নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং স সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন ঃ ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৫ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 5th January, 1973 শুক্রবার, ২১ পৌষ, ১৩৭৯ .52 Paise

অমূল্য মদিরা : লণ্ডন শহরে গত নভেম্বর মাসের একুশ তারিখে ৪,৬৬১ পাউণ্ড মূল্যে এক বোতল পুরনো মদ বিক্রী হল, ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে যার দাম হবে ৮৮ হাজার টাকার কিছু বেশী। ইতিপূর্বে এত দামে এক বোতল মদ কখনও লণ্ডন, প্যারিস বা লস এঞ্জেলসের নীলামে বিক্রী হয় নি। ১৮৭০ সালে রথস-চাইল্ডদের তৈরী ঐ মদ ও মদের বোতল দুই নাকি হাতে তৈরী করা। ঐ ধরনের মদের বোতল আর একটিই আছে পৃথিবীতে। প্রায় ৬০০ বোতল বিভিন্ন সময়ের ও ভিন্নতর মানের মদ ঐ দিন লণ্ডনের বণ্ড স্ট্রীটস্থ সোথ্বির বিখ্যাত নীলাম কেন্দ্র থেকে বিক্রী হয়। কিন্তু নীলামে ডাক চলে একসঙ্গে লণ্ডন, প্যারিস ও লস এঞ্জেলস শহরে। ক্রেতাদের মধ্যে টেলিফোনের সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করা হয় এবং তিন কেন্দ্রে যিনি সর্বোচ্চ ডাক দেন তিনি তাঁর ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ করেন। উল্লেখিত নতুন বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি-কারী দামটি দেন মারিও রুসপোলি নামে এক মদিরা রসিক। ঐ দিন নীলামে মোট ৩৮,০৭১ পাউণ্ড মূল্যের পুরনো মদ বিক্রয় হয়।

ওরা চলে গেল : গ্রীক, পারশিক, শক-হূন-পাঠান-মোগলের মতো ওরাও একদিন অনাহূত হয়েই এদেশে এসেছিল এবং এদেশের মাটিতে আশ্রয় পেতে তাদেরও কোন অসুবিধা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্মসভায় ভারতের শাশ্বত আতিথেয়তা ও ঔদার্যের কথা বলতে গিয়ে ওদের কথাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে ইহুদিরা যখন স্বদেশেই নিরাশ্রয় হয়, রোমানদের পীড়নে নিরুপায় হয়ে দেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর চারিদিকে তখন ভারতই ওদের আশ্রয় দিয়েছিল অসঙ্কোচে, সাগ্রহে। সে আতিথ্য তারা গ্রহণ করেছিল সকৃতজ্ঞচিত্তে। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ওদের বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু শক-হূন-পাঠান-মোগলদের ভারত আগমনের সঙ্গে ওদের ভারত আগমনের ব্যাপারে একটা পার্থক্য বরাবরই ছিল, এবং সে পার্থক্য সম্বন্ধে ওরাই ছিল সবচেয়ে বেশি সচেতন। এই ভারতের মহামানবের সাগরে একদেহে লীন হতে ওরা আসেনি। উনিশ শ বছর ধরে ওরা একথা কখনও ভোলেনি যে, ওরা এদেশের অতিথি, এটা ওদের স্থায়ী বাসভূমি নয়। ওদের 'প্রতিশ্রুত ভূমি' ইজরেইল ওরা আবার একদিন ফিরে পাবেই এবং সেদিন একবারের জন্যও পিছু ফিরে না তাকিয়ে ওরা স্বগৃহে ফিরে যাবে। তারপর বিগত দুই সহস্রাব্দে কত ঝড়ঝঞ্ঝা এসেছে ওদের জীবনে, দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ ইহুদির প্রাণবলি হয়েছে, কিন্তু ওরা ওদের বিশ্বাস থেকে এতটুকুও টলেনি, একবারের জন্যও ভাবেনি যে ওদের দেশ ওরা আর ফিরে পাবে না। আর শেষ পর্যন্ত যখন ওদের বিশ্বাসেরই জয় হল, প্রতিষ্ঠিত হল ইহুদি রাষ্ট্র ইজরেইল তখনই শীতের পাখিদের মতো ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে ফেরা শুরু হল।

কোচিন থেকে কদিন আগে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ, ৭০ খৃষ্টাব্দে যেসব ইহুদি কোচিনে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তিন দশক আগে তাদের সংখ্যা ১০,০০০ পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে মাত্র পনেরটি ইহুদি পরিবার পড়ে আছে এবং তাদের মোট সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হবে না। ঐ সম্প্রদায়ের নেতা শ্রী এস এস কোডার বলেছেন, ইজরেইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ওদের দলে দলে দেশত্যাগ শুরু হয়। ছেলেরাই প্রথমে যায়, তারপর মেয়েদেরও না গিয়ে উপায় থাকে না। আজ যারা পড়ে আছে তাদেরও না চলে গিয়ে উপায় নেই, কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হওয়াই এখন সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহুদিদের প্রতিষ্ঠিত মালা গ্রামে আজ একজন ইহুদিও বাস করে না তাই সেখানকার সিনাগগ, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতির দায়িত্ব স্থানীয় পঞ্চায়েৎকে নিতে হয়েছে। কোচিন ও তার নিকটবর্তী চেনামঙ্গলমের সিনাগগের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ উপাসনা ভবনগুলির দায়িত্ব নেওয়ার মত কোন যাজক আর সেখানে নেই।

ইউরোপ আমেরিকার ধনাঢ্য মহল আজ পাগল হয়ে উঠেছে এক চতুর্দশবর্ষীয় বালকগুরু—গুরু মহারাজজির ভক্তিপ্রেমে। মোটামুটি হিসাবে গুরু মহারাজজির লণ্ডনে ভক্তের সংখ্যা ৬০০০, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ৫০০০ আর আমেরিকায় ৩০,০০০। তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও সমৃদ্ধ ঘরের ছেলে এবং সকলেই সম্মানজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত আর প্রায় সকলেই যুবক ও যুবতী। গুরু মহারাজজির জন্য তারা পাগল; এই মহাবিশ্বের প্রতি অণু পরমাণু গুরুজির নিয়ন্ত্রণে—এ বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ নেই; গুরুজির দর্শন পেলে বা তাঁর চরণারবিন্দ স্পর্শের সুযোগ পেলে তারা নবজীবন লাভের আনন্দ ও শিহরণ অনুভব করে। গুরুজি যে ভগবান কৃষ্ণ ও যীশুর বিভূতির উত্তরাধিকারী! ইউরোপ আমেরিকা থেকে যে অন্যূন তিন হাজার শ্বেতাঙ্গ শিষ্যশিষ্যা জাম্বো জেট বিমান ভাড়া করে আসছে ভারতে, তাদের একমাত্র আনন্দ যে একটানা তিনদিন তারা ঐ বালমুকুন্দর চরণতলে বসে তার দর্শনে নয়ন ও বাণীতে শ্রবণ সার্থক করতে পারছে।

ইউরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত, গোলগাল ও মাখনের মত নরম, চতুর্দশবর্ষীয় বালক গুরু মহারাজজি আর এক গুরু সৎগুরুদেব শ্রীহংস মহারাজজির পুত্র এবং তাঁর কাছেই দীক্ষিত। মাত্র দু' বছর বয়সে ঐ বালকের বিভূতির প্রকাশ পায় এবং ছ' বছর বয়সে বালক সুন্দর পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে এক তত্ত্ব-সমৃদ্ধ ভাষণ দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে। আজ চতুর্দশ বর্ষ বয়সে ঐ বালক শতসহস্র ভক্তকে একটানা কয়েকঘণ্টা ধরে ভাষণ দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। বালক গুরুর প্রায় সবটুকু সময় এখন বিশ্বময় ভক্তদের মাঝে ঘুরে ঘুরেই কেটে যায়। তার সংগঠনের নাম 'ডিভাইন লাইট মিশন', শিষ্যদের দেওয়া একটি রোলস রইস গাড়িতে চড়ে গুরু আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ান। ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দি ডিভাইন টাইমস' পত্রিকায় নিয়মিত গুরুজির বাণী ও ঐশ্বরিক লীলার কথা প্রচারিত হয়। বালক গুরু এখন বিশ্বগুরুর মর্যাদায় উন্নীত।

—প্রত্যক্ষদর্শী

নববর্ষের শুভ সূচনা

একটি বৎসর অতিক্রান্ত। আমরা প্রতিশ্রুতিময় সত্তরের দশকের আরেকটি বৎসরে পদার্পণ করলাম। বাহাত্তর সালে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। বিগত কয়েক বৎসরের দ্বিধা সংশয় এবং অস্থিরতা কাটিয়ে ভারতবর্ষ তার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বনিয়াদকে আরও মজবুত করেছে। পশ্চিম বাংলায় দুঃখনিশার অবসান ঘটিয়ে এ রাজ্যে স্থায়ী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য। প্রতিবেশী বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে ডিসেম্বরে। এই মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতবর্ষের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর উজ্জ্বল ও অক্ষয় ভিত্তি আজ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত।

বৎসরের শেষ সপ্তাহে আমাদের বাংলায়, কলকাতা শহরে জাতীয় কংগ্রেসের ৭৪তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বাংলায় গত কয়বছর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল এবং কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তাতে কেউ আশা করতে পারে নি এত অল্প সময়ের মধ্যে এই রাজ্যে কংগ্রেস আবার তার হৃতমর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী এই গৌরবের অধিকারী করেছেন বাংলার যুবসমাজকে এবং বাংলার সাধারণ মানুষের সুস্থ রাজনৈতিক বুদ্ধিকে। তাদের জন্যই বাংলায় রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদের কর্মসূচী রূপায়ণের কাজে গোটা জাতি হয়েছে ঐক্যবদ্ধ। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভাষণও বিশেষ তাৎপর্যময়। কংগ্রেসের মধ্যে যে সংকল্প ও প্রত্যয় ফিরে এসেছে নতুন উদ্দীপনায় সভাপতির ভাষণে তা সুস্পষ্ট। একথা ঠিক যে, পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বৃহৎ জনসমাজের অনেক সমস্যা এখনো সমাধান করা যায় নি। কিন্তু ধাপে ধাপে এবং প্রগতিশীল কর্মসূচী অনুযায়ী সেই সমস্যার মোকাবিলা করার যে চেষ্টা হচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পুঁজিবাদী চিন্তাধারার জট থেকে মুক্ত করে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে একটি গতিশীল এবং সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠনে পরিণত করা হয়েছে। বৃহৎ দল বলেই তার মধ্যে নানা ধরনের লোক সহজে অনুপ্রবেশ করার সুযোগও পায়। প্রগতিশীল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ ও রূপায়ণের পথে তারা সাধারণত বাধা সৃষ্টি করে। কংগ্রেস সভাপতি এই অপশক্তির বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় হুঁসিয়ারী দিয়েছেন এবং তাদের প্রতিকূলতা রোধের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেসকর্মীদের।

ভারতের মতো বৃহৎ জনসমষ্টির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার ও শিল্পসমৃদ্ধির অর্থপূর্ণ কার্যসূচী রূপায়ণ সমন্বিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই। অনেক পুঁজিবাদী দেশেও পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা কার্যে রূপায়ণের মনোভাব দেখা দিয়েছে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সামাজিক অসঙ্গতি দূর করার জন্য ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে কার্যসূচী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সেদিকেই আজ কংগ্রেসের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সামাজিক কুসংস্কার এবং অশিক্ষা দূর করতে না পারলে এই বৃহৎ ও পবিত্র কর্মযজ্ঞে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্থিতস্বার্থের শক্তি, কায়েমী উপস্বত্বভোগী শ্রেণী এবং পুঁজিবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন আমলাতন্ত্রের দ্বারা দেশে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী রূপায়ণ যে কত কঠিন তা নেতারা এখন ভালভাবেই উপলব্ধি করছেন। সে কারণেই কংগ্রেস সভাপতি তাঁর সংগঠনকর্মীদের এবং সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনগণকে এই দুরূহ কার্যসূচী রূপায়ণে প্রত্যক্ষ অংশীদার হবার আহ্বান জানিয়েছেন। যত দিন যাচ্ছে জনগণের সংকল্পও হচ্ছে ততই দৃঢ়। কিন্তু সরকারী শৈথিল্য এবং নানা স্তরে কর্তব্য অবহেলা ও অনাচারের দরুন জনসাধারণের প্রাপ্য বস্তু নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী, মুনাফাখোরদের চক্রান্ত এখনও ভাঙা সম্ভব হয় নি। তাই দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। এর জন্য সাধারণ মানুষের দুর্গতি ও দুর্দশার অন্ত নেই। বস্তুত, এটাই হল সমস্ত হতাশার মূল।

সত্তরের দশকে আমরা পুরোপুরি খাদ্যে স্বনির্ভর হব এবং সকল মানুষকে মোটা ভাত-কাপড় দিতে পারব এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে পঞ্চম যোজনার কাজ শুরু হবে। নতুন বৎসরে সেই প্রত্যাশাই আমরা নতুন করে তুলে ধরতে চাই জনসাধারণের কাছে 'গরিবী হটাও' ধ্বনি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গরিবীই হল সবচেয়ে বড় পাপ। এই পাপ দূর করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের বিধাননগর অধিবেশন নতুন করে যে সংকল্প ঘোষণা করেছেন তা সার্থক হোক, নববর্ষের এই শুভেচ্ছাই জানাই। আরও নিষ্ঠা, আরও শ্রম এবং আরও সততায় ঘোষিত কার্যসূচী রূপায়িত হোক এবং দেশের বুভুক্ষু কোটি কোটি মানুষের জীবনে তা নিয়ে আসুক প্রসন্নতার আশীর্বাদ।

দেশ বিদেশ

১৯৭২ সাল শেষ হয়ে যখন ১৯৭৩ সাল শুরু হতে চলল ঠিক সেই সংক্রান্তির ক্ষণেই ইন্দোচীনে শান্তির আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এই একটি মাত্র ঘটনার দ্বারাই বিদায়ী বছরটি 'হতাশার বৎসর' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সম্ভবত এই শতাব্দীতে মানুষের শেষ চন্দ্রযাত্রা অ্যাপোলোর সফল সমাপ্তি করে যেদিন আমেরিকান নভশ্চররা পৃথিবীর বুকে ফিরে এলেন ঠিক সেদিনই মার্কিন বোমারু বিমানগুলি প্রচণ্ড পরাক্রমে ইতিহাসের ভীষণতম বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল ক্ষুদ্র উত্তর ভিয়েতনামের উপর, এই একটি তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগের মধ্যে ১৯৭২ সাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে একই সঙ্গে মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার বৎসর হিসাবে।

অথচ বিদায়ী এই বৎসরের সূচনা হয়েছিল গভীর আশা নিয়ে। ঘটনার স্রোত এই বছর এমনভাবে বয়েছে যাতে মনে হচ্ছিল, দীর্ঘকাল বাদে মানুষ বুঝি পুরান বিরোধ ও বিবাদ ভুলে বিশ্বশান্তির একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি খুঁজে পেতে চলেছে। ১৯৭২ সালে বিশ্বশান্তির ঐ আশার বৃহত্তম প্রতীক হয়ে উঠেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের চীন সফর। ঐ সফরের ফলে আর কিছু না হোক, অন্তত এটুকু আশা করা গিয়েছিল যে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনবহুল আর সবচেয়ে জনবহুল নিজেদের ভিতরকার চিরাচরিত বৈরিতার পথ পরিহার করে সহজতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পাবে। চীন সফরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন রাশিয়া সফরে গেলেন তখন বিশ্বশান্তির আশা উজ্জ্বলতর হল। ঐ সফরের পর দুই দেশের মধ্যে যেসব চুক্তির কথা ঘোষণা করা হল সেগুলির ভিতর দিয়ে এটা প্রমাণিত হল যে, রাজনীতি ও মতাদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও পৃথিবীর এই দুই শক্তিশালী দেশ কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করতে পারে।

বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা হ্রাসের এই প্রবণতা ১৯৭২ সালে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। চীন ও জাপান তাদের দীর্ঘকালের শত্রুতার স্মৃতি মুছে একে অন্যের দিকে হাত বাড়াল। জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী তানাকা চীন ঘুরে আসায় চীন-জাপান সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। ১৯৭১ সালের শেষে রাষ্ট্রসংঘে লাল-চীনের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে যে শুভ প্রবণতার সূচনা হয়েছিল সেটা এইভাবে ১৯৭২ সালে সার্থক পরিণতির দিকে যাচ্ছিল।

এই ১৯৭২ সালেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত দেশগুলিতে দেশ-বিভাগের বেদনাময় স্মৃতি মুছে দেওয়ার জন্য নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করতে আরম্ভ করা হয়েছে। পাকিস্থানের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বাংলাদেশ এই বছর তার মুক্তির প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। বাংলাদেশের মুক্তি অনেক সঞ্চিত সংস্কারের মূলে আঘাত করে ২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছে। ১৯৭২ সালে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের ঐ পথটিকে আলোকিত করেছে। যদিও এই চুক্তির রূপায়ণ খুব সহজসাধ্য হচ্ছে না, তাহলেও বছরের শেষে অন্তত ঐ চুক্তির প্রথম ধাপটি পার হওয়া গেছে যার ফলে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে দুই দেশের অধিকৃত এলাকাগুলি ভারত ও পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে চলে এসেছে। ওদিকে আর একটি বিভক্ত দেশ জার্মানিও দেশবিভাগের ক্ষতচিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৭২ সাল বিদায় নেওয়ার আগে পশ্চিম জার্মানি ও পূর্ব জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বিভক্ত কোরিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ অংশও এই বছর নিজেদের মধ্যে পুনর্মিলন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিচার্ড নিকসন, পশ্চিম জার্মানিতে ভিলি ব্রান্ট ও জাপানে কাকুই তানাকার পুনর্নির্বাচন ১৯৭২ সালে ঐ তিনজনের শান্তিনীতির প্রতি দেশের মানুষের সমর্থন সূচিত করেছে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিশেষ পরামর্শদাতা ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধি লেঃ ডুক থোর মধ্যে দীর্ঘ ও গোপন আলোচনার মধ্যে এক সময়ে এই আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ করার একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। ডঃ কিসিঞ্জার নিজে ঘোষণা করেন 'শান্তি এখন করায়ত্ত'। বড়দিনের আগেই ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলেও আশা করা হয়েছিল। এই আশা যদি সার্থক হত তাহলে ১৯৭২ সালকে পথ-পরিবর্তনের বৎসর হিসাবে চিহ্নিত করে রাখতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু প্রধানত সায়গনের বশংবদ সরকারের প্রধান থিউ বাগড়া দেওয়ার ফলেই ঐ আশা বাস্তবে পরিণত হল। বছরের শেষে ঐ ব্যর্থতা ১৯৭২ সালে তিলে তিলে গড়ে তোলা আশা ও বিশ্বাসের প্রতিমাখানিকে নাটকীয়ভাবে ভেঙে চুরমার করে দিল। ১৯৭২ সালে আশা করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিকসন। হ্যানয়, হাইফং ও উত্তর ভিয়েতনামের অন্যান্য অঞ্চলে অসামরিক জনসাধারণ, সিনেমা হাউস, বিদেশী দূতাবাস, হাসপাতাল, এমনকি বন্দীশালারও উপর নির্বিচারে বোমাবৃষ্টি করার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে বি-৫২ বিমান পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন সদম্ভে ঘোষণা করলেন, উত্তর ভিয়েতনাম (আমেরিকার নিজের শর্তে) চুক্তি করতে যতক্ষণ সম্মত না হচ্ছে ততক্ষণ আমেরিকা বোমা ফেলতেই থাকবে। খাস আমেরিকার মানুষ যখন বড়দিনের উৎসব নিয়ে ও নতুন বছরকে আবাহন করতে ব্যস্ত তখন উত্তর ভিয়েতনামের বন্দিশালায় আমেরিকান যুদ্ধবন্দীরা নিজেদের দেশের বিমানের হানাদারি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিবর খনন করতে লেগেছিলেন—বিদায়ী ১৯৭২ সালের ঘটনাপ্রবাহের বিচিত্র পরিহাসের প্রতীক হয়ে থাকবে ঐ ঘটনা।

দেশের দিকে তাকালেও আমরা সম্ভবত ১৯৭২ সালটিকে আশাভঙ্গের বৎসররূপেই চিহ্নিত করব। ১৯৭১ সাল ভারতবর্ষে শেষ হয়েছিল একটা গভীর আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। পার্লামেন্টের মধ্যবর্তী নির্বাচন

তখন শ্রীমতী ইন্দিরা সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি সফল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সম্ভব করেছে। আপন প্রত্যয়ের শক্তিতে তার বিশ্বাস তখন যেমন প্রবল বিশ্বের দৃষ্টিতেও তার আসন তখন তেমনি উঁচে। ঘরের ভিতরে তখন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতি তখন অনেক বেশি স্বস্তিকর। ফসলের প্রাচুর্যে তখন তার শস্য-ভাণ্ডার পূর্ণ, বহু বছরের মধ্যে তখনই ভারতবর্ষ খাদ্যশস্যে স্বয়ংনির্ভর। বাজারের দাম তখন মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে ছিল। দেশের মধ্যে কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিপত্তি তখন অপ্রতিহত। কিন্তু বিদায়ী বছরের শেষে চিত্রটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। একটি খরার আঘাতে সবুজ বিপ্লব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আকাল দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার নিরন্ন মানুষ শহরে ছুটে আসছে। খাদ্য-শস্যের সন্ধানে আবার আমাদের বিদেশের দিকে তাকাতে হচ্ছে। খাদ্যশস্যের জাহাজ আবার আমাদের বন্দর স্পর্শ করছে। অন্য-দিকে, ছাত্র ও শিক্ষকদের বিক্ষোভ, ভাষার লড়াই [illegible] দাবিদাওয়ার লড়াই ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন অশান্তি ডেকে আনছে। অন্ধ্র ও আসামে এইসব অশান্তি কংগ্রেসের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের বাদ্য দিয়েও সেই বিরোধের নিরসন করা যাচ্ছে না।

এইভাবেই ভারতবর্ষের মানুষে ১৯৭২ সাল পার হল এখন দেখা যাক ১৯৭৩ সাল এই দেশের জন্য কোন ভাগ্য নিয়ে আসে।

২৯-১২-৭২   —পাণ্ডবীক

মানেকশ ফিল্ডমার্শাল

সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ এম এইচ এফ জে মানেকশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হয়েছেন। আর সেনা-বাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে ১৪ জানুয়ারী থেকে কার্যভার নেবেন লেঃ জেনারেল বেউর।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে, জেনারেল মানেকশ আজীবন এই পদমর্যাদা ভোগ করবেন।

তাঁর প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপে তাঁকে এই মর্যাদায় ভূষিত করা হল। স্বাধীনতার পরে জেনারেল মানকশই সর্ব-প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হলেন। এক-মাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ। ভারত উপমহাদেশে আর কোন ফিল্ড মার্শাল ছিলেন না।

১৯৬৫ খৃঃ পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের জয়লাভের পর কোন কোন মহল থেকে জেনারেল জে এন চৌধুরীকে ফিল্ড

ফিল্ড মার্শাল মানেকশ

মার্শাল পদে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই সময়ে সরকারের মনোভাব সেই প্রস্তাবের অনুকূলে ছিল না।

২ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ভবনে আনু-ষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি জেনারেল মানেকশকে এই সম্মান স্মারক প্রদান করেন।

ফিল্ড মার্শাল সাম-হরমুসজী ফ্রামজী জামশেদজী মানেকশ ১৯৬৯ খৃঃ ৮ জুন সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডঃ এইচ এফ মানেকশ প্রথম মহাযুদ্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিসে একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ ৮ এপ্রিল অমৃতসরে জেঃ মানেকশর জন্ম। নৈনীতাল এবং পরে অমৃতসরে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৪ খৃঃ তিনি কমিশন পান এবং পরে সীমান্ত রাইফেলস বাহিনীতে যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি ব্রহ্ম রণাঙ্গনে ছিলেন। প্রথম বর্মা অভিযানে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সিটাং নদী ফ্রন্টে তিনি পেগু ও রেঙ্গুন অভিমুখী জাপ বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে তাঁর বাহিনী পরিচালিত

করেন। তাঁর নেতৃত্ব এবং সাহসের জন্য তাঁকে অবিলম্বে পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই থেকে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং চিকিৎসার জন্যে তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়।

অতঃপর তিনি কোয়েটা স্টাফ কলেজে যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে তিনি স্টাফ অফিসার হিসেবে ইন্দো-চীনে জেনারেল ডেজির নিকট যান। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তিনি দশ

হাজার ধ্বংসবন্দীর পুনর্বাসন কার্যে সাহায্য করেন।

১৯৫৭ খৃঃ তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের একটি বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। অতঃপর তিনি ওয়েলিংটনে ডিফেন্স সার্ভিস স্টাফ কলেজে কম্যান্ডান্টের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬২ খৃঃ তিনি লেঃ জেনারেল পদে উন্নীত হন। চীনা আক্রমণের পরেই নেফার কোর কম্যান্ডার নিযুক্ত হন।

১৯৬৩ খৃঃ তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের জি ও সি-ইন-সি নিযুক্ত হন এবং পরে পূর্ব কম্যান্ডের প্রধানরূপে কলকাতায় বদলী হন। ১৯৬৮ খৃঃ তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ খৃঃ ৮ জুন তিনি সৈন্য বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

প্রকাশ লেঃ জেনারেল বেউর ১৪ জানুয়ারী সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

সাধারণত ১৫ জানুয়ারী তারিখ সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্যবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করে থাকেন। জেনারেল বেউর যথাসময়ে কর্যাভার গ্রহণ করবেন।

বৃটিশ সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুসারে কোন বিশিষ্ট জেনারেলকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করা হলে সামরিক বাহিনীর তালিকায় তাঁর নাম রাখা হয় এবং অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকার সেই নীতিই অনুসরণ করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চলো বিধাননগর

দিলীপ মালাকার

চলো চলো দিল্লী চলো স্লোগান ছিল ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন চলছিল আই, এন, এ মুভমেণ্ট। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্লোগান ছিল চলো ঢাকা চলো। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় স্লোগান চলো চলো বিধাননগর।

দিল্লী চলো, ঢাকা [illegible] বিধাননগর চলোর তফাত অনেক। এ [illegible] কংগ্রেস অধিবেশনে কলকাতায় অনেক বাস, মিনিবাস চলেছিল একটিমাত্র লক্ষ্যে— বিধাননগরে। বিধাননগরে গিয়ে দেখি গাড়ির পর গাড়ি। তার বুকে সাঁটা 'অন এসেনশিয়াল সার্ভিস', 'অন স্পেশাল ডিউটি' 'এ', 'বি' পার্ক, প্রেস: ইত্যাদির লেবেল সাঁটা। বিশেষ ট্রেন এসে থেমেছে উল্টাডাঙ্গা স্টেশনে। যদি ট্রাম লাইনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকত তাহলে বোধহয় ট্রামও থামত বিধাননগরে।

লবণ হ্রদ নামে যে জলাভূমি পড়েছিল মহাকাল তাকে উদ্ধার করে বালি দিয়ে ভরাট করে নগর বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর উদ্যমে লবণ হ্রদের কাজ শুরু হয় দশ বছর আগে। সে কাজ এখনও চলছে। বাড়ি ঘর হয়েছে প্রচুর। কিন্তু মনে হবে যেন রাজস্থান বা নয়াদিল্লীর কোনো উপনগরী। সবুজের চিহ্ন নেই। ধুধু করছে বালি। অনেকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, যদি বালি খেতে চাও তো বিধাননগরে যাও।
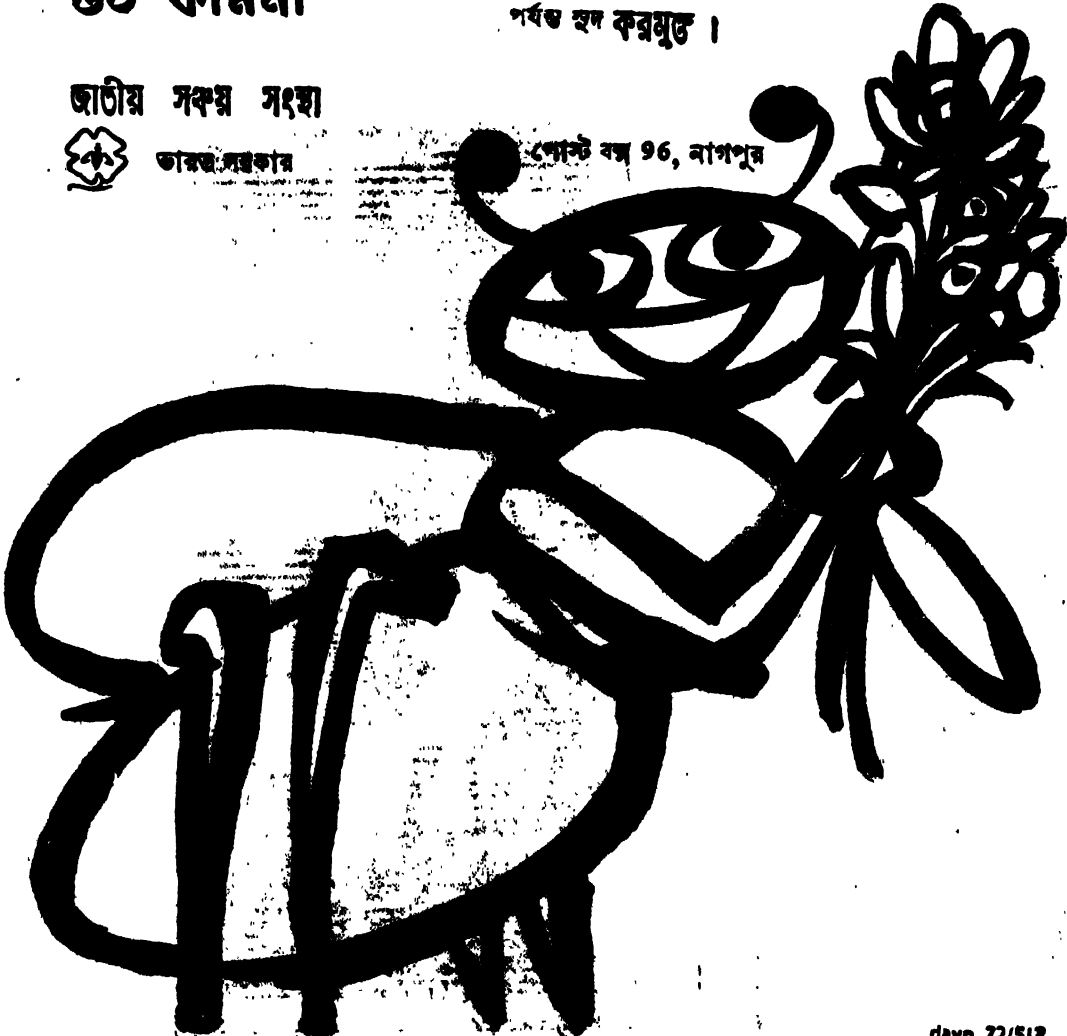
ধুলোর চেয়ে মারাত্মক ছিল সন্ধ্যের পর মশার কামড়। তারচেয়েও উল্লেখযোগ্য হল ডাকসাইটে-বিশালকায় পোকা-মাকড়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত এইসব পোকা-মাকড়ের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এত বড় পোকা আমি জীবনে দেখিনি।

বিধাননগরে ৭৪তম কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হয় ২৬শে ডিসেম্বর। কিন্তু অগণিত দর্শকের ভীড় শুরু হয় ২৪শে ডিসেম্বর থেকে। তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবনির্মিত অতিথিশালা। যেখানে প্রধানমন্ত্রী বাস করেছিলেন। বাড়িটা সম্পূর্ণ শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত। সদ্য

বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকের আগে বন্দে মাতরম্ গানের সময় মণ্ডপে নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে ওঠেন। ছবিতে কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ডানদিকে এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব, বাঁদিকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও সর্বদক্ষিণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সংগে আলোচনারত শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ

বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধান প্যান্ডেলের পিছনে উড়ছে কংগ্রেস পতাকা।

বানান বাগানে বড় বড় খেজুর গাছ তুলে লাগান হয়েছিল। বানান হয়েছিল ফুল বাগান।

জনগণের ভীড় দেখা গেছে প্রদর্শনী মণ্ডপে। সেখানে লাখ লাখ লোকের ভীড়।

কংগ্রেস অধিবেশন দেখতে লক্ষ লোকের লাইন। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর জনতার ভীড় রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল সময় সময়। প্রথম দিন দেখলাম জনতা একবার এ, আই, সি. সি. সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত আসন ও সাংবাদিকদের জন্যে সংরক্ষিত জায়গায় ঢুকে বসে পড়েছেন। তাঁদের সরে যেতে অনুরোধ করেন কয়েকজন মন্ত্রী।

প্রথম যুগে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলেই তার সংগে বসত স্বদেশী মেলা। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশী মেলার চলন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবার। সেই থেকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সংগে মেলার চলন চলে আসছে। এবারের কংগ্রেস অধিবেশনেও তাই হয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশনকে বাৎসরিক মেলা বলে কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল একটি সংবাদপত্রে। তাই নিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস অধিবেশন মেলা নয়। একে অত খেলো মনে করার কারণ নেই। কংগ্রেস অধিবেশনের শেষের দিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ও সেই এককথা বললেন, যেসব দুষ্ট লোক কংগ্রেস অধিবেশনকে মেলা বলে প্রচার করছে তারা জেনে রাখুন এটি জনগণের মেলা।

কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করতে এসে বিহার-উত্তরপ্রদেশের কিছু লোক 'রথ দেখা ও কলা বেচা' দুই কাজই

করেছেন। কয়েকজনকে দেখলাম কংগ্রেসের প্যান্ডেলের সামনে চাদর বিক্রি করছে।

একদিন দেখলাম প্যান্ডেলের কাছে সাপ ও বেজীর খেলা দেখান হচ্ছে। বেশ ভীড় জমে গেছে। একজন কংগ্রেস সদস্য বললেন—ভেতরে সাপ-নেউলের খেলা হয়নি তাই বাইরে হচ্ছে। আমাদের অধিবেশন শান্তভাবেই হয়েছে।

এ বিষয়ে সবাই একমত। এবারকার বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশনে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। এখানে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার ছক তৈরী করা হয়েছিল দিল্লীতে। বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনে যতক্ষণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসেন নি ততক্ষণ উত্তেজনা ও দর্শকদের কৌতূহল অত বেশী ছিল না। যখনই শ্রীমতী গান্ধী প্যান্ডেলে আসতেন তখনই দেখতাম গুঞ্জন ও জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি। কংগ্রেস বলতে যেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধী বলতেই যেন কংগ্রেস।

হিন্দিওয়ালারা একটু বেশী মাত্রায় হিন্দিপ্রেমিক বলে মনে হল। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগের দিন প্রদেশ কংগ্রেসের ক্যাম্পের সামনে এক হিন্দিওয়ালা বক্তৃতা শুরু করে দেয়, ইংরেজীতে কেন পথ-নির্দেশিকা ও প্রচারপত্র ছাপা হয়েছে। ইংরেজ তো বিদায় নিয়েছে। আর ইংরেজী কেন।

অধিবেশনের প্রথম দিন কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা ভাষণ দিচ্ছিলেন ইংরেজীতে। অমনি প্রতিবাদ উঠল, হিন্দিতে বলুন, ইংরেজীতে নয়। পরে অবশ্য সভাপতি হিন্দিতে বলেছিলেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে ডায়াসের সামনে এসে উপস্থিত এক নাগা সন্ন্যাসী। তার পরনে কৌপীন। খালি গা। হাতে একটি ছোট্ট কাঠের বাক্স। স্বেচ্ছাসেবকরা যখন তাকে নিয়ে এলো বাইরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোত্থেকে এসেছেন। নাগা সন্ন্যাসী জানালেন যে তিনি হরিদ্বার থেকে এসেছেন। যেখানেই কংগ্রেস অধিবেশন হয় সেখানেই তিনি গিয়ে হাজির হন। ট্রেনে চাপলেই হল। কোনো ঝামেলা নেই। দেশে এত পাপ বাড়ছে তাই তিনি ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন।

ব্যাজধারীদের সংখ্যা কম ছিল না। কেউ কেউ নিজের হাতে ব্যাজ তৈরী করেও এসেছিলেন। কিন্তু যাঁরা কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের কারুর কারুর ব্যাজও ছিল না, ছিল না তাঁদের গাড়িতে বিশেষ কাগজ সাঁটা। তাই নিয়ে বেশ রসিকতা চলে প্যান্ডেলে। উপমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জির জামায় ব্যাজ নেই। তাঁকে ঢুকতে দিতে চাইছিল না পুলিশের লোক যদিও তিনি পুলিশ মন্ত্রী। শেষে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ রঞ্জিত গুপ্ত এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মণ্ডপে।

এমনি আরেক অঘটন ঘটে কেন্দ্রীয় কোনো ছাড়পত্রের কাগজ ছিল না। তাই শুনে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন মন্ত্রী জ্ঞান সিং সোহনপাল মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। কারণ তাঁর দায়িত্ব ছিল গাড়ির ব্যবস্থা করা।

এ তো কিছুই নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি চীফ শ্রীহান্ডাকে নিয়ে টানাটানি করে স্বেচ্ছাসেবকরা। তার বুকে কোনো ব্যাজ ছিল না। পুলিশের লোক এসেও সেই এক কথা বলে। শ্রীহান্ডাকে কেউ চেনে না। তাই এত গণ্ডগোল।

দর্শকদের কৌতূহলের শেষ ছিল না রান্নাঘর দেখার। কারণ চল্লিশ হাজার লোকের আহারের ব্যবস্থা চাট্টিখানি কথা নয়। চল্লিশ হাজার লোকের দুবেলা খাবার অর্থাৎ আশী হাজার পাতের রান্না করেছে কয়েক হাজার পাচক। সেকালে রাজ-রাজড়াদের আমলে রাজসূয় যজ্ঞ হত বলে শুনেছি। সেখানে নাকি বহু লোক খেত। কিন্তু চল্লিশ হাজার লোকের রান্নার ব্যবস্থা ছিল বলে আমরা জানি না।

চা-জলখাবারের সময়ও সমস্যা বড় কম ছিল না। কেউ চা খান কেউ কফি। মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীকে কফি দিতে তিনি চাইলেন চা। চা আনতে ছুটলেন এক কর্মকর্তা। চা যখন এলো তখন প্রধানমন্ত্রী উধাও।

একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো বক্তা একবার মাইক হাতে পেলে সহজে ছাড়তে চাইতেন না। তাই নিয়ে বেশ রসিকতা চলে ভি. আই. পি লাউঞ্জে।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন বিধাননগরের নবনির্মিত বাড়িগুলোতে। বাড়তি সদস্যরা ছিলেন টিনের চালের ক্যাম্পে। সবচেয়ে বেশী সদস্য আসে উড়িষ্যা থেকে—প্রায় সাড়ে তিন হাজার। তারপর হল উত্তরপ্রদেশের। সবচেয়ে কম আসে মিজোরাম থেকে। মাত্র তিনজন।

বিধাননগরে অধিবেশনও ব্যবস্থাদি সম্পর্কে এক এক প্রদেশের প্রতিনিধি এক এক রকমের মন্তব্য করেছে। কংগ্রেস অধিবেশনের এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকজন প্রতিনিধি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস অফিসের সেক্রেটারী শ্রীসুন্দর রাজন, সালেম জেলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীমতী মারাগাথাম ত্যাগরাজন ও মাদ্রাজ নগর কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীএল মাথাই বলেছেন—১৯৫৫ সালের আবাদী কংগ্রেসের পর বিধাননগরের অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের বম্বে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের তুলনায় বিধাননগরের প্রকাশ্য অধিবেশন বিরাট ও এলাহি ব্যাপার। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় তাঁরা সন্তুষ্ট। প্রদর্শনীও আকর্ষণীয়। ভাষা সমস্যায় তাঁরা খানিক বিব্রত বোধ করছেন। এই ধরনের ব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটি ছিল।

অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের শ্রীরাজন মূর্তি বললেন—বম্বে অধিবেশনে যে আয়োজন ছিল তার তুলনায় বিধাননগরের আয়োজন অনেকগুণ বড়। প্রদর্শনীও বিরাট। সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে আরও ভাল হত। যাবার আগে কলকাতা শহর দেখতে বেরুবেন।

মণিপুরের এক প্রতিনিধি শ্রীইবোতোম্বি সিং এর কাছে বিধাননগরীর সব ব্যবস্থাই ভাল লেগেছে। তাঁর দলের কোনো অসুবিধে হয়নি।

হিমাচল প্রদেশের শ্রীভার্গব, এম, পি, এবং শ্রীরমেশ বর্মা, এম, এল, এ বললেন—বিধাননগরে সবই ভাল কিন্তু তথ্য ও অনুসন্ধানের বড়ই অভাব। নইলে সব সুষ্ঠু হত।

বিহারের কৃষিমন্ত্রী শ্রী পি, সি, কিস্কু ও শ্রীমতী কিশোরী দেবী, এম, এল, সি বললেন—আমাদের কাছে বম্বে অধিবেশনের ব্যবস্থা ভাল লেগেছিল। বিধাননগরে বাসস্থানের ব্যবস্থা তাঁদের মনঃপূত হয়নি। তাছাড়া রয়েছে যানবাহনের সমস্যা।

পাঞ্জাব প্রতিনিধি দলের শ্রী ও, পি, গুপ্ত (লুধিয়ানা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি) ও শ্রী এ, সি, মেহেতা জানালেন তাঁদের খাওয়া থাকার কোনো অসুবিধে হয়নি। তবে তথ্য ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা ভাল নয়। সময় মতন অনেক খবরও পান না। অধিবেশনের পরে কলকাতায় শিল্পাঞ্চল দেখা তাঁদের একমাত্র মনের সাধ।

সাংবাদিকদের জন্যে ব্যবস্থা ছিল অনেক। এক সার বাড়ি তাঁদের জন্যে। মণ্ডপের বাইরে ডাক-তার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল বিরাট প্রেস লাউঞ্জ। সেখানে টেলিপ্রিণ্টার ও টাইপরাইটার মেশিনের ছড়াছড়ি। অধিকাংশ সংবাদপত্রের অফিসে ছিল টেলিপ্রিণ্টার ও সরাসরি টেলিফোন লাইন। মণ্ডপেও ছিল মঞ্চের ধার ঘেঁষে প্রেস কর্ণার। ভারতের প্রায় সবকটা বড় সংবাদপত্রেরই অফিস খোলা হয় বিধাননগরে। তাছাড়া ছিল চোদ্দজন বিদেশী সাংবাদিক।

কংগ্রেস অধিবেশনের জন্যে নাকী চল্লিশ লাখ টাকা তোলা হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারও অর্থ ঢেলেছে প্রচুর বিধাননগরের জন্যে। তার সঠিক অংক জানা যায়নি। তবে একটি রাজনৈতিক দলের অধিবেশনের জন্যে সরকার এতখানি আগ্রহ দেখাবেন সেটা অনেকে ভাবতে পারেননি। অনেকে বলেছেন যে, ইংলণ্ড যখন লেবার পার্টি বা কনজারভেটিভ পার্টির বাৎসরিক অধিবেশন বসে ব্রাইটন বা ব্ল্যাকপুলে তখন কি সরকার এগিয়ে যায়? তা কখনই নয়। কারণ রাজনৈতিক দল যা করে তা তাঁরা নিজের টাকার জোরেই করে। সরকার এগিয়ে গেলে দেশময় মস্ত হৈচৈ বেধে যায়। এই নিয়ে অনেকে অনেক রকমের সমালোচনা করছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেও এই সপ্তাহে এবং [illegible] [illegible] নিয়মিতই সমস্ত। এই উপলক্ষে কলকাতার কাছে একটি উপনগরী গড়ে উঠল। এটাই

ঋতু হিসাবে পৌষ-মাঘ শীতকাল হলেও, অনেক বছর কার্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণের গোড়া থেকেই শীতের জোয়াল আমেজ দেখা দেয়, গরমের জামা-কাপড় ঘার করে ফেলতে হয়, কাঁথা-কম্বল-লেপ গায়ে দিতে হয়, তারপর পৌষ-মাঘ এলে তো আর কথাই থাকে না। এবার শীতের প্রকোপ কিন্তু এখনও তেমন জাঁকিয়ে দেখা দেয়নি। শীতকে অনেক সময় ভয়ের চোখে দেখলেও, শীত কিন্তু গ্রীষ্ম-বর্ষার মত যন্ত্রণাদায়ক নয় বলেই মনে হয়। গ্রীষ্ম-বর্ষায় যা পেটে সয় না, হজম হয় না, শীতে তা অনায়াসে হয়ে থাকে। শীতে ক্ষুধার উদ্রেক যেমন অন্যান্য ঋতুর চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশী হয়, তেমনি হজমও হয়ে যায় সহজে। প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম। এই সময় নানা রকমের আনাজ-কোনাজ ও ফল-ফুলাদি যেমন ওঠে, তেমনি ফুলেরও সমারোহ দেখা যায় চারদিকে। সেজন্যই বসন্তকে যেমন ঋতুরাজ বলা হয়ে থাকে, তেমনি শীতকেও আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে 'সুন্দরী' 'রানী' প্রভৃতি বলে।

এসম্বন্ধে সুন্দর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল 'জন্মভূমি' পত্রিকার ১৩০৩ সালের পৌষ সংখ্যায়। তখন অবশ্য পুরোপুরি ইংরেজ আমল এবং ইংরেজদের খুবই জোরদার অবস্থা। গরমের সময় হোমরাচোমরা, লাটবেলাট রাজপুরুষরা চলে যেত ঠাণ্ডা জায়গায়, পাহাড়ের দেশে শৈত্যাবাসে; আবার শীত জাঁকিয়ে পড়লে নেবে আসত তারা সমতলভূমিতে অপেক্ষাকৃত কম শীতের জায়গায় দলবল নিয়ে। 'জন্মভূমি'র এই লেখাটির মধ্যে এসকল বিষয় যেমন ইঙ্গিত আছে, তেমনি সাহিত্য-রসও আছে প্রচুর। সম্পাদকীয়টির নাম হচ্ছে 'শীত-সুন্দরী'। রচনাটি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—বানান ও ভাষা যথাযথ রেখে।

শীত-সুন্দরী

"আমি শৌর্য্যে সিংহিনী; সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রাণী; আমি বিলাস-বৈভবে বহুরূপিণী। আমি শীত। আমি নেমেছি।

আমি ইংরেজ-শাসনে ঋতু-রাজ্যের পাটরাণী। রাজ-দরবার ও শৈত্য-সোহাগে বিলাসসম্ভার বুকে করে আমি নেমেছি।

আমি শিমলা-শৈল-নিবাসে, স্বর্গ-বিলাসে ছিলেম। শরকুট করিতে, সখ করে, আমি নিম্নে—নেটিব-লোকে নেমেছি।

আমি, এই সহরে, মাস-দু-তিন শফর-প্রবাস করব। পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন। চৈত্র অবসানে উঠবে। চৌরঙ্গী ত্যজিয়া, আমার দলবল তখন চন্দ্রলোকে চম্পট দিবে।

আমি আট মাস অন্তরীক্ষে আরাম করি। সমতলের মাটীতে পা দিই না। নিদাঘের দাবদাহ আমার অতীব অপ্রিয়।... আমি নিদাঘে নামি না।

আমার শৈত্য-সম্পদে বঞ্চিত হয়ে, সমতলভূমি শ্মশানবৎ সন্তপ্ত হয়। আমি আট মাস এ রাজ্যে নামি না। এ রাজ্যের নিয়ন্তাদিগকেও নামাই না। আমরা একত্রে, হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, ঈথরের অনুপম পরমাণু স্পর্শে পুলকিত হই; আর প্রমোদ-প্রবাহে, রাস-বিলাসে ,প্রেয়সী ছোটাই। পৃথিবীতে পা বাড়াই না।

●

আমি নেমেছি। দেখ, এই সহরে, সুর-লোক নামায়েছি। বর্ষা-বিড়ম্বিত, গ্রীষ্ম-শুষ্ক শ্মশানকে, আমি মুহূর্ত মধ্যে, আমার মোহন স্পর্শে,—আ! আমার ঐন্দ্র-জালিক চুম্বনে, পর রমণীয় প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত করেছি। আমার ইঙ্গিত মাত্রে, দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, অপ্সর আত্মীয়স্বজনসহ, এখানে এসে সমবেত হ'য়েছেন।

●

যে বৃটিশ-সিংহ স্বেচ্ছা করলে, সসাগরা সমগ্র পৃথিবী রসাতলে প্রেরণ করতে পারেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বার্ত্তাকুবৎ—বরফ-ব্রাণ্ডির শবরৎ-বৎ অবহেলে উদরস্থ করতে পারেন,—এই বিশাল ভারতভূমি নিমেষ মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারেন, তাহার সেই বৃটিশ-সিংহের স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য আমারই হ্রাস-বৃদ্ধির উপর, নিত্য ও নৈমিত্তিকভাবে নির্ভর করে। তোমরা বুঝতে পেরেছ কি, আমি কে,—আর আমার শক্তি কত? আমি অপরিমেয় শক্তিময়ী; বৃটিশ সিংহের বক্ষে, শোণিতে, শিরায় শিরায় বিশ্ব-বিঘাতক-বল-সঞ্চারিণী; আমি শীত।

●

...আমি আমার সৌন্দর্য্যের কথা বোলবো না। সুন্দরী আপন সৌন্দর্য্যে আপনি দেখান না; লুকিয়েও রাখেন না; লোক তাহা দেখে। আমি আমার লাবণ্যরাশি তো আর লুকায়ে রাখিনি; লোকের চক্ষু থাকে তো দেখুক। আমার অঙ্গে অঙ্গে দেখুক, ওপাঙ্গে-ওষ্ঠে-নয়নে-বদনে-নিতম্বে দেখুক, আমার নীবীবন্ধে দেখুক, আমার কপোলে-কণ্ঠে-কুন্তলে দেখুক, আমার কাঁকালে, আমার বাহুতে ও বক্ষে দেখুক; আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে দেখুক! আমার এই সহরের শিরায় শিরায় তোরা আমার সৌন্দর্য্য-শোভা দেখ্! আমার হাট, আমার হোটেল, আমার ঠাট, আমার মাঠ, আমার পথ, আমার পার্ক, আমার যান, আমার বাহন, আমার অসংখ্য হর্ম্যের আর অসংখ্য জ্যোতি, আমার বিনোদ চিত্রশালা, আমার বিলাস-মন্দির, আমার ক্রীড়াস্থল, আমার সাজ-আসবাব আমার বারেন্দা-বৈভব সমস্তই আজ আমারই শীত-সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত করছে। আমার চৌরঙ্গী চাঁদের হাট, আমার ওয়েলেসলি অপ্সরোদ্যান, ফেয়ারলি ফ্যানসীপুলকিত, আমার পার্ক স্ট্রীট পরী-প্লাবিত; আমার হাস্যালোক-হিল্লোলিত হ্যারিসন প্রমোদ-ভুবন; আমার খিড়েন—ওলো! এবার শ্রীবৃন্দাবন!

●

আমি শীত, সাতিশয় রসবতী। আমায় শুষ্ক ভাবে কে? আমি বড়রসে সুন্দরী। আমি [illegible]গিনী। আমার ম্যুনিসিপাল মার্কেটে আর অগণিত লক্ষ রসের আটলাণ্টিক মহাসাগর! মজিবে, ম্যুনিসিপালে শ্লেচ্ছরস? তা, 'মাধবে' যাও। রস-সাগর নধর নূতন বাজারে যাও; আর যাও তবে বহুরস-রসিকা আমার বউ বাজারে! খাঁটী আর্য্যরস হ'তে আরম্ভ করে, বিশুদ্ধ বাবু-রস, অথাই আমিরী রস, নোক্তাদার নবাবী রস,—সকল রসই সশরীরে মূর্তিমান,— সজীবতায় দেদীপ্যমান দেখতে পাবে। ওলো! আমি রস নইলে কি এক নিমেষে রইতে পারি লো। আমি সর্বরসে সোহাগিনী। আমার নব্য-রস, আমার সভ্যরস, আমার কাব্যরস, আমার চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্যরস চারিদিকে দৌড়িচ্ছে! ওলো! পেয়-রসে আমি প্রেয়-গম্বরী! আমার পুলি, পুডিঙ, পিষ্টক আর পীরীতি রসের কি অবধি আছে! আমার কোবি-কড়াই-কমলা; কেক্ ও কংগ, কুক্কুট এবং কর্কট-রস কি তোরা চাকিস্ নি! জিহ্বার মাথা কি খেয়েছিস্!

●

তা, তোরা কি আমার কাব্যরস পান করেছিস, আমার কবিতা শুনেছিস? না, শীতের কবিতা শুনবি কেন! মরগে যা তবে, বয়াটে বঁদির বসন্তের বাড়ী। কোকিলের কলকলানি নইলে কি আর কবিতা হয়! শীতের কবিতায় যে কি সতেজ সৌন্দর্য্য, তা কাউপার বুঝতেন: বসন্ত-বিড়ম্বিত ব্যভিচারী লোকে তার কি বুঝবে! কিন্তু শোন্ বোলছি; আমার কবিতা যদি না শুনিস্ আর শুনে যদি না কাঁদিস, তা হ'লে আমার কড়াই-ক্যাঁকড়া খা'সনে, আমার কুল-কমলা ছুঁসনে! আমার ক্রিশমাস, কঙ্গারাস দেখিস নে! 'কিরে' কর্!

আমার ক্রিশমাস কঙ্গরস দুই একদিনে আরম্ভ! সেটী নইলে এখন আর আমি রইতে নারি। পৌষ পড়তে পড়তেই কঙ্গ-পীরিতে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে!"

(অতীতে সাধারণতঃ কংগ্রেসের অধিবেশন শীতকালেই বড়দিনের সময় ক্রিশমাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যেত। সে কারণ জন্মভূমি'র সম্পাদক শীত-সুন্দরীর আলোচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের (কঙ্গারাস) কথা উল্লেখ করেছেন।)

এক ম্হূর্ত আমার মনে হল, আমার ভিতর থেকে কেউ ব্ঝি আমার নাম ধরে চীৎকার করে ডেকে উঠল। ডাকটা অনেক দ্রের। কণ্ঠ নারীর না পর্ষের—এ বোঝার চেষ্টা করিনি। আমার পোষাকী নাম সীতেশ' অফিসে জানে 'পালিতবাব্' এরকম কোন শব্দে আমায় ডাকেনি। ডেকেছে বাবাই' বলে—শিশ্কালে আমার বাড়ির দেওয়া অতি অন্তরঙ্গ ডাকনামে—আমার বাবা-মা ছোটবেলা থেকে যে নামে বারবার ডেকে আসতেন—সেই নামে।

ডাকটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি চাঁপা অন্যমনস্ক। তারপরেই। চাঁপার কোন কথা আমার কানে যায় নি। দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। কম পাওয়ারের আলোয় ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। জানি, দোতলার সব ঘরের দরজা এখনো বন্ধ হয় নি। কোন কোন ঘরে মাদের সঙ্গে গান-বাজনা চলেছে। আমি যেন মাথার মধ্যে একটা ভারী বোঝা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

সবটাই দ্রুততায় ঘটছে। একতলার বাইরে যাবার প্যাসেজটার আলো-আঁধারি। দ্'পাশে সারি সারি নানা বয়সী মেয়ে সেজে-গ্জে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কারোর পা দিলাম। শ্নতে চাইনি, শোনার মত কান আমার এই ম্হূর্তে নেই। তব্ 'চাঁপাদি' 'প্রথম' 'এত তাড়াতাড়ি'—এই রকম ছোট ছোট শব্দের সঙ্গে অশ্লীল মন্তব্য, বিড়ির ধোঁয়া বের করা ফ্যাকফ্যাক হাসির শব্দ আমাকে যেন অজস্র ইঁটের ট্করো ছ্ড়ে মারল। ইঁটের ধাক্কায় ম্খ থ্বড়ে পড়তে পড়তে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি যেন।

আমি ভিতরে বেপরোয়া, ভয়ংকর জেদী পশ্র মত। যেন কিছ্ই শ্নিনি, কিন্তু ভিতরে ভয়, অসহায়তা, ওপরে তাচ্ছিল্য নিয়ে প্রায় দৌড়নোর মত হাঁটতে লাগলাম।

নেই। শুধু আমি বুঝতে পারছি, আমি ভীষণ ঘামছি, অফিসের জামা-কাপড়ে সারা-দিনের ঘামের ওপরে এখনকার ভেজা অবস্থা বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। যেন আমি বাঁচতে চাই, আমার ডুবে যাওয়ার মুহূর্তের সেই ভয়ংকর শ্বাসকষ্ট থেকে একটু শান্তি চাই—এই ভেবে খানিকটা স্থলভাগ পেয়ে তাকে একমাত্র নির্ভর জেনে পাগলের মত পালাচ্ছি।

এমন হাঁপাতে হাঁপাতে আমি এ কোথায় এলাম! থমকে দাঁড়ালাম, জায়গাটা ঠাহর করতে পারছি না। আলোর থেকে অন্ধকার এখানে বেশী। রাস্তা নির্জন। মনে পড়ছে, কিছু সময় আগে একটা ট্রাম রাস্তা পেরিয়েছি, পেরিয়েই একটা গাড়ির তলায় যেতে যেতে কোনরকমে বেঁচে গেছি। গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে গালাগাল দিয়েছিল 'শালা কুত্তার বাচ্চা, রাস্তা চলতে জানে না! শালার মরার সাধ। আমি তাকাই নি। মুহূর্তের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে সেই যে হেঁটেছি, এখন এখানে। কিন্তু এ রাস্তাটা কোথায় গেছে, কেন এদিকে এলাম?

থমকে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট চোখে গলি বরাবর সোজা সামনে তাকালাম। আমি বোধহয় গঙ্গার ধারে এসে গেছি। ঝির ঝির করে বাতাস গায়ে লাগল। আমি বুকের নিঃশ্বাস সামলাতে এগিয়ে গেলাম।

গঙ্গার ধারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। এমন অসহ্য গরমের দিনে চারপাশে লোকজন গিজগিজ করছে। গঙ্গার গা বেয়ে ঢালুর ওপর, পাড়ের রেখায়, রেলিং-এ বসে আছে ভিড় করে। আমি ঈষৎ ঠান্ডা বাতাস গায়ে মাখতে মাখতে দূরের ওই নির্জন ছায়াময় গাছের নীচে বসার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

এখানটা অন্ধকার। অথচ সামনেই গংগা চমৎকার দৃশ্যময়। বসেই মনে হল, কটা বাজে? হাতঘড়ি দেখলাম, সাড়ে আটটা। আমি ঘাসের ওপর বসে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার হাত কাঁপছে এখনো। ঠোঁট থেকে দু'বার সিগারেটটা পড়ে গেল। তৃতীয়-বার শক্ত করে সিগারেটটা দু' ঠোঁটের মাঝ-খানে চেপে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ধরলাম।

এখন মনে হল আমি ভীষণ ক্লান্ত। আর বোধ হয় কোনদিন এই মাটি ছেড়ে উঠতে পারব না। অথচ একটু আগে কি ভয়ংকর শক্তি ছিল গায়ে। চাঁপার ঘর থেকে বেরিয়ে কি ভীষণ জোরে, সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে এতটা হেঁটেছি। আর এখন।

আমি একভাবে সিগারেট টানতে লাগলাম। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডের সেই দপদপ শব্দ নেই। কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছি আমি। অথচ আধঘন্টা আগে আমি চাঁপা দাসীর ঘরে ছিলাম ওর নাম চাঁপা জানতাম না। রাস্তা থেকে ওদের একতলায় ঢোকার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছি [illegible] আমার সামনে

'আমি ওপরে যাব।' আমি বিড় বিড় করেছিলাম। কারোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিনা জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে ভয়ংকর এক দুর্ঘটনা অপেক্ষা করছিল।

'এই ওপরের ঘরে যাবে।' কে একজন চাপা গলায় বলেছিল।

'অ চাঁপা, তোর তো এবার।'

যে মেয়েটি আমার সামনে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, সে বলল, 'আসুন।'

আমি ওর পিছন পিছন এগোচ্ছি, কানে এল—'চাঁপার ভাগ্যটা ভালো রে। সহজেই পেয়ে গেল।'

আমার তখন শক্ত শরীর। আমি একভাবে ফর্সা মেয়েটার পিছন পিছন উঠে ওর ঘরে ঢুকেছি।

'বসুন।' চাঁপা আমাকে বসার জন্যে নীল চাদর পাতা তক্তপোষের বিছানা দেখিয়ে দিল।

আমি অভিভূতের মত বসেই বলেছিলাম, 'আপনার নাম কি?'

'চম্পারাণী দাসী। সকলে চাঁপা বলে ডাকে' চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মুখে পান ছিল। চিবোতে চিবোতে এক-সময় উঠে গিয়ে ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে বসল। 'আপনি বুঝি নতুন? এত কাঁপছেন কেন?' চাঁপা বেশী হাসল।

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম, 'এ লাইনে এসেছেন কেন?' বিয়ে করে ঘর সংসার করতে তো পারেন।'

বিকট শব্দে হেসে উঠল চাঁপা। ঠিক বুঝেছি, আপনি নতুন। যারা নতুন আসে, তারা এসব কথা বলেই সময় কাটায়।' আবার হাসতে লাগল চাঁপা।

আমি চাঁপাকে দেখছি। রং ফর্সা, বছর পঁয়তিরিশের একটি মেয়ে। মুখের প্রসাধনের আড়ালে এমন নির্মম ছায়া লুকনো থাকতে পারে কোন মেয়ের মুখে, আমার ধারণা ছিল না। গায়ে কিছু মাংস আছে, খোঁপা অনেক কাঁটা দিয়ে শক্ত করে লাগানো।

'কি দেখছেন এমন করে?' চাঁপা খিল খিল করে হেসে উঠল। মুহূর্তে কাপড় খসে গেছে বুক থেকে।

'আপনার সিঁথিতে তো সিঁদুর আছে। বিবাহিত —' আমি জানি আমি ভিতরে ভীষণ কাঁপছি, শুধু নিজেকে সামলাবার জন্যেই এমনভাবে বলে চলেছি:

'এমনি সিঁদুর পরতে হয়। বিয়ে হবে কি করে? চাঁপা একটু এগিয়ে এল আমার দিকে।

'কেন? আমি সিঁথির সিঁদুর দেখছি।

সংসার করলে ছেলেপুলে দরকার। আমাদের ছেলেপুলে হবে না। এখানে আসা দিয়েছি।' একটু থামল চাঁপা। আপনার ছেলে মেয়ে আছে বুঝি?

হ্যাঁ, আছে। মনে মনে বিড় বিড় করতে করতে চাঁপার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আপনি এলেন কেন?' লাল ছোপ ধরা দাঁতে হাসতে হাসতে আরও এগিয়ে এল চাঁপা। আমার হাত ধরল। 'পান শুনবেন, না এখনি চলে যাবেন?' চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর বুকের কাপড় কোলের ওপর লুটোচ্ছে।

আমি কেন এলাম। হঠাৎ কথাটা শুধু তখনি যেন মনে হয়েছিল। আর চাঁপা আমার হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ি, আমার স্ত্রী অশোকা, স্বর্গীয় বাবা-মার মুখ, আমার ছেলে-মেয়ের কথা চাঁকতে মনে হতেই 'বাবাই'—আমার এই ডাকনামে সেই মুহূর্তে কেউ যেন ডেকে উঠেছিল।.. ......

'কটা বাজল বলুন তো?' ঈষৎ দূরে এক বয়স্ক ভদ্রলোক সময় জানতে চেয়ে কথা বলতেই আমার সম্বিত ফিরে এল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখলাম। 'ন'টা বাজতে দশ।' বলে আমি একটু আগের ভয়ের স্মৃতিতে হাঁপ-ধরা বুক থেকে পরিপূর্ণ নিঃশ্বাস ফেললাম। হাতের সিগারেট নিভে গেছে।

মুখের ভিতরটা তেতো লাগছে। সারাদিন অফিসে থাকার পর কিছু না খাওয়ায় পিত্তি পড়েছে হয়ত। নাকি সস্তা সিগারেটের ধোঁয়ায় এমন মুখ তেতো! মেরুদাঁড়ায় টান পড়ে কনকন করতেই সোজা সহজ হয়ে বসলাম। হঠাৎ যেন চারপাশ থেকে বাতাস চলে গেছে। গুমোট গরমে বুক চাপা অবস্থা যেন এখানেও। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে না।

চাঁপার ঘরে কেন গিয়েছিলাম—চাঁপাও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। অথচ সেই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত একবারও আমার নিজের মনে হয়নি কথাটা। আমিও ভাবিনি, কিসের জন্যে অশোকার স্বামী, ন বছরের মেয়ে ও একটি পাঁচ বছরের ছেলের পিতা, আমি, সতীশ পালিত, প্রায় আটত্রিশ বছরের একজন যুবক বেশ্যার ঘরে ঢুকেছি।

ঠিকই, সেই মুহূর্তে কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু তার আগে, কতবার যে আমি নিজেকে শেষ করতে চেয়েছি। নিজের চিন্তাতেই আঁতকে উঠলাম। চাঁপার ঘরে আসার আগেও তো একবার ভেবেছিলাম, আমাদের পুরনো ওই ভাড়াটে ভর্তি বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। তা না করে একসময়ে রাস্তায় বেরিয়ে পাড়ার অতি-পরিচিত ওষুধের দোকান থেকে কিছু ঘুমের বড়ি কেনবার কথাও তো ভেবেছিলাম! চাঁপাদের পাড়ায় ঢোকার আগে পার্কের সামনে দোতলা বাসের চাকাটার দিকে তাকিয়ে একবার গা গুলিয়ে উঠেছিল না? সেই মুহূর্তে গায়ের রক্ত

কি ভেবে আমি একটু আগে বেশ্যা-পল্লীতে ঢুকেছিলাম? হঠাৎ এই মুহূর্তে আমার নিজের ভাবনায় আমি উত্তেজিত বোধ করছি। আমার ভিতরটা আবার ঘামে ভিজে উঠেছে।

......'ট্যাকের জোর যখন নেই, বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন? সামনেই তো বেশ্যা-পাড়া ছিল।' অশোকা চেঁচিয়ে উঠল।

একতলার একখানামাত্র স্যাঁতসেঁতে ঘর। সামনে ছোট দালান, অন্ধকার, চাপা। ওপাশে জিনিসপত্তরে ডাঁই-করা রান্নাঘর। আমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছি।

'অশোকা, সাবধানে কথা বলো। ছেলেটা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।' আমি ঠান্ডা গলায় বললাম।

'আমাকে সাবধান করতে এসো না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না হয়।'

আমি নীরব থেকে অশোকাকে দেখছি। পাতলা, রুগ্ন বিষণ্ণ চেহারা অশোকার। গাল তোবড়ানো, বড় বড় চোখ দুটি ভিতরে ঢোকা। মাথার চুল উঠে গেছে অনেক। শরী-রের কোথাও এতটুকু মাংস নেই। অ্যানিমিয়া থেকে কোন রকমে ধার-দেনা করে সামলে নিয়েছি।

বললাম, 'তুমি তো জান, যা ধার হয়ে আছে, আর কেউ দেবে না।' আমি ঘরে এসে বসলাম। জামাটা এবার ছাড়ব বলে বোতাম খুলেছি।

'আমি সব জানি। কিন্তু এখন চলবে কি করে?'

'আমি কি করে জানব?'

'বাঃ' অশোকা যেন ভেংচাল। মুখ ভেঙালে অশোকাকে কুৎসিত দেখায়। 'তা হলে আমাকে বাইরে বেরুতে বল।' একটা ঘরে তো ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েছি, আর একটা ঘরে যাই তাদের খাওয়া-পরার জন্যে। তোমার বাবা-মা বুঝি তাই শিখিয়েছে।'

'চুপ কর।' ভীষণ জোরে ধমক দিলাম। ক্রমশঃ মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। 'সহ্যের একটা সীমা আছে।'

'তোমার দম আছে?' অশোকা শরীরের হাড় ক'খানা মুড়ে-ভেঙে ঘরের কোণে বসে রইল।

আমি চুপ করলাম। একদিন নয়, বিয়ের ক'দিন পর থেকেই অশোকার এই মূর্তি দেখে আসছি আমি। তখন সবেমাত্র বড় মেয়ে রুপা পেটে এসেছে। মেয়েকে মানুষ করতে হবে, টাকা চাই অনেক। অভাবের সংসার আর নয়। ভাল চাকরী দেখ, টাকা রোজগার কর। অশোকা বার বার বলত। আমিও মনে মনে চাইতাম। কিন্তু রুপা হওয়ার পরও বাবলু এল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি।

ছোট ছেলে বাবলু পাঁচ বছরের। রুপো বড় হয়েছে, বাইরে সমবয়সী মেয়েদের মধ্যে গিয়ে খেলে, গল্প করে। বাবলু বাইরে যায় না। ও এগিয়ে এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল।' মা, দিদি কোথা?

হঠাৎ অশোকা ঠাস করে একটা চড় মারল বাবলুর গালে। ঘরে ছিটকে গিয়ে গড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল বাবলু। কয়েক মুহূর্ত।
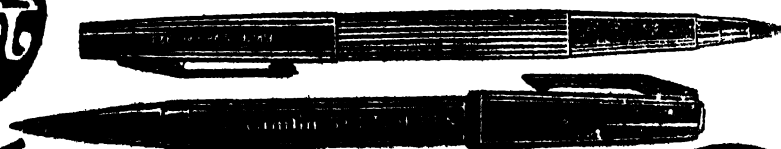
আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। 'এ কি করলে।' অশোকার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেই বাবলুকে তুলে ধরলাম

'মরে যাক। ওদের মা আমি নই।' খন খন করে বেজে উঠল অশোকার গলা।।

আমি বাবলুকে সামনে ধরে দেখি বাবলু চোখ বুজিয়ে হাঁপাচ্ছে। মার খেতে অভ্যস্ত ওরা, জানি, কিন্তু এমন! আমি সারাদিন অফিসে থাকি, এদের দেখিনা। অশোকা এই করে! আমার ভয় করল। দ্রুত মুখে জল ছিটোলাম। কয়েকবার চুমু খেলাম। জোরে জোরে নাড়া দিয়ে ডাকলাম। একসময়ে বাবলু ফুকিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার চোখে জল। নিঃশ্বাস দ্রুত। আমি বাবলুকে কোনরকমে থামিয়ে মেঝের শুইয়ে দিলাম। বাবলু, কেন যেন, ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি এতক্ষণ অশোকার দিকে তাকাই নি। অশোকা দশ বছর ধরে এভাবে আমাকে শাসন করে এসেছে। অমার অক্ষমতা, অসহায়তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। আমার বোতামগুলো খুলছিলাম। আবার পরলাম। তাকালাম অশোকার দিকে। আমার মাথার মধ্যে ট্রাম যাওয়ার গুরগুর শব্দ। রগ দুটো দপ দপ করছে।

বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'যে দিকে ইচ্ছে।'

'রাগ দেখাচ্ছ?' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল অশোকা।

'ওটা কি তোমার একার অধিকারে?'

'না, তা নয়। কিন্তু কার ওপর?'

'নিজের ওপর।'

'নিজেকে নিয়ে যা পার কর, আমাদের ব্যবস্থা কর।'

'আমি কিছু জানি না।' বেপরোয়ার মত এগোলাম।

অশোকা হঠাৎ এগিয়ে এল। সামনে দাঁড়িয়ে পথরোধ করল। 'খাওয়ার আগে আমার কথার জবাব দাও।

তোমার কথার জবাব? ঘেন্না করে তোমার সংগে কথা বলতে!'

'ও, তাই! কেন, আমি দেখতে খারাপ বলে। আমার কিছু নেই বলে!'

এ কথাগুলো শুনে শুনে অভ্যস্ত আমি; কিন্তু কেন যেন রেগে গেলাম। 'ঠিক তাই। কি তোমার আছে আমাকে ধরে রাখার। শরীরে এতটুকু মাংস রেখেছ? এই কথানা হাড়ে একটা সুস্থ পুরুষ কিছু পায় না।'

'কি, কি বললে!'

ঠিকই বলেছি। কেশুয়ারা তোমার থেকেও পরিষ্কার থাকে। তোমার জন্যে যা টাকা খরচ পেতাম।' বলেই প্রায় ঠেলে সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

অশোকাকে কোনদিন এরকম কথা বলিনি: দশ বছর ধরে যা বলেছে, তাই করেছি। যা পেয়েছি, তাই ওকে দিয়েছি। কিন্তু আজ চাঁপার ঘরে ঢোকার আগে অশোকার কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর আমি নিজেকে নিঃসহায় ভেবেছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়েই ভেবেছিলাম, পুরনো বাড়ির ছাদের কথা। রাস্তায় বেরিয়ে পাগলের মত ছটফট করে কখন যেন চাঁপার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম।

কিন্তু সেখান থেকে কে যেন আমায় ডেকে এখানে নিয়ে এল। কে? আমার মা-বাবা? শুধু তাঁরাই তো আমাকে 'বাবাই' বলে ডাকত। কতদিন মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে 'বাবাই' নামের সংগে মিল রেখে মায়ের নিজেরই বানানো ছড়া শুনেছি; সেসব ছড়া কতদিন আমার মুখস্ত থাকত। এখন সব ভুলে গেছি।

নাকি রুপো আমাকে 'বাবা' বলে ডেকেছিল? বাড়ি থেকে বেরুবার সময় রুপো ছিল না। রুপোর সংগে দেখা হয়নি। রুপোই বুঝি আমাকে ডেকেছে! কেন যেন রুপোর কথা মনে পড়ছে। রুপো বাড়িতে, আমায় খুঁজছে! আর আমি এখন কোথায়, কতদূরে!

ভয়ংকর এক চাপা ভয় আর উত্তেজনায় ভিতরে আতকে উঠলাম। আমার চারপাশ ভুলে ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। এই মুহূর্তে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক দম্পতিকে দেখলাম। সংগে একটি মেয়ে; সম্ভবত ওদেরই এক বন্ধুর সংগে কথা বলছে।

'সত্যেন, তোর মেয়েটা খুব সুন্দর হয়েছে রে! ঠিক তোর মত।'

'না, ঠিক বললি না।' সত্যেন নামে যুবকটি হাসল। স্ত্রীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মেয়ে ঠিক ওর মায়ের মত, আগন্তুক পরেরটা আমার জন্যে ঠিক আছে।' হো হো করে হেসে উঠল ওরা।

......'মেয়েটা কার মত হবে বলতো?' এক বছর যেতে না যেতেই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অশোকা বলেছিল।

'ঠিক তোমার মতো।'

'যাঃ, তোমার মতন লম্বা হবে,. স্বাস্থ্য পাবে। মুখের নীচের দিকটাতে তোমার মুখেরই একটা অংশ একেবারে ছাঁচে তোলা।'

'তার মানে তুমি-আমি মিলিয়ে আছি!'

হঠাৎ আমার কি হল, আমি ছিটকে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সামনের ওরা হেসে ভেঙে পড়ছে। আমি ওদের হাসির মধ্যে কারোর কথা শুনতে পেলাম না। মনে হল, আমাকে কেউ যেন ডাকছে! 'বাবাই' বলে ডাকছে কেউ। আমার মা, নাকি, আমার মায়ের দিদা নাকি তোমাকে 'বাবাই' বলে ডাকত! আমি তোমাকে 'বাবা' বলে ডাকব।

আমি তো তোমার ছোট 'মা'।

ছোট করে ডাকব!—চিবুক ধরে, রুপো আরও ছোট ছিল যখন, কতবার একথা বলত!

আমি ভয়ংকর এক উত্তেজনা বোধ করছি ভিতরে। কোনদিকে না তাকিয়ে আমি, কেন যেন, পড়ি-মরি করতে করতে বাস-ট্রাম ধরে বাড়ির দিকে এগোলাম।

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, রান্নার উনুনের সামনে অশোকা গালে হাত দিয়ে নিঃসাড় বসে আছে। আমার পদশব্দেও পিছন ফিরল না।

আমি ঘরে ঢুকতেই রুপো চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তো বাবা, এসে গেছ। আমি তোমার সংগে কিছুতেই কথা বলব না!'

'কেন মা! আমি মেঝেয় ওর স্কুলের বই ছড়িয়ে রাখা জায়গাটার সামনে বসে পড়লাম। একটু দূরে বাবলু একভাবে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

'তুমি অফিস থেকে এসেই চলে গেলে কেন?' রুপোর গলা একটু যেন ভেজা।

'তুমি আমায় দেখেছ?' আমি মেয়ের মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

'দেখিনি! আমি দোতলায় রমাদের ঘরে গিয়েছিলাম। নীচে নেমেই দেখি, তুমি চলে যাচ্ছ। কি তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলে! কতবার তোমায় ডাকলাম, তুমি সাড়াই দিলে না। পেছন ফিরে একবার দেখলেও না! আমি তোমার সংগে আর কথাই বলব না!'

'এই তো এসেছি!' আমি রুপোকে কোলের ওপর টেনে নিলাম। 'যা, দেখি তোমার মুখটা।'

'কেন!' রুপো অবাক হয়ে আমার চিবুক ধরে আমার দিকে তাকাল। 'কি দেখছ বাবা! আমি খুব সুন্দর দেখতে কিনা?' বলেই হাসতে লাগল রুপো। 'বাবা তুমি খুব ভাল!'

আমি রুপোর মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইলাম। অনেকদিন পরে রুপোকে এমন খুঁটিয়ে দেখলাম। রুপোর মুখের নীচের দিকটা, যত বড় হচ্ছে, আমার মত। চোখ, কপাল একেবারে অশোকার কেটে বসানো। বিয়ের সময় অশোকার যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল, রুপো সেরকম হয়ে উঠছে। রং, লম্বায় আমি। রুপো কেমন সুন্দরভাবে অশোকা-আমি মিলিয়েই হয়ে উঠছে।

আমি আমার শুকনো দু'চোখ আর শূন্য বুক ভরে আমার মেয়ের মুখ ছবির মত স্থির রেখে দেখতে লাগলাম। আমার [illegible]
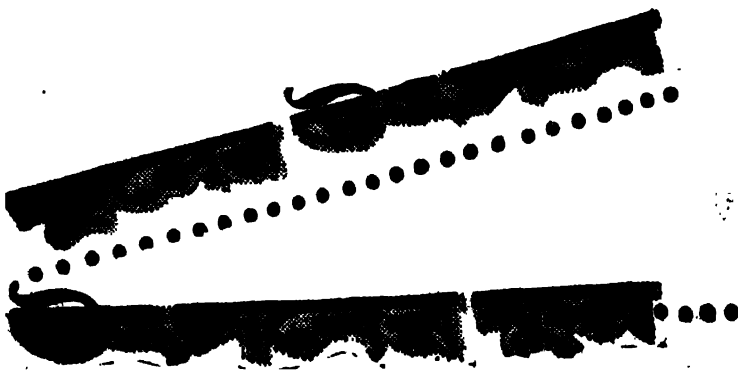
রোববারের সকালে হাতিবাগানের রাস্তাগুলি জমজমাট থাকে। অফিসের ব্যস্ততা নেই। ছুটির দিনের হাল্কা মেজাজ নিয়ে সবাই চলাফেরা করেন। ভেতরে মাছের বাজার। পাশেই তরিতরকারীর দোকান। তবু অনেকের হাতে বাজারের থলে থাকে না। পরনে পাজামা। গায়ে পাঞ্জাবী। কেউবা আসেন, পাখির খোঁজে।

এখানে পাখি পাওয়া যায়। কোকিল, টিয়ে, ময়না, বুলবুলি, পায়রা। এমন কি তিতিরও। কোনো পাখি পোষ মানে। কোন পাখি মানে না। যাঁদের বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম আছে, তাঁরা লাল, নীল মাছের খোঁজ করেন। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়, ফুলের দোকানের আনাগোনা।

গ্রে স্ট্রীটের খানিকটা জায়গা জুড়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মুখ পর্যন্ত, দোকানীরা ফুলের টব, ফুলের চারার অস্থায়ী দোকান সাজিয়ে বসেন। ফুলের চারা বিক্রী হয় কুঁড়িসুদ্ধ। বর্ষাশেষে মৌসুমী ফুলের চারায় বাজার ছেয়ে যায়। দামেও সস্তা। তবু চাহিদা বেশী গোলাপ, রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল, ডালিয়া, চন্দ্র-মল্লিকা প্রভৃতির।

রোববারের এইরকম একেকটি সকালের স্বাদই আলাদা। অভিজ্ঞতাও বিচিত্ররকম।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সেদিন দেখা হয়েছিল আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর সংগে। চন্দ্রমল্লিকার খোঁজে এসেছিলেন। পান নি। তাই, দুটো গোলাপ আর ডালিয়ার চারা কিনেছিলেন। ওর ছাদ ভর্তি এখন ফুলের টব। বললেন, আসুন না একদিন। চমৎকার দুটো গোলাপ ফুটেছে। দেখাবো। নতুন কয়েকটা ক্যাক-টাসও সংগ্রহ করেছি। এমন জিনিস কিন্তু আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

আমি তাঁকে জানি।

কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতার বাসিন্দা। তবু নিজের বাড়ি নেই। ভাড়াটে বাড়ি-টাকেই নিজের বাড়ি করে নিয়েছেন। সারা-দিনের কাজকর্মের পর, এই নিয়ে তাঁর সময় কাটে। এই তাঁর বিলাস। কোনো গাছে কুঁড়ি দেখা দিলেই বন্ধুবান্ধবদের কাছে খবরটা ছড়িয়ে দেন। ফুল ফুটলে তো আর কথাই নেই।

কলকাতার কয়েক লক্ষ নাগরিকের মধ্যে তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠের দলে। কিংবা তাঁর কোনো দল নেই। তিনি নিঃসঙ্গ। যাঁদের বাড়ি আছে, তাঁরা হয়তো ফুলের চারা কেনেন। টবে ফুলও ফোটে। কিন্তু বাসা-বদলের নিয়মিত অভ্যাসে যাঁরা অস্থির, তাঁদের জীবনে বাগানের শখ থাকে না। দোকানের ফুলে ফুলদানি সাজাতে হয়।

আমি গাঁয়ে গিয়েছি। গাঁয়ে থেকেছি। অথচ, ফুলের ভালোবাসায় অবসর কাটান; এমন মানুষ বিশেষ দেখিনি। ফুল ফোটো

ওখানেও ফোটে। কিন্তু [illegible] রণও ফুলদানিতে সাজানো হয় না। কারো বাড়ির উঠোনে দেখেছি [illegible] গাছ। সকালবেলায় শাদা ফুলগুলি বিকেলে অন্য রকম হয়ে যায়। তবু কেউ ওদের ছিঁড়ে এনে ফুলের তোড়া বাঁধে না। কখনো শিউলির-গন্ধে সারা বাড়ী ম ম করে। সেই ফুলও বেশীর ভাগই উঠোনে [illegible]।

প্রকৃতপক্ষে, গাঁয়ের মানুষ ফুল সম্পর্কে উদাসীন। শহরেই তার ব্যবহার বেশী।

চৌরঙ্গী কিংবা গড়িয়াহাটের মোড়ে কোনো মহিলা যদি বেল কিংবা রজনী গন্ধার মালা খোঁপায় জড়িয়ে রাস্তা হাঁটেন, আমরা অবাক হই না। [illegible] এই রকম অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। তাদের কাউকে চিনি, কাউকে চিনি না। কিংবা চিনলেও, তাদের জানি, কোনো ভদ্রলোকের বোন কিংবা স্ত্রী হিসেবে। দিদি কিংবা বৌদি হিসেবে। এইরকম [illegible] পরিচয়ের অস্পষ্টতায় আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি ই রহস্যময়।

কিন্তু গাঁয়ের মানুষ এখনো এতটা অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। আইডেনটিটি হারায় নি। সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে চলে। বধূর ভাসুরের সামনে ফুল গোঁজা তো দূরের কথা, ঘোমটা খোলাই যায় না। প্রতিবেশীর সঙ্গেও কাকা, জেঠা, মাসি-পিসির সম্পর্ক।

শহরবাসী মানুষের জীবনে এই অতি-পরিচয়ের সংকোচ নেই। শাসন নেই। এবং নেই বলেই, মেয়েরাও অনেকটা স্বাধীন হবার সুযোগ পায়। সাজসজ্জাকে আর্ট বলে ভাবতে পারে।

এই ভাবনার মূলে নাগরিকতা, একটা বড় কথা।

অন্য কারণও থাকতে পারে। সেটা শিক্ষাগত রুচির দিক। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার প্রতিক্রিয়া। সেই আদিমকালে মানুষ যখন প্রকৃতি-আশ্রিত ছিল, তখন সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বিশেষ আয়োজন করতে হত না। কিন্তু জ্ঞানীমানুষ বন থেকে ফুলের চারা সংগ্রহ করে উদ্যান বানিয়েছে। প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তবু নিজেকে তৃপ্তি দিতে পারে নি।

এরই জন্য যা কিছু উদ্যোগ, যা কিছু আয়োজন।

বিভূতি বাড়ুজ্জের উপন্যাসে মাঠ-ঘাটের বর্ণনা পেয়েছি। সৌখীন ফুলের বর্ণনা পাই নি। 'আরণ্যকে' দুধলি গাছের ফুলকে চিনেছি, নক্ষত্রের উপমায়।

গাঁয়ের মানুষ ওদের চেনে। মাড়িয়ে যায়। মাঠভর্তি মটর, সর্ষে কিংবা খেসারীর ফুল দেখে। বড়জোর, অবন ঠাকুরের রিদয়ের চোখ দিয়ে, ঐ মাঠকে সতরঞ্চ খেলার ছক বলে ভাবতে পারে। তার বেশী নয়। তবু কোথাও যদি সৌখীন ফুলের বাগান দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, ঐ গাঁয়ে শহুরে রুচির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিংবা শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

এই তো সেদিনের কথা। কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরের এক গাঁয়ে গিয়েছিলাম। [illegible] এসে গিয়েছি, ম্যাগনোলিয়ার ফুল দেখে। যে সে ফুল নয়, গ্র্যান্ডিফ্লোরা। বন্ধুকে বললুম, কোথায় পেলেন? এটা আমাদের দেশী ফুল নয়।

বন্ধু আমাকে বোঝালেন, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। এই ফুল তিনি সংগ্রহ করেছেন অনেক কষ্ট করে, উত্তর আমেরিকা থেকে। আমাদের দেশেও এখন পাওয়া যায়। উদ্ভিদবিৎ পিয়ারে ম্যাগনোলের নাম অনুসারে এই ফুলের নামকরণ হয়েছে ম্যাগনোলিয়া।

বুঝি, তিনি আমাকে পারস্পরিক চটিয়েছিলেন। না হলে, এক কথা বলতেন না। তাঁর মতে, হালকা ছায়ায় ম্যাগনোলিয়া ভালো হয়। সুস্থ বোধ করে। গ্র্যান্ডিফ্লোরা অবশ্য রোদের তাপ সইতে পারে অনেকটা। তবে গাছের গোড়ায় জল জমলে বাঁচে না। ফুল ফোটার মাস দুয়েক আগে, গোবর কিংবা হাড়ের গুঁড়োর সার দিলে ফুল বড় হয়।

এসব তথ্য আমার ত অজানা।

তিনি বললেন, ম্যাগনোলিয়া গ্রুপের আরো অনেক ফুল আছে। যেমন পুমিলা, টেরোকার্পা, মিউটাবিলিস, ফসকাটা প্রভৃতি। সমতল বাংলায় এদের চাষ হয়। কিন্তু এখনো তেমন মর্যাদা পায় নি। গ্র্যান্ডিফ্লোরা এদের রাণী। এবং শ্বেতাঙ্গিনী। পুমিলা আর টেরোকার্পার রং শাদা। মিউটাবিলিস গাঢ় ঘিয়ে রঙের।

এইসব আলোচনার পরেও, গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে আমি তাঁর কোনো মানসিক সংযোগ আবিষ্কার করতে পারিনি। এককালে তিনি কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন। এখন পিতৃপুরুষের ভিটের টানে গাঁয়ের বাসিন্দা। চাষবাসের সঙ্গে সংযোগ নেই। কলা, মুলোর চাষও করেন না। পাশের বাড়িতেই দোপাটি আর গাঁদা ফুল ফুটেছে বেগুন গাছের ফাঁকে ফাঁকে। ঐ ফুল পুজোর জন্য প্রয়োজন।

পরতেন। হাতে জড়িয়ে নিতেন বেলফুলের মালা। মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ। তবু তার বুকের ফাঁকা জায়গাটা পূর্ণ হত না। হাহাকার জাগত।

সেই অতৃপ্তি তো গোটা নগর-জীবনেরই।

এখন টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত প্রতিটি রাস্তার মোড়ে ফুলের দোকান হয়েছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার মালা পাওয়া যায়। এখানে ফুলের উৎসব নেই। তবে উৎসবের ফুলে নিজেরা সাজে কিংবা অন্যকে সাজায়। এটা বিত্তবানের ক্ষেত্রে যেমন, বিত্তহীনের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। আমি এমন মানুষকে দেখেছি, যার বাড়িতে ফুলদানি নেই, সারা বছরেও ফুল ঢোকে না। কিন্তু বড়বাবুর মেয়ের জন্মদিনের খবর রাখে। নির্দিষ্ট তারিখে ফুলের তোড়া পাঠায়।

কলকাতা যতগুলি সরকারী এবং বে-সরকারী অফিস আছে, সেখানে মিস্টার বাসু, মিস্টার দত্ত, মিস্টার লাহিড়ী, মিস্টার ব্যানার্জী কিংবা মুখার্জীরা চাকরী করেন। তাঁদের পদোন্নতি, ট্রান্সফার, জন্ম-দিন এবং বিদায়সভা আছে। এবং প্রতিটি ব্যাপারেই কিছু রজনীগন্ধা, দু-একটা ফুলের মালা প্রয়োজন। গোলাপ, পদ্ম, সূর্যমুখী, ডালিয়াসহ দেবদারু বাঁধা ফুলের তোড়াও এই উপলক্ষে অনেকে উপহার দেন।

তাছাড়া আছে, অফিস ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান।

এ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত হয়ে থাকে কোনো নাট্যমঞ্চ ভাড়া করে, কিংবা

মুসলমান পাড়ায় ওসবের বালাই নেই। কবি জসীমউদ্দিনের মুখে শুনেছি, তাঁর ছেলেবেলার গল্প। সেই বয়সে তাঁর ফুল ভালো লাগত। সেজন্যে হিন্দুপাড়ায় যেতেন ফুলের খোঁজে।

তবু গাঁয়ের পথে ফুল চাই, ফুল বলে কোন ফেরিওয়ালা হাঁটায় না। দরকারও হয় না। ওখানে নগদ পয়সার খদ্দের নেই। শহর এবং শহরতলিতেই কেবল কাঁচা পয়সার কারবার। চাল, ডাল, তেল, নুন, মাছ, পালং, শাকসব্জী সবই নগদ পয়সায় কিনতে হয়।

প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতার এই এক ট্র্যাজেডি।

কলকাতার পাশেই ভাগীরথী। তবু জীবন নদীর প্রবাহ নেই। কয়েক আনা খরচ করলেই গ্রামে যাওয়া যায়। তবু জীবনে সজীবতার একান্ত অভাব। আউটরাম ঘাটে বসে সিনেমার গল্প, বোনাসের আন্দোলন, চিত্রতারকার কেচ্ছাকাহিনী প্রায়ই আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

কিছুকাল আগেও, কলকাতার নিষিদ্ধ পাড়ায় মধ্যরাতের অলিগলি ফেরিওয়ালার ডাকে রহস্যময় হয়ে উঠত : 'চাই রজনী-গন্ধার মালা, বেলফুল।' কোনো বিত্তবান যুবক হয়তো শান্তির খোঁজে সেখানে
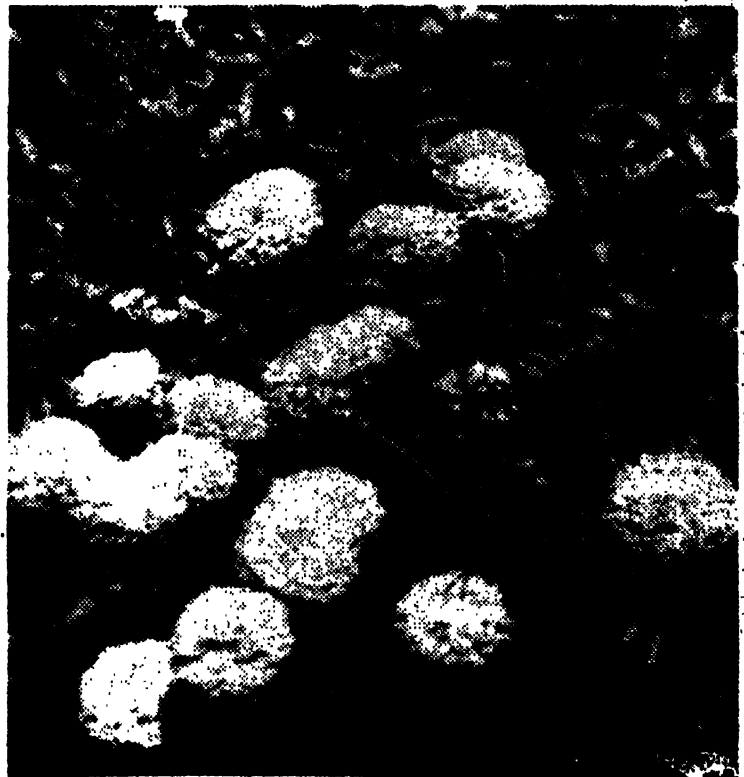
সিনেমা হলে। কেরানীর স্ত্রী থেকে অফিসার গিন্নী পর্যন্ত প্রায় সকলেই সপরিবারে তাতে অংশ নেন। কেউ নিজের স্ত্রীকে অন্যের চোখে ছোট হতে দিতে চান না বলেই হয়তো সাজগোজের বাহারেও টেক্কা দিতে প্রস্তুত। সভাপতির টেবিলে রাখা ফুলের তোড়া থেকে নাটমঞ্চের শেষ আসনে বসা মহিলার চুলে জড়ানো ফুলের মালাটি পর্যন্ত সব মিলিয়ে কেমন যেন রোম্যান্টিক পরিবেশ তৈরী করে। কেউবা অনুষ্ঠান শেষে অফিসার, কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কিংবা কোম্পানী মালিকের সংগে নিজের বউকে পরিচয় করিয়ে দেন, এই আমার স্ত্রী রীনা। ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে।

আধুনিক সঙ্গীত এখনকার ফ্যাসান নয়।

কলকাতা এই রকম এক আশ্চর্য শহর। এখানে গানের ইস্কুল আছে নাচের ইস্কুল আছে। এমনকি, ফুল সাজানোর ট্রেনিংও দেওয়া হয়। গাঁয়ের পথে নাচিয়ে মেয়ের সমস্ত বিপদ। কারো খোঁপায় ফুল দেখা গেলে তো কানাকানি শুরু হয়ে যায়। মেয়ের মনে রং ধরেছে।

ব্যতিক্রম দেখেছি আমি সাঁওতাল পরগণায়।

আদিবাসী মেয়েরা ফুল ভালোবাসে। কিন্তু ফুলের মালা পরে না। কালো সাঁওতাল যুবতীরা গায়ে ধবধবে শাদা কাপড় আঁটো-সাঁটো করে পরে। চুল বাঁধে টান টান করে। কখনো তাদের চুলে দেখা যায়, কোনো একটি লাল কিংবা সাদা ফুল। অনেক সময় জবা কিংবা ধুতরা ফুলও ওরা চুলে গোঁজে। দেখতেও খারাপ লাগে না।

শহরে সাদা ফুলেরই ব্যবহার বেশী। লালের মধ্যে গোলাপ কিছুটা অভিজাত। রজনীগন্ধার মালায় লকেটের মতো কাজ করে। আসল কথা, নাগরিক জীবনে ফুলের ব্যবহার এখন সর্বত্র সঞ্চারিত।

অনেক কাল আগের কথা বলছি।

ভিক্টর হুগোর 'হ্যানচ ব্যাক অব নোতরদাম' দেখেছিলাম সিনেমার পর্দায়। তাতে কি যেন সব পাপ পুণ্যের কথা ছিল। ধর্মাধর্মের ইঙ্গিত ছিল। সব ঘটনা আজ মনে নেই। তবে, গীর্জা-সংস্কারের আশ্রয়ে বেড়ে-ওঠা একজন কুশ্রী মানুষকে অস্পষ্ট-ভাবে মনে পড়ে।

তাকে ভুলতে পারিনি।

কেননা, জনৈকা তরুণীর সান্নিধ্যে তার হৃদয়ের উন্মেষ ঘটেছিল। ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল। এবং সেই মুহূর্তে গীর্জার ফ্রাটলে-গজানো আগাছার ফুলটি পর্যন্ত ঐ কুশ্রী মানুষটির নজর এড়ায়নি। তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল।

ঐ ফুল ছিল তার ভালোবাসার প্রতীক। জাগরণের ইঙ্গিতবাহী।

ঠিক ওরকম প্রতীকী অর্থে না হলেও, নগর-জীবনে ফুলের ব্যবহার সর্বজনীন। শুধু একালে নয়, সেকালেও। ভিক্টর হুগো নিশ্চয়ই তা জানতেন। না হলে, ফুলের প্রতীকে ভালোবাসার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন না। সেইকালে নিশ্চয়ই যুরোপের নগর-জীবনে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়েছিল। নাকি কালিদাসের কালে, কালিদাস ছিলেন অ-নাগরিক?

আমার তা মনে হয় না।

তাঁর কাব্যে ফুলের ব্যবহার দেখেছি। ফুলের উপমায় মুগ্ধ হয়েছি। তাই বলে, রাজসভায় বসে তিনি নর্তকীর নাচ দেখেন নি, কেবল নূপুরের শব্দই শুনতেন—একথা ভাবতে পারি না। দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীরা ফুলের গয়না পরতেন। ফুলের মালা গলায় পরে মন্দিরে নাচ দেখাতেন। রাজ পুরোহিতের দৃষ্টি তাদের ওপরে কিভাবে পড়ত, সে খবর কোনো ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই। তবে, তারা যে সমাজবিচ্ছিন্ন ছিল, সে ব্যাপারে সকলেই নিঃসন্দেহ।

জানি না, ওদের জীবনে যন্ত্রণা ছিল কিনা।

তবে অনুরূপ যন্ত্রণায় আমরা উৎসব করি। কখনো দেবতার নামে, কখনো মনীষীর জন্মদিনে কিংবা স্মৃতিতর্পণে, কখনো-বা সংস্কৃতির নামে। সেই ফুল টবে জন্মায় না, গাঁয়ের চাষীরা জোগান দেয়। রেল কোম্পানীর কাছেও খবরটি অজ্ঞাত। না হলে, টাইম টেবিলে উল্লেখ থাকত। টাটা থেকে সন্ধ্যা যে-ট্রেনটি কলকাতায় আসে, তার নাম স্টীল এক্সপ্রেস। কিন্তু রাত শেষ হওয়ার আগেই যে-ট্রেনটি পাঁশকুড়া হয়ে হাওড়ার দিকে ছুটতে থাকে, তার কোনো নাম দেন নি।

গাঁয়ের মানুষ তার নাম দিয়েছে, ফুলের স্পেশাল।

ঐ ট্রেনে আসে গোলাপ, রজনীগন্ধা, পদ্ম, ডালিয়া, সূর্যমুখী, এমনি আরো অনেক ফুল। আসে অনেক সিজন ফ্লাওয়ার। গাঁদা, দোপাটি, বেলপাতা, আমের শাখা, দূর্বা ঘাস প্রভৃতিও। কেননা, ভোর হওয়ার আগেই, ব্রীজের নিচে ফুলের বাজার বসে। ফুল বিক্রী হয়, ওজন দরে, ডজন হিসেবে, শতকরা গুনতিতে।

শিয়ালদার তরিতরকারীর বাজারের সংগে এই বাজারের কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে পণ্যের ভিন্নতায়। শিয়ালদায় ক্যানিংয়ের চাষীরা কলা, মুলোর চাহিদা অনুযায়ী দরদস্তুর করে। হাওড়ায় ফুলের দাম নিয়ে দর কষাকষি করে হাওড়া ও মেদিনীপুরের ফুল চাষীরা। তবে উভয় বাজারের খদ্দের এক রকম নয়।

হাওড়া ব্রীজের নিচে ফুল কিনতে আসেন, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কিংবা তার আত্মীয়স্বজনেরা, পুজো কমিটির সেক্রেটারী কিংবা উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিগণ, সদ্য-প্রয়াত কোনো কোন ভদ্রলোকের শোকার্ত আত্মীয়-স্বজন। এবং আরো নানাশ্রেণীর দুঃখী, উজ্জ্বল, শোকার্ত, বিষণ্ণ, উৎসবমুখর ও উৎসবহীন মানুষ।

তবু তাদের ওপরে ব্যবসা নির্ভরশীল নয়।

কলকাতা এবং শহরতলীতে যাঁরা ফুলের ব্যবসা করেন, তাঁরাই মূলত হাওড়া হাটের খদ্দের। সে রকম ছোট বড় ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। নিউ মার্কেটের সৌখীন ফুল ব্যবসায়ী থেকে লেক মার্কেট, কলেজ স্ট্রীট, হাতিবাগান, শোভাবাজারের ফুটপাথের দোকানদাররা পর্যন্ত ঐ জোগানের ওপর নির্ভরশীল।

শোভাবাজারের দোকানীরা কুচো ফুল বেচে বেশী। পুজোয় লাগে। জবার মালা, জুঁই, বেল, সূর্যমুখী, অপরাজিতাও পাওয়া যায়। যাঁরা অল্প ফুল কেনেন, তাঁদের চাহিদা এই ফুটপাথের দোকানীরাই মেটাতে পারে। ছেলের জন্মদিন, মেয়ের মুখেভাত, কিংবা বিষ্যুৎবারের লক্ষ্মীপুজোকে তো আর বড় উৎসব বলা যায় না।

তবে স্থানীয় স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা, রবীন্দ্রজয়ন্তী, মেয়ে স্কুলের নৃত্যানুষ্ঠান কিংবা বিয়ে, বৌ-ভাতে ফুলের দরকার হলে, আগে থেকে অর্ডার দেওয়াই ভালো। ঝাউয়ের পাতাসুদ্ধ গোলাপ, দেবদারু পাতায় সাজানো পদ্ম, সূর্যমুখী, গোলাপের তোড়া, মেয়েদের খোঁপায় পরার উপযুক্ত ফুলের অলংকার, ফুলদানির ফুল—সবই ঠিক সময়ে মিলে যাবে। লগনসার বাজার হলে দামের তর তম হতে পারে।

নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানে ফুল লাগে খুব। একসংগে বিশ-পঁচিশটি মেয়েকে সাজাতে হয়। একবার আমি একটি অনুষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, প্রায় তিনশ টাকা বরাদ্দ ছিল ফুলের পিছনে।

অর্থাৎ, উৎসব না থাকলে ফুলের চাহিদা বাড়ে না। এবং উৎসব শেষে যখন ফুলদানিতে ফুল থাকে না, চারদিকের আলোগুলি ম্লান হতে থাকে, তখন মাড়িয়ে-যাওয়া দু'একটা ছেঁড়া ফুলের দিকে নজর পড়ে। বুকের শূন্যতা ঢাকা যায় না। বিশেষ করে, সকালবেলায় যখন আস্তাকুড়ের মধ্যে ফুলের মালাগুলিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তখন উৎসবের নিয়তি ভেবে দুঃখিত না হয়ে পারি না।

তবু এখানে উপলক্ষও অনেক। উৎসবও অজস্র।

কলকাতার যত নাট্যশালা ও সিনেমা হল আছে, তার প্রত্যেকটিতেই প্রতিদিন চলছে, কোনো না কোনো উৎসব। ক্লাবের উদ্বোধন, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, কালচারাল ফাংশান, ফ্লাওয়ার্স কর্ণারের পুষ্প প্রদর্শনী, গুণী সম্বর্ধনা, গৃহপ্রবেশ, সঙ্গীত সম্মেলন, ধ্রুপদী গানের আসর, সোলো প্রোগ্রাম, শততম অভিনয়ের উৎসব

রজত জয়ন্তীর সাজসজ্জা—এমনি আরো অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই কলকাতার চাঞ্চল্যকে অনুভব করি।

নিউ মার্কেটে গেলে টের পাই, ফুলের চাহিদা কিভাবে বাড়ছে। বহু বড়লোকের বাড়িতে ও'রা ফুল জোগান। সেই ফুল ফুলদানিতে সাজানো হয়। ফলে মেজাজ প্রসন্ন রাখে।

এই খবর মেচেদার নিমাই মণ্ডলেরও অজানা নয়।

তিনি জানেন, বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত যখন রজনীগন্ধার মরশুম থাকে, তখন ফুলের চাহিদা সত্ত্বেও দাম বাড়ে না। কেবল ফাল্গুন মাসেই সুদে-আসলে কিছুটা উঠে আসে। রজনীগন্ধার শ বিক্রী হয় দশ-বারো টাকা।

তরিতরকারীর চেয়ে এই ফুলের চাষে লাভ বেশী। তবে চন্দ্রমল্লিকার চাষে তেমন লাভ হয় না। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, জল, ফুলের শত্রু। এ সম্পর্কে সতর্ক থেকেও পাশকুড়া, পারেট, মির্টগিরি, বন্দাবন চক, কোলাঘাট অঞ্চলের চাষীরা রজনীগন্ধার চাষ করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার জমির ওপর।

কলকাতার মানুষ তার খবর রাখেন না।

নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। কলরোভার এক পার্বত্য এলাকায় তিনি গিয়েছিলেন নাচের দল নিয়ে। সেখানে লোকনৃত্যশিল্পীদের একটা শিক্ষণ-কেন্দ্র আছে। তাঁর ধারণা, ঐ রকম কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে, ফুলের সমারোহে, থাকলে শিল্পীরা যথার্থই জাতীয় ভাবাপন্ন হয়।

এই ঘটনা বর্ণনার সময় অমলাশঙ্কর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আমি প্রতিবাদ করিনি। কেননা, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল আন্তরিক। স্নিগ্ধ। ফুলের ভালোবাসায় তিনি যতটা মুগ্ধ ছিলেন, গ্রামীণ স্বভাবে ততটা একাত্ম ছিলেন।

আমি তাঁর [illegible] দেখেছি। কিন্তু যে ভূমিকায় তিনি নাচের অনুষ্ঠান করেছেন, সেই রাধা, সেই পার্বতী কি গ্রামের জীবনে আছে? না, নেই। কিংবা থাকলেও তারা ফুলের সাজে সাজে না। আমি কলকাতার মঞ্চে লৌকিক কাহিনীর নৃত্যরূপ দেখেছি। কিন্তু গাঁয়ে সেই কাহিনীর কোনো চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলেনি। আসল কথা, লোকসাহিত্যে গ্রামের লোক নেই। গ্রামীণ সত্তার পরিচয় আছে। বুড়ী ঠাকুমারা এককালে রূপসী ছিলেন হয়তো। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট রূপকথার গল্পের যে বর্ণময়তা, যে ঐশ্বর্য, তা লৌকিক জীবনের কোথাও নেই। সেই গল্প অতি-লৌকিকতার স্পর্শবাহী।

নির্বাসিত নগর-জীবনে আমরা তারই ছোঁয়া পাই।

কিন্তু পাশকুড়া, কোলাঘাট এলাকার পুকুরে, খালেবিলে, রেলের ঝিলে যে-চাষীরা পদ্মফুলের চাষ করে, তাদের কাছে ফুলকুমারীর গল্প নেহাৎ-ই রূপকথার কাহিনী। তারা জানে, দুই শ একর জমিতে পদ্মফুলের চাষ করলে, কত লাভ হয়। কলকাতার দোকানদারদের তারা এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। অনেকে সস্তা দামে পদ্ম কিনে কোল্ড-স্টোরেজে রাখে। তারপর চাহিদা বাড়লেই মওকা মারে। সেই ফুলে অনেক লাভ হয়।

এই লাভের জন্যই হাওড়া, মেদিনীপুরের চাষীরা এখন গোলাপের চাষ করছে। বিঘের পর বিঘে, মাইলের পর মাইল, যতদূর চোখ যায়, গোলাপ, রজনীগন্ধা, অ্যাস্টার, সূর্যমুখী, পদ্ম, ডালিয়া, গাঁদা অপরাজিতা, চন্দ্রমল্লিকার ক্ষেত উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

সেই ফুল বিশুদ্ধতার প্রতীক, বিষণ্ণতার প্রতীক, উৎসবের উপকরণ।

যে-ফুলের স্পেশালের খবর রেল-কোম্পানী রাখেন না, যার উল্লেখ টাইম-টেবিলে নেই, সেই রহস্যময় গাড়ীটিই একদিন হয়তো নিজের প্রয়োজনীয়তাকে সশব্দে জাহির করবে। কেননা, শহর যতটা বাড়ছে, বিচ্ছিন্নতাও ততটাই বাড়ছে। ফুলের চাহিদাও আনুপাতিক হারে ক্রমবর্ধমান। অনেকে এরই মধ্যে সব্জীর চাষ ছেড়ে দিয়ে ফুলের চাষ সুরু করেছেন। ভবিষ্যতে আরও জমির দরকার হবে। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের চাষও চাই।

ফুল আমাদের বিচ্ছিন্নতার আশ্রয়। নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক লক্ষ মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কেবল হাওড়া ব্রীজের বাজারেই ফুল বিক্রী হয়, বার্ষিক প্রায় চার কোটি টাকার।

কুড়ি বছরের পত্রগুচ্ছ
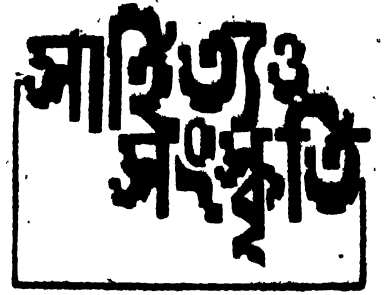
নয়ু ইয়র্কের ম্যানহাটান শহরের এক পাড়ায় থাকতেন উৎসাহী তরুণী টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট রাইটার হেলেন হানফ। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি লণ্ডনের একটি পুরাতন বই-এর দোকানের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। অনেকগুলি পত্র এই কুড়ি বছর ধরে বিনিময় করা হয়েছে আর তার মধ্যে গড়ে উঠেছে একালের এক আশ্চর্য প্রেম কাহিনী।

সম্প্রতি '৮৪, চেয়ারিং ক্রস রোড' নামক গ্রন্থটি এমনই একগুচ্ছ চিঠি দিয়ে গড়া। অত্যন্ত মানবিক স্পর্শ সংযুক্ত এই আনন্দ-বেদনাময় কাহিনী পাঠকচিত্তকে সজল করে তোলে। সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে কেমন সহজে এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে একটি সাধারণ বিষয়বস্তু কিভাবে একটি মহৎ সাহিত্য গ্রন্থে পরিণত করা যেতে পারে।

'স্যাটার ডে রিভ্যু' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যে লণ্ডনের. ৮৪ নম্বর চেয়ারিং ক্রস রোডের 'মার্কস অ্যাণ্ড কোং' পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর ব্যবসা করে থাকেন। কুমারী হেলেন হানফ ন্যুইয়র্কের ১৪ নম্বর ইস্ট ৯৫তম স্ট্রীট থেকে 'মার্কস অ্যাণ্ড কোং' কর্তৃক প্রদত্ত এই বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪৯-র ৫ই অকটোবর তারিখে লিখলেন—

'আমি একজন দরিদ্র লেখিকা। পুরাতন গ্রন্থ পাঠের রুচি আছে। আমি যেসব বই চাই তা যেমন দুষ্প্রাপ্য আবার তেমনই দুর্মূল্য। এখানে হয় অতি মনোহর বহুমূল্য রাজসংস্করণ মেলে নয়ত পাওয়া যায় ছেঁড়া-খোঁড়া স্কুল-বালকের হাত ফেরতা বই। আমার অবিলম্বে যা চাই তার একটা তালিকা পাঠাচ্ছি—যদি আপনাদের কাছে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কপি এসব বইয়ের থাকে তাহলে পাঁচ ডলার পাঠাচ্ছি--একেই অর্ডার বিবেচনা করে বই পাঠান।'

সেই বছরেরই ২৫ অকটোবর মার্কস কোম্পানীর তরফে 'এফ পি ডি' নামাঙ্কিত একটি পত্র এল। এই পত্রে বলা হল—

আমরা আপনার সমস্যার ২।৩ অংশ সমাধান করতে পেরেছি। বুকপোস্টে হ্যাজলিটের প্রবন্ধাবলী ও স্টিভেনসন পাঠাচ্ছি। লে-হান্টের প্রবন্ধাবলী এত সহজে পাওয়া যায় না। লাতিন বাইবেল আমাদের নেই, নিউ টেসটামেন্ট আছে...'

৩ নভেম্বর তারিখে মিস হেলেন জবাব দিলেন—

'বইগুলি নিরাপদে এসেছে—স্টিভেনসন এত ভালো এত নরম একটা বই যে এত আনন্দের সম্পদ হতে পারে জানতাম না। আমি পাউণ্ডের বিনিময় হিসাব জানি না আপনারা অঙ্ক ঠিক করে জানিয়ে দেবেন।'

এরপর চিঠি এল ৯ নভেম্বর। মার্কস কোম্পানীর তরফে, 'এফ পি ডি' জানালেন--টাকা এসেছে। নিউ টেসটামেন্ট পাঠান হল। আশা করি আপনার ভালো লাগবে।'

১৮ নভেম্বর এই চিঠির জবাবে হেলেন হানফ লিখলেন—এ আবার কি ব্ল্যাক প্রোটেস্টানট বাইবেল? এ কি করেছে ওরা? এমন গদ্য নষ্ট করেছে? দেখবেন এর জন্য ওরা জ্বলে মরবে। আমি নিজে ইহুদী, আমার কাছে এ কিছু নয়। তবে আমার বউদি ক্যাথলিক। আর এক বউদি মেথডিস্ট, এক ঝাঁক প্রেসবিটেরিয়ান খুড়তুতো ভাই-বোন (আমার বড় কাকা আব্রাহাম খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেন।) আমার এক খুড়ি 'ক্রিশ্চান সায়ান্স নিরাময়কারী', আমি জানি তাঁরা কেউই এই বাইবেল স্পর্শ করবেন না, যদি এর অস্তিত্ব জানতে পারেন। আপনাদের কাছে কি ল্যানডরের 'ইমাজিনারি কনভারসেস্যন' গ্রন্থটি আছে?'

২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ তারিখে মার্কস কোম্পানীর তরফে এফ পি ডি লিখলেন:—আমরা আপনাকে একখণ্ড 'ওয়ার্কস অ্যাণ্ড লাইফ অফ ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যানডর, পাঠাচ্ছি। এই গ্রন্থটির ২য় খণ্ডই শুধু আছে। এই গ্রন্থটির অবশ্য তেমন আকর্ষণীয় খণ্ড নয় বটে তবে ভালোভাবে বাঁধান। আপনাকে লাতিন বাইবেল পাঠিয়েছি বলে দুঃখিত, একটি ভলগেট খুঁজে দেখব। লে-হানটের কথা আমরা ভুলিনি।'

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরের আট তারিখে হেলেন হানফ লিখলেন—স্যাভেজ ল্যানডর নিরাপদে এল। আমি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই খুব ভালোবাসি বিশেষতঃ যে পৃষ্ঠাটি পূর্বতন মালিক বার বার পড়েছেন সেই পৃষ্ঠায় চোখ পড়ে। যেদিন হ্যাজলিট এল, আমি খুলে দেখি লেখা আছে 'আই হেট টু রিড নিউ বুকস' উল্লাসে বলে উঠলাম 'কমরেড'—আগে যিনি এই গ্রন্থের মালিক ছিলেন তাঁর উদ্দেশে।

আমি শুনলাম যে আপনাদের ওখানে মাংস, ডিম প্রভৃতি পাওয়া যায় না। এখান-কার একটি ছোট্ট ব্রিটিশ ফার্ম ডেনমার্ক থেকে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আমার পরিচিত ব্রায়ানের মাকে লণ্ডনে পাঠান। আমি মার্কস অ্যাণ্ড কোং-কে তাঁদের মারফৎ একটি ছোট্ট বড়দিনের উপহার পাঠালাম। মনে হয় আমার প্রেরিত টাকায় কুলিয়ে যাবে। আপনার তত্ত্বাবধায়কত্বে বস্তুটি যাবে, আপনি অবশ্য যিনি হোন।—'

এর জবাবে ২০ ডিসেম্বর তারিখে ফ্রাঙ্ক ডোয়েল এই নাম স্বাক্ষর করে 'মিস হানফ' এই সম্বোধনে পত্র এল—

এই প্রথম বার পরস্পরের নাম উল্লিখিত হল পত্রের মধ্যে। তিনি লিখলেন—

'প্রিয় মিস হানফ: আপনার উপহার পারসেল আজ নিরাপদে এল। তাব ভিতরকার মালপত্র আমরা সবাই ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের মালিক মিঃ মার্কস ও মিঃ কোহেন বললেন—এইগুলি কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে নিতে মালিকদের বাদ দিতে। আপনাকে জানাচ্ছি যে পার্সেলের অন্তর্ভুক্ত সব দ্রব্যই আমরা চোখে দেখতে পাই না, এ শুধু 'ব্ল্যাক মার্কেটে' পাওয়া যায়। এভাবে আমাদের স্মরণ করা আপনার মহত্ব, আমরা সবাই সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৯৫০-এর শুভেচ্ছা জানাই।'

১৯৫০-এর মার্চ মাসের একটি পত্রে হেলেন লিখলেন:

'আপনারা কি করছেন? কাজ-কর্ম নেই? বসে আছেন চুপচাপ? আমার লে-হানট কই? 'অকসফোর্ড ভার্স'?' ভলগেটই

বা কই? আপনারা আমাকে এখানে লাইব্রেরীর বইগুলির তালিকাতে লিখতে বাধ্য করছেন। কোনদিন ধরা পড়ব। ওরা আমার কার্ড কেড়ে নেবে।

আমি ব্যবস্থা করেছি আপনি যাতে ইস্টারের ডিম (ডিম) পান—ও হয়ত ওখানে পৌঁছে দেখবে আপনি অসাড় হয়ে রস্ত।

দেখুন বসন্ত আসছে—আমি কিছু প্রেমের কবিতা চাই। কীটস বা শেলী নেই? আমাকে এমন কিছু কবির কাব্য পাঠান যাঁরা নাকে না কেঁদে ভালোবাসতে পারেন। ছোট সাইজের বই, জ্যাকেটের পকেটে থাকবে, সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে যেতে পারব। চুপচাপ বসে থাকবেন না, আমার জন্য খুঁজুন! আপনাদের বই-এর দোকান যে কিভাবে চলছে?'

এর জবাবে ৭ এপ্রিল ফ্রাঙ্ক জানালেন ইস্টার পার্সেল পৌঁছেছে। সবাই খুশী—সবাই জানাচ্ছে ধন্যবাদ। বই পাচ্ছি না। চেষ্টা করছি। ইত্যাদি।

ঐ একই তারিখে লিখিত আরও একটি পত্র এল ঐ কোম্পানীর 'সিসিলি ফার' নামক জনৈক কর্মীর কাছ থেকে। সিসিলি লিখছেন—

'মিস হানফ, ফ্রাংককে জানাবেন না আমি এই চিঠি লিখছি। যখনই আপনার চিঠি পাই তখনই একটা চিঠি দেওয়ার বাসনা হয়, ভাবি ফ্রাঙ্ক কি মনে করবে। আপনার চিঠি আমাদের সকলের ভালো লাগে, ভাবি, না জানি আপনাকে কেমন দেখতে। মনে হয় আপনি তরুণী, অতি স্মার্ট, অতি ফ্যাসন-দুরস্ত। আমাদের মালিক বৃদ্ধ মার্টিন মনে করেন আপনার সরস বক্রোক্তি সত্ত্বেও আপনি হয়ত খুব বেশী পড়াশোনা করা টাইপ। একটা ফটো পাঠান না কেন? আপনার যদি ফ্রাঙ্ক সম্পর্কে কৌতূহল থাকে তাহলে বলি তার বয়স ত্রিশের শেষের দিকে—চমৎকার একটি আইরিশ মেয়েকে বিয়ে করেছেন—মনে হয় এটি ও'র দ্বিতীয় স্ত্রী। আমার বাচ্চা দুটো (মেয়ে পাঁচ—ছেলে চার) ত' হাতে স্বর্গ পেয়েছে। ডিম আর কিসমিস দিয়ে আমি সত্যি কেক বানিয়ে দিয়েছি। আমার চিঠির জন্য অপরাধ নেবেন না। ফ্রাংককে জানাবেন না। আপনার যদি লণ্ডন থেকে কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকে আমাকে লিখবেন, বাড়ির ঠিকানা চিঠির পিছনে দিলাম।'

এই পত্রের উত্তরে হেলেন জানালেন—

'প্রিয় সিসিলি...বৃদ্ধ মার্টিনের অদৃষ্ট মন্দ। আমি অতি পড়াশোনায় অবহেলা করা মেয়ে। কখনও কলেজ যাইনি। বই পড়ার অদ্ভুত আগ্রহ আছে।...আমি বেচারী ফ্রাঙ্ককে কেবল জ্বালাই—জানি আমার আবদার উনি সিরিয়াস ভঙ্গীতে গ্রহণ করবেন। ব্রিটিশ গাম্ভীর্য কাটাতে আমার প্রচেষ্টার ত্রুটি নেই। ও'র যদি অম্বলের রোগ হয় তাহলে আমিই দায়ী। আমাকে জগতের কথা লিখবেন। কবে যে লণ্ডন যাব সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি।'

অনেক দিন পরে সেপ্টেম্বরে একটি চিঠি এল ফ্রাঙ্ক ডোয়েলের কাছ থেকে—ফ্রাঙ্ক লিখলেন—

'আমরা আপনার চাহিদা ভুলিনি। এখন একটা অক্সফোর্ড বুক অব ভার্স পেয়েছি—ইণ্ডিয়া পেপারে ছাপা চমৎকার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই। দাম দু ডলার। নিউম্যানের 'দি আইডিয়া অব এ ইউনিভার্সিটি' আপনি একবার চেয়েছিলেন। চাই নাকি? প্রথম সংস্করণ এক খণ্ড আমরা কিনেছি—দাম ছয় ডলার।'

পত্র প্রাপ্তি মাত্র উত্তর দিলেন হেলেন—লিখলেন, 'ফার্স্ট এডিশন চাই, সেই সঙ্গে অক্সফোর্ড বুক অব ভার্স—টাকা পাঠালাম।'

ইতিমধ্যে হেলেনের দেওয়া উপহার সামগ্রীর জন্য প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে আরও একজন চিঠি দিলেন। তাঁর নাম বিল হাম্‌ফ্রিজ, তিনিও মার্কস অ্যাণ্ড কোং-এর কর্মী: তিনি লিখলেন—'আমার জ্যাঠাইমা আমার সঙ্গে থাকেন, বয়স ৭৫। আমি যখন আপনার পাঠান মাংস ইত্যাদির টিন নিয়ে এলাম তখন তাঁর চোখের আনন্দের ছাপ যদি দেখতেন। সত্যি, এত দূরে থেকেও আমাদের কথা মনে রাখেন, আশ্চর্য! যদি কখনও লণ্ডন থেকে কোনো কিছু প্রয়োজন হয় জানাবেন।'

এরপর চিঠি দিলেন ফ্রাঙ্ক ডোয়েল ৯ এপ্রিল তারিখে। তিনি লিখলেন—'আপনি বোধহয় আমাদের নীরবতায় উদ্বিগ্ন। আমি লণ্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনীগৃহে পুরাতন বই সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরছি। বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ি, রাতে গিয়ে শুয়ে পড়ি। স্ত্রী বলেন খাবার কুটুম। কিন্তু আপনার পাঠান জিনিষ পাওয়ার পর আমার বদনাম কেটেছে। তিনি সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করেছেন। আপনার করুণার প্রতিবেদনে আমরা সামান্য একটা উপহার পাঠাচ্ছি। মনে হয় আপনার পছন্দ হবে।'

এই সঙ্গে একটি কার্ড—'এলিজাবেথান পোয়েটস' নামক গ্রন্থের সঙ্গে সাটা—৮৪, চেয়ারিং ক্রসের সবাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদসহ হেলেন হানফকে দিলেন।' বলা বাহুল্য চিঠিগুলির সমগ্র অংশ দেওয়া সম্ভব নয়, সংক্ষেপিত সারাংশ মাত্র পাঠকদের অবগতির জন্য যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন তা এই নিবন্ধে দেওয়া হল।

আগামী সংখ্যায় শেষাংশটুকু পরিবেশিত হবে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে যে একটি কাহিনী গড়ে উঠতে পারে এবং তার মধ্যে এক আশ্চর্য প্রেমের সম্পর্ক পাওয়া যায়—হেলেন হানফ লিখিত '৮৪, চেয়ারিং ক্রস রোড' নামক গ্রন্থে তার পরিচয় ছড়ানো আছে।

84 CHARING CROSS ROAD: By HELENE HANFF : Published by ANDRE DEUTSCH LONDON — Price 30 Shilling.

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

ঢাকায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই মেলায় উভয় দলের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন:

শতবর্ষের আলোয় শশাঙ্কমোহন সেন

গত ২৩ ডিসেম্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবি সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের জন্মশতবার্ষিকী স্মৃতিসভা উদযাপিত হয়। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়।

প্রধান বক্তা জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, 'শশাঙ্কমোহন সেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে একটি প্রায়-বিস্মৃত নাম। তাঁর রচিত কবিতা, পুস্তক, সমালোচনা ও নিবন্ধ গ্রন্থসমূহ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।...অথচ রবীন্দ্রযুগেও শশাঙ্কমোহন ছিলেন স্বাতন্ত্র্য খ্যাত কবি।' অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শচীন্দ্রনাথ দত্ত, জ্যোতিপ্রসন্ন সেন, সনৎকুমার গুপ্ত। অধ্যাপক মদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে

প্যারিসে তৈরি হয়েছিল ভিয়েতনাম শান্তি চুক্তির খসড়া। সই-সাবুদ হবো হবো করেও শেষ পর্যন্ত তা হল না। উল্টে ভিয়েতনামের আকাশে নতুন উদ্যমে শুরু হল বর্তমানকালের প্রচণ্ডতম বিমান আক্রমণ। নিকসন প্রশাসন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের আশা ও যাবতীয় মানবিক আচার ভঙ্গ করে অভূতপূর্ব নৃশংসতার নজির তৈরি করল। তারই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ। গত ২৫ ডিসেম্বর তাঁরা এক ধিক্কার মিছিল নিয়ে যান মার্কিন দূতাবাসের সামনে। মিছিলে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তরুণ সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখো-

পাধ্যায়, গণেশ বসু, দীপেন রায়, আশিস সান্যাল, দেবনাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

এক-আ-জি-র খবর ।।

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানিতে সব গ্রন্থমেলাকেই টেক্কা দিয়ে গেল এবারকার ২৪তম মেলাটি। ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় মোট ৫৮টি দেশের ৩,৬৮৩টি প্রকাশক সংস্থা নেন অংশ। সবশুদ্ধ দেখানো হয় ২৫০,০০০ বই আর তার মধ্যে ৭৮,০০০টি গ্রন্থই একেবারে নতুন প্রকাশিত। বলাই বাহুল্য, ফ্রাঙ্কফুর্ট গ্রন্থমেলা খুচরো বই কেনা-বেচার জায়গা নয়। তবে সব আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার মতই ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়েছিল ভবিষ্যতের ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তিকেন্দ্র।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী ৪৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লক্ষ্ণৌ-এ। ২৫ ডিসেম্বর এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় মেয়র ডঃ দৌজি গুপ্ত। তিনি বলেন 'বাংলা সাহিত্য জাতির মধ্যে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাই নয়—ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাবোধও সঞ্চারিত করেছে। এবং এজন্যে দেশ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।' তিনি আরো বলেন, দেশবাসীর বর্তমান চিন্তাধারায় যে বিপ্লব ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের অবদান।'

সম্মেলন সভাপতি দেবেশ দাশ বলেন, 'সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আবার আমরা সবাই, সব বাঙালি, এপার বাংলা ওপার বাংলার বাঙালি সবাই একসঙ্গে এক সুরে এক সংবেদনে উচ্চারণ করতে পারছি নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।' তিনি বলেন, 'সাহিত্য হচ্ছে প্রাণের আগুন, ভস্মরাশি নয়।...সাহিত্য ও জীবন সমস্যা নিয়ে। এখানে অর্থনীতি ও রাজনীতিবিদদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ দরকার। সাহিত্য সম্মেলনে এই দুই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অধিকারীরা কোন কোন বছর আমাদের পুরোধা হয়েছেন। তাঁদের কাছে আমার নিবেদন যে জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বাঁচবে না।'

দ্বিতীয় দিনে অতুলপ্রসাদ জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি বলেনঃ 'অতুলপ্রসাদ সত্যি সত্যি অতুলনীয়। রবীন্দ্র সৌরমণ্ডলের

অতুলপ্রসাদ সেন

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

একজন হয়েও, রবীন্দ্র সংস্কৃতি সমুদ্রে অবগাহন করেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তায় অতুলপ্রসাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। পুরোপুরি বাঙালি থেকেও অন্যতম সেরা ভারতীয় বলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। জীবনের বৃহত্তর অংশ বাংলার বাইরে কাটলেও বাঙালিদের গৌরবের কোনো সীমা ছিল না তাঁর।' তিনি আরো বলেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার অতুলপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'অতুল, তোমার গান অতুলনীয়।' মাত্র তের বছর বয়সে যিনি এমন ভাবসঙ্গীত রচনা করতে পারেন—

> 'তোমারই উদ্যানে
> তোমারই যতনে
> উঠিল কুসুম ফুটিয়া।'

—তাঁর প্রতিভাকে কেই বা না স্বীকার করে পারে? সেই প্রতিভাধর মানুষটি সর্বদা যাতে আমাদের স্মরণে থাকে, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌয়ে এবং কলকাতায়, তেমনভাবে তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের অবশ্যই করণীয়।'

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পরবর্তী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মেদিনীপুরের তমলুকে। এবং নতুন বছরের জন্যে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়।

অমৃত ও যুগান্তর পুরস্কার

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে এ বছর 'অমৃত' পুরস্কার পান মানসী মুখোপাধ্যায় আর 'যুগান্তর' পুরস্কার লাভ করেন বিশিষ্ট হিন্দী লেখক অমৃতলাল নাগর। প্রতিটি পুরস্কারের নগদ মূল্য এক হাজার টাকা।

হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন

হাওড়ার 'সাহিত্য প্রয়াসী'র উদ্যোগে আমনের ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি হাওড়া

গার্লস কলেজ প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী 'হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যতদূর জানা যায়, হাওড়া জেলার অধিকাংশ লেখকই এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। বলাইবাহুল্য সাহিত্য-অধিবেশন ছাড়াও চিত্রপ্রদর্শনী, হাওড়া জেলা ও অবশিষ্ট গ্রাম বাংলার পত্র-পত্রিকার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

যুগোশ্লাভিয়ার খবর

মাত্র কিছুদিন আগে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিষ্ঠিত লেখক ব্রাঙ্কো কোপিক পেলেন নতুন সম্মান। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যেই তাকে দেওয়া হল নেগোশ পুরস্কার। এটি পান তিনি তাঁর ছোট গল্প সংকলন। দ্য হাইহস গার্ডেন-এর জন্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে লিখতে শুরু করেন কোপিক। মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। শুধু কবি ও লেখক হিসেবেই তিনি জনপ্রিয় নন, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। যুগোশ্লাভিয়ার মন্টেনেগ্রো রিপাবলিক দিয়ে থাকেন নেগোশ পুরস্কারটি। বলাই বাহুল্য, এই পুরস্কার দেওয়া হয় মন্টেনেগ্রো ও যুগোশ্লাভ কবি পিটার পেট্রোভিক নেগোশ-এর নামে।

বাংলাদেশের খবর হতে

তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন বাংলাদেশ লেখক শিবির। গত ২১ ডিসেম্বর এর উদ্বোধন হয় বাংলা একাডেমিতে। প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবদুল জলিল মিয়া। প্রথম দিনটি বার্ট্রাণ্ড রাসেল সম্পর্কিত আলোচনায় ছিল সীমাবদ্ধ। এই অনুষ্ঠানে সরদার ফজলুর করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক, জনাব আহমদ ছফা প্রমুখ লেখক, অধ্যাপকেরা অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে 'সংস্কৃতির সংকট' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন বদরুদ্দিন উমর ও জনাব সাঈদুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মাহাবুবউল্লাহ, আহমদ ছফা। এদিনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আহমেদ শরীফ।

নতুন বই

আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)। তরুণ সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। আট টাকা।

কবি শ্রীতরুণ সান্যালের আর একটি নতুন পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আধুনিক কবিতা : বিচ্ছিন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ'এর মধ্যে সার্থক প্রবন্ধকার হিসেবে। ইনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে সম্যক মনীষার ও চিন্তাশীলতার পরিচয় রেখেছিলেন, বর্তমান গ্রন্থটি সেই সমস্ত প্রবন্ধ-ভাবনা ও গ্রন্থ সমালোচনা জাতীয় রচনার উল্লেখযোগ্য সংকলন।

ওদেশে এককালে এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, সেসিল ডে লুই, এদেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'কাব্য পরিমিতি' গ্রন্থে কিছু কবিতা, কাব্য বিষয় আলোচনা করেছেন। তরুণবাবু এ সবের অনুসারী, কিন্তু একেবারে আধুনিক কালের জটিল কাব্য মানসিকতার নানাবিধ সমস্যা ও দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস তরুণবাবুর রচনায় স্বকীয় বক্তব্যে উজ্জ্বল।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট তেরোটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ 'গোর্কী, আধুনিক বাংলা কবিতা, ঝড়ের পাখি', সর্বশেষ প্রবন্ধ 'মার্কি দ্য সাদ ও তাঁর উত্তরপুরুষ'। মধ্যবর্তী প্রবন্ধগুলির মধ্যে ব্যক্তিপ্রসঙ্গ—যেমন রিলকে, গিওর্গ লুকাচ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে, তেমনি আছে কবিতার বিভিন্ন আন্দোলনের কথা, তার সমস্যা, প্রতীকত্ব, বিশুদ্ধতা, কাব্যব্যক্তিত্ব, চিত্রকল্প, ডিকশন ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

তরুণবাবুর আলোচনা বিশ্লেষণধর্মী ও 'কমপ্যারেটিভ'। সমস্ত প্রবন্ধের শেষে নিজস্ব মত ও ভাবনাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কঠিন ভিত্তি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তরুণবাবু একজন কবি হয়েও কোথাও কবি, কাব্য, কবিচারিত্র বিষয়-ভাবনা বিচারে 'সাবজেকটিভ' আলোচনায় বাঁধা পড়েন নি। আলোচনায় যুক্তি আগে এবং সে যুক্তি মননির্ভর, বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতায় নির্ভীক, শাণিত। এই প্রবন্ধগুলিতে অভিব্যক্তি ঘটেছে বোধ ও বোধির অধিক উপলব্ধির শুদ্ধতায়। বোঝা গেছে, যখন তিনি সমালোচনা করতে বসেছেন, তখন তিনি কবি নন, কবি-আত্মার অন্তস্থলে উপবিষ্ট অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন এক জিজ্ঞাসু সমালোচক।

প্রথম প্রবন্ধ প্রমাণ করে, কবি তরুণ সান্যাল সমালোচক হিসেবে কবিতায় কি চান! এ বিষয়ে তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য 'কবির সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশী। সে দায়িত্ব বিপ্লবীর দায়িত্ব...রচনার শিল্পরূপে হবে, হয় বিপ্লবী রোমান্টিকতা, নইলে বাস্তবতা। এবং সে বাস্তবতাও হবে এ যুগে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।' তরুণবাবুর এই ভাবনা অন্যান্য প্রবন্ধে চাবিকাঠির মত সক্রিয়। বোঝা যায়, তরুণবাবু মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এবং একজন স্বনিষ্ঠ অনুরাগীও। বিরোধীরা তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতায় মুখর হতে পারেন, কিন্তু তরুণবাবুর শাণিত যুক্তি ও বিপুল অধ্যয়নজাত সমীকরণের ফলস্বরূপ অভিজ্ঞতার কাছে নীরব হতে বাধ্য। কবিতা ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার সমস্যা সম্বন্ধেও তরুণবাবু বিশেষভাবে চিন্তিত এবং এ চিন্তা স্বভাবী পাঠকরূপেই। বিজ্ঞানের ভাষা ও কবিতার ভাষা সংক্রান্ত মন্তব্যটি বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য। কবি হিসেবে তিনি আধুনিক মানুষ, জীবন, সমাজ ও সভ্যতার মূল কথাই বলেছেন,—'বিজ্ঞান ও কবিতা, বিজ্ঞানশিক্ষা ও মানবতত্ত্ব—উভয় বিদ্যার ঐক্যময় সামঞ্জস্যের মধ্যেই আছে আগামী কালের মানুষের সংস্কৃতি।' (অমোঘ শর)।

তরুণবাবুর কয়েকটি মন্তব্য তাঁর মতের সামগ্রিকতা স্পষ্ট করে। যেমন—'ভাষাই এক অর্থে কবিতা—কেননা তা চিত্রকল্প, রূপক ও উৎপ্রেক্ষাময়।' 'বিশুদ্ধ কবিতার আমি বিপক্ষে নই, কিন্তু আমি অ-বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষে প্রবলভাবে। আসলে কোনো কবিতা আন্দোলনই তো নিরঙ্কুশ নয়।' তরুণবাবুর কোন কোন মন্তব্য 'নেগেশান' থেকে 'অ্যাফারমেশানের' মধ্য দিয়ে তাঁর মূল চিন্তাপদ্ধতি, অন্তত কবিতা সম্পর্কে, স্পষ্ট করায়। যেমন, 'এমন কি নিজেকে বোধগম্য ও বোধ্য করে তোলার প্রয়োজনেও কবিকে কি বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিরত করা যায়? 'নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা, ও আধুনিকতা', 'দুরূহ শব্দের জোটানায়', 'কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে', 'কবিব্যক্তিত্ব, কবিচরিত্র ও কবি' ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখকের চিন্তার মৌলিকতার দাবী রাখে। গিওর্গ লুকাচের প্রসঙ্গটি যোগ করে তরুণবাবু আধুনিক পাঠকের বাস্তবতা সম্পর্কিত নতুন ভাবনায় সুস্থ, সবল খাদ্য পরিবেশন করেছেন বলা যায়।

তরুণবাবুর বহুপঠন, দীর্ঘদিন কাব্য রচনায় গম্ভীর-প্রোথিত অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানী

সাহিত্যের বিপুল শিক্ষার আশ্চর্য আত্মী-করণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলি, বেশ কিছু আলোচনায় এদেশীয় কবি-মনীষীর চিন্তা-ভাবনা প্রসঙ্গত আনা উচিত ছিল। শুধু বিদেশী কবি-কাব্য প্রসঙ্গ কোথায় যেন অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের অতৃপ্ত রাখে। দ্বিতীয়ত, আলোচনায় বার বার একটি বাংলা শব্দ আবার 'বা' প্রয়োগ করে তার ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহার গদ্যকে ক্লান্তিকর করেছে কোথাও কোথাও।

সবশেষে তরুণবাবুর গদ্য প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়, তিনি আলোচনার গদ্যে কোথাও অযথা ভার নিয়ে আসেন নি। সহজ সরল গদ্যে দুরূহ বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হতে পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হই।

বঙ্কিম স্মারক গ্রন্থ ।। সম্পাদনা কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমূল্যভূষণ গুপ্ত। বারাসত পূর্ণিমা সম্মিলনী। দাম চার টাকা।

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমকে বলেছিলেন, 'দি গ্রেটেস্ট ম্যান অব দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী'। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বিশাল স্তম্ভ—যার মধ্যে এতটুকু ভাঙ্গন ধরে নি আজও। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমকে সামনে রেখে, গ্যেটের সম্বর্ধনায় নেপো-লিয়নের মূল্যবান উক্তিটি স্মরণ করে বলা যায়—'হিয়ার ইজ এ কমপ্লিট ম্যান'। এই অসাধারণ প্রতিভার বিশ্লেষণ হয়েছে বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে, এখনো চলছে সমানে। এই রকম আলোচনা ধারায় একটি মূল্যবান সংযোজন হল 'বঙ্কিম স্মারক গ্রন্থটি'। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের লেখক নন অথচ রুচিশীল, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী কয়েকজনের সার্থক রচনায় সমৃদ্ধ এই স্মারক গ্রন্থটি বঙ্কিম সম্পর্কে এক নূতন রশ্মি নিক্ষেপ করে। অমূল্যভূষণ গুপ্তের 'বিজ্ঞান সাহিত্যে বঙ্কিম' এবং কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার বাল্যস্মৃতি ও বঙ্কিম-হৃদয় সন্ধান'—দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বঙ্কিম সম্পর্কিত রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ রায় ও প্রণবকুমার মজুমদার। গ্রন্থটি গবেষক, ছাত্র ও সহৃদয় পাঠকদের কাছে অত্যন্ত উপযোগী।

সারস্বত মঠ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম। স্বামী প্রেমানন্দ সরস্বতী। মধ্য বাংলা সারস্বত আশ্রম, পূর্বস্থলী, বর্ধমান। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

স্বামী প্রেমানন্দের 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' নামে প্রবন্ধ আর্য দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল তেরশ পঁচিশ ও ছাব্বিশ সালে। সেই প্রবন্ধেরই পরিণতি হিসেবে বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ এই পুস্তকে অনূদিত হয়ে গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। বস্তুত বর্ণাশ্রম ধর্মে অবস্থিত মোহগ্রস্ত অন্ধ সমাজের চৈতন্যোদয়ের কারণেই এই গ্রন্থটির রচনা-উদ্দেশ্য নিহিত। 'প্রার্থনা' অংশ দিয়ে শুরু ও মোট পনেরোটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। লেখকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সহজ, সরল, মতবাদ বিশ্লেষণ সহনশীলতা সমন্বিত ও সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ। ধর্মরস-পিপাসুদের কাছে এ গ্রন্থ আদরণীয়।

অনন্ত মধ্যাহ্ন ফিরে (কাব্য সংকলন)—বাদল ভট্টাচার্য। কবিকণ্ঠ প্রকাশনী, ১০।২, ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা—৩২। তিন টাকা।

বাদল ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় সহজ কবিপ্রাণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আশা, নিরাশা, ভয়-ভয়হীনতা, ভালবাসা, বিষাদ—এ সমস্ত কবির অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে স্পর্শ করেই কবির উত্তুঙ্গ কল্পনার পরি-চায়ক হয়ে উঠেছে এ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে। কবি বলেছেন—'কত আশা বুকের অতলে/ /অন্তহীন সাগরের মত'; বলেছেন—'কিছুতেই পারি না—/ বুকের ভেতর থেকে সমস্ত স্মৃতি ক্রোধ ক্ষোভ এক লহমায় মুছে ফেলতে।' আলোচ্য কবি জীবনকে ভাল-বাসেন, তাই বলতে পেরেছেন অবলীলায়—'বন্ধু ওগো তোমার জন্য অগাধ আয়োজন'। বাদল ভট্টাচার্য যেমন ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখেছেন, আবার গদ্যকবিতাও বাদ দেননি। এবং ছন্দের প্রত্যেক বিভাগেই কবির কান প্রখর ও সতর্ক উন্মুখ। আধুনিক 'ইমেজ' ব্যবহার কবিকে অনেকটা আত্মীয় মনে করায় স্বভাবী কাব্যপাঠকদের কাছে। নাম কবিতাটি কবিক্ষমতার পরিচায়ক। প্রচ্ছদ সুন্দর।

একনাথী ভাগবত (ধর্মগ্রন্থ)—শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, ১১২।১ ক্যানেল স্ট্রীট, কলকাতা-৪৮। পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী একনাথ ব্যাখ্যাত ভাগবতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সহকারে। এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। অনুবাদের ভাষা সহজ, সরল। ভূমিকাটিও মূল্যবান। ধর্মপ্রাণ পাঠকের ভালো লাগবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শারক : সম্পাদক রণধীর রায়। প্রকাশ স্থান উল্লেখ নেই। দাম এক টাকা।

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকাটি মুদ্রণ ব্যাপারে কিছুটা প্রথা-বিরোধী। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে যাত্রা সম্পর্কে। এগুলি প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ উপলক্ষে। সম্পাদকের রুচিশীল বিদগ্ধ মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট।

অম্বিষ্ট (জীবনানন্দ সংখ্যা)—সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৯।১।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৩। তিন টাকা।

ত্রৈমাসিক 'অম্বিষ্টে'র বিশেষ সংকলন 'জীবনানন্দ সংখ্যা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে 'এলিয়ট' 'অবনীন্দ্র' ও 'মানিক' সংখ্যা প্রকাশ করে 'অম্বিষ্টে'র মত একটি প্রতিষ্ঠিত রুচিশীল ত্রৈমাসিক 'লিটল্ ম্যাগাজিনের' সম্পাদক সহৃদয় পাঠকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। আলোচ্য সংখ্যাটি আমাদের মতে আরও উন্নতমানের এবং এর লেখক, কবি ও সম্পাদকের দুঃসাহসিক পরিশ্রমী সততা ও অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। সাধারণভাবে কবি জীবনানন্দের উপর সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন সর্বশ্রী অলোক রায়, সুকুমার ঘোষ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুধীন মিত্র। জীবনানন্দের প্রতিটি কবিতাগ্রন্থের উপর স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ ও তরুণ কয়েকজন কবি—সর্বশ্রী অরুণ ভট্টাচার্য, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য, শিবশম্ভু পাল, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নন্দমিতা মিত্র ও দীননাথ সেন। কবি জীবনানন্দের ছোটগল্প এক বিস্ময়। সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রতিষ্ঠিত তরুণ গল্পকার শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত। জীবনা-নন্দকে নিবেদিত কয়েকটি কবিতা লিখেছেন সর্বশ্রী সতীকান্ত গুহ, দীনেন বন্দ্যো-পাধ্যায় ইত্যাদি। জীবনানন্দ-জীবনী ও কবি-সম্পর্কিত রচনাপঞ্জী লিখেছেন যথা-ক্রমে শ্রীপ্রভাতকুমার দাশ ও শ্রীস্বপন দাস-অধিকারী। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ সুরুচিসম্মত এবং এই বিশেষ সংখ্যাটি সর্বস্তরের গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রহের যোগ্য।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি : সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ। ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর। দু টাকা।

বেসরকারী উদ্যোগে মেদিনীপুরের প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, ধ্যানধারণা, লৌকিক সংস্কার, দেবদেবী, শিল্প, সাহিত্য, লোকসংগীত প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য স্থাপিত হয়েছে মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি সেই অনুসন্ধানের ফল। লিখেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, বঙ্গভূষণ সেনাপতি, প্রদীপ চৌধুরী, দুলাল চৌধুরী, সুহৃদকুমার ভৌমিক (মেদিনীপুরের গ্রাম-নাম ও প্রাগৈ-তিহাসিক জনবসতি), সত্যেন বড়ঙ্গী, সুদর্শন সামন্ত (আঞ্চলিক ইতিহাস : তাম্রলিপ্ত), নিশিকান্ত মাইতি, প্রদ্যোৎ মাইতি, বিনোদশঙ্কর দাস, গোকুলানন্দ মিশ্র, শ্যামাপ্রসাদ বসু (মুসলমান আমলে মেদিনীপুর), প্রণব রায়, তারাশিষ মুখো-পাধ্যায়, কাননবিহারী গোস্বামী এবং কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সংকলনটি কৌতূহলী পাঠকের কাছে মূল্যবান বলে গণ্য হতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রন্থ-মেলায়

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণের এক দিকে সামিয়ানা, যেখানে সেমিনার চলছে—অন্য দিকে রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা ছোট-বড় শিবিরের মতন সারি-সারি বইয়ের দোকান, যেখানে গ্রন্থ-মেলা বসেছে। আরো একটি প্রাঙ্গণ একাডেমীর সামনেই, মাঝখানে বিরাট বৃক্ষের বেদী, সেখানে কবিগানের আসরের আয়োজন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সেমিনার থেকে সবে বেরিয়েছি—সেদিন আলোচ্য ছিল পুস্তক-প্রকাশন ও বিতরণের নানা সমস্যা—ইচ্ছে ছিল, প্রাঙ্গণের ওদিকে গ্রন্থ-মেলায় যাব, আমাদের ভারতের স্টলে ভিড় ঠেকানোর নতুন কোনো সমস্যা জাগল কি জাগল না দেখব। এমন সময় দুটি মেয়ে কোত্থেকে হঠাৎ হাজির, বলে 'আব্বা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের — যাবেন জয়নাল আবেদীনের বাড়ী?'

যাব আবার না! জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি ঢাকায় পৌঁছানোর প্রথম দিন হতে—অতএব সন্ধ্যার সমস্ত প্রোগ্রাম নিমেষে বাতিল হয়ে গেল, এমনকি কী প্রোগ্রাম আছে-না-আছে আর মনেই পড়ল না, মেয়ে দুটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তার আগে যেটুকু বলবার, তা হল মেয়ে দুটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় সেদিনই হয়েছে, সকালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, যেখানে গ্রন্থ-মেলা উপলক্ষে আগত ও বাংলাদেশ সরকারের বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি অন্নদাশঙ্কর রায়কে সস্ত্রীক সম্বর্ধনা জানানো হয়। এবং সর্বত্রই যে-প্রাণের স্পর্শ, চোখের চাওয়া, ঠোঁটের হাসি, তার প্রভাবে যেমন আরো অনেকের সঙ্গে এখানে ইতিমধ্যেই হয়েছে, তেমনি ঐ সকালের অতটুকু আলাপেই মেয়ে দুটিকে কেমন-যেন আপন করে নিতে পেরেছি। তার উপর জয়নাল আবেদীনের ম্যাজিক নামটি তাদের মুখে সেই সন্ধ্যায়, উচ্চবাচ্যের প্রশ্ন আর কোথায়!

'গাড়ী কিন্তু নেই', চোখ ঘুরিয়ে হেসে মেয়ে দুটির একজন জানালো।

ঢাকায় যানবাহন একটা বিরাট সমস্যা, তাই গাড়ী সম্বন্ধে ঐ বিশেষ উক্তিটি। তাছাড়া ওদেরই গাড়ী করে সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হোটেলে ফিরেছি—মেয়ে দুটির আব্বা হলেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, বাউল গানের সংকলনে সারা জীবন কাটিয়েছেন, শুধু পণ্ডিতই নন, বিচক্ষণ রসিক ব্যক্তি, নিজেকে ব্রাহ্মণ বলেন।

'আসে রিকসা করে যেতে হবে', একটু যেন লজ্জিতের ভাবে অন্যটি জানালো।

আমি তখন জানতে চাইলাম, কত দূর—অর্থাৎ পায়ে হেঁটে সে-দূরত্বটা পাড়ি দেওয়া যায় কিনা। উত্তরে জানলাম দূর যদিও তেমন কিছুই নয় এবং হেঁটে অনায়াসেই যাওয়া চলে, তবু যেহেতু হাজার হলেও আমি অতিথি মানুষ এবং হাতে সময়ও তত নেই—কারণ কে জানে আবেদীন সাহেবের জন্য কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা সন্ধ্যায়—তাই শেষ পর্যন্ত দরদস্তুর করে দুটি সাইকেল-রিকসাই নেওয়া হল, একটিতে আমি, অন্যটিতে ওরা দুজন। বলা হল আমার রিকসাটি আগে-আগে যাবে, ওদেরটি আসবে পিছন-পিছন। যখন জানতে চাইলাম কেন—যেহেতু আমি রাস্তা চিনি না, আমারই ওদের পিছন-পিছন আসাটা সমীচীন ঠেকেছিল—তখন মেয়ে দুটির আবার সেই প্রাণ-ছোঁওয়া হাসি, বলে 'আপনাকে নজরে রাখার দরকার আছে', এবং পরেই আমার রিকসা-চালকটিকে নির্দেশ দেয় সে যেন হুস-হুস করে পা না চালিয়ে একটু আস্তে-আস্তে যায় এবং জোনাকি সিনেমার সামনে এসে পরের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

অতএব আমার বেশ ভার নেওয়া হচ্ছে, দেখা-শোনা করা হচ্ছে, আছি আপনজনেরই হাতে—এই জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হওয়ারই অবকাশ। কিন্তু মিনিট দুয়েক আগে আরেকটা ছোট্ট ঘটনাও ঘটেছে।

পারলে যদি কোনো বন্ধু-বান্ধবের গাড়ী পাওয়া যায়, বা যে-কোনো গাড়ী, যা আমাদের নিয়ে যেতে পারে আবেদীন সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত, অর্থাৎ রিকসা নেওয়ার বাধ্যবাধকতাটাকে যদি কোনো রকমে এড়ানো যায়—প্রথমে সেই চেষ্টাই চলছিল। এবং গাড়ী আসছে-যাচ্ছে প্রচুরও, মেলা দেখতে কেউ এলেন, বা মেলায় কাউকে নামিয়ে কোনো গাড়ী অন্যত্র উধাও হল, এরকম আকছারই ঘটছে—দুটো-একটা ভ্যানও এসে থামছে, হয় সেখানে থামতে কিছুক্ষণ, নয়তো একটু দাঁড়িয়ে অন্য পথ নিতে। এবং মেয়ে দুটির তখন কি ছোটাছুটি একটার পর একটা গাড়ীর চালককে জিজ্ঞেস করছে ওদিকে একবার বোঁ করে ঘুরে আসতে পারবে কিনা—আমাদের নামিয়ে বাংলা একাডেমীতে আবার ফিরে আসতে তাদের সবসুদ্ধ পনের মিনিটও লাগবে না, এমন যুক্তিরও অবতারণা করছে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, কোনো গাড়ীর পক্ষেই সম্ভব হল না আমাদের ঐ রাস্তাটা পৌঁছে দিতে—অগত্যা সাইকেল-রিক্সা নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। কিন্তু ঐ যখন ছোটাছুটি করছে ওরা, এ-গাড়ী থেকে ও-গাড়ীর চালককে রাজী করানোর চেষ্টা করছে, তখন প্রতিবারই ওদের যুক্তির একটি কথা উড়ো হাওয়ায় আমার কানে ভেসে আসছে—কথাটি হল 'ফরেনার' অর্থাৎ বিদেশী। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যেটা ওরা গাড়ীর চালকদের বোঝাবার চেষ্টা করছে তা হল আমি একজন 'ফরেনার' এবং আমাকে নিয়ে ওরা একটা জায়গায় যেতে চায়, হাতে সময়ও কম, অতএব এই সব নানান-কিছু বিবেচনা করে চালকদের কেউ কি সদয় হয়ে আমাদের সেই জায়গাটায় পৌঁছে দেবেন? এবং আশ্চর্য যেটা, তা হল এই যে, 'ফরেনার' কথাটা উচ্চারণ করছে মেয়ে দুটি, তার মধ্যে কিন্তু আমার প্রতি কোনো অসম্মান বা বিদ্বেষের ভাব একটুকু নেই, বরং কথাটা স্বতঃস্ফূর্তই, বেরিয়ে আসছে তেমন কিছু না ভেবেই। যেন এমন একটা সত্য এটা, যেটা সুপ্রতিষ্ঠিত যুগ হতে যুগান্তরে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে পড়ে যায় আসার পথে দমদম বন্দরে থামার দুঃসহ সময়টুকু, একটার পর একটা ফর্ম ভর্তি করা, এটা-ওটা নিয়ম-কানুন পালনের পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা—যেন যে-সব দেশ বহুদূরের, যা সত্যিই সর্ব অর্থে বিদেশ, সেখানেও পাড়ি দেওয়া এর চেয়ে সোজা। অবশ্য উল্টোভাবেও জিনিসটা দেখা চলে—ভাবা চলে, ঐ 'ফরেনার' কথাটা যাতে এখানে শুনতে হয় এবং সেটা শুনেও যাতে চমকিত না হতে হয়, তার প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয় সেই দমদম বিমান-বন্দরেই। অর্থাৎ, দমদমে ঢাকার বিমানে পা ফেলবার ছাড়-পত্রটি যখন পাই অত নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে গিয়েই, তখন 'ফরেন' ভিন্ন এ-দেশটার আর কি কিছু হওয়া সম্ভব?

তবু কেন জানি না, কথাটা সেই সন্ধ্যায় শুনে শুধু চমকিতই হই নি, এক অনির্দেশ্য আঘাতও পাই বুকের কোন গহন কোণে—কথাটা যতবার উচ্চারিত হয়েছে, ততবারই কে হাতুড়ি পিটিয়েছে খুব কোমল এক জায়গায়। যদিও মুখ ফুটে বলি নি কিছুই, মনে-মনে দুষ্টুমির আওড়াই এক দুঃখমিশ্রিত কৌতুকের ভাবে, 'আমি যদি তোর ফরেনার হই তো, তোর আপনজন কে রে?' ততক্ষণে অবশ্য রিকসায় উঠে বসেছি, চলতে শুরু করেছি।

সংক্ষেপে বলা চলে, এই সামান্য ঘটনায় বিবরণে বিধৃত রয়েছে এবারকার ঢাকায় আসার উপলক্ষ এবং সেই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ঢাকায় কয়েকদিন কাটানোর সামগ্রিক অভিজ্ঞতা।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উৎসব উপলক্ষে ঢাকায় একটি গ্রন্থ-মেলার আয়োজন করা হয়েছে, ২০শে থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই মেলায় যোগদানের জন্য আমি এসেছি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের প্রতিনিধি হয়ে ও বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। সস্ত্রীক অন্নদাশঙ্কর রায়ও এসেছেন একই বিমানে

সাড়া দিয়ে—যেখানে তিনি গেছেন, সেমিনারে বা বাংলা একাডেমীতে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্বত্র যে-আশ্চর্য সম্বর্ধনা পেয়েছেন, তা প্রমাণ করে তাঁর আজীবন সাহিত্য-কীর্তির অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ তো বটেই, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক অনস্বীকার্য ঐক্যও। সেই ঐক্যের সূত্রটি এপারের ও ওপারের বাংলার বহু বিভিন্নতাগুলিকে মাঝে-মাঝে কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন করে তোলে, খেই ক্রমশই হারিয়ে যায়।

আরো এসেছেন প্রকাশকদের একটি অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল—কেউ বোম্বাই থেকে, কেউ-বা দিল্লী থেকেও। কলকাতা থেকে এসেছেন সুপ্রিয় সরকার—দু দিনের জন্য জয়ন্ত বসুও এসে ফিরে গেছেন। অশোক ভট্টাচার্যকেও কিছুক্ষণের জন্য দেখি। প্রকাশকের এই প্রতিনিধি-দল তাঁদের নিজেদের ও ভারতে অন্যত্র প্রকাশিত কিছু-কিছু বই এনেছেন প্রদর্শনীর জন্য—ভারত ভিন্ন অন্য বিদেশী স্টল যা আছে, তাৎ কোনটি রাশিয়ার, কোনটি আমেরিকার, বা বুলগেরিয়ার বা জাপানের বা বৃটেনের বা পূর্ব জার্মানীর। বাকী স্টলগুলি বাংলাদেশের। মেলা যতদিন চলছে, তার প্রতিদিনই সেমিনারও বসছে একাডেমী প্রাঙ্গণের অন্য পাশে—আলোচ্য বিষয় কোনদিন লেখকের স্বাধীনতা, কোনদিন বা গ্রন্থ-প্রকাশন ও বিতরণ, কোনদিন বা পাঠাভ্যাস উন্নয়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রধান বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান, আবদুল গণি হাজারী, কে এম যাকারিয়া, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নীলিমা ইব্রাহিম, সরদার জয়েনুদ্দীন — নামের তালিকা অনায়াসে দীর্ঘতর করা চলে। এ-প্রসঙ্গে যেটি উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল এই সব আলোচনায় শ্রোতৃবৃন্দের এত ঔৎসুক্য ভারতের কোন প্রদেশেই আয়োজিত অনুরূপ সভা-টভায় সচরাচর দেখি নি। সেমিনার বসত বেলা তিনটে থেকে, চলত প্রতিদিন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছটা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত—এবং প্রতিদিনই অন্তত শ'দেড়েক লোক তো সেমিনারে সব সময়ই রয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা যখন করেছি, আমাদেরই দলের এর-ওর সঙ্গে এই নিয়ে

কথা বলেছি, তখন কেউ-কেউ ভেবেছেন ঢাকা শহরে আমোদ-প্রমোদের অবকাশ নিতান্ত কম, বলেই সামান্য কিছুও যদি কোথাও ঘটে, হয়তো সেখানে লোক যাবেই—অর্থাৎ এই গ্রন্থ-মেলাটা শহরের পক্ষে যাকে বলে একটা ঘটনা, এখানে এমন অনেক লোক আসছে যারা আমোদ-প্রমোদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের কোনো অবকাশ অন্যত্র পেলে সেখানেও সমান তৎপরতায় ছুটত। আরো সহজে বলতে গেলে, সেমিনারে রোজই যে-ভিড় দেখছি, তার মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা হুজুগ দেখতে এসেছেন—অর্থাৎ, কারুর কারুর মতে, তেমন একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে।

আমার কিন্তু এটা মনে হয় নি, কারণ সেমিনারে শুধু বক্তৃতাই হচ্ছে না, আলোচনাও চলছে, এবং উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সেই আলোচনা মন দিয়ে যে শুনছে—এবং তাতে অংশ গ্রহণও করছে—সেটা সহজেই পরিষ্কার ঠেকে।

এরই মধ্যে কখন হচ্ছে ছড়া-পাঠ, কখন বা কাজী সব্যসাচী কিছু আবৃত্তি করে গেলেন—কখন আবার সন্ধ্যার দিকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজনও রয়েছে, সে-সব ছবি দেখাচ্ছেন রাশিয়া বা ভারত বা জাপান বা বৃটেন বা পূর্ব জার্মানী বা অস্ট্রেলিয়া।

অবশ্য ভিড়ের কথা যদি বলি, আসল লোক-সমাগম দেখছি বইয়ের স্টলগুলিতে, বিশেষত ভারতীয় স্টলে যা ভিড় রোজই সামলাতে হচ্ছে, তা আমাদের সকল প্রত্যাশার অতীত। প্রথম দিন যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী মেলাটির উদ্বোধন করলেন, তখন থেকে আজ যখন মেলা শেষ হয়-হয়, ভিড়ের জোয়ার চলেছে সমানই। বিশেষত প্রথম কয়েক দিন আমরা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, শেষ অচিরেই ভারতীয় স্টলে তিনটির জায়গায় ছটি স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েনের জন্য বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে হল—যাতে অঘটন কিছু না ঘটে, তার জন্য দু-একটি অন্য ব্যবস্থাও নিতে হয়। 'অঘটন' কথাটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম, কারণ সত্যিই অন্তত প্রথম দিন আমাদের স্টলটি ভেঙে যাওয়ার ভয় ছিল। শত-শত ছাত্র হুড়মুড় করে একসঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করছে, কিছুতেই কোনো লাইন মানবে না, সকলেরই আকুল প্রশ্ন : 'এ-সব বই বিক্রী হচ্ছে তো? আমরা কিনতে পারব তো?' অথচ ভারত থেকে বই এসেছে শুধু প্রদর্শনীর জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়—এবং তা শুনে উষ্মা-প্রকাশে এক বিরাট ছাত্রগোষ্ঠী সোচ্চার হয়ে ওঠে। অনেক করে বোঝাতে হয়, একই কথা বার বার বলতে বলতে মুখের হাড়ে ব্যথা ধরে যায়, শেষে দ্বিতীয় দিন আগে-ভাগে মেলা-প্রাঙ্গণে এসেই আমাদের বক্তব্যটিকে লিখে পোস্টারের আকারে টাঙিয়ে দিই—যেমন, 'এ-সব বই প্রদর্শনীর জন্য, বিক্রী এখানে হচ্ছে না—কাগজপত্র রয়েছে, তাতে আপনার ঈপ্সিত পুস্তকের তালিকা আপনার নাম-ধামসহ লিখুন, বই সরবরাহের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে।'

ভারত হতে আগত সকল রকম বই-এর চাহিদা এখানে ভীষণ বললে অত্যুক্তি হবে না—চাহিদা বিশেষত পাঠ্যপুস্তকের, এবং সে-চাহিদার আকার যে কী বিরাট, তার সামান্য আভাস পেয়েই আমরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় বনে গেছি। কারণ দুই দেশের মধ্যে বই-এর লেনদেন সুষ্ঠুভাবে এখানো চালু হয় নি, পথে বাধা-বিঘ্ন নিতান্ত কম নয়—এবং সেই বাধা-বিঘ্নগুলি দূর করার ক্ষমতা আছে দুই দেশের সরকারেরই, আমাদের মতো অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিবিশেষের নয়। আমাদের খুব ছোটাছুটি চলেছে তাই এখানে-ওখানে আর্জি পেশ করতে বা কখনো স্থানীয় পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক-মহলে ধর্ণা দিতে—এক কথায়, নানান তাগিদে সারা দিন ধরে সারা শহরে চরকি-বাজী খেতে।

আর হ্যাঁ, একটা ছোট্ট জিনিস বলতে ভুলে গেলাম, যেটা শুনে ভাবতে অনেকের—বিশেষত কবি-মহলে কারুর-কারুর তো বটেই—ভালো লাগা উচিত। সেমিনারে একদিন শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য-সভা হওয়ার কথা ছিল—সেটি হল না। কেন? উত্তরে শামসুর বললেন, ছোট-বড়-অপ্রকাশিত সব কবিই তাতে কবিতা পড়তে চান, কেউ-কেউ নাকি ভয় পর্যন্ত দেখান যে, তাঁদের পড়ার সুযোগ না দিলে সভা ভণ্ডুল করে দেবেন।

যাই হোক, এই অল্প ক'দিন ঢাকায় বিরাট চরকিবাজী খাচ্ছি। তবু ভাবতে ভালো লাগে, এরই মধ্যে সময় করে কখনো নিবিষ্ট হয়ে বসতে পেরেছি শামসুর রহমান, আল মাহমুদ ও অন্যান্য কবিদের সান্নিধ্যে, কখনো 'থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদক রামেন্দু মজুমদার এসেছেন নাট্যোৎসাহীদের নিয়ে কখনো ভাষণ মুনীরের মাধ্যমে ইদানীংকার তরুণদের কিছু সাম্প্রতিক অভিনিবেশ ও নৈরাশ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি।

অবশ্য গিয়েছি একের-পর-এক সেই দরজাতেও যেখানে কান্না থমকে আছে। গিয়েছি মোফাজ্জল হায়দরের পরিবারে, বা মুনীর চৌধুরীর বাড়ীতে। এ এক আরেক তীর্থ, আরেক অভিনিবেশ, আরেক অভিজ্ঞতা। নাঃ, দুই বাংলা আর এক হবে না, কারণ এদের একটা সাংঘাতিক অতীত আছে, যেটা অন্তত মনে-মনে আজও সমানই বর্তমান তাদের পক্ষে—সে-অতীত আমাদের নেই। এবং এরা এখানে যা-ই হোক না বা হতে চান না, একমাত্র সেই অতীতই এদের সকল ভবিষ্যতের পথ বেঁধে দেবে। আমাদের সংলাপ কেটে যায়, কেবলই কেটে যায়—দুই বাংলার মাঝখানে এমন এক পদ্মা আজ, যা আর অতিক্রম করা যাবে না।

তাই মনে হয়, গ্রন্থমেলায় মেয়েটি আমায় 'ফরেনার' বলেছিল, হয়তো ঠিকই করেছিল।

কুড়ি

তিন-চার মিনিট কিরণ চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বলল না। বেয়ারা এসে দু-কাপ চা, টোস্ট আর ওমলেট টেবিলের উপর রেখে গেল। কিরণকে নীরব এবং চিন্তিত দেখে রীতাবরী চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল,—'নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।'

কিন্তু কিরণের মুখভাব বদলাল না। সে গম্ভীর এবং অন্যমনস্কের মত চা-পান শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল,—'আমি একবার তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব ভাবছি।'

—'কি হবে দেখা করে?' রীতাবরী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'তোমাকে বলেছি না? বাবার টনটনে বংশ-গৌরব। আমরা নিমতার বিখ্যাত গোস্বামী বংশের সন্তান, একথা তাঁর মুখে দিনের মধ্যে সাত-বার শুনি। তোমার কাছ থেকে মেয়ের অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাব শুনলে বাবা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। তারপর একটা বিশ্রী রাগারাগি হবে। হয়তো ভীষণ চটে গিয়ে তোমাকে অপমান করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন। দাদা-বৌদি, ঝি-চাকর, বাইরের লোকেদের সামনে আমাকে নিয়ে এমন একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী কিছুতেই হতে দিতে পারব না।'

কিরণ বলল,—'শুরুতে আপত্তি করলেও পরে হয়তো তোমার কথা ভেবে উনি রাজি হতে পারেন। আর এমনি তো ঘটে। প্রথম দিকে কারো মা-বাবাই এই ধরনের বিয়েতে রাজি হতে চান না। পরে ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করে মত দিতে হয়।'

রীতাবরী অবসন্ন রোদ্দুরের মত ম্লান হাসল। —'তুমি আমার বাবাকে চেন না। ভীষণ জেদী আর গম্ভীর। তাকে আমরা বরাবর দূরের মানুষ বলে জানি। বাবার স্বভাব ঠিক পাহাড়ের মত। অটল, অনড়। তাঁর কথায় কিছুতেই নড়চড় হবে না। একবার কোনো বিষয়ে না বললে তাকে আমরা মত বদলাতে দেখিনি।'

কিরণ ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'তাহলে উপায় কি হবে? আমাকে বিয়ে করলে বাবা বোধহয় কোনোদিন তোমার মুখদর্শন করবেন না।'

—তার জন্যে দুঃখ নেই।' রীতাবরী পরিষ্কার বলল। 'আমি পরে চিঠি লিখে তাঁকে সমস্ত কিছু জানিয়ে আশীর্বাদ চাইব। যদি ক্ষমা করে উত্তর দেন, তাহলে তোমার সঙ্গে ফের ও বাড়িতে ঢুকতে পারি না হলে আর প্রয়োজন নেই। আমি জানব বাপের বাড়ির দরজা আমার জন্য চিরদিন বন্ধ হয়ে গেছে।'

কিরণ কোনো কথা বলল না। সে চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিল।

রীতাবরী জিজ্ঞাসা করল,—'আমাদের কথা বাড়িতে বলেছ নাকি?'

কিরণ মাথা নাড়ল। 'আগে বলিনি রীতাবরী! কিন্তু জানিয়ে রাখলে বোধহয় ভালো হত। আসলে ঠিক এই মুহূর্তে মা আর বাবার কাছে তোমার কথা বলতে একটু অসুবিধে আছে আমার।'

—'অসুবিধে?' রীতাবরী সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। কিরণের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল,—'অসুবিধে কিসের? এ বিয়েতে কি তোমার মা বাবা আপত্তি করবেন?'

—'না, না। আপত্তি করবেন কেন? ওসব কিছু নয়।' কিরণ চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে তাকাল। 'মুস্কিল হয়েছে আমার সেই ভাইকে নিয়ে। যার কথা তোমাকে সেদিন বলেছিলাম।'

রীতাবরী ঈষৎ দুশ্চিন্তার ভাব করে বলল,—'কেন, কি হয়েছে তার? তুমি তো বলছিলে হিরু মানে তোমার ছোট ভাই খুব ভালো ছেলে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে তার নাম দেখলে তুমি আশ্চর্য হবে না।'

—'হ্যাঁ। পরীক্ষায় বসলে হয়তো সে রকম কিছু হতে পারত। কিন্তু এখন তার কোনো সম্ভাবনা নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিরণ বলল, 'হিরু বাড়ি থেকে চলে গেছে রীতাবরী।'

—'চলে গেছে? কোথায়?' বিস্ময়ে তার চোখ দুটি বেশ বড় দেখাল।

—'ঠিক জানি না। তবে বাড়িতে একটা চিঠি লিখে গেছে। সে গ্রামে যাচ্ছে... কোথায় কোন গ্রামে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।'

রীতাবরী চুপ করে শুনছিল। টেবিলে আহার্য সব পড়ে। মামলেট কেউ মুখে দেয় নি। কিরণ শুধু একটা টোস্টে কামড় দিয়েছিল মাত্র। কেমন করে খাবে? আড়ালে বসে কে যেন একটা বিষণ্ন সুরের রাগ বাজিয়ে চলেছে। সেই সুর সমস্ত ঘরময়, এই গ্রীলের ভিতর, বাতাসের মত বার বার তাদের দুজনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে।

কিরণ মুখ নীচু করে বলল—'মুস্কিল হয়েছে ভাই। হিরু চলে যাবার পর মা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। সবই করে....নাওয়া, খাওয়া ঘুমোন কিছুই বাদ নেই। তবু মায়ের মুখের দিকে যেন তাকান যায় না। আমি বুঝতে পারি দেহের ভিতরে রোগ যখন ছড়িয়ে পড়ে, বাইরে থেকে তা ধরবার উপায় নেই। মায়ের অবস্থা ঠিক তাই। মনের ভিতরে ঘুণ ধরেছে। তিলে তিলে মা নিঃশেষ হচ্ছে, অথচ কাউকে একটি কথাও বলবে না। শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে। কখনও নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়।'

—'আর তোমার বাবা?' রীতাবরী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

—'তাঁর অবস্থাও কিছু ভালো নয়। আগে বাবা বেশ শক্ত মানুষ ছিলেন। কথা-বার্তা কম বলতেন। ছোটখাটো ব্যাপারে আদৌ মাথা গলাতেন না। কিন্তু ইদানীং তিনি বেশ দুর্বল। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে প্রায়ই একটা ব্যথা অনুভব করেন। আর মাঝে মাঝে পাগলের মত অর্থ-হীন ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, —ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টা বাজছে কিরণ। শুধু হিরু নয়, আমাদের সকলকেই এবার যেতে হবে।'

রীতাবরীকে রীতিমত হতাশ দেখাল। সে মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে রইল।

কিরণ তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি নিজের করতলে টেনে নিয়ে বলল,—'তুমি বিশ্বাস কর রীতাবরী। এই মুহূর্তে আমার বড় অসহায় অবস্থা। বাড়ির কথা তো শুনলে? হিরু চলে গেছে। সামনের শনিবার সন্ধ্যের প্লেনে দাদা আমেরিকায় উড়বে।... আর কিছু দিনের মধ্যে বাবা রিটায়ার করে দেশে যাবেন। আমাদের আমির বারিক লেনের বাড়িতে এখন ভাঙনের সুর শুনতে পাই। মায়ের মলিন মুখ...শ্রীহীন রুক্ষ বেশ। বাবা ভীষণ নিস্তেজ আর মনমরা। ঠিক এই অবস্থায় মা-বাবার কাছে নিজের বিয়ের কথা বলতে আমার খুব লজ্জা আর দ্বিধা বোধ হচ্ছে।'

রীতাবরী খুব আস্তে আস্তে তার হাতের আঙুলগুলি কিরণের মুঠোর মধ্য থেকে বের করে নিল। মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করল,—'আমি তাহলে এখন কি করব বল?'

—'তুমি একটু অপেক্ষা কর রীতাবরী। আমাকে কিছু দিন সময় দাও।'

—'সময়?'

—'হ্যাঁ। বেশী দিন নয়। মাত্র দু মাস। এই কটা দিন আমার বড় প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত জানি তার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে যা দেরি। তারপর মা-বাবা দুজনেই অনেকখানি স্বাভাবিক হবে। আর ইতিমধ্যে আমিও কিছুটা প্রস্তুত হতে পারি।'

—'তুমি বলো এখন প্রস্তুত নও কিরণ?' রীতাবরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

কিরণ আবার হেসে বলল,—'প্রস্তুত আছি এই মুহূর্তে সেকথা কেমন করে বলি? তুমি তো সবই জান রীতাবরী। এই বিয়েতে তোমার মা-বাবার সম্পূর্ণ মত। আর আমাদের বাড়ির পরিস্থিতি তো শুনলে। বিয়ে [illegible] কোথায় [illegible] বলতে পার?' একটু থেমে সে আবার [illegible] শুরু করল,—'আমার মনের ইচ্ছে তোমাকে কত দিন বলেছি। একটা দু-কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট। সাউথ ক্যালকাটায় কিম্বা কাছাকাছি কোনো স্থানে। আমরা দুজনে মিলে সুন্দর করে বাড়িঘর সাজাব। কিন্তু তার জন্যেও কিছু দিন সময় দরকার। এখনও তেমন ফ্ল্যাট জোগাড় করা হয় নি।'

রীতাবরী হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,—'আমার দেরি হয়ে গেছে। এখন যাই তাহলে।'

কিরণ একটু অবাক হল। সে ভুরু কুঁচকে বলল,—'এখনই যাবে? তুমি তো কিছুই খেলে না।'

—'ভালো লাগছে না খেতে।' রীতাবরী আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিয়ে কিরণ ওর পিছু পিছু রাস্তায় এসে নামল। কিন্তু রীতাবরী যেন খুব ব্যস্ত। পথের ধারে একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল। সে কিছু না বলে তাতে উঠে বসল। সব বুঝেও কিরণ বোকার মত প্রশ্ন করল,—'তুমি বোধ হয় রাগ করলে রীতাবরী, তাই না?'

—'হ্যাঁ। এই তো রাগ করবার সময়।' রীতাবরী ঠোঁট টিপে বিচিত্র একটি ভঙ্গি করল। ফের বলল,—'আমি বুঝতে পারছি কিরণ। এখন তোমার অসুবিধে,—খুব অসুবিধে। বোকার মত আমি শুধু নিজের কথা ভেবেছি। তোমার দিকে একবারও তাকিয়ে দেখিনি।'

—'দু মাস খুব বেশী দিন নয়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে রীতাবরী।'

—'হ্যাঁ। নিশ্চয় কেটে যাবে।' রীতাবরী প্রায় ফিস ফিস করে বলল। 'দিন কি কারো জন্য অপেক্ষা করে কিরণ?'

—'আবার কবে দেখা হবে? তুমি কোথায় অপেক্ষা করবে কিছুই তো বলে গেলে না—'

—'দেখি। একটু ভেবে দেখি কিরণ। আমি কোথায় অপেক্ষা করব এখনই কিছু জানাতে পারছি না।' রীতাবরী ঠিক হেঁয়ালীর মত কথা কইল। ফের কিরণের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল,—'তোমাকে চিঠি লিখব। তাতেই সব জানবে—।'

রিকশা চলতে শুরু করল। চারপাশে কোলাহল। শুধু রীতাবরী পিছন ফিরে একটু অলসভাবে হাত নাড়ছিল। একটা রং-রেখার সুন্দর ছবির মত দেখাচ্ছিল তাকে। খানিকটা দূরে যেতেই সে আবার সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

ট্রাম লাইনের পাশে কিরণ বিবর্ণ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনটা এখন সীসের মত ভারী। আজকের অভিজ্ঞতা তাকে বেশ পীড়া দিচ্ছিল। রীতাবরী তাকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে বলে নি। অথচ কিরণ সেজন্য তৈরী ছিল। এখন তার হাতে কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে করলে সে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারত। কিরণ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিল। শেষ পর্যন্ত রীতাবরী কি [illegible]

আজ [illegible] থিয়েটার। ফাংশনে [illegible] সেই ভদ্রলোক [illegible] গাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু [illegible] ব্যাপার নিয়ে তার দাদা ভীষণ ব্যস্ত। সকাল-বিকেল ছুটোছুটি করছে। আর মা-বাবা? হিরু চলে যাবার পর তাদের মনে শান্তি নেই। ফাংশন শুনবার মত [illegible] মনের অবস্থা নয়।

বিনীত তাকে [illegible] বলেছিল,—'মেজদা তুমি যেও। সঙ্গে যাবে [illegible]। নইলে ওরা কি ভাববে? আমাদের বাড়ি থেকে কেউ না গেলে—'

কিরণের তাই ইচ্ছে ছিল। রীতাবরীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সে নিশ্চয় বিনীতর থিয়েটার দেখতে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভীষণ অবসন্ন লাগছে তার। মনমর্জি জংধরা লোহার মত অকেজো। এখন ফাংশন কেন, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। বরং একা একা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলে তার ভালো লাগবে। একটা এসপ্ল্যানেডগামী ডবল-ডেকার বাস ক্রসিংএর মুখে দাঁড়িয়ে। মোটামুটি ফাঁকা। কিরণ লম্বা লম্বা পা ফেলে বাসটা ধরবার জন্য এগোল।

* * *

রাত্রে নটায় ফাংশন শেষ হল। বিনীত যখন গাড়িতে উঠল, তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে। রতীশ বলল,—'তবু অনেক তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম শুরু হতেই সাতটা বেজে যাবে।'

গাড়ির সীটে বসে বিনীত উসখুস করছিল। তার গালে, মুখে, ঠোঁটের উপর রঙ। কপালে টিপ। ভালো করে মেক-আপ তুলতে গেলে অনেক দেরি। তাই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। মুখের উপর বার দুই তিন রুমাল ঘষে বিনীত প্রশ্ন করল,—'থিয়েটার কেমন হল? সবাই কি বলছিল আমাকে বলবে না?'

—'আহা! নিজের প্রশংসা শুনতে বুঝি খুব ইচ্ছে করছে?' রতীশ বাঁকা চোখে তাকাল।

—'ধ্যেৎ! আমি কি তাই বলছি?' বিনীত লজ্জা পেল।

রতীশ হেসে বলল,—'তোমার নাচের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। আগে শুধু আমি ভালো বলতাম। তুমি একদিন বড় শিল্পী হবে। অনেক নাম,...যশ,...খ্যাতি। এই কলকাতায় তোমার নাচ হবে শুনলে হলে আর লোক ধরবার জায়গা থাকবে না। তখন আমার কথা গ্রাহ্য করতে না। এখন কত লোক তারিফ করছে। এবার নিশ্চয় তুমি বিশ্বাস করবে।'

—'তোমার কথা কি আগে অবিশ্বাস করেছি?' বিনীত প্রায় হেলে পড়ে তার মাথাটা রতীশের কাঁধের উপর রাখল। কয়েক সেকেন্ড পরে সে বলল,—'আচ্ছা, তুমি নাকি খুব শীগগির বিলেত যাবে?'

—'কে বলল তোমাকে? মিলি নিশ্চয়?'

—'হ্যাঁ।' বিনীত স্বীকার করল। 'কিন্তু কথাটা সত্যি কিনা বল?'

—'ঠিক সত্যি বলা চলে না।' রতীশ ঢোক গিলল। ঠোঁটের উপর জিভটা বুলিয়ে ফের সচল করে নিল। বলল,—'বাবার তাই ইচ্ছে। অনেকদিন থেকেই কথাটা হচ্ছে। আমি এবার লন্ডনে গিয়ে একটা কোর্স কমপ্লিট করি। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। কি হবে বিদেশে গিয়ে? ইন্ডিয়াতে কি ডিগ্রী মেলে না?' কথা শেষ করে সে ধূর্ত শিয়ালের মত মুচকি হাসল।

বিনীত আড়চোখে তাকিয়ে বলল,—'আমার কথা মনে রেখ রতীশ। তোমার সঙ্গে অনেকদূরে এগিয়েছি। এখন ডুবজলে দাঁড়িয়ে রইলাম। তোমার হাত ধরে ভাসতে ভাসতে ওপারে যেতে পারি। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিলে আর পথ নেই। জলে ডুবে মরতে হবে।'

একটা জনহীন স্বল্পালোকিত জায়গায় রতীশ হঠাৎ গাড়ি থামাল। বিনীত কিছু বলবার আগেই সে বাঁ হাত বাড়িয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে

প্রায় জাগুলীর মত ভঙ্গীতে তাকে আরো কাছে টেনে আনল।

বিন্তি অস্ফুট চিৎকার করে বলল,—এই ছেড়ে দাও। লাগছে আমার—'

রতীশ কোনো কথা বলল না। সে একটু জোর করে এবং কিছুটা কৌশলে বিন্তিকে কোলের উপর আধশোয়া অবস্থায় ফেলে তার মুখে, গালে, ঠোঁটের উপর অনবরত চুমু খেতে শুরু করল।

খানিকটা ধস্তাধস্তির পর বিন্তি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্তির সংগে বলে উঠল,—'কি যে কর। এমন রাগ হয় আমার—'। তারপর রতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে হেসে ফেলল। বলল,—'কেমন জব্দ! মুখে গালে রঙ লেগে এবার বেশ সঙের মত দেখাচ্ছে।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রতীশ বলল,—'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার সেই মাসী কলকাতায় আসছে।'

—'তাই নাকি? কোন মাসী বল তো? সেই যিনি খুব ফেমাস? এখান থেকে তেরশ মাইল দূরে থাকেন?'

—'হ্যাঁ। সামনের শনিবার মাসী আসছে। মোটে তিনদিন থাকবে। আমাকে রবিবার সকালে দেখা করতে বলেছে। তুমি যাবে নিশ্চয়?'

—'কোথায় যেতে হবে?'

—'কেন, গ্র্যান্ড হোটেলে। যেখানে মাসী এসে ওঠে।'

বিন্তি সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল,—'তোমার মাসী হোটেলে ওঠেন কেন? নিজেদের বাড়ি নেই? তাহলে আত্মীয়-স্বজন কিম্বা জানাশুনো কারো বাড়িতে উঠলেই পারেন।'

—'হুম। তাহলেই হয়েছে।' রতীশ রহস্য করে বলল। 'মাসীকে বেরোবার রাস্তা করে দিতে শ'খানেক পুলিশ ডাকতে হবে।'

—'পুলিশ?' বিন্তি একটু ভয় পেল। 'তোমার মাসীকে বেরোবার সময় পুলিশ ডাকতে হয় নাকি?'

—'না, না, ডাকতে হবে কেন? প্রয়োজন বুঝলে পুলিশ এমনিই থাকে।' রতীশ হেসে জবাব দিল। সে ফের বলল,—'বেশ তো। রবিবার সকালে মাসীর সংগে আলাপ কর। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।'

অমিয় বারিক লেনের মুখে গাড়ি থেকে নেমে বিন্তি তাড়াতাড়ি গলিতে ঢুকল। এত রাত্তির। একা একা হাঁটতে বেশ ভয় ভয় লাগে। তাদের বাড়ি থেকে কেউ থিয়েটার দেখতে যায়নি। বিন্তি আশা করেছিল, তার মেজদা হয়তো যাবে। কেন গেল না কে জানে? গলিটা একেবারে ফাঁকা......জনহীন। বিন্তি বড় বড় পা ফেলে বাড়ির দিকে হেঁটে চলল।

• • •

সন্ধ্যে সাতটার অনেক আগেই ওরা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছল। আজ দুপুর থেকে মনোরমা আবার চোখের জল ফেলছে। হিরুর নাম করে সে নিঃশব্দে কাঁদছিল। পনের দিন হল ছেলে বাড়ি থেকে নিখোঁজ। এখনও তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি। অথচ তাই নিয়ে কি কারো দুর্ভাবনা আছে?

কিরণ একবার বলল,—'মিছামিছি তুমি কেঁদে কি করবে? হিরু তো তোমাকে জানিয়ে গেছে মা। সে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে। গ্রামের কুঁড়েঘরে নিঃসম্বল মানুষগুলির মধ্যে। একদিন সেখান থেকেই দলে দলে আবার শহরে এসে ঢুকবে।'

সান্ত্বনার কথা শুনলে মনোরমার কান্না আরো বাড়ে। গলা বন্ধ হয়ে আসে। চোখ দুটি ছলছলে দেখায়। বড় বড় জলের ফোঁটা টলমল করে। আর কিরণের এসব কথার কোনো মানে আছে? ছেলেটা দু-ছত্র লিখে গেছে বলেই কি বাড়িশুদ্ধ লোক নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে? কোথায় কোন গ্রামে সে পড়ে রইল? সেখানে কি খায়? এই ঠাণ্ডায় লেপ-কম্বল দূরে থাকুক, একটি শীতবস্ত্রও হিরু সংগে নেয় নি। এরপর মনোরমা কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকে? শীতের রাত্তিরে লেপ মুড়ি দিয়ে আরামে চোখ বন্ধ করতে পারে?

হিরু চলে যাবার পর বাণীব্রত বড় বেশী অস্থির। চোখেমুখে ভরসা নেই।...... বিকেলের মরা আলোর মত নিস্তেজ দৃষ্টি। মাঝেমাঝে সেই এক বুলি। ঘণ্টা বেজেছে। আর সময় নেই রে। হিরু চলে গেল। এবার আমাদেরও সব দিকে দিকে যেতে হবে। তৈরি হতে শুরু কর। ট্রেনের বাঁশী কখন বাজবে বুঝতেই পারবে না।

সকালবেলায় বাণীব্রত খুব সেন্টি-মেন্টাল হয়ে পড়েছিলেন। মিলনকে কাছে ডেকে তার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,—'তোর সংগে বোধহয় আর দেখা হবে না রে খোকা। শরীরের অবস্থা তো বুঝতে পারছি। ভিতরে ঘুণপোকা কুরে কুরে খাচ্ছে। কবে আছি, কবে নেই। আমেরিকায় বসে হয়তো একদিন খবর পাবি বুড়ো বাপ নক্ষত্রের দেশে রওনা হয়েছে!'

মিলন জানে তার বাবার মন ভেঙে গেছে। আর জোড়া লাগবে না। এই কদিনে

যেন বেশ রোগা হয়ে গেছেন বাণীব্রত। কণ্ঠার হাড় দুটো বিশ্রী প্রকট। দৃষ্টি বিষণ্ণ। বাবার হাত ধরে সে বলল,—'তোমার অত অনর্থক চিন্তা, আমি কি চিরকাল বিদেশে থাকতে যাচ্ছি? দু-বছর কিম্বা তিন বছর পরে আবার ফিরে আসব। আর এই কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

অপরেশ প্রায় শেষ সময়ে এসে পৌঁছল। মিলনকে দেখে সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, —'বাঃ! নতুন স্যুটটায় গ্র্যান্ড দেখাচ্ছে তোকে।' তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল,—'দেখিস, এলসী বৌদি আবার না তোর প্রেমে পড়ে যায়।'

—'যাঃ! কি যে বলিস, তোর নিজের বৌদি। মুখের যদি এতটুকু আগল থাকে।'

পরিচয় পেয়ে মনোরমা একগাল হাসল। —'ওমা! তোর সেই বন্ধু? কি সুন্দর চেহারা। ঠিক রূপকথার রাজপুত্তুরের মত।'

মিলন আশা করে নি। কিন্তু অপরেশ তার মা-বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। মনোরমা ওর চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ জানাল। মুখে বলল, 'বেঁচে থাক বাবা। তোমার কাছে আমরা বড় ঋণী। মিলুর জন্য তুমি অনেক করেছ। চিরদিন তা মনে রাখব।'

যাবার বেলায় বিন্তি কাঁদতে লাগল। মিলন তাকে আদর করে বলল,—'এই মুখ-পুড়ী, কাঁদছিস কেন? তোর জন্যে কি আনব বল? টেপ-রেকর্ডার, ক্যামেরা না টেরিকটনের শাড়ি?'

তবু বিন্তির চোখের জল থামল না।

মিলন আবার বলল,—'বোকা মেয়ে! কাঁদিস নে। মা-বাবাকে দেখবি। তারপর ভালো করে নাচ শিখে তুইও একদিন আমেরিকা যাবি।'

বিদায় বেলার মুহূর্তগুলি বড় করুণ আর বিষণ্ণ হয়। সুখ-দুঃখের যে সকল অনুভূতি এতকাল ভোঁতা ছিল, সেগুলি হঠাৎ স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। গলা বুজে আসতে চায়। নয়ন ছলছল করে।

মনোরমা তাই আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল। এতকাল ধাড়ি মুরগীর মত সে ছেলেমেয়েদের আগলে রেখেছিল। এখন তারা বড় হয়েছে। একজন উড়ে গেছে। হিরু পালিয়েছে। মিলন আজ চলল। বাকি শুধু কিরণ আর বিন্তি।

নিয়মমাফিক [illegible] চেকিং ইত্যাদির পর [illegible]। তারপর মস্ত একটা ঈগলো পাখির মত বিমান আকাশে উড়ল। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর রূপ সুন্দরী নারীর মত। অচেনা, মোহময়। আকাশের বুকে জোনাকী বারবার লাল আলো, নীল আলো জ্বালিয়ে তবে বিমানটা কোথায় অদৃশ্য হল।

* * *

হোটেলের কাছে এসে বিন্তি খুব অবাক হল। আর রতীশ যা বলেছিল সব ঠিক। এত সকালেও দরজার কাছে কি ভিড়। অন্তত আট-দশ জন পুলিশ তাদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। নিশ্চয় হোটেল থেকে বেরুতে দেরি হবে। তাকে এক পলক চোখে দেখার জন্য মানুষগুলো তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রতীশ বলল, —'তাড়াতাড়ি চল। আটটা বেজে গেছে। এরপর মাসী আবার বেরিয়ে যাবে।'

—'হোটেলের দরজার কাছে এত ভিড় কিসের?' বিন্তি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। 'তোমার মাসীকে দেখবার জন্য এরা এসেছে নাকি?'

প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই যেন রতীশ মুচকি হাসল। পরে বলল,—'আগে মাসীকে দেখবে চল। তখন তোমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

স্লিপ পাঠাতেই বেয়ারা এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে বিন্তি প্রায় হতভম্ব। তার সামনে দাঁড়িয়ে ইনি কে? প্রথমটা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কেমন যেন ওলটপালট ঠেকছে। তারপর মগজটা ধীরে ধীরে আবার পরিষ্কার হয়ে এল।

এবার সে বুঝতে পারল। রতীশ তাকে মিথ্যে বলে নি। তার মাসীকে সে চেনে বৈকি। শুধু সে নয়। এই কলকাতায় কত লোক চিনবে। তার কথা বলা, চলাফেরা, গান গাওয়া, সব বিন্তির পরিচিত। এতবার দেখেছে। কখনও ভুল হতে পারে?

চিত্রতারকা মধুমিতা সেন তাকে দেখে মিষ্টি হাসল। বলল,—'তোমার নাম বিন্তি, তাই না? রতীশ আমাকে চিঠিতে সব লিখেছে। তুমি খুব ভালো নাচতে পার।' ফের চোখের একটি সুন্দর ভঙ্গিমা করে প্রশ্ন করল,—'তারপর বড় হয়ে কি করবে? আমার মত সিনেমায় নামবে নাকি?'

বিন্তি কোনো জবাব দিল না। সে লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল।

রতীশের মাসীর সময় ছিল না। ব্যস্ত নায়িকা। সকাল নটা থেকে স্যুটিং চলবে। আজ আবার কাল। দুদিনই মাল বোঝাই নৌকোর মত প্রোগ্রামে ভারী। পরশু সকালে আবার বোম্বাই ফিরতে হবে। দু দণ্ড বসে গল্প করবার সময় কোথায়?

মিনিট পাঁচ পরেই মধুমিতা উঠল। বলল,—'ভেরি সরি। আজ আর সময় নেই রতীশ। তোর মাকে বলিস এর পরের বার মাসী নিশ্চয় দেখা করবে।'

—'হ্যাঁ, তুমি আবার দেখা করো।' রতীশ প্রায় অভিমানের ভঙ্গিতে জানাল।

মধুমিতা তাদের দুজনের গাল টিপে আদর করল। চোখ নাচিয়ে বেশ মজা করে বলল,—'দেখ, তোমরা দুজনে মিলে আবার যেন একটা সিনেমার কাহিনী তৈরি করে বসো না।'

তারপর [illegible] জলতরঙ্গের সুরেলা আওয়াজের মত খিল খিল করে হেসে উঠল।

আরো কুড়ি পঁচিশ দিন পার। বাড়িতে গোছগাছ শুরু হয়েছে। এতদিনের সংসার। জিনিস তিলে তিলে জমে উঠেছে। টুকিটাকি নানা জিনিসপত্র। অনেককাল ধরে সব সংগ্রহ করেছে। সার্কাসের তাঁবু নয়। যে একদিনেই মনোরমা সব গুটিয়ে ফেলবে।

ডিসেম্বরের শেষে বাণীব্রত চন্দননগরে যাবেন। চাষীকে চিঠি লেখা হয়েছে। উঠোনের আগাছা, বুনো ঝোপজঙ্গল কেটে সে যেন ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখে।

ক'দিন ধরে কিরণ খুব চিন্তিত। রীতাবরী তাকে চিঠি লিখবে বলেছিল। কিন্তু মাসখানেক হতে চলল, তার কোনো খবর নেই। কিরণ একদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল। খোঁজখবরের আশায়। কিন্তু সে কাউকে চেনে না। কার কাছে রীতাবরীর খবর জানতে চাইবে? তবু বুদ্ধি করে অফিসের কেরানীবাবুর কাছে খোঁজ নিয়েছে। কিন্তু সে সংবাদও খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। রীতাবরী নাকি বেশ কিছুদিন হল ক্লাসে আসছে না। প্রায় পনের-কুড়ি দিন? হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিম্বা আরো দু-পাঁচদিন বেশী। ক্লাসের রোলকলের খাতার উপর একনজর বুলিয়ে কেরানীবাবু তাকে পরিষ্কার উত্তর দিল।

অঘ্রাণের সকাল। ক'দিন হল শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। রোদ্দুরে পিঠ রেখে কিরণ চিন্তা করছিল। তার এখন কি করা উচিৎ? দু-একদিনের মধ্যে সে রীতাবরীর বাড়ি যাবে নাকি? এ ছাড়া উপায় নেই। যা সেণ্টিমেণ্টাল মেয়ে। নিশ্চয় তার উপর রাগ করে ঘরে বসে আছে।

অবশ্য রীতাবরী নিষেধ করেছে। তার বাবা ভীষণ রাগী। সব শুনে হয়তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিরণকে দুটো অপমানের কথা হজম করতে হতে পারে। তবু সে তৈরি। ভীরুর মত লেজ গুটিয়ে বসে থেকে লাভ নেই। যা হয় হবে। কিন্তু রীতাবরী এবং তার পরিচয় ও সম্পর্কের কথা জোর গলায় জানাতে সে দ্বিধা করবে না।

মনোরমা হঠাৎ তার কাছে এসে বলল, —'ও কিরণ! শোন বাবা, তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।'

চোখ তুলে কিরণ অবাক হল। কথা বলতে গিয়ে মায়ের ঠোঁট দুটো অমন থরথর করে কাঁপছে কেন? মা কি আবার কিছু দেখল? হিরুর বিছানার তলায় চকচকে ছোরাটা দেখতে পেয়ে মা ঠিক অমনি কেঁপে উঠেছিল না?

মনোরমা ফিস ফিস করে বলল,—'তুই তো ডাক্তার। বিন্তিকে একটু দেখবি? মানে ওর শরীরটা—'

কিরণ ভুরু কোঁচকাল। মা যেন কি ইঙ্গিত করছে। অথচ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারছে না।

—'কি হয়েছে বিন্তির?' কিরণ প্রশ্ন করল। আজ সকালে সে বাথরুমে বসে বমি করছিল দেখলাম। ওর অম্বল-টম্বল হয়েছে নাকি?'

—'নারে বাবা। বোধহয় সর্বনাশ হয়েছে।' মনোরমা দাঁত কিড়মিড় করে কান্না চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'পোড়ারমুখী আমাদের সকলের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা : টাকার দাম

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

কোন জিনিস কিনতে যে পরিমাণ টাকা লাগে তা হল সেই জিনিসের দাম। তেমনি টাকার বিনিময়ে যে পরিমাণ জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় টাকার দাম। সুতরাং টাকার বিনিময়ে বেশী জিনিসপত্র পাওয়া গেলে টাকার দাম বাড়ে, আর জিনিসপত্র কম পাওয়া গেলে টাকার দাম কমে।

ইতিহাস থেকে

এই অতি সাধারণ তত্ত্ব মোটামুটি সকলেরই জানা। অর্থনীতির ছাত্রেরা এটাও জানে যে টাকার দাম কতটা বাড়ল বা কমল তার হিসাব করা হয় সাধারণ ভোগ্যপণ্যের গড় দাম কতটা কমল বা বাড়ল তা থেকে। কিন্তু এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে টাকার দাম বা ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে। ইংল্যান্ডে চোদ্দ শতকে মাত্র কয়েক পেন্সের বিনিময়ে একটি গরু বা ভেড়া পাওয়া যেত। আমাদের দেশে ঐ সময়ে শেখ নাসিরুদ্দিন চিরগের খইরুল মজলিস (১৩৫২-৫৩ সালে লেখা) থেকে জানা যায়, কীমৎ (দাম) এত কম ছিল যে এক তঙ্কায় একটা বিরাট ভোজ দেওয়া যেত। তঙ্কা হল রুপোর টাকা এবং পঞ্চাশটি তাম্র মুদ্রার সমান।

মুঘল আমলেও টাকার দাম প্রায় ঐ রকম ছিল। হুমায়ুননামায় আছে যে আকবরের সময় এক টাকায় চারটে ছাগল পাওয়া যেত। আর সায়েস্তা খাঁর আমলের বাংলাদেশের ত' কথাই নেই, এখনও তা কিংবদন্তী হয়ে আছে। আওরংগজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের ব্যয়ভার বহন করত সম্রাটের মাতুল সুবেদার সায়েস্তা খাঁর শাসনাধীন বাংলাদেশ। সুবেদার সাহেব বাংলাদেশ থেকে সোনা রুপো সংগ্রহ করে, গালিয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করতেন বলে টাকার পরিমাণ এত কমে গিয়েছিল যে জলের দামে জিনিসপত্র পাওয়া যেত—চালের দাম ছিল টাকায় আট মণ।

এইভাবে এক এক সময় টাকার দাম বেড়ে গেলেও শতাব্দীর ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায়, এক শতক থেকে আর এক শতকে ঐ দাম কমেই চলেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত এও হল ইতিহাসের অন্যতম লিখন, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় তখনই যখন টাকার দাম অস্বাভাবিক পরিমাণে এবং দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে বা কমতে থাকে।

এই শতকেরই দ্বিতীয় দশকের শেষদিক থেকে অভূতপূর্ব মন্দার জন্যে টাকার দাম অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে যাচ্ছিল—অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম অবিশ্বাস্যভাবে হ্রাস পাচ্ছিল। এর দরুন পৃথিবীর সব ধনতান্ত্রিক দেশেই কল্পনাতীতভাবে উৎপাদনের হ্রাস ঘটেছিল। যা উৎপন্ন হত তারও ক্রেতা ছিল না। চাহিদার অভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু পরিমাণ শস্য সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছিল। উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার বেকারে সব দেশই ছেয়ে গিয়েছিল এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ফলে অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে বহু লোকের সারাজীবনের সঞ্চয় নষ্ট হয়েছিল। এই সবের দরুন দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাজনৈতিক গোলযোগ লেগেই ছিল। অনেকেরই মনে হয়েছিল যে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চলেছে—ধনতন্ত্রের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।

আজ অবশ্য এইভাবে টাকার দাম বৃদ্ধির কথা আর কল্পনা করা যায় না। এ যদি ঘটে তবে ঘটবে অতি দীর্ঘকালে—যে দীর্ঘকালে, কেইনসের ভাষায় : উই আর অল ডেড। সুতরাং আজকের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামান যাক।

আজকের দিনের সমস্যা ঠিক বিপরীত প্রকৃতির—টাকার দাম দ্রুত হ্রাসের সমস্যা। এ সমস্যা মোটামুটি সমগ্র সভ্য জগৎকেই প্রপীড়িত করছে। সমস্যাটি যে, আশংকা নয়, আতংকের কারণ হয়ে উঠতে পারে, এ শিক্ষা সভ্যজগৎ লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানী থেকে। কিরকম শিক্ষা লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাক।

১৯২৩ সালের জার্মানী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আধ দশক আগে শেষ হয়ে গেছে। জার্মানীর স্কন্ধে যুদ্ধের ব্যয়ভারের বিপুল বোঝা, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যাহত এবং সরকারী আয়-ব্যয় পদ্ধতিতে বিশৃংখলার চূড়ান্ত।

একজন মার্কিন পর্যটক এসেছেন জার্মানী বেড়াতে। ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকের এক বড় হোটেলে ঢুকে তিনি দেখেন রিসেপশান কাউন্টারে বড় বড় হরফে নোটিশ ঝোলান : মার্কে পেমেন্ট নেওয়া হয় না। মার্ক জার্মানীর নিজস্ব প্রশাসনিক মুদ্রা। সুতরাং এইরকম নোটিশে অবাক হবারই কথা। পর্যটক ভদ্রলোক কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য হননি, কারণ ব্যাপারটা তিনি কিছুটা জানতেন। সম্পূর্ণ হতবাক হলেন পরের দিন।

সকালে উঠে তিনি হোটেলের পাশের ডাকঘরে গিয়েছিলেন বার্লিনে এক বন্ধুর কাছে একটা ছোট পার্সেল পাঠাবার জন্যে। ডাক-মাশুল শুনে চক্ষু একেবারে চড়কগাছ। কত কল্পনা করতে পারেন? ইংরেজীতে যাকে বলে একটা অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ফিগার—১০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক। হতবাক হয়ে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দেখে পার্সেল ক্লার্কটিই পথ বাতলে দিল : কোন বৈদেশিক কারেন্সী থাকলে বিনিময়ে করে আনুন না কেন। না হয়, ঐ কারেন্সী আমাকেই দিন, আমিই ব্যবস্থা করছি।

পর্যটক ভদ্রলোক কি করেছিলেন তা লেখেন নি।

এর মাত্র কয়েকদিন আগে একজন ইংরেজ পুস্তক-ব্যবসায়ী লাইপজিগে এসেছিলেন জার্মানীতে প্রকাশিত বই ইংল্যান্ডে আমদানির ব্যাপারে ওখানকার এক প্রকাশকের সংগে চুক্তি সম্পাদন করবার জন্যে। চুক্তিপত্রের খসড়া পড়ে ইংরেজ পুস্তক-ব্যবসায়ী দেখেন যে মার্কে নয়, ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ডেই টাকা মেটানর কথা লেখা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই জার্মান প্রকাশক খোলাখুলিই বললেন : আজকাল মার্কে কেউ আর চুক্তি সম্পাদন করে না—আভ্যন্তরীণ চুক্তিও নয়, বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি ত' দূরের কথা। মার্কের দাম যে হারে কমছে তাতে দুদিন পরে লোকে হয়ত মার্ক নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকারই করবে।

জার্মান প্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা মার্কের বাজারে কোন দামই রইল না। বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবাই মার্ক নিতে অস্বীকার করতে লাগল। বড় বড় হোটেল দোকান ইত্যাদি ত' নোটিশই ঝুলিয়ে দিলে : মার্কে পেমেন্ট নেওয়া হয় না। আর ডাকঘরের মত সরকারী সংস্থাগুলো মাশুল ইত্যাদির জন্যে মার্কে অযুতলক্ষ নিযুতকোটির সংখ্যা হাঁকতে লাগল।

এরই কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে বেরিয়েছিল। একদিনে নাকি বিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। যা তখনকার দিনে ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় যা পাওয়া গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর।

এইরকম অবস্থায় কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে আর মার্ক বাতিল হয়ে যাবে, তা সহজেই অনুমেয়।

এর পরবর্তী ঘটনা হল রাষ্ট্রবিপ্লব! বহু লোকের সারাজীবনের সঞ্চয় নষ্ট হওয়ায়, বহু চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ায়—এক কথায় সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসাবে টাকার কোন কাজ না থাকায় জার্মানরা সেই নতুন মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তনের দাবিই করতে থাকে যা টাকার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আবার ফিরিয়ে আনবে। এর জন্যে শাসন ব্যবস্থারও যে পরিবর্তন প্রয়োজন, তাও তারা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিল। এবং এর ফলেই নাৎসী দর্শন ও হিটলারের অভ্যুত্থানের পথ সুগম হয়। তাই তৃতীয় দশকের মহামন্দার মত দ্বিতীয় দশকের জার্মানীর এই দৃষ্টান্তও সমগ্র সভ্যজগতের আতঙ্কের কারণ হয়ে আছে।

আমাদের টাকার দাম :

আমাদের টাকার দামও অতি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তবে আশংকাজনকভাবে কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে কিছুটা পরিসংখ্যান এবং কিছুটা তথ্যের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য, কারণ এটা হল পরি-

সংখ্যান ও তথ্যের যুগ—ঠিক অন্ধের যুগ নয়।

আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন ১৯৪৯ সালের তুলনায় এই '৭২ সালে টাকার দাম হল মাত্র ৪২·৪ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত তেইশ বছরে আমাদের টাকার ক্রয়ক্ষমতা ৫৮ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে। যদি এইভাবেও চলে—যদি আরও দ্রুত হ্রাস না পায়, তবে আগামী কুড়ি বছরের পর অবস্থা কি দাঁড়াবে তা ভাবতেও পারা যায় না। জার্মান মার্কের মত আমাদের টাকাও কি বাতিল হয়ে যাবে?

আগের কথা ছেড়ে দিলেও ১৯৫০ সাল থেকে টাকার দাম ক্রমেই কমছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ মোটামুটি প্রথম পরিকল্পনার সময় এই মুদ্রা হ্রাসের হার ছিল বছরে গড়ে এক শতাংশেরও কম। তারপর ঘটতে থাকে অকল্পিত হ্রাস। ১৯৫৬ এবং ১৯৬৬ সাল—এই দশ বছরের মধ্যে টাকার দাম ৪৮ শতাংশের মত কমে যায়। বাকিটুকু ঘটে পরবর্তী বছরগুলোতে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে এসে দেখা যায়, দ্রব্যমূল্য পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশী এবং আগস্ট মাসের হিসেবে ঐ অংক ৮ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

তার পরের নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি, তবে টাকার দাম যে আরও কমেছে, এ সকলেরই অনুভূত সত্য। সুতরাং আতংকের আশু কারণ না থাকলেও গতি যে আশংকাজনক তাতে কোন সন্দেহই নেই। তাই সরকার, সংসদ থেকে শুরু করে দায়িত্বসম্পন্ন সকলেই আজ এই গতিরোধের ব্যবস্থা নির্ণয় করতে ব্যস্ত বা ব্যতিব্যস্ত।

মুদ্রাস্ফীতি :

এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা টাকার মূল্য হ্রাসকে 'প্রাইস ইনফ্লেশন বা মূল্যস্ফীতি বলে অভিহিত করা হয়। শুধু 'ইনফ্লেশন' বা মুদ্রাস্ফীতি শব্দটা কিছুটা বিভ্রান্তিজনক, কারণ মুদ্রার পরিমাণে বৃদ্ধি না ঘটেও দাম বৃদ্ধি ঘটতে পারে। লর্ড কেইনস তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'জেনারেল থিয়োরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি'-তে (১৯৩৬) লিখেছেন: তুলনামূলকভাবে টাকা যখন অপ্রচুর হয়ে পড়ে তখন টাকার কার্যকর যোগান বৃদ্ধি করবার জন্যে বিকল্প বস্তুকে খুঁজে নেওয়া হয় (৩০৭ পৃষ্ঠা)। বর্তমান দিনে এই বস্তু হল ব্যাংক-ঋণ। অতএব কারেন্সীর পরিমাণবৃদ্ধি করা না হলেও—এন্তার নোট ছেপে বাজারে না ছাড়লেও অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে—অর্থাৎ টাকার দাম হ্রাস পেতে পারে। তাই একে বলা হয় মূল্যস্ফীতি।

মূল্যস্ফীতির বিশ্বজনীনতা :

আগেই বলেছি, মূল্যস্ফীতি আমাদের দেশের কিছু একক ঘটনা নয়—একরকম সারা পৃথিবী আজ এই সমস্যায় প্রপীড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবছর খাদ্যের গড় দাম গত বছরের তুলনায় ঋতু অনুসারে ১০ থেকে ২০ শতাংশ বেশী। এই মূল্যস্ফীতির জন্যই পনের মাস আগে রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে 'ওয়েজ ফ্রীজ' বা সাময়িকভাবে মজুরিবৃদ্ধি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে এবং তার কিছুদিন পরে ডলারের বনেদীয়ানা ধুলোয় লুটিয়ে 'ডিভ্যালুয়েশন' বা মুদ্রামান হ্রাসের পথে পদসঞ্চার করতে হয়েছিল। কঠোর নিয়মানুবর্তী দেশ ইসরায়েলেও দ্রব্যমূল্য বছরে ১০—১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্যবাদী দেশ যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যান্ডও এই বিশ্বজনীন ব্যাধির বাইরে থাকতে পারেনি। নব শিল্পসম্রাট পশ্চিম জার্মেনী ও জাপানও এর কবলমুক্ত নয়। আর গত মাসেই এর দরুন ইংল্যান্ড জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে ৯০ দিনের জন্যে সমস্ত মজুরি দাম ভাড়া এবং লভ্যাংশের যে কোন বৃদ্ধি বন্ধ করেছিল। আরও বলা যায়, গত মাসে অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানী ও কানাডার নির্বাচনে অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ ছিল মূল্যস্ফীতি। বলা বাহুল্য কারণ ঐসব শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা যা সহ্য করতে পারে আমরাও যে তাই পারব—এরকম আশা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং ঐ সব দেশের পক্ষে যা সমস্যা আমাদের ক্ষেত্রে তা সংকটেরই নামান্তর। এই সংকটমুক্তির পথই খুঁজতে হবে এবার।

মূল্যস্ফীতির কারণ :

অতীতে, যেমন উল্লিখিত তৃতীয় দশকের গোড়ায় জার্মানীতে যখন মূল্যস্ফীতি ঘটত তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলেই বর্ণনা করা যেত। একদিকে যেমন উৎপাদক অপরিপূরিত চাহিদার সংগে তাল রাখতে পারত না, অপরদিকে তেমনি টাকার যোগানও অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেড়ে যেত। তত্ত্বের দিক দিয়ে এর ফলে ঘটত ভোগ, উৎপাদন ও টাকার যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের বর্ধমান অভাব। এবং ফলে যে অবস্থার উদ্ভব ঘটত অর্থনীতিবিদ পিগু তাকে 'অত্যধিক টাকা কর্তৃক অত্যল্প দ্রব্যাদির পশ্চাদ্ধাবন' বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশে যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধোত্তর যুগে ঠিক এই অবস্থা ঘটলেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু (১৯৫১ সালের মার্চ) থেকে মূল্যস্ফীতির কারণ ছিল একটু স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের পরিকল্পনা—কর্তৃপক্ষ আধুনিক সম্প্রসারণধর্মী অর্থনীতির এই তত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, মৃদু বর্ধনশীল মূল্যান্তর ছাড়া সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কারণ, কিছুটা বেশী দাম না দিলে নতুন নতুন ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহ আসবেই না, আর বেসরকারী ক্ষেত্রও উৎপাদনবৃদ্ধিতে আগ্রহান্বিত হবে না। এই দামবৃদ্ধিকে 'ফাংকশানাল প্রাইস রাইজ' বা 'ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত (আংগিক নয়) দাম বৃদ্ধি বলে অভিহিত করা হয়।

এই ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত দাম বৃদ্ধির জন্যেই উন্নত দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি নিয়মিত ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের সমস্যা হল : কি করে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, পূর্ণ নিয়োগ এবং মূল্যস্ফীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা যায়।

মোটামুটি আমাদেরও এই সমস্যা, তবে পরিমাণগত দিক দিয়ে হল আকাশ-পাতাল তফাৎ। যেমন আমাদের দেশে ১৯৬৩—৬৭ সালের মধ্যে যে বছরে ১৩ শতাংশ হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল তাকে কোন মতেই সম্প্রসারণজনিত দামবৃদ্ধি বলে অভিহিত করা যায় না। আর বিগত তেইশ বৎসরে টাকার দাম যে ৫৮ শতাংশের মত হ্রাস পেয়েছে তাও নিশ্চয়ই সম্প্রসারণের মূল্যে নয়।

আমাদের মূল্যস্ফীতির মৌলিক কারণ :

এই অতিবৃদ্ধির বিবিধ কারণ আছে। এর মধ্যে দুটিকে মৌলিক বলে নির্দেশ করা যায় : ত্রুটিপূর্ণ কৃষি-পরিকল্পনা এবং জনবিস্ফোরণ। কৃষির পুনর্গঠনের জন্যে বিবিধ প্রচেষ্টা এবং বহু পরিমাণ বিনিয়োগ সত্ত্বেও আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হই নি—বর্তমান বৎসরের মত খরার কবলে পড়লে (যেটা এদেশে অতিস্বাভাবিক ঘটনা) খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে বিদেশের দিকেই তাকিয়ে থাকি। তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ করতে পারি নি। অপর দিকে পরিকল্পনার বিপুল ব্যয় শুধু কার্যকর চাহিদার পরিমাণই বৃদ্ধি করে চলেছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে ঘাটতি ব্যয়ের নীতি এবং কালো টাকার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫৬—৬৬) ২,০০০ কোটি টাকার বেশী ঘাটতি ব্যয় বা নোট ছাপিয়ে ব্যয় করা হয়েছিল, এবং গত ১৯৭১-৭২ সালেই বাংলাদেশ সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলার জন্যে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি টাকার মত।

কালো টাকার ব্যাপারে ওয়াংচু কমিটি বলেছে, ৭০০০ কোটি টাকার মত কাজকারবার এই টাকায় চলে এবং এই সূত্রে ৪০০-৫০০ কোটি টাকার মত কর বছরে ফাঁকি দেওয়া হয়। চাহিদার তুলনায় স্বল্প দ্রব্যাদির ওপর এই টাকার চাপ যে টাকার দামকে কমিয়ে দেবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

এর ওপর আবার সাম্প্রতিক কারণ হিসেবে আছে প্রতিরক্ষাজনিত ব্যয় বৃদ্ধি এবং অধিক রপ্তানীর প্রয়োজনীয়তা। বলা হয়, মাত্র বাংলাদেশে যুদ্ধ ও বাংলাদেশকে খাদ্য সরবরাহের ব্যয় আমাদের মূল্যস্তরকে বেশ খানিকটা উর্ধ্বে নিয়ে গেছে।

দুরতিক্রম্য চক্র :

এইভাবে টাকার দাম কমলে মজুরীবৃদ্ধির দাবী জোরালো হতে বাধ্য। আবার ঐ দাবী মেনে নিলে মূল্যস্তর আরও বেড়ে যা টাকার দাম আরও কমে যায়। অথচ দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ দাবী পূরণ না করার জন্যে ধর্মঘট বা অনুরূপ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে মূল্যস্ফীতির গতি ত্বরান্বিত হতে বাধ্য, নিয়োগ বা শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্ন না হয় ছেড়েই দিলাম। মজুরিবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে উৎপাদকেরা মুনাফার হ্রাস

সহ্য করতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এর ফলেই দেখা যায় 'কস্ট-পুস' বা উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি। অপরদিকে লোকের আর্থিক আয় বৃদ্ধির দরুন অপেক্ষাকৃত স্বল্প দ্রব্যাদির ওপর বর্ধিত ব্যয়জনিত চাপ পড়লে যে দামবৃদ্ধি ঘটে তাকে 'ডিম্যান্ড-পুল' বা চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বলা হয়। দামবৃদ্ধি উৎপাদন-ব্যয় বা চাহিদা যে দিক থেকেই শুরু হোক না কেন, একটা স্তরের পর উভয় কারণই কার্য করতে থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে তাই ঘটছে—বর্তমান উৎপাদন ব্যয় এবং বর্তমান চাহিদা সমতালে মূল্যস্তরকে ক্রমাগত ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মজুত-দার, মুনাফা-শিকারী ইত্যাদি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছে। মোট ফল : অর্থ-ব্যবস্থায় একেবারে বেসামাল অবস্থা।

হয়ত অবস্থা এখনও আয়ত্তের বাইরে যায় নি। হয়ত মূল্যস্ফীতিকে এখনও দ্রুত-গতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু দেয়ালের লিখন সত্যই আশংকাজনক। অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিলেও সম্পদ ও আয় বন্টনে যে-পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে তাকে দুর্যোগেরই অগ্রদূত বলে মনে করতে হবে। মূল্যস্ফীতি বা টাকার দাম হ্রাসের ফলে ধনী কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, মজুতদার, চোরা-আমদানীর কারবারী ইত্যাদি মাত্র কয়েক শ্রেণী স্ফীত হয়ে উঠছে, আর সমাজের বাকী অংশের দৈনন্দিন অভাব মিটানর সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এ অবস্থা অন্তত সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে বেশী দিন চলতে পারে না। তাই দেয়ালের অস্পষ্ট লিখনের সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবিধান

প্রতিবিধান নিয়ে রথীমহারথীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। অনেক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের অনুসরণে 'ওয়েজ-ফ্রীজ' বা মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ করারও প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ প্রস্তাব যে মোটেই বাস্তব নয়, তা ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে। হয়ত ভারতে মাত্র সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে এবং সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধি রহিত করার একটা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ছোটখাট শিল্প, স্বয়ং-নিযুক্ত ব্যক্তি, কৃষি শ্রমিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা কি সম্ভব? উপরন্তু মজুরী বৃদ্ধি রহিত করা হলে খাজনা, ভাড়া, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি সূত্রেও আয় বৃদ্ধি রহিত করতে হবে। নচেৎ বিভেদমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হয়ে উঠবে এবং আয়-বন্টন আরও বৈষম্যমূলক হবে। সুতরাং এ পথ গ্রহণীয় নয়। তবে কালো টাকার কাজ-কারবার দমন করতে পারলে অনেকটা সুরাহা হতে পারে। এই ব্যাপারে কিন্তু শুধু বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করলেই চলবে না, সমাজের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে। 'অমৃতে'রই অন্য এক সংখ্যায় আলোচনা করেছি যে এর জন্যে থরস্টিন ভেবলেস-বর্ণিত বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ভোগের পথ পরিহার করার জন্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তত্ত্বের দিক দিয়ে মূল্যস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান উৎপাদন বৃদ্ধি। লর্ড কেইনস অবশ্য পূর্ণ নিয়োগের অবস্থাকেই প্রকৃত মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতি বলেই বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ নিয়োগের অবস্থায়—অর্থাৎ উৎপাদনের সকল উপকরণ যখন পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে তখন আর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের মত মূল্যস্ফীতির অবস্থায় যখন সংখ্যাতীত বেকার পথে পথে ঘুরছে এবং বহু পরিমাণ উপকরণ অলস অবস্থায় পড়ে আছে তখন উৎপাদনবৃদ্ধি নিশ্চয়ই সম্ভব। উপরন্তু, কলাকৌশলের ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদন-সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজনমত মূলধন গঠন করে সংগঠন-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করতে পারলেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

এর জন্যে প্রয়োজন সুচিন্তিত, শুধু দৃষ্টি-আকর্ষক নয়, পরিকল্পনার। এই পরিকল্পনায় খেলাগানের চেয়েও গুরুত্ব দিতে হবে কার্যকারিতার ওপর, আর প্রথমেই কৃষির ভিত্তিকে সুসংগঠিত করতে হবে।

মূল্যস্ফীতির দমন :

যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে না আসছে ততক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে দমন করার সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ সরকারের পক্ষে অন্তত প্রধান প্রধান ভোগ্য-পণ্যের বন্টন-ভার নিতে হবে। একেই অর্থ-নীতিতে মূল্যস্ফীতির 'সাপ্রেশান' বা দমন বলা হয়।

অন্যান্য ব্যবস্থা :

আর্থিক আয় বেশী হলেই দ্রব্যাদির ওপর ক্রয়ক্ষমতার চাপ বেশী পড়বে। তাই আর্থিক আয়কেও কমান দরকার। এ ব্যাপারে হয়ত আয়করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার সীমা আরও কমান যেতে পারে। এই ব্যবস্থা সরকারের জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস করলেও মূল্যস্ফীতিরোধের ব্যাপারে যে ফলপ্রসূ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

'রাজ কমিটি'র সুপারিশ সম্পূর্ণ কার্যকর করে কৃষি-আয়ের ওপর কর-স্বল্পতা সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, কৃষি থেকে আয় দ্রব্যাদির ওপর বিশেষ চাপ দেয়।

'একসাইস ডিউটিস' বা অন্তঃশুল্কের হার দামবৃদ্ধির আর একটা বিশেষ কারণ। প্রতিবারেই কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে সাধারণ লোকে ভয়ে ভয়ে থাকে যে, আবার কোন্ কর বাড়ল এবং ফলে দাম আরও চড়ল। বিলাস-দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য অন্তঃশুল্কের হার কমাবার চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দাম যাতে কমে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, চিনির ক্ষেত্রে অন্তঃ-শুল্ক হ্রাস করে চিনির দাম কিছুটা কমাবার ব্যবস্থা এখনই করা যেতে পারে। আয়করের ক্ষেত্রে উল্লিখিত জনপ্রিয়তা হ্রাস এতে খানিকটা পূরিত হবে।

আরও বলা যায় সরকার যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করে তাদের ক্ষেত্রে দাম বাড়াবার আগে বার বার চিন্তা করতে হবে। এতে বাণিজ্যিক নীতি বা উৎপাদন-ব্যয় ও দামের অংগাংগ সম্পর্ক খানিকটা ব্যাহত হলেও ক্ষতি নেই। কারণ অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করেও দ্রব্যাদি সরবরাহ করলে আখেরে সরকারের লাভ হয়—সরকারী আয়ব্যয়-নীতির এ একটা স্বীকৃত সত্য। রেলপথ পরিচালনায় ঘাটতি হলেই যদি মাশুল বৃদ্ধি করা হয়, ডাক-বিভাগ পরি-চালনায় ঘাটতি দেখা দিলেই যদি খাম-পোস্টকার্ডের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয় বা মুনাফা হ্রাসের দরুন দাম বাড়ান হলে অন্তত নৈতিক দিক দিয়ে সরকারের বিশেষ কিছু বলবার থাকতে পারে না। সুতরাং দান কার্যের মত দাম বৃদ্ধি রোধের কার্যও সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু হলে ভাল হয়। এর ফলে আর কিছু না হোক অন্তত নৈতিক ক্ষেত্র কিছুটা প্রসারিত হবে — বেসরকারী ক্ষেত্রের স্বাভাবিক মুনাফার ব্যবধান আবার কিছুটা ফিরে আসবার চেষ্টা দেখা দেবে। মোট কথা প্রতি বার দাম বৃদ্ধি ঘোষণার আগে বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করবে।

পরিশেষে, ঘাটতি ব্যয়ের পথে অতি-সতর্কভাবে চলতে হবে এবং সর্বতোভাবে লোককে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে ঐ সঞ্চয়ের যথাযোগ্য বিনিয়োগ-ব্যবস্থা করতে হবে।

এইভাবে একদিকে যদি ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং অপরদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায় তবে আজকের দিনের গুঁড়িমেরে চলা মূল্য-স্ফীতি হঠাৎ লম্ফ দিয়ে উঠে অর্থ ও সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করতে সমর্থ হবে না।

অবশ্য এ ব্যাপারে আশাবাদী হতে হবে—মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব নয়, এই রকম নৈরাশ্যবাদ পোষণ করা চলবে না, ব্যক্ত করা ত নয়ই। কারণ এই রকম ধারণা ও উক্তি মজুতদারী ব্যবসায়ী ইত্যাদিরই আশাবাদ সম্প্রসারণে সহায়তা করে। তার বদলে আইন-কানুন, বিরতিহীন প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধিরোধ সম্বন্ধে সরকারের নিজের এবং সমাজের শোষিত-শ্রেণীর আশাবাদ এবং শোষক-শ্রেণীর মধ্যে দণ্ড ভয় গড়ে তুলতে হবে। এও অবশ্য এক পরিকল্পনার প্রশ্ন, কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
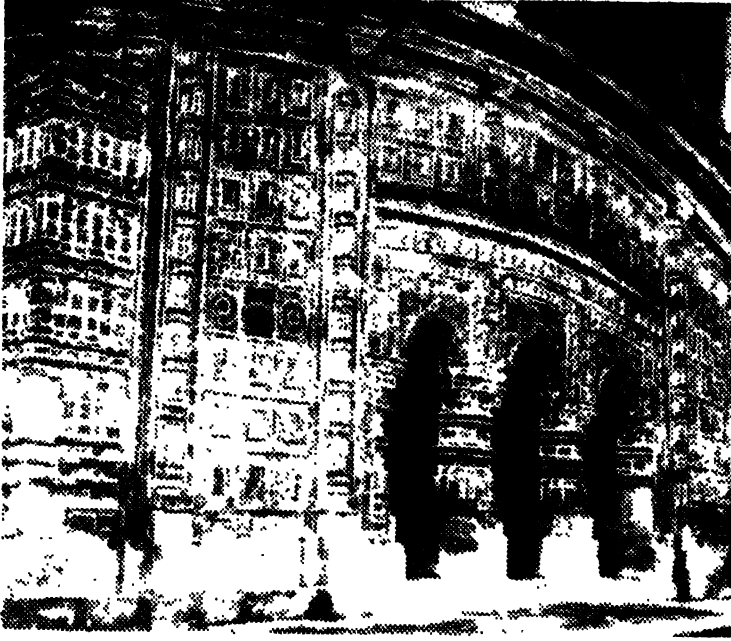
বিষ্ণুপুরের পঞ্চরত্নমন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ

ফিরোজ মিনার, গৌড় (মালদহ)

মনোজিৎ বসু

॥ ১ ॥

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের আকর্ষণ আগেকার তুলনায় এখন যে অনেক বেশি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাস্তাঘাটের অভাবে আগে যেসব দ্রষ্টব্যস্থান ছিল দুরধিগম্য, এখন তা সুগম হয়ে উঠেছে। পাকা সড়ক বিস্তৃত হয়েছে শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে, রেলপথ যেখানে নেই সেখানেও এখন নিত্য যাতায়াত চলেছে বাসের দৌলতে। আগে অনেক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে পর্যটকেরা থাকা-খাওয়ার যেসব অসুবিধা ভোগ করতেন, এখন আর সেসব অসুবিধা নেই। সরকারী পর্যটন দপ্তরের কল্যাণে বহু জায়গায় এখন আরামপ্রদ পর্যটক-আবাস বা ট্যুরিস্ট লজ চালু হয়েছে, অনেক জায়গা খোলা হয়েছে যুব-আবাস বা ইউথ হোস্টেল। গাইডেরও ব্যবস্থা আছে বিশেষ বিশেষ পর্যটনক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন আছে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-বনান্তর, তেমনি আছে শ্যামল শস্যপ্রান্তর আর সুনীল সমুদ্র। প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত পার্বত্য অঞ্চলে যাঁরা ঘুরে বেড়াতে চান, তাঁদের জন্যে আছে দার্জিলিং কালিম্পং, কার্শিয়াং। সমুদ্র-সৈকতে যাঁরা অবকাশ যাপন করতে চান, তাঁদের জন্য আছে দীঘা ও বকখালি। প্রাচীনকালের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক প্রাসাদ, দুর্গ, মঠ, মন্দির, মসজিদ, মিনার, সমাধি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ যাঁরা প্রত্যক্ষ করতে চান, তাঁদের আকর্ষণ করবে, গৌড়, পাণ্ডুয়া, ধানগড়, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর। তীর্থধর্মের আকর্ষণে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বেড়াতে চাইবেন তাঁদের হাতছানি দেবে নবদ্বীপ, কালীঘাট, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, ত্রিবেণী, কালনা, কাটোয়া, তারাপীঠ, জয়রামবাটী, কামারপুকুর। অরণ্যাঞ্চলে যাঁরা ভ্রমণ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য রয়েছে উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া, আলিপুরদুয়ার, জয়ন্তী, আর দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করতে হলে ভ্রমণ করতে হবে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে, যোগ দিতে হবে জয়দেব-কেঁদুলি ও গঙ্গাসাগরের মেলায় এবং মালদহের গম্ভীরা আর পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের আসরে। তাছাড়া, শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে ঘুরে বেড়াতে হবে-আসানসোল, চিত্তরঞ্জন ও দুর্গাপুর-এলাকায়, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী অঞ্চলে আর কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-চব্বিশ পরগণার হুগলি নদীর ধারে ধারে।

॥ ২ ॥

পশ্চিমবঙ্গে পার্বত্য অঞ্চল বলতে প্রধানত দার্জিলিং জেলাকেই বোঝায়। ছোটোখাটো পাহাড় অবশ্য বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলেও আছে। কিন্তু সেগুলি নেহাতই পাহাড়, পার্বত্য কৌলীন্যের দিক থেকে তাদের আকর্ষণ অকিঞ্চিৎকর। দার্জিলিং হ'লো ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস। নগাধিরাজ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার অনির্বচনীয় শোভা দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর পর্যটকদের কাছেই বিরাট একটা আকর্ষণ। তা ছাড়া 'টাইগার হিল' থেকে সূর্যোদয় নিরীক্ষণ, পার্বত্য উপজাতিদের নৃত্যগীত উপভোগ, এবং তাদের তৈরী নানারকম হস্তশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করায় আগ্রহটাও নেহাত কম নয়।

দার্জিলিং শহরকে বলা হয়েছে 'কুইন অব দি হিলস্টেশনস', শৈলনগরীর রাণী। এই উচ্ছ্বসিত উক্তির কারণ বোধহয় এখান থেকে হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গগুলি যে অপূর্ব শোভা নিয়ে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়, উত্তর ভারতের আর কোনো শৈল-

বাস থেকে তেমনটা হয় না। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে 'অবজারভেটরি হিল'—তার মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তুষারাচ্ছন্ন অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ ও নৈসর্গিক শোভা। অবশ্য ঘন মেঘ বা কুয়াশা না থাকলে। এই অবজারভেটরি হিলের নিচেই বৃত্তাকারে বিস্তৃত হয়েছে ম্যাল রোড বা প্রধান ভ্রমণ সড়ক। বেড়াতে বেড়াতে ভ্রমণকারীরা চলে যাবেন জলাপাহাড়ে, সেখান থেকে আরও দূরে ঘুম পর্যন্ত। ভ্রমণপথে উপরে-নীচে কত বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য কতরকমের গাছপালা রঙবেরঙের কতো ফুলের ও অর্কিডের সৌন্দর্য জানা-অজানা কত রকমের পাখির কূজন। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক পথে বা রেলপথে যাঁরা ঘুরে বেড়াবেন তাঁদের চোখে আরও একটা জিনিস ধরা পড়বে। তা হ'লো পার্বত্য ঝরণাধারা—সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লো কবি সত্যেন্দ্রনাথ বর্ণিত 'পাগলাঝোরা'। ম্যালের নিচে ভুটিয়া বস্তি। বৌদ্ধ গোম্ফা। ম্যাল রোডের এক পাশে রাজভবন, বার্চহিল পার্ক। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের শোভা যাঁরা মুগ্ধ বার্চহিল থেকে তাঁরা সূর্যাস্তের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতেও ভোলেন না। দার্জিলিং শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে মিউজিয়ম বোটানিক্যাল গার্ডেন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন স্টেপঅ্যাসাইড' ইত্যাদি। দার্জিলিং শহরের আশেপাশে আরও কত দর্শনীয় স্থান।

কলকাতা থেকে উড়োজাহাজে বাগডোগরা বিমানঘাটিতে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র দেড় ঘন্টা। তারপর, সেখান থেকে মোটরগাড়ীতে দার্জিলিং শহরে হাজির হতে ঘন্টা আড়াই লাগলেও পারতো পথে সেই মোটরবিহারের একটা আলাদা আনন্দ আছে। কলকাতা থেকে দার্জিলিং এর দূরত্ব প্রায় ৬৬৭ কিলোমিটার—ট্রেনে যেতে গোটা একটা দিনই লেগে যায়। শেষ ৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে খেলনা রেলগাড়িতে চেপে, বিচিত্র লুপ লাইনে। তাড়াহুড়ো যাদের নেই এবং ধৈর্য ধরে পার্বত্য শোভা নিরীক্ষণের ঝোঁকটা যাঁদের একটু বেশি তাঁদের কাছে খেলনা রেলগাড়ী কিন্তু আদৌ খেলনা নয়। সময় বেশি লাগলেও তাঁরা ঐ পথটাই বেছে নেন। আর, তাড়াতাড়ি দার্জিলিং শহরে যাঁরা পৌঁছতে চান বা স্পীডের থ্রিলটা যাঁদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় তাঁদের জন্য ট্যাক্সি বাস ইত্যাদি হাজির থাকে শিলিগুড়িতেই। সাম্প্রতিক কালে রাস্তার পরিবহণের কল্যাণে কলকাতা থেকে বাসেও দার্জিলিং যাওয়া যাচ্ছে। আর তাতে সময়ও যে খুব বেশি লাগে তা নয়। সব ঠিকঠাক থাকলে, মাত্র সাড়ে ষোলো ঘন্টার বাস-যাত্রা।

দার্জিলিং এর পথে কার্সিয়াং আর একটি মনোরম শৈলশহর। শিলিগুড়ি থেকে এর দূরত্ব ৫১ কিলোমিটারের মতো, আর দার্জিলিং থেকে ৩২ কিলোমিটার। কার্সিয়াং থেকে যে-দৃশ্যটি ভ্রমণকারীদের সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, তা হলো দক্ষিণাভিমুখী বাংলার সুবিস্তৃত সমতলভূমির সৌন্দর্য। এখানে দার্জিলিং থেকে শীত অপেক্ষাকৃত অনেক কম হলেও বৃষ্টিপাত হয় বেশি। শহরের চারদিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকগুলি চা বাগান। তার দৃশ্যও চমৎকার।

কালিম্পং হলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উজ্জ্বল আর একটি শৈলাবাস। এখান থেকেই হিমালয়ের দৃশ্যাবলী যেন বেশি করে উপভোগ করা যায়। দার্জিলিং শহর থেকে কালিম্পঙের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। এর পশ্চিমে বড় রঙ্গীত নদীর শ্যামল উপত্যকা, দক্ষিণ পশ্চিমে সিঞ্চল পাহাড় ও বন, পূবে রিলি নদীর উপত্যকা, আর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এগুলিই কালিম্পং-এর বড়ো আকর্ষণ। তাছাড়া, কালিম্পং থেকে পর্যটকরা সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে গিয়েও ঘুরে আসতে পারেন দিনকয়েকের জন্য।

দার্জিলিং অঞ্চলে পর্যটনের সুযোগ সুবিধা যে আগেকার চেয়ে অনেক বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে রাজ্যের পর্যটন বিভাগের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গত কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা দার্জিলিং ও কালিম্পং এ মোট পাঁচটি যাত্রীনিবাস স্থাপন করেছেন তিনটি দার্জিলিংএ আর দুটি কালিম্পং এ দার্জিলিং টুরিস্ট লজ বিলাসবহুল এবং আধুনিক যুগের বিভিন্ন উপকরণ সমন্বিত। ম্যাল রোডে অবস্থিত এই লজের দূরত্ব রেলস্টেশন থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার। দুই শয্যাবিশিষ্ট পনেরটি শয়নকক্ষ আছে। তার মধ্যে তিনটি বেশ বড়সড়। ভাড়া শয্যাপিছু তিরিশ টাকা দৈনিক। আর গোটা ঘর নিলে পঞ্চাশ টাকা। অন্য যে বারোটি ডবল রুম আছে সেগুলির প্রত্যেকটির দৈনিক ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা বা শয্যাপিছু পঁচিশ টাকা হবে। অফ সিজনে বিশেষ রিবেটও পাওয়া যায়। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সব রকমের খানাপিনার ব্যবস্থা আছে এই লজে। খাওয়া-খরচ বেডটী থেকে শুরু করে প্রাতরাশ, দ্বিপ্রাহরিক আহার, বৈকালিক চা ও নৈশভোজ সমেত সাড়ে পঁচিশ-ছাব্বিশ টাকার মতো। বারো বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে পনের-ষোল টাকা। এই হিসেব থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, দার্জিলিংয়ের এই টুরিস্ট লজ প্রধানত বিত্তবান পর্যটকদের জন্যই। তবে মধ্যবিত্ত পর্যটকদের জন্যও দার্জিলিঙে একটি আরামপ্রদ যাত্রীনিবাস স্থাপন করেছেন স্টেট ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট। সেটি হলো জলাপাহাড় রোডের শৈলাবাস। রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব তিন কিলোমিটার। মোট সতেরোটি ঘর আছে এখানে। তার মধ্যে দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর একটি, ভাড়া শয্যাপিছু দৈনিক আট টাকা পাঁচ ও ছয় শয্যাবিশিষ্ট ঘর যথাক্রমে দুটি ও চারটি—ভাড়া শয্যাপিছু ছ' টাকা রোজ। তাছাড়া আট শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে পাঁচটি এবং একটি ঘর আছে নয় শয্যাবিশিষ্ট। এই দুটি ঘরের যে কোনো একটি ঘরে আশ্রয় নিলে শয্যাভাড়া দৈনিক মাত্র পাঁচ টাকা। অন্যান্য ঘরের ক্ষেত্রে লাগোয়া গোসলখানা থাকলেও শেষোক্ত ক্ষেত্রের বাথরুমটি অংশত কমন। শৈলাবাসে সকালে আমিষ ও নিরামিষ দুরকম খাবারই আপনি পাবেন, তবে ইউরোপীয় নয়, সম্পূর্ণ দিশী খাবার। প্রাতঃরাশে খরচ সাড়ে পাঁচাসকের মতো দ্বিপ্রাহরিক ও রাত্রির আহার তিন টাকা করে বৈকালিক চা পঁচাত্তর পয়সা। আর ভোরবেলার চা পঁচিশ পয়সা থেকে দুটাকা। সার্ভিস চার্জ শতকরা পাঁচ টাকা।

সিঞ্চলের ক্যাবহাউস অ্যান্ড চ্যালেট ও একটি আকর্ষণীয় যাত্রীনিবাস। ঘুম রেল-স্টেশন থেকে এর দূরত্ব চার কিলোমিটার। চার শয্যাবিশিষ্ট দুটি ফ্যামিলি স্যুট আছে এখানে। প্রতি স্যুটের ভাড়া দৈনিক তিরিশ টাকা অর্থাৎ শয্যাপিছু মাত্র সাড়ে সাত

দীঘা সমুদ্র-সৈকত

টাকা। আর একটা সুবিধে এই যে, পরিবারে বাড়তি দু-একজন থাকলে অতিরিক্ত খাটের সুবিধাও পাওয়া যায়। অতিরিক্ত খাট অবশ্য দুটির বেশি এক স্যুটে ঢোকানো যায় না। খাটের ভাড়া পড়ে প্রত্যেকটির জন্য পাঁচ টাকা করে। ছয় শয্যাবিশিষ্ট দুটি ডরমিটরীও আছে এই ক্লাবহাউসে। রেলগাড়ির টু-টায়ার স্লীপার কোচের মতো ওপরকার বিছানা পিছু ভাড়া পাঁচ টাকা, আর নিচেকার প্রতিটি বিছানার ক্ষেত্রে সাত টাকা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু-রকমের খানাপিনার ব্যবস্থা আছে এখানে। টাইগার হিলের সূর্যোদয় দেখবার জন্য যেসব পর্যটক বিশেষ আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে এখানেই রাত্রিযাপন সুবিধাজনক। কেননা, কাছেই টাইগার হিল। পায়ে হেঁটে ধীরে-সুস্থে প্রতীক্ষিত উদয়পর্বের আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছুনো যায়। সূর্যোদয় মিস করবার দুর্ভাবনা থাকে না।

কালিম্পঙের যাত্রীনিবাস দুটির মধ্যে একটি হলো, ভারতীয় ও ইউরোপীয় আহারের ব্যবস্থা সমন্বিত ট্যুরিস্ট লজ, অন্যটি 'শ্যাংরিলা' পর্যটক-আবাস। শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকে প্রথমটির দূরত্ব একাশী কিলোমিটার, দ্বিতীয়টির দূরত্ব তার চেয়ে তিন কিলোমিটার কম। প্রথমটিতে এক শয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষ আছে দুটি এবং তিনটি কামরা আছে দুই শয্যাবিশিষ্ট। এক শয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষের ভাড়া দৈনিক পঁচিশ টাকা। দুই-শয্যা শয়নকক্ষের মধ্যে একটি বেশ বড়ো। একজন যাত্রী গোটা ঘরটা নিলে ভাড়া পড়বে পঞ্চাশ টাকা দৈনিক। কিন্তু একই দলের দুজন প্রাপ্তবয়স্ক থাকলে ষাট টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু তিরিশ টাকা, আর তিনজন থাকলে পঁচাত্তর টাকা বা মাথাপিছু পঁচিশ টাকা দক্ষিণা। সাধারণ ডবলরুম আর যে দুটি আছে, সেক্ষেত্রে শয্যাপিছু চব্বিশ টাকা ধার্য হলেও ঘরপিছু তিন টাকা কম। এই ট্যুরিস্ট লজে অর্ডার-মাফিক খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং খাদ্যের পরিমাণ ও শ্রেণী হিসেবে দাম ধার্য হয়ে থাকে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রায় অভিজাত হোটেলের মত। 'শ্যাংরিলা' পর্যটক আবাসটি মধ্যবিত্তদের থাকবার উপযোগী। এখানে চার শয্যাবিশিষ্ট ও ছয় শয্যাবিশিষ্ট ঘরে আছে দুটি করে। নিচেকার বিছানার ব্যবস্থা মোট বারোটি, দক্ষিণা বিছানাপিছু দৈনিক আট টাকা। বাঙ্কের মতো ওপরকার বিছানা আছে আটটি—সেক্ষেত্রে প্রতি বিছানার ভাড়া ছয় টাকা দৈনিক। প্রাতঃরাশ ও বৈকালিক চা ছাড়া এখানে আহারাদির কোনো আয়োজন রাখা হয়নি। দুপুরকার ও রাত্রির খাওয়া-দাওয়াটা তাই ইচ্ছামতো অন্যত্র সেরে আসা যায়।

দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পর্যটক-আবাসগুলিতে থাকতে হলে আগে থাকতেই বুকিং করে যাওয়াটা নিরাপদ। কলকাতায় বুকিং হয় রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে। ঠিকানা—৩।২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, কলকাতা-১ (ফোন : ২৩-৮২৭১)। আর, সরাসরি দার্জিলিং-এর রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতেও বুকিং করা যায়। ঠিকানা—'অজিত ম্যানসন' নেহরু রোড, দার্জিলিং (ফোন : দার্জিলিং-৫০)।

দার্জিলিং এলাকার ভ্রমণ সমাপ্ত করে সমতলভূমিতে নেমে আসবার পথে কৌতূহলী ভ্রমণকারীরা ইচ্ছে করলে জলপাইগুড়ি জেলার জলদাপাড়া অভয়ারণ্যটিও এবার ঘুরে দেখে আসতে পারেন। অরণ্যে বিচরণশীল বাঘ, হরিণ, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপ্রাণী প্রত্যক্ষ করবার এ একটা চমৎকার সুযোগ। হোলং-এ বন-বিভাগের যে রেস্ট-হাউস আছে, সেখানে অনায়াসে রাত্রিযাপনও করা যায়। সেখানে থাকা-খাওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তা মোটামুটি ভালোই বলতে হবে।

॥ ৩ ॥

এবারে বলা যাক পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র-সৈকতে ভ্রমণের কথা। ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে তার মাথায় আছে হিমালয়ের তুষারকিরীট, আর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে ফেনিলোচ্ছল সাগর। শহর থেকে দূরে, কোলাহলের বাইরে সমুদ্রসৈকতে দিনকতক কাটিয়ে আসবার পক্ষে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত দীঘা একটি উপযুক্ত স্থান। কলকাতা থেকে খড়্গপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে বাস ধরে যেমন সেখানে পৌঁছুনো যায়, তেমনি কলকাতা থেকে সরাসরি দীঘা পর্যন্ত আরামপ্রদ বাস-সার্ভিসও আছে। খড়্গপুর থেকে দীঘার মধ্যে সারাদিন অনেক প্রাইভেট বাস এবং ট্যাক্সিও চলাচল করে। সড়কপথে কলকাতা থেকে দীঘার দূরত্ব ২৪৩ কিলোমিটার। বাসে বা মোটরে গেলে সময় লাগে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা। কলকাতা থেকে যেমন বাসসার্ভিস আছে, তেমনি আছে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, সিউড়ি (শান্তিনিকেতন), বাঁকুড়া আর ঝাড়গ্রাম থেকেও। কখন, কোথা থেকে এই সব বাস ছাড়ে তার খবরাখবর এবং বাসে সীট রিজার্ভের জন্য কলকাতার যাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারেন রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে ভ্রমণের স্থান হিসেবে দীঘা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ হলো দীঘার শান্ত ও মনোরম পরিবেশ এবং থাকা-খাওয়ার সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা। তাছাড়া, প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শক্ত সমুদ্রসৈকতের আলাদা একটা আকর্ষণও আছে। ঝাউবীথি ও বালিয়াড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সমুদ্রগর্ভ থেকে পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় এবং সমুদ্রবক্ষে সেই সূর্যের অস্তগমন নিরীক্ষণের মধ্যে বিশেষ একটা পুলকানন্দ অনুভব করা যায় বৈকি। তাছাড়া, সারা বছর ধরে দীঘা সমুদ্র-সৈকতের আবহাওয়াও থাকে মনোরম। সাম্প্রতিককালে দীঘার সমুদ্রে ভাঙন ধরেছে, কিন্তু চেষ্টাও চলেছে সেই ভাঙনের হাত থেকে দীঘাকে রক্ষা করবার।

সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়ানো ও সমুদ্র-স্নানের আকর্ষণ ছাড়াও দীঘার আশেপাশে দর্শনীয় স্থান কিছু কিছু আছে। যেমন, চার কিলোমিটার দূরবর্তী একটি প্রাচীন শিবমন্দির। তাছাড়া, কাঁথির কাছে আছে কপালকুণ্ডলা মন্দির, আর আছে দীঘা থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরবর্তী চন্দনেশ্বরী বিগ্রহ। দীঘার নুনের কারখানাটিও দেখবার জিনিস। দীঘা থেকে তার দূরত্ব হবে বাইশ কিলোমিটারের মতো। জুনপুটে ফিশারীতে গেলে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

ঘুরবেন পর্যটকেরা। সরকারী মৎস্যবিভাগ থেকে সেখানে কিভাবে নানারকমের মাছের চাষ হচ্ছে এবং নানারকম গবেষণা চলেছে তাও দেখবার মতো। এখানকার সমুদ্রদৃশ্য যেমন মনোরম, তেমনি সুন্দর ঝাউবীথির পরিবেশ।

দীঘাকে পর্যটনের দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ এখানে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থার দিকে যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা এখানকার ট্যুরিস্ট লজ' আর 'সৈকতাবাস' দেখলেই বোঝা যায়। আধুনিক ও আরামপ্রদ হোটেলের মতই ট্যুরিস্ট লজে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দুরকম খাদ্য-পানীয়ই মেলে এখানে। দুই শয্যার বারোটি ঘর আছে এই পর্যটক-ভবনে। ভাড়া ঘরপিছু দৈনিক তিরিশ টাকা এবং শয্যাপিছু পনের টাকা। আহারাদির খরচের হার এইরকম—বেড-টী এক টাকা, প্রাতঃরাশ দু টাকা পঁচিশ পয়সা থেকে তিন টাকা পঁচিশ পয়সা, দ্বিপ্রাহরিক আহার পাঁচ থেকে সাত টাকা, বৈকালিক চা সওয়া টাকা থেকে দু টাকা। আর নৈশভোজ সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে সাত টাকা। এর ওপর সার্ভিস চার্জ শতকরা পাঁচ টাকা। সৈকতাবাসেও ভারতীয় ও ইউরোপীয় খাদ্য মেলে। কিন্তু সেখানকার খাওয়াথাকার খরচ অপেক্ষাকৃত অনেক কম, প্রায় অর্ধেক। সৈকতাবাসে দুই শয্যার দুটি করে শয়নকক্ষ ও লাগোয়া রান্না-ঘর আর গোসলখানা সমেত সুটে আছে ছয়টি। একতলার সুটের ভাড়া দৈনিক ছাব্বিশ টাকা, আর দোতলায় তিরিশ। অর্থাৎ, শয্যাপিছু খরচ ছয় থেকে সাত টাকা মাত্র। দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে আরও তেইশটি। একতলার প্রতি ঘরের ভাড়া তের টাকা দৈনিক, অর্থাৎ শয্যাপিছু সাড়ে ছয় টাকা। আর, দোতলায় ঘরপিছু দু টাকা, আর শয্যাপিছু মাত্র এক টাকা করে বেশি। সৈকতাবাসের খাইখরচের হার —বেড-টী পঞ্চাশ পয়সা, প্রাতঃরাশ আড়াই টাকা, দ্বিপ্রাহরিক আহার পাঁচ টাকা, বৈকালিক চা দেড় টাকা, আর নৈশভোজ সাড়ে পাঁচ। থাকাখাওয়ার মোট খরচের ওপর একটা সার্ভিস চার্জ আছে। তার হার একই রকম, অর্থাৎ ফাইভ পারসেন্ট।

দীঘায় আর একটি জিনিস আছে। তা হলো পর্যটক-কুটীর বা ট্যুরিস্ট কটেজ। দুই কামরাবিশিষ্ট কটেজ আছে চারটি, আর এক কামরাবিশিষ্ট তিনটি। প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি কটেজের দৈনিক ভাড়া সাড়ে ছ' টাকা, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে সওয়া পাঁচ টাকা। বিদ্যুৎ-সরবরাহ, বিছানার চাদর সরবরাহ ইত্যাদির খরচ অবশ্য আলাদা। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা হয় সংলগ্ন রান্নাঘরে নিজেদের ইচ্ছামতো নিজেরাই রান্না করে খান, নয়তো রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটারিয়া, ক্যান্টিন প্রভৃতিতে গিয়ে খেয়ে আসেন কটেজের রান্নাঘরে রাঁধবার বাসনকোসন এবং খাবারের থালাবাটি, গেলাস ইত্যাদি বিনা ভাড়াতেই মেলে। তাছাড়া, আরও মস্ত একটা সুবিধে আছে এই সব কটেজে। এক ঘরের কটেজে একসঙ্গে দুজন পর্যন্ত এবং দু ঘরের কটেজে একসঙ্গে দশজন পর্যন্ত থাকবার অনুমতি পাওয়া যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে মাথাপিছু ঘরভাড়া পড়ে যৎসামান্য, অর্থাৎ ৬৫ থেকে ৯০ পয়সা মাত্র।

দীঘাতে কয়েকটি বেসরকারী হোটেল বা যাত্রীনিবাসও আছে। এখানকার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যেমন সাধারণ ধরনের, খরচও তেমনি কম। যেমন, ক্যাফেটেরিয়া, বোস-লজ, সী ভিউ লজ, নীলাচল, সাগরিকা, বেলা নিবাস, বিজলী নিবাস, চম্পা সৌধ, সারদা বোর্ডিং হাউস। তাছাড়া দীঘা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত কয়েকটি রেস্ট-হাউসও আছে। আর আছে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি চীপ ক্যানটিন। রেস্ট-হাউসগুলোতে বিছানা-পত্তর যেমন আছে তেমনি আছে রান্নার বাসনকোসনসমেত রান্নাঘর। প্রতি রেস্ট-হাউসের দৈনিক ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা। 'চীপ ক্যানটিনে'ও থাকবার ব্যবস্থা আছে। তবে, একঘরে একসঙ্গে অনেককে থাকতে হয়, শয্যাপিছু থাকবার দক্ষিণা দৈনিক মাত্র দেড় টাকা। শয্যা বলতে খাট বা চৌকি, শোবার জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। ছাত্রদের পক্ষে কম খরচে এই চীপ-ক্যানটিনে থাকাই সুবিধাজনক।

দীঘার ট্যুরিস্ট লজে, সৈকতাবাসে বা ট্যুরিস্ট কটেজে গিয়ে থাকতে হলে আগে থাকতেই বুকিং করে যাওয়া ভালো। এ-বিষয়ে কলকাতার ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। অথবা, ট্যুরিস্ট লজের ক্ষেত্রে ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ, পোঃ দীঘা (মেদিনীপুর), আর সৈকতাবাস কিংবা ট্যুরিস্ট কটেজের বেলায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দীঘা ডেভেলপমেণ্ট স্কীম, পোঃ দীঘা (মেদিনীপুর) এই ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখে ব্যবস্থা করে নেওয়া যেতে পারে। চীপ ক্যানটিনে সাধারণত আগে থাকতে বুকিং করে রাখা যায় না। দীঘায় যাত্রীদের ভিড় প্রায় সারা বছরই লেগে থাকে, বিশেষ করে সিজনে বা ছুটির মরশুমে। সে-সব ক্ষেত্রে মাসখানেক আগে থাকতে বুকিং-এর ব্যবস্থা করে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। জুনপুটের ইন্সপেকশন বাংলোতে থাকতে হলে চিঠি লিখতে হয় সুপারিন্টেন্ডেণ্ট অব ফিশারীজ, জুনপুট, কাঁথি (মেদিনীপুর)—এই ঠিকানায়।

খুব সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণের আর একটি ব্যবস্থা হয়েছে সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে। জায়গাটির নাম বকখালি। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৩২ কিলোমিটার। সুন্দরবন এলাকার অকৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশে এই যে সমুদ্রসৈকত, এর একটা আলাদা রূপ আছে। সামনে সুনীল সমুদ্রের গর্জন আর তরঙ্গোচ্ছ্বাস আর পেছনে ঝাউবনের শন্-শনানি। জনকোলাহল নেই, ভিড় নেই—শান্ত পরিবেশে অবকাশযাপনের মনোরম একটি জায়গা। বকখালিতে একটি ট্যুরিস্ট লজ নির্মিত হয়েছে। সেই লজে আপাতত আঠারোটি সীট আছে। তাছাড়া আছে তাঁবুতে থাকবার ব্যবস্থা। এক-একটি তাঁবুতে আছে চারটি করে খাট। জল ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও আছে সেখানে। তাঁবুপিছু দৈনিক থাকবার দক্ষিণা মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। তবে আগে থাকতে, যাত্রার অন্তত দুদিন আগে, রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁবু রিজার্ভ করিয়ে নেওয়াটা একান্তই প্রয়োজন।

বকখালিতে যাওয়ার বিশেষ কোনো ঝামেলা নেই। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের এস্‌প্ল্যানেড অফিসে গিয়ে বাসের টিকেট কিনে নিয়ে বাসে চড়লেই হলো। এই বাস যাবে নামখানা পর্যন্ত। নামখানায় নদী পার হতে হবে। ওপারে পৌঁছুলেই দেখবেন একস্-

দার্জিলিং শহরের কেন্দ্রস্থল ম্যালে একটি রেস্তোরাঁ

প্রেস রয়েছে দাঁড়িয়ে। সেই বাসে চেপে সোজা ফ্রেজারগঞ্জ। সেখান থেকে বকখালি খুব কাছেই, দু' কিলোমিটারের মধ্যে। সব-সুদ্ধ ঘণ্টাপাঁচেকের মতো লাগবে সমুদ্র-তীরবর্তী বকখালি পৌঁছুতে। আহারাদির জন্য আছে 'চীপ ক্যানটিন'। মোটামুটি ভালো ব্যবস্থাই। প্রাথমিক একটা চিকিৎসা কেন্দ্রও আছে এখানে। তাছাড়া, পুলিশ-ক্যাম্পের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বিপদ-আপদের কথা ভেবে।

।। ৪ ।।

বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাসের বহু স্মৃতি এখনও ছড়িয়ে আছে পশ্চিম-বঙ্গের নানা জায়গায়। সেগুলির মধ্যে পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান গৌড়-পাণ্ডুয়া আদিনা, মুর্শিদাবাদ, আর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর। সযত্ন সংরক্ষণের অভাবে বহু জায়গার বহু পুরাকীর্তি আজ লুপ্ত-প্রায় হলেও, উল্লিখিত জায়গাগুলিতে এখনও অনেক কিছু দেখবার আছে।

গৌড় - পাণ্ডুয়া - আদিনা—মালদহের তিনটি ঐতিহাসিক স্থান। শহর থেকে দক্ষিণ দিকে সাত-আট মাইল গেলেই আপনার নজরে পড়বে গৌড়ের ধ্বংসা-বশেষ। পিয়াসবাড়ি ছাড়িয়ে আধ মাইলের মধ্যেই পড়বে রামকেলি গ্রাম। বৃন্দাবনের পথে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানে এসে উপ-স্থিত হয়েছিলেন। সেই স্মৃতি বহন করছে এখানকার তমালতলা। রূপ-সনাতনের স্মৃতিও ছড়িয়ে আছে এখানে। যেমন—রূপ-সাগরদীঘি, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, শ্যাম-কুণ্ড প্রভৃতি। গৌড়ের দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় সুলতানী আমলের বহু হাবেলি, মসজিদ, মিনার, দুর্গ বা দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, যেমন—বার-দুয়ারী বা বড়-সোনামসজিদ, দখল বা দাখিল্ দরওয়াজা, হাবেলিখাস, ফিরোজ-মিনার, লুকোচুরি দরওয়াজা, কদমরসুল, চিকা মসজিদ, লোটন মসজিদ, ছোটো-সোনা মসজিদ প্রভৃতি।

বাস্তুবিদ্যার বিস্ময়কর নিদর্শন বার-দুয়ারী বা বড় সোনামসজিদ গৌড়ের সব-চেয়ে বড়ো আর জমকালো অট্টালিকা। ছোটো ছোটো ইট আর পাথরের খিলান দিয়ে এটি তৈরি হয়েছিল ১৫২৬ খৃঃ অব্দে, সুলতান নসরৎ শাহের আমলে। অনেকের ধারণা, গোড়ার দিকে এটি বাদ-শাহী দপ্তরখানা হিসেবেই ব্যবহৃত হতো, পরবর্তীকালে মসজিদে পরিণত হয়। এক সময় এর ওপরে কারুকার্যখচিত ৪৪টি অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ ছিল। তার বেশির ভাগই ভেঙে গেছে, টিকে আছে গুটি-কয়েক। দখল্ বা দাখিল্ দরওয়াজা গৌড়-দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার, ছোটো ছোটো লাল ইটের তৈরি। এর যতটুকু অংশ আজও টিকে আছে, তার কারুকাজ দেখে অবাক হতে হয়। এর চারকোণে যে চারটি গম্বুজ বা টাওয়ার আছে, সেগুলি পাঁচতলা উঁচু। ঐতিহাসিকদের অনুমান এই তোরণদ্বারটি নির্মিত হয়েছিল ১৫-শ শতকের গোড়ার দিকে। এই দরওয়াজা থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে গেলেই নজরে পড়বে ফিরোজ শাহের আদেশে নির্মিত ৮৪ ফুট উঁচু এক বিজয়-স্তম্ভ, ফিরোজ-মিনার নামে যেটি চিহ্নিত। এই স্তম্ভের ভিতরে ৭৩ ধাপ-বিশিষ্ট একটি ঘোরানো সিঁড়ি আছে। আগে এই মিনারের মাথায় একটি গম্বুজ ছিল। এখন আর সেটি নেই। এই মিনারের কাছেই রয়েছে গৌড়দুর্গের পূর্বদ্বার বা লুকোচুরি দরওয়াজার ধ্বংসাবশেষ। তার পাশেই কদমরসুল মসজিদ। ভিতরে গেলে নজরে পড়বে কষ্টিপাথরে খোদিত একজোড়া পদ-চিহ্ন। লোকে বলে, পয়গম্বর রসুলের পায়ের ছাপ। চিকা মসজিদের দরজায় ও খিলানে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ে। তা হলো পাথরের কারুকাজের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। অনেকের তাই ধারণা, গোড়ায় এটি হিন্দু-মন্দিরই ছিল, পরে মসজিদে রূপান্তরিত হয়। রং-বেরং-এর মিনার কাজকরা ইট দিয়ে তৈরি লোটন মসজিদটিও দেখবার মতো। মসজিদটি তৈরি হয় ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে, সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, বাদশাহী দরবারের কোনো এক নর্তকী নাকি এই মসজিদটি তৈরি করিয়েছিলেন।

মালদহ শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরবর্তী পাণ্ডুয়া এক সময় ছিল গৌড়-বঙ্গের আর এক রাজধানী। অনেকে মনে করেন, পাণ্ডুয়া ছিল হিন্দুজন-অধ্যুষিত শহর। কেননা, সেখানকার মসজিদ ও দরগায় হিন্দু-আমলের বহু ইট-পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি হলো একলাখী মসজিদ। ১৪১২ থেকে ১৪১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্মিত। এই মসজিদের সম্মুখ-দ্বারের খিলানে একটি হিন্দু দেবমূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে দেখা যায়। পাণ্ডুয়ার অন্যান্য পুরাকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেখানকার বড়-দরগা ও কুতুবশাহী মসজিদ।

সুবিখ্যাত আদিনা মসজিদ আপনি দেখতে পাবেন পাণ্ডুয়ার পূর্ব সীমানায়। মসজিদটি ১৩৬৪—১৩৭৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে তৈরি বলে অনেকের অনুমান। অর্থাৎ, প্রায় ছ'শ বছর আগেকার। অংশত বিধ্বস্ত হলেও মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব এক নিদর্শন। মালদহ মিউজিয়মে গেলে গৌড়-পাণ্ডুয়া-আদিনার ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত বহু পাথরের মূর্তি, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি দেখে চমৎকৃত হবে যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু পর্যটক।

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো এইসব প্রাচীন কীর্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছাড়া মালদহের আরও অনেক আকর্ষণ আছে। তার মধ্যে বিভিন্ন কুটীর-শিল্প, বিশেষ করে তসর, গরদ, মুগা-জাতীয় রেশম-বয়নশিল্প যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি হলো আমের মরশুমের রকমারি আম, আর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা-উৎসব। এই উৎসবের মধ্যে থাকে মেলা, গান ও নাচ। বাংলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গম্ভীরা-গানের বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। শিবের গাজনই গম্ভীরা-গানের প্রধান উৎস। শুধু গান দিয়ে গম্ভীরার আসর জমে না বলে অভিনয় ও বাজনার আয়োজনও থাকে।

ফারাক্কায় গঙ্গার ওপরে সড়কসেতু নির্মিত হওয়ায় এখন মালদহে যাওয়া সহজতর হয়েছে। কলকাতা থেকে মালদহ পর্যন্ত ৩৩৮ কিলোমিটারের পাকা সড়ক রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে অতিক্রম করতে সময় লাগে আট ঘণ্টার মতো। ট্রেনেও যাওয়া যায়। থাকা-খাওয়া সুবন্দোবস্ত রয়েছে
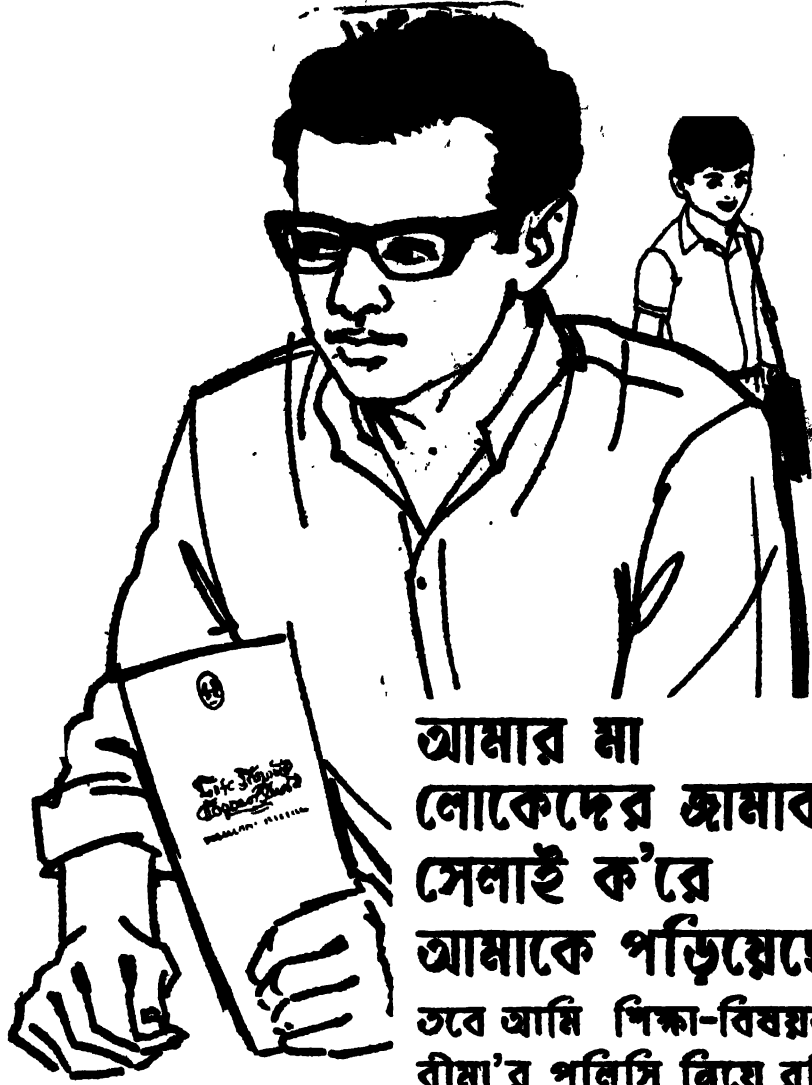
আমার মা লোকেদের জামাকাপড় সেলাই ক'রে আমাকে পড়িয়েছেন !

তবে আমি শিক্ষা-বিষয়ক বৃত্তি বীমা'র পলিসি নিয়ে রবিকে উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

"যখন আমার রবির জন্ম হয় তখনই আমি ওর জন্য ৭,০০০ টাকার ১৬ বছর মেয়াদের একটি পলিসি নিয়ে নিই। এর জন্য মাসিক প্রিমিয়াম মাত্র ৩০টাঃ ৮০পঃ। পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হ'লে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন আমাকে পাঁচ বছরের জন্য প্রতি ছয় মাস পর পর ৭০০ টাকা ক'রে দেবে। এই টাকায় রবি সহজেই কলেজে পড়াশুনা করতে পারবে। এমনকি আমার অবর্তমানেও রবি ওই টাকা পেতে থাকবে (সেই ক্ষেত্রে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না)"।

আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা

আপনিও লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের এই ধরণের পলিসি নিয়ে আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা সুনিশ্চিত ক'রে ফেলতে পারেন। এর প্রিমিয়াম—আপনার বয়স, বীমার শ্রেণী, আর পলিসির মেয়াদের ওপর নির্ভর করবে। আপনার ছেলেমেয়ের জীবনকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করার জন্য বীমা-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়।

আপনার সব রকমের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের অন্য আরও অনেক রকমের পলিসি রয়েছে। আজই লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জীবন বীমা নিয়ে ওদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করে তুলুন

দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজ

পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট লজে। রেল-স্টেশন থেকে তার দূরত্ব মাত্র দু' কিলো-মিটার। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু' শয্যার দুটি এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রণবিহীন দু' শয্যার দুশটি শয়নকক্ষ আছে এই লজে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে শয্যাপিছু ভাড়া দৈনিক পনের টাকা। আর, দু শয্যার ছটি ঘরের প্রত্যেকটি শয্যার দক্ষিণা বারো টাকা। দু' শয্যাবিশিষ্ট আর যে চারটি শয়নকক্ষ আছে, তাতে ভাড়া অনেক কম, শয্যাপিছু সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ভারতীয় ও ইউ-রোপীয় দু'রকমেরই খাবার পাওয়া যায়। খরচ পড়ে এই রকম—বেড-টী পঁচাত্তর পয়সা, প্রাতঃরাশ তিন টাকা, দুপুরের আহার তিন টাকা থেকে সাত টাকা, বৈকালিক চা পৌনে দু' টাকা, আর নৈশ-ভোজ সাড়ে তিন থেকে সাড়ে সাতটাকার মধ্যে।

মালদহ থেকে ফেরবার পথে, কিম্বা সেখানে যাবার পথে আপনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদটাও ঘুরে দেখে যেতে পারেন। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২১৯ কিলোমিটার। সরকারী বাসে বা ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার যাত্রা মাত্র। এখানে দাঁড়িয়ে আছে সম্রাট ঔরংজীবের অধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন অট্টালিকা, মসজিদ, উদ্যান প্রভৃতি। লাল-বাগের কাটরা মসজিদের অনেকাংশ ভেঙে গেলেও এটি দেখবার মতো। এই মসজিদটি তৈরী করিয়েছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ, মক্কার মসজিদের আদলে। মুর্শিদকুলি খাঁর কবরও আছে এখানে। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদ বর্তমানে একটি জাদুঘর বিশেষ। ১৩৫ বছর আগে মীরজাফরের উত্তরাধিকারী নবাব হুমায়ুন এই প্রাসাদ ভবনটি তৈরী করান। সিরাজদ্দৌলার আমলের বহু অস্ত্র-শস্ত্র, কাপড়-চোপড়, চীনেমাটির বাসন-কোসন, অলঙ্কার, মুদ্রা, পুঁথিপত্র ও বই, তৈলচিত্র প্রভৃতি রক্ষিত আছে হাজারদুয়ারী প্রাসাদে। অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে 'জাফরগঞ্জ দেউড়ি' অন্যতম। লোকে বলে, বিশ্বাস-ঘাতকের দেউড়ি বা নিমকহারাম ফটক। এক সময় এখানেই ছিল মীরজাফরের বাসভবন। কিংবদন্তী এই যে, এই দেউড়িতেই মীরনের হাতে প্রাণ ত্যাগ করতে হয় হতভাগ্য নবাব সিরাজকে। কাঠগোলা উদ্যানবাটিকাটিও দর্শনীয়। কোন এক ধনী জৈন ব্যবসায়ীর বাগানবাড়ী ছিল এক সময়। পুরনো আমলের একটি জৈন মন্দিরও আছে এখানে। জাফরগঞ্জ সমাধিক্ষেত্র থেকে দু কিলোমিটার দূরে নজরে পড়বে ১৮ শতকের ভারত-বর্ষের সবচেয়ে ধনী ও মহাজনদের অন্যতম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের প্রাসাদ। নবাব বাহাদুরের প্রাসাদ ভবনের মাইল দেড়েক দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে সুবিখ্যাত মোতিঝিল। আলিবর্দী-কন্যা ঘসেটি বেগম থাকতেন এইখানে। মীরজাফর এটিকে উপঢৌকন দেন ইংরেজদের। লালবাগে ভাগীরথীর অপর পাড়ে রয়েছে আলিবর্দী, সিরাজ আর সিরাজের বেগম লুৎফুন্নেসার কবর।

মুর্শিদাবাদের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের তালিকায় পড়বে পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত বরানগরের রাণীভবানী মন্দির, জাহানকোষা কামান, কাশিমবাজারের প্রাসাদ, কুঞ্জঘাটায় অবস্থিত মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ, আর পলাশী। পলাশী বর্তমানে নদীয়া জেলার প্রান্তসীমায় অবস্থিত হলেও আগে ছিল মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই পলাশীর আম্রকুঞ্জসংলগ্ন প্রান্তরে।

পর্যটকদের কাছে মুর্শিদাবাদের আরও একটা আকর্ষণ আছে। তা হলো এখানকার হস্তশিল্প। যেমন—গজদন্তে তৈরী নানা রকমের শিল্পসামগ্রী, রেশম বস্ত্র, খাগড়াই বাসন ইত্যাদি। বহরমপুরে যাঁরা বেড়াতে যান তাঁরা সেখানকার বিখ্যাত মিষ্টদ্রব্য 'ছানাবড়া'র স্বাদ নিতেও ভোলেন না।

রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ থেকে এখানেও একটি ট্যুরিস্ট লজ খোলা হয়েছে। রেল স্টেশন থেকে মাত্র দু কিলোমিটার পথ। এই লজে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু শয্যার কামরা আছে দুটি, ভাড়া মাথাপিছু দৈনিক পনের টাকা। আর শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-বিহীন দু শয্যার কামরা আছে মোট সাতটি। সেক্ষেত্রে শয্যাপিছু দৈনিক ভাড়া বারো টাকা। কিন্তু চার শয্যার যে দুটি শয়নকক্ষ আছে এখানে, তার প্রতি শয্যার দৈনিক ভাড়া মাত্র চার টাকা। ভারতীয় ও ইউরোপীয় দু রকমের খাদ্যবস্তুই মেলে এই লজে। প্রাতঃকালীন চা সমেত চার বেলাকার খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ পড়ে মাথাপিছু দশ টাকা থেকে আঠারো টাকা। বহরমপুর শহরে কম খরচে থাকবার আরও অনেক জায়গা আছে এবং সস্তা হোটেলেরও অভাব নেই।

পর্যটন তথা শিল্পরসিক ভ্রমণকারীদের কাছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের আকর্ষণটা যে অনেকখানি সেকথা বলাই বাহুল্য। কেননা, সারা পশ্চিমবঙ্গে পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত এত মন্দির বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ছাড়া আর কোথাও নেই। মল্লরাজাদের আমলের বহু কীর্তি এখনও ছড়িয়ে রয়েছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের এখানে-ওখানে। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দিরই এদেশের প্রাচীন স্থপতি ও ভাস্করদের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। সেগুলির মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য জোড়বাংলা, শ্যাম রায় ও মদনগোপালের মন্দির। জোড়বাংলা মন্দিরের গঠনসৌষ্ঠবের যেন কোন তুলনাই হয় না। মদনগোপাল মন্দিরটিকে 'পঞ্চরত্ন মন্দির'ও বলা হয়। ল্যাটেরাইট পাথর দিয়ে তৈরী এত বড় পঞ্চরত্ন মন্দির বাংলাদেশে আর নেই। বিষ্ণুপুরের আর একটি দ্রষ্টব্য হলো লাল-বাঁধ। মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ এই বাঁধটি তৈরী করান। এই বাঁধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর ইরানী-সহচরী লালবাঈ-এর স্মৃতি।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামের কংক্রিট মন্দির ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও প্রাচীন যুগের স্থাপত্যকলার অনেক নিদর্শন মেলে। শহর থেকে ছাতনার দূরত্ব মাত্র ছ' মাইল। ট্রেনে ও বাসে যাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিকুলতিলক চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত বাশুলী দেবীর মন্দির এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থল। বাঁকুড়ার দু মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে আছে এক্তেশ্বর শিবের মন্দির। এরকম সুদৃঢ় ও সুন্দর গঠনসৌষ্ঠবযুক্ত মন্দির বাঁকুড়ায় আর চোখে পড়ে না। শুশুনিয়া পাহাড়টিও বাঁকুড়া পর্যটকদের কাছে একটা বড় আকর্ষণ। শহর থেকে এর দূরত্ব মাইল

ঝরো। বাস পাওয়া যায়, ট্যাকসীও যাতায়াত করে। এই পাহাড়ে সুদৃশ্য দুটি ঝর্ণা আছে। বিষ্ণুপুর শহর থেকে একুশ মাইল দূরবর্তী সোনামুখী শহরে গেলে সেখানেও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির নজরে পড়বে পর্যটকদের। সেগুলির মধ্যে গৌরগোবিন্দের মন্দিরটি শিল্পকলার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আছে অম্বিকানগরের অম্বিকা মন্দির, বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং বাঁকুড়া শহরের রঘুনাথদেবের মন্দির। সবগুলিই দর্শনীয়।

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে যাঁরা বেড়াতে যাবেন তাঁরা সেখানে ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্য পাঁচমুড়াতেও ঘুরে আসবেন একবার। সেখানকার তৈরী বাঁকুড়া হর্স তো আজকাল বিদেশেও চালান যাচ্ছে। পোড়ামাটির তৈরী এই ঘোড়া কুটিরশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। আরও নানা রকমের খেলনা, মূর্তি ও পুতুল তৈরী হয় পাঁচমুড়ায়। তাছাড়া বাঁকুড়ার রেশম, পিতল, কাঁসা ও তামার বাসন-কোসনের বিশেষ খ্যাতি আছে। বাঁকুড়া শহর থেকে কংসাবতী প্রকল্পের দিকে নিসর্গশোভামণ্ডিত অতি মনোরম একটি জায়গা আছে। তার নাম ঝিলিমিলি। অবকাশ যাপনের চমৎকার জায়গা সেটি।

কলকাতা থেকে রেলপথে খড়গপুর হয়ে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব ১২৫ মাইল। আর সেখান থেকে বাঁকুড়া শহর ১৯ মাইল। কলকাতা থেকে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সরাসরি বাসেও যাওয়া যায় দুর্গাপুর হয়ে। বিষ্ণুপুরেও রাজ্য সরকার একটি ট্যুরিস্ট লজ চালু করেছেন। রেল স্টেশন থেকে তার দূরত্ব মাত্র দু কিলোমিটার। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে এই রকম- দু শয্যাবিশিষ্ট শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শয়নকক্ষ দুটি, শীতাতপনিয়ন্ত্রণবিহীন দু শয্যার কামরা সাতটি, আর আট শয্যার ডরমিটরী একটি। প্রথমটির ক্ষেত্রে দৈনিক ভাড়া শয্যাপিছু পনের টাকা, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বারো টাকা, আর তৃতীয়টির ক্ষেত্রে প্রতি শয্যা মাত্র চার টাকা। বেড-টী সমেত চার বেলাকার মোট খাই-খরচ সওয়া এগার টাকা থেকে সওয়া উনিশ টাকা পড়ে। বাঁকুড়া শহরে কোন ট্যুরিস্ট লজ না থাকলেও সেখানে কয়েকটি বাংলো আছে, ছোটখাট বেসরকারী হোটেলও আছে।

॥ ৫ ॥

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মস্থান তথা তীর্থস্থানের অভাব নেই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান তো কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ-শান্তিপুর, বীরভূমের তারাপীঠ-বক্রেশ্বর, বাঁকুড়ার জয়রামবাটি, বর্ধমানের কালনা-কাটোয়া, আর হুগলী জেলার তারকেশ্বর, ত্রিবেণী ও কামারপুকুর। তাছাড়া, আরও অসংখ্য ধর্মপীঠ ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি জেলায়।

কলকাতায় যেসব হিন্দু তীর্থকামী পর্যটক আসেন তাঁদের কাছে অবশ্য দ্রষ্টব্য দক্ষিণাকালীর পীঠস্থান কালীঘাট, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের স্মৃতিবিজড়িত দক্ষিণেশ্বর-এর কালী মন্দির, আর সাম্প্রতিক কালে নির্মিত আদ্যাপীঠের মন্দির এবং স্বামী বিবেকানন্দের বেলুড়মঠ। জৈনদের কাছে এখানকার পরেশনাথের মন্দিরের আকর্ষণ আছে, বৌদ্ধদের কাছে তেমনি রয়েছে মহাবোধি সোসাইটির উপাসনাভবন, বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর আর জাপানী বৌদ্ধমন্দির। মুসলমান তীর্থকামীদের কাছে নাখোদা মসজিদ, শিখদের কাছে কালীঘাটের গুরুদ্বার এবং খৃস্টানদের কাছে সেন্টপলস ক্যাথিড্রালেরও তেমনি আকর্ষণ।

কলকাতা থেকে নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের দূরত্ব ৬২ মাইল। সেখান থেকে নবদ্বীপঘাট আরও আট মাইল। ট্রেনে বা বাসে নবদ্বীপঘাটে পৌঁছে সেখান থেকে নবদ্বীপ শহরে যেতে হয় গঙ্গা পেরিয়ে। আর একটি সহজ পথ আছে ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে ট্রেনে। ব্যাণ্ডেল থেকে নবদ্বীপ স্টেশনের দূরত্ব ৪১ মাইল। আর, নবদ্বীপ স্টেশন থেকে নবদ্বীপ শহর দু মাইলের মধ্যে। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের কাছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবস্থান তথা লীলাভূমি হিসাবে নবদ্বীপের আকর্ষণ সর্বাধিক। এখানকার দর্শনীয় স্থান—মহাপ্রভু বাটী (এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত), পোড়া-মা তলা (নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী), বুড়ো শিবের মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালী, আগমেশ্বরীতলা, শ্যামসুন্দর মন্দির, অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুর বাড়ী, সোনার গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ মন্দির, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, প্রভৃতি। পর্যটকদের কাছে মায়াপুর আর একটি আকর্ষণ। নবদ্বীপঘাট থেকে নদী পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। অনেকের মতে মায়াপুরই আসলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান।

এখানে যেসব জায়গা ঘুরে দেখবার মতো তা হলো—যোগপীঠ মন্দির বা শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান, শ্রীবাস অঙ্গন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট শ্রীচৈতন্য মঠ, চাঁদ কাজীর সমাধি, বল্লাল ঢিবি প্রভৃতি। শান্তিপুরও বৈষ্ণবদের কাছে একটি তীর্থস্থান। কলকাতা থেকে রেলপথে এর দূরত্ব মাইল আটান্ন। কারুকার্যশোভিত শ্যামচাঁদের মন্দির যেমন শান্তিপুরের দর্শনীয় স্থান তেমনি গুপ্তিপাড়ার জলেশ্বরের মন্দির। শেষোক্ত এই মন্দিরে পোড়া মাটির যেসব কারুকাজ আছে এককথায় তা অতুলনীয়। যত্নের অভাবে মন্দিরটির এখন জীর্ণদশা। পর্যটকদের কাছে শান্তিপুরের আনন্দ চৌকির স্মৃতিস্তম্ভটিও দেখবার জিনিস।

নবদ্বীপ-শান্তিপুর যেমন বৈষ্ণব পীঠস্থান, বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত তারাপুর বা তারাপীঠ তেমনি শাক্ত সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি। রামপুরহাট শহর থেকে মাইল অনেক দূরে এই পীঠস্থানটি অবস্থিত। পাশেই দ্বারকানদী। এখানে যে মন্দিরটি আছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধক বামা ক্ষ্যাপার বহু স্মৃতি। তারাপীঠে সাধনা করেই বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেন। বীরভূমের আর একটি পীঠস্থান হলো বক্রেশ্বর। রেলপথে কলকাতা থেকে অণ্ডাল-দুবরাজপুর হয়ে এখানকার দূরত্ব ১৩৪ মাইল। শ্মশানের উপর মহাপীঠ অবস্থিত। দেবী মহিষমর্দিনীর মন্দিরের সামনে শ্বেত সরোবর নামে একটি গরম জলের কুণ্ড আছে। সেখানে স্নানাদি সেরে একটি গুহাগহ্বরে গিয়ে বক্রেশ্বরের দেবতা বক্রনাথ শিবকে দর্শন করে আসতে হয়। বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে আরও কয়েকটি। পর্যটকরা সেই তীর্থক্ষেত্র বক্রেশ্বরে বেড়াতে যান। তারাপীঠ ও বক্রেশ্বরে মাঝে মাঝে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পর্যটন-বিভাগ মাঝে মাঝে টুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা করে থাকেন। যেমন করেন বাঁকুড়ার তীর্থস্থান জয়রামবাটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী পুণ্যবতী শ্রীমা সারদামণির স্মৃতিমন্দির দর্শনই জয়রামবাটিতে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ।

বর্ধমানের অন্তর্গত কালনা ও কাটোয়া বৈষ্ণবদের কাছে তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত। এ দুটি জায়গায় শুধু যে বৈষ্ণবদের পীঠস্থানই আছে তা নয়, হিন্দুদের অন্যান্য ভক্তিশাখার আকর্ষণও আছে। কালনার দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে—বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের তৈরি একশ আটটি শিবমন্দির, আর অম্বিকা গ্রামের গৌরীদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে বর্ধমান জেলার অন্য মহকুমা শহর কাটোয়ার দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার মতো। কাটোয়াও বৈষ্ণবতীর্থ হিসেবে পরিচিত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানেই কেশব-ভারতীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান ঝামটপুর কাটোয়া থেকে দু মাইল।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শৈবতীর্থ হলো তারকেশ্বর। হাওড়া থেকে রেলপথে এই স্থানের দূরত্ব ৩৬ মাইল। স্বাধীনতালাভের পর কলকাতা থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যে পাকা সড়কটি তৈরি হয়েছে বাসে বা মোটরে করে সেই পথেও আজকাল সহজেই যাতায়াত করা চলে। তারকনাথ শিবের মন্দিরই এখানকার প্রধান দর্শনীয় স্থান। তারকনাথ স্বয়ম্ভু শিববিগ্রহ বলে কথিত। তাই, চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা ছাড়াও সারা বছর ধরেই তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয়ে থাকে। হুগলী জেলার আর একটি তীর্থস্থান হলো ত্রিবেণী। প্রয়াগে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী তিনটির যুক্তবেণী, হুগলির এই ত্রিবেণীতে তেমনি তারা মুক্তবেণী। ত্রিবেণীর গঙ্গায় স্নানাদিকর্ম তাই পুণ্যকর্ম বলেই অভিহিত হয়ে থাকে। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন হয়ে এর দূরত্ব মাইল পঁচিশ। ব্যাণ্ডেল থেকে মাত্র পাঁচ মাইল। এখানেও একটি স্টেশন আছে। সড়কপথে বাসেও যাওয়া যায় ত্রিবেণীতে। উত্তরায়ণ, বারুণী, মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ

তিথিতে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এখানে। গঙ্গাস্নানের পুণ্যলগ্ন করে তাঁরা বেণীমাধব মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করেন, পুজোও দেন। বর্তমানে কামারপুকুর-ও একটি তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। এই কামারপুকুরেই একদা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই পবিত্র জন্মকুটীর পরিদর্শনের জন্য সাধারণ পর্যটকেরাও কামারপুকুরে যাবার আকর্ষণ অনুভব করেন। রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগও মাঝে মাঝে ট্যুরিস্ট বাসে করে কামারপুকুর ঘুরিয়ে আনেন ভ্রমণকারীদের। হুগলি জেলার আর একটি তীর্থস্থান হলো ব্যান্ডেল গির্জা। সাধারণ পর্যটকদের কাছেও এর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। গির্জাটি বহু পুরনো। ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে পর্তুগীজেরা এটি তৈরি করান। সম্ভবত এটিই পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের প্রথম গির্জা। গির্জাটির গঠনপারিপাট্য যেমন দৃষ্টি আকর্ষণকারী, তেমনি মুগ্ধ হতে হয় ভিতরকার দেওয়ালে আঁকা চিত্রাবলী দেখে।

॥৬॥

পশ্চিমবঙ্গ পরিভ্রমণ করতে এসে বিদেশী পর্যটকেরা যেমন শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন, তেমনি আগ্রহ দেখান ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পর্যটকেরাও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র তথা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, কবিগুরুর বাসস্থান, কুটীরশিল্পকেন্দ্র শ্রীনিকেতন ইত্যাদি পরিদর্শন করে মুগ্ধ হন দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীরা। শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে শুধু কবিগুরুর স্মৃতিই বিজড়িত নয়, দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর স্মৃতিও জড়িত।

কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব তেষট্টি কিলোমিটার। রেলপথে বোলপুর স্টেশনে নেমে যেতে হয় শান্তিনিকেতন। ট্রেনে লাগে ঘন্টা চারেক সময়। সড়কপথেও যাওয়া যায় মোটরে বা ট্যুরিস্ট বাসে। সেক্ষেত্রে সময়টা ঘন্টাখানেক আরও বেশি লাগে। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক শোভা, সেখানকার খোয়াই, বিভিন্ন ঋতুতে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান এবং অন্যান্য উৎসব, পৌষমেলা ইত্যাদি যেমন পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়, তেমনি কলাভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের আঁকা চিত্রাবলী, কবিগুরুর বাসভবনে উত্তরায়ণ, শ্যামলী, কোনারক, চীনাভবন ও বিদ্যাভবন তথা বিরাট গ্রন্থাগার এসব ঘুরে ঘুরে দেখাও একটা অভিজ্ঞতা। ভাস্কর্যের সুন্দর সুন্দর যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আশ্রমের উন্মুক্ত এলাকায় সেগুলিও পর্যটকদের নয়নমনে এনে দেয় সুগভীর একটা তৃপ্তি।

শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করেই পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে যাওয়া চলে বক্রেশ্বরে, ম্যাসাঞ্জোড়ে, সাঁওতালদের লোকনৃত্যের জায়গায় কেন্দুলিতে, তারাপীঠে এবং বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত নানুরে।

পর্যটকদের জন্য শান্তিনিকেতনে সরকারী উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে দুরকমের যাত্রীনিবাস বা ট্যুরিস্ট লজ। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ট্যুরিস্ট কটেজগুলিতে থাকাখাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। এখানে বারোটি এক শয্যাবিশিষ্ট ও পাঁচটি দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে। প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে ভাড়া দৈনিক সতের টাকা, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘরের ক্ষেত্রে শয্যাপিছু পনের টাকা দৈনিক। কমখরচে থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে তিনতলাবিশিষ্ট ট্যুরিস্ট লজে। সেখানে এক শয্যার ঘর আছে আটটি, দুই শয্যার দশটি, চার শয্যার দুটি, দশ শয্যার ডরমিটরী একটি আর একুশ শয্যার ডরমিটরী আর একটি। ডরমিটরীতে প্রতি শয্যার দক্ষিণা দৈনিক মাত্র দু টাকা। চার-শয্যার দৈনিক ভাড়া লাগে তিন টাকা করে। তাও বেশি নয়। তবে, দুই শয্যার এবং এক শয্যার ঘরের ক্ষেত্রে শয়নপিছু ভাড়া যথাক্রমে আট টাকা ও নয় টাকা করে। কটেজে ও লজে ভারতীয় ও ইউরোপীয় খাদ্য সরবরাহের দুরকম ব্যবস্থাই আছে। বেড টী সমেত চারবেলার খাওয়ার খরচ পড়ে সাড়ে সাত টাকা থেকে আঠারো টাকা।

শহর কলকাতার কলকোলাহল থেকে নিজেদের মুক্ত করে যাঁরা কলকাতারই কাছে পিঠে অবকাশ যাপনের জন্য আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে ৫১ কিলোমিটার দূরবর্তী ডায়মণ্ড হারবার একটি উপযুক্ত ভ্রমণ কেন্দ্র। সড়কপথে, বাসে অথবা রেলপথে ট্রেনে যাওয়া খুবই সহজ। এখানে 'সাগরিকা' নামে যে 'ট্যুরিস্ট সেন্টার'-ভবনটি আছে তার বারান্দায় বসে সুবিস্তৃত গঙ্গার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আপনার নজরে পড়বে সমুদ্রগামী জাহাজ, নানা রকমের স্টীমার, লঞ্চ, নৌকা। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে একটি প্রাচীন দুর্গ, লোকে যাকে বলে 'চিংড়িখালি গড', আর লকগেট। নদীতীরে ভ্রমণ ও পিকনিক করাও ভ্রমণকারীদের পক্ষে কম আনন্দদায়ক নয়।

ডায়মণ্ডহারবারের 'ট্যুরিস্ট সেন্টার'-কে কেন্দ্র করেই আরও কয়েকটি জায়গায় বেড়িয়ে আসা যায়। যেমন, নামখানা, কাকদ্বীপ ও গঙ্গাসাগর। তীর্থযাত্রী ও সাধারণ ভ্রমণকারীদের কাছেও মকরসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত গঙ্গাসাগর মেলা বিশেষ আকর্ষণীয়।

ডায়মণ্ডহারবারের 'সাগরিকা' পর্যটন-আবাসে দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে ছয়টি আর দুই শয্যার স্যুট আছে একটি। শনিবার রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে শয্যাপিছু দৈনিক ভাড়ার হার পঁচিশ টাকা, ঘর পঁয়তাল্লিশ আর স্যুট পঞ্চান্ন। অন্যান্য দিন যথাক্রমে কুড়ি, পঁয়ত্রিশ আর পঁয়তাল্লিশ। কোনো ঘরে বাড়তি শয্যার ব্যবস্থা করতে হলে আরও দশ টাকা খরচ করতে হয়। আর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী ইউথ হোস্টেলের পঞ্চাশ পয়সা। অন্যান্য পর্যটক আবাসের মতো এখানেও শতকরা পাঁচ টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। এখানকার ডাইনিং হল ও পানশালাটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। খাওয়া খরচের হার—বেড-টি পঞ্চাশ পয়সা, প্রাতঃরাশ সাড়ে তিন টাকা, দ্বিপ্রাহরিক আহার সাড়ে চার টাকা, বৈকালিক চা দেড় টাকা, আর নৈশভোজ সাড়ে পাঁচ।

॥৭॥

আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে হলে দুর্গাপুরে না গিয়ে উপায় নেই। দুর্গাপুর ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল আজ পূর্ব ভারতের 'রুর' নামেই অভিহিত। দুর্গাপুরে দেখবার ও বিস্মিত হবার অনেক কিছু রয়েছে। ভারত সরকার পরিচালিত বিরাট স্টীল প্ল্যান্ট দেখে যেমন পর্যটকরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হবেন, তেমনি খুশী হবেন রাজ্য সরকার পরিচালিত দুর্গাপুর প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ দেখে। অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে ফার্টিলাইজার করপোরেশন, মাইনিং অ্যান্ড অ্যালায়েড মেশিনারী করপোরেশন আর অপথালমিক গ্লাস প্রোজেক্টের কারখানাগুলি, দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং স্টীল টাউনটি। দুর্গাপুরে ব্যারাজটিও দেখবার, এবং বেড়াবার উপযুক্ত একটি জায়গা। দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করেই পর্যটকেরা ঘুরে দেখে আসতে পারেন মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধ, আসানসোলের শিল্পাঞ্চল, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, আর রূপনারায়ণপুরের কেবল্‌স ফ্যাকটরী।

কলকাতা থেকে দুর্গাপুরের দূরত্ব ১৮৫ কিলোমিটার। ট্রেনে সেখানে পৌঁছুতে সময় লাগে চার ঘণ্টা। মোটরে ও বাসে লাগে আর এক ঘন্টা বেশি। দুর্গাপুরে থাকবার বহু জায়গা আছে। সরকারী বাংলোগুলি ছাড়াও আছে বেসরকারী হোটেল। আর আছে রাজ্য সরকারের 'ট্যুরিস্ট লজ'। স্টেশন থেকে ট্যুরিস্ট লজের দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। দুইতলাবিশিষ্ট এই পর্যটন-আবাসে ঘর আছে বারোটি। সবই দুই শয্যাবিশিষ্ট। প্রত্যেক তলায় ছ'খানা করে ঘর। দোতলায় শয্যাপিছু ভাড়া লাগে দৈনিক আঠারো টাকা, আর ঘরপিছু তিরিশ টাকা। একতলায় সেই রেট, দাঁড়ায় যথাক্রমে পনের আর পঁচিশ। খাওয়ার ব্যবস্থা দু'রকমেরই আছে, অর্থাৎ ভারতীয় ও ইউরোপীয়। বেড-টি সমেত চারবেলাকার খাবারের খরচ পড়ে মাথাপিছু আঠারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা। তার ওপর শতকরা পাঁচ টাকা সার্ভিস চার্জ।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের ব্যবস্থা ক্রমশ যেমন সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে যদি ভালোভাবে থাকাখাওয়ার জন্য কমখরচের পর্যটন-আবাসের প্রসার হয় তাহলে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ লাভই যখন পর্যটনের প্রধান উদ্দেশ্য, তখন যুব সম্প্রদায় ও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী সস্তা হোস্টেলের সংখ্যা বাড়ানোরও প্রয়োজন আছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিভার চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। বলল, 'আপনি মহাভারত পড়েননি?'

'হ্যাঁ পড়েছি, ঠিক মনে নেই। তা ছাড়া কথাটা বিশ্বাসও হচ্ছিল না। ইচ্ছে করে কেউ মরে কিনা, বা মরলেও যে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল তার কোন সাক্ষী-সাবুদ নেই—'

কথার মাঝখানেই বিভা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'না মরলে মহাভারতে শুধু-শুধু ভীষ্মেরই ইচ্ছামৃত্যুর কথা লেখা হবে কেন। আরও তো অনেকে সেইভাবে মরতে পারতেন, যেমন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, কিম্বা দুর্যোধন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ নিজে। শ্রীকৃষ্ণকে তো বাণ মেরেছিল; একটা পাখি ভেবে। এমন সুন্দর লাল টুকটুকে পা ছিল!' বলতে বলতে বিভার চোখ দুটো বুজে এল। ও যেন চোখের সামনে একজোড়া রাঙা চরণ দেখতে পাচ্ছিল।

অনিমেষ নড়ে-চড়ে শুল। অনিমেষ যে ঘুমোয়নি, বোঝা গেল।

বিভা আবার বলল, 'বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর। আপনি যদি বিশ্বাস করেন, ভগবান আছেন, তিনি আছেন। যদি বলেন, নেই। কেন নেই, না থাকলে গাছ-পালা পশু-পাখী মানুষ জন্মাচ্ছে কী করে, মানুষ মরছে কেন, কেউ সুখ পাচ্ছে, কেউ কষ্ট পাচ্ছে—নানা প্রশ্ন। তার চেয়ে বিশ্বাস করাটা অনেক সহজ। প্রশ্ন থাকে না। প্রশ্ন না থাকলে অশান্তিও হয় না।'

'প্রশ্ন না থাকলে বুঝি অশান্তি হয় না?'

'হবে কী করে? আপনি যদি ভাবেন, একটা গাছে কী করে ফুল ফোটে আপনি জানবেন, তবেই না আপনাকে সেই গাছটার কাছে ছুটতে হবে। ফুল ছিঁড়তে হবে। টুকরো টুকরো করে চোখে মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে কত কী ভাবতে হবে। কিন্তু যাদের মনে নেই প্রশ্ন নেই, দেখবেন, তারা খুব সুখে আছে। ফুলটা দেখে ভাল লাগল, কেউ খোঁপায় পরলো, কেউ কোটে গুঁজে দিল, কেউ বা বৈঠকখানায় এনে সাজিয়ে রাখলো।' কথা বলে বিভা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় বলল, 'সত্যি না!'

ঘাড় হেলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, খুব সত্যি। তুমি আরও লেখাপড়া শিখলে পারতে। খুব ভাল রেজাল্ট হতো তোমার।'

বিভাকে বিমর্ষ দেখাল। ও বলল, 'দাদা আর পড়তে দিল না। আমি পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম।'

অসতর্ক মুহূর্তে কখন স্পর্শকাতর জায়গায় এসে পড়েছি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'তার চেয়ে অনেক ভাল করেছো রান্না শিখে। পড়াশুনো করলে মানুষের নিজের হয়তো জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু সবাইকে কী এমন আনন্দ দেওয়া যায়! এই ধরো না আজ যেমন খাওয়ালে, কোনদিন ভুলতে পারবো!'

বিভা সলজ্জ হেসে বলল, 'আপনি খুব পেটুক। খেতে ভালবাসেন।'

'আমার পেটে অনেকগুলো তিল আছে। মা বলে, যাদের পেটে তিল থাকে, তারা খুব খেতে ভালবাসে।'

বিভা খুব হাসতে লাগল। সামান্য কথায় বিভা কী সুন্দর হাসতে পারে। ওকে খুব পবিত্র আর সরল দেখাচ্ছিল। এক সময় বললাম, 'যদি কোনদিন কোলকাতায় যাও আমি তোমাকে পেয়ারা পেড়ে খাওয়াব।'

বিভা আনন্দে নেচে উঠল, 'সত্যি, নিজের হাতে পেয়ারা পেড়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ গাছে চড়ে নিজে পেড়ে দেব। আমি নীচে ফেলবো, আর তুমি কোঁচড়ে ভরে নেবে।'

হাসতে হাসতে বিভা বলল, 'আপনাকে দেখলে একটুও মনে হয় না যে আপনি গাছে চড়তে পারেন!'

'আমাকে দেখলে কি মনে হয়?'

'মনে হয়, আপনি শুধু খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে পারেন।'

'অথচ সেই তখন থেকে তোমার দাদাই ঘুমোচ্ছে।' বলে অনিমেষের পিঠে সুড়সুড়ি দিতেই অনিমেষ লাফিয়ে উঠে পড়ল।

হাসতে হাসতে বিভা উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়ান, আপনাদের চা নিয়ে আসি, চারটে বেজে গেল।'

জামসেদপুরে আগে কোনদিন আসিনি। কিন্তু অনিমেষ এমন সুন্দরভাবে জায়গার বর্ণনা দিয়ে দিয়েছিল যে স্টেশনে নেমেই মনে হল কতদিনের চেনা জায়গা। প্রথমেই গেলাম আগরওয়ালার কাছে। আগরওয়ালা অফিসেই ছিল। খাতির করে বসাল। একথা সেকথার পর কাজের কথা শুরু হ'ল। আমি বিচক্ষণ ব্যবসাদারের মত সাবধানে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মার্কেট বুঝি খুব ভাল এখন? আপনি র‍্যাকে দেখছি বহু মোটর স্টক করে রেখে-ছেন?' র‍্যাকে বহু ইলেকট্রিক মোটর সাজান ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে আবার বললাম, 'অবিশ্যি আপনারা টাকাওয়ালা লোক, আপনাদের মাল স্টক করতে গায়ে লাগে না।

মিষ্টি কথায় জগৎ তুষ্ট। আগরওয়ালা খুশী মনে বিনয় দেখিয়ে বলল, 'আমি আর কী বড়মানুষ চ্যাটার্জি সাহেব। যা কিছু সবই আপনাদের দৌলতে।'

আগরওয়ালার কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটতে হাঁটতে মোটরগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ-তো দেখছি বিভিন্ন কোম্পানীর।'

আগরওয়ালা সহজেই ফাঁদে পা দিল। বলল, 'হ্যাঁ। যা যখন সুবিধা হয়, তুলে রাখি।'

'কিন্তু চুক্তি অনুসারে আপনি তা পারেন না।'

'কেন?' আগরওয়ালা কিছুটা বিস্মিত কিছুটা বা বিরক্ত।

'যেহেতু আমাদের কোম্পানীর সংগে আপনার সে রকম একটা চুক্তি হয়েছিল তিন বছর আগে। যদিও সেই চুক্তি কিছুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে।'

'তার মানে এই না যে আমি আর কোন ব্যবসা করতে পারবো না।' আগরওয়ালার চোয়াল ক্রমাই শক্ত হয়ে উঠছিল।

'একটা কেন হাজার ব্যবসা আপনি করতে পারেন। সে বিষয়ে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, চাইও না। কিন্তু আপনার কোম্পানীর ডিরেক্টর নাম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া দরকার, এবং সবচেয়ে বড় কথা হল গিয়ে একই ধরনের ডিলারসীপ ম্যানুফ্যাকচারের জিনিষপত্র আপনি এক জায়গায় বেচাকেনা করতে পারেন না। আইনের চোখে সেটা দুষণীয়, কারণ সেইরকম একটা অঙ্গীকারপত্র আপনি সই করেছিলেন তিন বছর আগে। কপি যদি না থাকে, আমার কপি আপনাকে দেখাতে পারি।' কথাগুলো খুব ধীরে ধীরে স্থির ভাবে বললাম।

কাজ ভাল হল। আগরওয়ালা নুরম হল। বলল, 'আইন নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কী হবে চ্যাটার্জি সাহাব। যা হয়ে গেছে যেতে দিন। আমার লোকগুলোও হয়েছে তেমন, কোন কিছু দেখবে না শুনবে না শুধু গপ্প করবে।' হঠাৎ আগরওয়ালা হাঁক ছেড়ে ডাকতে লাগল, 'ভট্টু, হই ভট্টু।' একটা রোগা রোগা নতুন ছেলে এগিয়ে এল। আগরওয়ালা হিন্দীতে বলতে লাগল, 'কত-দিন তোকে বলেছি না অন্য কোম্পানীর মাল তুলবি না ঘরে। কথা শুনিস না কেন তোরা। তোদের জন্যে বুড়ো বয়সে কি জেল খাটবো। যা, জিনিসগুলো সব সস্তা দামে বিক্রি করে দিয়ে আয়, এক্ষুনি।'

ছেলেটা হন্তদন্ত করে চলে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

ছেলেটি অম্লান বদনে বলল, 'সস্তায় বিক্রী করে দিতে আসতে।'

প্রশ্ন করলাম, 'সংগে সংগে বিক্রী করতে পারবে?'

আগরওয়ালা বলে উঠল, 'পারবে না কেন, জাটকা দামমে দেনেসে যে কেউ লুফে নিয়ে যাবে। আর দেরী করিস না ভট্টু যা।'

ভট্টু বেরিয়ে যেতে বললাম, 'ও আপনার কে হয়?

আগরওয়ালা গর্বিত ভাবে বলল, 'আমার বড় ছেলে। দেখেছেন এইটুকু বয়সেই মাথাটা কীরকম সাফ। বড় হলে ও আমার চেয়েও বড় কারবারদার হবে।'

'আপনার কষ্ট হয় না?'

'কেন চ্যাটার্জি সাহাব?'

'এই যে আপনার বড় ছেলেকে জাহা-ন্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন?'

আগরওয়ালা চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, ভট্টু সব মালগুলো মাটির দামে বিক্রী করে দিয়ে আসবে?'

আগরওয়ালা থতমত খেয়ে আমাকে প্রশ্ন করে বলল, 'বিক্রী না করে মালগুলো কি করবে ভট্টু?'

'পেছনের দরজা দিয়ে গুদোমে তুলে রাখবে।'

আগরওয়ালা সমস্ত দাঁত বের করে হাসতে লাগল। ধরা পড়ে গিয়ে মানুষ যে এরকম নির্লজ্জভাবে হাসতে পারে জানা ছিল না। কিছুক্ষণ হাসার পর আগরওয়ালা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আপনার ব্রেণ খুব চমৎকার পরিস্কার আছে বাবু-সাহেব। এরকম মানুষ সংগে পেলে আমি রাজা বনে যেতে পারি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি খুব দুঃখিত আগরওয়ালাবাবু যে আপনাকে রাজা বানাতে পারলাম না। আজ চলি, পরে দেখা হবে। নমস্কার।'

'সে কী কথা বাবুসাহেব। এত কষ্ট করে এলেন। গরীবের চৌকাঠে পা রেখে চলে যাবেন, তা কি হয়। একটু চা-টা খেয়ে যান। আরে ভট্টু।' আগরওয়ালা গলা ফাটিয়ে সমানে চীৎকার করতে লাগল।

বললাম, 'ভট্টু এখন কুলী ডাকতে গেছে, শুনতে পাবে না। আর কোনদিন যদি সুযোগ সুবিধে হয়, এসে চা খেয়ে যাব।' বলে চলে আসছিলাম।

আগরওয়ালা হন্ত-দন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। 'চা না খাবেন না খান, কিন্তু ডিলারসীপ আমার চাই-ই মিস্টার চ্যাটার্জি। আমি এর ওপর ভরসা করে বসে আছি।'

'কাজটা আপনি ভাল করেননি।'

কেন, কেন, চ্যাটার্জি সাহাব। কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে কি। যদি কিছু গোলমাল থাকে, আপনি ঘাবড়াবেন না মশাই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার ভি পেট ভরবে, আমি ভি ভুখা মরবে না।' আগর-ওয়ালা হাঁস-ফাঁস করতে লাগল।

বললাম, 'দেখা যাক, সবই ভগবানের হাত।'

'ভগবানটান কিছুই না মশাই, সবই মানুষের হাত। মানুষের হাতই বা বলছি কেন, সবই তো আপনার হাত। যাকে রাখেন, যাকে মারেন, দয়া করবেন হুজুর।' আগরওয়ালা মুখ কাঁচুমাচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি গিয়ে কোলকাতায় রিপোর্ট পাঠাবো, ডিলারশীপ দেওয়া বা নেওয়া তাদের ইচ্ছে। তবে এতদিন যেভাবে কাজ পেয়ে এসেছেন, সেইভাবে পেতে চেষ্টা করলেন না কেন?'

আগরওয়ালা হঠাৎ দু-হাত দূরে ছিটকে গেল। ওর ক্রুদ্ধ কণ্ঠ কানে এল, 'সেভাবে আর হয় না মশাই। আপনাদের ম্যানেজার এক চামার লোক। দস্তুর এ্যাণ্ড কোম্পানী নিজের লোক বলে অন্যায়ভাবে তাকে ডিলার-সীপ দিতে চাইছে। কিন্তু চাইলেই তো হবে না। আইন আছে, বিচার আছে, আর আছে টাকা। খেলা দেখিয়ে ছাড়বো না।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বললাম, 'তবে তাই দেখান।'

আগরওয়ালা আর বাধা দিল না। দেখ-বারের মত শুনলাম, 'আমি বাজারে বলদাম ছড়াবো। সময়মত মাল দিতে পারে না যে কোম্পানী, সেই মাল বুক করে ডিলার পথে বসবে। আরও বলবো, আপনাদের মালের চাহিদা শুধু নামের জোরে, আসলে মাল বহুৎ রদ্দি। বুঝলেন মশাই, খুব সাবধান। আমিও—' ওর শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না।

ভাগ্য ভাল দস্তুরকেও অফিসে পাওয়া গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কম কথা বলেন। শনিবার দিন ডিলারশীপ-কাইল দিতে যাবার আগে তেওয়ারী কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে চুপি চুপি বলে গিয়েছিলেন, 'ফাইলে একটা নাম দেখবেন, দস্তুর অ্যাণ্ড কোম্পানী। দেশপাণ্ডে সাহেবের খুব বন্ধু লোক।' তেওয়ারী আর অপেক্ষা না করে চলে গিয়েছিলেন। আমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে দস্তুর ধীরে ধীরে কাজ সারলেন। কাঁচের ভেতর দিয়ে দস্তুরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এমন কিছু দরকারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বলে মনে হল না। কিছুসংখ্যক মানুষ যে এভাবে নিজের পদমর্যাদা বাড়ায় সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিছুক্ষণ পরে ভেতরে ডাক পড়ল। হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে দস্তুর একটা কাগজ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। অথচ আমি জানি কাগজটা তেমন জরুরী কিছু না। জরুরী কাগজ আগন্তুকের সামনে বসে পড়া যায় না।

এক সময় দস্তুর মুখ তুলে তাকালেন। চশমার আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি হারিয়ে যায়নি। ছোট চোখ, কিন্তু খুব উজ্জ্বল। বুঝলাম, দস্তুর বুদ্ধিমান মানুষ। বললাম, 'আপনি কি আমাদের মালের ডিলারসীপ নিতে ইচ্ছুক?'

'আপনাদের কী কী মাল?' দস্তুর এমনভাবে বললেন, যেন আমি কোন ছোট-খাট নতুন কোম্পানীর প্রতিনিধি, যে কোম্পানীর নাম এখন পর্যন্ত বাজারে ছড়ায় নি।

বললাম, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পাম্প, জেনা-রেটিং সেট, মোটর, সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফর-মার আরও কিছু কিছু জিনিস।'

দস্তুর বললেন, 'আপনাদের কাছ থেকে যদি সুবিধাজনক সর্ত পাওয়া যায়, আমি ডিলারসীপ নিতে ইচ্ছুক।' উনি এমনভাবে তাকালেন, যাতে আমার কৃতার্থ বোধ করা উচিত।

দস্তুরকে ভাল করে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা তখনও প্রবল। বিনীতভাবে বললাম, 'আপনাদের নামকরা ফার্ম। আপনাদের সংগে কাজ করতে পারলে আমরাও খুশী হব।' কাজ হল, দস্তুরের শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল দেখাল।

উনি বললেন, 'কাজ করা না করা নির্ভর করছে অনুকূল ব্যবস্থার ওপর।'

'কি ব্যবস্থা আপনি চান?' বলে একটা সাদা সই করা কাগজ দস্তুরের সামনে ঠেলে দিলাম।

দস্তুর চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে একটা পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর লিখতে লিখতে পড়তে লাগলেন, প্রথম, পার্সেন্টেজ অব কমিশন বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়, ক্রেডিট ফেসিলিটি। থার্ড পাবলিসিটি। ফোর্থ, মাল স্টক করার মত গোডাউন আমার নেই। একটা গুদামঘর ভাড়া করে দিতে হবে। বলা বাহুল্য সেই ভাড়া আপনারা দেবেন। ফিফথ, আপনাদের সার্ভিস সম্বন্ধে ছোট খাটো কমপ্লেন শুনতে পাই। আমি চাই না ভবিষ্যতে সে জাতীয় কোন কমপ্লেন আমার কানে আসে।'

লেখা এবং পড়া দুই-ই শেষ হল। দস্তুর মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন। হাসি-হাসি মুখে বললাম, 'মিস্টার দেশপাণ্ডেকে গিয়ে আপনার প্রোপোজাল দেব। ম্যানেজারিয়েল র‍্যাঙ্ক ছাড়া এ সম্বন্ধে মতামত দেওয়া যাবে না। আপনার সর্তগুলি যদি একটা চিঠি আকারে দিয়ে দেন, আমাদের কাজের খুব সুবিধা হয়।'

ধূর্ত মানুষও এক এক সময় ছেলে-মানুষের মত কাজ করে ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দস্তুর অলস্তব সর্তগুলো চিঠির আকারে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আশা-করি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন চিরস্থায়ী হবে।'

বললাম, 'আমাদের দিক থেকে সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হবে না।' বলে বেরিয়ে এলাম। মাত্র কয়েককটা দিন হল নতুন এই পদে এসেছি। নিজের গুণে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এক চালে দস্তুরকে কীভাবে মাৎ করে দিয়ে এলাম! প্রথমত আমাদের কোম্পানী ধারে কারবার করে না। অ্যাডভান্স দিয়ে যেখানে মাল পাওয়া যায় না, বাকীতে কারবারের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসার সর্ত আসার কথা আমাদের তরফ থেকে, দস্তুরের কাছ থেকে না। চিঠি পেয়ে কোম্পানীর সম্মানে লাগবে, স্বভাবতই দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানী খসে পড়বে, যেটা কিনা আমি আর অনিমেষ চেয়েছিলাম। বাকী রইল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসেসোরিজ প্রাইভেট লিমিটেড। অনিমেষ বলে দিয়েছে, বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, যদি সুবিধা হয়, এদেরই ডিলারশীপ দিতে।'

তখন লাঞ্চের সময়। হোটেলে ফিরে গিয়ে আবার এদিকে আসতে ইচ্ছে করল না। ভাবলেম একবার দেখাই যাক না, যদি ওদের কাউকে পাওয়া যায়। প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে গিয়ে বাকীটা না হয় চিঠি-পত্রে শেষ করা যাবে। না হয়, আর একবার আসাও যেতে পারে। ট্রেনে চড়তে আমার তো ভালই লাগে।

ই-ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসেসোরিজের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এস কে মুখার্জি চেম্বারেই ছিল। কার্ড ভেতরে পাঠিয়ে দিতেই ডাক পড়ল। উর্দিপরা চাপরাশীর পিছন পিছন যে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, একটা ছোট-খাট কোম্পানীতে এই ধরনের চেম্বার দেখার আশা করিনি। প্রকাণ্ড ঘর। ঘরজোড়া দামী কার্পেট। প্রতি পদক্ষেপে পা ডুবে ডুবে যাচ্ছিল। নরম মিষ্টি আলো ঘরে একটা মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, 'প্লীজ কাম ইন।' তারপর হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোককে ভাল করে দেখার সুযোগ হল। লম্বা ছিপছিপে শরীর। স্যাম্পু করা চুল। কালো-সুরস্ত স্যুট পরনে। উন্নত নাসিকা আর প্রকাণ্ড ললাট, যা কিনা সমস্ত চেহারায় একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। ভদ্রলোক একটা দামী সিগারেট কেস আমার সামনে খুলে ধরে বললেন, 'প্লীজ হ্যাভ এ স্মোক।' বলে নিজে একটা গ্লাসে চুমুক দিলেন। মদ না খেলেও মদের গন্ধ আমার অচেনা নয়। বুঝলাম, ভদ্রলোক দিনে-দুপুরে অফিসে বসেই ড্রিংক করতে অভ্যস্ত। কোন কোন বিরল মুহূর্তে পিছনের একটা অংশ অতর্কিতে কক্ষচ্যুত হয়ে চোখের সামনে এসে পড়ে। তখন সেই অংশটার দিকে না তাকিয়ে উপায় থাকে না! দেখতে দেখতে মন ভারী হয়ে ওঠে, তবু সেইদিকে তাকাবার কী প্রচণ্ড স্পৃহা! হঠাৎ করবী যেন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আপনি কোনদিন মদ খাননি?' ট্যাক্সিতে যেতে যেতে করবী একদিন আমাকে এই প্রশ্ন করেছিল। অতর্কিতে শব্দের লহরী ভেদ করে সেই কথাটা ছিটকে এসে আমার কানে বাজল। চোখের খুব কাছে মুহূর্তের জন্য করবীকে দেখতেও পেলাম যেন। শুধু করবী না! করবীর পাশে ওর ছেলেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। করবীর ছেলে কাঁদছে আর আঙুল দিয়ে একজন লোককে দেখাচ্ছে।

এই সেই লোক। আমার কয়েক হাত দূরে বসে আছে সে। মাঝের ব্যবধান শুধু মাত্র একটা টেবিল। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কোন কথা বলতে পারলাম না। মুখার্জি মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর সিগারেটে টান মারছে। কথা বলছে না! আমি যেন সহসা অন্য একটা জগতে চলে গিয়েছিলাম। পারিপার্শ্বিকতা ভুলে গিয়ে অন্য একটা জগৎ—আমার পিছনের একটা জগৎ। আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত ঘর, ঘরের নীলচে আলো, পায়ের নীচের নরম গালিচা, দু হাত দূরের একজন উন্মত্ত মানুষ, আমার চোখে মাদকতার সৃষ্টি করেছিল। গ্লাসের ওপরে মদের একটা গন্ধ। যে গন্ধের স্বাদ আমার অজানা কিন্তু গন্ধটা অচেনা নয়। এই লোকটি করবীর স্বামী কিনা জানি না, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হল, এ-ই করবীর স্বামী। করবীর স্বামী মদ খায়।

বললাম, 'আর ইউ এস কে মুখার্জি?'

'দ্যাটস রাইট।' ভদ্রলোকের গলাটা বেশ ভরাট, পুরুষমানুষের গলা যেরকম হওয়া উচিত।

বাংলায় বললাম, 'আমার নাম অংশুমান চট্টোপাধ্যায়।'

মুখার্জি হেসে বলল, 'আপনার কার্ড দেখেই জেনেছি। আমার নাম শশাঙ্ককুমার মুখোপাধ্যায়।'

বললাম, 'আপনি অনিমেষ দত্তকে চেনেন?'

'আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।'

'এজেন্সির ব্যাপারে আপনার ইণ্টারেস্ট জেনে আমি অনিমেষের কথামত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'অনিমেষ আমাকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই উপকার করতে চায়। যদিও আমাদের বন্ধুত্বটা গাঢ়, কিন্তু চারিত্রিক দিক দিয়ে আমরা দুজনে দুই পোলের বাসিন্দা।' বলে হো হো করে হেসে উঠল শশাঙ্ক। ভারী গলায় কেউ যদি উচ্চৈঃস্বরে হাসে আমার রক্তে দোলা লাগে। মনে হয় একটা দুরন্ত ঘোড়া যেন টগবগিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কথা বলতে বলতেও শশাঙ্ক অনবরত গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন, এ ধরনের কথা বলছি, শুধু মাত্র অনিমেষ আমাদের দুজনেরই বন্ধু বলে, অফিসে বসে ড্রিঙ্ক করলে কাজের ক্ষতি হয় না?'

'নাঃ।' শশাঙ্ক যেন হাত নেড়ে একটা মাছি তাড়াল।

'আমি এসেছি আমাদের 'প্রডাক্টের' ডিলারশীপ আপনাকে দিতে।'

'আমার ইতিকথা কিছু না জেনেই এতবড় কাজটা করে ফেলবেন? তাছাড়া,

আমি যতদূরে জানি আপনি চাইলেও সে কাজ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।' শশাঙ্ক খুব প্রসন্ন সুরে কথাগুলো বলল।

'কেন?'

'আপনাদের ম্যানেজারটি যে কী চীজ তা আমার জানা আছে। এখানে, ক্লাবে লোকটিকে বহুবার মিট করেছি। এতদূরে গাড়ি ছুটিয়ে আসে কেন জানেন? মদ খেতে। অথচ দু পেগের বেশী কোনদিনই খাবে না। কোনদিন মাতালটাকে আউট হতে দেখলাম না। একটা জঘন্য চরিত্রের লোক মশাই।' শশাঙ্ক এমনভাবে নাক মুখ কোঁচকাল যেন এই মুহূর্তে পরিচ্ছন্ন মেঝের থু থু ফেলে বসবে।

'জঘন্য কেন? মাতাল হয় না বলে?' শশাঙ্ককে রাগাতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

'ইয়েস। একশোবার ইয়েস। যে লোক মদ খেয়ে নেশা করে না, সে কেন মদ খায় বলতে পারেন? মেয়েমানুষের কাছে যাবে বলে? স্যরি, প্রথম দিনেই মুখ খুলে ফেললাম। আমরা দুজনেই অনিমেষের বন্ধু। অনিমেষের দোহাই, কিছু মনে করবেন না।' বলে শশাঙ্ক টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

ওর হাতটা দুই হাতের মধ্যে নিতে নিতে বললাম, 'না না, কিছু মনে করিনি। তবে আপনাকে এভাবে ড্রিঙ্ক করতে দেখে সত্যি কথা বলতে কী, আমার ঠিক স্বস্তি হচ্ছে না। অবিশ্যি আপনাদের বড়ঘরের ব্যাপার হয়তো আলাদা।'

শশাঙ্ক একটা হাত বাতাসে নেড়ে দিয়ে বলল, 'কিস্সু না মশাই, বড় ঘর ছোট ঘরের ব্যাপার না। মোট কথা, এবং মোদ্দা কথা হচ্ছে, ন একার তালব্য শ আকার। নেশা। নেশা জমানো নিয়ে কথা। নেশা করতে আমার ভাল লাগে, তাই আমি মদ খাই। কার কি।' বলে শশাঙ্ক হঠাৎ বুকে টান করে রাজা-রাজা ভাবে বসল।

সামান্য লোভটা সামলাবার চেষ্টা করলাম না। বলে ফেললাম, 'আপনার স্ত্রী কিছু বলেন না?'

'আমার স্ত্রী!' বলে চোখ কুঁচকে শশাঙ্ক আমার মধ্যে যেন ওর স্ত্রীকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল। বিড় বিড় করে আবার বলল, 'কোথায় আমার স্ত্রী? সি ইজ ডেড। সে মারা গেছে।' শেষের দিকে শশাঙ্কর কথা শিথিল হয়ে এল। বুঝলাম ওর নেশা হয়েছে। ওর সমস্ত মুখ ক্রমশই রক্তবর্ণ হয়ে উঠছিল। চোখ বুজে বুজে আসছিল। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে আসতে লাগল।

অফিসের চেম্বারে যে এ ধরনের একজন মস্ত মানুষ দেখব ভাবতে পারি নি। প্রথমটায় কী রকম হকচকিয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, 'শশাঙ্কবাবু, মিস্টার মুখার্জি।'

শশাঙ্ক ফিক করে হেসে ফেলল, 'মাতাল হওয়া আর অজ্ঞান হওয়া এক কথা না বিকাশবাবু।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমার নাম অংশু। অংশু চট্টোপাধ্যায়।'

শশাঙ্ক মুখ বিকৃত করে বলল, 'নামটা খটোমটো, ভাল লাগল না। তার চেয়ে যদি বিকাশ কিম্বা অশোক বা এই ধরনের কিছু হতো অনেক সহজ হতো। পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্ত কী জানেন? সবচেয়ে শক্ত হচ্ছে, সহজ হওয়া। বি ইজি। সহজ হয়ে যান, দেখবেন কোন কষ্ট নেই। আমরা কষ্ট পাই, শুধুমাত্র সহজ হতে পারি না বলেই না! এই যে সন্ধ্যে—সন্ধ্যে কেন, কোন কোনদিন গভীর রাত পর্যন্ত আমাকে এই বদ্ধ ঘরটায় নিজেকে আটকে রাখতে হয়, কেন? হোয়াই? যেহেতু আমি সহজ হতে পারি না। আত্মঅহঙ্কার আমাকে এই আড়াল থেকে বাইরে আসতে দেয় না। নিজের ইচ্ছায় আজ আমি বন্দী।' বলে দু হাত অসহায়ভাবে তুলে ধরল শশাঙ্ক।

এই অবস্থায় ব্যবসার কথা তোলা না তোলা সমান। উঠবো উঠবো করছিলাম, হঠাৎ শশাঙ্ক বলে উঠল, 'আপনি বিব্রত বোধ করছেন, বুঝতে পারছি। যদি লাঞ্চের আগে আসতেন আমি স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলতে পারতাম। তা ছাড়া আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল। অবিশ্যি এমন ঘটনা প্রতি মাসে একবার দুবার ঘটছেই। তবু অন এ স্পেশাল অকেশন, একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করা উচিত। তাই আজ এই যথেচ্ছ মদ্যপান।' বলে এক চুমুকে গ্লাস খালি করে ফেলল শশাঙ্ক।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি স্পেশাল অকেশন আজ?'

'আজ আমার স্ত্রী কোলকাতায় চলে গেলেন।' বলে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপর নিজের কপাল চেপে ধরল শশাঙ্ক। মানুষের এই অসহায় অবস্থা দেখতে খুব খারাপ লাগে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'পরে একদিন আসবো। চিঠি লিখে আসবো। সেদিন ড্রিঙ্ক করবেন না। চেষ্টা করবো লাঞ্চের আগেই আসতে।' বলে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিগারেট আর মদের গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বাইরে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম।

কাছ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল, বললাম, 'আপনাদের আর কোন সাহেব আসেন নি এখনও?'

লোকটি বলল, 'ও'রা সবাই লাঞ্চের পরে আসবেন। আপনি বসবেন?'

'না' বলে বেরিয়ে এলাম। অফিসটা আকারে বিশেষ বড় না। এখন মাধ্যাহ্নিক বিরতি, কিন্তু মনে হল লোকজনের সংখ্যা বা ব্যবসার অবস্থা মোটামুটি ভালই। অথচ এই কোম্পানীর বড়সাহেব একটা বদ্ধ কামরায় মত্ত এবং অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাইরের কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না। এর জন্য অফিসে কোন কাজের ব্যাঘাতও ঘটে না হয়তো। করবীর কথা আবার মনে পড়ল। ইচ্ছে করলে করবী শশাঙ্ককে বাঁচাতে পারত। একটা অসহায় পঙ্গু জীবনের বিনিময়ে সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন তাকে দিতে পারত। করবীকে এই মুহূর্তে আমার দারুণ ঘৃণা করতে ইচ্ছে করল। বলতে ইচ্ছে হল, তুমি ভয়ানক নিষ্ঠুর করবী। একজন মুমূর্ষু মানুষকে ইচ্ছা করলে তুমি নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারতে। কিন্তু সেই চেষ্টা না করে তুমি কোলকাতায় চলে গেলে।

দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কর্মব্যস্ত শহর। মানুষজন হাঁটছে, গাড়ি চলছে। কর্মমুখর জগতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে পরম সুখ পেলাম।

ট্রেনে চড়তে চিরদিন আমার ভাল লাগে। আজও লাগল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। কলকাতা ছেড়ে যেদিন আসি, সেদিনও অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন ছুটে চলেছিল। মার কথা খুব মনে পড়ছিল সেদিন। আজ করবীর কথা মনে পড়তে লাগল। সেদিন করবী ট্যাক্সিতে যেতে যেতে যেসব কথা বলেছিল, সব মনে পড়তে লাগল। অথচ স্মৃতি রোমন্থন করতে আমার ভাল লাগে না। অতীত মানুষকে পিছনে টানে। জীবনের পথে আমি সামনে এগিয়ে যেতে চাই। তাই অতীতের সঙ্গে আমার বড় বিরোধ। কিন্তু কোন কোন অসতর্ক মুহূর্তে পিছনের জানালা দিয়ে ফেলে আসা জীবনের কিছু কিছু অংশ দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বলেই তাকিয়ে দেখি। দেখি কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু করবী আজ একটি জেদী মেয়ের মত বারংবার আমাকে টেনে টেনে পিছনে নিয়ে আসছিল। বারংবার ওর দিকে আমাকে আকৃষ্ট করতে চাইছিল। আমি সিগারেট খেতে ভালবাসি না। কিন্তু যখন হাতে কিছু করার থাকে না, কিম্বা অজস্র কতগুলো চিন্তা এসে মন ভারাক্রান্ত করে দিতে চায়, তখন আমি সিগারেট খাই।

খুব সতর্ক হয়ে আমাকে সিগারেট টানতে হয়। এই সতর্কতার মধ্য দিয়ে আমি একটা একঘেয়ে চিন্তাকে ভুলতে চাই। অথচ আজ আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছিল। করবীর চিন্তাটা একটা নাছোড়-বান্দা মাছির মতই উড়ে উড়ে আমার মগজে এসে বসছিল। করবী একদিন বলেছিল, তুমি বোকা না, তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ। কথাটার মধ্য দিয়ে ও আমার অন্তর স্পর্শ করতে চেয়েছিল। জানি না, ওর সেই চেষ্টা সফল হয়েছে কিনা। আমার ধারণা, হয় নি। কারণ এতগুলো দিনের মধ্যে বিশেষ করে করবীর কথা আমার আর একদিনও মনে পড়ে নি। ব্যর্থতাকে আমি ঘৃণা করি। প্রেম ব্যর্থতা নিয়ে আসে। ঠিক সেই কারণেই আমি করবীর প্রণয়প্রার্থী হতে চেষ্টা করি নি। করবীর প্রণয়ী না হয়েও আজ আমি করবীর কথা ভাবছি, শশাঙ্ককে করবীর স্বামী কল্পনা করে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই উচ্চারণ করলাম, না। করবীর স্বামীরূপে শশাঙ্ককে কল্পনা করিনি। ওকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবো, সে শুধুমাত্র অনিমেষের বন্ধু বলে। সময় সময় নিজের মনকে এক গভীর অরণ্য বলে ভ্রম হয়। মনে হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গহন অরণ্য আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে, আর আমি সেই অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র একটি প্রাণী, শুধু চক্রাকারে ঘুরেই মরছি। এ ঘোরার বিরাম নেই, ছেদ নেই, উদ্দেশ্য নেই, শুধু আবহমানকাল ধরে নিজের মধ্যে এই যে ঘুরে মরা, কী বলে একে। আত্মানুসন্ধান বা নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা? কিন্তু সে চেষ্টা তো আমার নেই। আমি রক্তমাংসের সামান্য একজন মানুষ. আমি নিজেকে উপলব্ধি করতে চাই না, জগৎ সংবন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। আমি শুধু নিজেকে নিয়ে বিব্রত এবং আমার পারি পার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকি। অথচ এই মুহূর্তে আমার চরিত্রগত দোষ কিম্বা গুণ (বা যাই হোক না কেন, একটা কিছু, যেটা কিনা শুধু মাত্র আমারই মত) হারিয়ে ফেলে আমি অন্য একজন মানুষের মত ব্যবহার করতে শুরু করে দিলাম। করবী, যে কিনা আমার জীবনে কোনদিন প্রেমিকারূপে আসে নি, বা আসার সম্ভাবনাও নেই, সে-ই কিনা এক রোমাঞ্চকর গভীর নিশীথে আমার সঙ্গে সন্দেহজনক ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়ল। রোমাঞ্চকর নিশীথ বলতে আজকের রাত্রটাকেই মনে হচ্ছে আমার। বাইরে অন্ধকার, ভেতরেও তাই। এই কামরায় আর যে তিনজন যাত্রী রয়েছেন, তারা ঘুমোচ্ছে। বাতাসে একটা ঠান্ডা ভাব। সবকিছু মিলিয়ে এইরকম মুহূর্তগুলো আমার মনে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেয়। করবী এখন আমার সঙ্গ নিচ্ছেতেই ছাড়ল না. আমি করবীকে নিয়ে নতুন খেলায় মেতে উঠলাম, ধরা যাক, সমস্ত দিন পরে শশাঙ্ক ঘরে ফিরে এসেছে। সন্ধ্যাবেলায় মদ খেয়ে ওর মুখ ফুলে উঠেছে, চোখ অসম্ভব লাল, অসংলগ্ন কথাবার্তা। করবী খুব সুন্দর করে সেজেছে। ওর গা দিয়ে মৃদু মৃদু গন্ধ বেরোচ্ছে। হয়তো কোন পাউডার বা সেন্টের গন্ধ। করবীর রুক্ষ চুলে কোন তেলের আভাস নেই। সুতরাং করবী যে তেল মাখে না তা নিশ্চিত। করবী যাই মাখুক না কেন, ওর শরীর দিয়ে মৃদু মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছিল। কিন্তু একটা চড়া গন্ধ সেই গন্ধকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। জলদস্যুর মত করবীর সামনে এসে দাঁড়াল শশাঙ্ক। নিমেষে করবীর মসৃণ মুখে কতগুলো কুটিল রেখা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ আগেও করবীর মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসিটা হারিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল, দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা আর গ্লানি। একটা ক্রুদ্ধ মানুষ যেন দুই হাত দিয়ে শশাঙ্ককে দূরে ঠেলে দিতে চাইল। কিন্তু পাওয়ার নেশায় জলদস্যু আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সেই শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই করবীর। করবী উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে নিজের জীবনভিক্ষা চাইতে লাগল। কিন্তু কেউ করবীর কাছে এগিয়ে গেল না। হঠাৎ করবী আমার খুব কাছে এগিয়ে এল। ওর চোখে মুখে আগুনের শিখা। সেই আগুন দিয়ে করবী আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইল। আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসতে চাইলাম। কিন্তু আমার সামনে পিছনে শুধু আগুনের শিখা। আমি নতজানু হয়ে করবীর কাছে নিজের জীবন ভিক্ষা চাইলাম। করবী আমাকে করুণা করল। আমাকে ভিক্ষা দিল।

জানি না, এভাবে নিজের সঙ্গে খেলা করে মানুষ সুখ পায় কিনা। আমি গভীর সুখ পেলাম। আমার ভারাক্রান্ত হৃদয় খুব হালকা হয়ে গেল। করবী আমার পিছন থেকে সরে গেল। যাবার সময় সব জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে গেল।

ট্রেন ছুটছে। সঙ্গে সঙ্গে দুলছেও। এলার্ম চেনের সঙ্গে কাঠের ঠোকাঠুকি হচ্ছে। চাকার খটাখট শব্দ ছাপিয়েও সেই ঠোকাঠুকির শব্দ কানে আসছে। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বুঝতে পারছিলাম, অনেকগুলো শব্দের সমষ্টি একটা বিরাট শব্দ হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। চাকা গড়াচ্ছে। ঘর্ষণের ধাতব শব্দ, সঙ্গে এসে মিশেছে তীব্র গতির রুদ্ধ আক্রোশ। গতি যত বাড়ছে, আক্রোশও তত বাড়ছে। অথচ এই আক্রোশ যে কার, ট্রেনের না গতির, না চারিপাশের বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হবার ফলে—বলতে পারব না। শুধু মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে মহাকাল থাবমান ট্রেনটাকে লাইন থেকে তুলে নিয়ে যে কোন একটা দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ধীরে ধীরে চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। সেই আক্রোশ বা রুদ্ধ চাপা গর্জন আর আমার কানে আসছে না। শুধু হাওয়া কাটার মিষ্টি শন শন একটা আওয়াজ। মনে হচ্ছিল বিরাট আকাশের নীচে অসংখ্য বড় বড় পাখি ডানা নেড়ে উড়ে চলেছে। ওরা উড়ছে, ওদের পাখার কম্পনে চারিদিকে একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। সেই শব্দটা খুব মিষ্টি বলে মনে হতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে পড়ল। মনে পড়ল রাজভবনের নীচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রেড রোডের ঠিক ওপরে মাঝে মাঝে আমি একটা নীল আকাশ দেখতে পেতাম। সেই আকাশ দেখতে দেখতে একদিন আমি বলেছিলাম, এমন একটা আকাশ, যার রং গাঢ় নীল, নীচে টিয়া রংয়ের প্রকাণ্ড বড় মাঠ, আকাশে বড় একটা সাদা পাখি, পাখিটা উড়ছে না, শুধুই ভাসছে।

সুপ্রিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছিল। কথাটা বলে ফেলে আমার মনে হয়েছিল, এই কথা সুপ্রিয়াকে না বললেই ভাল হতো। সুপ্রিয়া হয়ত দারুণ হাসবে। কিন্তু সুপ্রিয়া হাসে নি। চকিতে শুধু একবার রেড রোডের ওপরের আকাশটাকে দেখে নিল, তারপর যেরকম হাঁটছিল, সেরকমই হাঁটতে লাগল।

করবীর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

কলকাতা ৭১ প্রসঙ্গে

গত বছর দীঘা থেকে ফিরছিলাম একই বাসে শ্রীমৃণাল সেনের সংগে। আমার ঠিক পেছনের সিটেই বসেছিলেন তিনি। বাসে আরো অনেক যাত্রী। চিনলেনও তাঁকে। স্বভাবতই বহুজনে নানা প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে এবং তিনিও একের পর এক সব জিজ্ঞাসার করেছেন সমাধান, বক্তব্য রেখেছিলেন বলিষ্ঠভাবেই। তখনই তাঁর মধ্যে যে ঐকান্তিক সমাজচেতনার পরিচয় পাই তার রূপায়িত দেখলাম 'কলকাতা ৭১'-এ। একটি প্রশ্নের উত্তরে মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমান প্রসংগ নিয়ে আমি এমন একটা কিছু গবেষণা করছি যা অদূর ভবিষ্যতে সকলকে ভাবিয়ে তুলবেই।' কথা প্রসংগে বলেছিলেন ঠিক, তবে 'কলকাতা ৭১' যে ভাবে আমাদের ভাবিয়ে তুলবে তা বোধহয় তিনিও কল্পনা করেননি। এবং এটা সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে তাঁদেরই, যাঁরা সমালোচনার খড়্গ নিয়ে তাঁর শিল্পভাবনার মর্মমূলে বার বার আঘাত করেও ব্যর্থ হয়েছেন।

বিজন শেঠ
কলকাতা—৬।

॥ ২ ॥

অনেক আলোচনা ও সমালোচনায় মুখরিত কলকাতা ৭১। অমৃতেও সেই সম্বন্ধীয় কিছু লেখা প্রকাশ হয়েছে। সেই জন্য স্বভাবতই কিছু লিখতে ইচ্ছা করে। ধন্যবাদ জানাই—মৃণাল সেন সহ সমস্ত কলাকুশলীকে। মিথ্যার বোরখা দিয়ে আর কতকাল চলবে? দশকের পর দশক আমরা এগিয়ে এসেছি। বঞ্চনা-দারিদ্র্য-আর শোষণের পরিবর্তন কি কাম্য ভাবে হয়েছে? মৃণাল সেন নির্ভীকভাবে সোচ্চার হয়ে বলেছেন একথা। হয়ত রাষ্ট্রপতির পুরস্কার জুটবে না এ বইয়ের ভাগ্যে। সুবিবেচকের অভাবে (?) ছাড়পত্র পেয়ে বিদেশে কলাও করে দেখানো হয়েছে বইটা' জনৈক মন্ত্রীর উক্তি। কিন্তু এ যে সর্বকালের সত্য। সৌন্দর্য রক্ষার মিথ্যার আশ্রয়কে সত্যাকারের শিল্প বলা যায় না। রঙিন স্বপ্ন আর তার পাশেই নিষ্ঠুর বাস্তবতা যেমন বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে প্রয়াস পায় তেমনি বিবেক বুদ্ধি আজকের সমাজের কাছে মৃণাল সেনের সৈনিক সম্প্রদায়ের পক্ষে। কিছু জিজ্ঞাস্যও সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

অশ্বিনীকুমার মণ্ডল
কলকাতা—১২।

দেশেই ও'দের সংস্থান করা হোক

কয়েকদিন আগে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে আসা একজন ডাক্তারের সংগে আলাপ হলো। আলাপের সূত্র অবশ্যই আমার এক ডাক্তার বন্ধু। চিকিৎসক ভদ্রলোক ব্যবহারে যেমন অমায়িক, ডিগ্রীর দিক থেকেও তেমনি উঁচু দরের। ডবল এফ আর সি এস তিনি। লণ্ডনের এক হাসপাতালে চাকরি করেন। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেশে এসেছেন। সংগে তাঁর রিটার্ণ টিকিট। কাজকর্ম চুকলেই আবার বিদেশে (তাঁর নিজের ভাষায় স্বদেশে) ফিরে যাবেন। কিন্তু বাবার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পরও তিনি বেশ কিছুদিন থেকে গেলেন। একদিন দেখা হতেই জানতে পারলাম যে, কলকাতাতেই তিনি চাকরির চেষ্টা করছেন। মোটামুটি মাইনের একটা কাজ পেলে আর বিদেশে যাবেন না। তাঁর কাছ থেকেই আরো জানতে পারলাম যে সে দেশে অর্থাৎ বিলেতে ভারতীয় ছাত্র যাঁরা ডাক্তারিতে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য যান তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা।

সেদেশে বেশির ভাগই যান জব-ভাউচার নিয়ে। ফলে সকলকেই চাকরি করতে হয় এবং তাঁদের পোস্টিং হয় সাধারণত লণ্ডন থেকে বেশ দূরে অর্থাৎ সুদূর গ্রামাঞ্চলের কোন হাসপাতালে। হাসপাতালে কাজের চাপ এত বেশি যে তাঁরা ঠিক মতো পড়াশোনা করতে পারেন না। তাছাড়া মাইনে যা পান তাতেও চলে না। তাই আয়ের অন্য পথ দেখতে হয়। সকালে-বিকালে কোথাও হয়তো পার্টটাইম করেন। আবার কোন ডাক্তারের অধীনে থেকে 'লোকাল কলে' যেতে হয়। এমনিভাবে সারা দিনই তাঁরা কাজে ব্যস্ত থাকেন। যে জন্য যাওয়া সেই পরীক্ষায় পাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবারে হয় না। কখনো কখনো আবার বছর বছরই অকৃতকার্য হন। এদিকে যাঁরা পাশ করে দেশে ফেরেন তাঁরাও উপযুক্ত চাকরি পান না। অথচ আমাদের দেশে ডাক্তারের যে প্রচণ্ড অভাব সেকথা তো অস্বীকার করা যায় না। একথা শুধু চিকিৎসক নয়, বিজ্ঞানীদের বেলায়ও খাটে। আমি আরো একজনকে জানি যিনি ৭০০।৮০০ টাকা মাইনের চাকরি পেলেও দেশে ফিরে আসতে উৎসুক।

আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ডাক্তার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপকদের এভাবে বিদেশে থাকতে বাধ্য না করে দেশে ফিরিয়ে আনার একটা সার্বিক উদ্যোগ যদি সরকার গ্রহণ করেন তাহলে কেমন হয়?

অপরাজিতা সেনগুপ্ত
কলকাতা—১৯।

মোহন রাকেশ প্রসঙ্গে

'অমৃত'-এর গত ২২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবিধ সংবাদে' পরলোকগত হিন্দী নাট্যকার মোহন রাকেশের সম্বন্ধে পড়লাম। তাতে জানতে পারলাম শ্রীমোহন রাকেশের বিখ্যাত নাটক 'আধে আধুরে' কলকাতার মঞ্চে হিন্দী এবং ইংরেজীতে অভিনীত হয়েছে। আপনারা জানিয়েছেন এই নাটকের বাংলা অনুবাদও আছে, তবে তা নাকি এখনও মঞ্চস্থ হয়নি। আমি এ সম্বন্ধে আপনাদের জানাচ্ছি, এই নাটকটি গত ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ দিল্লীর অন্যতম খ্যাতনামা নাট্য সংস্থা 'যাযাবর গোষ্ঠী' দিল্লীস্থ 'ফাইন আর্টস হলে' সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেছিলেন। আমি যতদূর জানি শ্রীমোহন রাকেশের জীবিত অবস্থায় এইটিই শেষ নাটক যা বাংলায় অভিনীত হয়েছে।

পিন্টু মিত্র
লক্ষ্মীবাঈ নগর, নতুন দিল্লী—১৩।

জীবন শেষ!

শেষ পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত মার্কিনী পত্রিকা 'লাইফ' বন্ধ হয়ে গেল। ভাবতেও কেমন অবাক লাগছে। না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, বহুরঙা অজস্র চিত্রশোভিত এই কাগজটিকে আর আমরা দেখতে পাবো না।

একথা ঠিক, লাইফ অন্তত লোকের না এসকোয়ার পাঁচের কাগজ ছিল না। এ ছিল আলাদা জাতের, একেবারে স্বতন্ত্র মানের। কে ভুলতে পারে, লাইফের সেই চোখ-জুড়ানো নানান রঙে ছাপা পাহাড়, সমুদ্র, জীবজন্তুর ছবি-গুলি! হ্যাঁ, বহু ঐতিহাসিক ঘটনাকেও বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রথম তুলে ধরার কৃতিত্ব কখনো কখনো ছিল লাইফ পত্রিকার। ১৯৩৬ সালে প্রথম বেরোয় এই কাগজটি: দশ বছরের মধ্যেই এর প্রচার সংখ্যা আড়াই লাখ থেকে পৌঁছয় পঞ্চাশ লাখে। অবশ্য এসবই টেলিভিশন যুগের আগের কথা। আর টি ভি প্রচারের সংগে সংগে 'লাইফ'এর কদর হল পড়তির দিকে, আয়ও হল নিম্ন-মুখী। টেলিভিশনের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটল। হায়, উজ্জ্বল লাইফ-এর শেষ নিঃশ্বাস!

পত্রলেখা গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৩।

জীবাশ্মবিদ্যা ও প্যালিয়ন্টোলজি

অয়স্কান্ত

পৃথিবীতে মানুষ এসেছে মাত্র ৫০ লক্ষ বছর আগে। 'মাত্র' বললাম এ-কারণে যে তার আগে প্রায় দু-শো কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো আকারে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। এবং এই সময়ের মধ্যে প্রাণের একটি বিবর্তনও ঘটে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন প্রায় ছবি আঁকার মতো করে বলে দিতে পারেন কি-ভাবে আদিম সমুদ্রের জলে এককোষী একটি জীব থেকে প্রাণের যাত্রা শুরু, কোন পর্বে মেরুদণ্ডী, কোন পর্বে উভচর, কোন পর্বে স্থলচর, কোন পর্বে খেচর, কোন পর্বে সরীসৃপ, কোন পর্বে স্তন্যপায়ী ইত্যাদি। এখনো পর্যন্ত মানুষ হচ্ছে প্রাণের বিবর্তনে উচ্চতম প্রকাশ কিন্তু তাই বলে দুশো কোটি বছরব্যাপী প্রাণের বিবর্তনের সঙ্গে অ-সম্পর্কিত নয়। যদি কেউ বলেন, আজ থেকে উনিশ কোটি বছর আগে ট্রিয়াসিক কালের ডাইনোসরদের সঙ্গে মানুষও এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছে তাহলে কথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তেমনি বলা চলে না যে আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে ক্যামব্রিয়ান কালে ট্রাইলোবাইট-দের সঙ্গে ডাইনোসরদেরও দেখা যেতে পারত। প্রাণের বিবর্তনে কোন সময়ে কোন জীবের উদ্ভব তা প্রায় ছকবাঁধা। পুরো ছকটি নিখুঁতভাবে জানা গিয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা অবশ্য দাবি করেন না। কিন্তু তাই বলে এতটা অসম্পূর্ণও নয় যে অস্বীকার করা চলে। এবারে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, এতটাই বা জানা গেল কি করে? কোনো মানুষ তো ডাইনোসর বা ট্রাইলোবাইটকে চাক্ষুষ দেখেনি, আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তাহলে ডাইনোসর বা ট্রাইলোবাইট বা এ ধরনের আরো হাজারটা জীব সম্পর্কে মানুষকে কে খবর জানাল? লিখিত ইতিহাস পড়ে বড়োজোর গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস জানা যাচ্ছে—কিন্তু তার আগের? সেই বিবরণ কোন পুঁথির পাতায় লেখা আছে? কি ভাবে? প্রাণের বিবর্তনের বিবরণ সম্পর্কে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা তা উদ্ধার করেছেন ফসিলের পাঠ থেকে। অতীতের প্রাণীরা অনেক সময়েই তাদের অস্তিত্বের কিছু একটা নিদর্শন রেখে গিয়েছে--একটা হাড়, একটা দাঁত, পাথরের গায়ে অবয়বগত আকৃতির একটা ছাপ--তারই নাম ফসিল বা জীবাশ্ম। বিজ্ঞানীরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এই সমস্ত ফসিল খুঁজে বার করেন এবং এই ফসিলের মধ্যেই খুঁজে পান পুরো জীবটির বিবরণ। ফসিল থেকে জীবের বিবরণ সংগ্রহ—বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে তারই নাম প্যালিয়ন্টোলজি বা জীবাশ্মবিদ্যা। এই বিদ্যার চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা হচ্ছেন প্যালিয়ন্টোলজিস্ট বা জীবাশ্ম-বিজ্ঞানী।

জীবাশ্মবিদ্যার শুরু, বলা চলে, আজ থেকে দেড়শো বছরেরও কিছু আগে। এক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে যাঁর নাম স্মরণীয় তিনি হচ্ছেন ফরাসী বিজ্ঞানী জর্জ কুভিএ (১৭৬৯—১৮৩২)। বহু কীর্তির অধিকারী এই বিজ্ঞানীর একটিমাত্র কীর্তি উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে, জীবাশ্ম-বিজ্ঞানীরা কী আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে কুভিএর বয়স কুড়ি, অর্থাৎ পূর্ণ যুবক, তবুও তিনি এই দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহ বোধ করেন নি, নরম্যাণ্ডির উপকূলে ঘুরে ঘুরে সামুদ্রিক জীবের নমুনা সংগ্রহ করতেন। নিজের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি যে কতখানি নিবেদিত ছিলেন, শুধু এটুকু বোঝাবার জন্যেই এই ঘটনার উল্লেখ। তখনো পর্যন্ত এ ধারণা স্পষ্ট ছিল না যে, প্রাণের নানা রূপে প্রকাশের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, একটা সম্পর্কের সূত্র। তবে এই ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে শ্রেণীবিভক্ত করা চলে। শ্রেণীবিভাগের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন সুইডেনের বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনীয়াস। এই পদ্ধতিই এখনো পর্যন্ত অনুসৃত। শ্রেণীবিভাগের আসল কথাটি কী? বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং এই সাদৃশ্য অনুসারে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লিনীয়াস যে বইটি লিখেছিলেন তার প্রকাশ-কাল ১৭৩৫ সাল। ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' আরো একশো পঁচিশ বছর পরের ঘটনা। কুভিএর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে লিনীয়াসের এই বইটিই তাঁকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছিল। তারপরে ১৮০২ সালে, কুভিএ যখন ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক, প্যারিসের জিপসাম খনি-অঞ্চলের কতকগুলো ফসিল তাঁর হাতে এসে যায়। ফসিল বলতে টুকরো টুকরো হাড় ও দাঁত। তখন তিনি উঠেপড়ে লাগলেন এই সামান্য হাড় ও দাঁত থেকে পুরো জীবটির মূর্তি খাড়া করতে। সে সময়ের পক্ষে প্রায় এক অসম্ভব প্রয়াস বলা চলে। দাঁত পাওয়া গিয়েছিল দু-ধরনের --পেষণ ও শব। পেষণ দাঁতগুলোর মধ্যে গরমিল নেই, কিন্তু শব-দাঁতগুলোর কোনোটা
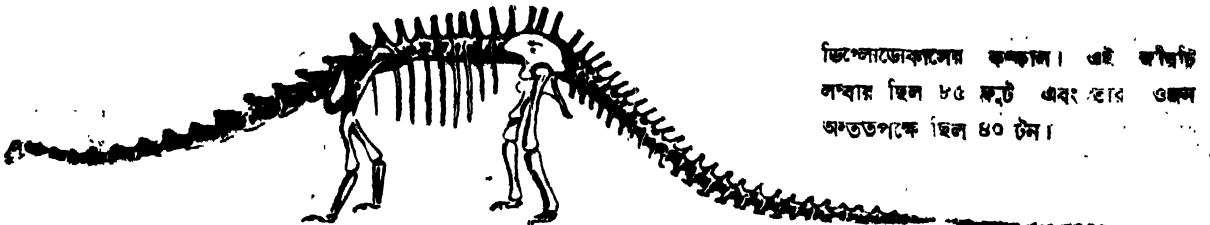
ডিপ্লোডোকাসের কঙ্কাল। এই জীবটি লম্বায় ছিল ৮৫ ফুট এবং তার ওজন অন্ততপক্ষে ছিল ৪০ টন।

২।। ডিপ্লোডোকাসের শরীরের কাঠামোগত ডিজাইন। ওপরের দিকে আর্চ সেতু, নিচের দিকে সাসপেনশন সেতু। ৩।। মাছের শরীরের ক্রস-সেকশন বা প্রস্থচ্ছেদ। শিরদাঁড়া শরীরের মাঝখানে। অন্য তিনটি ছবি যথাক্রমে হিপোপটেমাসের, হাতির ও ডিপ্লোডোকাসের।
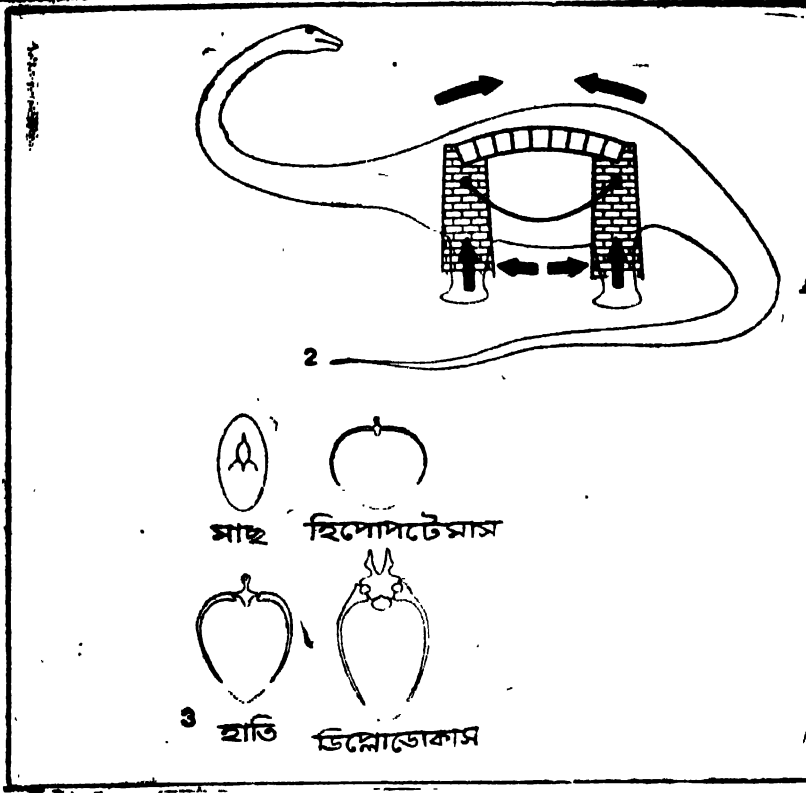
ছোট কোনোটা বড়ো। মাথার খুলির হাড়েও এই অমিল। কুভিএ লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে জোড় মেলাতে লাগলেন।

এবং শেষ পর্যন্ত অসাধ্যসাধন করলেন বলা চলে। সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন : পেষণ-দাঁতগুলো একালের গণ্ডারের সঙ্গে তুলনীয় কোনো জীবের। পুরু চামড়াওলা তৃণ-ভোজী জীব। দু ধরনের, কেননা শব-দাঁত ভিন্ন। একটির নাম দিলেন 'অ্যানোপ্লো-থেরিয়াম' (অস্ত্রহীন বন্য জন্তু), অপরটির 'প্যালিওথেরিয়াম' (প্রাচীন বন্য জন্তু)। শুধু এই সিদ্ধান্ত নয়, সূত্র জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত জন্তুটির সম্পূর্ণ আকৃতি কল্পনা করতে পারলেন এবং কাগজে-কলমে ছবি এঁকে দেখালেন। যে জীব পৃথিবী থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে লোপ পেয়েছে, সামান্য কয়েকটা হাড় ও দাঁত অবলম্বনে তার পুরো ছবি এমনভাবে কল্পনা করতে পারলেন যেন তিনি চোখের সামনে দেখছেন।

কিছুকালের মধ্যেই এমন প্রমাণ পাওয়া গেল যাতে মনে হতে পারত, তিনি প্রকৃতই চোখের সামনে দেখেছেন। কিছুকাল পরে সেই জিপসাম খনি-অঞ্চল থেকে পাওয়া গেল প্যালিওথেরিয়ামের আস্ত একটি কঙ্কাল। তখন দেখা গেল, সামান্য কিছু খুঁটিনাটির ব্যাপার বাদ দিলে কুভি-এর আঁকা ছবির এবং কঙ্কালের হুবহু মিল। প্যারিসে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মে আঁকা ছবি ও কঙ্কালটি পাশাপাশি রাখা আছে। দেখে মনে হয়, কঙ্কাল দেখেই ছবি আঁকা।

এই আশ্চর্য কাণ্ডটি ঘটিয়ে কুভি-এ একটি নতুন বিজ্ঞানের পত্তন করলেন : জীবাশ্মবিদ্যা। তারপর থেকেই ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবের সম্পূর্ণ মূর্তিটি খাড়া করার চেষ্টা চলছে। গত একশো বছরে এই বিশেষ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বও অনেকখানি। যেসব জীবের কোনো-না-কোনো ফসিল পাওয়া গিয়েছে তাদের মোটা-মুটি একটা চেহারা এখন আমরা কল্পনা করতে পারি। আরো একবার বলি, বিজ্ঞানের যে-শাখাটির চর্চায় এ-ব্যাপার ঘটেছে তার নাম প্যালিয়ন্টলজি বা জীবাশ্মবিদ্যা।

প্যালিয়-ইঞ্জিনীয়ারিং

ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবের বিবরণ সংগ্রহ—এই হচ্ছে জীবাশ্মবিদ্যা। এই ফসিল হতে পারে একটা দাঁত বা একটা হাড় বা শরীরে একটা ছাপ মাত্র। এই সামান্য সূত্র থেকে সম্পূর্ণ মূর্তিটি কল্পনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সাধারণত তুলনামূলক শারীরবিদ্যার সাহায্য নিয়ে থাকেন। আর ফসিলের বয়স নির্ধারণ করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার ও রসায়নবিদ্যার, ভূবিদ্যার তো বটেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে আরো একটি বিদ্যার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। তা হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং। বিজ্ঞানীরা দেখছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্রগুলো (যেমন, সেতু নির্মাণের সূত্র, বিমান নির্মাণের সূত্র ইত্যাদি) যদি জীবাশ্মবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা যায় তাহলে ফসিল থেকে সংগৃহীত বিবরণের অনেক ফাঁক ভরাট হতে পারে। বলা হচ্ছে, এ এক নতুন বিজ্ঞান : প্যালিয়-ইঞ্জিনীয়ারিং। এই বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে পৃথিবী থেকে লুপ্ত প্রাণীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানা যেতে পারে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগেকার কালের জীব টেরোড্যাকটিল টেরানোডন সম্পর্কে জানার চেষ্টা হচ্ছে। এই জীবটি আকাশে উড়ত, এত বৃহৎ আকারের উড়ন্ত জীব জগতে আর কখনো দেখা যায় নি। এই জীবটি সম্পর্কেই এতদিন পর্যন্ত যা-কিছু জানা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী জানা গিয়েছে প্যালিয়-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য নিয়ে—শুধু তার চেহারা সম্পর্কে নয়, বেঁচে থাকার ধরন সম্পর্কেও।

জীবাশ্মবিজ্ঞানীরা এতদিন পর্যন্ত কি করে এসেছেন? ফসিলের বয়স নির্ধারণ করতেন ভূবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সাহায্যে, ফসিলের সংরক্ষণ রসায়নবিদ্যার সাহায্যে এবং ফসিল থেকে সম্পূর্ণ জীবটির মূর্তি কল্পনা করতে চেষ্টা করতেন জীবন্ত জীবের শারীরগত কাঠামোর তুলনামূলক বিচার থেকে। ইঞ্জিনীয়ারিংকে মোটামুটি উপেক্ষা করতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য অনেক বেশী লাভজনক। কেননা প্রত্যেকটি জীবেরই রয়েছে একটি যান্ত্রিক কাঠামো আর সেই কাঠামোটি হওয়া চাই এমন যাতে তার ওপরে চাপানো ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে ও শক্তপোক্ত হয়। প্রত্যেকটি জীবকেই নড়াচড়া করতে হয়, কাজেই মাংসপেশী হওয়া চাই যথেষ্ট বৃহৎ ও সঠিকভাবে স্থাপিত। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য নিয়েই এই বিচার হতে পারে।

বিশেষ করে বড় মাপের জীবগুলোর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্য বিশেষ ফল-প্রসূ। যেমন, ৮৫ ফুট লম্বা শরীরবিশিষ্ট ডাইনোসর ডিপ্লোডোকাসের কথা ধরা যাক। এই জীবটির পুরো শরীরের ভার বহন করত চারটি পা। তাহলে সেই বিশাল শরীরটি মাঝখান দিয়ে ভেঙে যেত না কেন? ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হত, ডিপ্লোডোকাস সাধারণত থাকত জলে এবং জলে থাকার দরুন তার শরীরের ওজন কমে যেত—ফলে পায়ের ওপরে বেশী ভার পড়ত না। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্র প্রয়োগ করে ডিপ্লোডোকাসের শরীরের কাঠামোর দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এটির গড়ন এমনই যে, ওপরের দিকটি আর্চ সেতুর মতো আর নীচের দিকটি সাসপেনসন সেতুর মতো। আর লম্বা গলা ও লেজ যেন শরীর থেকে উদ্গত ক্যান্টিলিভার। এক্ষেত্রে কমপ্রেশন মেম্বার হচ্ছে শিরদাঁড়া আর জীবিত অবস্থায় শিরদাঁড়ার উপরে যে পেশীবন্ধ ছিল সেটাই টেনশন মেম্বার। বোঝা যেখানে সবচেয়ে বেশী শিরদাঁড়ার শিরা সেখানে সবচেয়ে লম্বা।

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্র ধরে এমনিভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, ডিপ্লোডোকাসের কাঠামোটিই এমন যে তার চারটি পা তার শরীরের পুরো ভার বহনে সক্ষম। সেজন্যে এই জীবটির জলে আশ্রয় নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ডাঙাতেই দিব্যি চলা-ফেরা করতে পারত। একালের হাতীও ডাঙার জীব, তেমনিভাবেই তার শরীরের কাঠামো তৈরী। কিন্তু হিপোপটেমাস ভাল-বাসে জলে থাকতে। হাতীর শরীরের গড়নের সঙ্গে ডিপ্লোডোকাসের মিল লক্ষ্য করা যেতে পারে। পুরোপুরি জলের জীব মাছের শরীরের গড়ন ভিন্ন ধরনের—হাতীর মতো সরু নয়। হিপোপটেমাস ডাঙাতেও চলে, অতএব হিপোপটেমাসের শরীরের গড়ন দুয়ের মাঝামাঝি।

ইঞ্জিনীয়ারিং কাঠামোটি যদি হয় বড় আকারের তাহলে সেটির অবশ্যই হওয়া চাই এমন শক্তপোক্ত যে, নির্মাণ কার্যের সকল স্তরে নিজস্ব ভার বহনে সক্ষম হয়। যেমন, পশু-পাখির ডিম। এই ডিমের খোলাটি হওয়া চাই এমন শক্ত যাতে ভিতরকার তরল পদার্থের চাপ সহ্য করতে পারে, আবার এমন নরম যাতে সময় হলে খোলা ভেঙে ছানা বেরিয়ে আসতে পারে। কাজেই ডিমের খোলা কতখানি শক্ত হওয়া সম্ভব তার একটা সীমা থেকে যায়, যত বড় আকারের ডিম-ই হোক।

আর উড়ন্ত জীবের বেলায় তো ইঞ্জি-নীয়ারিং-এর সূত্রগুলো আরো কড়াকড়ি মেনে চলা দরকার। আর জীবটি যদি আকারে বড় হয় তাহলে ডানা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে উড়ে চলার সমস্যাটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে। টেরোড্যাকটিল টেরানো-ডন এতাবৎ কালের সমস্ত উড়ন্ত জীবের মধ্যে আকারের সবচেয়ে বড়। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সূত্র ধরে বিচার করলে এই জীবটি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যেতে পারে। জানা গেছেও। যেমন, জীবটির শরীরের ওজন, ডানার বিস্তার ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক হিসেব, ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী এই নতুন বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। আশা করা চলে, অতীতের পৃথিবীর অন্ততপক্ষে বৃহৎ আকারের জীবগুলো সম্পর্কে অচিরেই আরো বিশদ বিবরণ জানা যাবে।

অ্যাপেলো-১৭ অভিযানে চাঁদে জলের চিহ্ন আবিষ্কার

অ্যাপোলো-১৭ অভিযান নিখুঁতভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর এইটেই শেষ অভিযান। আগামী একপুরুষের মধ্যে চাঁদে আবার মানুষের পা পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

চাঁদের মাটিতে পা দেওয়া এবার নিয়ে ছ-বার। প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অভিযান সম্পর্কে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই সমালোচনা শোনা গিয়েছিল যে চাঁদের দেশে বারে বারে একই ধরনের অভিযান চালানো বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নিরর্থক,

(ওপরে) অ্যানোপ্লোথেরিয়াম (নিচে) প্যালিওথেরিয়াম কয়েক টুকরো ফসিল থেকে কুভিএ এই দুটি জীবনের সম্পূর্ণ আকৃতি কল্পনা করতে পেরেছিলেন।
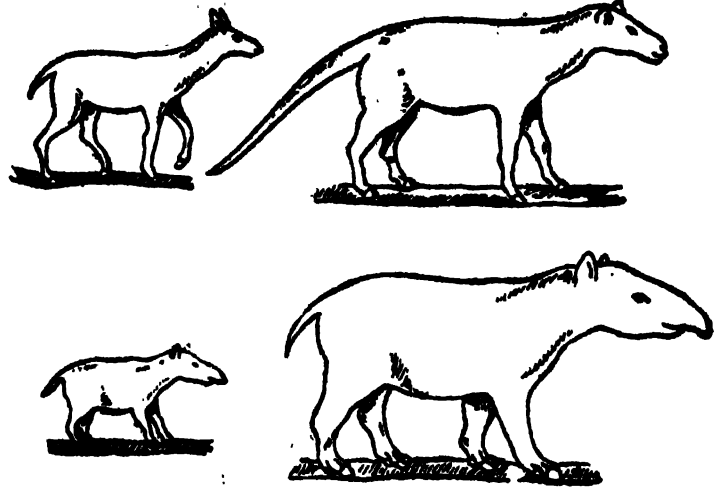
মানুষকে চাঁদে পাঠিয়ে যতোটুকু করা যাচ্ছে তার সবটুকুই অনেক কম খরচে যন্ত্রের সাহায্যে করা যেত। ষষ্ঠ অভিযান নিয়ে তাই অনেক মহলেই খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই এবারের অভি-যানেই এমন এক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে যাতে বিজ্ঞানীমহল রীতিমতো সচকিত। বর্তমান শতাব্দীতে যে আরো কোনো অভিযান হচ্ছে না, এটা এখন আক্ষেপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবারের অভিযানে চাঁদের মাটিতে এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যা থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় চাঁদ একেবারে জলশূন্য নয়। চাঁদে জল পাওয়া যাবে, এমন একটি ধারণা মানুষ এতকাল শুধু স্বপ্নে পোষণ করতে পারত। মঙ্গলবার রাত্রিরে এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়েছে। চাঁদের মাটিতে নভশ্চররা এমন কিছু চিহ্ন পেয়েছেন যাকে জলের অস্তিত্ব সূচক ঘোষণা বলে মনে হতে পারে। অর্থাৎ এতকাল চাদ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল—মৃত জড়পিন্ড মাত্র— তা যথার্থ নয় এমন ধারণা করার কারণ ঘটেছে। এখন জানা যেতে পারে, পৃথিবীর বহু মরুভূমি যেমন পুষ্পিত হয়েছে তেমনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চাঁদকেও একদিন ফুলে-ফলে মানুষের বাস-যোগ্য করা সম্ভব।

নভশ্চররা কি চাঁদের মাটিতে জলের ধারা আবিষ্কার করেছেন? না, তা নয়। কিন্তু এমন নিদর্শন যদি পাওয়া যায় যা থেকে মনে হতে পারে চাঁদের মাটিতে জল আছে—খনিজ আকরে আবদ্ধ অবস্থাতেই হোক বা শিলাস্তরে উবে যাওয়া অবস্থাতেই হোক—তাহলেও তা থেকে জল নিষ্কাশিত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য নয়। অ্যাপোলো-১৭ অভিযানের নভশ্চররা তাঁদের মাটিতে এমনি এক নিদর্শনেরই সন্ধান পেয়েছেন।

সোমবার সারাটা দিন নভশ্চররা কাটিয়ে-ছিলেন যন্ত্রপাতি স্থাপন করার কাজে। অধিনায়ক সেরগন এদিন ৯ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়েছিলেন এবং চাঁদের মাটির কালো অঙ্গারসদৃশ আস্তরের তলা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল এজন্যে। তবুও আস্তরের নিচের শিলাস্তর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন।

পরদিন তাঁরা গাড়ি চালিয়ে গিয়ে-ছিলেন দক্ষিণের কেন্দ্রীয় পর্বতের দিকে। সেখানে ছিল এক মাইল উঁচু পর্বতচূড়ো থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের চাঁই। মানুষ চাঁদ থেকে যতো নমুনা সংগ্রহ করে এনেছে তার মধ্যে এই পাথরই সম্ভবত বয়সে সব-চেয়ে প্রাচীন। সেখান থেকে চ্যালেঞ্জারে ফেরার পথে একটা গহ্বরের পাশ দিয়ে, যার আলোকচিত্র আগে থেকেই নেওয়া ছিল। জানা ছিল যে এটি এমন এক গহ্বর যা থেকে উৎক্ষিপ্ত মাটি-পাথর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েনি, আবার সেই গহ্বরের মধ্যেই জমা হয়েছে। ওপরে তেমনি ধূসর আস্তর, চাঁদের সর্বত্র যা দেখা যায়। আস্তর সরাতেই অধিনায়ক সেরনান দেখলেন, জমির রং কমলা, হলুদ ও লাল। তার মানে, কোনো একসময়ে এই ভূমি জলের সংস্পর্শে এসেছিল এবং তারই ফলে মরচে পড়ার মতো চিহ্ন। তখন নভশ্চররা জমি খুঁড়তে লাগলেন। প্রায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত খুঁড়েও দেখা গেল, জমি একই রকমের লাল ও কমলা। শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল কালো লাভা। তখন নভশ্চররা বুঝতে পারলেন, আগ্নেয়গিরি থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসার সময় যে ধরনের কাটল সৃষ্টি হয় এখানেও তাই। পৃথিবীতেও আগ্নেয়গিরির কাছে এমনি নিদর্শন পাওয়া যায়।

এমনি এক নিদর্শন আবিষ্কার করা যাবে তা ভেবেই অ্যাপোলো-১৭ অভিযানের লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল লিটরোজ-টরাস এলাকা। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন নিদর্শনটি পাওয়া গেল তখন এমনকি পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রের অত্যন্ত হিসেবী বিজ্ঞা-নীরাও উত্তেজনায় দিশেহারা। নভশ্চরদের তাঁরা নির্দেশ দিয়ে...

টেরোড্যাক্‌টিল প্টেরানোডন, উড়ন্ত জীব হিসাবে এখনও পর্যন্ত আকারে সবচেয়ে বড়ো। ডানার বিস্তার ২৭ ফুট।

খুঁড়ে চলতে। নিরাপত্তামূলক সমস্ত হিসেবের বাইরে গিয়ে কাজটি তাঁরা করলেন। ফলে মহাকাশচরদের অক্সিজেনের ভাঁড়ার এতই কমে গিয়েছিল যে পথে ফেরার সময়ে যদি রোভার গাড়িটি স্টার্ট না নিত তাহলে আর তাঁদের জীবন্ত অবস্থায় ফিরতে হত না।

এখানেই সেই কথাটি ওঠে। যাঁরা বলেন, চাঁদের দেশে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মানুষ যা কিছু করেছে সবই যন্ত্রের সাহায্যে করা যেত, তাঁরা এক্ষেত্রে বেকায়দায় পড়তেন। নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের বাইরে যন্ত্রের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। মানুষই পেরেছে প্রোগ্রামকে অগ্রাহ্য করে মাটি গহ্বরের জমি খুঁড়ে চলতে এবং চাঁদের মাটির সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারটির সন্ধান নিয়ে আসতে।

এ থেকে বোঝা গেল এখনো চাঁদের মাটিতে অনেক কিছু অনুসন্ধান করার আছে। ছটি অভিযানের পরেও চাঁদ সম্পর্কে জানতে অনেক কিছু বাকি। সেজন্যে আরো অভিযান চাই। চাঁদে অবতরণ করা ও চাঁদে দিন কয়েক কাটিয়ে আসা খুব একটা বিপজ্জনক ব্যাপার নয়, তাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমেরিকানরা এই শতাব্দীর মধ্যে চাঁদের দিকে আর পা বাড়াচ্ছে না, তাও ঠিক। আরো কয়েকটি অ্যাপোলো অভিযান হলে ভালোই হত। অন্ততপক্ষে চাঁদকে আরো একটু হাতের মুঠোয় পাওয়া যেত। তাই কি হয়তো এই শতাব্দীর মধ্যে চাঁদকে মনুষ্যবাসযোগ্য করে তোলার কাজও শুরু হয়ে যেতে পারত। কিছুই অসম্ভব নয়। ১৯৫৭ সালের প্রথম স্পুৎনিক থেকে ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো-১৭ পর্যন্ত সময় পার হয়েছে মাত্র পনেরো বছর। এইটুকু সময়েই এতখানি। আগামী আঠাশ বছরে আরো কী হতে পারে, আরো কী হবে— তা কে বলতে পারে! চাঁদে যাতায়াত যে এমন নির্বিঘ্নে ও এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারে, অ্যাপোলো-১৭-র আগে তাও কি ভাবা গিয়েছিল। —অয়স্কান্ত

কৃষিদরদী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে একটা খুবই বিস্ময়কর যুগ। জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করে রামমোহন যে যুগের সূচনা করেন সেই যুগে অসাধারণ সব মনীষীরা, যেমন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ—একের পর এক এসে বাঙালীর মানসকে সর্ব দিক থেকে উদ্ভাসিত করেন।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ববাংলার ঢাকা বিক্রমপুর জেলার এক বিত্তশালী বৈদ্য পরিবারে রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের সাংসারিক সচ্ছলতা হ্রাস পায় এবং কষ্টের ভিতর দিয়েই তাঁদের দিন কাটে। রাজেশ্বর দাশগুপ্ত শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কৃষিবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করেন ও পরে নানা স্থানে কাজ করার পর গভর্নমেন্টের কৃষি বিভাগে নিযুক্ত হন। লর্ড মেয়োর সময় থেকে গভর্নমেন্টের কৃষিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের দেশের কর্মকর্তারা যে কৃষকদের এ বিশ্বাস বিদেশী গভর্নমেন্টের আদবেই ছিল না।

কৃষিবিজ্ঞানী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশের কৃষকদের ঠিক মতো শিক্ষা দিতে পারলে তারা বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী আয়ত্ত করতে পারবে। তিনিই সর্বপ্রথম ডেমনস্ট্রেটরের পদ সৃষ্টি করে চাষীদের হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি শেখাবার ব্যবস্থা করেন। উৎকৃষ্ট বীজভাণ্ডার স্থাপন, কৃষি প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা, চুঁচড়ায় কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কৃষি সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তোলেন। বাংলা ভাষায় কৃষিবিভাগ সম্বন্ধে কোনও বই ছিল না। তিনিই প্রথম দুই খণ্ডে 'কৃষি-বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় প্রতিশব্দগুলিরও স্রষ্টা রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। এ ছাড়াও তিনি তাঁর কৃষি-বিজ্ঞান বইটিতে নানা রকমের দেশী ও বিদেশী সবজী ও ফসলের চাষ সম্বন্ধে ও কি করে জমি প্রস্তুত করতে হয় ও সব প্রয়োগ করতে হয় সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে চাষের উন্নতি না হলে দেশের জনসাধারণের কখনও কল্যাণ হবে না। ক্ষুদ্র চাষীদের কথা মনে রেখে তিনি সব সময় চিন্তা করতেন। ব্যক্তিবিশেষকে যে আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয় সেটা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, কিন্তু দেশের অবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। ছোট ছোট ক্ষেতে বিভক্ত কৃষি জমির পক্ষে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ যে সম্ভব নয় সেটা তিনি বুঝেছিলেন ও সেই কারণে একটি হালকা ধরনের লাঙ্গল তৈরী করেছিলেন। শুধু বাংলাদেশে নয় সারা ভারতবর্ষে তাঁর মতো কৃষক-দরদী কৃষি-বিজ্ঞানী আর একজনও ছিলো না তাঁর সময়।

গভর্নমেন্টের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তিনি নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে তাদের উন্নতি সন্ধানের অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন।

১৯২৬ সালে যখন রয়্যাল কমিশন অব এগ্রিকালচার ভারতবর্ষের কৃষি অবস্থা তদন্ত করবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত গভর্নমেন্ট তাঁকেই সেই কমিশনের লিয়েজোঁ অফিসার নিযুক্ত করেন। কঠিন পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় ও ১৯২৬ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে [illegible]।

সম্মোহন চিকিৎসা

সম্মোহন কথাটা সরাসরি বললে যেন মনে হয় এর সংগে জড়িয়ে আছে তান্ত্রিক একটা পদ্ধতি। 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমারকে স্মরণ পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি কি তাই? একটু তলিয়ে দেখলে যে সমস্ত মানুষ বুদ্ধির জোরের বড়াই করে বেড়ান তাঁরা কি সম্মোহিত অবস্থায় কখনও পড়েন নি বলে বুক বাজিয়ে বলতে পারেন?

সম্মোহনের সংগে এদেশের একটা জায়গার নাম বেশ জড়িয়ে আছে। সে স্থানটি কামরূপ-কামাখ্যা বলে খ্যাত। সেখানে গিয়ে খুব আত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও নিজস্ব সব বিচার-বিবেচনা শক্তি খুইয়ে বসতেন। লোকে এজন্য বলতো—ওখানে গেলে মানুষ ভেড়া বনে যায়।

সম্মোহনের ক্ষমতার সংগে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের নাম বেশী জড়িত। যাকে বলে মোহিনীর মায়া। চলতি কথায় বলত 'ডাইনীর খপ্পর'।

এই সম্মোহনকে উইচক্র্যাফট ও শয়তান উপাসনা ভেবে নিয়ে তথাকথিত প্রগতির উপাসকদের পাল্লাভারীর সময়ে অনেক হামলা-নির্যাতনও চলেছে। কসুর কম কিছুতে নেই। কোনও ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম না হলেই সেটাকে স্রেফ বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টাচরিত্র বিজ্ঞান ও যুক্তির উপাসকদের কাছেও কম পাওয়া যায়নি।

তবে এটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে পরখ করে দেখার চেষ্টাও কম হয়নি। ১৮৮২ খৃঃ খাস লণ্ডনে গড়ে ওঠে 'সোসাইটি ফর সাই-কিক্যাল রিসার্চ'। সাইকি কথাটা আত্মা বা মন সংক্রান্ত ব্যাপারকে বোঝাবার জন্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে। প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল মেটাসাইকিক্যাল ইনস্টিটিউট। একজনের মনের ওপর অপরের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ও তার কার্যকারিতা নিয়ে এরা অনেক [illegible] ভেবেছেন ও বলেছেন। এটাকেই বলে হিপ-নটিজম। অপরাপর ইজমের মত বাজারে এরও একটা মরশুম এসময় এসেছিল। আগে একেই বলা হত মেসমেরিজম। অস্ট্রিয়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ফ্রাঞ্জ অ্যান্টন মেসমারের নাম থেকে ঐ নাম প্রচলিত। মেসমার ভিয়েনার বড় চিকিৎসক ছিলেন। অপরাপর রোগেও তিনি হাত লাগাতেন। তাঁর চিকিৎসার মাধ্যম ছিল এই সম্মোহন শক্তি। মেসমারের মতে তাঁর শরীর থেকে একটা শক্তি রোগীর শরীরে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে রোগ সারাত। তিনি তাকে বলতেন 'এ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম'. তিনি অস্ট্রিয়া ও প্যারিসে পসার জমিয়ে তুললেও তাঁর গোটা চিকিৎসার বিজ্ঞানকে বুজরুকি বলে হৈচৈ সুরু হয়ে যায়। সরকার তাঁর ঐ ধরনের চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। ১৮১৫ খৃঃ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন।

মেসমার সাহেবের নাম থেকে এই পদ্ধতিকে বিযুক্ত করেন জেমস ব্রেড সাহেব। হিপনটিজম কথাটার প্রচলনের সুরু তখন থেকেই। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত এর বাজার খুব জম-জমাট ছিল।

ডঃ ইউজিন ওস্টির মেটাসাইকিক ইন্টারন্যাশনালের একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। তিনি সুপার নরম্যাল 'ফ্যাকলটিজ ইন ম্যান' নামে একখানা বই লেখেন। এই বইটাতে হিপনটাইজড অবস্থার বিশ্লেষণের সংগে বহু উদাহরণ দিয়ে এই পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপনের একটা চেষ্টা চালান হয়েছে। সাইকোমেট্রির মূলে ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কাজেই অস্বাভাবিক অবস্থা ও ব্যবহার ব্যাখ্যা মানুষের যুক্তিভিত্তিক মানসিক দখল করে উঠতে সমর্থ হয় না।

টাইরেল লিখেছিলেন 'দি পারসোনা-লিটি অব ম্যান'। এতেও যে সব ঘটনার বিবরণ [illegible] জগতে খুব হাতেনা পরখ করার সুযোগ কম। কাজেই অলৌকিক ঘটনা বলে ব্যাপারে [illegible] ইতি করে অনেকে [illegible] গদগদভাব হতে চান।

সম্মোহিত বা হিপনটাইজ করে নানা-রকম মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি নিরাময় করার ঘটনা খুব বিরল নয়। আবার নানা-রকম প্রবণতা থেকেও হিপনটিজমের সাহায্যে মুক্তি পেতে দেখা গেছে।

কিন্তু আর একটা দিকও আছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে হিপনটাইজ করে অপরাধমূলক কাজও করানো সম্ভব।

হিপনটিজমের গোড়ার কথা হল এক-জনের ইচ্ছাশক্তিকে অপরের ওপর প্রয়োগ। আর শেষের কথা হল হিপনটিক ট্রান্স সম্মোহিত ব্যক্তি নিজে কি-কি করেছেন সে কথা পরে তাঁর মনে থাকে না। স্বপ্নে অনেক সময় স্মরণে আসে। হিপনটাইজড হবার সময়ে যে কথা মনে ধরিয়ে দেওয়া হয় তার কথা ঘোর কেটে গেলে ভুলে যান বটে, কিন্তু নির্ধারিত সময়ে হিপনটিক সাজেশন মত নির্দেশ ঠিক পালন করে যান।

এরই সংগে যাঁরা মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁদের পরলোকগত আত্মার সংগে সরা-সরি সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারটাও এসে পড়ে। [illegible] আত্মার সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য যে বৈঠক তাকে বাংলায় বলে প্রেতচক্র। অনেক সময় এর জন্য মাধ্যম বা মিডিয়াম গ্রহণ করা হয়। মেয়েরাই ভাল মিডিয়াম। ছেলেরাও যে না হয় এমন নয়।

এছাড়া আছে প্ল্যানচেট। কিন্তু সব চক্রেতেই এক [illegible] সমা-বেশ: একই উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ প্রয়োজন। তাতে বেশী [illegible] [illegible]

করে প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে। মানুষ মিডিয়াম শুধু কথাই বলে না পরন্তু অনেক সময় লিখেও জবাব দেয়। হাতের লেখার ধরণও অনেক সময় পাল্টে যায়।

মিডিয়ামদের ব্যবহার হতে হতে এর বিশ্বাসী মহলে খুব কদর বাড়তো। 'দি গ্রাফিক' পত্রিকাতে ১৯৩১ খৃঃ ১০ অক্টোবর সিলভিয়া টমসন সাহেব এক মহিলার বর্ণনা দিয়েছেন তার জুতো-মোজারই শুধু বিশেষত্ব ছিল না—তিনি বাঘের ছাল পরতেন এবং চুলের একটা রঙীন ওড়না থাকতো। কাল সাটিনের ঢাকনা দেওয়া গদীতে বসতেন। এঁর কাছে সেই যুগের জাঁদরেল রাষ্ট্রনায়কদের স্বাক্ষরিত তসবীরও ছিল। কিন্তু লেখক তাঁকে একেবারে ডুবিয়ে ছেড়েছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী একটুও ফলেনি।

হাতের গঠন ও চেটোর ওপরকার রেখা নিয়েও এই লাইনের লোকেদের বাগবিতণ্ডার রসালো জবাব ঐ প্রবন্ধে রয়েছে। দেহের গঠনের ধরণ দেখে মানসিক শক্তির ও মানসের ক্ষমতার কথাও এঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। চেহারা ও হাতের গঠন মিলিয়ে ব্যক্তির ওপর গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব এবং তার দ্বারা ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে তাঁরা অনেক ভবিষ্যৎ বাণী করে থাকেন।

এইসব ভবিষ্যদ্বক্তা ও মিডিয়ামরা অনেক সময় ছল-চাতুরী চালিয়ে থাকেন। যাদুবিদ্যায় যাদের জ্ঞান আছে তারা এঁদের ছল-চাতুরি অনেক সময় ধরে ফেলেন। ফকিরকারীর কেরামতি এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই সেইদিকে যাব না।

জাগতিক দৃষ্টিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না এমন আর একটি ব্যাপার হল ঘুম। ঘুমিয়ে থেকে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, সচেতন, অবচেতন-অচেতন মনের বাসনা, চিন্তা, পরিকল্পনা ও ফেলে আসা দিন এবং হালফিলের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনের পটে ছবির খেলা দেখে। ঘুমের মধ্যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলে তারও ছবি চোখে ভাসে। ঘটনার সংগে একই সময়ে সমঘটনার রেখা মনে আঁকে ওঠার কয়েকটি ঘটনা কিছু নইতে আছে। এমন কি উপস্থিতির ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে।

ধর্মের মাঝে মানুষের আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে অপর জায়গায় ঘুরে আসতে পারে এবং অপর জীবিত কিম্বা মৃত মানুষের আত্মা বা মনের সংগে সংযোগ করতে পারে বলে বলা হয়ে থাকে।

ভুতুড়ে ব্যাপারটাকে এ প্রসংগে ধরা অন্যায় হবে না। ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া, দমকা বাতাস, গানের সুর ইত্যাদি অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। অতৃপ্ত বাসনা, প্রেম প্রভৃতিকে এক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

মনস্তত্ত্ব ও শারীরতত্ত্বের দিক থেকে বা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তির ভিত্তিতে এসব ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা যাই হোক প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে এইগুলি এক নতুন বিস্ময়ের দ্বার উন্মোচিত করে দিয়েছে।

দূষিত পরিবেশ

অলোক সেন

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সংগে সংগে সমগ্র মানব সমাজও আজ ক্রমিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এ উন্নতি নিঃসন্দেহে আমাদের গর্বের কারণ হতে পারে। দেশে নিত্য নতুন কলকারখানা স্থাপন, যানবাহনের আধুনিকীকরণ, কৃষির উন্নতি, চিকিৎসাশাস্ত্রে নিত্য নতুন আবিষ্কার এ সবই আমাদের মঙ্গলের দিশারী। কিন্তু সভ্যতার এ অগ্রগতির সংগে সংগে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। পরিবেশ হয়ে পড়ছে কলুষিত। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবন ধারণকে শঙ্কিত করে তুলেছে। এ নিয়ে চিন্তাও তাই বিশ্বব্যাপী। পশ্চিম বাংলাতেও দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ও আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখার জন্য দুটি ক্ষমতাবান কমিটি গঠন করা হয়েছে—কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায়।

আবহাওয়া দূষিতকরণ কথাটি এখন বহু মুখে শোনা গেলেও প্রকৃত ব্যাপারটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ঠিক কতখানি ওয়াকিবহাল একটু হিসেব করে দেখা যাক। আমরা সাধারণত ধরে নিই অতীতের সুন্দর স্বাস্থ্যকর এবং উপভোগ্য পৃথিবী আজকের মতো দূষিত ছিল না—বিষাক্ত ছিল না সেদিনের নিঃশ্বাস-বায়ু। নির্মল বিশুদ্ধ আবহাওয়া ছিল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসের পক্ষে উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। বাড়ীর বা পাড়ার বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয় এবং অতীতের সেই দূষণহীন দিনগুলির জন্য তাঁরা অন্তরে মানব সভ্যতার সুদূর অতীতেও মানুষ প্রকৃতিকে দূষিত করেছে নানাভাবে, বিষাক্ত করেছে জল-বাতাস-মাটিকে। এমন কি মানুষ এ ধরাধামে আসার বহু আগেও পৃথিবী কলুষমুক্ত ছিল না। বারে বারে এই জল, এই মাটি দূষিত হয়েছে নানা কারণে। তবে সেদিনের থেকে আজ এর মাত্রা বেড়েছে নানাভাবে ও বহু গুণে আর আগামী দিনগুলিতে মানবসভ্যতা ও কলুষের পরিমাণকে এক ভয়াবহ আকারে বাড়িয়ে তুলবে। সেদিন প্রকৃতির প্রতিশোধ ফিরে আসবে প্রাণী-উদ্ভিদ সমস্ত জীবিত সংসার উপরে। বিজ্ঞানীরা তাই চিন্তিত বেশ কিছু দিন আগে থেকে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জনমতকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইদানীং শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। নানা দেশের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘও বিশেষভাবে ভাবিত ও সক্রিয়। কিছু দিন আগে 'স্টকহল্‌মে' 'ইউনেস্কো' আয়োজিত আলোচনা সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার দিকে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছিল উদ্ভিদ প্রাণী জল হাওয়া মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে। আর এ আত্মনিয়ন্ত্রণের পিছনে ছিল খাদ্যশৃঙ্খল। খাদ্যখাদক সম্পর্ক এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু সভ্য মানুষ প্রকৃতির সংগে লড়াই করে নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে বহুক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও [illegible]

উদ্ভিদ শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে যা উদ্ভিদভোজী প্রাণীকে আহার যোগায়। প্রাণীর দেহ ও দেহজাত প্রোটিন চর্বি ইত্যাদি মাংসাশী বা মিশ্র আহারে অভ্যস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতির এ বিন্যাস-ব্যবস্থাকে মানবসভ্যতা বানচাল করেছে নানাভাবে ফল হয়েছে মারাত্মক। মানুষের বসতিকে নির্বিঘ্ন করার জন্য কোথাও বা সাপ মারতে বেজী আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে সাপ নির্বংশ হওয়ায় ইঁদুরের উপদ্রব বেড়েছে বহু গুণে। লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ইঁদুরের পেটে গিয়ে মানুষের আহার্য ঘাটতি সৃষ্টি করেছে। ফসল নষ্ট করে বলে পাখি তাড়াতে গিয়ে পোকার উপদ্রব বেড়েছে। রাসায়নিক প্রয়োগে পোকা ধ্বংস করতে গিয়ে মাটিতে জমেছে নানা বিষাক্ত উপাদান যা কৃষকের বন্ধু বহু বিচিত্র ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাককে ধ্বংস করেছে—মাটির যৌগিক গঠন পাল্টে গিয়ে জলধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। উর্বরতা বাড়াতে ইচ্ছামত সার প্রয়োগে এ অবস্থাটিকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। একই জমিতে বার বার লাভজনক ফসল বুনে জমিকে অকালবন্ধ্যাত্বে বন্দী করা হয়েছে। দীর্ঘ দিনের বন্ধ্যাত্ব ও জলধারণ ক্ষমতার অভাব, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণে ঘাটতি এনেছে। এখানে-সেখানে বন কেটে ফেলে এ অবস্থাকে আরো ঘনীভূত করেছে। তাই জলভরা মেঘ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলেও উপযুক্ত আর্দ্রতার অভাবে তার বুক থেকে পারে না জলাধার ছিনিয়ে নিতে। লক্ষ লক্ষ একর জমি খরার কবলে পড়ে কোটি কোটি লোকের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে।

দূরদর্শিতার অভাব অনেক সময় আমাদের জীবনযাত্রাকে মারাত্মক বিপাকে নিয়ে যায়। পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকায় খাল কেটে [illegible] করা [illegible] কোটি [illegible]।

কিন্তু উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থার অভাবে প্রায় এক কোটি একর নীচু জমি জলবন্দী হয়ে যায় বেশ কিছু দিনের জন্য। ফলে মাটির নীচে জমে থাকা লবণ, জলে গলে উঠে আসে জমির ওপরে—ফসল ও জমিকে চিরকালের জন্য নষ্ট করে দেয়। আর এর পরিমাণ নিতান্ত কম না—প্রতি পাঁচ মিনিটের হিসাবে প্রায় এক একর জমি। মাটির গভীর গর্ভ থেকে তুলে আনা খনিজ সম্পদ মানব সভ্যতার চাকা ঘুরিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ আজ অনেকাংশেই খনিজ-নির্ভর। কিন্তু প্রকৃতির শক্ত ভিতকে আলগা করে দেওয়ায় শহর নগর বসে গেছে, কৃষি ভূমি বিনষ্ট হয়েছে, নদীর খাত পাল্টে গিয়ে খরা অথবা বন্যা এনেছে। কিম্বা এখানে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ ভূমিকম্পের দোলায় শত-সহস্র প্রাণের বলি হয়েছে। আর এরই সঙ্গে রয়েছে বড় বড় বাঁধ প্রকল্পের প্রতিক্রিয়া। কোনো জলাধারে হঠাৎ জমিয়ে তোলা কোটি কোটি ঘনফুট জলের অতিরিক্ত চাপ স্থানীয় ভূ-পৃষ্ঠের বহন ক্ষমতা বানচাল করে দেয়। দক্ষিণ ভারতের কয়না ভূমিকম্পের পিছনে ছিল এমনি একটি কারণ। মানুষ এমনি করে ধরিত্রীকে দুর্বল ও সশঙ্ক করে তুলেছে।

এক কথায় প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যেভাবে ব্যবহার করবো, প্রকৃতি ঠিক সেই অনুপাতে আমাদের ফিরিয়ে দেবে তার আচরণ। বড় বড় শহরে জমিকে ইঁট-পাথরে বাঁধিয়ে ফেলে এক দিকে সভ্যতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। লোকসংখ্যা বাড়ছে। গাছপালা জলাশয় ইত্যাদি কমে যাচ্ছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলে জলের চাহিদাও বাড়ছে। গাছপালা কমলে এবং একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ইঁট-পাথরে বাঁধিয়ে দিলে সেখনকার তাপধারণ ও বিকিরণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় একদিকে স্বাভাবিক বৃষ্টির মাত্রা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে মাটির বাঁধানো অঞ্চলে মাটির তলায় জল যেতে পারছে না। ফলে ভূতলে জলের পরিমাণে ঘাটতি হচ্ছে। বছরের পর বছর এভাবে জলের সঞ্চয় অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায়, জলের স্তরগুলি শূন্য হয়ে পড়ছে। মাটির ওপরকার বড় বড় অট্টালিকা প্রভৃতির প্রবল চাপে ঐ শূন্য স্তরগুলি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাবে। তখন দেখা যাবে সমগ্র শহরটি বসে যাচ্ছে। এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। কেননা বসে যাওয়ার পরিমাণ সব জায়গায় সমান না হওয়ায় রাস্তাঘাট বড় বড় প্রাসাদ সেতু ইত্যাদির প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক। ওদিকে তীব্র জলাভাবও সমগ্র শহরটিকে ক্রমশ গ্রাস করবে। কালের ব্যবধানে যা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানী মহলে তাই প্রশ্ন জেগেছে : কলকাতা কি সেদিকেই এগিয়ে চলেছে? প্রশ্ন অবশ্য কেবল কলকাতাকে নিয়ে নয়—পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরগুলিই আজ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে [illegible]।

পরিবেশ-এর আর একটি অঙ্গ হল বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল কলুষিত হয় কী ভাবে? এর নানাদিক রয়েছে। কলকারখানা, মোটর-বাস ইত্যাদির অর্ধদগ্ধ কার্বন কণিকা, জল তেল এবং নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের বাষ্প, ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বহু মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসজাত কার্বন ডাইঅকসাইড প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি, আবর্জনা এবং পরিত্যক্ত নানা পদার্থের পচনজনিত বিষাক্ত নানা গ্যাসের উৎপত্তি। এছাড়া তেজস্ক্রিয় ভাসমান পদার্থের সমাবেশও বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করছে। নির্মল নিঃশ্বাস-বায়ু থেকে আমাদের প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করছে।

শহর সভ্যতার দুটি বিষ বাণ হল শব্দ ও আলো। দিন-রাতের অবিশ্রান্ত বিরক্তিকর শব্দের ফল অত্যন্ত মারাত্মক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মানুষের স্নায়ু-দুর্বলতাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব গ্রাম অপেক্ষা শহরে বহু গুণে বেশী। অবিরাম শব্দের প্রবাহ মানুষকে এ রোগের মুখে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষত যে শহরের মধ্যে বা খুব কাছে রয়েছে বিমানবন্দর, সেখানে এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক। বধিরতা, নিদ্রাহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, তীব্র আকারের মাথাধরা, অস্থিরতা প্রভৃতি রোগের পিছনে অবিরাম শব্দ প্রবাহের যোগাযোগ অপরিসীম। পৃথিবীর বহু শহরে শব্দ রোধের নানা চেষ্টা চলেছে। যানবাহন ও অন্যান্য শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রে 'শব্দ নিরোধক' লাগানো হচ্ছে। বিমানবন্দরে 'শব্দ শোষক দেওয়াল' গেঁথে শহরবাসীকে বাঁচানোর চেষ্টা চলেছে। শহরের বাড়ী ঘরেও শব্দ শোষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শব্দের জোয়ার কি কোনোদিন মানুষের এ শাসনে বন্দীত্ব গ্রহণ করবে?

পৃথিবীর বড় বড় শহরের আলোক ব্যবস্থাও পরিবেশকে নির্মল থাকতে দিচ্ছে না। নানা রঙের নানা উজ্জ্বলতার আলো প্রতিফলিত হয়ে কেবল শহর বুকেই নয়, বায়ুমণ্ডলের বহু উর্ধ্বস্তরেও প্রভাব বিস্তার করে। আবার বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণায় পুনঃ প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে তাতে গগনচুম্বি প্রাসাদের সুউচ্চ কক্ষেও সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। জীবজন্তু কীটপতঙ্গ এমন কি গাছপালাও এর প্রভাবে তাদের জীবনযাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সমুদ্রে নিঃসঙ্গ বাতিঘরগুলিতে প্রতি বছরে হাজার হাজার নিশাচর পাখি প্রাণ দিচ্ছে—আলোর হাতছানি এড়াতে না পেরে। নগর উপকণ্ঠের মানমন্দিরগুলিও এ আলোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানাভাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই গভীর রাতে উজ্জ্বল বাতিগুলিকে নিভিয়ে দিতে বলেছেন। আলোর এ দৌরাত্ম্য এড়াতে না পারলে একদিন নগর সভ্যতার বুকে নানা অনর্থও নেমে আসবে। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা তাই [illegible]

কিন্তু মনে রাখা দরকার কোনো একটি স্থানের দূষিতকরণের ব্যাপারে দায়িত্ব শুধু সে অঞ্চলেরই নয়। বায়ুপ্রবাহ কিম্বা নদীর জলে বয়ে আনা নানা দূষিত পদার্থ ছড়িয়ে যায় দূর-দূরান্তরে। আবহাওয়া দূষিতকরণ সমস্যা তাই কোনো একটি বিশেষ স্থানের নয়। এ সমস্যা আজ সামগ্রিকভাবে সমস্ত পৃথিবীর। দায়িত্বও তাই পৃথিবীর সমস্ত দেশের। শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আবহমণ্ডল যেভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে তা দূর করার জন্য, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী ও তৎপর হওয়ার সময় এসেছে।

পরিবেশ আমাদের অস্তিত্ব, বিকাশ ও উন্নতিকে প্রভাবিত করে। বাইরের প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা এবং পৃথিবীর নানা আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মোট ফলাফল রূপায়িত হচ্ছে পরিবেশের মাধ্যমে। দারিদ্র্য দূর করার জন্য দেশে শিল্প বাড়াতে হবে কিন্তু তার ফলে যাতে আবহাওয়া দূষিত না হয় সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। আবর্জনা ও ময়লাকে যতদূর সম্ভব অন্য কাজে লাগাতে হবে। কারখানার চিমনি নিঃসৃত ধোঁয়া যাতে বহু উর্ধ্ব বায়ুস্তরে পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। মোটর বাস প্রভৃতির ধোঁয়াকে বাইরে ছড়াতে না দিয়ে শোষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের পরিত্যক্ত জলকে পরিস্রুত করে পুনরায় ব্যবহারোপ-যোগী করে তুলতে হবে। নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। কলকাতাতেও ঐ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করে ব্যবহারের চেষ্টাও হয়তো অদূর-ভবিষ্যতে সফল হবে। সেদিন পৃথিবীতে পানীয় জলের সমস্যা অনেক কমে যাবে। কল-কারখানায় শ্রমিক কিম্বা ট্রাফিক পুলিশদের অবিরাম ধোঁয়া ও দূষিত বাতাসের মধ্যে কাজ করতে হয় বলে তাদের নিয়মিত অক্সিজেন গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে পাশ্বি-পার্শ্বে অক্সিজেন সরবরাহের যন্ত্র বসিয়ে। পশ্চিম জার্মানী এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। জনসংখ্যার বিকেন্দ্রী-করণেও মন দিতে হবে। এক কথায় প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর কাজটি করতে হবে গভীর চিন্তা অভিনিবেশ ও পরি-কল্পনা সহকারে। তা না হলে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্য প্রমাণিত হবে : 'প্রকৃতিকে দোহন করে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে তার ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন প্রকৃতির সব দাক্ষিণ্য ফুরিয়ে যাবে।' সেই দারুণ দুর্যোগে যাতে মানুষকে পড়তে না হয় তার জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। উপ-করণের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সীমিত না রাখলে প্রকৃতির প্রতিশোধ সভ্যতার মর্মমূলে ধ্বংসের বীজ বুনে দেবে। পৃথিবীর [illegible] সেদিন হয়তো আমাদের

প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের পোশাকে ॥

কৃষ্ণ ধর

রোজ সেই প্রতিবিম্ব দেখি
প্রতিদ্বন্দ্বীর পোশাকে
বাহবা কুড়োয় দু হাতে।
একদম এক
চুলের ছাঁট, বুকের বোতাম
জামার ঠিকণের ফুলকারি
সব ঠিকঠাক মিলে যায়।
হাততালি অবিরল
কান পাতা যায় না
এমন নিখুঁত অভিনয়
সঙ্গে রাজ্যের গালগল্প।
তার রোমাঞ্চে সবাই
হুমড়ি খেয়ে পড়ে
দেখে অবাক হতে হয়।
তার চোখ ঝলসানো আলোয়
দেখি যেন অন্ধকার বিপন্ন উদ্ধার।
আমাকে সে বিহ্বল করে
বিভ্রান্ত করে
মাতাল করে।
আমি তার অনল-উজ্জ্বল পোশাকের
প্রান্ত চুম্বন করে বলি,
সাবাস্ তুমিই জিতে গেলে।
করমর্দনের জন্য হাত বাড়াতেই
হাতের চেটোতে রক্তের দাগ লুকোতে
আড়াল করি ফুলদানিটা।

স্বয়ংক্রিয় হাসির দমকে
প্রতিবিম্ব বলে ওঠে,
দরকার হবে না,
এই দ্যাখো—
তার পোশাকের আড়ালে
হাহাকারে পুড়ে ছাই হচ্ছে
অবিকল আমি।

চোখ ॥ সামসুল হক

আমাদের নিজস্ব ও একমাত্র কর্ষণযোগ্য ভূমি
চোখ,
ওখানেই গর্ভাধানের প্রাকৃত-উৎসব জমে ওঠে,
আর শস্য—
সেও আমাদের, মানুষের, ক্রমে চলে যায় আমাদেরই
পৃথিবীর যৌথ গোলায়।

আজকাল উৎসবের আয়োজন থাকে, কর্ষণ হয় না,
প্লাবন কিংবা অনাবৃষ্টি যেন চোখের নিয়তি,
শস্যের নিবৃত্তি—
সেও আমাদের, ক্রমে মানুষের থেকে সরে যায়
মানুষের যৌথ সভ্যতা।

বিক্ষোভ ॥ আইভি রাহা

সবাই বলে নাকি হতাশা থেকেই হয় এমন;
এই বেপরোয়া ভাব, কিছুকে ভয় না করা,
সব ছাড়িয়ে ফেলা, মাড়িয়ে যাওয়া।
রাখতে ইচ্ছে হয় না মনটাকে
কিংবা কোন বিশ্বাস, সযত্নে, সংগোপনে
হৃদয়ের নিভৃত কোন কোণে।
ভালবাসা, প্রেম? বাজে।
একদম বাজে মনে হয় ওসব।
কেমন যেন বোকা বোকা
অর্বাচীন মূঢ়তার মত।
বিশ্রী অসহ্য মনে হয় সব
কৃত্রিম চাপা মাপা হাসি।
মনে হয় ছিঁড়ে ফেলি একটানে
ভদ্রতার নির্মোক—আর ওই
সযত্নে ঢেকে রাখা ফাঁকি।
হয়তো সত্যি এসব—
এই;—হতাশা আর না পাওয়ার জ্বালা থেকে
বিদ্রোহী হয়ে যায় মানুষের সমুদ্দুর
[illegible]

গঙ্গা

রেবী আনওয়ার

সারাদিনের ভাবনায় গঙ্গার দেহটা যেন আরও নুড়িয়ে গেছে। বয়সের সীমা আরো কয়েকটা বছর এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে যেন আরো সামনে এনে দিয়েছে। গঙ্গা বারান্দার এক কোণে বাঁশের খুটিতে হেলান দিয়ে বসে ভাবছে। ওধারে চৌকিগুলোর উপর ভীড় করে বসে আছে মক্কেল আর মুহুরী। সামনে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে রয়েছেন উকিল সাহেব। আর তার পাশের চেয়ারটায় চৌধুরী সাহেব নিজে—মেয়েটার বাবা। দুজনে গভীরভাবে পরামর্শ করছেন।

গঙ্গার কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই। মাথায় হাত দিয়ে ও বসে আছে। বয়সের সঙ্গে মাথার সব চুল ঝরে পড়ে গেছে। শুধু ঘাড়ে গোটা কয়েক চুল বয়সের প্রান্ত সীমার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে আঁকাবাঁকা অসংখ্য কুঞ্চিত রেখা। চোখে ঔজ্জ্বল্য নেই, বিবর্ণ দৃষ্টি। বিশৃঙ্খলভাবে গজিয়ে ওঠা শনের মত গোঁফ, দু'ধারে চিবুক পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। আর গোটা মুখের সমস্ত [illegible] আঁকা-বাঁকা ছোট-বড় রেখাসহ চামড়ার নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে—বোধহয় বয়সের বোঝা সইতে না পেরে।

গঙ্গা নড়ে চড়ে বসে।

হাঁটুর ঘা'টার চারপাশে কয়েকটা মাছি পিনপিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে ঘা'টাকে ব্যস্ত করে বসছে, আবার উড়েও যাচ্ছে। কিন্তু ওদের তাড়াবার জন্য কোন চেষ্টা আর আগ্রহ গঙ্গার নেই। ও শুধু ভাবছে। ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে। নিশ্চল নিথর প্রস্তর মূর্তির মতই নিশ্চুপ হয়ে বসে শুধুই ভাবছে।

বীনুর বাবা চৌধুরী সাহেব ডাকছেন : 'শোন তো বাবা গঙ্গা, এদিকে এস।'

প্রথম ডাকে সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়বার গলাটা আরো বেশী মোলায়েম করে চৌধুরী সাহেব বলেন : 'কই বাবা গঙ্গা, শোন এদিকে এসোতো একটু—'

গঙ্গা চমকায়। তারপরে সামনে এসে দাঁড়ায়। উকিল সাহেব আর বীনুর বাবার সামনে।

উকিলসাহেব কাগজের ভিড় ঠেলে গম্ভীর মুখখানা আরও বেশী গম্ভীর করে তুলে পুরু লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে গংগার আপাদমস্তক একবার দেখে নেন। ওর জরাগ্রস্ত খাড়পড়া দেহের দিকে তাকিয়ে উকিলসাহেব প্রশ্ন করেন—

: তুমিই গংগা?

: জী, হুজুর, আমিই গঙ্গা জিউ।

: সেদিনের ঘটনাটা তুমি জান?

: জী হুজুর।

: তুমি শুনেছ, না দেখেছ?

: শুনেগা কাহে হুজুর—আপনা এহি আঁখছে দেখা।

: বেশ। বেশ। এবার তবে বলত সেদিন কখন, কোথায় এবং আসলে কি ঘটনা ঘটেছিল। উকিল সাহেব জানতে চান।

মুহূর্তে গঙ্গার চামড়ায় টান পড়ে, কুঁজো মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে যায়। ক্লান্ত ঘোলাটে ছানিপড়া চোখের আড়ালে এক প্রচণ্ড ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠে। ঝুলানো গালের চামড়া [illegible] হয়ে ওঠে। [illegible]

ঘৃণা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে কপালে হাত জোড় করে বলে : হুজুর, হামি ও পাপ কথা মুখে না আনতে পারবে। এত বড় পাপ। ছিঃ! ছিঃ! রাম, রাম। এয়ছা পাপ হামি জিন্দেগী মে কভি নেহি দেখা, হুজুর।...

উকিল সাহেব মাথা দোলালেন। তারপর হাত নেড়ে বলেন : তুমি বস গঙ্গা।

গঙ্গা ধপ করে আবার মাটিতে বসে পড়ে। সিগারেটটা দেশলাইয়ের বুকে ঠুকে নিয়ে উকিল সাহেব আবার জেরা শুরু করেন : আচ্ছা গঙ্গা, সেদিন কলেজ ছুটির পর তুমি ওদিকে গিয়েছিলে কেন?

: ঘরমে তালা লাগাতে, হুজুর।

: গিয়ে ওদের দেখলে?

: জী হুজুর।

: আর কি দেখলে?

: পাপ, হুজুর পাপ।—কাঁপতে থাকে গঙ্গা : হামি এত বড় পাপ কভি দেখিনি হুজুর। চালিশ সাল ইয়ে কলেজে নোকরী কিয়া হুজুর, লেকিন এইসা বড়া পাপ ই-কলেজে ঢোকেনি। প্রফেসর হোকে ছাত্রীব সংগে—ছিঃ ছিঃ রাম! রাম! আপনারাই কন হুজুর—কভি এয়সা পাপের কথা শুনিয়েছেন?

উকিল সাহেব চুপ করেন।

চৌধুরী সাহেব এতক্ষণে মুখ খোলেন। বলেন : গঙ্গা এ কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে আছে। কলেজকে সে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে। পুত্রতুল্য ওর সে ভালবাসা এ-কলেজের জন্য।

: হুঁ, উকিল সাহেব একটা শব্দ করলেন। তারপর সিগারেটটা জ্বালিয়ে বলেন : আচ্ছা গঙ্গা, তুমি কি চাও এ পাপের শাস্তি হোক!

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে গঙ্গা : শাস্তি হুজুর, জরুর শাস্তি হোতি হবি। এ পাপকে খতম করতি হবি বাবু।

: তা হলে আগামীকাল তোমাকে আদালতে সব খুলে বলতে হবে, গঙ্গা।—গঙ্গার কথার মাঝখানে বলেন উকীল সাহেব।

: আদালতে!—মুহূর্তে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যায় ও।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, গঙ্গা আদালত। ওখানে সব কথা তুমি খুলে বলবে। কোন ভয় নেই তোমার। আমরা তো আছি।

—উকিল সাহেব আশ্বাস দেন।

: কিন্তু।

: না গঙ্গা, এখানে কোন কিন্তু টিন্তু নয়। আদালতে সব খুলে না বললে পাপী যে শাস্তি পাবে না। কলেজেরও কলঙ্ক যাবে না—বীনুর বাবা চৌধুরী সাহেব বলেন।

: পাপী—শাস্তি—কলঙ্ক—অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে গঙ্গা। তারপর অকস্মাৎ গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে উঠে : জরুর বোলেগা হুজুর, জরুর বোলেগা—সব বোলেগা একদম বোলেগা।

ওর গালে দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে। হ্যাঁ, সেসব বলবে, খুলে বলবে, যা সে দেখেছে সব—স-ব। কেন বলবে না? কদর্যতার, নোংরামীর সংগে ভীরু আপোষ সে করতে যাবে না—পারে না, পারবে না। পাপের উচ্ছেদ করতেই হবে। পাপকে, কলেজের কলঙ্ককে ধ্বংস করতেই হবে।

বিড় বিড় করে গঙ্গা। গঙ্গা জিউ।

সন্ধ্যার ঝুড়ি থেকে বাইরে এসে বসে গঙ্গা। কলেজ সংলগ্ন গঙ্গার ছোট্ট ঝুপড়ি।

ধূসরতায় চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে।—চারিদিকে ভাষাহীন নীরবতা, সামনে দিয়ে সরু রেখার মত বয়ে যাচ্ছে 'রাঙ্গাবিল'। তার উপরই কলেজ। ধবধবে সাদা দোতলা দালান। ধাপে ধাপে কলেজ উপরের দিকে উঠেছে। বড় হয়েছে। আর ওর খানিকটা করে রক্ত চুষে নিয়ে বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে ওকে।

আরো ভালো করে তাকায় গঙ্গা সাদা চুনকাম করা দালানটার দিকে। মনে পড়ে যায় ওর অতীতের কথা। প্রথম এদেশে যখন এসেছিল, তখন চল্লিশ বছরের শক্ত জোয়ান দেহে ভরা যৌবন। শক্ত-সামর্থ্য-সুস্থ পেশী-বহুল দেহটা তার সেকালের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হক, সাহেবের চোখে আটকে গিয়েছিল।

পরদিনই ডেকে বলেছিলেন তিনি—

: তোমার নাম কি?

: গঙ্গা জীউ, হুজুর।

: কি কর?

: কুছ নেহি।

: কুছ নেহী? চাকরী করবে?

: নোকরী! নোকরী পেলে তো সে বর্তে যায়, কেন সে করবে না?

তাই বলে : জরুর করেগা হুজুর। দিজিয়ে না একঠো নোকরী।

: কাল থেকে তবে কলেজের দারোয়ানের চাকরি কর—কেমন?

: জী হুজুর।

সেদিন গঙ্গা জীউ হক সাহেবের এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। সেলাম করে চলে এসেছিল। সে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের পুরানো কথা। তারপর থেকে আজ চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে কলেজে চাকুরী করছে। দিনে কলেজ বেয়ারা, রাতে কলেজ পাহারাদারেব চাকুরী।

এ চাকুরীকে সে চাকুরী বলে মনে করে নি কোন দিন। এ চাকুরী তাকে আর তার বাল-বাচ্চাদেরকে দু' মুঠো ডালভাত এবং রুটি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এতো চাকুরী নয়—কলেজ তো তার বাপ-মা। মা-বাপ তো জন্ম দিয়েই খালাস। কিন্তু এ চাকুরীর দৌলতেই আজ তারা ছয় ছয়টি প্রাণী দু'বেলা দু' মুঠো খেতে পাচ্ছে। তাই সে কলেজ ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালবেসে এসেছে তার সমস্ত পিতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়ে। এ কলেজের গত চল্লিশটি বছরের সব ছাত্রছাত্রী গঙ্গাদা বলতে অজ্ঞান হয়েছে। কলেজের বেয়ারা বা পাহারাদার বলে তারা কস্মিনকালেও ভাবেনি। এ কলেজের অধ্যাপক মহল থেকে ছাত্রছাত্রীদের উপর তার আধিপত্যই আলাদা। নতুন কোন ছাত্র বা অধ্যাপক তাকে নতুন এসে হেয় নজরে দেখলেও দু'দিনে গঙ্গা তাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। অধ্যাপকরাও তাকে সমীহ করে। ছাত্রছাত্রীরা 'গঙ্গাদা' ছাড়া গঙ্গা বলে কোন দিন ডাকেনা। পুরানো জামাজুতো বা দিনে দু-দশ কাপ চা'এর জন্য তাই গঙ্গাকে কোন দিন অন্যান্য বেয়ারার মত ট্যাঁকের পয়সা খরচ করতে হয়নি। না চেয়েই পেয়ে এসেছে এতোকাল।

তাকে সবাই ভালোবাসে। আর তাই হয়তো বা এই আশি বছরেও ওর চাকুরীটা ঠিক রয়েছে। আর তাই ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সবার কাছেই সে আজও মনে মনে কৃতজ্ঞ।

আর একবার তাকায় সে কলেজের সাদা দোতলা দালানটার দিকে। কোথাও এতটুকুও দাগ নেই। সাদা বকের পাখার মত ধব্‌ধব্‌ করছে।

হঠাৎ গঙ্গার শিরায় শিরায় উত্তেজনার শিহরণ বয়ে যায়। দাগ পড়েছে। সাদা চুন করা কলেজটার গায়ে দাগ পড়েছে—কলঙ্কের দাগ। এ দাগ আর কস্মিনকালেও উঠবে না। সাদা দেওয়াল আর সে দেখতে পায় না। দু'হাতে সজোরে চোখ ঘষে সে। কিন্তু কৈ, কোথায় সাদা দেওয়াল? শুধু পোকা—কাল কাল পোকা—কিলবিল করছে এর দেওয়ালময়। সাদা দেওয়ালটাকে ছেয়ে ফেলেছে। দু'হাতে চোখ চেপে ধরে গঙ্গা। কিন্তু তবুও দেখতে পায়। যেখানেই তাকাচ্ছে সেখানেই দেখতে পাচ্ছে পোকা—কাল কাল পোকা—টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, অফিস সর্বত্র।

চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে গঙ্গা; শান্তি, এই শান্তিয়া মেরা লাঠি দো।

পিছনে কার যেন পদশব্দ শুনে ঘুরে তাকাতেই দেখে প্রফেসরের বিবি নূরজাহান বেগম ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে।

নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোয় শুধু গঙ্গার মুখ থেকে: মায়ি তু?

প্রফেসরের স্ত্রীর ঠোঁট দুটো বারকয়েক কেঁপে যায়। বলে : গঙ্গা আমার স্বামীকে...

: আমি কি করবে মায়ি?

: তুমি সব করতে পার গঙ্গাদা। আমার স্বামী জেলে গেলে আমাদেরকে যে না খেয়ে মরতে হবে গঙ্গাদা।

: মায়ি, ও পাপ করেছে।

: তুমি ওকে ক্ষমা করো গঙ্গাদা।

: না, না মায়ি, হামি মাফ না করতে পারবে। ও পাপ করেছে। ওর জেল হবি, ফাঁসি হবি। তবে না পাপ যাবি। ওকে মাফ করলে ভগবান হামে মাফ না করবি।

: গঙ্গাদা!—ব্যাকুল আর্তনাদ করে ওঠে নূরজাহান বেগম। প্রফেসর জলীলের স্ত্রী। হাটু গেড়ে ওর সামনে বসে কোলের বাচ্চাটাকে এগিয়ে ধরে। বলে : এর দিকে তাকিয়েও কি তুমি ওকে ক্ষমা করতে পার না গঙ্গাদা? নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না গঙ্গা। সমগ্র সত্তা কান্না হয়ে প্রকাশ পায়। দু'হাতে চোখ চেপে ছুটে যায় ও অন্যদিকে। আর্তস্বরে বলে : আমি

পারবে না মারি। হামি পারবে না তু চলে যা। বাসায় যা।

এবার শেষ অস্ত্র চালায় নূরজাহান। আঁচলের গিঁট থেকে এক তোড়া কড়কড়ে নোট গঙ্গার দিকে এগিয়ে ধরে বলে : গঙ্গাদা।

: কেয়া ?

নূরজাহানের হাত কাঁপে। তবু বলে : নাও তোমার ছেলেকে দিলাম।

চমকে ওঠে গঙ্গা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে শুধু বলে : নেহি মারি, তু যা। তু-যা--

রাতে শুতে গিয়েও গঙ্গা মুক্তি পায় না। সমগ্র চিন্তা জাল হয়ে ঘিরে ধরেছে দু' হাতে। অনেক চেষ্টা করেও চিন্তার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না সে।

আদালতের কথা মনে পড়ছে।

—চোখের সামনে ভেসে উঠছে আদালত কক্ষের দৃশ্য। সাক্ষীর কাঠগড়ায় ও দাঁড়িয়ে। সামনে মহামান্য বিচারপতি। আর এদিকে সহস্র জনতা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে গঙ্গার জবানবন্দী শুনবার জন্য। কলেজের পাপের প্রতিষ্ঠা কেমন করে হয়েছে--শুনবার জন্য। গঙ্গা জবানবন্দী দিয়ে গেল। যা যা দেখেছে সব বলে গেল ধীরে, অকম্পিত গলায়। ওর গলাটা একবারের জন্যও এতটুকুও কাঁপলো না। জনতা উদগ্রীব হয়ে সব শুনলো।

বিচারক ওর কথা শুনে রায় দিলেন : শিক্ষার পবিত্র মন্দিরে শিক্ষক হয়ে একটি ছাত্রীর সংগে এই জঘন্য পাপে লিপ্ত থাকার জন্য শিক্ষককে সারা জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। কলেজ তার চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কলংকিত হলো। কলংকিত হলো কলেজ আজ একা গংগার জবানবন্দীতে। এ পাপ চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে গেল কলেজের ইতিহাসে। কলেজে সাদা দেওয়ালে যে কলংকের কালিমা লেপন হলো তা কোন দিন উঠবার নয়।

হঠাৎ গঙ্গা আর্তনাদ করে উঠে : নেহী, নেহী—কভি নেহী।

শান্তি চমকে উঠে : কিয়া হুয়াজী ?

গঙ্গা জবাব দেয় না। বোবা চোখ মেলিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে শান্তির দিকে। শান্তি আবার বলে: চিল্লায়া কিউ জি ?

: এইসি—

গঙ্গা জবাব দেয়। ছেলেটার দিকে একবার তাকায়। শেষ জীবনের নিধি। দীর্ঘ দিন ধরে অসুখে ভুগছে। টাকার অভাবে চিকিৎসা চলছে না। বেচারা শান্তির কোলে পড়ে আছে। এক টুকরো কাপড়ের ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত। শান্তি অভিযোগের সুরে বলে : আভিতক তুম ইসকা কুছ না করবো হো ?

: করেগা রে, জরুর করেগা—কিঁউ নেহী করেগা—ও মেরা মুনিয়া হ্যায় না ?

শান্তি ওকে বলে : মাগার কব ? খহকা বোখার যে ছোর রাহা নেহী।

একটুক্ষণ চুপ মেরে কি যেন ভাবে গঙ্গা। তারপর প্রায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে : জানতি শান্তি, চৌধুরী সাহাবসে কাহা, গঙ্গা তুম আদালতমে সব সাচ্ সাচ্ কহনেছে হাম তোমে শ' রুপেয়া এনাম দেগা।

: শ' রুপেয়া!

: হ্যাঁরে, হ্যাঁ। ও শ' রুপেয়া মিলনেছে হাম মুনিয়া কো বড়ী ডাগটার জুলফিকার হাসান সাবকো পাছ লে জায়েংগে। গঙ্গার কথা শুনে শান্তি মুনিয়াকে আরও নিবিড়ভাবে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে। আশায় ওর ক্লান্ত চোখের আড়ালে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠে। তার মুনিয়া ভাল হয়ে উঠবে। চৌধুরী সাব শ' রুপেয়া এনাম দিবে। বড়ি ডাগটার আসবে মুনিয়াকে দেখতে।— ভাবে সে।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে শান্তি বলে : শোন জি, আদালত মে তুম সব সাচ্ সাচ্ বলনা, হাঁ!

: আরে বোলেগা কিঁউ নেহী ? চৌধুরী সাব রুপেয়া নেহী দেনেছে ভী জরুর বোলেগা, সব সাচ্ সাচ্ বোলেগা—গঙ্গার গলায় দৃঢ়তা ফুটে উঠে।

তারপর ওরা দুজন নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ে ঘুমের কোলে।

পরদিন।

বেলা দশটা পঁয়ত্রিশ। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী প্রফেসর জলীল আহমেদ। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের সুপুরুষ যুবক অধ্যাপক সাহেব। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ও সদা হাস্য গৌরবর্ণ চেহারা তার এ কদিনেই ম্লান হয়ে গেছে। চোখের নীচে কালী জমে আছে। চুলগুলো এলোমেলো উস্কো-খুস্কো। জামা-কাপড় শ্রীহীন। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন আসামীর কাঠগড়ায়। নিশ্চুপ নিথর হয়ে। লজ্জায় জড়সড়। মনে মনে হয়তো বা বলেছেন : 'মা ধরিত্রী তুমি দ্বিধা হও। আমি তোমার কোলে আমার লজ্জাকে লুকোই।'

ডানদিকে বসে মহামান্য বিচারপতি। আর বিরাট হলঘর ভর্তি লোক। শহরের ছেলে বুড়ো কৌতুহলী শতশত দর্শক। গংগাকে উকীল জালালুল ইসলাম সাহেব জেরা করতে থাকেন। দু হাতে কাঠগড়ার রেলিং দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিতে থাকে গঙ্গা।—গঙ্গা জীউ। আদালত কক্ষ থমথম করছে।

ওর জবানবন্দী শুনবার জন্য সবাই উন্মুখ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সকলে শুনছে ওর প্রতিটি কথা। জবানবন্দী।

উকীল সাহেব জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি প্রতিদিন কলেজের দরজা বন্ধ করতে যাও গঙ্গা ?

: জী হুজুর।

: তুমি কি কলেজ গেট বন্ধ করার পূর্বে গোটা কলেজ ঘুরে দেখে নাও ?

: জী হুজুর।

: তুমি কি গত শনিবার কলেজ গিয়েছিলে ?

: জী হুজুর।

: তুমি সেদিন বিকেল পাঁচটায় কলেজ ছুটির পর প্রফেসর রুমে কেন গিয়েছিলে ?

: তালা লাগানে হুজুর।

প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয় সে ঠিক ঠিক। এতটুকুও গলা কাঁপে না। একবারের জন্যও না।

উকিল সাহেব শেষ ও মোক্ষম প্রশ্ন ছোড়েন ওর দিকে। বলেন : তালা লাগাতে গিয়ে প্রফেসর রুমে তুমি কাউকে দেখেছিলে গঙ্গা ?

মুহূর্তে গঙ্গা জনতার দিকে তাকায়। ওদের শত-সহস্র চোখ কান উদগ্রীব হয়ে আছে কলেজের চল্লিশ বছরের ইতিহাসে প্রথম পাপের প্রতিষ্ঠা দেখার জন্য।

এক মুহূর্ত।

কি যেন ভেবে নেয় সে শেষবারের জন্য। ওর গলা কেঁপে ওঠে। বলে: জী নেহী হুজুর। হামি কাউকে দেখিনি।

: গঙ্গা!

উকিল সাহেব আকাশ থেকে যেন মর্ত্যে ধপাস করে ছিটকে পড়েন। তার গলা থেকে যেন আর্তনাদ বের হয়। একি বলছে গংগা ?

দর্শকদের মাঝেও বিস্ময়ের গুঞ্জরণ ওঠে। সবাই ফিস-ফিস শব্দ করে এতোক্ষণে। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। এদের মধ্যে কেউবা একটু জোরেই বলে—

: মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

কেউবা তার উত্তরে বলে : না, ও শালা হাতখোর, প্রফেসরের কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ খেয়েছে। নইসে একথা বলবে কেন ?

উকিল সাহেব বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—

: মিথ্যা কথা বলো না গঙ্গা। তুমি তোমার ভগবানের শপথ খেয়ে বলো : কাউকে দেখেছিলে কিনা ?

কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে বিচারকের দিকে তাকিয়ে গঙ্গা বলে : ধর্মাবতার, ভগবানের শপথ করেই আমি বলছি, হামি সাচ্ সাচ্ কলেজে সেদিন কাউকে দেখিনি হুজুর।

বক্তব্য শেষে গঙ্গা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।

গঙ্গা কলেজে পাপ প্রতিষ্ঠা হতে দিল না। কোন লোভে নয়—কোন স্বার্থের খাতিরেও নয়। সে বেঁচে থাকতে তার পিতৃতুল্য সন্তানতুল্য কলেজের ইতিহাসে পাপের প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না।
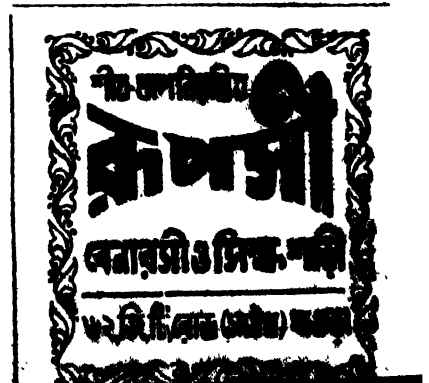
ঊনচল্লিশ বছর আগেকার কংগ্রেস সভাপতিকে মণ্ডপে নিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। সঙ্গে আছেন শ্রীমতী মায়া রায় এম-পি।

অঙ্গনা

মহিলাদের রাজনীতি সচেতনতা

খবরে প্রকাশ, জাতীয় কংগ্রেসের এবার-কার অধিবেশনে যোগদানকারী মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। মোট প্রতিনিধির সংখ্যা পঁচিশ হাজারের কাছা-কাছি। তুলনামূলক বিচারে খুব একটা উল্লেখযোগ্য না হলেও এ সংখ্যা অনেকখানি আশাব্যঞ্জক। যতদূর জানা যায়, এমন বিপুল সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি ইতিপূর্বে আর কোন কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেননি। অথচ প্রাক স্বাধীনতা যুগে দেশের রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয় মহিলারা এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কমলা নেহরু তখন মৃত্যুশয্যায়, জওহর-লাল নৈনী জেলে বন্দী। বৃটিশ তরফে জওহরলালের কাছে প্রস্তাব এল যে, তিনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন, দণ্ডভোগের যে মেয়াদ এখনো বাকি আছে সে সময়ে তিনি রাজনীতির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখবেন না তবে অসুস্থ স্ত্রীকে দেখার জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আত্মহত্যা করা এ দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না পণ্ডিতজীর কাছে। মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু অতি দ্রুত সব সংশয় কাটিয়ে উঠলেন। আর এ শুধু সম্ভব হলো পত্নী কমলারই জন্য। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন, সেপ্টেম্বরের পর এলো অকটোবর। তাকে (কমলা নেহরু) দেখার জন্য আমাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া

হলো। সে আচ্ছন্নের মতো শুয়েছিল। গায়ে বিষম জ্বর। সে আমাকে দেখতে চেয়েছিল, আমাকে তার কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আবার জেলে ফিরে যাবার সময় মৃদু হেসে সে আমাকে নিচু হতে বললো। আমি নিচু হলাম। আমার কানে সে ফিসফিস করে বললো—সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কি হলো? ঐ প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়ো না।—এই হচ্ছে কমলা নেহরু।

তাঁর মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ সভায় রবীন্দ্রনাথ কমলা নেহরু সম্পর্কে বলেছিলেন। এই নারীর বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে প্রতিদিন যে দুঃসহ সংগ্রাম চলেছিল, যে সংগ্রামে তিনি কোনদিন পরাভব স্বীকার করেননি সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কঠিন বিচ্ছেদ তিনি অচঞ্চল চিত্তে বহন করেছেন স্বামীর মহৎ ব্রতের প্রতি লক্ষ্য রেখে। দুর্বিষহ দুঃখের দিনেও স্বামীকে তিনি পিছনের দিকে ডাকেননি নিজের কথা ভুলে সংকটের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁকে বেদনা জানাননি। স্বামীর ব্রতরক্ষা তিনি আপন প্রাণরক্ষার চেয়েও বড় করে জেনেছিলেন। এই দুষ্কর সাধনার জোরে তিনি মৃত্যুর পরও স্বামীর নিবিড় সঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

এমন যোগ্য স্ত্রী না পেলে জওহরলালের জীবনসাধনা হয়তো অপূর্ণই থেকে যেত। কংগ্রেসের কর্মমুখর জীবনযাত্রায় প্রথম সারির নেতাদের গৃহিণী, মা এবং বোন সকলেরই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। এবং সে ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলতে গেলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় কংগ্রেসের সার্থক রূপায়ণে তাঁরাই ছিলেন মূল প্রেরণাদাত্রী।

এলাহাবাদের আনন্দ ভবন ছিল জাতীয় কংগ্রেসের এক বিরাট ঘাঁটি। সেদিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেশের পক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ছিলেন তখন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার। আর তিনি যাঁর কাছ থেকে নিরন্তর প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি হলেন তাঁর পত্নী স্বরূপা দেবী। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনে তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণে তিনি প্রতিটি কর্মে স্বামীকে আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন।

দেশবন্ধু-জায়া বাসন্তী দেবী স্বামীর দেশানুরাগের প্রতি ছিলেন উৎসর্গিতপ্রাণা। শুধু দেশবন্ধু নয় সেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর মনে তিনি বিরাট প্রেরণা জাগিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র তো তাঁকে মা বলেই সম্বোধন করতেন। সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হওয়ার পিছনে বাসন্তী দেবীর দান অনেকখানি। স্বামীর সকল কাজেই ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। তাই দেখা যায় যে, দেশবন্ধু যখন বাড়ি-ঘর সবকিছু দেশকে দান করে রিক্ত হলেন তখনও বাসন্তী দেবী হাসিমুখে স্বামীর হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। দিনের পর দিন দেশবন্ধু কারান্তরালে দিন কাটিয়েছেন আর বাসন্তী দেবী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরো প্রশস্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলার কাজে করেছেন আত্মনিয়োগ।

গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরবাও খুব একটা স্বামী সান্নিধ্য পাননি। গান্ধীজীর জীবন কেটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর ইংরেজের জেলে। কস্তুরবা সেজন্য কখনো বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করেননি। গান্ধীজী যখন দেশের কাজে ব্যস্ত তখন তিনি তাঁর কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন মেয়েদের মধ্যে নানা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, এঁরা সকলে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি বটে কিন্তু এঁদের প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষে কাজ করাই ছিল একরকমের অকল্পনীয়। আবার মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম থেকে শুধু জাতীয় কংগ্রেসের সংগে মহিলাদের যোগাযোগ ছিল। ১৯১৭ সালে তাঁরা এগিয়ে এলেন প্রত্যক্ষভাবে। সে বছর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং সভানেত্রী নির্বাচিত হন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত। এই সর্বপ্রথম একজন মহিলা জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী পদে বৃত হনে। সেদিন তাঁকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল দেশবন্ধু-কন্যা অপর্ণা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে তার কিছুটা উদ্ধৃত দেওয়া যাক : বিপুল সমারোহে শ্রীমতী বেসান্তকে স্টেশন থেকে শোভাযাত্রা করে আনা হলো।...জাতীয় পতাকার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পোশাকে কিশোর-যুবকদের অশ্বচালনা, জাতীয় সেবকদলের ছেলেমেয়েদের শোভাযাত্রা ও সর্বশেষ পুষ্পাচ্ছাদিত গাড়িতে শ্রীমতী বেসান্তের প্রত্যাভিনন্দন চিত্তাকর্ষক হয়েছিল সন্দেহ নেই। জনাকীর্ণ পথের দু-পাশের বাড়ি লোকে লোকারণ্য। যেখান দিয়ে তাঁর গাড়ি যাচ্ছিল সেখান থেকেই তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করে সমগ্র দেশ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বৃটিশ আইনের প্রতি ঘৃণা এবং আইন-কবলিত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্তা দেশনায়িকার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা তাঁকে সম্রাজ্ঞীর মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এরপর ১৯৩৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর মর্যাদা লাভ করেন শ্রীমতী নেলি সেনগুপ্তা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিণী জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন আজ থেকে ৩৯ বছর আগে। দেশপ্রিয়ের প্রতিটি কাজে তিনি ছিলেন স্বামীর বিশ্বস্ত সহচরী। সে বছরও কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়। আজ আবার যখন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সংগে দেখা করেন। আবেগভরে প্রধানমন্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলে [illegible] তোমার কাছে [illegible] আমার [illegible] ভারতের [illegible] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য [illegible] নেলি সেনগুপ্তা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও স্বামীর জন্মভিটা চট্টগ্রামেই ছিলেন। চিকিৎসার জন্য কিছুদিন হলো তিনি কলকাতা এসেছেন। আর সে [illegible] বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

[illegible] সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে [illegible]। সেখানে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। [illegible] অল্পসংখ্যক মহিলা [illegible] দেশপ্রেমে অনন্যা ছিলেন তাঁদের [illegible] শীর্ষস্থানীয়া। গান্ধীজীর বিশ্বস্ত অনুগামীদের তিনি অন্যতম। জাতীয় কংগ্রেসের নানা সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বলতে গেলে তিনিই প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি কংগ্রেস সভানেত্রীর সম্মান লাভ করেন।

তারপর আর অনেকদিন কংগ্রেস সভানেত্রীর মর্যাদায় কোন মহিলাকে দেখা যায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনীতির প্রতি মহিলাদের আগ্রহও অনেকখানি কমে গিয়েছিল। তাই সেসময়ে কংগ্রেস অধিবেশন যোগদানকারী মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যাও তেমনভাবে সাড়া জাগায়নি। দেশ স্বাধীন হবার দীর্ঘদিন পরে ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস সভানেত্রীর সম্মান লাভ করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজকের ভারতের রূপকার। এ দু বছর কংগ্রেসের অধিবেশন বসে যথাক্রমে গৌহাটি এবং নাগপুরে।

তারপরের ইতিহাস অনেক মোড় নিয়েছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত সুদক্ষ এবং সুযোগ্য কাণ্ডারীর মতো তিনি দেশতরণীর পরিচালনা করছেন। এবারের কংগ্রেস অধিবেশনের তিনিই মধ্যমণি। তিনি আমাদের নারী জাতির গৌরব। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক রাজনীতি সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে। একে বলা চলে মহিলাদের রাজনীতি-সচেতনতার পুনর্নবীকরণ। এর সবটাই নেহাত সাময়িক না সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার ইংগিত বহন করছে তা বোঝা যাবে দূর ভবিষ্যতে। সে মূল্যায়নের এখনই অনুকূল সময় নয়।

রুমা গুহঠাকুরতা

রুমা গুহঠাকুরতা সংলাপ মুহূর্তে

সন্ধ্যা সেন

'রুমা গুহঠাকুরতা'—নামটি শুনলেই মনে ভাসে নিটোল একটি মুক্তোর ছবি। আয়তনে বিশাল নয়, কিন্তু তার দীপ্তিতে? টলটলে পূর্ণতায়? মুগ্ধ না হয়ে উপায় আছে?—এ দীপ্তি প্রখর নয় বলেই মনের কোথায় যেন এমন একটা স্নিগ্ধদ্যুতি বিকীরণ করে, যার দাহ নেই কিন্তু আলো আছে। ব্যক্তিত্বের এই স্বয়ংপ্রভ আলোতেই রুমা উদ্ভাসিতা।

রুমাকে দেখেছিলাম অনেক দূর থেকে। কখনও মঞ্চে, কখনও বা পর্দায়। আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসবের নানান অনুষ্ঠানে যখন অকৃপণ ঔদার্যে ঢেলে দিয়েছেন নিজেকে তার অতি আদরের ইয়ুথ কয়ারের নৃত্যের জোয়ারে, গানের কলতানে, উৎসবসভায় সহস্রপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। উজ্জ্বল করে তুলেছেন সেই পুণ্যমধুর লগ্নকে। সেই আলোতেই শুধু দেখলাম না, নতুন করে চিনলাম রুমাকে। নামেরই মত মধুর যাঁর প্রতিটি সৃষ্টি, শিল্পচিন্তা ও গতির তরঙ্গ।

নাচ, গান, অভিনয়, সংগঠনশক্তি সবকটিতেই তিনি শুধু প্রথম শ্রেণীর নন, যাকে বলে জাত-প্রতিভা তাই। কিন্তু এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী হয়েও শিল্পী যেন তাঁর যথাযোগ্য স্বীকৃতির আসনটি পেলেন না। রুমার সম্বন্ধে এইরকম একটা অস্ফুট ক্ষোভ মনের মধ্যে জমা ছিল। বারবার মনে হয়েছে শিল্পজগতের অনেক ঘটনার মধ্যে এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনারই সামিল। কিন্তু আরো আশ্চর্য ঘটনা যেটি, সেটি হচ্ছে এই যে তিনি নিজে এর জন্য এতটুকুও ক্ষুব্ধ নন। তাঁর ইয়ুথ কয়ার নিয়েই তিনি ভরপুর রসউজ্জ্বল'—কি পাইনি সেই হিসাবের ক্ষুদ্রতা এ আনন্দকে [illegible] তিনি রাজী নন।

'অনেকটাই বলছি—আমার ইয়ুথ কয়ার নিয়ে আমি এত আনন্দে আছি, যে কোন অপূর্ণতার বেদনা আমার এতটুকুও বাজে না। কারো সম্বন্ধে আমার এতটুকু অভিযোগ নেই।'—মাত্র কয়েক দিন আগে নানান আলোচনাপ্রসঙ্গে শিল্পীর এই নির্ভীক দৃঢ় উক্তিতে এক নিখাদ আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছিল বলেই বুঝি তা মনকে এমনভাবে স্পর্শ করল। এই ইয়ুথ কয়ার রুমার সারাজীবনের শিল্প, ধ্যান, স্বপ্ন ও সংস্কৃতির ফলশ্রুতি—এ তাঁর প্রাণের চেয়েও বড়।

এই ইয়ুথ কয়ার প্রসঙ্গেই শিল্পী ফিরে গেলেন সুদূর অতীতে। ওঁর সেই সঙ্গে আমারও চোখের সামনে ভেসে উঠল লোকালয় ও তার কলরব থেকে অনেক, অনেক দূরে আলমোড়ায় নৃত্যগুরু উদয়শঙ্করের সাধনপীঠের ছবি। মাত্র সাত বছর বয়সেই উদয়শঙ্করের ধ্যানলোক সেই আলমোড়ায় ছোট্ট রুমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মা,—(তখনকার দিনের প্রখ্যাতা গায়িকা সতীদেবী)। চেতনা জাগবার আগেই বাড়ীতে মা ও বাবার (সুবিখ্যাত শিল্পরসিক ও সাংবাদিক মণ্টুবাবু) সংগীত ও সংস্কৃতির আওতায় মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জলসিঞ্চিত লতার মতই সতেজ শ্যামল হয়ে উঠেছিল। পাখীর মতই কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত গানের গুঞ্জন সুরু হয়েছিল সেই শিশুকাল থেকেই। গানের ঘরে জন্মানো ছাড়াও আবদুল রহমানের কাছে স্বল্পদিনের শিক্ষাতেই সহজাত প্রতিভার শান লেগেছিল। ঠিক এই সময়েই আলমোড়ার পরিবেশ রুমার শিল্পমানস গঠনে মণিকাঞ্চন যোগের মতই ভূমিকা গ্রহণ করে।

'আলমোড়াতে মা গান শেখাতেন। সেখানে নাচ ও গানের শিক্ষা চলল একই সঙ্গে। শুধু কি নাচগানের শিক্ষা? কেমন করে চলতে হয়, সুন্দর করে কথা বলতে

ইয়ুথ কয়ারের লোকনৃত্য

হয়, গুরুজন ও শ্রদ্ধেয় সকলের সঙ্গে আচরণে কেমন নম্রনত হতে হয়—সকল মানুষের মর্যাদা রেখে ব্যবহার, শোভনসুন্দর বেশবাস—সেসব শিক্ষা লেখাপড়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ ছাড়া প্রতি পুজো, বড়দিন, মুসলমানদের পরবে—সবই হয়ে উঠত আমাদের সকলের উৎসব। এ-সবকে কেন্দ্র করে সবাই মিলে সেই হুল্লোড়, আনন্দ কেউ কি কল্পনা করতে পারে? আনন্দের স্রোতেই জাতিগত, ধর্মগত ভেদ-বৈষম্য কোথায় ভেসে যেত। আনন্দের হাটেই সকলের মিলিত সুরের শুদ্ধসৃষ্টিতে এই উপলব্ধি জাগত যে আমরা বাঙালী। হিন্দু, মুসলমান সবই সত্য—কিন্তু সবার ওপর বড় সত্য হোল আমরা ভারতীয়। এ এক অভিনব আত্মপরিচয়। এ পরিচয়ে মানুষের শুধু দৃষ্টিভঙ্গীই নয়, গোটা চরিত্রটাই বদলে গিয়ে একটা অপরূপ বিকাশে যেন দল মেলে।

এ সবেরই উৎস ছিলেন দাদা—যেমন অভিনব তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি, তেমনই অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। এত স্নেহকোমল, এমন কোমল, উদার, কিন্তু কি স্ট্রিকট্ ডিসিপ্লিন! স্টেজের ফ্রেমে সকলের দাঁড়ানো, এক আঙুলের চলার ছন্দে এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। ট্রেনার হিসাবেও দাদা অতুলনীয়।

"এই শোম্যান শিপের শিক্ষা অন্তঃপ্রবাহী শক্তির মতই আপনার ইয়ুথ কয়ার গঠনে সাহায্য করেনি কি?"—শিল্পীর উচ্ছ্বাসমুখরতায় বাধা দিয়েয় বলি।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। জানেন, আলমোড়ার জীবনের মত অমন সার্থক সুন্দর দিন শিল্পীর জীবনে আসে না। দাদা ত মধ্যমণি হয়ে ছিলেনই, তাঁর চারপাশে যেসব ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল গড়ে উঠল তাঁদের আকর্ষণই কি কিছু কম? সিমকীজী, জোহরাজী, অমলাদি, শঙ্করম নম্বুদরী, আরও কত গুণী—সৃষ্টিশীল শিল্পী। এঁদের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করাটাও একটা মস্তবড় সৌভাগ্য।

দাদা সবাইকে নিয়ে অল ইণ্ডিয়া ট্যুরে বেরোলেন। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। যেখানেই যাই ইতিহাসের রাজাবাদশাদের মতই যেন এক একটা রাজ্যজয় হয়ে যায়। এ ট্যুরকে দাদার ট্রুপের দিগ্বিজয় যাত্রা বললেও অত্যুক্তি হয় না। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে বোম্বে এসে দাদা থেকে গেলেন। এই সময় থেকেই এবং বোম্বেতেই 'কল্পনার' রিহার্স্যাল সুরু হয়েছিল।

এই শোতেই আমার নাচ দেখে আর গান শুনে দেবিকারাণী খুব ইমপ্রেসড্ হয়েছিলেন। উনি মার সঙ্গে দেখা করে আমায় ছবিতে নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। সেই আমার প্রথম ছবিতে কাজ।'

'মা আপত্তি করেননি?'

'একেবারেই না। আমাদের বাড়ীর সবাই বিশেষ করে মা, বাবা শিল্পকে সত্যি করে ভালবেসেছেন বলেই এ বিষয়ে গতানুগতিক

ইয়ুথ কয়ারের নাগানৃত্য

'আর একটা কথা—আলমোড়ার অমন স্বর্গের মত পরিবেশের পর চিত্রজগৎ ত বলতে গেলে আশমান জমীন তফাৎ—এর-জন্য মনে কোনো দ্বিধা আসেনি?'

'আসাটাই হয়ত স্বাভাবিক—তবু যে আসেনি তার কারণ দেবিকারাণী ও হিতুমামা (হিতেন চৌধুরী) তখন খুব ছোট ছিলাম বলেই হয়ত এঁরা আমায় এমন স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখতেন যে স্টুডিওটা ঠিক বাড়ী বাড়ী মনে হোতো।'

'কি কি ছবিতে ছিলেন?'

'জোয়ারভাটা' ও 'দিন কা তারা'—এরপর মা পৃথিরাজ কাপুরের থিয়েটারে যোগ দিলেন। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হলাম।'

'তখন কি শিল্পীজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল?'

'ছিন্ন হয়ে গেল বললে ভুল বলা হয়। এই সময় জোহরাজী ও তাঁর স্বামী কামেশ্বরজী বোম্বেতে নাচের স্কুল করেছিলেন। ও'দের কোনো অনুষ্ঠান হলেই আমায় যোগ দিতে বলতেন।

এই সময়ই মাত্র ১৩ বছর বয়সে নীতিনদার আমন্ত্রণে বঙ্কিমবাবুর 'রজনী' ছবির নামভূমিকায় হিন্দী বাংলা ডবল ভার্সনেই অভিনয় করলাম। তখন পড়াশোনায় কিছুটা ছেদ পড়ল। 'রজনী' হিট পিকচারই হয়েছিল এবং আমার গান ও অভিনয় শিল্প-রসিকদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছে।

'রবুদা ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া সুরু করলেন। ভারতের কত বড় বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম তাঁদের কাজের ধারা, ভাবনার ছবি। এই সময় আই পি টি এ গড়ে উঠল। ভারতের সেরা শিল্পীদের মিলনমেলা যেন। আর সকলেই তখন যৌবনপ্রাচুর্য ও সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জ্বল, উচ্ছল। সেসব আনন্দের দিন জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

'এর পরই এল জীবনের এক উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন। ছবিতে কাজ করতে করতেই স্টুডিওতে অবসর পেলেই শচীনদার ঘরে গিয়ে বসতাম। উনি সুর রচনা করতেন, কত আর্টিস্ট আসতেন তাঁদের ছবির গান তোলাতেন। খুব ভাল লাগত। তাছাড়া মানুষটাও ছিলেন বড় মজলিসী।

'এইখানেই দেখলাম কিশোরকে। শিশুর মত চঞ্চল, প্রাণপ্রাচুর্যে যেন টগবগ করছে। আর কি অপূর্ব কণ্ঠ। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নোটেশন, পর্দা, সরগম কিছুই ও জানেন না। কিন্তু সে কোন সুর এক লহমায় তুলে নিয়ে এমন আকর্ষণীয় ঢঙে

গাইতে পারেন যে শুনে মনে হয় যেন অনেক শিক্ষা ও অনুশীলনীর শ্বারা এই 'গায়কী' [illegible] মধ্যে [illegible] কাছের [illegible] জানেন [illegible] এ গায়কী [illegible] শিখিয়ে [illegible]। ও'র কাছে [illegible] মতই [illegible]—

[illegible] ক্ষেত্রে [illegible] অধিকারী ছিলেন'—

'[illegible] শুনেছি। গানের ওপর আমার সহজাত [illegible] ছিল। এই গান শুনতে শুনতেই [illegible] এসে গেলাম। [illegible] তারপর [illegible] বিয়ে হয়েও গেল। তখন আমার '১৬ [illegible]।'

'[illegible] প্রেমের মধুরতার ছোঁয়ায় [illegible] মধুরতর পরিণতির দিকে মোড় নিল?' —স-কৌতূহলে জিজ্ঞেস করি।

'একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বাইরের কর্মজীবনে একটা সাময়িক বিরতির ছেদ পড়ল এটা বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়।'

'কেন?'

'তখন ঘর-সংসার-গৃহস্থালীর কাজটা এত ভাল লেগে গেল যে তাতেই একেবারে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম'—

'বিচিত্র স্বাদ?'

'খানিকটা', বলেই মৃদু হেসে চিন্তিতস্বরে মুন্না বললেন— 'তাছাড়া বিবাহিত জীবনটা আমি খানিকটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলাম'—

'কেন?'

'কারণ এ বিয়েতে আপত্তি ছিল কিশোরের বাড়ীর সবার। সবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছিলাম বলেই জেদ চেপেছিল সবাইকে জয় করতে হবে, আমার বিরোধিতার শক্তি দিয়ে নয়। আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা সেবা দিয়ে। আমার প্রতিজ্ঞা বিফল হয়নি। কিশোরের মা থেকে সবার স্নেহ, ভালবাসায় এমনভাবে ভরে উঠেছিলাম যে কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখ আমার মনকে স্পর্শও করতে পারেনি। তব, এ বন্ধন রইল না' —ঈষৎ অন্যমনস্কতার ছায়া পড়ল মুন্নার আয়ত চোখে।

'[illegible] কেন? ভুল বোঝাবুঝি?'

'[illegible] নয়। বরং তার উল্টো। [illegible] খুব [illegible], সহজ এবং প্রাণখোলা ছিল বলেই মুক্তমনে পরস্পরের পক্ষে এ জীবন থেকে বিদায় নেওয়াটা সম্ভব হয়েছিলো। প্রথমতঃ ওর অমন কণ্ঠসম্পদ, আমি চাইতাম ও তার অপচয় না করে পূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছক গানেরই পথে। কেন শু-[illegible] ছবির গানের জনপ্রিয়তার মধ্যেই [illegible] প্রতিভা সীমিত থাকবে? গানেই [illegible] আত্মনিয়োগ করুক, [illegible] গান [illegible] বা কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীনদা, সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবীর গানের মতই বাংলা গানের চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে। এর জন্য ছবির কাজ যদি একটু কমাতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি?

'কিন্তু প্রাণোচ্ছল কিশোরের পক্ষে শুধু গান নিয়ে থাকাটা সম্ভব হোলো না। তাছাড়া তখন অত নাম, ডাক, গ্ল্যামার, টাকা, ঐশ্বর্য, বিলাসের বিপুল আকর্ষণ ছাড়াটা কারোর পক্ষেই সহজ নয়। এজন্য আমি ওকে একটুও দোষ দিই না।

'কিন্তু এই ছবির কাজেই ও এমন বিভোর হয়ে গেলো যে কাজ ছাড়া ওর জীবনে আর কিছুই রইল না। তখন বোম্বের ছবির ক্ষেত্রে ওর চাহিদা এত বেড়ে গেল যে অন্য কোনো রিল্যাকসেশন বা গৃহ-জীবনের ডাকে সাড়া দেওয়ার কোনো অবকাশই ছিলো না।

'আমার কাছে কোনোদিনই টাকাটা বড় ছিল না, আজও নয়। আর সব বাদ দিলে অথবা ধরলেও একথা ত অস্বীকার করা যায় না যে আমি নারী। নীড় বাঁধবার সাধ আমার মজ্জায়। কর্মজীবন আমি ভালবাসি নিশ্চয়, কিন্তু দিনের শেষে সব কাজ সারা হলে মনটা যে পাখীর মত ডানা গুটিয়ে আশ্রয় নিতে চায়—সৌন্দর্য ও শান্তির নিলয়ে।

'যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই ঘরমুখী জীবনে জীবন যোগ করা কিশোরের পক্ষে সম্ভব নয়—তখন মনে হোলো তবে আর এ নিরর্থক বন্ধনে জড়িয়ে থাকার বিড়ম্বনা কেন? এও ত এক ধরনের আত্মপ্রতারণা—জীবনের অপচয়। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনোরকম কটাক্ষ না করেই বলছি—চিত্রজগতের পরিবেশ এখনও সেরকম [illegible] হয়ে ওঠেনি।

'যাই হোক, যখন বুঝলাম পরস্পরের প্রীতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব না থাকলেও স্বধর্মের তফাৎটা বড় বেশী, তখনই আমাদের জীবনের পথও আলাদা হয়ে গেল। এর জন্য আমরা কেউ কাউকে দোষারোপ করি না। আমাদের বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব-সম্পর্ক আজও অটুট।'

'জীবনের এতবড় একটা ওলট-পালটের পর একাকীত্বের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করবার ঠিক কিছু পরিকল্পনা করে কোনো কাজ করিনি'—বিষণ্ণ হেসে মুন্না বললেন,— 'সবটাই যোগাযোগের ব্যাপার। এই সময়, মানে ১৯৬৬ সালে সলিলদা আমার কাছে এলেন ইউথ কয়ার গড়বার পরিকল্পনা নিয়ে। ও'র আইডিয়া আমার খুব ভাল লাগল—আমি সানন্দে এই গড়ার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

'আইডিয়াটা কি?'

'সলিলদা বললেন, এখনকার যুগ ও [illegible] দেখলাম, [illegible] নের এমন [illegible] হেরিডিট্যারি সঙ তার কোনো খবর এরা জানতে পারছে না, আর না জানলে জানবেই বা কি করে? আমাদের রবীন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত, নজরুলের গান, এত রকমের লোকসঙ্গীত—এর মধ্যের রসের অফুরান সম্পদ, রঙের বাহার, ভাবের গভীরতা, আবেগের দোলা, কাহিনী ওদের সামনে মেলে ধরার দায়িত্ব ত আমাদেরই। এসব গান শুনলে ওরা গ্রহণ করবে না এ হতেই পারে না।'

—সলিলদার কথায় আমার মনও খুব সায় দিল। নূতন উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে গড়বার কাজে নেমে গেলাম—'

'একটা কথা মুন্নাদি'— শিল্পীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বলি—'মাঝের কটা বছর কি গান বাজনার সঙ্গে একেবারেই কোনো সম্পর্ক ছিল না?'

'আমি নিজে কোনো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিনি—তবে সবরকম সঙ্গীত সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক আসরে সুযোগ পেলেই যেতাম। ইহুদি মেনুইনের বাজনা শুনেছি, বিলায়েৎ খাঁ সাহেবও প্রায় আসতেন আমাদের বাড়ী। অন্যান্য সব শিল্পীদেরও আনাগোনা ছিল,—আমি প্যারফরমিং আর্টিস্ট না থাকলেও শিল্পজগতের থেকে একটুও বিচ্ছিন্ন হইনি।'

'এবার বলুন আপনার ইয়ুথ কয়ারের কাহিনী।'

'সে আমাদের জীবনে তীব্রভাবে বেঁচে ওঠার এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বিমল রায় প্রেসিডেন্ট, শৈলেন্দ্র ও আমি হলাম জয়েন্ট সেক্রেটারী। সলিলদা ও আমিই শুধু নয়—কয়ারের প্রত্যেকটি সভ্য যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন ভাবা যায় না। বোম্বে ত কসমোপলিটান শহর জানেনই। নানারকম জাতি, নানা ভাবাভাষীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে করতে 'এক জাতি এক প্রাণ একতা' কথাটির সত্যতা যেন নূতন করে উপলব্ধি করলাম। আর এত সব লোকসঙ্গীত কিভাবে সংগ্রহ করেছি জানেন? গোয়ানীজের কাছে গিয়ে গোয়ান লোকসঙ্গীত তুলে এনেছি, পাঞ্জাবের শিল্পী খুঁজে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজের শিল্পীর কাছে মাদ্রাজী—এইরকম বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছ থেকে গান তুলে এনে [illegible]

ইয়ুথ কয়ারের গরবা নৃত্য

ঘুরিয়েছি। কি প্রচণ্ড পরিশ্রম, কিন্তু কি বিপুল উন্মাদনা আনন্দ। কাজে যে এত আনন্দ আগে বুঝিনি।'

'কেন, আলমোড়ায় ?'

'তখন বয়স খুব অল্প। তাছাড়া সেটা ছিল শিক্ষার যুগ। তবে রথীমহারথীদের কাজের ধারা প্রত্যক্ষ করে অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে একটা সংগঠন করবার সংস্কার গড়ে উঠেছিল। সেই সংস্কারটা এখন কাজে লাগল। একথা নিশ্চয় বলা যায়।—প্রথম শো—দারুণ সাকসেস। আমাদের সবারের মনে হয়েছিল যেন একটা রাজ্য জয় করলাম। সলিলদা বললেন, রুমাদি দেখলেন ত? বলিনি? আমাদের গানের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরজা যদি ওদের সামনে খুলে দেওয়া যায়-ওরা অ্যাকসেপ্ট করবেই ?

সলিলদার দূরদৃষ্টিকে আমি শ্রদ্ধা করি; আর একটা জিনিস ইয়ুথ কয়ারে আমরা সবাই খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, কাজ করেছি, কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমশীল ছিলেন। সলিলদা অত বড় কমপোজার সংগঠক, ইয়ুথ কয়ারের একাধারে পরিকল্পনা, রূপ-দানকারী কিন্তু তার জন্য এতটুকু সচেতনতা কোনো দিন দেখিনি। আমাকে উনি আজও 'রুমাদি রুমাদি' করে কথা বলেন। সব ব্যাপারে এমনভাবে আলোচনা করতেন, পরামর্শ চাইতেন যেন আমিই সব উনি কিছু নন।'

১৯৬৮তে কলকাতায় এলাম রাজেন-বাবুর অনুরোধে ফিল্মে যোগ দিতে।

'ইয়ুথকয়ার ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়নি ?'

'শুধু ইয়ুথকয়ার নয়, একটা গোটা জীবন—জীবনের আলোমাখা একটা অংশ ছেড়ে আসার বেদনাও বড় কম নয়। তাছাড়া ইয়ুথকয়ার আমায় যে কিভাবে ধরে রেখে-ছিলো বলে বোঝাতে পারব না।—বোম্বে ছাড়ার সময় প্লেন ছাড়বার আগে কত দিনের আনন্দ বেদনার স্মৃতি মাখানো শহরটাকে একবার ভাল করে দেখতে চাইলাম কিন্তু চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেল। কিছু দেখতে পেলাম না।'—অশ্রু আভাসে ঝিকিয়ে শ্রীমতিগুহের দুটি বিশাল নয়ন।

এরপরই কলকাতার চিত্রজগতে রুমার আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী ছায়াছবিতে রূপ পাচ্ছে শুনে কৌতূহল হয় আবার শঙ্কাও হয়। বাংলা উপন্যাসের স্থপতির সৃষ্টি কি যথাযথ রূপ পাবে? যদি নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় তবে নাই বা গেলাম সে ছবি দেখতে? এমনি একটা সংশয় এসেছিল যখন 'রজনী' ছায়াছবি আসে। সেদিন কিন্তু অন্ধ মেয়ের অভিনয় দেখে নিরাশ হইনি। অভিনেত্রীকে বরণ করেছিলাম শ্রদ্ধাপূর্ণ শুভেচ্ছা দিয়ে।

প্রকাশই শিল্পকলা। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর প্রকাশভঙ্গী তখনই আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায় যখন কাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে তিনি নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন। শিল্পী তখন ভুলে যান তাঁর নিজের সত্তা—চলে যান অন্য এক লোকে। সেটা আনন্দলোকও হতে পারে, বেদনালোকও হতে পারে।

রুমা গুহঠাকুরতার কর্মপাশ বা পরিধি বিস্তীর্ণ। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখেছি তাঁর অভিনয়—কিন্তু কখনই মনে হয়নি যে চরিত্রের সঙ্গে তিনি নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারেননি।

'গঙ্গা'র তাঁর অভিনয় কি ভোলবার? অথবা 'পলাতকে' মরুণার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়? 'পলাতকে' মমুদদলের মেয়ে বলে কি তাঁকে মনে হয়নি? পি-এর রুমা দেবীকেই কি দেখছি 'পলাতকে?' ভাবতে ভালো লাগে যে শিল্প আর্টিফিসিয়াল হয়ে যায়নি। 'পলাতকে'র

প্রকাশভঙ্গীতে। আধিক্য নেই, আতিশয্য নেই—আবার জড়তাও নেই।

আবার মুহূর্তে মাঝে মাঝে মনে ভেসে ওঠে 'পলাতকে'র শেষের অংশের করুণ ছবি। ঘোমটা, গোরুর গাড়িতে নায়কের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগপূর্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। আজকে নায়ক মরণপথের যাত্রী। ইচ্ছে হয় না তাকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে যেতে। তবু যেতে হবে—প্রীতিতে হবে অশ্রুবদনের গান। গান গাওয়া হয়েছে—সার্থক গান—'চিনিতে পারিনি বধু'। এ গান ... নিজ শ্রোতাদের ... যাওয়া একটা ... বলতে হয় এ প্লো অফ দি হার্ট'।

বেনারসীতে দেখেছি তাঁর অনবদ্য অভিনয়। 'অভিমান', 'সিঁদুরে মেঘ', 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার', 'নির্জন সৈকতে', '৮০-তে আসিও না', ছবিগুলিতে রুমাকে দেখি বিভিন্ন ভূমিকায়।

'ক্ষণিকের অতিথি'তে যে চরিত্রের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন সেটা একটু কঠিন। অতীতের প্রেমাস্পদের কাছে নায়িকাকে আসতে হয়েছে ছেলের চিকিৎসার জন্য। নিরুপায়ের সংকোচ রূপ পেয়েছে তাঁর ভাব, ভঙ্গী ও কথায়। ফেলে-আসা প্রিয়জনের কাছে দেখানো চলবে না আবেগ, আবার স্বার্থপরতার কদ্রূপতাও ফুটে উঠবে না—এইরকম একটা পরিস্থিতিতে অভিনয় করতে হয়েছে রুমাকে। সুন্দর সংযত হয়েছে তাঁর অভিনয়। শেষ দৃশ্যটি কি ভোলবার? বিদায় লগ্ন আসন্ন—ডাক্তার (নির্মলকুমার) জিজ্ঞাসা করছেন, 'খোকন বড় হলে তুমি কি হবে?' আবেগভরা কণ্ঠে মা উত্তর দিচ্ছেন, 'ও বড় হলে ডাক্তার হবে—তোমার মত ডাক্তার হবে।' সজল কৃতজ্ঞতার সুষ্ঠু প্রকাশ হয়েছে রুমাদেবীর বলার ভঙ্গীতে।

রুমাদেবীর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য কি? এই রকম একটা প্রশ্ন করা সহজ—উত্তর দেওয়া কঠিন। তবু যদি...উত্তর দিতে হয় তাহলে বলব সফটনেস। তাঁর অভিনয়ে আছে স্মার্টনেস, সুইটনেস কিন্তু সর্বোপরি আছে একটা সফটনেস।

রুমাদেবীর রোল সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। যখন ভাবি 'পঞ্চতপা' ও 'আরোগ্য নিকেতনে'র কথা। 'পঞ্চতপা'র নায়িকার ভূমিকায় আছেন রুমাদেবী, নায়কের ভূমিকায় আছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়: এঁরাই আবার 'আরোগ্য নিকেতনে' মা ও ছেলে। 'পঞ্চতপা'র রুমা স্বচ্ছন্দ, প্রাণবন্ত—আবার 'আরোগ্য নিকেতনে' রুমা ধীর, স্নিগ্ধ সংযত। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের মিল হোক—দাদু নাতির সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে

বাল্মীকি প্রতিভায় লক্ষ্মীর ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতা

আন্তরিক ইচ্ছে। কিন্তু সেটা যখন সম্ভবপর হল না তখন মা ও ছেলের মাঝে নেমে আসে অভিমানের প্রাচীর। অভিমান কিন্তু অশান্তি আনছে না—এই স্পিরিট ফুটে উঠেছে রুমাদেবীর অভিনয়ে। 'আরোগ্য নিকেতন' একসময় শেষ হয়েছে কিন্তু শান্তি-সৌন্দর্যের যে ছবি মনে আঁকা হয়েছে তা আজও ম্লান হয়নি। এই ছবির সুষমা মনকে ভরিয়ে দেয় শান্তরসে।

শুধু অভিনেত্রীই নন রুমাদেবী একজন সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর অনেক গানই আমাদের আনন্দ দিয়েছে—যেমন 'রুমঝুমে', 'সীমান্তের ঐ সীমান্তে', 'মালিনী মান কোর না', এল পি-র যেক সঙ-এ তাঁর গান, 'দেখো দেখো দেখো শুকতারা', 'মোরা জলেস্থলে', 'আজ্ঞা বনবিহারিণী', 'তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি', 'কোথা বাইরে দূরে', যাজে করুণ-সুরে', 'একখানা মেঘ ভেসে আসে', 'তোমার আমার ঠিকানা'।

'গঙ্গা'র মিউজিক রেকর্ডিং-এর সময় সলিলদা কোলকাতায় এলেন। ইয়ুথ কয়ারের কথা বলতে হেসে বললেন, 'আপনি চলে আসার পরই সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল ইয়ুথ কয়ারও ভেঙ্গে গেল। তারপর উনি এখানেও ঠিক ঐ রকমভাবে ইয়ুথ কয়ার গড়বার ...

...সেই স্বপ্নের ইয়ুথ কয়ার? মনে হতেই আনন্দে প্রাণটা নেচে উঠল। ... সঙ্গে ভয়ও হোল—বাংলার বাইরে ... ঠিক ততখানি শক্ত বাংলাদেশে প্রতিভাকে গড়া এবং মতামতের ভেদবৈষম্যের মধ্যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা। যদি বোম্বের সাফল্য এখানে ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়—প্রাণটা বড় ভেঙে যাবে না?

'আপাতবাদি সলিলদা কিন্তু উল্টো কথাই বললেন, আফটার অল এটা ক্যালকাটা কালচার, শিল্পের প্রতি ভালবাসা—এই নিয়েই এখানের মানুষ হাজার সমস্যাকে উপেক্ষা করে এখানে বেঁচে আছে। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না?'

তারপর অনেক ভাবলাম। বোম্বের জীবনযাত্রা সত্যিই খানিকটা যান্ত্রিক। কলকাতার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা ওখানে নেই। গত ১৪ বছর ধরে যে কজন টিপ্পুর আছেন তাঁরা ত থাকবেন? অতএব 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা'...।

'এই সময় 'গঙ্গা'র কাজ চলছিল। তারই মধ্যে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের উদ্যোগপর্ব চলল।'

'ছবির কাজ করে এতসব শেখানো, রিহার্স্যাল সে ত প্রচণ্ড পরিশ্রমের ব্যাপার। অত সময়ই বা পেতেন কেমন করে? তাছাড়া শরীরের সাধ্যেরও একটা সীমা আছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। শরীরের সাধ্য সত্যিই সীমিত। কিন্তু শরীর ছাড়াও মন বলে একটা জিনিস আছে। তার শক্তি শরীরের শক্তিকে হার মানায়। গঙ্গার কাজ আমার কাছে খুব স্ট্রেনিউয়াস মনে হচ্ছিল। কারণ আল-মোড়া ও ইয়ুথ কয়ারের আওতার কাজ করে আমার মনটা একেবারে টিম-মাইণ্ডেড

হয়ে উঠেছিল। চিত্রজগতে হিরো-হিরোইন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। হিরোর সবসময় হিরো হিরো ভাব, হিরোইনেরও তদ্রূপ। সবাই মিলে জোট বেঁধে বসে হৈ হৈ আড্ডার মধ্যে কাজ করা—পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়সম্বন্ধতেই আমি অভ্যস্ত। তার ব্যতিক্রমটা মনকে পীড়া দেয়, ক্লান্ত ও বিষণ্ণ করে তোলে।

তাই ঠিক এই মুহূর্তে নতুন করে ইয়ুথ কয়ার গড়ার কাজ পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলাম। স্যুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে পুরোদমে রিহার্স্যাল চলতে লাগল। নতুন প্রেরণা। খুব শীগ্‌গির শো দিয়ে সবাইকে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের এক্‌জিসটেন্স জানাতে হবে। এই উদ্দীপনাই সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল।

কিন্তু প্রথমবারে অকল্পিত সাফল্য সত্ত্বেও একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হোলো।'

'কি সেটা?'

'আমি চেয়েছিলাম ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের ফার্স্ট শো কলকাতাবাসীকে সলিলদাই নিবেদন করুন। একদল আমায় সমর্থন করলেন। আর একদল (এঁদের অধিকাংশই ছিলেন সলিলদার পুরানো ছাত্র) এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কোনো বারণ শুনব না। স্রষ্টাই তাঁর কল্পনার রূপমূর্তিকে মেলে ধরবেন। যাঁর যা সম্মান প্রাপ্য তাঁকে সেটুকু দিতে হবেই। আমার কথাই রইল। ১৯৫৯ সালে নিউ এম্পায়ারে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের প্রথম অনুষ্ঠানের সে যে কি বিপুল সার্থকতা ভাবা যায় না। হাউসফুল! শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ১০ মিনিটের জন্য শো দেখতে এসে প্রথম থেকে শেষ অবধি বসে রইলেন—আর শোয়ের পর তাঁর সে কি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন। আমার কথামত সলিলদাই প্রেজেন্ট করেছিলেন।

'কিন্তু আনন্দের এই চরম মুহূর্তেই টিমের অধিকাংশ সভাই স্টেজে দাঁড়িয়েই রিজাইন দিলেন। সব আনন্দের হাজারো বাতি যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। সলিলদাকে বললাম, কি হোলো ত; প্রথমেই বলিনি? সলিলদা হাসলেন। কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান।

'আমি কিন্তু দমিনি। অলড্রেজ্যাতে দাদার শিক্ষা মনের পরতে পরতে যেন গাঁথা ছিল এনি সর্ট অফ চ্যালেঞ্জ ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইন লাইফ। সেই শিক্ষাই আমায় শক্তি যোগাল।

মাত্র ১০ জন নিয়ে রিহার্স্যাল সুরু করলাম। আর দশদিনের মাথায় হিন্দুস্থান পার্ক ওপেন এয়ার শো দিলাম। উদ্যোক্তা ছিলেন কমল ঘোষ। কয়ার-এর সাধনা সব বাধাকে জয় করল। এই শো-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে। স্নেহ ও আশীর্বাদ ধন্য হোলো সেই পুণ্যমুহূর্তে।

'তারপরের ইতিহাস ত সবই আপনাদের জানা। আপনাদের সবার ভালবাসায় আমাদের যাত্রাপথ আজ বাধামুক্ত। এই কয়ার নিয়ে ভারতের কত জায়গা গেছি, ঘুরেছি সব জায়গাতেই শো-এর শেষে সকল দর্শকের চোখে খুশীর আলো জ্বলে উঠতে দেখেছি—সে আলো আমায় উদ্দীপিত করেছে আরও, আরও বেশী এগিয়ে যেতে।'

'যদি কয়ার ও ফিল্মের মধ্যে যে কোনো একটিকে আপনাকে বেছে নিতে বলা হয় আপনি কি করবেন?'

অফ কোর্স কয়ার উইল বি মাই ফার্স্ট চয়েস। এখানের মেম্বারেরা সবাই মিলে যেন একটি একান্নবর্তী পরিবারের মতো। কারো যদি সন্তান হয় আমরা সবাই মিলে হৈ-চৈ করি। কারো বিবাহ হলে একসঙ্গে দলবেঁধে হুল্লোড় করি—মৃত্যু হলে সবাই শোকাচ্ছন্ন হই। আমাদের সবার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের আনন্দ দুঃখে আমরা এক হয়ে গেছি।

'কখন ট্যুরে যাই দলবেঁধে থার্ড ক্লাশে যেতে যেতে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে যতখানি আনন্দ পাই—ঠিক ততখানিই মজা লাগে নানা জায়গায় খাওয়া-শোওয়া বসার সুবিধা-অসুবিধা উপভোগ করতে। একবার ভারী মজা হয়েছিলো। দিল্লীতে গভর্ণমেন্টের ডেলিগেট হয়ে আমরা গেছি। বিরাট এয়ার কন্ডিশনড হোটেলে আলাদা আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে সকলকে থাকতে দিয়েছে। কিন্তু এত কমফোর্টস পেয়েও কেউ খুশী নয়। বলে রুমাদি বড় অসোয়াস্তি লাগছে। একসঙ্গে বসা, গল্প করা হৈ হৈ ত হচ্ছে না? মহার্ঘ্য ব্রেকফাস্ট ডিনারের চেয়ে সবাই মিলে বসে কাগজ পেতে মুড়ি বাদাম আর কলাপাতায় গড়িয়ে যাওয়া ঝোলভাত খাওয়ার মজাটাই আমাদের কাছে বড়।'

'সংসারজীবনের সঙ্গে বাইরের কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করাটা কঠিন লাগে না?'

'লাগত, যদি না আমার শ্বশুরবাড়ীর সবার এমন সহৃদয় সহযোগিতা পেতাম। আমার স্বামী অরূপ গুহঠাকুরতা ত কয়ারেরই একজন। আর আপনি ত জানেনই এদের বাড়ী সংস্কৃতির একটা কেন্দ্রস্থল—বললেও অত্যুক্তি হয় না। কলকাতার অনেক নামকরা সংগীত প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবাড়ী থেকেই।'

'মাত্র কয়েকটা আসরে গেয়েই অমিত যথেষ্ট নাম করেছে। ওর কন্ঠও শিক্ষা-মার্জিত। ও কি কোনো ওস্তাদের কাছে শিখেছে?'

'গুলাম মোস্তাফার কাছে অল্প-দিন শিখেছিল। তবে শুনে শুনেই ও নিজেকে তৈরী করেছে। তাছাড়া কয়ারে ও তালযন্ত্র বাজায়।'

'আপনি ত অনেকবার বাইরে গেছেন ইন্টারন্যাশন্যাল প্রাইজ নেবার উপলক্ষ্য ছাড়াও সাংস্কৃতিক সফরে। ভারতীয় সংগীতের প্রতি ওদের আদর্শটি ঠিক কি ধরনের?'

'মিউজিকের ট্রিমেন্ডাস রেসপন্স আর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ফোক-সঙের ওপরই ওদের ঝোঁক বেশী। ইনডিভিড্যুয়াল আর্টিস্ট হিসেবে গেয়ে ইমপ্রেস করা কঠিন—বিশেষ কয়েকজন ব্যতিক্রমী শিল্পী ছাড়া। আমাদের ভারতীয় সংগীতে লোক-সংগীতের এমন বহুধাবৈচিত্র্য ওদের মুগ্ধ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এদিকে সরকারের নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।'

'বর্তমান বাংলাসংগীতের ধারা সম্বন্ধে আপনার মতটা জানতে ইচ্ছে করে।'

'এখন সমাজ, শিক্ষা, দেশের সবক্ষেত্রেই একটা অস্থিরতার যুগ। এই অস্থিরতার ছোঁয়া সংগীতেও লেগেছে। তবে একটা কথা। পপ্ সং ভালই হোক আর মন্দই হোক—পপ্ সং বলে এখন যা গাওয়া হচ্ছে তা কিন্তু মোটেই "পপ্ সং" নয়। কথা ও সুর এত কাঁচা সেও বোধহয় সুস্থিরচিত্তের চিন্তাজাত নয় বলেই। তবে কোনো দুর্যোগই স্থায়ী হয় না। বাংলা গানের এ শাপগ্রস্ত মুহূর্তের অবসান নিশ্চয় ঘটবে। এ আশা না রাখতে পারলে আমরা বাঁচব কি নিয়ে?'

'আমাদের পত্রিকার সঙ্গে আপনার আত্মীয়সম্বন্ধ চিরন্তন থাকবে ত?'

'সন্ধ্যাদি শিল্পীরাও ত মানুষ। অন্তরের স্নেহদাক্ষিণ্যের আশ্রয় না পেলে তারাই বা চলবে কি করে? আপনাদের এ স্নেহকে অমর্যাদা করা আমার [illegible]

১৯৭২ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির শ্রেণীবিভাগ, মুক্তির তারিখ ও প্রযোজক সংস্থার নামসহ তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ছবির নাম	প্রযোজক সংস্থা	মুক্তির তারিখ	শ্রেণীবিভাগ
১।	জনতার আদালত	জনতা ফিল্ম কর্পোরেশন	২১-১-৭২	রাজনৈতিক
২।	বিরাজ বৌ	কে, সি, দাস প্রোডাকসন্স	১৮-২-৭২	সামাজিক
৩।	আজকের নায়ক	সপ্তর্ষিতা ফিল্মস	২৫-২-৭২	সমস্যামূলক
৪।	মা ও মাটি	সংগীতা প্রোডাকসন্স	২৫-২-৭২	সামাজিক
৫।	আলো আমার আলো	চারুচিত্র	১৭-৩-৭২	সামাজিক
৬।	অনিন্দিতা	গীতাঞ্জলি	১৪-৪-৭২	গার্হস্থ্য
৭।	অপর্ণা	সরকার প্রোডাকসন্স	১৪-৪-৭২	বিপ্লবী-জীবনীমূলক
৮।	শপথ নিলাম	রূপ ও বাণী	৫-৫-৭২	গার্হস্থ্য
৯।	জীবন সৈকতে	রাধারাণী পিকচার্স	১২-৫-৭২	গার্হস্থ্য
১০।	শেষ পর্ব	শুভাম্বু পিকচার্স	৫-৭২	গার্হস্থ্য
১১।	নয়া মিছিল	মনমুন ফিল্মস	২-৬-৭২	সামাজিক
১২।	অর্চনা	সাহা ফিল্মস	১৬-৬-৭২	গার্হস্থ্য
১৩।	অন্ধ অতীত	ঊষা ফিল্মস	৭-৭-৭২	সামাজিক
১৪।	নায়িকার ভূমিকায়	চিত্রযুগ	২১-৭-৭২	গার্হস্থ্য
১৫।	ছায়াতীর	রমেশ সাইগাল প্রোডাকসন্স	২১-৭-৭২	সামাজিক
১৬।	নতুন ফুলের গন্ধ	এটসেট্রা ফিল্মস	২৭-৭-৭২	গার্হস্থ্য
১৭।	বহুরূপী	দীনেশ চিত্রম্	৪-৮-৭২	সামাজিক
১৮।	স্ত্রী	বেবী অনুন প্রোডাকসন্স	১৮-৮-৭২	সামাজিক
১৯।	পিকনিক	ইকান্স ফিল্মস	১-৯-৭২	সামাজিক
২০।	বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা	জাহ্নবী চিত্রম	১৫-৯-৭২	ভ্রমণমূলক
২১।	মেমসাহেব	পম্পি ফিল্মস	১৬-১০-৭২	প্রণয়ধর্মী সামাজিক
২২।	কলকাতা ৭১	ডি এস পিকচার্স	১২-১০-৭২	সমকালীন সামাজিক
২৩।	ছিন্নপত্র	কলামন্দির	২০-১০-৭২	গার্হস্থ্য
২৪।	পদি পিসীর বর্মী বাক্স	অনিন্দ্য চিত্র	৩-১১-৭২	কিশোরকাহিনীমূলক
২৫।	জবান	মুভ প্রোডাকসন্স	৮-১২-৭২	সমকালীন সামাজিক
২৬।	হার মানা হার	সবাক চিত্রশিল্প	৩০-১২-৭২	গার্হস্থ্য

১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির হালতামামি

ওপরের তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে যে, বাংলা দেশে তোলা 'নতুন ফুলের গন্ধ' ছবিটি সমেত মোট ২৬টি বাংলা ছবি কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছে সদ্য অতিক্রান্ত ১৯৭২ খৃীস্টাব্দে। আমরা এর সংগে বাংলা ভাষায় ডাব-করা রুশ ছবি "বাহাদুর ছেলে"কে তালিকাভুক্ত করিনি এই কারণে যে, দক্ষিণ ভারতীয়দের মুখের বাংলা সংলাপ ও গানকেই যখন আমরা ভিন্ন চোখে দেখতে অভ্যস্ত, তখন রুশ অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখনিঃসৃত বাংলা সংলাপ ছবিটিকে আমাদের কাছে কিছুতেই বাংলা করে তুলতে পারবে না।

গেল ১৯৭১-এ যেখানে পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত ২৮ খানি ছবি মুক্তি পেয়েছিল, সেখানে ১৯৭২-এ মুক্তিলাভ করেছে ২৫ খানি। কারণ অনুসন্ধান করতে বেশী [illegible] সাধারণত বাংলা ছবি দেখিয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ৮টি একনাগাড়ে বন্ধ ছিল ১২ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পঁচিশ দিন ধরে যদি ছবিঘরগুলি বন্ধ না থাকত, তাহ'লে নিশ্চয়ই আরও দুটি কয়েক ছবি দর্শকদের মুখ দেখতে পেত। এ-ছাড়া বছরের গোড়ার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ফলে 'ভারতী' চিত্রগৃহ বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল।

ছবির তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিরাজ বৌ" দ্বিতীয়বার ছবির রূপ পেল মানু সেনের পরিচালনায়। আশাপূর্ণা দেবী ও জরাসন্ধের দু'খানি এবং তারাশঙ্কর, বিমল মিত্র, প্রতিভা বসু, শঙ্কু মহারাজ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শৈলেশ দে ও নিমাই ভট্টাচার্যের একখানি করে উপন্যাস চিত্ররূপান্তরিত হয়েছে। পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহের [illegible] ছবি এ-বছর মুক্তিলাভ করেনি। [illegible] পরিচালকদের মধ্যে মানু সেন [illegible] একখানি করে ছবি উপহার [illegible] সলিল সেন, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, [illegible] নাগ ও পীযূষ গাঙ্গুলীর দু'খানি করে ছবি মুক্তিলাভ করেছে। নতুন তিন জন পরিচালককে আমরা পেয়েছি (১) হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, (২) [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] অনিন্দিতা, বহুরূপী ও জবান ছবির মাধ্যমে। এবারে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নতুন নাম হচ্ছে বাপী লাহিড়ী (জনতার আদালত) ও সুকুমার মিত্র (শপথ নিলাম)। বয়স্কী প্রবীণ সুরশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক বহুদিন পরে একখানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন (বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা)।

এবারের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবি হচ্ছে মৃণাল সেন পরিচালিত "কলকাতা '৭১"। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কে এমন মর্মদাহী ছবি ভারতবর্ষে এই প্রথম। ঠিক বিপরীতভাবে নির্মিত হয়েছে জীবনের আদর্শাম্বেষী, ভারতের ঈশ্বরমুখিতার ছবি "বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা" নামক ভ্রমণকাহিনীনির্ভর চিত্র। বর্তমানের যুগযন্ত্রণা ও মানসিকতা রূপ পেতে চেয়েছে 'জনতার আদালত' 'আজকের নায়ক', 'মা ও মাটি', 'শপথ নিলাম', 'নয়া মিছিল', 'বহুরূপী', জবান' প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে।

দেখা যাচ্ছে, অবিসংবাদীভাবে জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমার এবারেও অন্ততঃ সাতখানি ছবিতে নায়ক। অবশ্য ওঁর থেকেও একখানি বেশী অর্থাৎ আটখানি ছবিতে

সৌমিত্র আছেন মাত্র তিনখানি ছবিতে। নায়িকার ভূমিকায় দেখা গেছে সুচিত্রা সেনকে মাত্র দু'খানি ছবিতে। মাধবী চক্রবর্তী এবং [illegible] পাঁচ ও তি[illegible] নতুন মুখের [illegible] পাওয়া গেছে ঃ অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, রাধা সালুজা, অর্চনা, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শাঁওলী মিত্র ও মধুছন্দা।

এ-বছরে আমরা হারিয়েছি রাজলক্ষ্মী দেবী, অনুভা ঘোষ, অমর মল্লিক, নীরেন লাহিড়ী ও পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরীকে। এবং আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে মহেন্দ্র সরকার ও বিজন দত্তকে।

চিত্র-সমালোচনা

হারমানা হার

সম্বাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত "হারমানা হার",—যা ২৯ ডিসেম্বর থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মহাশ্বেতা উপন্যাসের চিত্ররূপ। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, তারাশঙ্কর রচিত এই উপন্যাসটিতে ঘটনার যত [illegible] আছে, মহৎ উপন্যাসসুলভ সে-রকম কোনও অবিস্মরণীয় [illegible] নেই, যা রচনাটিকে কালজয়ী [illegible]রে [illegible]তে পারে। সম্ভবত তারাশঙ্কর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার দিকে জাগ্রত চক্ষু নিয়েই মহাশ্বেতা উপন্যাসটি রচনা করেন। সেদিক দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন সম্বাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেড। কিন্তু মূল কাহিনীটিকে চিত্রনাট্যের মাধ্যমে বিবৃত করবার চেষ্টায় চিত্রনাট্যকার-পরিচালক সলিল সেন যে-সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে অধিকাংশই কোনো রকম ঔচিত্য ও সম্ভাব্যতার ধার ধারে না এবং সময় সময় তারা এমনই প্রত্যাশার বিপরীত যে, মনে হয়, তিনি চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের দিকেও যথেষ্ট নজর দেন নি। নীরা এবং বিনো সেনের চারিত্রিক গভীরতা আরও বেশী ক্ষুন্ন হয়েছে তাদের মুখে অনাবশ্যকভাবে চটুল গানের সমাবেশ ঘটানোর ফলে। বিনো সেনের জীবন দর্শন কি "এসেছি আলাদীন ছু মন্তর-ফন্তর-তন্তর" বা "লেখাপড়া শিকেয় তুলে, বেশতো ছিলাম বাউণ্ডুলে" প্রভৃতি হাল্কা গানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব? না, তারাশঙ্কর রচিত 'মহাশ্বেতা'র প্রতি আদৌ সুবিচার করেনি সলিল সেন লিখিত চিত্রনাট্যটি। যে-গান যোজনা "মণিহার" ছবিতে এনেছিল সাফল্য, তাদের কথা ও সুর ছিল চরিত্রানুযায়ী। দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, বর্তমান ছবিতে তা হয়নি। এখানে গানের কথা ও সুর চরিত্রকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু চিত্রনাট্যের ত্রুটি সত্ত্বেও ভাগ্যতাড়িতা নীরার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন যথাসম্ভব অর্থবহ অভিনয়ের সুমহ চেষ্টা করেছেন এবং [illegible] সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছেন। ভূমিকার যে-সব স্থানে ব্যক্তিত্বের ও চারিত্রিক গভীরতার পরিচয় আছে, সে-সব জায়গায় তাঁর অভিনয় অন্তরস্পর্শী। অবশ্য কিছু দিন আগে পর্যন্তও পর্দার বুকে তিনি যে মাদকতার সৃষ্টি করতে পারতেন, আজ তার অভাব ঘটেছে বটে, কিন্তু অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্যে তিনি যে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তার স্বাক্ষর এ-ছবিতেও আছে। সদানন্দ ও পরার্থকামী শিল্পী বিনো সেন বেশে উত্তমকুমার তার স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু এ-ছবিতে উচ্চাঙ্গের নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের বিশেষ কোনও সুযোগ তিনি পাননি। আত্মভোলা বৃদ্ধ শিল্পী শিবনাথের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের মুখের স্বচ্ছন্দ ও সরস সংলাপ একটি চমৎকার উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে। অপরাপর ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন কেতকী দত্ত, কনিকা মজুমদার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, গীতা দে, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেন-শর্মা নিমু ভৌমিক প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহার চিত্রগ্রহণ সর্বত্র সমানভাবে উচ্চাঙ্গের না হওয়ায় কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। পূর্বেই বলেছি, কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গীত-রচনাও যেমন হয়নি, সুর-যোজনাও তেমনই সঙ্গতিবর্জিত। গানকে যদি বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করতে না পারা যায়, তাহ'লে সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে (এখানে উত্তমের মুখের গান গেয়েছেন মান্না দে) তা যতই অনবদ্য হোক না কেন, ছবির প্রকৃতির সঙ্গে সমতা রাখতে না পারায় তা ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য।

আমাদের মনে হয়, উত্তম-সুচিত্রার যুগ্ম-অভিনয় সম্বাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেড-এর 'হারমানা হার'কে বিপুল জনপ্রিয়তা দেবে।

প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এবং সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ইলা বসু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শ্যামল মিত্র এবং অনুপ ঘোষাল।

স্টুডিও সংবাদ

গৌতম চিত্রমের সংগীত গ্রহণ ঃ গত সপ্তাহে গৌতম চিত্রমের প্রথম ছবি 'জীবন-টাই নাটক'-এর কয়েকটি গান বিজন পালের সংগীত পরিচালনায় মান্না দের কণ্ঠে রেকর্ডিং হয়ে গেছে। মণীষ রায় ছবিখানি পরিচালনা করছেন। কাহিনী ঃ ফণী চক্রবর্তী। শমিত ভঞ্জ ও আরতি ভট্টাচার্য ছবির নায়ক-নায়িকা।

অগ্নিভ্রমর ঃ তানাকা চিত্রমের প্রথম ছবি 'অগ্নিভ্রমর'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। অজিত গাঙ্গুলী এই ছবির পরিচালক কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এর গান লিখেছেন। নচিকেতা ঘোষ এর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। কণ্ঠ সংগীতে আছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও নচিকেতা ঘোষ স্বয়ং। রামানন্দ সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে আছেন। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, বিদ্যা রাও, চিন্ময় রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং নায়ক চরিত্রে আছেন নবাগত কৌশিক বসু।

জীবন রহস্য ঃ তপেশ ঘোষ ও জয়ন্ত দেব প্রযোজিত জাগ্রত পিকচার্সের প্রথম ছবি সলিল রায় পরিচালিত 'জীবন রহস্য'-এর কাজ সমাপ্তির পথে। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীরায় স্বয়ং। চিত্রনাট্য লিখেছেন তপেশ ঘোষ। অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির সুরকার। ছবির বিশেষ আকর্ষণ হিন্দী চিত্রজগতের সর্বজনপ্রিয় চিত্রতারকা প্রাণ। প্রাণ বাংলা ছবিতে এই প্রথম। একটানা দশ দিন স্টুডিও চত্বরে ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্যুটিং শেষ করে প্রাণ ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বোম্বে রওনা হয়ে গেছেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অপর্ণা দেবী, হরিধন, জ্ঞানেশ, মণিকা রায়চৌধুরী, মন্মথ, দিলীপ রায়, কল্যাণী মণ্ডল, [illegible] মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। আশা ভোঁসলে ও মান্না দে ছবিতে গান গেয়েছেন। চিত্রগ্রহণে আছেন পূর্ণ কালের বিমান সিনহা। ব্যবস্থাপনায়—প্রশান্ত পাত্রাদার।

অচেনা অতিথি ঃ সারা প্রডাকসন্সের নতুন ছবি সত্যেন বসু রচিত 'অচেনা অতিথি'র কাজ সংগীত পরিচালক [illegible]

দাসের পরিচালনায় মান্না দের দুইখানি ও মৃণাল চক্রবর্তীর একখানি—মোট তিনখানি গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে শুরু হয়। চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন কাহিনীকার সুখেন দাস। পরিচালনায় আছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন দাস। গেল ২২ ডিসেম্বর থেকে ছবির একটানা চিত্রগ্রহণের কাজ নিউ-থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। ভূমিকালিপিতে এখন পর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন—স্বরূপ দত্ত, সুখেন দাস, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন সাধু, অজয় ভট্টাচার্য, মেনকা দেবী, রত্না ঘোষাল ও নবাগতা সোমা দে। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলায় 'নতুন দিনের আলো' : ইংরেজী নতুন বছর শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বাদল পিকচার্সের অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত ও নচিকেতা ঘোষ সুরারোপিত 'নতুন দিনের আলো' জি আর পিকচার্সের পরিবেশনায় উত্তরা, পূরবী উজ্জলা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, বিকাশ রায়, প্রমোদ গাঙ্গুলী, চিন্ময় রায়, বিদ্যা রাও, হারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতা রায়, দেবরাজ, শমিতা বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, কল্যাণ রায়, অনুপকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মঞ্চাভিনয়

একাডেমী ও রঙ্গমঞ্চে বিজুর বাব : থিয়েটার কমিউনের সর্বাধুনিক প্রযোজনা 'বিজুর বাব' আগামী এগারো জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে এবং চোদ্দ জানুয়ারী রবিবার সকাল দশটায় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে। নাটক ও নির্দেশনায় আছেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি : সংস্কৃতি চর্চায় মফস্বল যে পিছিয়ে নেই কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির নাট্য বিভাগ কর্তৃক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নহবত' নাটকের অভিনয় তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ১০ ডিসেম্বর, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। নাটকের প্রণোত্তাপ আসে সংঘবদ্ধ অভিনয়ের দৃঢ়তায়। এদিক দিয়ে সোসাইটির সভ্যরা সার্থকতা লাভ করেছেন। যে ক'জন শিল্পীর চরিত্র চিত্রন প্রথমেই সবার মনকে স্পর্শ করেছে; তাঁরা হলেন শিবানী ভট্টাচার্য (কেয়া), জয়ন্ত গাঙ্গুলী (জ্যাঠামশাই), বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘেঁটু), শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিবাবু), বলরাম আদক (রাম), বিজয় মুখোপাধ্যায় (অক্ষয়) এই ক'জন শিল্পীর অভিনয় সামগ্রিক প্রয়োজনকে যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে বলে মনে হয়। ২।৩টি ছোট ছোট চরিত্র অভিনয়ে নিমাই ঘোষ (সব্যসাচী), অনন্তকুমার মিত্র (কাশীদাদু) অনুশীলনের অভাবে প্রাণহীন মনে হয়েছে। বিনয় খাঁর (অনন্ত) অভিনয় একবারে অচল।

ফেরারী ফৌজ অভিনয় : গত ১১ ডিসেম্বর 'রঙ্গনা' মঞ্চে কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাবের দশম নাট্যার্ঘ্য উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' অভিনীত হয়। শিল্পীদের দলগত অভিনয়ে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংঘের সভ্য সুহাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নাটকটি সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। চরিত্রচিত্রণে ছিলেন দাশগুপ্তের মত দুরূহ ভূমিকায় বলরাম রায়, জ্যোতির্ময়ের চরিত্রে নারায়ণ গাঙ্গুলী, যোগেনের ভূমিকায় শৈলেন মজুমদার ও অশোকের চরিত্রে হরিশংকর চক্রবর্তী পেশাদার অভিনেতাকেও ছাপিয়ে যায়। অন্যান্য ভূমিকায় অশ্বিনী ঘোষ, হিরণ্ময় চ্যাটার্জি, মাখন দস্তচৌধুরী, সরোজ গোস্বামী, সহদাস চক্রবর্তী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সমাদ্দার, রবি রায়, মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত, সেন্দু সান্যাল, অধীর কর ও হরিপদ পাল বলিষ্ঠ অভিনয় করেন। স্ত্রী-চরিত্রে মঙ্গলাসীর ভূমিকায় মলিনাদেবী, রাধা নীলিমা দাস ও শচীর ভূমিকায় রুণু বড়াল দর্শকদের মনোহরণ করে রাখে। শিশু শিল্পী মাঃ অংশুমান ও কুমারী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীও অভিনয়ে প্রচুর আনন্দদান করে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ : এই বৎসর উজ্জয়িনীতে কালিদাস সমারোহে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণ-কলস লাভ করেছে। পরপর তিন বৎসর এই সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ প্রথম স্থান লাভ করে রেকর্ড স্থাপন করে। এই নাট্যাভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় শকুন্তলার ভূমিকায় ভাস্বতী সেন, ভরতের ভূমিকায় শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্মন্তের ভূমিকায় দীপক চট্টোপাধ্যায়, কণ্বের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনসূয়া গীতা সোম এবং পরিচালক ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়।

সান্ধ্য আসরের নাট্যার্ঘ 'রং বদলায়' : জ্যোৎস্নাময় বসু বিরচিত 'রং বদলায়' নাটকটি বর্তমান নাট্যনিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস। নাটকের কাহিনীর মূল সুর গড়ে উঠেছে কয়েকটি চরিত্রের আনাগোনায়। সেখানে নাট্যকারের মৌলিক চিন্তাস্রোত এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে। সম্প্রতি ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা 'সান্ধ্য আসর' স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে তাদের নাট্যার্ঘ 'রং বদলায়' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। জ্যোৎস্নাময় বসুর নির্দেশনায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন—অণিমা বসু, দত্তা মুখার্জি, রুণু ঘোষ, অরুণকুমার সরকার, অসীম মুখার্জি, স্বদেশরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ সেন এবং জ্যোৎস্নাময় বসু। আলোকসম্পাত, আবহসঙ্গীত ও মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব পালন করেছেন—পরিমল দত্ত, যাদব মণ্ডল, ইউনিক অর্কেস্ট্রা ও মানব ব্যানার্জি।

একাঙ্ক প্রতিযোগিতা : চন্দননগরের 'নাট্যরঙ্গ' ক্লাব জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে একটি একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। যে-সব সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চান, তাঁদের রমেন চক্রবর্তী, সম্পাদক 'নাট্যরঙ্গ', পোঃ গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জীবন্ত স্ট্যাচু : শৈলেশ গুহ নিয়োগীর প্রাণবন্ত নাটক 'জীবন্ত স্ট্যাচু' সম্প্রতি বিশ্বরূপায় মঞ্চে পরিবেশিত হোল।

প্রযোজনা করলেন 'হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতি'। প্রথমেই বলে রাখি এমন সুষ্ঠু প্রযোজনা অফিস ক্লাবের ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই সার্থকতার নেপথ্যে যাঁর শৈল্পিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা লুকিয়ে আছে, তিনি হলেন নির্দেশক শ্রীবঙ্কিম ঘোষ। নাটকটির প্রতিটি মুহূর্তেই শ্রীঘোষের স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চিন্তার প্রোজ্জ্বলতাকেই তুলে ধরে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শিল্পীদের আন্তরিকতার কোন অভাবই ছিল না। শ্রীবঙ্কিম ঘোষ 'পরিতোষের' ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। তাঁর অভিনয় এতো সাবলীল হয় যে, দর্শকরা তাকে বারম্বার স্বীকৃতি জানায়। মনে হয় মঞ্চে 'ব্যাপিকা বিদায়ে'র ঘনশ্যাম'-এর চরিত্রের অসামান্য সাফল্যের পর আর একটি অসাধারণ সৃষ্টি হোল 'জীবন্ত স্ট্যাচু'র 'পরিতোষ'।

সুঅভিনীত নাটকটির অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীময় মৈত্র, অমিয় মল্লিক, পার্থ মিত্র, কান্তি রায়, রবীন চক্রবর্তী, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বিমলেন্দু ঘোষ, সন্তোষ বসু, দীপক মজুমদার, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, তমাল প্রামাণিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুলেখা চট্টোপাধ্যায়, আরতি বসু।

সাহেব বিবি গোলাম : বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলামে'র মঞ্চসাফল্য আজ আর নাট্যানুরাগীদের কাছে অজানা নেই। বহুখ্যাত এই নাটকটিকে সেদিন স্টারে পরিবেশন করলেন 'টেকসম্যাকো স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র শিল্পীরা। মোটামুটিভাবে নাটকটির মর্মকথাকে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করতে পেরেছেন শিল্পীরা। এ-ব্যাপারে নির্দেশক শ্রীতুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী চোখে পড়েছে। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধ ভাষা পেয়েছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে বিমান বল (বংশী), শ্রীধরদেব মুখার্জি (কৌস্তুভমণি) ও মন্দিরা রায় (জবা) চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। তবে পটেশ্বরীর ভূমিকায় শমিতা বিশ্বাস আমাদের হতাশ করেছেন। পটেশ্বরীর অন্তর্বেদনা শ্রীমতী বিশ্বাসের অভিনয়ে মনে হয় কোন মুহূর্তেই ধরা পড়েনি। অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের 'চুণীদাসী'ও একটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ হতে পেরেছে।

দুই মহল: বি বি জে (ভি ডব্লিউ) স্টাফ ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'মিনার্ভা' থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন জ্যোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটকটি। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। সামগ্রিক প্রযোজনাটি দর্শকদের কাছে বেশ উপভোগ্যই হয়ে ওঠে।

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখতে পারেন, তাঁরা হলেন অরবিন্দ

হারানো হার। সুচিত্রা সেন — পরিচালনাঃ সলিল সেন

উত্তমকুমার।। ফটো : অমৃত

বন্দু (জোলহয়া), রবীন্দ্র রায়চৌধুরী (রঞ্জন সান্যাল), অপূর্ব মুখোপাধ্যায় (ছোনেরাম), অঞ্জলি ভট্টাচার্য (ওসমানী)। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন জয়দেব মুখোপাধ্যায়, ইরা মিত্র, পুলক বসু, সজিত চ্যাটার্জি, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভবতোষ গাংগুলী, শৈলেন কর্মকার, অমিয় রায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কে সি বারিক, শশাংক চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ওস্তাদ আলি আহমেদ খান

আলাউদ্দিন সংগীতসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণকেন্দ্র ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ সাহেব তাঁর সংগীত-প্রতিষ্ঠান ও গৃহ ১০৩।বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে পরলোকগমন করেন গত ২৭ ডিসেম্বর। ঐ প্রতিষ্ঠানে তিনি শিশু সম্মেলনেরও প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল (৬৮ বছর অবধি) ইনি জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত শিষ্য-শিষ্যাকে শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন। গত দু' বছর ধরে পক্ষাঘাত, হাঁপানী ইত্যাদি নানান রোগযন্ত্রণা তাঁর উদ্যমকে স্তিমিত করতে পারেনি। কায়মনোবাক্যে, সর্বপ্রকাশে খ্যাত-অখ্যাত সকল সঙ্গীতানুরাগীকে ইনি প্রয়োজনমত সাহায্য করেছেন।

খাঁ সাহেবের জন্ম অধুনা বাংলাদেশভুক্ত ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে। তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন তাঁরই পিতা বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফকির গুল মহম্মদ খানের কাছে। পরে গুরু আলাউদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ আয়েৎ আলি খানের কাছে। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ ফকির আফতাবুদ্দিন খাঁ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি। শেষদিন অবধি তিনি সংগীত-সম্মেলন মঞ্চস্থ করার চিন্তায় বিভোর ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক মহান সঙ্গীতপ্রেমিক, উদারহৃদয় শিল্পীর জীবনাবসান ঘটল।

লোকান্তরিত ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ

প্রখ্যাত সরোদী ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ গত ২৮ ডিসেম্বর ৯৫ বছর বয়সে তাঁর দিল্লীস্থ বাসগৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সেনী ঘরাণার অন্যতম শিল্পী হাফেজ আলি খাঁ ছিলেন সুরসিদ্ধ। তাঁর সুরেলা হাতের টিপ সঙ্গীতজগতে কিম্বদন্তীরই মত হয়ে আছে।

স্ত্রী ও তিনটি পুত্র রেখে তিনি গেছেন। কনিষ্ঠতম আমজেদ আলি খাঁ—ভারতবিখ্যাত সরোদবাদক। ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ ওস্তাদ আলাউদ্দিনের গুরুভাই ছিলেন।

পরলোকে প্রখ্যাত চিত্রসাংবাদিক বিজন দত্ত

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক বিজন দত্ত, ২২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। বিজনদা'র—চিত্রসাংবাদিক মহলের ছোট

বড়. সকলেরই তিনি বিজনদা—শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরে খারাপই যাচ্ছিল, রক্তচাপ, ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর কলমও যেমন থামেনি, চলাফেরাও তেমনই বন্ধ হয়নি। শেষাশেষি মৃত্যুর মাত্র দিন সাতেক আগে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এবং শেষ পর্যায়ে ইউরিমিয়া রোগে আক্রান্ত হন।

অধুনা বাংলাদেশভুক্ত খুলনা জেলার কারাপাড়া গ্রামে ১৯১১ সালে বিজন দত্তের জন্ম হয়। হাওড়া, শিবপুরের বি কে পাল ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই এস সি এবং প্রেসিডেন্সী থেকে বি এস সি পাশ করেন। কিছুদিন তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় এম-এস-সিও পড়েছিলেন। চলচ্চিত্র দেখা ও চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশুনা করার ঝোঁক তাঁর কৈশোর থেকেই। এবং এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'টু আওয়ার ক্যামেরামেন' (ইংরেজী) প্রকাশিত হয় ইংরেজী সাপ্তাহিক দীপালিতে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে। সেই সময় থেকে প্রায় মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি চিত্রসাংবাদিকেরই জীবন যাপন করে গেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। ইদানীং তাঁর লেখা প্রধানত প্রকাশিত হত উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ এবং ইংরাজী স্টার অ্যান্ড স্টাইল পত্রিকায়। তিনি বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত ছিলেন এবং এর সম্পাদক পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অল্পভাষী ও নিজের মতামত সম্বন্ধে দৃঢ়।

তাঁর পরলোকগমনে আমরা একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম। তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রীকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নেই। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

যাত্রাভিনেতা তারাপদ সাউ সম্বর্ধিত : বাংলা সাধারণ নাটশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন রঙমহল থিয়েটারে গত ৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অধিবেশনে সঙ্গীতাচার্য নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সম্মেলন সভাপতি মন্মথ রায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা 'বাণী সাম্ধ্য সমাজ' নামক পারিবারিক যাত্রার দল প্রতিষ্ঠাতা নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ কর্তৃক পল্লী অঞ্চলে লোক-শিক্ষামূলক যাত্রাগানের বিনামূল্যে পরিবেশন ব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্বর্ধনা সভার পর বাণী সাম্ধ্য সমাজ অবনীনাথ গোস্বামী রচিত 'শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা' নাট্যাভিনয় দ্বারা উপস্থিত সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। নাম ভূমিকায় নাট্যশ্রী তারাপদ সাউ-এর অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে।

মিঠু মুখোপাধ্যায়।।

[illegible]

রাজা রামমোহন রায় জন্ম দ্বিশত বার্ষিকী উৎসব : গত ৯ই পৌষ (ইং ২৪শে ডিসেম্বর) রবিবার মিত্র সাহিত্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডস্থ মিলন মন্দিরে ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ড়ঃ শিবদাস চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের প্রতি আলোকপাত করে বিস্তৃত আলোচনা করেন। মিত্রর সদস্যারা রামমোহন রায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্র প্রশস্তি পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অবশেষে শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগী শিল্পীরা এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠান 'ভারত পথিক রামমোহন' গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন।

সাংস্কৃতিকী হাওড়া : গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২, সন্ধ্যা ৭টায় 'সাংস্কৃতিকী হাওড়ার' বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব' উপলক্ষে সংস্থার কার্যালয়ে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রভাতকুমার দত্ত, এবং বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংস্কৃতিক সম্মেলন : সম্প্রতি আমড়াপাড়া স্বরলিপি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় তাদের দ্বাদশ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় যুগবাণী সংঘ প্রাঙ্গণে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক রমানন্দ চক্রবর্তীর সম্পাদকীয় ভাষণের পর অনুষ্ঠান সুরু হয়। প্রথমে বিদ্যালয়ের [illegible] এককভাবে যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য [illegible]

পরিবেশন করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল নাগা নৃত্য, কৃষাণ-কৃষাণী নৃত্য এবং [illegible] জন্ম (নৃত্যনাট্য)। একক-[illegible] পরিবেশন করে কুমারী [illegible] সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। [illegible] ছিলেন [illegible] দে। [illegible] নৃত্যে অংশ [illegible] করে, [illegible] নাগ, [illegible] বিশ্বাস, ইন্দ্রাণী ঘোষাল, বিজলী দাস, মনীষা সিংহ এবং [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় [illegible] দে। অনুষ্ঠানের অন্যতম এবং প্রধান আকর্ষণ ছিল পৃথিবীর জন্ম নৃত্য-নাট্য। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে নৃত্যনাট্যটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। নৃত্যে এবং সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে মধুমিতা প্রধান, ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রদীপ্ত রায়, মনীষা সিংহ, বিজলী দাস, কাকলী নাগ, তপতী সিংহ, স্বপ্না বিশ্বাস, মণিকা ভৌমিক, ডলী চক্রবর্তী, কাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা দত্ত, [illegible] লাহিড়ী, মৌসুমী সুর, বিনীতা [illegible], [illegible] দত্ত, ছন্দা নন্দী, কল্যাণী দত্ত, আশীষ নন্দী, গৌরী ভট্টাচার্য, সুব্রত চন্দ্র, কল্যাণী দত্ত, তপতী সরকার, মহাশ্বেতা দে, শুক্লা চন্দ, সুস্মিতা চক্রবর্তী, গৌরী চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী, শুভ্রা চন্দ। নৃত্য পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন রুবী সিংহ। সঙ্গীত পরিচালনা করেন রমানন্দ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন ত্রিদিবরঞ্জন লাহিড়ী এবং রবীন্দ্রনাথ নন্দী।

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি বার্ষিকী:

গত ১৭ ডিসেম্বর শিয়ালদহ 'ক্রেম টাউন ইনস্টিটিউট'এ মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে ও কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদারের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩৮তম স্মৃতি বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রারম্ভে বিভিন্ন বক্তা ও সভাপতি মহোদয় আমাদের সংগীতবিত্ত সমাজে [illegible]চর্চার প্রচলনে মন্মথনাথের স্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীরা সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সঙ্গীতাংশের প্রারম্ভে পূরিয়া রাগে আলাপ ও ধ্রুপদ পরিবেশন করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়সে বেশ প্রবীণ হলেও তাঁর কণ্ঠ যে এখনও বেশ সতেজ ও কমনীয় তার পরিচয় পাওয়া গেল। পূরিয়ার অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করে তিনি পরিণত শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই শিল্পীর গান আমাদের কলকাতা বেতার কেন্দ্রে বা সঙ্গীত সম্মেলন-গুলিতে শুনতে পাওয়া যায় না, শ্রোতাদের [illegible] বেদনা বোধ স্বাভাবিক। এঁর সঙ্গে [illegible] ও উপভোগ্য সঙ্গত করেন সুখ্যাত মার্দঙ্গিক শ্রীবজীবলোচন দে। তেরী হাতে নানা প্রকার ছন্দের বোলে তবলার ত্রিতালের লহরা বাজিয়ে শ্রোতাদের প্রশংসা পান মন্মথনাথের পৌত্র ও শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও শিষ্য শ্রীমান তাপস। সঙ্গে হারমোনিয়ামে সুর রাখেন শ্রীদেবাশিস ভট্টাচার্য। পণ্ডিত রতন ঝন-কারের এবং শ্রীমতী গিরিজা দেবীর শিষ্যা বারাণসীর কুমারী মঞ্জু সামন্তের পূরিয়া কল্যাণের খেয়াল গানে তাঁর রাগ রূপায়ণের দক্ষতায়, সাবলীল ও বৈচিত্র্যময় তানে এবং বিশেষ করে তাঁর অনুপম কণ্ঠমাধুর্যের আবেদনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন। ঠুংরি ও ভজন গানেও তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এঁর সঙ্গে প্রাণবন্ত সংগত করেন ওস্তাদ আফাক হোসেন খাঁ। পরি-শেষে সেতারে শ্রীমণিলাল নাগ বাজান যোগ রাগ। সঙ্গে তবলা বাজান শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন এই দুই নবীন ও প্রবীণ শিল্পী তাদের স্ব স্ব যন্ত্রের সুর ও ছন্দের যাদুতে শ্রোতাদের যেভাবে অভিভূত করেছেন তার স্মৃতি তাঁদের মনে দীর্ঘদিন অম্লান থাকবে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ।।　　ফটো : অমৃত

•

ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান: গত ২৮ ডিসেম্বর ৭৪তম নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিকেল সাড়ে চারটায় ভারতীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক একটি সঙ্গীত-আলেখ্য পরিবেশন করেন। এই আলেখ্যটি রচনা ও পরিচালনা করেন লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যথাক্রমে মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শান্তি রায়। অংশ গ্রহণ করেন মণিলাল ঘোষ, প্রণব চৌধুরী, পার্থসারথী দত্ত, সবিতা দে, শিখা বন্দ্যো-পাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায়, শিখা রায়, মঞ্জুষা রায়, দ্বিজেন্দ্র বিশ্বাস, অমিতা বিশ্বাস ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

প্রথম টেস্ট খেলা

ফিরোজশা কোটলা মাঠে ভারতের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে জয়ী হয়ে নজির সৃষ্টি করেছে। এই নিয়ে এই মাঠে এই দুই দেশের মধ্যে যে চারটে টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল ড্র ৩ এবং ইংল্যান্ডের জয় ১। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস নিঃসন্দেহে খুবই ভাগ্যবান এবং ইংল্যান্ডের পরমন্ত অধিনায়ক এই কারণে যে, তিনি ইতিপূর্বে কোন টেস্ট ম্যাচ না খেলেই বর্তমান ইংল্যান্ড দলের অধিনায়কের পদ লাভ করেছেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট খেলাতেই শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে জয়ী হয়েছে। অপরদিকে অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারতের পরাজয় এই প্রথম। ইংল্যান্ড বনাম ভারতের বিগত ৪১টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতের জয় ৪, ইংল্যান্ডের জয় ১৯ এবং খেলা ড্র ১৮।

ভারতবর্ষ টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নেয়। প্রথম দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৫৬ রান উঠেছিল। প্রথম দিনটা ইংল্যান্ডের সাফল্যেরই দিন ছিল। অধিনায়ক টনি লুইস খেলায় ঠিকমত বোলার বদল করে যথেষ্ট সাফল্য লাভের সূত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৩ উইকেট পড়ে ৪৩

আবিদ আলী

এবং চা-পানের সময় ৬ উইকেট পড়ে ১০৪। চা-পানের বিরতির সময় খেলায় অপরাজিত ছিলেন আবিদ আলি (২৩ রান) এবং সোলকার (৭ রান)। এই ৭ম উইকেট জুটিই ৫৬ মিনিটে দলের ৪৩ রান তুলে ভারতের মুখরক্ষা করেছিলেন। ভারতের ১২৩ রানের মাথায় সোলকার নিজস্ব ২০ রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১৭৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা মাত্র ৩৭ মিনিট খেলে বাকি ৩টে উইকেটের বিনিময়ে প্রথম দিনের ১৫৬ রানের (৭ উইকেটে) সংগে ১৭ রান যোগ করেছিল। ৮ম উইকেটের জুটিতে ভেংকট

টনি গ্রীগ

(১৭ রান) এবং আবিদ আলি ১৫ মিনিটে দলের ৪৬ রান তুলেছিলেন। তাঁদের ৮ম উইকেট জুটির এই ৪৬ রানই ভারতের ১ম ইনিংসের খেলায় যে-কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রান। ১ম ইনিংসে আবিদ আলির ৫৮ রানই ছিল দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ১৫১ রান উঠেছিল। চন্দ্রশেখর ৫৬ রানে ৪টে এবং বেদী ৪৯ রানে ২টো উইকেট নিয়ে ভারতের অনুকূলে খেলার স্রোত ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে 'গোল্লা' করে মাঠ থেকে ফিরে যান।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের অসমাপ্ত ১ম ইনিংসের খেলায় গ্রীগ (৪৩ রান) এবং আরনল্ড (১২ রান) অপরাজিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩৬ (কোন উইকেট না পড়ে)। লাঞ্চের পর তাদের ৬৯ রানের মাথায় সঙ্কট সৃষ্টি

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

একনাথ সোলকার

বি এস চন্দ্রশেখর

যায়। ৬৯ রানের মাথায় ২য় এবং ৭১ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। ... রানের মধ্যে তিনটে উইকেট পড়ে ... টনি গ্রীগ তাঁর 'অ্যাবডোমেন গার্ড' পরবার সময় পাননি, মাঠে খেলতে নেমে ... ভুল ধরা পড়ে।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ২০ মিনিট আগে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র ২৭ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ড তাদের শেষ ৪ উইকেটে ৪৯ রান যোগ করেছিল। টনি গ্রীগ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ৬৯ রান করে নটআউট থেকে যান। গ্রীগ ২৭৩ মিনিট খেলে তাঁর নটআউট ৬৯ রানে ৮টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন। এই নটআউট ৬৯ রান তাঁর টেস্ট খেলার এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান।

ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ৮টা উইকেট পান। তাঁর আগে ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের টেস্ট খেলার এক ইনিংসে ৮টা উইকেট পেয়েছেন মাত্র দুজন—ভারতবর্ষের পক্ষে ভিনু মানকাদ (৫৫ রানে ৮টি উইকেট, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২) এবং ইংল্যান্ডের পক্ষে ফ্রেডী ট্রুম্যান (৩১ রানে ৮টি উইকেট, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২)।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সোলকার (৩০ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার (৩ রান)। এইদিন সরদেশাই ২০ রান সংগ্রহ করার সূত্রে সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ২০০০ রান পূর্ণ করেন। আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলার শেষে তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান দাঁড়ায়: খেলা ৩০, ইনিংস ৫৫, নটআউট ৪ বার, মোট রান ২০০০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২১২ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৭১) এবং সেঞ্চুরী ৫ (দুটি ডাবল সেঞ্চুরীসহ)।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ৬৯ মিনিট পর ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষ চতুর্থ দিনের খেলায় শেষ ৫টা উইকেটে পূর্ব দিনের ১২৩ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১১০ রান যোগ করেছিল। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ২০৬ (৫ উইকেটে)। লাঞ্চের পর মাত্র ২০ মিনিটের খেলায় ৩টে উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে রান দাঁড়ায় ২১১ (৮ উইকেটে)। সোলকার এবং ইঞ্জিনিয়ার ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১০৩ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। সোলকার ২৪৯ মিনিট খেলে তাঁর ৭৫ রানে ১১টি বাউন্ডারী করেন। অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ার ১৭১ মিনিটে তাঁর ৬৩ রানে বাউন্ডারী করেন ৮টা।
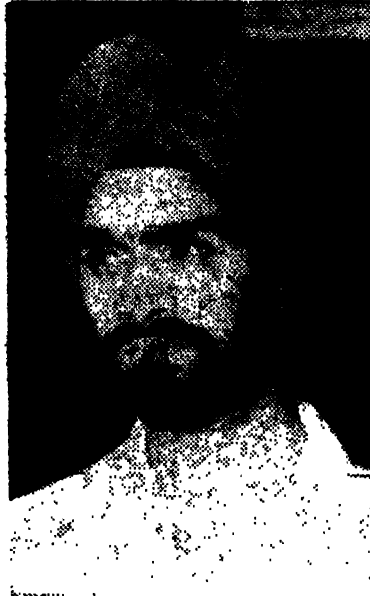
বিষেণ সিং বেদী

ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০৭ রান তুলতে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১০৬ রান সংগ্রহ করে। উড (৪৫ রান) এবং অধিনায়ক লুইস (১৭ রান) খেলায় অপরাজিত থেকে যান। এইদিন বিষেণ সিং বেদী কিথ ফ্লেচারের উইকেট নেওয়ার সূত্রে তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ১০০ উইকেট পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর আগে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন এই তিনজন—ভিনু মানকাদ (১৬২টি উইকেট), সুভাষ গুপ্তে (১৪৯টি উইকেট) এবং এরাপল্লী প্রসন্ন (১২৪টি উইকেট)।
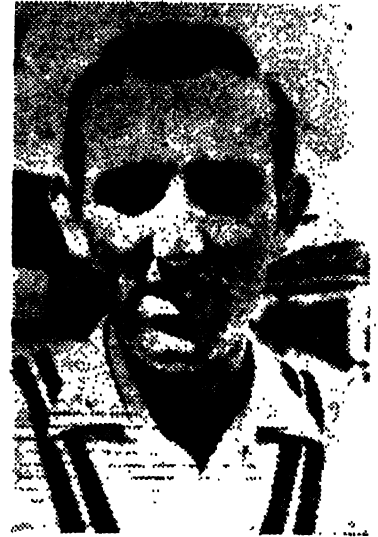
জিওফ আরনল্ড

পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইংল্যান্ড ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২০৮ রান তুলে ৬ উইকেটে জয়ী হয়। লাঞ্চের ৫ মিনিট পর গ্রীগের ব্যাট থেকেই জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান ওঠে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ভারতবর্ষ: ১৭৩ রান (আবিদ আলী ৫৮ রান। আরনল্ড ৪৫ রানে ৬, কোট্টাম ৬৬ রানে ২ এবং গ্রীগ ৩২ রানে ২ উইকেট)।

ও **২৩৩ রান** (সোলকার ৭৫ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৬৩ রান। আণ্ডারউড ৫৬ রানে ৪, আরনল্ড ৪৬ রানে ৩ এবং পোকক ৭২ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড: ২০০ রান (গ্রীগ নট আউট ৬৯ এবং অ্যামিস ৪৬ রান। চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ৮ এবং বেদী ৫৯ রানে ... উইকেট)।

ও **২০৮ রান** (৪ উইকেটে। উড ৪৫, লুইস নট-আউট ৭০ এবং গ্রীগ নট-আউট ৪০ রান। বেদী ৫০ রানে ৩ উইকেট)।

... পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কালকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষান্মাসিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১২ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 12th January, 1973 শুক্রবার, ২৮ পৌষ, ১৩৭৯ .52 Paise

এক নজরে

ছুটির হিসাব : মহামানবের সাগরতীর এই ভারত হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-পারশিক ও মুসলমান-খৃষ্টানের মাতৃভূমি হওয়ার সুফল বোধহয় এদেশের চাকুরিজীবীরাই সর্বাধিক ভোগ করে থাকেন। নতুন বছরের ক্যালেণ্ডারটির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, মোটামুটিভাবে বাহান্নটি রবিবার বাদে সরকারি ছুটির দিন আছে আরও ২৩টি। নিঃসন্দেহে এটি ভারতের একটি রেকর্ড বিশেষ। ইংলণ্ডে সরকারি ছুটির দিন মাত্র পাঁচটি। এমনকি পয়লা জানুয়ারিও সে দেশে ছুটির দিন নয়। অথচ ঐ ইংরাজরাই এদেশে শাসক থাকাকালে যে একদা খৃষ্ট বর্ষের প্রথম দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন বলে চিহ্নিত করেছিলেন তা আমরা আজও অপরিবর্তিত রেখেছি। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের কথা স্মরণে রেখে, এবং সঙ্গত কারণেই, ভগবান যীশুর আবির্ভাবের শুভ দিন 'ক্রীস্টমাস ডে' বড়দিনকেও আমরা সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছি। ইংলণ্ডেও বড়দিন ছুটির দিন, কিন্তু বৃটেনেরই অপর অংশ স্কটল্যাণ্ডে ঐদিন ছুটি থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় ও লৌকিক মিলিয়ে সারা বছরে মোট সাতদিন সরকারি ছুটি, শুধু ইহুদিদের জন্য আরও একদিন বেশি ছুটি। হিন্দু, মুস্লিম, বৌদ্ধ বা শিখ ধর্মের পুণ্যদিনে খৃষ্ট দুনিয়ায় ছুটি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একই কারণে মুস্লিম দুনিয়াতেও ছুটির দিন সীমিত। সুতরাং বহু ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য এটা আমাদের একটা উপরি লাভ বলা যেতে পারে। ছুটির তালিকায় ধীরে ধীরে বুদ্ধ, নানক সকলেই স্থান করে নিচ্ছেন।

তবে এর অন্য একটা দিকও আছে যা মনে রাখলে আমাদের এই বিশেষ সুবিধাটাকে আর তেমন একটা সুবিধা বলে মনে হবে না। পশ্চিম দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই এখন ছয়দিন-সপ্তাহের বদলে পাঁচদিন-সপ্তাহ চালু হয়েছে। সুতরাং সপ্তাহে দুদিন ছুটির দৌলতে ঐখানেই ওরা ছুটির ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বাহান্ন দিন এগিয়ে গেছে। আমাদের ছয়দিন কাজের সময় ওদের দেশে পাঁচ দিন কাজের সময়ে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তাদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু সপ্তাহান্তে শনি-রবি দুদিন ছুটির ব্যবস্থা থাকলে ঐ অতিরিক্ত পরিশ্রমটুকু মেনে নিতে বোধহয় কারও আপত্তি হবে না। তখন যাবতীয় পূজাপর্ব উৎসব অনুষ্ঠানে ছুটি পাওয়ার ব্যাপারটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না।

অভিযোগ মুক্তি : খবরটি ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলের বেলফোর্ট শহর থেকে প্রচারিত। সেখানকার এক উচ্চ বিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিকোল মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, ছাত্রীদের কাছে যৌন প্রচার পত্রিকা পাঠ করে তিনি সমাজজীবনের নৈতিক মান ক্ষুণ্ণ করেছেন। আদালতে শ্রীমতী মার্সিয়ার অভিযুক্ত হওয়ার পর তা নিয়ে এমন হৈচৈ পড়ে যায় যে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে একটা জাতীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মামলার বিবরণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীমতী মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রীর অভিভাবক।

অভিযোগের উত্তরদানকালে শ্রীমতী মার্সিয়ার বিচারপতি সমীপে নিবেদন করেন যে, ক্লাসের ছাত্রীদের অনুরোধেই তিনি 'লেট আস লার্ন টু লাভ এণ্ড এনজয় আওয়ারসেলভস' পুস্তিকাটির কিছু কিছু অংশ পাঠ করে শোনান ও প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আগে কারও আপত্তি আছে কিনা তাও তিনি ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রেমকে কিভাবে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা যায়, কিভাবে প্রেম দাম্পত্যজীবনের বন্ধনকে মধুর করে তোলে—তাই ছিল ঐ রচনার আলোচ্য বিষয়।

শ্রীমতী মার্সিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিই আদালতের কাছে অভিযুক্তাকে নির্দোষ বলে অভিমত দেন। শ্রীমতী মার্সিয়ারকে অভিযুক্ত করা নিয়ে বেলফোর্টের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এমন বিক্ষোভ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেখানকার তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ডিসেম্বর মাসে পাঁচদিনের জন্য বন্ধ রাখেন।

মুক্ত কারাগার : একদা কারাদণ্ডকে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা বলেই মনে করা হত। সেকারণে কারাদণ্ডের সঙ্গে নানা কঠোর শ্রমের ব্যবস্থা ছিল কারার অভ্যন্তরে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে এবং কারাদণ্ডকে শাস্তি না ভেবে সংশোধনের কাল বলে মনে করার প্রস্তাব ওঠে। আর সেই প্রস্তাব মত জেলের অভ্যন্তরেও সংস্কার শুরু হয়। জেলে কয়েদিদের শাস্তির বদলে শিক্ষাদান শুরু হয় এবং যাতে তারা মুক্তির পর স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ঐ পরিবর্তিত চিন্তাধারারই পরিণতিরূপে মুক্তকারাঙ্গনের প্রস্তাব ওঠে। ভারতে প্রথম বাঙ্গালোরে একটি মুক্ত কারাগার গঠিত হয় এবং সে কারাগারে ২৫ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিতকে প্রেরণ করা হয়। সেই ২৫ জন বন্দী গত এক বছরে ১২৫ একর জমিতে যে আধুনিক কৃষি খামার গড়ে তুলেছে তা মুগ্ধ করেছে মহীশূর সরকারকে, এবং সেই উৎসাহে মহীশূর সরকার আরও একটি মুক্ত কারাঙ্গন স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বাঙ্গালোর জেলার কোরামঙ্গল গ্রামে কৃষির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু'শ' বন্দীকে নিয়ে ঐ মুক্ত কারাঙ্গন শুরু হবে এবং কর্তৃপক্ষের সুনিশ্চিত বিশ্বাস, ঐ পরীক্ষাও ব্যর্থ হবে না।

যারা অভাবের তাড়নায়, বিপথচালিত হয়ে অথবা মুহূর্তের উন্মত্ততায় একটা কঠিন অপরাধ করে বসে তারা যে ক্ষমার অযোগ্য নয় এবং সুযোগ পেলে তারাও যে মানবসমাজের কল্যাণে সাগ্রহে আত্মনিয়োগ করে, মুক্ত কারাগারগুলির সাফল্য তারই সুনিশ্চিত প্রমাণ। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে যা পাওয়া যায়, শাস্তি দিয়ে বা রক্তচক্ষু দেখিয়ে তা পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

—প্রত্যক্ষদর্শী

অন্ধ্র ও আসামে অশুভ সংকেত

অন্ধ্র ও আসামে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন সারা ভারতে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। উভয় রাজ্যেই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। আসামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিপন্ন, নির্যাতিত এবং ব্যাপকভাবে বিতাড়িত। অন্ধ্রে একই ভাষাভাষী লোক আঞ্চলিকতার নামে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; অবিশ্বাস ও সংশয় গোটা রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। দুটি রাজ্যের অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দোহাই দিয়েও অবস্থা আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। বিধাননগরে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণই হল তার মধ্যে মুখ্য। অন্ধ্র কিংবা আসামের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে আমরা এই ভেবে শংকিত না হয়ে পারি না যে, বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতিবোধের যেখানে অভাব সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদে পদে ব্যাহত হতে বাধ্য। কার্যত তাই হচ্ছে। অন্ধ্র ও আসাম তাদের নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে এই আত্মঘাতী বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়ে।

আসামের ঘটনার জের চলছে এখনও। কিছুতেই আসাম সরকার তাঁদের ভাষানীতি নমনীয় করতে রাজী হচ্ছেন না। আসামে যে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু বাংলাভাষী আছেন এবং অনসমীয়াভাষী খণ্ডজাতি আছেন তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে আসাম সরকার, গৌহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি অদূরদর্শী ভাষা-প্রস্তাব মেনে নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে একদলদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, আমরা আশা করেছিলাম আসাম সরকার তার কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজের রাজ্যের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সেই ভাষানীতির পরিবর্তন করবেন। দুঃখের বিষয়, আঞ্চলিকতাই আজকাল জাতীয়তার স্থান নিয়েছে; সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনই গণতান্ত্রিক অধিকাররূপে পরিচিত হচ্ছে। তার ফলে আজ পর্যন্ত বিতাড়িত বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীরা ফিরে যেতে পারছে না ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তাদের স্কুল-কলেজে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহের আশ্বাসও তারা মেনে নিতে পারছে না। কারণ, উগ্রভাষাপন্থীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে আসাম সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। কাছাড় জেলার বাংলাভাষীরাও শংকিত। কারণ সেখানে বাংলাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আসাম সরকার সেখানে অসমীয়া ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করতে বদ্ধপরিকর। এ এক আশ্চর্য ভাষানীতি। গণতন্ত্রের এমন বিকৃতি দেশের ভাবগত সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করছে।

অন্ধ্রের অবস্থা আরও বিচিত্র। এখানে সবাই এক ভাষাভাষী: তেলুগুভাষী অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা সংযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে অন্ধ্রপ্রদেশ। এখন মুল্কি বিধি রাখা এবং না-রাখার প্রশ্নে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে চলেছে এক সাংঘাতিক লড়াই। অন্ধ্র এলাকায় বিক্ষোভ এমন মারাত্মক আকার নিয়েছে যে, সেখানে পুলিশের গুলিতে হতাহত হয়েছে লোক। নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘট করে সরকারী কাজকর্ম দিয়েছে অচল করে। কর বন্ধ আন্দোলনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অবস্থা খুবই সাংঘাতিক। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে পার্লামেন্টে মুল্কি বিধি সংরক্ষণের জন্য একটি আইন পাশ করিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হল অনগ্রসর তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জন্য আরও কিছুকাল চাকুরির সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করা। কিন্তু রাজধানী হায়দরাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদে এই আইন চালু রাখতে দিতে অন্ধ্রবাসীদের আপত্তি। একটি রাজ্যের রাজধানীতে যদি সকল শ্রেণীর লোক সকল সুযোগ-সুবিধা না পায়, তাহলে আপত্তি হবেই। তাই তাঁরা এখন চাইছেন, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল: দরকার নেই বিশাল অন্ধ্রের, তেলেঙ্গানা আলাদা হয়ে যাক। ঘটনার গতি দেখে মনে হচ্ছে, অন্ধ্র বিভাগ ছাড়া গতি নেই। অথচ অন্ধ্র-রাজ্য গঠনের দাবিতেই ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলনের সূত্রপাত। অন্ধ্রবাসীরাই একদিন সাগ্রহে প্রাক্তন নিজামশাহীর অন্তর্গত হায়দরাবাদ রাজ্যকে, যার অন্তর্গত তেলেঙ্গানা, নিজেদের বৃহৎ পরিবারে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন।

আসল ব্যাধি অন্যত্র। শুধু ভাষার পালিশ দিয়ে রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত করা যায় না। ভাষা নিশ্চয়ই ঐক্যস্থাপনের একটি বড় উপাদান। কিন্তু তা একমাত্র উপাদান নয়। অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ বাধলে ভাষার স্বর্ণসূত্রও যায় ছিন্ন হয়ে। তেলুগুভাষী অন্ধ্ররাজ্যে তেলেঙ্গানা অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর। যতদিন এই অঞ্চল রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সমান অগ্রসর হতে না পারবে, ততদিন থাকবে এই বিক্ষোভ। সুতরাং তার সমাধান আগে করা দরকার। তাহলেই তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হবে। আসামের অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে এক শ্রেণীর উগ্রভাষাপ্রেমী সংকীর্ণ আঞ্চলিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গোটা রাজ্যে অস্থির অশান্তি ডেকে এনেছে। মাতৃভাষার প্রতি আবেগ যখন উৎকট হয়ে ওঠে, তখনি অন্য ভাষাভাষীদের পক্ষে তা হয় বিপজ্জনক। আমাদের গণতান্ত্রিক শিক্ষার অপূর্ণতাই এর জন্য দায়ী। এই অশুভ শক্তি দূর করতে না পারলে জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ ভেঙে পড়বে। অন্ধ্র ও আসামে যার সূচনা, তা অন্যত্রও দেখা দেবার আশংকা। সুতরাং এখনি সাবধান হবার সময়।

দেশ বিদেশ

বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে যাওয়ার পর এখন ঐ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার পালা। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শংকরদয়াল শর্মা আগামী ৩১ জানুয়ারি নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীদের ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। তার আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসছে এবং তার পর জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতি ও সম্পাদকদের বৈঠক। এইসব সম্মেলন ও বৈঠকের একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে, কংগ্রেসের কি সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা যায়। বিধাননগরের কংগ্রেস অধিবেশনে এবার এই কথাটা বিশেষভাবে উঠেছিল। কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, দলের সিদ্ধান্তগুলি রূপায়িত করার ভার শুধু প্রশাসনের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ, আমাদের বর্তমান প্রশাসনের ভিতর যে স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে সেটা অস্তিবানদের দিকে। সেই কারণে এই বিষয়ে দলের একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। দলকে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে একটি কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, যদিও কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল তাহলেও "কেডার" বলতে যা বোঝা যায় কংগ্রেসের তেমন কিছু নেই। কংগ্রেস একটি গণ-ভিত্তিক পার্টি। এটাই কংগ্রেসের ঐতিহ্য। এই দলের এমন একটা কর্মী বাহিনী নেই যার প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। কংগ্রেস নেতারা এখন অনুভব করছেন যে, এতদিন যেভাবে চলে আসছে সেভাবে আর চলবে না। কংগ্রেসের কথায় আর কাজে যে ফারাক হয়ে যাচ্ছে তা যদি কমাতে হয় তাহলে দলের একটি "কেডার" তৈরি করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিবর্তনের সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কাজটা অবশ্যই সহজ হবে না। কংগ্রেস এতদিন যেভাবে সদস্য সংগ্রহ করেছে সেই সদস্যতালিকার ভিত্তিতে যেভাবে দলের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে তার কোন কিছুর সঙ্গেই একটি কেডার-ভিত্তিক দলের ধারণার মিল নেই। কেডার তৈরি করতে গিয়ে দলের গণভিত্তি পরিত্যাগ করতে কংগ্রেস নেতারা রাজি হবেন বলে মনে হয় না। অথচ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা খুবই কঠিন।

•

বর্তমান রবি খন্দ থেকে খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে সিদ্ধান্ত কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বণ্টনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ করেছেন।

পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, কৃষিপণ্যের মূল্য স্থির রেখে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য জনসাধারণের কাছে, বিশেষ করে দরিদ্রতর মানুষদের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়ার জন্য, চাষীরা যে দাম পান ও খরিদ্দাররা যে দাম দেন, এই দুয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান কমাবার জন্য সারা দেশব্যাপী একটি সুষ্ঠু ও যোগ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। রাজ্যগুলিকে এই সর্বভারতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে, তাদের পৃথক কোন নীতি নিয়ে চলতে দেওয়া হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

এই ধরনের কোন সর্বভারতীয় সংগ্রহ ও বণ্টনের পরিকল্পনা তৈরি হলে সেটা অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে ফুড করপোরেশন অব ইন্ডিয়ার মারফৎ। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফুড করপোরেশনের কার্য-কলাপে এমন কোন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নি যাতে তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যেতে পারে। ফুড করপোরেশনের পরি-চালন ব্যয় দিন দিন বাড়ছে। তার ফলে উৎপাদন ও খরিদ্দারের মধ্যবর্তী পর্যায়ে খরচের ব্যবধান কমার বদলে বরং বাড়তির দিকেই চলেছে। ফুড করপোরেশনের মারফৎ যে খাদ্য বণ্টন করা হচ্ছে তার 'ন্যায্যমূল্য' বজায় রাখা সম্ভবপর হচ্ছে শুধু সরকারি ভর্তুকি দিয়ে। ফুড করপোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা-রকম দুর্নীতির অভিযোগ হয়েছে এবং এসব বিষয়ে সি-বি-আই তদন্ত করছেন। সমালোচনার চাপে করপোরেশনের চেয়ারম্যান ইকবাল সিং ইস্তফা দিয়েছেন।

•

বিধাননগর কংগ্রেসের আর একটি নির্দেশ বলতে গেলে জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হয়ে গেছে। বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের কোন লোক সংকীর্ণতাবাদী কোন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন না। এই অধিবেশন শেষ হওয়ার দুদিনের মধ্যে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেস-কর্মীদের একটি বিরাট অংশ মন্দিরশহর তিরুপতিতে এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। ঐ সম্মেলনে তাঁরা আওয়াজ তুললেন, অন্ধ্রকে দুভাগ করে অন্ধ্র অঞ্চল ও তেলেঙ্গানা অঞ্চলে দুটি পৃথক রাজ্য গঠন করতে হবে। অন্ধ্র অঞ্চল থেকে নির্বাচিত বিধানসভার ৮৫ জন সদস্য, ১১ জন পার্লামেণ্ট সদস্য জেলা পরিষদগুলির সভাপতি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্ধ্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বি ভি সুব্বা রেড্ডি। সম্মেলনে তিনি এই বলে কংগ্রেস নেতৃত্বকে সাবধান করে দেন যে, অন্ধ্রের পৃথকী-করণের আওয়াজ তোলার জন্য যদি কংগ্রেসকর্মীদের শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে অন্ধ্র থেকে কংগ্রেসের 'নাম মুছে যাবে।'

তিরুপতির এই সিদ্ধান্তের পর তেলেঙ্গানার কংগ্রেসকর্মীদের একাংশও পৃথক তেলেঙ্গানার আওয়াজ তুলেছেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা অন্ধ্রকে ভাগ করার বিরোধী। তাঁরা মনে করেন, মুলকি বিধি সংক্রান্ত বিরোধ অবসানের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচদফা সূত্র দিয়েছেন সেটি যদি সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় তাহলে অন্ধ্র ভাগ করার দরকার হবে না। অন্ধ্র ভাগ করলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। একবার অন্ধ্রে এই ধরনের দাবি মেনে নেওয়া হলে অন্যান্য রাজ্যেও এই ধরনের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি উঠবে।

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড মনে করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সূত্রটির তাৎপর্য অন্ধ্রের কংগ্রেসনেতারা জনসাধারণকে ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি বলেই এবং তার পরিবর্তে তাঁরা নিজেরাই সেখানকার জনসাধারণের উত্তেজনার শিকার হয়ে যাওয়ায় অবস্থা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। পরিস্থিতিটা সামলাবার জন্য ও প্রধানমন্ত্রীর সূত্রের ভিত্তিতে অন্ধ্রকে অখণ্ড রাখার চেষ্টা করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত

কমিটির তিনজন সদস্য—শ্রী ওয়াই বি চাবন, শ্রীজগজীবন রাম ও জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ—অন্ধ্রে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে অন্ধ্রে যে একটা প্রবল স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরকারি কর্মচারী ও ছাত্ররা বিপুলসংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। 'জয় অন্ধ্র' পতাকা তোলা হচ্ছে।

এই 'জয় অন্ধ্র' আন্দোলন উপলক্ষে গত ২ জানুয়ারি যে বন্ধ পালন করা হল সেই বন্ধ নানাস্থানে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষের আকার ধারণ করে। নেলোরে পুলিশের সঙ্গে এক সংঘর্ষের ফলে তিনজন আন্দোলনকারী মারা গেছেন। রেল স্টেশন, সরকারি অফিসার, গাড়ি ইত্যাদি আক্রমণ করা হয়েছে, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বিশৃঙ্খলার মোকাবেলা করার শক্তি অন্ধ্র সরকারের নেই। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিং রাও এমনিতেই দুর্বল মানুষ। তিনি তেলেঙ্গানার প্রতিনিধি। দলের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি সামান্য। এদিকে উপমুখ্যমন্ত্রীসহ আটজন মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যাতে পদত্যাগ করেন সেজন্য তাঁর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।

অন্ধ্রের ১১ জন স্বাতন্ত্র্যবাদী এম-পি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে বলেছেন, 'প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ও সরকারি অফিসগুলি অনির্দিষ্টকাল যাবৎ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের নেতৃত্বে অনাস্থার যে সংকট দেখা দিয়েছে তাতে এক অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নির্বিচার ও বর্বরোচিত গুলিবর্ষণের ফলে সেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে।'

এই পরিস্থিতিতে শ্রীনরসিং রাওয়ের মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ নিতান্তই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। দিল্লির খবর হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে অন্ধ্রে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হতে পারে।

•

এদিকে ওড়িশায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও একটি শক্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব ও আরও চারজন বিধানসভা সদস্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা 'স্বতন্ত্র কংগ্রেস' নামে একটি নতুন দল গঠন করেছেন। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে শ্রীমতী শতপথীর বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে ডঃ মহতাবকে এর আগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আরও একজন সাসপেন্ডেড সদস্য শ্রীমনোরঞ্জনধর কোনার ডঃ মহতাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

এই পাঁচজন দলত্যাগ করায় এখন ওড়িশা বিধানসভার মোট ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৭৯ জন কংগ্রেসে রইলেন। এদিকে খবর এই যে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা উৎখাত করার জন্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আরও দুজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী—উৎকল কংগ্রেসের শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও স্বতন্ত্র পার্টির শ্রীরাধানাথ সিং দেও। শ্রীপট্টনায়ক এক বিবৃতিতে ডঃ মহতাবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, দলত্যাগ করে তিনি ওড়িশাবাসীদের নববর্ষের উপহার দিলেন। এটা উপহারের প্রথম কিস্তি। পরে আরও আসছে। কংগ্রেসের আরও কিছু সদস্য এখন দল ছেড়ে হয় উৎকল কংগ্রেসে অথবা নবগঠিত স্বতন্ত্র কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি বলে ওড়িশায় এখন জোর গুজব। বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনেই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

•

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান অ্যান্টোনিও শহরের কাছে র‍্যান্ডলফ এয়ার ফোর্স বেস নামে মার্কিন বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি রয়েছে। ঐ বিমানঘাঁটির একটি বিশেষ বিভাগ আছে যাদের দায়িত্ব হচ্ছে, নিহত, আহত অথবা নিখোঁজ আমেরিকান বৈমানিকদের আত্মীয়পরিজনের কাছে দুঃসংবাদ পৌঁছে দেওয়া। সম্প্রতি ঐ বিভাগের অফিসাররা খুব ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা বর্ষণ করতে গিয়ে অতিকায় বি ৫২ ও অন্যান্য বিমানগুলি যে হারে উত্তর ভিয়েতনামী প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে ঘায়েল হচ্ছিল অতীতে আর কখনও সেই হারে আমেরিকাকে দামী বিমান ও বৈমানিকদের খোয়াতে হয় নি।

বিশেষ করে উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে আমেরিকা যেভাবে বি ৫২ বিমানগুলি খুইয়েছে তা অভূতপূর্ব। পেন্টাগনের নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই পাঁচ দিনে এক ডজন বি ৫২ বিমান নষ্ট হয়েছে। একজন বৈমানিক মারা গেছেন, ৪৩ জন নিখোঁজ। উত্তর ভিয়েতনামের হিসাবে বিধ্বস্ত বি ৫২-এর সংখ্যা দুই ডজন। অথচ, এর আগে সাত বছরে আমেরিকার একটি মাত্র বি ৫২ বিমান ইন্দোচীনের আকাশে নষ্ট হয়েছিল।

বি ৫২ বিমানের অন্য নাম হল স্ট্র্যাটোফোর্ট্রেস। এই বিমানগুলির আটটি করে ইঞ্জিন, ছয়জনের ক্রু নিয়ে সেগুলি চলে। প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এগুলিতে খুব উন্নত ধরনের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা আছে। আসলে এগুলি তৈরি হয়েছিল পারমাণবিক বোমা ফেলার জন্য।

আর এই বি ৫২ বিমানের প্রতিরোধ করার জন্যই তৈরি হয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ার 'এস-এ' পর্যায়ের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। টেলিফোনের থামের আকারের এই বিরাট বিরাট ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মাটি থেকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে এই 'এস-এ' ক্ষেপণাস্ত্রগুলির সঙ্গেই মোকাবেলা হয়েছিল আমেরিকান বি ৫২ বিমানের।

অন্য সময়ে ও অন্য স্থানে ব্যবহারের জন্য তৈরি দুই পক্ষের অস্ত্রের এই সঙ্ঘাতের যে ফলাফল দেখা গেল স্পষ্টতই আমেরিকা তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করার চেয়ে আকাশ থেকে বোমা ছুঁড়ে চলে আসা আমেরিকার দিক থেকে অনেক নিরাপদ, এই গণনা করেই প্রেসিডেন্ট নিকসন বড়দিনের আগে উত্তর ভিয়েতনামে ইতিহাসের প্রচণ্ডতম বোমা বর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন। এই নির্বিচার বোমাবর্ষণ থেকে কেউ বাদ যায় নি, কোন কিছু বাদ যায় নি। হাসপাতাল, মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের শিবির, সিনেমা ভবন সবই আক্রান্ত হয়েছে। এই বর্বর বোমাবাজির বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে ধিক্কার উঠেছে। কিন্তু সেই ধিক্কারেও
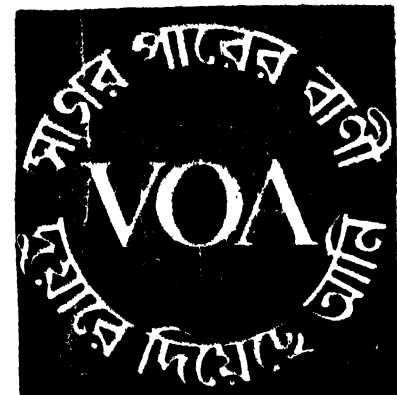
প্রেসিডেন্ট নিকসন সম্ভবত ততটা বিচলিত হন নি যতটা হয়েছেন বি ৫২ বিমানগুলি খুইয়ে। আমেরিকান সৈন্যরা যদি হতাহত না হন তাহলে এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের কি ক্ষতি হল তা নিয়ে আমেরিকানরা মাথা ঘামাবেন না এবং ঐ যুদ্ধ থামাবার জন্য তাঁর উপর চাপ দেবেন না, এটাই ছিল প্রেসিডেন্ট নিকসনের হিসাব। কিন্তু ভূপাতিত স্ট্র্যাটোফোর্ট্রেসগুলি তাঁর সব হিসাব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। থ্যাইল্যান্ডের বিমানঘাঁটি থেকে যতবার মার্কিন বিমান-বন্দরের বার্তাজীবীরা আমেরিকান গৃহস্থের কাছে দুঃসংবাদ নিয়ে গেছেন ততবারই আমেরিকানরা বুঝেছেন, আকাশের বুকে বসে সুইচ টিপে যুদ্ধ চালানও এখন আর আমেরিকার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

অন্যান্য কারণের মধ্যে সম্ভবত এটাও একটা বড় কারণ যেজন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন হ্যানয় ও হাইফং এলাকায় বোমা-বর্ষণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আর একবার ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসনের পরামর্শদাতা কিসিঞ্জার প্যারিসে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন আলোচনা বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন।

৬-১-৭৩ —পুণ্ডরীক

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যে হঠাৎই প্রবীর আর মীরার সংগে দেখা হয়ে গেল। শতদল ভাবতেই পারেনি যে, এতদিন পরে ওদের সংগে এভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। সে ভীড় ঠেলে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। অনেকদিন পর প্রবীরকে দেখে শতদলের মনে হল যে ওর চেহারাটা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে।

—কী ব্যাপার! হঠাৎ তোকে এখানে দেখব ভাবতে পারিনি।

—আমিও পারিনি। প্রবীর বলল।

—আপনিও এসেছেন! এবার মীরাকেই শতদল কথাটা বলল।

মীরা ঈষৎ হেসে বলল, কেন, আপত্তি আছে?

শতদল বলল, নাঃ, আপত্তি থাকবে কেন?

—তারপর বলুন কেমন আছেন? মীরা শুধোল।

—ভালোই। আপনারা?

—আমরা ভালোই আছি। মীরা কথাটা বলে কি যেন ভাবল। তারপর শুধোল, বিয়ে করেছেন?

—নাঃ, করলে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারতেন।

—আর কবে করবি? এবার করে ফ্যাল। প্রবীর বলল।

—দেখি—বলে শতদল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল।

—না আর দেখি-টেখি না। এবার বিয়ে করে ফেলুন।

মীরা প্রায় আবদারের ভঙ্গিতে কথাটা বলল। তারপর শুধোল, আপনার জন্য মেয়ে দেখব?

শতদল খুব অস্বস্তিতে পড়ল। এ ধরনের প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সে? সে চুপ করে রইল।

মীরা তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যেতে লাগল, আমার একজন কলিগ আছে। এম-এ পাশ। দেখতে শুনতে ভালো। বলেন তো দেখি—

শতদল পরিহাসের সুরে বলল, দেখুন—

মীরা বলল, না ঠাট্টার কথা নয়। সিরিয়াসলি বলছি। আপনারা তো বামুন, অলকারাও তাই। আপনার আবার গোত্র-টোত্র নিয়ে আপত্তি নেই তো?

শতদল দেখল, মীরাকে থামাতে গেলে এখন তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া

দরকার। সে বলল, আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করব না কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসব?

সিনেমা হলের সামনের ভীড় তখন কমে গেছে। শো ভাঙার পর দর্শকেরা প্রায় সবাই চলে গেছে। পরের শো-এর দর্শকরা একে একে আসতে সুরু করেছে।

—চল, কোথাও গিয়ে বসি। প্রবীর বলল।

কয়েক পা এগোতেই ওরা একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেল। যদিও বাইরে এখনও বিকেলের আলোটুকু পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, রেস্টুরেন্টের ভিতরে এর মধ্যেই আলো জ্বলে উঠেছে। রেস্টুরেন্টটির আসবাবপত্র বেশ দামী। দেওয়ালের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য সবার আগেই চোখে পড়ে।

ওরা তিনজন ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

প্রবীর শুধোল, কী খাবি বল্।

—আমি কিছু খাবো না। শুধু চা।

—তা কি হয়। মীরা বলল।

—সত্যি বলছি। আমার খিদে নেই।

—কিছু একটা খা। প্রবীর বলল

—আচ্ছা বল্ তোদের যা ইচ্ছে।

প্রবীর বেয়ারাকে ডেকে তিনটে চিকেন রোল আনতে বলল।

মীরা শতদলের ঠিক সামনের সিটে বসায় শতদল মীরার চেহারার পরিবর্তনটা ভালো করে লক্ষ্য করতে পারল। আগের চেয়ে মীরার চেহারা আরও ভালো হয়েছে। দেখতেও আরও সুন্দরী হয়েছে সে। ওদের বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর। এখনও কোন সন্তান হয়নি। বিয়ের পর মীরাকে সে এক-আধবার দেখেছে। তারপর প্রায় দু বছর মীরার সঙ্গে দেখা হয়নি। এর মধ্যে প্রবীরের সঙ্গে দু-একবার দেখা হলেও মীরার সঙ্গে হয়নি। প্রবীরদের বাসায়ও যাওয়া হয়নি বহু দিন।

—তারপর তুই কী করছিস বল। প্রবীর বলল।

—কী আর করবো? একটা চাকরি করি, ছুটি-ছাটার দিনে আড্ডা দি। না হলে সিনেমা দেখতে যাই।

—আমাদের ওদিকে মাঝে মাঝে গেলেও তো পারেন। মীরা বলল।

—কেন যাবো? প্রবীর কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে?

কথাটা বলেই শতদল ভাবল, একটু রূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। বিয়ের আগে প্রবীর তাদের আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিত। বিয়ের পরও দু-এক বছর অনিয়মিত হলেও আড্ডায় আসত। এখন সে তাদের আড্ডায় যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

—তুই আমার বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ করলি? প্রবীর হাসতে হাসতে বলল। বোঝা গেল প্রবীর তার কথায় রাগ করেনি।

—কেন করবো না? আমার অভিযোগটা কি মিথ্যে?

—না, মিথ্যে নয়। কিন্তু এখন আমার কি আগের মত আড্ডা দিয়ে বেড়ানো সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয় শুনি?

—বিয়ে কর, তবে বুঝবি।

—এটা বুঝবার জন্য বিয়ে করার দরকার হয় না।

—সংসার তো কোনদিন করলি না।

—তোর এই একটা ভুল ধারণা। বিয়ে না করলে কি কেউ সংসার করে না? আমি দোকান-বাজার, রেশন-তোলা, ডিপো থেকে দুধ আনা সবই করি। তুই এর চেয়ে বেশি কী করিস?

—ও'র কথা আর বলবেন না। এবার মীরা বলল—কোনদিন আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। একদিন বাজার করতে যেতে বললে যেতে চায় না। সব আমার দেওর করে।

—তবে—বলে শতদল এমনভাবে হাসল যার অর্থ, কি, আমার কথাই ঠিক হল তো?

বেয়ারা এসে খাবারের প্লেটগুলো টেবিলের উপর রেখে গেল।

প্রবীর এবার মীরাকে ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলল, আরে দোকান-বাজার করাটাই কি সব? সংসারের একটা দায়িত্ব আছে না? শতদলের আর কি। ওর তো তিন জনের সংসার। দাদা মা আর ও নিজে। আমাদের মত তো আর বিরাট সংসার নয়।

শতদল চিকেন রোল-এ কামড় বসাতে বসাতে বলল, তোর মাথার উপরে দু দাদা আছে। তোর বাবা-মা এখনও বেঁচে আছেন। তোকে কতখানি সংসারের ভাবনা ভাবতে হয় তা আমার জানা আছে।

এবার আর প্রবীর কোন কথা বলল না। সে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল।

মীরা একবার প্রবীরের দিকে তারপর শতদলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। প্রবীর যে তর্কে হেরে গেছে তাতে সে খুশীই হয়েছে মনে হল। সে শতদলকে বলল, এরা কিন্তু চিকেন রোলটা বেশ করে, না?

শতদল বলল, ফাইন। আমার এতক্ষণ খিদে ছিল না। কিন্তু এটা খেতে খেতে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়েছিল।

প্রবীর এবার হেসে বলল, আমরাও তা জানতুম।

বেয়ারা শূন্য প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চা দিয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রবীর 'আঃ' বলে একটা তৃপ্তির শব্দ করল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিজে একটা নিল, শতদলকেও একটা দিল।

মীরা আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল।—তাহলে কবে আসছেন আমাদের বাড়ী?

শতদল কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে একটা লম্বা টান দিল। তারপর বলল, একদিন যাওয়া যাবে।

—না একদিন যাবো বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কবে যাবেন, ঠিক করে বলুন।

শতদল দেখল মীরাকে একটা যেকোন উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। ও যে-রকম নাছোড়বান্দা তাতে ওকে স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে হবে।

—আপনাদের বাসায় গেলে তো কোন রবিবার বা ছুটির দিনে যেতে হবে। নাহলে তো দুজনকে পাওয়া যাবে না।

মীরা বলল, আমার স্কুল তো সকালে। অবশ্য আপনার বন্ধু অফিস থেকে সন্ধ্যের আগে বাড়ী ফেরে না।

—সেইজন্যই তো বলছিলাম যে কোন ছুটিছাটার দিনে আপনাদের বাসায় যেতে হবে।

—তাহলে এক কাজ করুন। আসছে রবিবার সকালে আসুন। আমাদের ওখানেই খাবেন।

শতদল দিনটা যত পিছিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য একবার শেষ চেষ্টা করল। বলল, আসছে রবিবার? আসছে রবিবার তো পারবো না। একটা বিশেষ কাজ আছে।

শতদলের ঐদিন কোন কাজই ছিল না। তবু মিথ্যে করে কথাটা বলল।

—তাহলে তার পরের রবিবার আসুন। সেদিন নিশ্চয়ই কোন কাজ নেই।

শতদল মীরার পীড়াপীড়িতে বিস্মিত হল। সচরাচর নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে বন্ধু-পত্নীরা তাদের বাড়ীতে যেতে বলে। তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকে না। তাই সে কোন বন্ধুর বাড়ীতে পারতপক্ষে যায় না। কিন্তু মীরার অনুরোধের মধ্যে সত্যিই আন্তরিকতা ছিল। যদিও শতদলের সঙ্গে তার দু-একদিনের বেশি কথা হয়নি তাহলেও মনে হয় সে প্রবীরের মুখে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছে। প্রবীরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তো কম দিনের নয়। সেই কলেজ-জীবনের সুরু থেকে।

—কি, আসছেন তো?

শতদল দেখল, আর এড়াবার উপায় নেই। সে যেন একটু চিন্তা করে বলল, তার পরের রবিবার? আচ্ছা যাওয়া যাবে। মনে হচ্ছে তো কোন কাজ নেই। নেহাৎ যদি কোন জরুরী কাজ না পড়ে যায়—

—পড়লেও আমরা শুনছি না। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে ঐদিন যেতেই হবে।

—তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল। এবার প্রবীর বলল।

—দুপুরে কিন্তু আমাদের ওখানে খাবেন। মীরা কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল।

—আচ্ছা। তাই হবে। শতদল আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে বলল।

বেয়ারা বিল নিয়ে আসতেই শতদল পকেট থেকে টাকা বার করে দিতে গেল। কিন্তু প্রবীর তাকে দিতে দিল না। মীরা

তার ব্যাগ থেকে টাকা বার করে প্রবীরের হাতে দিল।

শতদল বলল, আমার কাছেই তো টাকা আছে। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

মীরা বলল, থাক।

প্রবীর বেয়ারার হাতে টাকা দিয়ে দিল।

রাস্তায় নেমে প্রবীর শুধোল, কোন্‌ দিকে যাবি?

—ভাবছি একটু কলেজ স্ট্রীটে যাবো।

—পুরোনো আড্ডায়।

—তাছাড়া আর কোথায় যাবো?

মীরা বলল, আর দুঃখ করতে হবে না: আপনার খাবার যাতে জায়গা হয়, তার একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

—তাই নাকি? শতদল শুধোল।

—হ্যাঁ। আমি কালকেই অলকার গোত্র-টোত্র সব জেনে নেবো। রবিবার গেলেই জানতে পারবেন।

শতদল ভাবল মীরা তার সহকর্মিণী-টিকে তার ঘাড়ে না চাপিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না মনে হচ্ছে। সে বলল, তাহলে তো আর আপনাদের বাসায় যাওয়া হল না দেখছি।

প্রবীর মীরাকে বলল, কি ছেলেমানুষী করছ বল দেখি।

তারপর শতদলের দিকে ফিরে বলল, তোর কিন্তু অবশ্যই আসা চাই। আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করবো। ফেল করবি না।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, আমাদের বাপু অত পেটে খিদে মুখে লাজ নেই। খিদে পেলে আমরা বলি।

শতদল বলল, আপনি আমার খিদের কথাটা জানলেন কী করে? আমি কি আপনাকে বলেছি?

—ও বলতে হয় না। আপনিই টের পাওয়া যায়।

শতদল শুধোল, তাই নাকি?

মীরা চোখ-মুখের একটা মধুর ভঙ্গি করে বলল, হুঁ।

একটু পরে ওরা একটা ডবল-ডেকারে উঠে চলে গেল। যাবার আগে মীরা এবং প্রবীর আর একবার তাকে তাদের বাসায় যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি। শতদল ভাবল, এখন তো অনেক দেরী। তার মনে থাকলে হয়।

যাবো না যাবো না করেও শেষ পর্যন্ত শতদল নির্দিষ্টদিনে প্রবীরদের পাইক-পাড়ার বাসায় গিয়ে হাজির হল। অনেকদিন সে এ বাড়ীতে আসেনি। প্রথমে ভয় ছিল ফ্ল্যাটটা ঠিক চিনতে পারবে কিনা। শেষ-পর্যন্ত অবশ্য কোন অসুবিধে হল না। শতদল প্রবীরের ফ্ল্যাট ঠিকই খুঁজে পেল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা সরু প্যাসেজ তার এক পাশে রান্নাঘর। আর এক পাশে বসার ঘর। তার পাশে বেড-রুম। মীরা রান্নাঘরে ছিল। আর একজন বিধবা মহিলা তাকে সাহায্য করছিল।

শতদলকে দেখে মীরা বলল, যাক শেষপর্যন্ত তা হলে এলেন! আমি তো ভাবলাম আপনি ভুলেই গেছেন—

শতদল বলল, কথা যখন দিয়েছি তখন—

মীরা বলল, যান ভিতরে গিয়ে বসুন।

—প্রবীর নেই? শতদল শুধোল।

—একটু বেরিয়েছে।

শতদল বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। বৈঠকখানা বলা অবশ্য ভুল। একফালি জায়গা সোফা-কোচে সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসলে এ ঘর এবং বেড-রুম নিয়ে প্রবীরের ফ্ল্যাটটাকে দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট বলা যায়। প্রবীরের দাদারা কলকাতার বাইরে চাকরি করেন। সেখানেই থাকেন। প্রবীরের মা-বাবা বড় ছেলের কাছে থাকেন। একমাত্র ছোট ভাইটি প্রবীরের কাছে থাকে।

শতদল সোফার উপর বসে সেদিনের খবরের কাগজটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মীরা রান্নাঘর থেকে বলল, আপনাকে একটু একা বসে থাকতে হবে।

—তাই তো দেখছি।

—চা খাবেন?

—প্রবীর এলেই খাবো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সে একা বসে রইল। মনে মনে সে প্রবীরের উপর একটু বিরক্ত হল। তাকে আসতে বলে প্রবীর কোথায় গেল?

মাঝখানে প্রবীরের ছোট ভাই গৌতম একবার এ ঘরে এসেছিল। অনেক দিন পর তাকে দেখে মনে হল সেই গৌতম আর নেই। শতদল যখন তাকে দেখেছিল তখন সে ছিল বালক, এখন সে যুবক।

গৌতম তাকে দেখে বলল, শতদলদা! আপনি কখন এলেন?

—এই তো মিনিট চল্লিশেক হল।

—দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—নাঃ। কোথায় তোমার দাদা!

—বাঃ। দাদা আপনাকে আসতে বলে কোথায় বেরিয়ে গেল!

—তুমি একটু দেখো তো ভাই, পাড়ায় কোথাও আছে নাকি।

—আচ্ছা দেখছি—বলে গৌতম রান্না-ঘরে চলে গেল। তারপর সেখানে তার বৌদির সঙ্গে কী কথা বলে বেরিয়ে গেল। তার পায়ের চটির শব্দ মিলিয়ে যেতে শুনল শতদল।

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সেদিনের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করল।

একটু পরেই প্রবীর এসে হাজির হল।

শতদল বলল, তুই তো আচ্ছা লোক। আমাকে আসতে বলে কোথায় গিয়ে বসে-ছিলি?

—একটা বিশেষ কাজ ছিল। তুই কত-ক্ষণ এসেছিস?

—তা প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

—চা খেয়েছিস?

—সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

—দাঁড়া, আগে চায়ের কথাটা বলেনি। প্রবীর রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলল, আমাদের দু-কাপ চা পাঠিয়ে দিও তো।

—বলতে হবে না। তোমাকে আসতে দেখেই চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছি।

প্রবীর আরাম করে সোফার উপর বসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। তারপর নিজে একটা ধরিয়ে শতদলের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, নে, খা—

শতদল বলল, এই তো খেলাম। চা-টা আসুক। তারপর খাচ্ছি।

প্রবীর শুধোল, তুই দাবা খেলতে পারিস?

—একটু-আধটু পারি।

—গুড্। তাহলে এক হাত দাবা হয়ে যাক।

প্রবীর দাবার সেট বারকরে ঘুঁটি সাজাতে লাগল।

মীরা এসে একটা প্লেটে ওমলেট ও দু-কাপ চা টি-পয়ের উপর রাখল। তারপর শতদলকে লক্ষ্য করে বলল, নিন, খেয়ে ফেলুন।

শতদল বলল, এখন কে ওমলেট খাবে?

—কেন, আপনি।

—এত বেলায় ওমলেট খেয়ে খিদে নষ্ট করার কোন মানে হয়?

—কটা বাজে? মীরা শুধোল।

হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে শতদল বলল, প্রায় বারোটা—

আপনার খেতে এখনও দু-ঘণ্টা দেরী আছে।

শতদল প্রবীরকে দেখিয়ে বলল, ও খাবে না?

—ও খেয়েছে। মীরা রান্নাঘরে চলে গেল?

প্রবীর বলল, আরে বাবা, খেয়ে নে না। ভারি তো একটা ওমলেট।

শতদল চামচ দিয়ে ওমলেটটা দু-টুকরো করল। তারপর নিজে একটা টুকরো তুলে নিয়ে প্লেটটা প্রবীরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, নে খা—

প্রবীর বলল, একটা ওমলেট খেতে পারিস না। কি পেট রে তোর!

শতদল বলল খেতে কি আর পারি না? তবে ভাগ করে খাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে সেটা একা খেলে পাওয়া যায় না।

প্রবীর আর আপত্তি করল না। সে প্লেট থেকে ওমলেটের টুকরোটা তুলে মুখে পুরে দিল।

শতদল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। অনেকক্ষণ ধরেই তার চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছিল।

প্রবীর তার ঘোড়াটা শতদলের রাজার আড়াই ঘর সামনে বসিয়ে বলল, নে, তোকে কিস্তি দিলাম।

শতদল কিস্তি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তারপর কতক্ষণ ধরে যে তারা দাবা খেলল তা দুজনেরই খেয়াল ছিল না। শতদল প্রবীরের কাছে দুবার হেরে গেল। প্রবীরকেও অবশ্য সে একবার হারিয়েছে। দু-ঘণ্টা কখন যে পার হয়ে গেল তা কারোরই খেয়াল হয়নি। খেয়াল হল তখন যখন মীরা রান্নাঘর থেকে প্রবীরকে বলল, তুমি এবার চান করে এসো। আমার রান্না হয়ে গেছে।

প্রবীরের অবশ্য আর একহাত খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মীরা বারবার তাগাদা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর খেলা হল না। বাধ্য হয়েই তাকে স্নান করতে যেতে হল।

মীরা এ-ঘরে এসে বলল, দেখুন আপনাকে কথা দিয়েছিলাম দুটোর মধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে। ঠিক তাই হল।

শতদল বলল, একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়েও এই?

মীরা বলল, গোপালের মার কথা বলছেন? ওকে দিয়ে কোন কাজ হয় না। সব দেখিয়ে দিতে হয়।

মীরা দু-হাত পিছনে নিয়ে তার চুল-খুলে দিচ্ছিল। শতদল দেখল, মীরার অনেক চুল আছে। ওর গায়ের রঙও খুব ফরসা। কালো স্লিভলেস ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে ওর গলা কাঁধ এবং পেটের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল।

শতদল চোখ নামিয়ে নিল।

প্রবীর স্নান করে এসে শতদলকে বলল, তুই চান করবি না?

—আমি চান করেই এসেছি।

প্রবীর মীরাকে বলল, তুমিও চান করে নাও। তারপর একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

মীরা বলল, না আমার অনেক দেরী হবে।

প্রবীর বলল, তা হোক।

মীরা বলল, তোমরা খেয়ে নাও। শতদলকে দেখিয়ে সে বলল, ও'র খুব খিদে পেয়েছে।

শতদল হাসতে হাসতে বলল, আমার খিদে পেলেও আমি আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারবো।

—আমার আধঘণ্টায় হবে না। এক ঘণ্টা লাগবে।

—বেশ, তাই হবে। শতদল বলল।

অগত্যা মীরাকে নিতান্ত অনিচ্ছায় স্নান করতে যেতে হল।

মীরার স্নান করতে আধঘণ্টাও লাগল না। শতদল ঘড়ি দেখল। মীরার আধ-ঘণ্টারও কম সময় লেগেছে। বোধহয় শতদলের কথা ভেবেই ও সংক্ষেপে স্নান সেরেছে।

ওরা তিনজনে যখন খেতে বসল তখন আড়াইটে বাজে।

—গৌতম খাবে না? শতদল শুধোল।

—ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে পৈতের নেমন্তন্ন আছে।

মীরা অনেক রকম আয়োজন করেছে। ভাতের থালার চার পাশে নানারকম বাটি সাজিয়ে দিয়েছে।

শতদল বলল, এ যে এলাহি ব্যাপার।

মীরা বলল, মোটেই না। আপনার জন্য বিশেষ কিছুই করিনি।

শতদল বলল, এই যদি সাধারণ হয়, তাহলে বিশেষ কিছু হলে না-জানি কী হবে।

মীরা বলল, আপনি কি খুব ঝাল খান? আমি কিন্তু মোটেই ঝাল দিইনি।

—ভালো করেছেন। আমি ঝাল খুব কম খাই।

—আপনাকে একটু মাংস দেবো?

—আরে না না। যা দিয়েছেন এই আগে খেয়ে উঠি।

—কিছু ফেলতে পারবেন না কিন্তু। মীরা যেন আদেশ করল।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে অনেক বেলা হয়ে গেল। ছুটির দিনে শতদলেরও দেরী করে খাওয়া অভ্যেস। কিন্তু তা বলে এত দেরীতে নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর সে সোফার উপর দেহটা এলিয়ে দিল। প্রবীরও এসে আর একটা সোফার উপর বসল। সে একটা সিগারেট ধরাল। শতদলও প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিল।

মীরা একটা কাগজের ঠোঙায় কতক-গুলো পান নিয়ে এ-ঘরে ঢুকল। বলল, পান খাবেন?

—মিষ্টি না জর্দা?

—মিষ্টি।

—দিন একটা।

অবেলায় খেয়ে গা-টা কেমন গুলোচ্ছিল। পানটা খেয়ে ভালোই লাগল।

শতদল ভেবেছিল তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু তার আর এখন উঠতেই ইচ্ছে করছিল না।

প্রবীর শুধোল, গান শুনবি?

—কে গাইবে?

—রেকর্ডের গান।

—আপত্তি নেই। তবে রবীন্দ্রসংগীত হলে শুনবো।

—তাই শোনাবো—বলে প্রবীর ঘরছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে সে একটা রেকর্ড-প্লেয়ার নিয়ে এল। তার পিছনে আর একটি ছেলের হাতে কতকগুলো রেকর্ড।

শতদল উঠে বসল। তারপর ছেলেটির হাত থেকে রেকর্ডগুলো নিয়ে বাছতে বসল।

তারপর শতদল একটার পর একটা রেকর্ড বেছে দিতে লাগল। আর প্রবীর সেগুলো বাজিয়ে চলল।

এক সময় রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে মীরাও এ-ঘরে এসে বসল।

—আপনি সোফাটার উপর শুয়ে পড়ুন না। মীরা বলল।

শতদল বলল, আমার শোয়ার দরকার নেই। বরং আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন।

মীরা বলল, আমি দুপুরে ঘুমোই না।

ছেলেটি একসময় উঠে চলে গেল।

ক্রমে বেলা পড়ে এল। শতদল জাফরি-কাটা জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল পাশের বাড়ীর পুরোনো ইঁট-বার-করা দেয়ালের উপর গাছের উপর বেলা শেষের রোদ এসে পড়েছে। কয়েকটা চড়ুইপাখি পাঁচিলের উপর লাফালাফি করছে, ডাকছে। প্রবীরদের বাড়ী আর পাশের বাড়ীটার মাঝ-খানের গলিটার মধ্যে ছায়া নেমে এসেছে।

রেকর্ড-প্লেয়ারে একটার পর একটা রবীন্দ্র-সংগীত বেজে যাচ্ছে। সে ভাবল বিয়ে করে প্রবীরের জীবনে যেন একটা পরিপূর্ণতা এসেছে। বিয়ে করার পর প্রবীরের জীবনে যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগে ও ছিল বাউণ্ডুলের মত। সারাক্ষণই আড্ডা দিয়ে বেড়াত। এখন প্রবীর শান্ত হয়েছে, স্থির হয়েছে।

কী ভাবছেন? মীরা শুধোল।

না, কিছু ভাবছি না। গানটা শুনছিলাম।

—আর একবার দেব?

—দে।

প্রবীর আর একবার রেকর্ডটা চালিয়ে দিল।

গানের কথাগুলো শতদলের মনটাকে কি রকম বিষণ্ণ করে তুলল। বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো/হৃদয় বিদারী হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো...

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

প্রবীর মীরাকে বলল, একটু চা খাওয়াবে না?

মীরা বলল, তুমি করো না: তুমি তো সেদিন খুব ভালো চা করে খাইয়েছিলে।

—ঠিক আছে। আমি করছি, বলে প্রবীর উঠে দাঁড়াল।

শতদল ঠাট্টা করল, তুই চা করবি। তাহলে তো মুখে দেওয়া যাবে না।

প্রবীর রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, একবার খেয়েই দ্যাখ্ না। আমি কি রকম চা করি।

এমন সময় প্যাসেজে যেন কার আসার শব্দ শোনা গেল।

মীরা জানলা দিয়ে প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে বলল, এসো, এসো। এত দেরী হল যে?

শতদল জানলার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে একটি মেয়েকে দেখতে পেল।

মীরার কথা শুনে মনে হল মেয়েটির আসবার কথা ছিল। হঠাৎ এসে পড়েনি।

মেয়েটি কিন্তু প্রথমে মীরাদের ঘরে এল না। সে রান্নাঘরে গিয়ে প্রবীরের সঙ্গে কী-সব কথা বলতে সুরু করল। শতদল একবার শুনতে পেল প্রবীর পরিহাসের সুরে বলছে, আর বলেন কেন? আমি এমনই বিয়ে করেছি যে, বৌকেই চা করে খাওয়াতে হয়।

মেয়েটি উত্তরে কী বলল তা বোঝা গেল না।

একটু পরেই মেয়েটি এ-ঘরে এসে ঢুকল। মীরা তাকে তার পাশে টেনে নিয়ে বসাল। শতদলের মনে হল মেয়েটি একবার তার দিকে তাকিয়েই মুখ নিচু করে নিল।

মীরা বলল, পরিচয় করিয়ে দিই।—এ আমার কলিগ, অলকা মুখোপাধ্যায়, আর ইনি শতদল ঘোষাল—ওঁর অনেকদিনের বন্ধু,—

অলকা নামটা শুনেই শতদলের মনে পড়ে গেল মীরা সেদিন এর কথাই তার কাছে বলেছিল। কথাটা মনে পড়তেই সে মেয়েটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখবার ইচ্ছেটা দমন করতে পারল না। মেয়েটির গায়ের রঙ বেশ কালো। অতি সাধারণ চেহারা। বয়স একেবারে কম নয়। তার ফলে অল্পবয়সী মেয়ের শরীরে যে লাবণ্য লক্ষ্য করা যায় তাও নেই। মুখ-চোখ আকর্ষণ করার মত নয়।

শতদলের মনে হল মেয়েটি আড়চোখে তাকে দেখছে। শতদল তার দিকে তাকাতেই মেয়েটি লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল। সে এ কথা ভেবে খুব বিস্মিত হচ্ছিল যে মীরা সত্যি সত্যিই এই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দেবার ফন্দি এঁটেছে। এই কথা ভাবতেই তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মীরার উপর তার খুব রাগও হচ্ছিল। সেদিন যখন মীরা তার কাছে মেয়েটির কথা বলেছিল তখন সে সেটাকে নিছক ঠাট্টা বলে মনে করেছিল। মীরা যে সত্যি সত্যিই মেয়েটিকে তার সামনে হাজির করবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

একটু পরে প্রবীর দু-কাপ চা নিয়ে এ-ঘরে ঢুকল। সে শতদল আর অলকার সামনে কাপ দুটো রাখল।

শতদল অনেকটা অস্বস্তি কাটাবার জন্যই বলল, খাওয়া যাবে তো?

—খেয়ে দ্যাখ্। বলে প্রবীর আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

তারপর আরও দু-কাপ চা নিয়ে এল। মীরার সামনে একটি কাপ রেখে বলল, নিন, মহারাণী সেবা করুন।

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে মীরা এবং অলকা দুজনেই হেসে উঠল।

শতদল চায়ের কাপে চুমুক দিতেই প্রবীর শুধোল, কি, কেমন হয়েছে?

—ফাইন।

—আমি চা খারাপ করি?

—মোটেই না।

প্রবীর একটা সিগারেট ধরিয়ে মীরাকে বলল, কি, শুনলে তো? আমি তোমার চেয়ে খারাপ চা করি না।

মীরা মিটি-মিটি হাসছিল। সে বলল, আমিও তো তাই বলেছিলাম।

অলকা ওদের কথা উপভোগ করছিল। সে শতদলের দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে পারছিল না। মীরা তাকে কী বলেছে কে জানে!

প্রবীর চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে শতদলকে বলল, তোর সংগে ওর পরিচয় হয়েছে?

শতদল ঘাড় নাড়ল। বলল, একটু আগেই হয়েছে—

—উনি কিন্তু ভালো গান জানেন। অতুলপ্রসাদী, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্র-গীতি সব—

অলকা লজ্জিতভাবে বলল, ধোৎ, আপনি যে কী—

প্রবীর হেসে বলল, আরে এতে লজ্জা পাবার কী আছে! গান জানেন অথচ সেটা বললেই যত আপত্তি?

প্রবীর যেভাবে মেয়েটির গুণপনা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল—তাতে শতদলের মনে হল যে অলকাকে এখানে আনার চক্রান্ত একা মীরাই করেনি। প্রবীরও করেছে।

—অলকা কিন্তু লেখাপড়ায়ও খুব ভালো। বি-টি-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। এবার মীরা বলল।

মীরা যত অলকার প্রশংসা করে যাচ্ছিল, শতদল ততই আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল। সে তখনই উঠে পড়তে পারলে বাঁচে। কিন্তু এখন উঠে যাওয়াও এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। মীরা-প্রবীর যে তাকে এরকম একটা বেকায়দায় ফেলবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ওদিকে অলকা নামে মেয়েটিও যে খুব অস্বস্তিতে পড়েছিল তাও বোঝা যাচ্ছিল। সে প্রায় সারাক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার কালো মুখটা লজ্জায় ঘেমে উঠেছিল।

প্রবীর এবং মীরা আরও কিছুক্ষণ অলকার গুণপনা ব্যাখ্যা করে তারপর এক সময় চুপ করে গেল। বোধহয় শতদলের উৎসাহহীনতা লক্ষ্য করে তারা আর এ-বিষয়ে কথা বলতে খুব উৎসাহ পেল না।

মীরা এক সময় উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অলকা তার শাড়ীর আঁচল টেনে ধরে তাকে বসাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে 'তোমরা গল্প কর। আমি আসছি—' বলে এ-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রবীর অলকাকে লক্ষ্য করে শুধোল, আপনার তো গানের ডিপ্লোমা আছে তাই না?

এটাও যে শতদলকে জানানোর জন্য বলা তা বুঝতে তার অসুবিধে হল না।

অলকা মুখে কিছু বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল।

প্রবীর এবার শতদলকে লক্ষ্য করেই বলল, গান শুনবি?

শতদল খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ল! তার গান শোনার এখন আদৌ ইচ্ছে নেই। কিন্তু গান শুনবো না বলাও যায় না। তাহলে মেয়েটিকে অপমান করা হয়। সে কী বলবে ভেবে পেল না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অলকাই তাকে বাঁচাল। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, তাহলে আমি চললাম—

প্রবীর বলল, আহা-হা! করেন কী? আচ্ছা বসুন বসুন। আপনাকে গান গাইতে হবে না।

অলকা একটু হেসে বসে পড়ল।

প্রবীর শতদলকে বলল, তুই যে একেবারে বোবা হয়ে গেলি!

—কী বলব বল? শতদল শুধোল।

—একজন ভদ্রমহিলার সংগে তোর আলাপ করিয়ে দিলাম। তুই কিছু বলছিস না?

শতদল বুঝল প্রবীর চাইছে সে-ও মেয়েটিকে কিছু জিগ্যেস করুক। কিন্তু সে সে-দিক দিয়েই গেল না। বলল, আমি আর কী বলবো? তোরাই তো বলছিস।

অলকা পলকের জন্য শতদলের দিকে তাকাল। মনে হ'ল সে কিছু জিগ্যেস না করায় সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

—এক মিনিট। আমি একটু আসছি—বলে প্রবীর পাশের ঘরে চলে গেল।

এখন এঘরে শুধু শতদল আর অলকা। শতদল লক্ষ্য করল অলকার মুখটা যেন আরও নুয়ে পড়েছে। সে লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না। শতদল দারুণ অস্বস্তিতে পড়ল। প্রবীর তাকে এ কোন বিপদে ফেলল? সে কি ভেবেছে যে তার আড়ালে শতদল অলকার সংগে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবে? সে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানতে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে প্রবীর যখন এঘরে এল তখন শতদল বলল, আমি এবার উঠবো রে।

—সে কি! এখনই প্রবীর বিস্মিত হল।

—হ্যাঁ। এবার আমায় উঠতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে—

সে উঠে দাঁড়াল।

রান্নাঘর থেকে মীরা বলল, ও কি! এখন চললেন কোথায়? আমি চা করছি। খেয়ে যাবেন।

শতদল বলল, না, আর চা খাবো না।

সে দরজার দিকে পা বাড়াল। অলকা যেন এতক্ষণে স্বচ্ছন্দে তার দিকে একবার তাকাল মনে হল। শতদল তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, চলি—

অলকা ঘাড় নাড়ল। তার মুখে সৌজন্যের হাসি।

মীরা রান্নাঘর থেকে বলল, অলকা তুমি কিন্তু উঠো না। তোমার সংগে আমার কথা আছে।

শতদল রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে মীরাকে বলল, আসি—

—আবার আসবেন।

—আচ্ছা।

মীরা যেন কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। শুধু ওর দৃষ্টির মধ্যে যেন কী একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল।

শতদল রাস্তায় বেরিয়ে দেখল প্রবীরও তার সংগে সংগে আসছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর প্রবীর বলতে সুরু করল, অলকার বাবা নেই। ওর দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না চেষ্টার অভাবে। [illegible] তো হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম তোর যদি পছন্দ হয় —অবশ্য দেখতে খুব ভালো না—তবে মেয়েটা খুব ভালো—ওর আয়েই ওদের সংসার চলে—

শতদল কিছু বলল না। সে প্রবীর এবং মীরার উপর খুব রাগ করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাও সে পারল না। পারল না অলকার কথা ভেবেই। কী অবস্থায় পড়ে মেয়েটিকে এই অপমান মেনে নিতে হয়েছে তা সে অনুমান করতে পারে। আর এটাও সে বুঝতে পারছিল যে, মেয়েটি খুব দুঃখী। কিন্তু তার জন্য শতদলের কিছু করার নেই। অলকার প্রতি এই মুহূর্তে সে কোন আকর্ষণ অনুভব করছিল না। বরং তার জন্য সে যে কিছু করতে পারছে না সেজন্য তার খুব খারাপ লাগছিল। অলকার যদি কোন উপকার সে করতে পারত তাহলে সে সুখী হত। কিন্তু অলকাকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব।

শতদলের মনে হল প্রবীরের বাড়ীতে ছুটির দিনটা বেশ ভালোভাবেই কাটছিল। হঠাৎ যেন তাল ভংগ হয়ে গেল।

ভগিনী নিবেদিতার পত্রে শ্রীঅরবিন্দ

শংকরীপ্রসাদ বসু

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু সংবাদ এবং কিছু বিতর্ক ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গেছি। বিতর্কের শুরু বহু বছর আগে—যখন ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। শ্রীমতী লিজেল রেম'র নিবেদিতা-জীবনী (বা তার অনুবাদ) বের হবার পরেও পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্য-মারফত সঠিক সংবাদ দিতে চেষ্টা করেন। বর্তমান রচনায় ঐসব বিতর্কের মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা আমার নেই: এমনকি সর্বস্বীকৃত সংবাদগুলিও পুরোপুরি পরিবেশন করতে চাইছি না। বিশেষ প্রয়োজনীয় মাত্র দু' একটি সংবাদের উল্লেখ করব।

প্রথমত শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন—নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ধর্মের ক্ষেত্রে নয়—কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য একই সঙ্গে বলেছেন, যোগে নিবেদিতার সহজ অধিকার ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথাই বলা চলে, নিবেদিতার সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের যোগ না থাকলেও নিবেদিতার গুরু বিবেকানন্দের এবং তস্য গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তা ছিল। সেই আধ্যাত্মিক সংযোগের কথা স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দই জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের ভক্তি নিশ্চয় নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পথ খুলে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সংগঠিত প্রথম বিপ্লব-পরিষদের পাঁচ সদস্যের একজন ছিলেন নিবেদিতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের কাছে কিছু অধিক সংবাদ আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঐ বিপ্লব-পরিষদ গঠিত হবার আগেই নিবেদিতা ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন—তা হয়েছিলেন স্বামীজী জীবিত থাকা কালেই। এ ব্যাপারে কাউন্ট ওকাকুরার বড় ভূমিকা ছিল। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ সংগ্রহ করে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রকাশিতব্য একটি গ্রন্থে আমি তা বিস্তৃত-ভাবে উপস্থিত করেছি। নিবেদিতাই অগ্রণী হ'য়ে বিপ্লবের ব্যাপারে অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে অরবিন্দও উৎসুক ছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থ অরবিন্দের কাছে রাজদ্রোহকর মনে হয়েছিল।

তৃতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ জানিয়েছেন, নিবেদিতার একটি নিজস্ব দল ছিল।

সেকথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য, অরবিন্দের দলের সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এবং অরবিন্দের বাংলা-দেশ-ত্যাগের পিছনে নিবেদিতার যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। ঐ প্রস্থানকে কিছু সময়ের জন্য ঢেকে রাখতে নিবেদিতা অরবিন্দের 'কর্মযোগিন' পত্রিকার কয়েক সংখ্যা বেনামে সম্পাদনা করে যান করেছিলেন।

যেসব সংবাদের উল্লেখ করলাম, সেগুলি মোটামুটি অনুসন্ধিৎসুদের কাছে পরিচিত। কিন্তু জানা নেই—এমন কিছু সংবাদও আমাদের কাছে আছে।

শ্রীমতী লিজেল রেম' নিবেদিতা-জীবনী লিখবার সময়ে নিবেদিতার বিপুল পরিমাণ চিঠি ব্যবহার করেছিলেন। এইসব চিঠির অধিকাংশই মিস ম্যাকলাউডকে লেখা। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবেও তিনি সংবাদ সংগ্রহ করে-ছিলেন। ইউরোপ আমেরিকার আরও কিছু ব্যক্তি (নিবেদিতার ভাই ও বোন তাঁদের মধ্যে ছিলেন) তাঁকে মূল্যবান সংবাদ দেন। ভারতবর্ষে এসেও তিনি বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তার পরেই তিনি নিবেদিতা-জীবনী লিখে-ছিলেন। রেম'-লিখিত জীবনীর নানা তথ্য কিন্তু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়—বিশেষত নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিষয়টি।

নিবেদিতা-বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করে আমি নিবেদিতার বিপুলসংখ্যক চিঠিপত্রের কথা জানতে পারি, এবং শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর মারফত সংবাদ পেয়ে শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে হাজির হই। কী অপূর্ব মহাপ্রাণতার সঙ্গে শ্রীমৎ অনির্বাণ আমাকে নিবেদিতা-পত্রাবলী দিয়ে দিয়েছিলেন, তার কাহিনী আমি লিখেছি 'নিবেদিতা লোক-মাতা' গ্রন্থের ভূমিকায়। যাইহোক, সেই চিঠিগুলি পরীক্ষা করে নিবেদিতার রাজ-নৈতিক ধারণা ও কার্যাবলীর বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ পাবার পরেও কিন্তু আমাকে একটি বিষয়ে একেবারে হতাশ হতে হয়েছিল—ঐ চিঠিগুলির মধ্যে অরবিন্দ-প্রসঙ্গ একেবারে নেই! একথা ঠিক, ঐ চিঠিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকবার নিবেদিতা বলেছেন—গুরুতর কোনো কথা আর চিঠিতে লিখব না, চিঠিপত্রে অবিরত হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—এবং আমরা জানি, অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার গুরুতর বিষয়েই সম্পর্ক ছিল—তবু অরবিন্দের উল্লেখ মাত্র না থাকা বিস্ময়কর। একটি জিনিস অবশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—বহু চিঠিই ছেঁড়া, বিশেষ
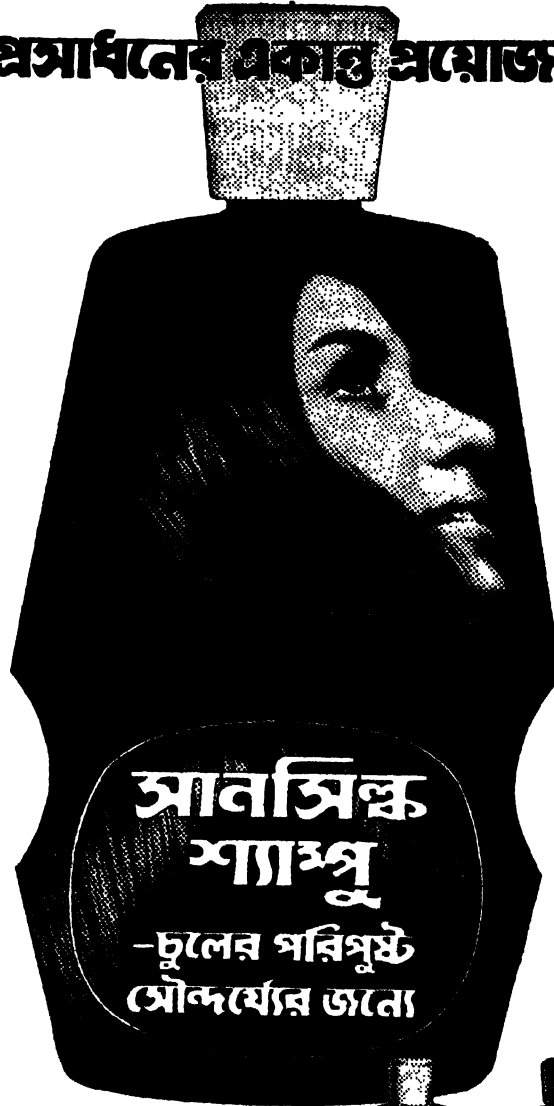
'প্রয়োজনীয়' অংশে। শ্রীমতী লিজেল রেম'কে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান—মিস ম্যাকলাউড তাঁর সামনে বসে বহু চিঠি গোটাগুটি বা অংশত ছিঁড়েছিলেন—'খুবই ব্যক্তিগত' এবং 'খুবই রাজনৈতিক' বলে। আমাকে অগত্যা সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল—ছিঁড়ে-ফেলা অংশের মধ্যে অরবিন্দ ছিলেন—এই কথা ভেবে!!

কাহিনীটি কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। শ্রীমতী রেম' পরে আরও একতাড়া চিঠি পাঠিয়ে দেন, যেগুলি লেখা হয়েছিল ইংলণ্ডে অবস্থিত এস কে র‍্যাটক্লিফের কাছে। র‍্যাটক্লিফ স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন, স্বদেশী আন্দোলন সূচনার সময়ে। নিবেদিতার জালে ধরা পড়ে তিনি ভারত-প্রেমিক হয়ে দাঁড়ান। ফলে তাঁকে চাকরি ছেড়ে ইংলণ্ডে চলে যেতে হয়। সেখানে তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-লেখক হয়ে উঠেছিলেন। উচ্চ রাজনৈতিক মহলে তাঁর গতিবিধি ছিল। নিবেদিতা তাঁকে ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করতেন পত্রযোগে। নিবেদিতার ঐসব চিঠি সাধারণ ডাকে যেত কিনা সন্দেহ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেত এজেন্ট-মারফত। এইসব চিঠির মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় এবং ইঙ্গিতে তৎকালীন রাজনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যারা মনে করেন নিবেদিতা উপর-উপর রাজনীতি করতেন, তাঁদের ধারণা যে কত উপর-উপর, তা প্রমাণের মত যথেষ্ট উপাদান এই চিঠিগুলিতে রয়েছে।

এবং এই চিঠিগুলির মধ্যেই অরবিন্দের উল্লেখ পেয়েছি। উল্লেখগুলি সাধারণভাবে খুব বিস্তৃত নয়, কিন্তু মূল্যবান। প্রত্যেকটি উল্লেখের পিছনেই খণ্ড ইতিহাস রয়েছে যার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা বর্তমানে সম্ভবপর নয়। কেবল এইখানে স্মরণ করিয়ে দেব নিবেদিতা তাঁর বন্ধুকে সংবাদ দেবার জন্যই এইসব সংবাদ পাঠাতেন না—অন্য উদ্দেশ্যও ছিল : এইসব সংবাদ পেয়ে র‍্যাটক্লিফ যথাস্থানে কলকাটি নাড়াবেন এবং সম্ভবক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবেন।

যেমন ধরা যাক, অরবিন্দের দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার-সম্ভাবনার কথা অনেকগুলি চিঠিতে জানানো হয়েছে। এইসব সংবাদ সংগ্রহের নানা সূত্র নিবেদিতার ছিল, এবং অনেক সময়েই তিনি কথাগুলি বাতাসে ভাসিয়ে দিতেন—এ-বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক ও সচেতন করবার জন্যে।

১৯০৯, ৩০শে জুলাই তারিখে নিবেদিতা মিঃ র‍্যাটক্লিফকে লেখেন—'শুনতে পাচ্ছি, তিনি (বাংলার লেফটন্যাণ্ট গভর্নর) এখনো বাংলার ম্যাটসিনিকে ৭ই অগস্ট তারিখে (বয়কট-দিবসে) চালান দেবার কথা ভাবছেন। পুলিসের কাছ থেকে ঐ-বিষয়ে আবেদন পেলেই ও কাজ তিনি করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী গভর্নরের বরাতের কথা, সেইসঙ্গে আসামীর জনপ্রিয়তার কথা ভাবলে, তাঁর এই কাজকে চরম বেপরোয়া আচরণ বিবেচনা করতে হবে।' বাংলার এই নবনিযুক্ত গভর্নর যে খুব শক্ত মানুষ, সেকথাও নিবেদিতা এই চিঠিতে লিখেছিলেন।

একই চিঠিতে সরকার পক্ষে কৌসুলী নর্টন সম্পর্কে নিবেদিতা যা লিখেছেন, তাকে মোটেই শ্রদ্ধাসূচক বলা চলে না। —'তোমাকে জানাতে চাই, একথা বলাবলি করা হচ্ছে যে, নর্টন একটা পুরো আহাম্মক —আইন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুব অল্প বা একেবারেই নেই। ....মামলা চলাকালে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল, (আশুতোষ) বিশ্বাসই সরকার পক্ষের মেরুদণ্ড, তিনি সরে গেলেই সব ভেঙে পড়বে।' ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ তারিখে একই বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন—'আপীল-মামলায় চিত্ত দাশ অপূর্ব কাণ্ড করেছেন। আর প্রতিদিন সবাই সবিস্ময়ে ভাবছে, কি করে নর্টনকে কেউ মামলায় ডাকতে পারে! ফরিয়াদী পক্ষে আশুতোষ বিশ্বাসই ছিলেন সত্যকার শক্তিস্তম্ভ। তাঁর 'অপসারণই' দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে কাজের কাজ হয়েছিল।'

এর আগে ৮ অগস্ট, ১৯০৯-এর চিঠিতে নিবেদিতা, সরকার কেন অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করতে চায়, সে-বিষয়ে লিখেছিলেন—'অরবিন্দ ঘোষের নির্বাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য তুমি আসল কারণটা বুঝতে পারবে। ৯ জন নেতাকে যখন নির্বাসনে পাঠানো হয়, তখন দেশের উপরে যে হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে, তা দেখে সরকার নিজের বিরাট বুদ্ধির কাজের মহিমা বুঝতে পারে। আলিপুর বন্দীদের মুক্তির পরে আবার জাগরণ দেখা দিতে থাকে। সুতরাং সার কথা হল—জাগরণের হোতাকে পাকড়াও করো এবং গারদে পোরো!'

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৯-এর চিঠিতেও 'ন্যাশনালিস্টদের নেতাকে' গ্রেপ্তার করে জামিন না দিয়ে আটকে রাখা হবে—এমন কথা পাচ্ছি।

অরবিন্দের প্রকাশ্য বক্তৃতাদি কিভাবে বিপদের সৃষ্টি করেছিল সে-বিষয়ে নিবেদিতা ২৪শে জুন, ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন, '(সংবাদপত্রে) বেরিয়েছে, অরবিন্দ বরিশালে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে অশ্বিনীর (অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রশংসা করেছেন এবং বয়কট করতে প্রণোদিত করেছেন। পুলিশ তার নোট নিয়েছে।' এইসব বক্তৃতা সম্বন্ধে নিবেদিতা নিশ্চয় অরবিন্দকে সতর্ক করেছিলেন। অরবিন্দের নির্বাসনে আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হবে তিনি মনে করতেন। অরবিন্দ এইসব সতর্কবাণীতে বিশেষ কান দেননি, এবং সব কিছুই 'প্রেরণা বশে করছেন'—এইরকম কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। নিবেদিতা অবশ্যই প্রেরণায় বিশ্বাস করতেন, তবে বাস্তববুদ্ধির ঠেকা দিয়ে দিলে সন্দেহ থাকে না'—এই ধরনের ভলটেয়ারী ধারণাও তাঁর ছিল। রাজনীতিকে তিনি নৈকষ্য আধ্যাত্মিক ব্যাপার মনে করতেন না। সুতরাং কিছুটা হতাশা ও বিদ্রূপ মিশিয়ে তিনি ২১শে জুলাই, ১৯০৯ তারিখে (ইউরোপ থেকে ফেরার পরেই) লিখেছেন : 'অরবিন্দ চতুর্দিকে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, এবং আমার বিবেচনায় এটা বিশেষ অবিবেচিত কাজ হচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজেকে ঈশ্বর-প্রণোদিত মনে করছেন, সুতরাং গ্রেপ্তার হতে পারেন না। আমরা অবশ্য অনেকেই অনেক অদ্ভুত কাজ করে থাকি, তার হেতু কেবল আমাদেরই জানা থাকে, 'আমরা কারো পরোয়া করি না' ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের 'বাঁচানোর' প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখেননি! জোয়ান অব আর্কের ঘটনা একটি স্থায়ী বিরোধী দৃষ্টান্ত। ....যাইহোক, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধনীতি কোনোমতেই এক বস্তু নয় এবং উভয় বস্তুকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।'

অরবিন্দ অবশ্য শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হননি। তার পিছনে নিবেদিতার সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং ঈশ্বরেচ্ছা—কার ভূমিকা পরিমাণে বেশী, তা নিয়ে তর্ক থামবে না। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এ-ব্যাপারে নিবেদিতা এবং দিব্যবাণী উভয়ের ভূমিকার কথা জানিয়েছেন। এই সঙ্গে আমরা নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে বুঝতে পারি, ঈশ্বরের কিছু কাজ ঈশ্বরনন্দিনী হিসাবে নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন, এবং অরবিন্দ যাতে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার না হন, সর্বাত্মকভাবে তার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। সরকারী মহলেও নিবেদিতার বন্ধুবান্ধব ছিল। অরবিন্দের গ্রেপ্তার না হওয়া সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সংবাদ পাচ্ছি নিবেদিতার ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯-এর চিঠিতে : 'অবস্থা শান্ত মনে হচ্ছে। অরবিন্দকে যদি নির্বাসনে পাঠানো না হয়, তা সম্পূর্ণত ম্যাকক্যারনেসের এবং ইংলণ্ডে তোমার (মিঃ র‍্যাটক্লিফের) প্রয়াসের জন্যই।'

অরবিন্দের 'কর্মযোগিন' পত্রিকার বিষয়ে উল্লেখ নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে পাই। ২১ জুলাই, ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন, 'বন্দেমাতরমের জায়গায় একটি নতুন সংবাদপত্র কর্মযোগিন, বেরিয়েছে।' ৫ অগস্ট তারিখে লিখেছেন : 'আমার বিশ্বাস, এই সপ্তাহে তোমার কাছে কর্মযোগিন পৌঁছবে। এর মধ্যে যে 'খোলা চিঠি' রয়েছে, তা ও-মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আমার বিশ্বাস, মর্লি এবং সকল সাংবাদিককে এর কপি পাঠানো হয়েছে। তবে সেগুলি পৌঁছতে নাও পারে।' নিবেদিতা অ্যালবার্টাকে (লেডী স্যাণ্ডউইচ) কর্মযোগিন পাঠিয়েছিলেন গোপনে। পাঠাবার কারণ 'আগামী দিন-দুয়েকের মধ্যে যদি খোলা চিঠির লেখককে নির্বাসনে পাঠানো হয়'—তাহলে ওঁরা যেন যথাকর্তব্য পালন করেন। র‍্যাটক্লিফকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আর এক কপি কর্মযোগিন পাঠাচ্ছেন—তাও লিখেছেন।

নিবেদিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহাত্যাগী, কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে প্রশংসা বিতরণে বদান্য নন। না হতে পারেন, কারণ তিনি স্বয়ং উচ্চাঙ্গের লেখিকা। এই নিবেদিতা, আমরা দেখতে পাই, অরবিন্দের

রচনার সবিশেষ অনুরাগী। ২০ জানুয়ারী, ১৯০৯ তারিখে তিনি সোচ্ছ্বাসে লিখেছেন : 'তুমি প্রতি সপ্তাহে যাতে কর্মযোগিন পাও তা কিভাবে যে চাইছি, কি বলব! আমার মতে, কর্মযোগিন চিন্তা ও স্টাইলের বিজয়বাদ্য। অরবিন্দ অসাধারণ। অপরপক্ষে অবশ্য একথা [illegible] হবে, যিনি দল চালান তাঁকে আদর্শ [illegible] তরল করার ঝুঁকি নিতেই হয়।' অরবিন্দের প্রস্থানের পরে নিবেদিতা [illegible] ১৯১০ তারিখে জানিয়েছিলেন [illegible] কাছে কর্মযোগিনের কোনো কপি পেলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে : তার আগে ৬ জুলাই, ১৯১০ তারিখে লিখেছিলেন, অরবিন্দ এখনো গ্রেপ্তার হননি, যদিও তাঁকে ধরবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

এবং তারও আগে, ৭ এপ্রিল,১৯১০-এর চিঠিতে পাচ্ছি : 'এই সপ্তাহে কর্মযোগিনকে আক্রমণ করা হয়েছে। একই অফিস থেকে 'ধর্ম' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বেরুত। ২০০০ টাকা জমা না দেওয়ায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ ও কর্মযোগিনের মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করা হবে—কর্মযোগিনে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমার বিশ্বাস প্রবন্ধটিকে ইংলন্ডে তুমি প্রচারিত করতে পারবে। প্রবন্ধটি কি রাজদ্রোহকর? অরবিন্দ ঘোষ উধাও। ১৮ই মামলার দিন স্থির হয়েছে। মুদ্রাকরের মামলাটা যদি জেতা যায় তাহলে অন্য ওয়ারেন্টগুলি বরবাদ হয়ে যাবে।'

অতঃপর নিবেদিতা বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন—সরকারের এই কণ্ঠরোধ-ব্যবস্থা বলবৎ থাকলে হত্যার পক্ষে প্রচার এবং গোপন সংবাদপত্র প্রচার ছাড়া আর কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না।

এই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছিলেন, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, কর্মযোগিনের আরও দুটি সংখ্যা বেরুবে।

কর্মযোগিনের শেষের কয়েকটি সংখ্যা নিবেদিতা প্রকাশ করেছিলেন—অরবিন্দের প্রস্থানকে ঢেকে রাখবার জন্য—এ ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু জানি কত সামান্য! কিছু নূতন সংবাদ নিবেদিতার পত্রগুলি থেকে উপরে উপস্থিত করলাম, এবং তার থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারা যায়—বিবেকানন্দ-প্রদত্ত নিবেদিতা নামটি সার্থক করবার জন্য, এবং 'ভারতের সেবিকা বান্ধবী গুরু' হবার আশীর্বাদ সফল করবার জন্য, রাজনীতিতেও ভারতের জন্য নিবেদিতাকে কতখানি করতে হয়েছিল।

অরবিন্দের প্রতি নিবেদিতার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ধর্মের ক্ষেত্রে নয়—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' ধর্মক্ষেত্রে নরনারায়ণকে পেয়ে আছেন।—তা জাতীয়তার প্রবক্তা অরবিন্দ সম্বন্ধেই। এমনকি একথাও বলা যায়, 'রাজনৈতিক' অরবিন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতা বিশেষ মুগ্ধ নাও হতে পারেন। নিবেদিতা রাজনীতির যে গহন, জটিল ও বিপজ্জনক ক্ষেত্রে বিচরণ করতেন—সেখানে তিনি অনেক সময়েই রাস্তার রাজনীতির হিসাবে অরবিন্দকে আনাড়ি মনে করেছেন—অন্তত আমার তাই [illegible] অরবিন্দের প্রতি নিবেদিতার সমাদর [illegible] শ্রেষ্ঠ উন্মো- [illegible] প্রতি সেই [illegible]। অরবিন্দের [illegible]-বিষয়ক রচনাগুলি গ্রন্থাকারে [illegible] বাসনা ছিল নিবেদিতার, এবং [illegible] চেয়েছিলেন বইটি ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত হোক। ২৬ জুন, ১৯০৯ তারিখে তিনি র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন : 'সম্ভব হলে আকস্মিক [illegible] উপস্থাপিত অরবিন্দর রচনাগুলি এবং অন্যান্য বস্তু নিয়ে একটি [illegible] করতে চাই। বইটির শেষে থাকবে, [illegible] ধর্মের অসাধারণ নমুনা— 'To the Sea'। ভূমিকায় থাকবে মামলার বিবরণ, স্বপক্ষে বিপক্ষে বক্তৃতাদি এবং বিচারক-কৃত সকল কতুর সারসংক্ষেপে, মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত ছবিটিও। বইটি ইংলন্ডে প্রকাশ করা ভালো, তাতে যদি খরচ দিতে হয় তাও সই। ক্রপটকিনের সহযোগিতায় তুমি কি একজন প্রকাশক জোগাড় করতে পারো—হেইনম্যান বা অন্য কাউকে! ইংলন্ড থেকে প্রকাশের সুবিধা তুমি দেখতে পাবে, এবং মনে হয়, বইটি প্রস্তুত হলে তোমার 'সাজেশন' জানাতে পারবে। মনে হয় না ফেবিয়ান সোসাইটি এটিকে প্রকাশ করতে বা পৃষ্ঠপটের আশ্রয় দিতে চাইবে—'ইন্ডিয়া' পত্রিকা কর্তৃপক্ষও তাই।'

নিবেদিতার কাছে 'জাতীয়তা জননী আমার'—অরবিন্দ সেই জাতীয়তার প্রবক্তা—সুতরাং অরবিন্দ 'বরণীয়'। এই মনোভাব নিবেদিতা প্রকাশ করেছেন ১৮ আগস্ট, ১৯১০-এর চিঠিতে। অরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে প্রস্থানের পরে এই চিঠি লেখা হয়। এই চিঠির মধ্যে নিবেদিতা কিছু বিস্তৃতভাবে একটি বিষয়ে আলোচনা করেন—র‍্যাটক্লিফকে বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন ও অবহিত করে দেবার জন্যে—এবং সেই প্রসঙ্গেই অরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর চরম কথাটি বলেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সরকারপক্ষ এবং সরকারের তাঁবেদার লোকেরা বলেছিলেন—এই আন্দোলন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাধিকোর পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই কথাটি ইংলন্ডে মহলে প্রচারিত হয়। এই উদ্ভট ধারণার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করে নিবেদিতা বলেন—এই আন্দোলন 'জাতীয় আন্দোলন'—যা তথাকথিত জাতিভেদকে নষ্ট করে ভারতবর্ষে ঐক্যমণ্ডিত অখণ্ড সমাজের পত্তন করবে। নিবেদিতা তিক্তভাবে বলেছিলেন—ইউরোপীয়রা কোনো আন্দোলন করবার সময়ে আগে 'ষড়যন্ত্রের' কথা ভাবে—ভারতবর্ষে তা কিন্তু হয় না। স্বদেশী আন্দোলন একটা দিব্য জাগরণ—মহৎ মাতৃসম্ভানের দিকে ধাবিত দেশপ্রাণতার বন্যা। নিবেদিতা আরও বলেছিলেন—এই আন্দোলনের মূল নেতারা ব্রাহ্মণ নন—কায়স্থ। 'গোটা জিনিসটিকে সৃষ্টি করেছে বিবেকানন্দের হৃদয়'—যিনি কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়। এবং ভারতীয়গণের মধ্যে 'কায়স্থ অরবিন্দের' মনীষাই একমাত্র জাতীয়তাকে যথার্থ সৃষ্টিশীলরূপে ধরতে পেরেছে। জগদীশচন্দ্র বসুও তা পেরেছেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে। নিবেদিতা আরও কয়েকজন কায়স্থ/ক্ষত্রিয়ের নাম করেছিলেন এই [illegible] ঠিক পরের থাকে রয়েছেন—[illegible], ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রমেশ দত্ত [illegible]। নিবেদিতার এই কায়স্থ-প্রীতির [illegible] গুরুভক্তি, এই সমালোচনা উঠতে [illegible] এবং জাতিভেদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের কথা বলবার পরে তিনি একটি বিশেষ জাতির নেতৃত্বের উপরে জোর দিয়েছেন, সে কথাও বলা যায়—কিন্তু নিবেদিতা সংকীর্ণ কোনো মনোভাব নিয়ে ঐ কথাগুলি বলেননি—সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই তা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য—ক্ষত্রিয়রা চিরদিন নূতন ভাব আত্মসাৎ করে তার পক্ষে লড়াই করেছে—ক্ষত্রিয় জাতিই জাতি ভেঙেছে সর্বাধিক—তার চরম দৃষ্টান্ত বুদ্ধ। নিবেদিতা নিজেকে 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের' অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন এবং ক্ষত্রিয় জাতিকে জাতি-বোধহীন জাতি ভাবতেন।

অরবিন্দ সম্বন্ধে নিবেদিতার উক্ত শ্রেষ্ঠ প্রশংসাবাণী ছিল এই—

> 'Arabindo Ghosh, may be said to be the one Indian mind that has really grasped nationality in a creative sense."

নিবেদিতার কাছে নিখিল সত্যের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন বিবেকানন্দ। তারপর সেই বিবেকানন্দই একদা নিখিল সত্যকে সাময়িক সুনির্দিষ্ট নদীখাতে প্রবাহিত করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—'আগামী পঞ্চাশৎ বৎসর এই পরম জননী মাতৃভূমিই তোমার আরাধ্যা দেবী হউক।'

নিবেদিতা সেই সূত্র তুলে নিয়ে জাতীয়তার মন্ত্র রচনা করেছিলেন :

'আমি বিশ্বাস করি—ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য।

'সম আবাস, সম স্বার্থ এবং সম প্রেমের উপর নির্মিত হয় জাতীয় ঐক্য।

'আমি বিশ্বাস করি—যে-শক্তি ব্যক্ত হয়েছে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে, ধর্মসমূহ ও সাম্রাজ্যের সংগঠনে, বিদ্বানের বিদ্যায়, ঋষির ধ্যানে—সেই শক্তিই পুনর্বার আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মধ্যে—আজ তার নাম জাতীয়তা।

'আমি বিশ্বাস করি—বর্তমান ভারত অতীতের মধ্যে গভীর-প্রোথিত এবং তার সামনে রয়েছে জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎ।

'হে জাতীয়তা! আমার কাছে আবির্ভূত হও আনন্দ ও বেদনারূপে; হে জাতীয়তা, তোমারি ক'রে নাও আমাকে।'

এই 'জাতীয়তাকে' অরবিন্দ ভাষা দিয়েছিলেন—তাই তাঁর প্রতি নিবেদিতার অসীম কৃতজ্ঞতা।

—একুশ—

মনোরমা পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে যেতেই চোখের সামনে অন্ধকার মনে হ'ল, হাত বাড়িয়ে সে শূন্যে একটা কিছু আশ্রয় খুঁজছিল।

চেয়ার থেকে উঠে কিরণ তাড়াতাড়ি মাকে ধরে ফেলল। বিছানার উপর একটা বালিশে হেলান দিয়ে তাকে ভালো করে বসাল। বলল—'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? বিন্তির কি হয়েছে আগে শুনি।'

মনোরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল,—'আর কি শুনবি বাবা? ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজ নেই। কালামুখী আমার কাছে সব স্বীকার করেছে। কিছু গোপন করেনি। আঁচলের কোণে চোখের জল মুছতে মুছতে ফের বলল,—সেই বড়মানুষের ছেলে। সেই রতীশ আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করল।'

সব শুনে কিরণ প্রায় নিঃসন্দেহ হ'ল। মায়ের নির্ণয় বোধহয় অভ্রান্ত। প্রকৃতির নিয়ম-টিয়ম হিসেব করলে ঠিক এরকম একটা কিছু ধরে নিতে হয়। কিন্তু কি সাংঘাতিক অবস্থা। খুব শীগগীর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। কথাটা বাড়ির ঝি কিম্বা বাইরের কোনো লোকের কানে গেলে আর রক্ষে নেই। পাড়ায় একটা ঢি-ঢি পড়ে যাবে। তারপর দশজনের কাছে মুখ দেখানো লজ্জার ব্যাপার হবে না?

একটু আগে সকালের সোনা-রোদ জানালা ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। এতক্ষণ চাদর জড়িয়ে চুপ করে বসে থাকতে কি সুন্দর লাগছিল। রোদ্দুরে পিঠ রেখে রীতাবরীর কথা ভাবছিল কিরণ। তার নিজের সমস্যা। এরপর সে কি করবে? রীতাবরীর বাবার সঙ্গে দেখা করবে কি-না। চুপ করে ভাবতে ভাবতে কখন অবচেতন মনে সে নানারকম স্বপ্নের জাল বুনছিল।

মায়ের কথা শুনে কিরণ যেন ঘেমে উঠল। এখন তার একটুও শীত করছে না। টান মেরে গায়ের চাদরটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে সে আলনা থেকে হ্যাঙগারে টাঙানো জামাটা টেনে নিল।

মনোরমা ব্যস্ত হয়ে শুধোল,—'যাবি কোথায়?'

—'সেই ভদ্রবেশী শয়তানটার কাছে।' কিরণ দাঁতে দাঁত ঘষল। তারপর নীচের ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে একটা শপথের ভঙ্গি করে জানাল, —'ওর সঙ্গে ফয়সালা করব আমি। বিন্তির এই অবস্থার জন্য সে দায়ী। সুতরাং তাকে বিয়ে করতে হবে।'

দুঃখ করে মনোরমা বলল,—'বিয়ের কথা আমি অনেক দিন ধরে তুলেছি কিরণ। তোর কাছে, মিনুর কাছে। তোর বাবাকেও জানিয়েছি। কিন্তু কেউ গা করিস নি। সবাই মিলে আমাকে শুধু বকিয়ে দিলি, বিন্তি ছেলেমানুষ, ওর এখনও বিয়ের বয়স হয় নি।' একটু থেমে সে ফের যোগ করল,—'এখন বুঝতে পারছিস তো? তোর বোনের বয়স না হলে কখনও এমনি সব লজ্জার ব্যাপার ঘটে?'

উত্তরে কিরণ অনেক কিছু বলতে পারত। কিন্তু সে চুপ করে রইল। তার মাথায় অনেক দায়িত্ব। এখন কত কাজ। মায়ের সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক করে লাভ নেই। আজ সকালে প্রথমে সেই ছেলেটার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কিন্তু রতীশ যদি দায়িত্ব অস্বীকার করে? তার বোনকে এখন বিয়ে করতে রাজি না হয়? তাহলে কি করবে কিরণ? একটা হৈ-চৈ, চেঁচামেচি করে পাড়ার ছেলেদের সাহায্য চাইবে? কিম্বা থানা-পুলিশের শরণাপন্ন হবে?

দরজার কাছে এসে মনোরমা চুপি চুপি জানাল,—'শোন বাবা। এসব কলঙ্কের কথা। বেশী চেঁচামেচি, রাগ-রোষ করিসনে যেন। হিতে বিপরীত হতে পারে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল,—'তোর বাবা কিন্তু এখনও কিছু জানেন না। রোগা মানুষ, আর এই তো মনের অবস্থা। শুনলে এখনই অস্থির হয়ে উঠবেন। তখন মেয়েকে সামলাব না তোর বাবাকে দেখব বলতে পারিস?'

—'বিন্তি কোথায় মা?' কিরণ এতক্ষণ পরে বোনের খোঁজ করল।

ওর পড়ার ঘরে। বিন্তিকে দেখলে তোর মায়া হবে কিরণ। মুখখানা ভয়ে কালি। হিমুর খাটে চুপ করে শুয়ে আছে।'

আমহার্স্ট স্ট্রীটে কিরণ ট্যাকসি নিল। অবশ্য ফাঁকা বাস ছিল। কিন্তু এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আবার বদল করবার ঝামেলা। মিছি-মিছি খানিকটা সময় যাবে। সাদার্ন অ্যাভেনিউ অবশ্য অনেকখানি পথ। পাঁচ-ছ টাকা নির্ঘাত গচ্চা। কিন্তু এই দুঃসময়ে পয়সা-কড়ির হিসেব করলে চলবে না। যেমন করে হোক রতীশকে রাজি করাতে হবে। সে যদি বিন্তিকে না বিয়ে করে তাহলে সামনে গাঢ় অন্ধকার। কি করবে কিরণ ভেবে পাচ্ছে না।

সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে বাড়ির নম্বর সে খুঁজে বের করল। কি সুন্দর শান্ত নির্জনতা। বাগানে কত রকম মরশুমী ফুল। এক-একটা বড় জাতের গোলাপের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কলিং বেল টিপতেই ধুতি আর হাফ সার্ট-পরা একজন বাজার সরকার গোছের লোক বেরিয়ে এল। ছেলেবেলায় ওর বসন্ত হয়েছিল। মুখে অল্প-বিস্তর সেই ক্ষতের চিহ্ন।

—'রতীশবাবু আছেন? তাঁকে একটু ডেকে দিন—'

—'আপনি দাদাবাবুকে খুঁজছেন?' লোকটি তার মুখের দিকে ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'তিনি তো এখানে নেই।'

—'নেই মানে?' কিরণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। 'কোথায় গেছেন?'

—'কেন, আপনি জানেন না? দাদাবাবু তো গত বুধবার বিলেত গেলেন।'

—'বিলেত গেলেন?' কিরণ যেন আকাশ থেকে পড়ল। ঘাড়ের উপর করতল চেপে

বলল,—'তার বাবা-মা কাউকে ডেকে দিন না।'

—'কেউ নেই বাড়িতে। তারা সবাই দিল্লীতে আছেন। এক মাস পরে কলকাতায় ফিরবেন।—'

কিরণ অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পায়ের তলায় ভূমি-কম্পের মত মাটি কাঁপছে। সে পা শক্ত করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারছে না। একটা শীতল ভয়ের স্রোত পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ক্রমাগত উপরে উঠছে আবার নীচে নামছে। এখন কি করবে কিরণ? কেমন করে বিন্তি কলঙ্কমুক্ত হবে? তার মাকে, বাবাকে লোক হাসি আর অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে?

প্রায় টলতে টলতে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে তার একজনের কথা মনে পড়ছে। ইচ্ছে করলে সে-ই তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তার বন্ধু পরিতোষ। বিন্তি বুঝতে পারেনি। ভুল করে সে আঘাটায় নেমে পড়েছিল। তাই পায়ে-হাঁটুতে নোংরা কাদা। সকলের অলক্ষ্যে সেটুকু ধুয়ে-মুছে দূর করলেই হয়। পরিতোষ বলে, আমাদের দেশের মেয়েরা পানকৌড়ি নয়। ওরা হাঁসের মত —ডাঙায় উঠলেই পালক থেকে জল ঝরে পড়ে। তখন আর অন্যায়ের ছিটে-ফোঁটাটি গায়ে লেগে থাকে না।

হাসপাতালে গিয়ে সে পরিতোষকে খুঁজে বার করল। প্রায় টানতে টানতে মাঠের এক কোণে তাকে নিয়ে গেল। জায়গাটা বেশ নির্জন। ডাক্তার-নার্স কিম্বা হাস-পাতালের অন্য কর্মচারীদের আনাগোনা কম। তার চিন্তিত মুখ, শুকনো ঠোঁট, প্রায় আঁকানাত চুল এবং উদভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে পরিতোষ রীতিমত অবাক হল।

ভুরু কুঁচকে সে প্রশ্ন করল,—'কি হয়েছে তোর?'

—'ভীষণ বিপদে পড়েছি। তুই যদি আমার একটা উপকার করিস।'

—'বেশ তো, কি করতে হবে তাই বল।'

কিরণ একটা ঢোক গিলল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে অবশেষে বলল,— 'ইয়ে, মানে একটি মেয়ের খুব বিপদ। আমার বিশেষ জানাশুনো। কি হয়েছে বুঝতে পারছিস? শী ইজ আনম্যারেড। তুই যদি একটা ডি এন সি করবার ব্যবস্থা করে দিস। মানে যেখানে হোক, আমি সমস্ত খরচ দিতে প্রস্তুত।'

—'ছি, ছি!' পরিতোষ বিরক্তিতে মুখখানা শক্ত করল। বন্ধুকে তিরস্কার করে বলল,—'তোর গালে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে। এমন আস্ত গবেট। নিজে ডাক্তার হয়ে রীতাবরীর এই সর্ব-নাশটি করলি। আজকাল বাজারে কত রকম জিনিস বেরিয়েছে, তার একটাও খুঁজে পেলিনে?'

লজ্জায়, দুঃখে কিরণের দু চোখে জলের ফোঁটা টলমল করছিল। চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুর ফোঁটা এখনই গড়িয়ে পড়বে। 'রীতাবরী নয়।' পকেট থেকে [illegible] মুছল। 'তোকে [illegible] বোন,—'আপন [illegible] বোন পরিতোষ।'

—'[illegible] গড। [illegible] কি তুই?' পরিতোষ বিস্ফারিত চোখে তাকাল।

—'হ্যাঁ। আমি সকালে উঠে সেই স্কাউন্ড্রেলটার বাড়ি ছুটেছিলাম। কিন্তু সে ভীষণ চালাক। গত বুধবার ইংল্যান্ড চলে গেছে, এমন কি বাড়িতে তার মা, বাবা কেউ নেই। সবাই এখন দিল্লীতে।' পরিতোষের হাত দুখানা ধরে কিরণ মিনতি করল, —'আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর তুই।'

—'নিশ্চয়।' পরিতোষ আশ্বাস দিল। একটু ভেবে বলল,—'তুই কাল ওকে নিয়ে আয়। বেলা বারোটা নাগাদ। আমার এক বন্ধুর ছোটখাটো একটা নার্সিং হোমের মত আছে, ওখানেই সব ব্যবস্থা হবে। দাঁড়া, তোকে ঠিকানাটা দিচ্ছি।'

কিরণকে নিরুত্তর দেখে সে ফের বলল,—'ভয় নেই তোর। এটা আর্লি স্টেজ, —সুতরাং রিস্ক নামমাত্র। তাছাড়া জায়গাটা খুব সেফ। আর মোটে দেড় দিনের ব্যাপার। কোথায় কি হল শিবের বাবাও টের পাবে না।'

* * *

বেলা দুটো নাগাদ কিরণ বাড়িতে ফিরল। ঘরে এখন শুধু মা আর বিন্তি।

সাপ্লাই আপিসে তাই কথা কইবার সুবিধে। সব শুনে মনোরমা কপালে করাঘাত করে বলল,—'আমার অদেষ্ট বাবা। নইলে ইস্কুলে-পড়া কুমারী মেয়ের এমন কলঙ্ক হয়? কি কুক্ষণেই আমি ওকে থিয়েটার করতে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন পাপপুণ্য, ভালো-মন্দ বিচার করবার অবসর নেই। যেমন করে হোক এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে।'

বিন্তির ঘরে ঢুকে সে প্রায় চিৎকার করে বলল,—'ন্যাথ, হতচ্ছাড়ি। কেমন ছেলের সঙ্গে পিরীত করেছিলি। কেস্টঠাকুর এখন বিলেতে গিয়ে মেমসাহেবদের নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। তোর কথা তার মনেও নেই।'

কিন্তু বিন্তি চুপ। আজ সকাল থেকে সে বোবা। ঠিক পাষাণ প্রতিমার মত। একটি কথাও বলছে না।

মনোরমা ছেলেকে কাছে ডাকল। গলা খাটো করে বলল,—'দোহাই কিরণ। তোর বাবাকে যেন একটি কথাও বলিস নি। কেমন মানুষ জানিস তো? এই সব অনাছিস্টি খবর শুনলে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। কাল আবার অফিসে পাঠিয়ে [illegible]। আর মোটে একটা রাত্তির। বলব, বিন্তি ওর এক বন্ধুর জন্ম-দিনে গেছে। রাত্তিরে সেখানেই থাকবে। তাহলে আর কোন চেঁচামেচি করবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর চাদর মুড়ি দিয়ে বিন্তি বিছানায় শুয়েছিল। আজ সকাল থেকে সে মেয়ের সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। তার কাছে যায় নি। আর বিন্তি কি অসম্ভব ঠাণ্ডা। ঠিক মরা মাছের মত কাঠ-কাঠ...আড়ষ্ট। এখন কথা বলতে গেলে সে তাকাতেই পারবে না। লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকবে।

কি প্রয়োজনে মনোরমা এ-ঘরে ঢুকে-ছিলেন। হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বলল,— 'ওই যাঃ। তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সকালের ডাকে তোর নামে একখানা চিঠি এসেছে কিরণ।'

—'চিঠি'! সে তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসল।

মনোরমা কোথা থেকে খামটা এনে দিতে কিরণ বুঝতে পারল। মেয়েলি হস্তাক্ষরে তার নাম পরিষ্কার লেখা। নিশ্চয় রীতাবরীর চিঠি। খামটা না খুলেও কিরণ নির্ভুল বলে দিতে পারে।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেলে সে আপন মনে মুচকি হাসল। আশ্চর্য! এতদিন বাদে রীতাবরীর তাকে মনে হল। প্রায় এক মাস পরে মেয়ের তাহলে রাগ পড়েছে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিরণ খামটা ছিঁড়ল। যা ভেবেছিল তাই। রীতাবরীর চিঠি। সে লিখেছে—

আমার ভালবাসার কিরণ,

তুমি যখন এই চিঠি পাবে তখন আমি অনেকদূরে চলে যাচ্ছি। আর একজনের সঙ্গে, যার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার কুমারী মনের লজ্জা-অনুরাগ মেলানো নরম রাঙা মাটিতে কোনোদিন তার ছায়া পড়েনি। তবু সেই অচেনা মানুষটির হাত ধরে তালগাছের বুক চিরে বানানো ডোঙা ডিঙির মত আমরা দুজনে সংসার-সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। নিশ্চয় অদৃষ্টে তাই লেখা ছিল। নইলে যাকে চিনলাম, জানলাম সে আমার কেউ হল না। আর যাকে কোনোদিন দেখিনি, সেই মানুষ কেমন করে আমার জীবনতরীর হাল ধরবার অধিকার পেল?

সেদিন কলেজ স্ট্রীট থেকে রাগ করে চলে এসেছিলাম। তুমি নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছ? সমস্ত পথ আমি শুধু চিন্তা করেছি, তুমি কেমন করে আমাকে দুমাস অপেক্ষা করতে বলতে পারলে? তোমার কাছে আমার অবস্থার কথা একটুও গোপন করিনি। আমাদের রক্ষণশীল বাড়ি। বাবা বংশ গৌরবকে চোখের মণির মত সযত্নে রক্ষা করতে চান। তার কাছে অসবর্ণ বিয়ের

অনুমতি চাওয়া অথবা পাথরে মাথা ঠুকে মরা প্রায় এক কথা।

তুমি কত সহজে আমার কাছে সময় চেয়ে নিলে। আরো দুটি মাস আমাকে অপেক্ষা করতে বললে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে কিরণ? মা-বাবা, বাড়ির লোকে আরো দু'মাস অপেক্ষা করবে কিনা, একথা তো তুমি একবারও জিজ্ঞাসা করলে না? আমার সৌভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্য যাই বল। যারা আমাকে পছন্দ করেছেন, তারা বাবার কাছে এসে বিয়ের দিন স্থির করতে চাইবেন একথা কি তোমার মনে জেগে উঠল না?

আমি বুঝতে পেরেছি কিরণ। তোমার অনেক দায়িত্ব, নানা সমস্যা। বাড়ির কথা তোমাকে বেশ ভাবতে হয়। তোমার ছোট-ভাই গ্রামে চলে গেছে। তাই মায়ের মনে সুখ নেই। দাদা আমেরিকায় যাবেন। বাবা অবসর নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি দেশের বাড়িতে কাটাবেন বলে স্থির করেছেন। এই মুহূর্তে তোমার কারো দিকে তাকাবার অবসর নেই। বলতে গেলে দায়িত্ব এখন একার। বাড়ির ভাবনা শুধু তোমার কিরণ। আর দু-মাস মিছে বলা, অন্তত আরো কিছু-দিন না গেলে দুই কাঁধে তুমি [illegible] শক্তি পাবে না।

বিশ্বাস কর, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল। এত সমস্যা, তার ভারে তুমি জর্জর। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত নিজের ভাবনার কথা বলে

তোমাকে বিব্রত করা আমার উচিত হবেনি। তাই আমি বিদায় নিচ্ছি কিরণ। লক্ষ্মীটি, আমাকে ভুল বুঝে তুমি দুঃখ পেও না।

অনেক ভেবে-চিন্তে এই বিয়েতে মত দিলাম। মা আমাকে বারবার বলেছেন, বোকা মেয়ে, তোর ভালো-মন্দ আমরা অনেক বেশী বুঝব। নিজের ভাবনা-চিন্তা আমাদের উপর ছেড়ে দে। দেখবি তুই জীবনে কত সুখী হয়েছিস।

নিজের সুখের জন্য নয়। তোমার কথা ভেবে বিদায় নিচ্ছি কিরণ। আমি চলে গেলে হয়তো তুমি একটু হাল্কা বোধ করবে। ভালো করে বাড়ির কথা ভাবতে পারবে। তোমার দুঃখিনী মায়ের কথা, বাবার কথা। ছোট বোন বিপ্তি, যার বিয়ের জন্য তোমাকেই এবার কোমর বেঁধে তৈরি হতে হবে।

আমার মা বলেন, এসব কাঁচা রঙ। বিয়ের জল পড়লেই সব ধুয়ে মুছে যাবে। আমি একথা মানি না কিরণ। ভালোবাসার রঙ কোনোদিন কাঁচা হয় না। দূরে সরে যাচ্ছি বলেই কি মন থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারব?

আবার কোনোদিন দেখা হবে কিনা জানি না। কিন্তু কলকাতায় গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালে তোমার কথা বড় বেশী মনে পড়বে। এই মাঠে-ময়দানে, শনশনে হাওয়ায় সবুজ ঘাসের উপর বসে দুজনে কত গল্প করেছি। আমার সেই স্বপ্নের বাড়িটার ছবি মনের আয়নায় কতবার ভেসে উঠবে।

কোনোদিন অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে পুরোন দিনের হাজার স্মৃতি মনের বন্ধ দরজায় মুখে ভিড় করবে, আমি চোখ বুজে আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখার মতো তোমার কথা চিন্তা করব কিরণ। আমাদের ভালোবাসার কথা। সেই ঝমঝমে বর্ষায় কলেজ স্ট্রীটে দুজনে দুদিক থেকে ছুটে এসে একই ট্যাক্সি ধরতে চেষ্টা করলাম। আবার কোনোদিন শ্রাবণের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যাবে। ঘন ঘোর বর্ষা নামলে তোমার কথা সর্বাগ্রে মনে হবে।

ভালোবাসার দিনগুলি বড় ছোট। শীতের বেলার চেয়েও স্বল্প পরিসর। কিন্তু তারা স্থায়ী। কোনোদিন মন থেকে মুছে যায় না। আর আমার কুমারী জীবনে তুমি প্রেমের প্রথম কিরণ। তোমার কথা কি কখনও ভুলতে পারি?

বিদায়——

ইতি
রীতাবরী

চিঠিখানা পকেটে রেখে কিরণ আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মনে রাগ বা অভিমান নয়। কেমন একটা বিচিত্র দুঃখের অনুভূতি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল। অন্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে বিষণ্ণ মেঘের ছায়া ক্রমেই ঘন হচ্ছে। অনেক দিন আগের একটা কথা মনে পড়ল তার। কলেজে এক বন্ধু ভীষণ তর্ক করে বলেছিল,—'মেয়েরা আদৌ ভাবপ্রবণ নয়। ওরা খুব প্র্যাকটিক্যাল।' এতদিন পরে সেই মন্তব্যটা কেবল মাথায় ঘুরছে। আর সত্যি কথা, রীতাবরী তাকে ঠিক নির্ভুল ওজনে বিচার করেছে। তার মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব। দাদা আমেরিকায়, ছিন্ন বাড়িঘরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছে। সুতরাং তার মা-বাবাকে কে দেখবে? আর বিপ্তি? এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে কি ভাবনার শেষ আছে? আরো কতদিন এই দুর্ভাবনা চলবে তাই বা কে বলতে পারে? দু মাস ছমাস, ছ মাস কিম্বা এক বছর হয়তো কিরণকে বাড়ির কথা ভাবতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বাইরে কোথাও ঘুরে এলে ভালো লাগবে? দেহে-মনে কেমন বিশ্রী অবসাদ। একটা তিক্ত কটুগন্ধ ওষুধ খাওয়ার পর মুখের যা দশা হয়, কিরণের মনের অবস্থাও তাই। সে ভাবছিল এসপ্ল্যানেডে গিয়ে কিছুক্ষণ বসবে কি না? কিম্বা কলেজ স্ট্রীটের কফি-হাউসে। সন্ধ্যের সময় সেখানে হয়তো পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

জামাটা মাথায় গলিয়ে কিরণ বেরোবার জন্য তৈরি হল। এই ফ্ল্যাটে এখন সে ছাড়া আরো দুটি প্রাণী। তার মা ও বিপ্তি। তবু সমস্ত বাড়িটা কি অদ্ভুত নিস্তব্ধ আর চুপচাপ। যেন সব মৃত। প্রাণহীন এক প্রেতপুরীর মধ্যে কিরণ আটকা পড়েছে। কিন্তু বিপ্তি? অমন প্রাণচঞ্চল ছটফটে মেয়েটা। কলঙ্কের কথা রটবার পর সে কি বোবা হয়ে গেছে?

সমস্ত রাত্তির কিরণের ঘুম হয়নি। রীতাবরীর চিঠিখানা তার পকেটে। চোখ বুজলেই পুরনো দিনের কথা কেবল মনে হয়। সেই গঙ্গার তীর। দূরে ওপারে শিবপুরের কল-কারখানাগুলির মাথায় ছেলে পড়েছে। রাজহংসীর মত একটা শাদা মোটর লঞ্চ তরতর করে জল কেটে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। সেই ছায়াঢাকা বিকেলে সবুজ ঘাসের উপর বসে তারা দুজনে শুধু স্বপ্নের জাল বুনত। কতদিন শিয়ালদ স্টেশনে নেমে রীতাবরী তার জন্য অপেক্ষা করেছে। হাসপাতালের উল্টোদিকে খানিকটা দূরে সিনেমা হলটার কাছে দাঁড়িয়ে। এই কলকাতার পথে পথে তারা দুপুরে-বিকেলে ঘুরে বেড়িয়েছে। অমন সোনার দিনগুলি পাখির মত ডানা মেলে কোথায় হারিয়ে গেল।

কিন্তু এখন বিছানায় শুয়ে রীতাবরীর কথা ভেবে তার মন খারাপ করলে চলে না। কাল অনেক কাজ। বিপ্তির জন্য সে খুব দুর্ভাবনায় আছে। পরিতোষ অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়েছে। ব্যাপারটা খুব সামান্য। আর্লি স্টেজে গেলে রিস্কের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু একটা কিন্তু থেকে যায়। সে নিজে চিকিৎসক। আর ডাক্তার তো ঈশ্বর নয়। সুতরাং ভুলচুক, অ্যাকসিডেণ্ট সবই ঘটতে পারে। কিছুই বিচিত্র নয়।

খুব সকালে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনোরমা যেন তাকে ব্যাকুলভাবে ডাকছেন। কিরণের মনে হল কথা বলতে গিয়ে মায়ের গলা কান্নায় বুজে আসছে। এই শীতের সকালে তার মস্তিষ্কের ভিতর বিদ্যুৎতরঙ্গের মত একটা চিন্তার প্রবাহ শুরু হ'ল। কি হয়েছে মায়ের? দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সে ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল।

—'ও কিরণ, তুই একটু ওঠ বাবা।' মনোরমা তেমনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'একবার দেখবি চল। বিপ্তি কেন জেগে উঠছে না? এত ডাকাডাকি, ঠেলাঠেলি করলাম। তবু ওর ঘুম আর কিছুতেই ভাঙে না।'

—'তাই নাকি?' কিরণ বেশ অবাক হ'ল। তারপর বিছানা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মেঝের উপর বিপ্তি নিশ্চিন্তে শুয়ে। এখন তার মুখখানি ঠিক নিশীথ রাতের জ্যোৎস্নার মত। বড় শান্ত, বড় সুন্দর। চিন্তা নেই। ভাবনা নেই। বিপ্তি যেন পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। তার বাবা বিছানার পাশে বসে গালে করতল চেপে গম্ভীরভাবে চিন্তা করছে।

ঘুম চোখে প্রথমটা সে ধরতে পারেনি। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে কিরণ চমকে উঠল। মাথার বালিশের কাছে পরিতোষের দেওয়া সেই নীল শিশিটা খালি পড়ে আছে। বিপ্তি একটিও রাখেনি। তার বাবা মাঝে-মধ্যে দু-একটা ব্যবহার করে থাকেন। বাকিগুলি বিপ্তি খেয়ে ঘুমিয়েছে। ক্রমে

গাঢ় নিদ্রা। তারপর ঘুমের দেশ পেরিয়ে আর এক অজানা দেশের মাটিতে সে পা দিয়েছে। সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না।

একটু খুঁজতেই বালিশের নীচে একটা ছোট্ট কাগজ পাওয়া গেল। তার শেষ চিঠি। কিরণ যা ভেবেছিল তাই। বিনিতা আত্মহত্যা করেছে। চিঠিতে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

কাগজটা মনোরমার হাতে দিয়ে কিরণ মাথা নীচু করে দাঁড়াল। 'একটু শক্ত হও মা। বিনিতাকে ডাকাডাকি ক'র না। ওকে ঘুমোতে দাও। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে ফের বলল, 'ওর ঘুম আর কখনও ভাঙবে না।'

মনোরমা ডুকরে কেঁদে উঠল। মেয়ের মৃতদেহটা আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল,—'তুই অভিমান করে চলে গেলি মা। তোকে কলঙ্কিনী বলেছি, তাই—।' মনোরমা আর কথা বলতে পারল না। সে বিছানার উপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বাণীব্রত আশ্চর্য মানুষ। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি গুম হয়ে বসে রইলেন। এমন একটা দুর্ঘটনা। তবু চোখে এক ফোঁটা জল গড়াল না। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বাপের এমন শুকনো গম্ভীর মূর্তি কিরণ জন্মে দেখেনি।'

তবু সে একবার ভয়ে ভয়ে বলল,—'তুমি অমন চুপ ক'রে বসে থাকবে বাবা? এখনও তো অনেক কাজ। আমার বুঝি মন খারাপ হয়নি?'

বাণীব্রত ঠোঁট ফাঁক করে একটু হাসলেন। কেমন পাগলের মত হাসি। চোখ দুটো বড় বড় করে ছেলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। —'আমি তোকে বলিনি? ঘণ্টা বেজেছে কিরণ। এবার ঘণ্টা বেজেছে। আর দেরি করিস নে বাবা। তাড়াতাড়ি আমাদের চন্দনপুরে পাঠিয়ে দে—।'

মা-বাবাকে প্রায় জোর করে বারান্দায় এনে কিরণ আর একবার ঘরের ভিতরে ঢুকল। একটা শাদা চাদরে মৃতদেহটা ঢাকতে গিয়ে সে কতক্ষণ ছোট বোনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল,—তুই ভুল করলি বিনিতা। অকারণে মা-বাবাকে এত দুঃখ দিলি। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করেছিলাম যে। এই কলঙ্কের কথা কাকপক্ষীতেও টের পেত না। মিছিমিছি সব ভেস্তে দিয়ে অকালে চলে গেলি।—'

শুধু পাড়ার ছেলেরা নয়। পরিতোষ তাকে যথেষ্ট সাহায্য করল। সমস্ত দিন ছুটোছুটি। কাটা-ছেঁড়া, পোস্টমর্টেমের হাঙ্গামা। সমস্ত কাজ চুকিয়ে কিরণ যখন বাড়িতে ফিরল, তখন অনেক রাত্তির। প্রায় ঘুমন্ত শহর। এগারোটা কখন বেজে গেছে।

পরের দিন সকাল হতেই বাণীব্রত অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি আজই চন্দনপুরে যাবেন। কলকাতায় আর এক মুহূর্তও নয়। অবসর নেবার কয়েকটা দিন বাকি ছিল। বাণীব্রত তাই কোম্পানীকে চিঠি লিখলেন। আজ থেকেই তিনি রিটায়ার করতে চান। এই শহরে আর একটি দিনও থাকবার অভিরুচি নেই। সাহেব তাঁর আগ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

চন্দনপুরে যেতে মনোরমার এখন আপত্তি নেই। কি হবে কলকাতায় থেকে? অম্বর ধারিক লেনের এই ফ্ল্যাটটা তাকে হাঁ করে গিলতে আসছে। সমস্ত ঘরে ছিরু আর বিনিতার হাজার স্মৃতি। মনোরমা কোনদিকে তাকাবেন? কেবল তার কান্না পাচ্ছে। এখানে থাকলে সে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে।

স্টেশনে অনেকে এল। অফিসের আদিনাথবাবু আরো দু-তিনজন সহকর্মী। পাড়ার ক'টি ছেলে, এবং পরিতোষ। কিরণ তাদের সঙ্গে দু-একদিনের জন্য চন্দনপুরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাণীব্রত রাজি হননি। এক রাত্তিরেই তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। কত বুড়ো। চুলগুলি উস্কোখুস্কো, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। যেন অন্য মানুষ। ভীষণ খিটখিটে, শক্ত মেজাজ। স্টেশনেও বললেন—'তোর যাবার প্রয়োজন নেই। আমরা বুড়ো-বুড়ি দিব্যি যেতে পারব। আর বিদেশ তো নয়। নিজের গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি। অত চিন্তা-ভাবনার কি আছে?' একটু থেমে ছেলেকে সাবধান করে বললেন—'তুমি কলকাতায় বেশীদিন থেক না। পারলে অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যেও, বুঝলে?'

পরিতোষ শুনতে পেয়ে বলল—হ্যাঁ মেসোমশায় আমি ওর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। দার্জিলিঙের কাছে, বেশ বড় চা-বাগানের হাসপাতালে। ভালো মাইনে। তাছাড়া ফ্রি কোয়ার্টার্স। কিরণ রাজি আছে।'

মনোরমা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, —'তুই চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছিস কিরণ? কই আমাকে তো কিছু বলিসনি?—'

—'পরে তোমাকে চিঠি লিখতাম মা', কিরণ মৃদু হেসে জানাল।

মনোরমা চুপ করে রইল। ছেলের মুখখানা যেন বড় সরু। আর কি রকম রোগা হয়ে গেছে। চোয়ালের হাড়গুলি স্পষ্ট। কে জানে ওর মনে কিসের দুঃখ। যা চাপা ছেলে। মুখ ফুটে তো বলবে না। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, নইলে হঠাৎ চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যেতে চাইবে কেন?

ট্রেন ছাড়ল। বাণীব্রত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওরা সবাই হাত নাড়ছে। এতদিন পরে কলকাতা ছেড়ে তিনি সত্যি চললেন। ভেবেছিলেন কত আনন্দ করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন, এমন দীনহীন নিরানন্দ হৃদয়ে তাকে বিদায় নিতে হবে, একথা কোনোদিন স্বপ্নেও মনে হয়নি।

* * *

শীতের সকাল। অল্প অল্প রোদ্দুর উঠেছে। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে গোরুর গাড়ি চলছিল। একদিকে ধান কাটা শেষ। দুপাশে ন্যাড়া মাঠ। কোথাও মোরাম মাটির অনুর্বর প্রান্তর। ছোট একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে পেরিয়ে এল। পথের ধারে খেজুর গাছ। রোগা, তিলতিলে ছেলের গলায় বড় একটা মাদুলির মত গাছের মাথায় খেজুর রসের হাঁড়ি টাঙানো। তার বাবার এক পিসী ছিল। বয়সে সাংঘাতিক বড়। ছেলেবেলায় বাণীব্রতকে সে বলত,—খেজুর গুড় পুজোয় লাগে না, জান কে তাই?'

বাণীব্রত প্রশ্ন করতেন,—'কেন ঠাকমা?'

—'কেন আবার? খেজুর গাছের গলা কেটে দিলে তবে তো রস পড়ে। সেই রস থেকে গুড়। তাতে কি কখনও ঠাকুরের পুজো হয়?'

কতদিনের কথা। কুয়াশাভরা শীতের সকালের মত যেন আবছা দেখা যায়।

মনোরমা চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। অনেকদিন সে গ্রামে আসেনি। কি গাঢ় নীল আকাশটা। কত গাছপালা, উন্মুক্ত প্রান্তর। দূরে হাতীর পিঠের মত শুশুনিয়া পাহাড়ের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। বিনিতা থাকলে এতক্ষণ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ত। হয়তো আহ্লাদে গান করত। প্রজাপতির মত এমন সুন্দর মেয়েটা। মনোরমা মুখ ফিরিয়ে আঁচলের কোণে চোখের জল মুছতে লাগল।

শিবতলায় হীরালাল সেম সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গরুর গাড়িতে নতুন মানুষ দেখে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। কাছে এসে চিনতে পেরে বলল—'তাহলে গ্রামে বাস করতে চলে এলেন?' তারপর ছইয়ের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—'তা আপনারা দুজনে? ছেলেমেয়েরা কই?'

বাণীব্রত গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন,—'তুমি পরে এস হীরালাল। সব কথা এক সময় বলব।'

কেমন বিষণ্ণ দৃষ্টি। কপালে চিন্তার রেখা। হীরালাল তাই আর কোনো প্রশ্ন করল না। সে সাইকেলে চেপে অন্যদিকে রওনা হল।

উঠোনে পা দিয়ে মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িটা তার চোখে নতুন লাগছে। দোতলাটা হবার পর মনোরমা আর আসেনি। তাছাড়া পুজোর পরেই বাণীব্রত এসে ঘরদোর সারিয়ে চুনকাম আর রং করিয়ে গেছেন। দেওয়ালে ফিকে হলুদ রং,...কার্নিশের একটু নীচে পর্যন্ত খয়েরী বর্ডার। তার শ্বশুরের আমলে এসব কিছুই ছিল না। একতলা বাড়ি। বৃষ্টিতে, জলের ঝাপটায় বিবর্ণ মূর্তি। তার বিয়ের সময়েও বাইরের দেওয়ালে রং হয়নি।

মনোরমার মনে পড়ল এ বাড়িতে নববধূর সাজে সে উঠোনের ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। শাশুড়ি তাকে বরণ করলেন। পাথরের থালায় দুধ আর আলতা গোলা। মনোরমা তার উপর উঠে দাঁড়াল। একতলার

ওই কোণের ঘরটায় তাদের ফুলশয্যে হয়েছিল। তারপরও এই বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছে মনোরমা। বাণীব্রত তখনও বাসা করেননি। ওই ঘোড়ানিমের গাছটা খুব ছোট ছিল। ঝাঁকড়া চুলওলা দৈত্যের মত এমন প্রকাণ্ড হয়ে ওঠেনি।

সমস্ত দিন একটা অবসন্নতার মধ্যে কাটল। আগাছার জংগল সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। এদিকে সেদিকে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু বাণীব্রতর কোনো উৎসাহ নেই। হাতে পায়ে জোর কোথায়? আগে হলে সকালেই লোকজন ডাকতেন। সূর্যি মাথায় উঠতে না উঠতেই সব পরিষ্কার। উঠোনের একটি খোপও বাকি থাকত না।

সন্ধ্যের পর মনোরমা অল্প অল্প গোছগাছ শুরু করল। বিছানাটা খুলতে হয়। জিনিসপত্র এবার সরিয়ে তুলে রাখা দরকার। আরো কত কাজ। কতকাল বাদে শ্বশুরের ভিটেয় আজ সন্ধ্যেপ্রদীপ জ্বালিয়েছে মনোরমা।

বাণীব্রত চুপ করে দাওয়ায় বসেছিলেন। হঠাৎ স্ত্রীর কান্না শুনে চমকে উঠে শুধোলেন—'কি হ'ল? ওগো কি হ'ল তোমার?'।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাণীব্রত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। একটা বাঁধানো ছবির দিকে [illegible] করে কাঁদছে মনোরমা। ছবির [illegible] পাশাপাশি দুই ভাই-বোন দাঁড়িয়ে। বাণীব্রতর মনে আছে, পাঁচ-ছ বছর আগে মিলনের এক বন্ধু ছবিটা তুলে দিয়েছিল।

স্ত্রীর হাত থেকে সেটি কেড়ে নিলেন বাণীব্রত। সস্নেহে বললেন—কেন ওসব দেখছ? মিছিমিছি মন খারাপ হবে।'

মনোরমা তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল,—'ওগো, কার জন্যে তুমি এই বাড়ি করেছ? এখানে কারা থাকবে? শুধু তুমি আর আমি? তোমার ছেলেরা কেউ এ বাড়িতে আসবে না? আমি কি এখানে একলা পড়ে থাকব?'

বাণীব্রত অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন—'আমি বুঝতে পারিনি মনোরমা। যখন ওরা ছোট ছিল, তখন আমরা সবাই এক বাড়ির কথা ভাবতাম। তারপর কখন ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। ওদের মনের মাটিতে নতুন নতুন রংচঙে বাড়ি তৈরি হ'ল। আমি তার খোঁজ রাখিনি, বুঝতে পারিনি। আমার চন্দনপুরের বাড়িতে ওরা কেউ বাস করবে না। একথা কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?'

অন্ধকার রাত্রি। কলকাতার চেয়ে ঠাণ্ডা অনেক বেশী। মাথার উপর গ্রহ-উপগ্রহ, নির্বাক তারার দল। বিস্তীর্ণ ছায়াপথ আকাশের এক কোণ থেকে অন্য কোণে প্রসারিত। বাণীব্রত ভাবছিলেন, এই বাড়িতে তার পূর্বপুরুষেরা বাস করে গেছেন। তার বাবা এখানে জন্মেছেন। এই উঠোনের মাটিতে খেলাধুলো করে বড় হয়েছেন। ওই অনন্ত আকাশ, নীহারিকাপুঞ্জ, গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য-তারার দল। ওরই আড়ালে দাঁড়িয়ে তার পূর্বপুরুষেরা অঙ্গুলি সংকেত করে বলছেন—'তুমি আমাদের বংশধর। তোমাকে ভালবাসি। সময় পূর্ণ হলে একদিন আমাদের মধ্যে তুমিও এসে দাঁড়াবে। আমরা অপেক্ষায় আছি।'

রান্নাঘরের চালার পাশে সজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে বাণীব্রত মৃদু হাসলেন। আর কয়েকদিন পরে শাদা শাদা ফুলে ভরে উঠবে গাছটা। মায়ের হাতের রান্না সজনে ফুলের চচ্চড়ির স্বাদ মনে হল তার। কতদিন আগের কথা। তার মা জিজ্ঞাসা করত—'আর একটু চচ্চড়ি নিবি খোকা? তুই তো খেতে ভালবাসিস।' পৌষের স্তব্ধ রাত্রে মায়ের কণ্ঠস্বর কানের কাছে স্পষ্ট মনে হল।

কখন মনোরমা এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছে। বাণীব্রত প্রায় ফিসফিস করে বললেন—'জানো, ওই সজনে গাছটা আমার মায়ের হাতে লাগানো। এখন কত বড় হয়েছে।'

মনোরমা স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার একটু ভয় ভয় করছিল।

বাণীব্রত স্বগতোক্তির মত বললেন,—'এস, আমরাও একটা গাছ লাগিয়ে যাই। কোনোদিন ছেলেরা নিশ্চয় এই বাড়িতে আসবে। ততদিনে সেই ছোট্ট গাছটা অনেক বড় হবে। আমরা হয়তো বেঁচে থাকব না। কিন্তু তার নীচে দাঁড়িয়ে ওরা ঠিক বলবে,—'এই গাছটা আমাদের মা আর বাবার হাতে লাগানো। ছায়ায় বসে আমাদের স্নেহ-ভালবাসার কথা ওরা অন্ততঃ একবার স্মরণ করবে।

কোথায় দূরে একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। বাণীব্রত স্ত্রীকে আর একটু কাছে টেনে নিলেন। নক্ষত্রের আকাশ। মৌন রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগল। নিঝুম, ঘুমন্ত গ্রাম। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুটি নারী-পুরুষ তাদের সন্তানদের শুভ কামনার ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা জানাল।

(শেষ)

নেবুতলার সেই দুঃসাহসী নায়ক

নারায়ণ দত্ত

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ। ব্যারাকপুরে বেশ কয়েকটা সেনাবিদ্রোহ হয়ে গেছে কিন্তু ভারতজোড়া সিপাহী বিদ্রোহ এখনও বিরাট অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে পড়েনি। পাইকপাড়ার সিংহীরা, কলকাতার মতিলাল শীল, এবং বেঙ্গলের বেশ কয়েকজন মাতব্বররা মিলে মাত্র কয়েকটা বছর আগে মেডিকেল কলেজ বসিয়েছে। মধুসূদন গুপ্ত রাজকৃষ্ণ দে প্রমুখেরা মড়া কেটে এদেশে শল্যবিদ্যার নবযুগের সূচনা করেছেন, ডাক্তার ভোলানাথ বসু, 'টাগোর স্কলার' হয়ে বিলেত ঘুরে এসে সুকিয়া লেনের ডিস্পেনসারী আর হাসপাতালের সারজেন্ট-সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে বসেছেন। তাও কয়েক বছর হয়ে গেল। সারা দেশ থেকেই ছেলেরা গুটি গুটি এগিয়ে আসছে মেডিকেল কলেজে পড়বে বলে।

সেই সময়ের ঘটনা। সেদিন হয়েছে কি, আউটডোর ডিস্পেনসারীতে ডাক্তার আরচার ক্লাস নিচ্ছিলেন। ফিফথ ইয়ার ক্লাস। ছাত্ররাও অধ্যাপকের সঙ্গে রোগীদের পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় আরচার তাঁদের চোখ ও আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসলেন। ছাত্ররা ত থ। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু জবাবের কোন কিনারা করতে পারলে না। প্রশ্নটা ভার হয়ে যেন সারা ক্লাসটার বুকে বসে রইল।

এহেন অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিলে এক নাটকীয় ঘটনা। অপেক্ষমান রুগীদের ভিড়ে সেদিন একটা রোগাপানা ছেলে বসেছিল। এসেছে কলকাতার নেবুতলা থেকে। এসেছে তার এক দুস্থ আত্মীয়কে সঙ্গে করে, তার চোখ দেখিয়ে দেবে বলে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সেই বেপরোয়া ছেলেটি বলে উঠল, সার যদি অনুমতি করেন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। ইংরাজ অধ্যাপক আর বিমূঢ় ছাত্রদের চোখগুলো সব একসঙ্গে গিয়ে পড়ল নেবুতলার সেই সাহসী ছেলেটির দিকে। কিছু-বা তাচ্ছিল্যের হাসি ভেসে উঠে থাকবে ডাক্তার আরচারের মুখে। বললেন 'ইয়েস, ইয়েস'। অপেক্ষমান রোগী, ছাত্র সবাই নতুন করে তাকাল অচেনা ছেলেটির দিকে। কারও চোখে কৌতূহল - সেটাই বেশী, কারও বা বিদ্রূপ কারও শুধু বিস্ময়!

আউটডোরের বিশাল হলঘরের বিপুল জনসমষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি বিনা দ্বিধায় আলোকবিজ্ঞানের সেই কঠিন প্রশ্নের সঠিক সরল জবাব দিয়ে দিলে। বিস্ময় থেকে এবার কৌতূহলের পালা। কে এই ছেলেটি? কিন্তু কেষ্টনগরের এককালের সিভিল সার্জন ডাক্তার আরচার ছেলেটিকে আরও বাজিয়ে নিতে চাইলেন। ওকে আরও প্রশ্ন করলেন তিনি। আলোকতত্ত্বের দুরূহ থেকে দুরূহতর প্রশ্ন। আর অবলীলায় সেগুলির নির্ভুল জবাব দিতে লাগল নেবুতলার সেই প্রতিভাধর তরুণ। এবং শেষবেশ অধ্যাপকের অনুরোধে ফিফথ ইয়ার ছাত্রদের সামনে চক্ষু ও আলোকতত্ত্বের ওপর একটা লেকচারও দিয়ে ফেলল সে সেদিন দ্বিপ্রহরে।

অচিরেই অবশ্য জানা গেল, নেবুতলার ছেলেটি আর কেউ নয় মহেন্দ্রলাল সরকার। মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তবে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষের। আদি বাড়ী পাইকপাড়া। পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা গেলে মায়ের হাত ধরে এসে ওঠেন মামার বাড়ী নেবুতলায়। মাও এককালে গত হলেন। কিন্তু যত্নের অভাব হল না। মাতুল গরীব কিন্তু আটকাল না লেখাপড়া। হেয়ার স্কুল পিছনে ফেলে সন্তর্পিত পদক্ষেপে ঢুকলেন হিন্দু কলেজের মস্ত থাম আর গথিক খিলানের তলা দিয়ে। কিন্তু সেখানেও কেমন যেন মন বসল না। মহেন্দ্রলাল তাঁর বিদ্যার স্ফূর্তি পাচ্ছিলেন না। এলেন মেডিকেল কলেজের চত্বরে। আঠারশ পঞ্চান্ন সাল।

রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরে পটীর বাড়ীতে 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। দিকে দিকে নীল বিদ্রোহের লাল আগুন জ্বলে জ্বলে উঠেছে। হরিশ মুখুজ্যে তাঁর কাগজে চুটিয়ে সাহেবদের সোনার বাঙলা ছারখার করার খবর ছাপছেন, 'বেঙ্গলী'তে কলম ধরেছেন গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্রলাল সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরোলেন—এল-এম-এস। আঠার'শ সাট। বছর তিনেকের মধ্যেই এম-ডি। কলকাতার দ্বিতীয় এম-ডি। প্রথম চন্দ্রকুমার দে।

এবং মহেন্দ্রলাল ডাক্তার হয়ে বসতে যা দেরী! দেখতে দেখতে জোর প্রসার। একেবার এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম। নাইবার খাবার সময় নেই—এত নামডাক। হাতে যেন জাদু আছে। দিকে দিকে নাম-যশ ছড়িয়ে পড়ল। মহেন্দ্র সরকার ত নয়, দ্বিতীয় ধন্বন্তরী। নাম শুনেই যেন রোগীর অর্ধেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়, ওষুধ পরের কথা। এমনি সুনাম।

এহেন সময়ে ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী এগিয়ে এসে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শাখা খুললেন বাংলা-দেশে শহর কলকাতায়। কিন্তু মহেন্দ্র সরকার ছাড়া কি কোন মেডিকেল অ্যাসো-সিয়েশন হয় এদেশে? কাজেই মহেন্দ্রলালও এলেন এই সংস্থায়। এবং সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দারুণ এক বক্তৃতা দিলেন। সার-গর্ভ ভাষণ। তাতে অ্যালোপ্যাথি সায়ান্সের আরম্বরে গুণকীর্তন আর অবৈজ্ঞানিক ও হাতুড়ে বলে হোমিওপ্যাথির নিদারুণ নিন্দা। সদ্য এম-ডি হয়ে বেরিয়েই অ্যালোপ্যাথির ঋণ যেন এমনি করেই শোধ করতে চাইলেন মহেন্দ্রলাল।

আর তাই নিয়ে লাগ-লাগ ভেল্কি, নাটকের সুরু। সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট চোখে পড়ে থাকবে ধোবাজারের সেকালের বিখ্যাত মানুষ রাজেন্দ্র দত্তর। অক্রূর দত্তের বংশের ছেলে তিনি। ছোটবেলা থেকে নানা স্কুলে পড়ে, হিন্দু কলেজ মায় মেডিকেল কলেজে পাঠ নিয়ে, বোধকরি সাঙ্গ না করে, তখন মনেপ্রাণে হোমিওপ্যাথি করছেন। মহেন্দ্রলালকে চিনতেন তিনি। তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট পড়েই আর থাকতে পারলেন না:

মহেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'একি বলেছেন আপনি?' যুক্তিতর্কের দীর্ঘ চাপান-উতোর। এই সময়ে আর একটা ঘটনা ব্যাপারটাকে বেশ ঘোরালো করে তুললে। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' কাগজের মস্ত ইংরিজিনবিশ সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র একদিন প্যালকী চেপে এসে হাজির মহেন্দ্র সরকারের বাড়ী। হাতে একখানা ইংরিজি বই, মরগান সাহেবের লেখা—'ফিলজফি অফ হোমিওপ্যাথি'। সরকার মশায়কে বললেন কিশোরীচাঁদ—একটা কাজ করতে হবে মহেন্দ্রবাবু। বইটার একটা কড়া 'রিভিউ' করে দিতে হবে আমার কাগজের জন্যে।

সেদিন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের কথা নিয়েই ফিরলেন কিশোরীচাঁদ। কিন্তু কি যে বিপদের মধ্যে ফেলে গেলেন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে তা যদি জানতেন! তাঁর চিন্তাধারায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। 'হোমিওপ্যাথি দর্শনের' সঠিক সমা-লোচনা করতে হলে তাঁকে হোমিওপ্যাথি বিশদভাবে জানতে হবে। ভালো করে জানতে হলে তার প্রয়োগের ফলাফল লক্ষ্য করতে হবে। নান্যঃ পন্থাঃ। যেই ভাবা, সেই কাজ। বাড়ীর কাছেই রাজেন্দ্র দত্ত। তাঁরই শরণাপন্ন হলেন। হোমিওপ্যাথিতে কি কি রোগ কেমন সারে তা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন বিজ্ঞানী মহেন্দ্রলাল। এবং এক-সময় হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথির ওপর তাঁর বিশ্বাস জন্মে গেল। মহেন্দ্রলালের নিজের ভাষায়: 'আই সিজড্ টু থিঙ্ক হোমিওপ্যাথি ওয়াজ দি গ্রেট হামবাগ দ্যাট ইট ওয়াজ রিপ্রেজেন্টেড।' শিবনাথ শাস্ত্রীও একই কথা বলেছেন: 'হ্যানিম্যানের অব-লম্বিত প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রতীত হইল।'

এই ব্যাপারে আবার অনেকে বিদ্যা-সাগর মশায়কে টেনে আনেন। বিহারীলাল সরকার মশায়ের গল্প এটা। জজ দ্বারকা-নাথ মিত্রের তখন ভারী অসুখ। মহেন্দ্র-ডাক্তার গিয়েছিলেন 'কলে'। গিয়ে দেখেন বিদ্যাসাগর মশায়ও এসেছেন। দ্বারকানাথ বন্ধুলোক। কাজেই অসুখের খবর পেয়েই কালবিলম্ব না করে দৌড়ে আসবেন, এ আর আশ্চর্য কি? মহেন্দ্রলাল রোগী দেখলেন। ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করলেন। তারপর ফেরবার উদ্যোগ। তাঁর নিজের ঘোড়ার গাড়ী। বিদ্যাসাগরকে বললেন, যাবেন, নাকি? বিদ্যাসাগরও অনেক-ক্ষণ এসেছেন। ফিরবেন ভাবছিলেন। বললেন, চল। দুজনেই গাড়ীতে এসে চাপলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

আর সেদিন সেই গাড়ীর মধ্যে বাইরের ঘোড়ার ক্ষুরের একটানা টগবগ টগবগ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বুঝি একচোট জোর তর্কের ঝড় বয়ে গেল। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে নেওয়া হল এক ঐতি-হাসিক সিদ্ধান্ত। অ্যালোপ্যাথির মস্ত ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার হোমিওপ্যাথিকে যাচিয়ে দেখতে রাজী হয়ে গেলেন। মহেন্দ্র-লালের বৈজ্ঞানিক মন না স্বীকার করে পারেনি কার্যকারণে যদি মেলে হোমিও-প্যাথির গুণ তিনি মেনে নেবেন। বিহারী-লাল লিখেছেন: 'গাড়ীতে বিদ্যাসাগর ও মহেন্দ্রলাল সরকারের মধ্যে হয় ক্রমাগত বাদানুবাদ। বিদ্যাসাগর বলেন যে, হোমিও-প্যাথিও যথেষ্ট উন্নত চিকিৎসা। এবং মহেন্দ্রলালের উচিত সে বিদ্যা শিক্ষা করা।' মহেন্দ্রলাল প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাড়বার পাত্র নন। অবশ্য তার কারণ ছিল। একসময় বিদ্যাসাগর নিজেই মাথার যন্ত্রণায় বিষম ভুগেছিলেন। কিছুতেই ভালো হয় না। এ ডাক্তার, সে ডাক্তার, মায় কবিরাজী। সব বিফল। রোগের যখন কোন-ক্রমেই সুরাহা হল না, রাজেন্দ্র দত্তর কাছে হাজির হলেন বিদ্যাসাগর। শিশির পর শিশি ওষুধ খেয়ে যা হয়নি, এক ডোজ হোমিওপ্যাথি পরিয়ায় তাই সম্ভব হল। বিদ্যাসাগর সেই থেকেই হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করতে সুরু করেন।

শুধু নিজের ব্যাপারেই নয়। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের পুরণো বন্ধু। তিনি একবার দারুণ 'পাইলস'এ ভুগে-ছিলেন। ওষুধে ডাক্তারে মেলা বসে গেল। কিন্তু নিরাময় দূরঅস্ত! অবশেষে সেই অগতির গতি হোমিওপ্যাথি। রাজকৃষ্ণ দিব্যি ভালো হয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগরের আস্থা বেড়ে গেল। তারপরও বিদ্যাসাগর স্বয়ং রাস্ক-বই নিয়ে বসে পড়েন। সে গল্প কারো অজানা নেই। তবে এই বিদ্যা প্রচার করতে হলে কোন দিকপাল প্রতিভার ডাক্তারের মদত চাই, 'প্র্যাকটিক্যাল' মানুষ বিদ্যা-সাগরের সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। আর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডির মধ্যে সেই ঈপ্সিত মানুষটিকে পেয়ে থাকবেন তিনি। এবং সেদিনের সেই আলোচনার সূত্রে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নিলেন তিনি!

অবশ্য মহেন্দ্রলাল ছাড়াও সেকালের তাবড় ডাক্তার — বিহারীলাল ভাদুড়ী অন্নদাচরণ খাস্তগীর—অনেককেই তিনি হোমিওপ্যাথি করতে উৎসাহিত করেন। এবং এটা শুধু বিহারীলাল সরকার বা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা নয়। ক্ষুদি রাম বসুও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মহেন্দ্র ডাক্তারকে ত তিনিই একরকম হোমিওপ্যাথিতে হাতেখড়ি দেন।'

রামগোপাল সান্যালের কেতাবে রয়েছে মহেন্দ্র সরকার নিজেও এ ব্যাপারে বিদ্যা-সাগরের প্রভাব স্বীকার করেছেন। আরও একটা ঘটনার কথা বলেছেন তিনি। বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম রচয়িতা সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মাথা, রাজা রাধাকান্ত দেবও নাকি একদা হোমিওপ্যাথিতে খুবই উপকার পেয়েছিলেন। মহেন্দ্রলাল লিখেছেন: 'দি কেস অফ রাজা রাধাকান্ত, দি কনভারসন অফ বিদ্যাসাগর এন্ড দি পারসিসটেন্ট এ্যাপীলস অফ বাবু রাজেন্দ্র ফর এ ফেয়ার হিয়ারিং এন্ড এ্যাবভ অল এ ফেয়ার ট্রায়াল, ফোরসড হোমিওপ্যাথি আপন মাই এ্যাটেনসন।'—অস্যার্থ, 'রাজা রাধাকান্ত

দেবের কেস বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রকাশ এবং বাবু রাজেন্দ্র দত্তর ব্যাপারটাকে ভেবে দেখবার এবং সর্বোপরি পরখ করে দেখার জন্যে বারংবার অনুরোধ হোমিওপ্যাথির প্রতি আমারো মনোযোগ দিতে বাধ্য করে।

তবে কোন্ প্রভাবটি বেশী জোরালো—রাজা রাধাকান্ত দেবের কেস, বিদ্যাসাগর না রাজেন্দ্র দত্তর অনুরোধ-উপরোধ না সব-কয়টি প্রভাবই একই সঙ্গে মহেন্দ্র সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বা মহেন্দ্র সরকার নিজেরই অজান্তে অন্য কোন যুগপ্রভাবে পড়েছিলেন সেকথা হলফ করে বলা শক্ত। তবে এই সব সত্যাসত্য কুয়াশার মধ্যে একটা ঘটনা কিন্তু দিবালোকের মত স্পষ্ট। বহু পয়সার অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস ছেড়ে ডাক্তার সরকার একদা হোমিওপ্যাথি সুরু করে দিলেন। এবং কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়। লুকিয়ে চুরিয়েও নয়। যেই হোমিও-প্যাথির বৈজ্ঞানিক সারবত্তায় তাঁর বিশ্বাস উৎপন্ন হল, তিনি একেবারে ডঙ্কা বাজিয়ে সাড়ম্বরে সেকথা ঘোষণা করলেন। এবং সে কাজ করলেন খাস অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদেরই এক বিরাট সভায়। সেটা সেই ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা শাখার চতুর্থ বার্ষিকী সভা। আঠারশ' সাতষট্টি। ষোলই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। স্থান, মেডিকেল কলেজের থিয়েটার। অদূরে গোলদিঘীর আসন্ন শীতের রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে জমতে সুরু করেছে। পটল-ডাঙ্গার বাড়ীবাড়ীতে শাঁখ বাজছে। কোথাও বা কাঁসরঘন্টা। তখনও বেলগেছিয়া ভিলাতে হিন্দুমেলার অধিবেশন বসেনি। তবে বেশ তোড়জোর চলেছে। বাঙালী মৌজ করে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার 'রোমান্স' পড়তে সুরু করেছে। সেই অবকাশে সেদিনের সভায় মহেন্দ্রলাল কয়েকটা মোক্ষম কথা বলে বসলেন। 'তিনি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সর্বজনবিনিন্দিত কতক-গুলি দোষকীর্তন করিয়া হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন।' দুরারোগ্য কলেরা রোগে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ 'আরসেনিক' ও 'ভেরাট্রাম'এর সফল প্রয়োগের প্রমাণ দিলেন তিনি।

আর যায় কোথা? কেউটে সাপের লেজে পা। মহেন্দ্র সরকার বক্তৃতা শেষ করতে না দেরী—ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের মত সাহেব ডাক্তাররা সব ফোঁসফোঁস করতে লাগল। লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠল। তার মধ্যে সবচেয়ে দাপট ডাক্তার ওয়েলারের। ক্ষেপে গিয়ে একেবারে যা নয় তাই বলতে লাগলেন মহেন্দ্র সরকারকে। তবে নেবুতলার সেই দুঃসাহসী নায়ক ত দমবার পাত্র নন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় দফা যুক্তি দেখাতে উঠলেন তিনি। আর যাই না ওঠা, 'হিন্দু প্যাট্রিয়টের' রিপোর্টার তাঁর প্রতিবেদনে লিখছেন: ওয়েলার টেবল চাপড়ে অসভ্যের মত চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ডক্টর সরকার, ইফ ইউ আটার এ ওয়ার্ড মোর, আই উইল ক্লাইক ইউ আউট অফ দিস রুম'—অর্থাৎ ডাক্তার সরকার আপনি যদি আর একটা কথা বলেন, আপনাকে আমি এই ঘর থেকে বার করে দেব।' সভায় দাঁড়িয়ে তিনি আরও শাসাতে লাগলেন, মহেন্দ্রলাল যদি এই অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকেন তিনি এই সভা বর্জন করবেন। তবে সব ডাক্তারই যে ওয়ে-লারের মত বেহদ্দ পাগলামি করেছিল, তা নয়। অন্যরাও ছিলেন। আর এক ইংরেজ ডাক্তার কলেস বললেন, তা কি করে হয়। এ সভায় মহেন্দ্রলাল সরকারকে তাঁর সমা-লোচনার জবাব দেবার অধিকার দিতেই হবে। ডাক্তার ইউ য়ার্ট সূর্যকুমার চক্রবর্তী প্রমুখেরা কিন্তু ডাক্তার ওয়েলারের কথায় সায় দিলেন। ডাক্তার শ্যামাচরণ মুখুজ্জে করলেন মহেন্দ্রলালকে সমর্থন।

এমনি করে রাতের নাটক জমে উঠল মন্দ নয়। কিন্তু নেবুতলার নায়ক ত মাথা হেঁট করার বান্দা নন। তর্কবিতর্কের চাপানউতোরের মাঝে অনেক রাতে সভা যখন ভাঙল, শীতের কলকাতা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কেবল সভা-ফেরৎ ডাক্তার-বাবুদের কারও পাল্কী বেয়ারাদের চাপা টানা সুর, কারও ফীটনের চাকার শব্দ, ঘোড়ার কদমের আওয়াজ পটলডাঙ্গার পাতলা-ঘুম বাবু-বিবিদের কারও কারও ঘুমের ব্যাঘাত করে থাকবে। তবে সেই সভা থেকে মহেন্দ্রলাল যখন ফিরলেন, সসম্মানেই ফিরলেন। কেননা, তখনও তাঁর বিরুদ্ধে হোমিওপ্যাথি সমর্থনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। তবে সেটা মাত্র কয়েক দিনের জন্যে। অনতিকাল পরেই তাঁকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বাংলা শাখা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আর সেই সঙ্গেই সুরু হল মহেন্দ্র সরকারের ওপর জঘন্য অত্যাচার! একেবারে একঘরে করার ব্যবস্থা। মহেন্দ্র সরকার নিজেই যাকে বলেছেন, 'প্রফেশন্যাল একসকমিউনিকেশন'। শহর কলকাতা সেকি তোলপাড়। কাগজে কাগজে উত্তপ্ত আলো-চনা। সাহেব অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের মহেন্দ্র-লাল সরকারের বাতুলতা নিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন গরম গরম নানা যুক্তির বন্যা বইয়ে দিলেন। তাঁর পোঁ ধরে কাগজে লিখতে লাগলেন ডাক্তার ইউআর্ট। কিন্তু মহেন্দ্র সরকারের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নতুন চিকিৎসায় সহজেই নিরাময় হচ্ছে রোগীরা। রোগ সারছে অনেক অল্প খরচে। হোমিওপ্যাথী গরীবের চিকিৎসা। তাতেই তিনি খুশি। মশগুল। সেই আনন্দেই তিনি বিভোর। সকল বাধাবন্ধ হেলায় তুচ্ছ করে' সেই দুঃসাহসী মানুষটি স্থির বিশ্বাসে স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে এগোতে লাগলেন। একটুও টললেন না।

টললেন না শত অত্যাচারেও। ঊনিশ শতকের বাংলাদেশের দ্বিতীয় ধন্বন্তরী মহেন্দ্র সরকারকে একঘরে করা হল যাতে তাঁর কাছে রোগী না যায়। তাঁর ডাক্তারি প্র্যাকটিস বন্ধ হয়ে যায়। মহেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন, 'প্রফেশন্যাল কমবিনেশন ইজ স্ট্রং এগেনস্ট মি। এন্ড ইজ লাইকলি টু বি স্ট্রংগার। এভার ওয়ানস আমস' সীমস টু বি এগেনস্ট মি।' অর্থাৎ 'আমার বিরুদ্ধে একই জীবিকার জোট বেশ জবর। কালক্রমে এই জোট আরও জোরদার হবার আশঙ্কা। আমার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই দেখি খড়্গহস্ত।' অবস্থা এমনি সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, মহেন্দ্র সরকারের কাছে একদম রোগী আসত না। সেদিনের দুঃসহ অবস্থার কথা লিখে শিবনাথ শাস্ত্রীমশায় জানিয়েছেন, 'ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না।' বন্ধুবান্ধবরা স্বভাবতঃই খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ হয়ত বা ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। জিগ্যেস করে থাকবেন, এমনি চললে খাবে কি? শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন, বুকটান করে জবাব দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সরকার, 'আমি চাষীর ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব, তাতে কি? কিন্তু সত্য যা তা ত বলতেই আর করতেই হবে।' করেও ছিলেন তাই। শেষ পর্যন্ত এই কঠিন লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলা-বাহুল্য, সে লড়াই ফতে করেছিলেন। তাঁর আদর্শ, তাঁর বিবেককে একটুও ছোট, সামান্যতম খর্ব করেননি তিনি। এবং এক-সময়ে দেখা গেল, সারা দেশের মানুষ তাঁর হিমাচলের মত ব্যক্তিত্বকে, তাঁর দুঃসাহসী মনকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। নতমুখেন মানুষ মাথা হেঁট করে তাঁকে সেলাম বাজাচ্ছে!

আরও দেখা গেল, যত দিন যেতে লাগল, নেবুতলার সেই অসমসাহসী নায়কের চারিধারে বাঙালীরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা'—ইন্ডি-য়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়ান্স' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলেন তাঁর চিকিৎসা-বিষয়ক কাগজ—'ক্যালকাটা জারনাল অফ মেডিসিনে'। এই সভার 'প্রসপেকটাস' বেরল হিন্দু প্যাট্রিয়টের পাতায়। বঙ্কিমের নজর পড়ল এই গুরুত্বর বিষয়ে। তিনি এর বাংলা করে সেটার

সঙ্গে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার ওপর একটা প্রবন্ধই লিখে ফেললেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন তাঁর দয়ার ভাণ্ডার নিয়ে এই জাতীয় সৃষ্টিযজ্ঞে। কলকাতার বাঙালী বলতে যাঁরা—তাবৎ সবাই এলেন এগিয়ে। 'ডোনারদের' লিস্টিতে' বেঙ্গলী কাগজের পাতা ভরে যেতে লাগল। পাথুরেঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, জজ রমেশ মিত্তির, মৌলভী আবদুল লতিফ খান, বিদ্যাসাগর সবাই 'ট্রাস্টী' হয়ে এলেন 'বিজ্ঞানসভার' মহেন্দ্র সরকারের পাশে। ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পল হলেন সভাপতি। তিনিই বিপুল সমারোহে বৌবাজারের বিজ্ঞানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। মহেন্দ্রলাল নিজে সারগর্ভ ভাষণ দিলেন ছবি দেখিয়ে। পরোজ রাগিণীতে সবাই মিলে গান গাইলে : 'বিজ্ঞান সাধনে হও আগুয়ান, উৎসাহ যতনে প্রিয় ভারত সন্তান।...

হিন্দু-যশ-সৌরভে ধরা আমোদিত হবে, ভারত-জননী পুনঃ পাইবেন মান।।' আঠারশ' ছিয়াত্তর। উনত্রিশে জুলাই। সারা দেশ তখন সাহেবদের অচ্ছুৎ এই মানুষটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তাঁর হোমিওপ্যাথির প্রতি আস্থা তখন সারা জাতির। নবযুগের মানুষের মনে নব ভাব।

আর এই ভাব নিয়েই নতুন ভাবনা। ভাবনা এই যে নবযুগের এই নবভাব—'হিউম্যানিজম'ও কি মহেন্দ্র ডাক্তারকে হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট করেছিল? যুগের হাওয়ার কি কিছু ভূমিকা ছিল এ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে উত্তরণে? উনবিংশ শতকের সেই মানবিকতার ঢেউ যা বাংলা সাহিত্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, চিন্তায়, সাধনায় প্লাবন এনেছিল, তা' কি মহেন্দ্রলালকেও অভিভূত করেছিল, রেহাই দেয়নি? দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধনী কাব্য' প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করেন মহেন্দ্রলালকে। উৎসর্গ পত্রে দীনবন্ধু একটি ঘটনার উল্লেখ করেন :

'কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি একদিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি লোক,—বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে: তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ওষুধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ একপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীব মনোরম—ইচ্ছা হইল আলেখ্য লিখিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই।' বলাবাহুল্য, 'সুরধনী কাব্যে' সেকাজ করেছিলেন দীনবন্ধু। 'ভিষক্-কুল-পঙ্কজ-সবিতা' মহেন্দ্রলাল সরকার সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'নানা বিদ্যা বিশারদ মহেন্দ্রপ্রবর,
নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ার সাগর,
উষায় বসিয়া ঘরে করে বিতরণ
অকাতরে দীনবন্ধু ঔষধ-রতন'।

এই যে দীনজনে দয়ার সাগরের ঔষধ বিতরণ—এই যে মানবিকতা, যার কথা মহেন্দ্রলাল তাঁর জবানবন্দীতে একদা বলেওছিলেন যে তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়, রোগীদের যে কল্যাণ হয়েছিল, আর্তের যন্ত্রণায় যে শান্তি দিয়েছিল তার তুলনায় তাঁর উপর বিরোধীদের অত্যাচার কিছুই নয়—'নাথিং কমপেয়ারড্ টু দি বেনিফিটস মাই পেসেন্টস এনজয়েড'—এটাও বোধ করি তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বেছে নেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথি প্রচারের আদিকালে রাজেন্দ্র দত্তর পাশে ছিলেন ডাক্তার বেরিনি। অন্যান্য বিদেশী ডাক্তারদের মতো দেশে ফেরার সময় মোটা টাকার ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে পারেননি এই ডাক্তার সাহেবটি। তাঁর বিদায়-সংবর্ধনা সভায় দুঃখ করে' বলেছিলেন রাজেন্দ্র দত্ত মশায়, কত সাহেব কত বড় বড় টাকার বাণ্ডিল নিয়ে গেল, আর তুমি যাচ্ছ শূন্যহাতে। জবাবে বেরিনি নাকি হেসে বলেছিলেন, 'কে বলে? আমার পকেটে পাঁচ হাজার টাকার চেক। রাজেন্দ্রবাবু ত অবাক। বললেন, কি রকম? বেরিনি বুঝিয়ে বললেন, মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছে—তার দামই ত পাঁচ হাজার টাকা। তাঁর সেই বিদায় সভায় বেরিনি নাকি আরও বলেছিলেন, সূর্য উঠলে চাঁদের আর দরকার হয় না। মহেন্দ্র সরকার হোমিওপ্যাথির সূর্য!

বেরিনি সাহেবের উপমা মোটেই অত্যুক্তি নয়। তবে এটা ঠিক এই সূর্যকে কোন সুন্দর সহাস্য প্রভাত সাদর অভ্যর্থনা জানায়নি। এলোপ্যাথ সাহেব ডাক্তারদের চক্রান্তের ঘন কালো মেঘ, তাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের দৃষ্টিরোধকারী কুয়াশা—এই সূর্যের অভ্যুদয়কে ব্যাহত করতে চেষ্টা করেছিল। তবে ধন্যারি পাপঘ্ন সূর্য বলেই না তাকে আটকান যায়নি। রোগী বন্ধ করেও না। কেশব সেনের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' অভিনয়, বঙ্কিমের উপন্যাস বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোম প্রকাশে'র আবির্ভাবের মতই মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথ আন্দোলন বাংলাদেশের নবযুগকেই দ্রুত সম্ভব করে তুলেছিল, সন্দেহ নেই।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিশ বছরের পত্রগুচ্ছ—(২)

গত সপ্তাহে এই বিভাগে এক বিচিত্র পত্র-সাহিত্যের আংশিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে —এই সংখ্যায় তার পরবর্তী অংশ পরিবেশিত হচ্ছে।

৯ এপ্রিলের চিঠির শেষে মার্কস্ অ্যান্ড কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রেরিত উপহার 'এলিজাবেথান পোয়েটস' পেয়ে হেলেন লিখলেন ১৬ এপ্রিল সবাইকে সম্বোধন করে—

"ধন্যবাদ, কি সুন্দর বই। আগে এমন সোনার জল দিয়ে মোড়া বই কখনও হাতে করিনি। বিশ্বাস করবেন না হয়ত, বইটি আমার জন্মদিনেই হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনারা বইটির পৃষ্ঠাতেই উপহার-বাক্য উৎকীর্ণ না করে আলাদা কার্ডে লিখেছেন কেন? পুস্তক-ব্যবসায়ীর মনোভংগী একেবারে ফুটে উঠেছে। ভেবেছেন হয়ত সেভাবে লিখলে বইটার মূল্য হ্রাস পাবে। কিন্তু বর্তমান মালিকের কাছে এর দাম বাড়ত! আপনারা নাম সই করেন নি কেন, সবাই মিলে? বোধহয় ফ্রাঙ্ক আপনাদের লিখতে দিত না। ও হয়ত চায় না আর কাউকে আমি প্রেমপত্র দিই!"

সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধু ম্যাকসিনে লিখলেন হেলেনকে ডিয়ার হার্ট সম্বোধন করে :

"আমাদের চমৎকার পুরানো বই-এর এই দোকানটি চমৎকার। একেবারে ডিকেন্সের বই-এর পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। দোকানটি দেখে একেবারে মুগ্ধ হবেন।

ভিতরটা অন্ধকার। দোকানটি চোখে পড়ার পূর্বে এর গন্ধ পাবেন। চমৎকার গন্ধ। ঠিক যে কি বলা সহজ নয়, তবে এতে আছে ধূলি আর ধূসরতা। বই একেবারে ছাদ ছুঁয়েছে, দেওয়াল আর মেঝে সবই কাঠের। আর বই-এর সেলফ্ যেন শেষ হতে চায় না। তার ওপর অনেক বছরের ধুলো।

একটা লম্বা টেবলে আছে চমৎকার ইংলিশ ব্যঙ্গচিত্র, এই সব চিত্রকর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না—আর কিছু সচিত্র পুরাতন পত্রিকা আছে। আমি আধ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করেও আপনার ফ্রাঙ্ক বা অন্য কাউকে দেখতে পাইনি। তবে তখন একটা বাজে—সবাই বোধহয় টিফিনে গিয়েছিলেন। আমি অপেক্ষা করতে পারিনি।..."

১৫ অক্টোবর তারিখে হেলেন ম্যাকসিনেকে লিখলেন : "তোমার মঙ্গল হোক। কি অপূর্ব বর্ণনা। আমি তিক্ততার আমেজ না এনে বলতে চাই, কোন পুণ্যবলে ঈশ্বর তোমাকে আমার বই-এর দোকানে পাঠিয়েছেন এদিকে আমি ৯৫তম স্ট্রীটে টি, ভি-র জন্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব এলেরী কুইনের স্ক্রিপট তৈরী করছি।"

সামুয়েল পেপিস-এর ডায়েরী সম্ভবত হেলেন চেয়েছিলেন এবং ফ্রাঙ্ক হয়ত কোনো এক সংস্করণ (সংক্ষেপিত) পাঠিয়ে থাকবেন—সেই গ্রন্থ পেয়ে হেলেন লিখল :

"ফ্রাঙ্ক : এটা পেপিসের ডায়েরী নাকি! এ কোনো ম্যাতব্বর সম্পাদক কর্তৃক 'পেপিস ডায়েরী'র সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ। এ বইটিতে থুতু ফেলা যায়।

১২ জানুয়ারী ১৬৬৯-এর পৃষ্ঠা কই? যেখানে তাঁর স্ত্রী একটি জ্বলন্ত শিক নিয়ে বিছানা থেকে উঠিয়ে তাড়া করেছিলেন সেই বিবরণ দেওয়া আছে? আপনি আমাকে আসল পেপিস পাঠান, টাকা পাঠালাম, তারপর এই বাজে বইটা পাতার পর পাতা ছিঁড়ে তাই দিয়ে জিনিষপত্র মুড়ব।"

এই সংগে আবার সহৃদয় প্রশ্ন আছে, বড়দিনের জন্য টাটকা ডিম ডেনমার্ক থেকে পাঠাব না পাউডার করা ডিম? ভোট নিয়ে মতামত জানাবার অনুরোধও আছে।

এই চিঠি পেয়ে ফ্রাঙ্ক মিস হানফকে ত্রুটী স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন। তিনি বললেন—বিশ্বাস করুন আমি ভেবেছিলাম এইটাই একেবারে নির্ভেজাল পেপিস! আমি একটা উপযুক্ত মূল্যের ভালো কপি পেলেই আপনাকে পাঠাব।

এই সূত্রে তিনি জানালেন যে একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী সংগ্রহ থেকে 'লে হান্ট' সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই সংগে ভলগেট ও নিউ টেসটামেন্ট।

আর ডিম সম্পর্কে মন্তব্য—এখানকার সকলের মত টাটকা ডিমই ভালো হবে।

বই পেয়ে ভারী খুসী মিস হানফ্। তিনি লিখলেন—আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। 'লে হান্ট', ভলগেট আর 'নিউ টেসটামেন্ট' সব এক সংগে একেবারে। আপনার হয়ত স্মরণে নেই, প্রায় দু বছর পূর্বে আমি এসব বইগুলির অর্ডার দিয়েছিলাম। ...সত্যি আমার জন্য যা করছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তা না করে আমি কেবল খোঁচা দিই। চিঠিটার ওপরে একটু কফি চলকে পড়েছে তার জন্য দুঃখিত।"

এরপর ফ্রাঙ্ক একটি বড় চিঠি লিখে জানালেন যে ডিম যথাসময়ে এসেছে। তার সিংহভাগ দেওয়া হয়েছে জর্জ মার্টিন নামক একজন বয়স্ক কর্মচারীকে, কারণ তিনি অনেক দিন ধরে অসুস্থ। এরপর দোকানের কর্মচারীরা সকলে মিলে একটা ছোট্ট ক্রিসমাস উপহার পাঠালেন বড়দিনের জন্য। একটি হাতে কাজ করা টেবলক্লথ। ক্রিসমাস গ্রিটিংস এবং নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ সেই উপহারের সংগে মার্কস অ্যান্ড কোম্পানীর নাম লেখা।

এর পরের চিঠিটি লিখলেন ফ্রাঙ্কের স্ত্রী নোরা ডোয়েল ২০শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে, তিনি জানালেন—

"অনেক দিন ধরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো মনে করি আমাদের সংসারে আপনার প্রেরিত উপহারের অংশের জন্য —এখন একটা সুযোগ এসেছে, আপনি নাকি জানতে চেয়েছেন যে ভদ্রমহিলা টেবলক্লথের লিনেনটিতে সূচিকর্ম করেছেন তাঁর নাম? কাজটি চমৎকার—তাই না? তাঁর

নাম মিসেস বলটন—তিনি পাশের বাড়ি ৩৬ নম্বরে থাকেন। তাঁর হাতের কাজ এটলান্টিক পার হয়ে যাবে শুনে তিনি আনন্দিত হয়েছেন খুব। আমাদের সুখী পরিবারের একটা ফটো আপনাকে শীঘ্রই পাঠাব। আমাদের বড় মেয়ে শীলা গত আগস্ট মাসে বারোয় পড়েছে, সে আমার রেডি-মেড কন্যা; ফ্রাঙ্কের প্রথমা স্ত্রী যুদ্ধের সময় গত হয়েছেন। আমাদের কনিষ্ঠা কন্যা মেরী গত বসন্তকালে চার বছরে পড়েছে। শীলা যে কনভেন্টে পড়ে সেখানকার নান-রা বিস্মিত হয়েছিলেন শীলা যখন আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠালো। শীলা বলেছিল ড্যাডি আর মামির মাত্র চার বছর বিয়ে হয়েছে। পরে অনেক করে তাঁদের সব বোঝাতে হয়।

আপনি আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা নিন। আপনাকে ইংলণ্ডের মাটিতে দেখবার বাসনা আছে।...

এরপর হ্যানফ তাঁর লণ্ডনস্থ বন্ধু ম্যাকসিনেকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন—তোমার মার কাছে শুনলাম তুমি নাকি দু ডজন নাইলনের জোড়া নিয়ে গেছ লণ্ডনে। আমার জন্য চারজোড়া বুকসপে নিয়ে গিয়ে ফ্রাঙ্ককে দেবে। বলবে, তাঁর তিন কন্যা এবং স্ত্রীর জন্য এই উপহার। ও'রা আমাকে হাতে কাজ করা আইরিশ লিনেনের টেবলক্লথ দিয়েছেন। আমার কাজের জন্য এলেরী কুইন স্ক্রিপট্ ২৫০ ডলার বাড়িয়েছেন। যদি জন পর্যন্ত চলে তাহলে আমি ইংলণ্ডে যাব এবং নিজের চোখে বুকসপ দেখব...তাদের জানাবো না আমার পরিচয়—"

এই নাইলন উপহার পেয়ে ফ্রাঙ্ক মহা খুসী। লিখলেন—"কি করে পাঠালেন! অবাক করে দিয়েছেন। আমার মেয়েরা আপনাকে চিঠি দেবে স্থির করেছে। আপনার অজস্র উপহার পাচ্ছি। কি ধন্যবাদ দেব। যদি কখনও ইংলণ্ডে আসেন তাহলে যতদিন থাকবেন, আমাদের বাড়িতে আপনার জন্য একটি বিছানা পাবেন।'

এইভাবে আরো অনেক চিঠি চলল। অনেক বই সংগ্রহ করল হেলেন হ্যানফ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইংলণ্ডে যাওয়া হল না। যে বাসায় তারা থাকত সেই বাসাটি সরকার ভেঙে দিচ্ছেন রাস্তা উন্নয়নের জন্য। ফলে নতুন বাড়িতে যেতে হল। সেখানে নতুন আসবাব ইত্যাদি কিনতেই ইংলণ্ড যাওয়ার জমানো টাকা খরচ হয়ে গেল।

১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ৮ জানুয়ারী তারিখে মার্কস অ্যাণ্ড কোম্পানীর তরফে তাঁদের সেক্রেটারি মিসেস জোয়ান টড হেলেনাকে একটি চিঠিতে লিখলেন :

...৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা ফ্রাঙ্কের নামে পাঠান চিঠি এই মাত্র দেখলাম। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ২২ ডিসেম্বর রবিবার দিন [illegible] পরলোক গমন করেছেন। তাঁর অ্যাপেনডিক্স ফেটে যাওয়ায় অপারেশন করতে হয়। দুঃখের বিষয় পেরিটোনাইটিস আক্রমণ করল এবং সাতদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি এই দোকানে চল্লিশ বছর কাজ করেছেন, তাই এই মৃত্যু মিঃ কোহেনের কাছে বিশেষ বেদনাদায়ক হয়েছে। বিশেষ করে মিঃ মার্কসের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এই ঘটনা ঘটল। আপনার জন্য 'অস্টেনস' সংগ্রহ করব কি?'

জানুয়ারী মাসে নোরা একটি চিঠি পাঠালেন হেলেনকে..."আমি চারদিক থেকে ও'র জন্য চিঠি পাচ্ছি। বই ব্যবসায়ে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই প্রশস্তি জানিয়েছেন। বই-এর ব্যাপারে উনি অনেক জানতেন এবং সকলকে সাহায্য করতেন। যদি চান আপনাকে সেসব পাঠিয়ে দেব। আপনাকে বলতে বাধা নেই আপনার ওপর মাঝে মাঝে ঈর্ষা হত—আপনার চিঠি ফ্রাঙ্কের ভালো লাগত, বিশেষ করে আপনার রসিকতার সঙ্গে তাঁর মনোভঙ্গীর মিল ছিল। আপনার লিপিকুশলতার আমি হিংসা করতাম। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পর-বিরোধী চরিত্র। উনি ভদ্র এবং সহৃদয় আর আমি সংগ্রামী। সর্বদাই অধিকার আদায়ের চেষ্টায় লড়ছি। উনি আমাকে বই বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আমার মেয়েরা ভালো। ওদের জন্য আমি খুসী। ভাবি পৃথিবীতে আরো অনেকেই ত আমার মত নিঃসঙ্গ।"

সেই বছর ১১ এপ্রিল তারিখে নোরা চিঠি লিখলেন তাঁর এক বান্ধবী ক্যাথরিনকে—

—জানো, ব্রায়ান আমাকে প্রশ্ন করেছিল—তোমার যদি ইংলণ্ডে যাওয়ার ভাড়া থাকত, সত্যি যেতে?

এ-কথায় আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমি জানি না, তবে কোনো দিনই ওখানে না যাওয়াই শ্রেয়। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি। আমি বিলাতী ছায়াছবি দেখতাম, ইংলণ্ডের পথঘাট কেমন, তা দেখার জন্য।

যে ভদ্রলোক আমাকে সব বই বিক্রী করতেন তিনি কয়েক মাস পূর্বে গত হয়েছেন। দোকানের মালিক মিঃ মার্কসও নেই। তবে মার্কস অ্যাণ্ড কোম্পানী আজো আছে। তুমি যদি ৮৪, চেয়ারিং ক্রসে যাও তাহলে আমার হয়ে সেই বাড়িটি চুম্বন করবে। আমি ওর কাছে অনেক ঋণী।"...

এইখানেই পত্রগুচ্ছের সমাপ্তি। দুঃখের বিষয় এই চিঠি লিখিত হওয়ার কুড়ি মাস পরে মার্কস অ্যাণ্ড কোম্পানীর ব্যবসা উঠে যায়, আর ৮৪ নম্বর চেয়ারিং ক্রসের বাড়িটাও নেই, উন্নয়ন ব্যবস্থায় সে বাড়ি ভাঙা হয়েছে।

এই পত্রগুচ্ছগুলির সংক্ষিপ্ত যে পরিচয় দেওয়া হল তার মধ্যে মানবমনের এক সুগভীর সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের গ্রন্থও সচরাচর চোখে পড়ে না।

—অভয়ঙ্কর

* 84, CHARING CROSS ROAD — By HELEN HANFF Publishers: ANDRE DEUTSCH · LONDON: Price 40 Shillings only.

সাহিত্যের খবর

শিরোনাম : সন্তোষকুমার ঘোষ

প্রায় দু যুগ আগের কথা। সবে বেরিয়েছে একটি উপন্যাস। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে গেল। দারুণ সাড়া জাগাল পাঠকমহলে। বইটির নাম 'কিনু গোয়ালার গলি'। লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। আর ঐ আলোড়নকারী উপন্যাসটি হল লেখকের প্রথম উপন্যাস। সেই আপন সৃষ্টির স্বয়ং নায়ক সন্তোষকুমার ঘোষ পেলেন এবারের সাহিত্য আকাদমির পুরস্কার। ১৯৭২ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের জন্য এই সর্ব-ভারতীয় সাহিত্য পুরস্কার।

'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে' হল তাঁর আকাদমি সম্মানিত উপন্যাস। অননুকরণীয় রীতিতে লেখা বাংলাভাষার অনন্য নজির এই উপন্যাসটি লেখকের নিজস্ব জীবনের এক আশ্চর্য অশ্রুলিপি। একজন পরিণত বয়স্ক মানুষ নিজেকে যেন দেখলেন ফালা ফালা করে। নিজের স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতকে ঘিরে গাঁথলেন শব্দমালা, চিত্রলিপি। ঘরোয়াভাবেই মাকে শোনালেন নির্মম নিষ্ঠুর নিজের কথা। কখনো স্বীকারোক্তি করছেন কখনো লিখছেন যেন চিঠি, করছেন স্মৃতিরোমন্থন। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস। আন্তরিক হ্যাঁ মানবিক অনুভূতিতে বড়ো বেশি আন্তরিক এক পরিণত বয়সের মানুষ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন সত্যের স্বরূপ। কড় নির্মম সত্যকে শেখালেন চিনতে।

সাহিত্যের প্রায়-সব শাখাতেই রয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, এমনকি কবিতাও তিনি লিখেছেন। এখনো লিখছেন। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, ভাষার কারুকার্য, বুদ্ধির দীপ্তি, চিন্তার মৌলিকতা, সর্বোপরি মানবিক অনুভূতির প্রকাশে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাসাহিত্যে সন্তোষকুমার ঘোষ একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর কিনু গোয়ালার গলি, নানা রঙের দিন, মোমের পুতুল মুখের রেখা, জল দাও, স্বয়ং নায়ক, রেণু, তোমার মন, ত্রিনয়ন, শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মা-কে, সময়, আমার সময় প্রভৃতি উপন্যাস; অজাত, অপার্থিব নাটক; প্রবন্ধ সংকলন 'সোজাসুজি', কুসুমের মাস, চীনে মাটি, শ্রেষ্ঠ গল্প, কাঁড়ুর ঝাঁপি প্রভৃতি ছোটগল্পের সংকলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আকাদমি পুরস্কৃত আরো কয়েকজন

বাংলাভাষাকে বাদ দিলে আরো বারোটি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক

১৯৭২-এর আকাদামী পুরস্কার। ইংরেজি, গুজরাতি, সোমিলা, সংস্কৃত, উর্দু ভাষায় কোন বই এবার পুরস্কার পায়নি। অসমীয়া সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী... আত্মার কাহিনী, উপন্যাস, সৈয়দ আব্দুল মালিক; হিন্দি : বাণী হোই রুসসি, কাব্যগ্রন্থ, ভবানীপ্রসাদ মিশ্র; কানাড়া : শূন্যসম্পাদনের পরামর্শে, ভাষ্য, এস এস ভুসনুরমথ; কাশ্মীরী : শুইয়া, নাটক, আলি মহম্মদ লোন; মালয়ালম : ওরু দেসাথিনতে কথা, উপন্যাস, এম কে পোট্টেক্কাট্; মারাঠি : জেভা মানুষ জাগা হোতো, আত্মকথা, গোদাবরি পারুলেকার; ওড়িয়া : মনোজ দাসঙ্ক কথা ও কাহিনী, ছোটগল্প সংকলন, মনোজ দাস। এছাড়া পাঞ্জাবী, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু ভাষার লেখকগণ পুরস্কার লাভ করেন।

পশ্চিম বার্লিন থেকে

অনেকের হয়তো মনে আছে সে-কথা। মাত্র কয়েক মাস আগেরই ঘটনা। নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন জার্মান লেখক হাইনরিশ বোয়েল। এবং তাঁর কথা বলতে গিয়ে অমৃতে প্রকাশিত হয়েছিল একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাহিনী। বোয়েল ছিলেন তাঁদেরই একজন। সেই সাহিত্য-গোষ্ঠীর নাম 'গ্রুপ ৪৭'।

ঠিক পঁচিশ বছর আগের এক সেপ্টেম্বর। হানস ভেরনার রিশটার আমন্ত্রণ করলেন পনেরোজন তরুণ লেখককে। বাভারিয়ার ফ্যুসেনের কাছে লেখিকা ইলসে স্নাইডার লেফেলের ঘরে বসল আসর। জমজমাট আদল পেল কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডাটি। যে যাঁর নিজের লেখা কবিতা পড়লেন, পাঠ করলেন স্বরচিত ছোটগল্প। কেউ কেউ পড়ে শোনালেন নিজের লেখা অপ্রকাশিত উপন্যাসের অংশবিশেষ। তারপর চলল আলোচনা। ঝাঁঝালো সুরেই একে অপরের দোষ-গুণ ধরিয়ে দিলেন খোলাখুলি।

এই আসরটিই জন্ম দিল একটি গোষ্ঠীর। সাহিত্যজগতে তাঁরা পরিচিত হলেন 'গ্রুপ ৪৭' নামে। যুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্যে, বিশেষ করে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির সাহিত্য-আন্দোলনে এই গোষ্ঠীর লেখকদের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজো এই গ্রুপের চিন্তাভাবনা পশ্চিম জার্মানির তরুণতর লেখকদের মধ্যে বেশ জোরালো।

হানস ভেরনার রিশটার এক সময় এই গোষ্ঠীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, এটা নিছক কিছু লেখককে পাদ-প্রদীপের সামনে নিয়ে আসার জন্য তৈরি হয়নি। বরং রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে যাঁরা কমিটেড অথচ সাহিত্যিক হবার জন্য চেষ্টার বালাই নেই, তাঁদেরই চোখের মণি 'গ্রুপ ৪৭'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ের প্রথম দিককার ঘোড়ো আবহাওয়ার কথা মনে রাখলেই এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সহজে ধরা পড়বে।

প্রাগুক্ত এই গ্রুপের সদস্য ছিলেন সাহিত্য-সমালোচক ওয়াশিম কাইজার। তিনি বলেছিলেন, এই গ্রুপের সদস্যদের সাফল্য যেমন দলগতভাবে ঘটেছে তেমনি হয়েছে ব্যক্তিগতভাবেও। এর সত্যতা যাচাই হয়েছে সময়ের কাছ থেকেই। তাই গ্রাস, ভালসার, বোয়েল, বাখমান, এনসেনবার্গার, আইখ, হাইসেনব্যুটেল, আইসিংগার, হিল্ডেসাইমার, হ্যোলেরার, ব্যমকর্ফ এবং আরো অনেক লেখকই ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

মাঝখানে সাহিত্যিকদের এই স্বর্গ গিয়েছিল ভেঙে। কেউ কেউ খেয়েছিলেন নিষিদ্ধ ফল। ব্যক্তিগত কন্দুয়ে ধরেছিল চিড়, কাজকর্মের তাগিদেও কেউ কেউ এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়েছিলেন। অবশেষে আবার তাঁরা মিললেন। মিলেছিলেন ঐতিহাসিক মে দিবসে। নানান দেশের শ্রমিকরা যখন পালন করছেন মে-দিবসের উৎসব, তখন পশ্চিম বার্লিনের হানস ভেরনার রিশটারের বাড়িতে বসল মজলিস। পুরনো দিনের লেখকবন্ধুরা হলেন জড়ো, বয়সের বাঁধ গেল ভেঙে, ফিরে পেলেন যৌবনের দিনগুলি, রাত গুলি। গ্রাস, জনসন, ক্রুগে, ভাই, হ্যোলেরার, ভোমান, সালুক, শন্দুরে, হাউম-গার্ট কাঁপিয়ে তুললেন আসর। হাল্কা চালের কথাবার্তার মাঝখানে কেউ কেউ বেশ তত্ত্বকথা জুড়লেন। কখনো বোয়েলের কথা, কখনো আবার বাখমান, আইসিংগার, হিল্ডেসাইমার, ভালসারের কথা বারবার ঘুরেফিরে এল। চলল স্মৃতিরোমন্থন, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও।

সকলেই বললেন, সাহিত্যে অনেক এলোমেলো হাওয়া বইলেও আজো 'গ্রুপ ৪৭'-এর প্রভাব সক্রিয়। তাঁদের সমাজ-সচেতনতা পশ্চিম জার্মানির সাহিত্যিকদের মধ্যে আজো স্পষ্ট।

যুগোশ্লাভিয়ার হৃদয় হতে

যাঁরা দেশ-বিদেশের সাহিত্যের খবরা-খবর রাখেন তাঁদের কাছে যুগোশ্লাভিয়ার লেখক ইভো আন্দ্রিক মোটেই অপরিচিত নন। ১৯৬১ সালে তিনি পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। সম্প্রতি তাঁর ৮০তম জন্মদিন যুগোশ্লাভিয়ায় পালন করা হলো বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে। এই উপলক্ষে নানান রকমের সম্মানও দেখানো

হয় তাঁকে। পেলেন কয়েকটি রাষ্ট্রীয় পদক। জনসাধারণের অফুরন্ত ভালোবাসারই স্মারকচিহ্ন রাষ্ট্রীয় পদক।

রাষ্ট্রপতি টিটো দিলেন অর্ডার অব হিরোজ অব সোস্যালিস্ট লেবার। যুগোস্লাভিয়া এবং হের্জেগোভিনার রাজধানী সারাজেভোর এক অনুষ্ঠানে তাঁকে জানানো হয় বিশেষ সম্বর্ধনা। তাঁর জন্মস্থান গ্রাভানিকের প্রথম নাগরিক হিসেবেও পান তিনি বিশেষ সম্মান।

মুক্তির সন্ধানে ভারত—কংগ্রেস পূর্ব যুগ (প্রবন্ধ সংকলন) যোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক : দি মডার্ণ পাবলিশার্স, ৮ ঞ, কলেজ রো। দাম ১৭ টাকা।

কংগ্রেস গঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। তারপরই জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় ছয় দশক পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ঐ আরম্ভের আগে আর এক আরম্ভের ইতিহাস আছে, কবির ভাষায় যাকে বলা যায়, সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানোর কাহিনী। প্রখ্যাত গবেষক লেখক যোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থটিতে ঐ 'সকাল বেলার সলতে পাকানোর কাহিনী' পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পরলোকগত লেখকের উল্লেখিত গ্রন্থটি অবশ্য কোন সাম্প্রতিক কালের রচনা নয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ তেত্রিশ বছর আগে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তখন তার ভূমিকা লেখেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঐ ভূমিকাতে বলা হয়—'যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাহা ভারতের নব-জাগরণের বা রেনেসাঁর ইতিহাস।'

যোগেশবাবুও তাঁর ভূমিকায় লেখেন, ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়। ঐ সময় থেকে সাহিত্য বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ললিত—কলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন জীবনস্পন্দন অনুভূত হয়।' দীর্ঘ পঁচাশী বছর যাবৎ ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালী, যে একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সাধনা করছিল তার একদিক মাত্র প্রথমে কংগ্রেসে রূপ পেল। 'প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর, বিশেষ করে বাঙালির ঐ কংগ্রেস পূর্ব পঁচাশি বছরের জাগরণ ও সংগঠন তৎপরতাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তবে প্রথম মুদ্রণকালে গ্রন্থটিতে যোগেশবাবুর লেখা 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'টি ছিল না। আলোচ্য সংস্করণে ঐ অধ্যায়টি সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটির একটি বড় ফাঁক পূরণ হয়েছে।

মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর দেশে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ইংরেজ শাসনকালে তার অবসান ঘটে এবং সেদিনের শান্ত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে নব যুগের সূচনা হয়। ঐ যুগে যাঁরা আবির্ভূত হন মোটামুটিভাবে তাঁরা সকলেই ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম কেউ তার ব্যতিক্রম নন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিরাট এক অভ্যুত্থান ঘটলেও দেশের ইংরেজি শিক্ষিত মহল ঐ অভ্যুত্থান থেকে অনেক দূরে ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে তার সবগুলির সঙ্গেই ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল এবং কংগ্রেসও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

১৮৩৮ সালে গঠিত হয় জমিদার সভা—বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন থিওডর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব ও দুজন সম্পাদক হন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক উইলিয়াম কব হ্যারি। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে বিলাতে গঠিত হয়—বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। ১৮৫১ সালে ঐ দুই প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে গঠিত হয় 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' যাকে ইংরেজ শাসিত ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলা যায়। ১৮৬৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু হয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'হিন্দু মেলা' তার উদ্দেশ্য 'হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা' হলেও জাতীয় চেতনার উন্মেষে তার ভূমিকা সামান্য ছিল না। তারপর ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে গঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা। এই সবকটি সংগঠনই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রপথিক। তবে ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে ভারতের সদ্য জাগ্রত জাতীয় চেতনার প্রথম সংঘর্ষ হয়, দু'বছর পরে গঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস।

উল্লেখিত সংগঠন ও আন্দোলনগুলির ইতিহাস অতি নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে যোগেশবাবু তাঁর 'মুক্তির সন্ধানে ভারত-কংগ্রেস পূর্ব যুগ' গ্রন্থটিতে আলোচনা করেছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ গ্রন্থ ইতিহাস, রাজনীতি ও সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে একটি অপরিহার্য আকরগ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। বইটির ছাপা প্রায় নির্ভুল, প্রচ্ছদপটটিও সুকল্পিত। তবে দাম একটু কম হলেই ভাল হত।

জলের গভীর (কাব্য সংকলন)—শরৎসুনীল নন্দী। অর্ণব প্রকাশনী ১, ছাতুবাবু লেন, কলকাতা—১৪। তিন টাকা।

'বিষণ্ণ স্বপ্নরাবে। অশ্রুময় নক্ষত্রেরা ক্লান্ত হয়ে ঝরে ছায়া জলে', 'বুকের মধ্যে আর একটা বুক হাতছানি দেয়', 'অথচ স্মৃতির কাছে ফিরে যেতে হয় বারবার'—এই সমস্ত পংক্তি রচনা করে 'জলের গভীর' কাব্যগ্রন্থের কবি শ্রীশরৎসুনীল নন্দী নিজ কবিক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন। আলোচ্য কবি রোমান্টিক বিষাদ নিয়ে কবিতাগুলির বিষয়, শব্দ ও ইমেজে ভ্রমণ করেছেন। ভালবাসা, দুঃখ, স্মৃতি, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আর্তি প্রত্যাশাপ্রত্যাশাহীনতা, নিজেকে দেখার দর্পণ-অন্বেষা—এই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র বিষয়কে কাব্যের সার্থক শব্দ, চিত্র, ছন্দ, কথের সূক্ষ্মতায় সুষমামণ্ডিত করেছেন। কোমল আন্তরিক কবিকণ্ঠ স্বভাবী পাঠকের সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপনে সক্ষম। কিন্তু কয়েকটি শব্দ, শব্দগত চিত্র ও চিত্রকল্পের একাধিক ও পৌনঃপুনিক প্রয়োগ অত্যন্ত ক্লান্তিকর লাগে, যেমন—'জল', 'জলের গভীর', 'বুক', 'জলাশয়', 'বুকের গভীর' 'নক্ষত্র' ইত্যাদি। ভালোবাসার 'ফোকাস' শব্দে শব্দগুচ্ছের অন্তর্নিহিত ধ্বনিমাধুর্য ও সূক্ষ্ম চিত্রের কল্পনা-সৌন্দর্য সুষম কাব্যিকতা পায় নি।

যা দেখেছি যা বুঝেছি (প্রবন্ধ)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস' ৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট তেতলা, কলিকাতা-১৪। দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ডায়েরীর পাতায় বিভিন্ন সময়ের বিবিধ যে সমস্ত চিন্তার উদ্ভব লেখা ছিল, সেগুলিকে লেখক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেইভাবেই গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছেন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'যা দেখেছি যা বুঝেছি' গ্রন্থে। রচনাগুলি লেখকের নিজস্ব চিন্তাভঙ্গি ও ব্যবহারিক জীবনের উপলব্ধ জ্ঞানেরই লেখ্য রূপ। জীবন কর্মমুখর। কর্মের সূত্রে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়—তা বাইরের এবং ভিতরের—দুই-ই। প্রতিটি মানুষের সাধ, সাধ্য, সাধনা ভিন্নধর্মী। জীবন, জগত, সমাজ, বাসনা—কামনা, দুঃখবোধ, সুখ-ভাবনা সবই অভিজ্ঞতার আলোয় ব্যক্তিত্বচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য পায়। এইরকম ব্যক্তি-চিহ্নিত কয়েকটি স্মৃতি-অনুভবজাত জগৎ ও জীবন সমীক্ষার কথা বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। লেখকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটি স্বচ্ছ। প্রকাশভঙ্গির সহজত ও সাবলীলতায় গ্রন্থটি মননধর্মী হয়েও সুখপাঠ্য।

...এবং অন্যান্য কবিতা। অশোক চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান। ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতার বইটির নাম পরিকল্পনাতেও নিরীহের লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। বইটির নাম খুব সম্ভবতঃ নক্ষত্র এবং ... অন্যান্য কবিতা। কবিতায় দুর্নীতি নিয়ে কবি

কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে, কবির বর্তমান রচনাগুলি তাই প্রমাণ করে। কবিতা, পোস্টার কবিতা (কবিতার সচিত্র হ্যাণ্ড-বিল?) প্রভৃতি ইত্যাদি দুরূহ পরীক্ষামূলক কবিতার জটিলতা পেরিয়ে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মূল কবিসত্তাটি আবিষ্কার করতে হয় তাঁর কবিতার মধ্যে, যেখানে কবি অনুভূতির গভীরে পৌঁছে বেদনাবোধে পীড়িত, বিষণ্ণ। —'পরিতাপে পরিতাপে মুখর সারাটি বেলা ধরে/একটি রঙীন পাখি পাতার আড়ালে বসে থাকে।' (পাতার আড়ালে)। ...'কেন সব দৃশ্য উড়ে যাবে, কেন' স্মৃতি, নাম দিলে/সেদিন প্রদোষে অমন সভয় হাতে ফুল দিলে কেন—/তোমার সাম্রাজ্য চাই, অবরোধী বিশাল নীলিমা/ভেদ করি এনে দিতে হবে ফুলগুলি।'...(চিঠি)।

কমল সাহা অঙ্কিত প্রচ্ছদটি তাৎপর্যমণ্ডিত।

আজ ও আগামীকাল (উপন্যাস)। দেবদত্ত রায়। গ্রন্থ-পরিচয়; কলিকাতা-৩০, মূল্য : ছয় টাকা।

'আজ ও আগামীকাল' কোন সাধারণ প্রেমকাহিনী নয়; একটি ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের গত নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক জোটের পরাজয় এবং অন্য একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ঘটনার পূর্বে ও পরবর্তী কয়েক মাসকাল মোটামুটিভাবে এই উপন্যাসের পটভূমি। একশ্রেণীর সমাজ-বিরোধী, সন্ত্রাসবাদী উগ্রপন্থীদের নাশকতামূলক কাজকর্মের ফলে দেশে এমন একটা সময় এসেছিল যখন সাধারণ মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব ঘটেছিল, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষায়তনে—সর্বত্র অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আদর্শবাদী কিছু যুবক জীবনের স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করে দেশে স্থায়ী মঙ্গল প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এই হল উপন্যাসের বিষয়। এই ধরনের উপন্যাস রচনায় সার্থকতা-লাভের জন্য লেখকের যে ধরনের বলিষ্ঠতা থাকা দরকার—চরিত্র পরিকল্পনায়, ঘটনা নির্বাচনে, বর্ণনায়, বিশ্লেষণে, ভাষায়—বর্তমান গ্রন্থের লেখকের মধ্যে তার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা গেছে এবং বর্তমান উপন্যাসটি সেই পরিমাণেই সার্থক।

এত্তো আলো অন্ধকার (কাব্য সঙ্কলন)। কালীপদ কোঙার। সখী সংবাদ প্রকাশনী, ৪৬।৪, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলকাতা-৩৪। তিন টাকা।

কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতাটিতে কবি-ভাবনার সিদ্ধান্তে এসে তরুণ কবি কালীপদ কোঙার একজন শুভানুধ্যায়ীর কথাকেই নিজের মত করে বলেছেন, 'সোনার হরিণে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে যদি মুক্তি চাও/পাখিটিতে কোনো কিছু আশা কোরো না।' কিন্তু এই কবি তাঁর 'এত্তো আলো অন্ধকার' গ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই অত্যন্ত সক্রিয় থেকে পাঠকদের বলেছেন — 'বন্ধু, জেগে ওঠো, দেখ কি রকম/পায়ের তলার থেকে সরে যাচ্ছে মাটি/ঘুমোবার এখন সময়?' আশা-নিরাশায় কবিমন দ্বিধাম্বিত। কবি বাঁচতে চান। কবির কাছে—'তাই মৃত্যু শেষ নয়/এবং দুঃখ অশেষ।' একেবারে সাম্প্রতিক কালের আধুনিক কবিদের মধ্যে কালীপদ কোঙার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি নিঃসন্দেহে। কাব্যের 'চিত্রকল্প', চিত্র কল্প ও ছন্দে তিনি সতর্ক, সচেতন কবি।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (১৬শ খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায়। গীতা প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা—২৬। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সঠিক ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বড় বড় টীকাকার ও সাধু-মনীষী গীতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই পরিচয় বহন করে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। এই খণ্ডে গীতার সপ্তম অধ্যায়টি বিস্তারিত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রথমাংশ ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রায় পূর্ববর্তী পনেরোটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান খণ্ডটি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির সুনাম রক্ষায় যথেষ্ট সমর্থ।

গংগাপদ বসু স্মারকগ্রন্থ—অন্বেষা। ১।২এ, বলভ স্ট্রীট, কলকাতা—৪। দাম : ছ'টাকা।

'শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার্থে, শিল্পরসিক মানুষদের জ্ঞাতার্থে একজন আত্মনিবেদিত শিল্পীর কর্মময় জীবনকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।'

শিল্পরসিক মহলে গংগাপদ বসু সুপরিচিত নাম। নাট্যকার, সাংবাদিক, সংগঠক এবং অভিনেতা হিসাবে আধুনিক বাংলা শিল্প সংস্কৃতির জগতে গঙ্গাপদ বসুর বিশিষ্ট ভূমিকাটি কোনদিনই বিস্মৃত হওয়ার নয়। 'ছিন্নমূল'-এর 'বিশু চক্রবর্তী', 'জলসাঘর'-এর 'মহিম গাঙ্গুলী', 'পরশপাথর'-এর কৃপারাম কাচালু', 'অযান্ত্রিক'-এর 'মামাবাবু' এবং 'শাপমোচন', 'বিষকন্যা' থেকে সাম্প্রতিক কালের 'এখানে পিঞ্জর' 'নিশিপদ্ম' ইত্যাদি বহু ছায়াছবির বিভিন্ন চরিত্র শ্রীবসুর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করবে সুদীর্ঘকাল; যদিও চলচ্চিত্রে গংগাপদ বসুর অভিনয় ক্ষমতার সার্বিক প্রকাশ ঘটতে পারেনি। ব্যবসায়িক বুদ্ধির দরবারে শিল্পীর স্বাধীনতা অন্তত কিছুটা কম হতে বাধ্য।

গংগাপদ বসুর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে—যে নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি, সেই 'বহুরূপী'র বিভিন্ন প্রযোজনায়। 'ছেঁড়া তার'-এর 'হাকিমুদ্দি', 'রক্তকরবী'র 'অধ্যাপক', 'ডাকঘর'-এর মাধব দত্ত, রাজা ওয়াদিপাউস'-এর 'মেষপালক'-এর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বাংলার নাট্যানুরাগীদের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ঐতিহাসিক বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ গংগাপদ বসু—'জবানবন্দী'র 'পরাণ মণ্ডল', 'নবান্ন'-এর 'হারু দত্ত'।

শিল্পে নিবেদিতপ্রাণ এই মহৎ শিল্পীর ব্যক্তি-জীবনের বহু দিকেও আলোকপাত করেছেন বর্তমান বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের পুরোধা কয়েকজন গুণী। গুণীবৃন্দের মধ্যে আছেন—সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, মন্মথ রায় বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, এন কে জি, সমরেশ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ।

স্বদেশ বসুর ভূমিকা গ্রন্থের একটি মূল্যবান অধ্যায়। সুসম্পাদিত গ্রন্থটির বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবেও সুরুচির স্বাক্ষর বর্তমান।

ঊনত্রিংশ ত্রিংশের গান (কাব্যগ্রন্থ)—অভিজিৎ সেনগুপ্ত। প্রাইমা পাবলিকেশনস, ৮১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭। আড়াই টাকা।

রহস্যময় এক মায়াবী যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন লেখক। অন্তত এ-বইয়ের কবিতাগুলি পড়ে, সেরকম একটা ধারণাই তৈরী হয়। 'সন্ধ্যা' 'কাকের ডাক' 'শতাব্দীর শিয়র' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দচিত্রের অনুষঙ্গে যে-জগৎ উন্মোচিত হয়, তার সংগে কবিতা-পাঠকের পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্ট।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কালি ও কলম (চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা) : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা কালি ও কলমের বর্তমান সংখ্যাটি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা পাঠের প্রতি অনীহা যে সমাজে প্রকট, সেখানে একজন যুগস্রষ্টা কবি স্মরণে বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক প্রয়াস। ম্যাকসিম গোর্কির ওপর লেখা সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রথমেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। জগন্নাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শামসুর রহমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আরো কয়েকজন সুধীন্দ্রনাথের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত রচনাপঞ্জী ও জীবনীপঞ্জী রচনা করেছেন শুভ মুখোপাধ্যায়।

চিঠিপত্র

দেশেই ও'দের সংস্থান করা হোক

এযুগে পৌষের সংখ্যায় অপরাজিতা সেনগুপ্তর চিঠিটি পড়লাম। তিনি বহু আলোচিত বিষয়কেই আবার নতুন করে তুলে ধরলেন। কিছুদিন আগে আমার বিদেশ যাবার সুযোগ ঘটেছিল। গিয়েও ছিলাম। সেখানে কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হয়। সকলেই চাকরি করছেন। ব্যবহারিক জীবনে রয়েছেন বহাল-তবিয়তেই। যাকে বলে হাতের মুঠোয় স্বর্গসুখ ধরে রাখা ঠিক তাই ঘটেছে। তবু তাঁরা ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছেন না। যা শিখলেন, দেশের কাজে লাগাতে পারছেন না বলে দারুণ আক্ষেপ। আর কাঁহাতক্‌ই বা পরদেশী ভাষায় কথা বলা যায়? মনের যে ভারতীয় পরিবেশ তাঁদের পছন্দ, তাও মেলে না। ফলে দেশে আসতে চান, দেশে ফিরে কাজ করতে চান। কিন্তু কে তাঁদের চাকরি দেবে? সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় পরিকল্পনা নিয়ে যদি না এগোন তাহলে দুঃসময় ঘনিয়ে আসতে আর বাকি থাকবে না।

সুনীল রায়, নতুন দিল্লি

তারাপীঠ প্রসঙ্গে সঠিক তথ্য

গত ৭ই পৌষ, (১৩৭৯) শুক্রবারের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতুল দত্তের লেখা 'কিংবদন্তীর বীরভূম' পড়লাম। বীরভূমের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান 'তারাপীঠ মন্দির প্রতিষ্ঠায় কিংবদন্তীর তথ্য প্রতুলবাবু ঠিকমত সংগ্রহ করতে পারেন নি। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন নাটোরেশ্বরী রাণী ভবানী নয়। মল্লারপুরের বাসিন্দা 'জগন্নাথ রায়। মন্দিরের গায়ে এখনও তাঁর নামধাম এবং সন তারিখ লেখা আছে। 'তারা মার পুজোয় (শারদীয়া শুক্লা চতুর্দশীতে) এখনও মল্লারপুর রায়বাড়ী হতে পুজোর সামগ্রী এবং বলিদানের পাঁঠা ইত্যাদি যায়। পুজো-বলিদান দিয়ে প্রসাদ বিতরণ হয়ে থাকে। তারাপীঠের বাসিন্দা 'যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের তারাপীঠ মাহাত্ম্য বইতে জগন্নাথ রায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লেখা আছে। তারাপীঠ সেবা সংস্থার সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র প্রামাণিক (জ্ঞানবাবু) মহাশয়ও এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। কিছুদিন পূর্বে কলকাতার কোনও এক ভক্ত মায়ের মন্দিরে চুনকাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জ্ঞানবাবু অনুমতি নেওয়ার জন্য আমাদের বাড়ী অর্থাৎ মল্লারপুর রায়বাড়ী গিয়েছিলেন। অনুমতি না দিয়ে রায়বাড়ী থেকেই চুন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বীরভূমের কিংবদন্তী নিয়ে বীরভদ্র যে গৈরিক কন্যা বই লিখেছেন, তাতে দেখা যায় এক বণিক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বণিকই হচ্ছেন জগন্নাথ রায়। আমি এই বংশের মেয়ে। আমরা শুনেছি এই জগন্নাথ রায় মস্ত চালের ব্যবসায়ী ছিলেন। বেনারস থেকে কাটোয়া পর্যন্ত তাঁর চালের ব্যবসা ছিল। গরুর পিঠে বস্তা বোঝাই করে তিনি চালের সওদা করে বেড়াতেন। তখনকার দিনে এতবড় চালের ব্যবসায়ী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি 'চেলো জগন্নাথ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব ধনবান এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর দুঃখ ছিল—তাঁর অর্জিত ধন কে ভোগ করবে? কেই বা তাঁর বংশ রক্ষা করবে? একদিন গরুর পিঠে বস্তা বোঝাই করে চণ্ডীপুর গ্রামে (তারাপীঠ) নদীতীরে জঙ্গলে রাত্রিতে বিশ্রাম করছিলেন। স্বপ্নে মায়ের আদেশ পেলেন বশিষ্ঠারাধিতা তারা দেবী আমি এইখানে অবস্থান করছি, এইখানে আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা কর এবং মল্লারপুরে বিশ্বাস বংশে বিবাহ কর। তোমার বংশ রক্ষা হবে। পরদিন জগন্নাথ রায় তারাদেবীর অনুসন্ধান করে মায়ের শিলামূর্তি দেখতে পেলেন, এবং সন্নিকটে এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন। তাঁর কাছে গত রাত্রির স্বপ্নের কথা এবং মন্দির তৈরীর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সন্ন্যাসী রুষ্ট হয়ে বললেন, এই মন্দির আমিই ভিক্ষা করে তৈরি করব স্থির করেছি। জগন্নাথ রায় ক্ষুণ্ণ হলেন। নিজের কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দুঃখিত মনে চলে গেলেন। নদীতীরে গিয়ে দেখতে পেলেন সেই সন্ন্যাসী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। জগন্নাথ রায়কে তিনি আশীর্বাদ করে মন্দির তৈরির অনুমতি দিলেন। জগন্নাথ রায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মল্লারপুর বিশ্বাস বংশে বিবাহ করার পর বংশ রক্ষা হলো। তারপর তিনি মল্লারপুরেই বসতি করলেন। আজও বিশ্বাস বাড়ী এবং রায় বাড়ী পাশাপাশি আছে। তারাপীঠে বশিষ্ঠদেবের যজ্ঞকুণ্ড যা জীবিৎকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ তার আকার ছিলো ছোট। জগন্নাথ রায় তার আয়তন বৃদ্ধি করে পুষ্করিণীর আকার দিয়েছিলেন। মন্দির সংলগ্ন ভোগ ঘরগুলিও তাঁরই নির্মিত। তিনি খুব খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। বহু দেবদেবী উনি স্থাপনা করে গেছেন। এবং সেবার ব্যবস্থাও করে গেছেন। মল্লারপুরে মল্লেশ্বর শিবের দেওয়ান ছিলেন তিনি। এই শিবের পায়সান্ন ভোগের ব্যবস্থাও তিনিই করে গেছেন। দুধ, মিষ্টি, জ্বালানির জন্য জমির ব্যবস্থা আছে। আধসের করে আতপ চাল এখনও প্রত্যহ রায়বাড়ী হতে যায়। মল্লেশ্বর শিবের সম্মুখে পঞ্চ মন্দির তিনি স্থাপনা করে গেছেন। নিজের বাড়ীতে গণেশজননী দেবী মূর্তি স্থাপন করে নিজের কুলগুরুকে সেবাইত নিযুক্ত করেছিলেন। তার জন্য গুরুদেবকে ১৮ বিঘা নিষ্কর জমি, পুকুর এবং বাস্তুভিটা দান করেছিলেন তা আজও তাঁর বংশধরেরা ভোগ করছেন। দুর্গোৎসব, সরস্বতী পুজো ইত্যাদি আরও বহু কীর্তি তিনি রেখে গেছেন যা এখনও তাঁর বংশধরদের চালাতে হয়। মল্লারপুরে বহু ভূসম্পত্তি তিনি করেছিলেন যার পরিমাণ ছিল ১৬ শত বিঘা। মল্লারপুরে মল্লরাজার বাড়ীর দুই পাশে যে দুটি সুবৃহৎ দীঘি ছিল তার ভোগী [illegible] তিনি। এখনও [illegible] দুই দীঘি রায়দেরই আছে।

[illegible] রায়,
[illegible], ধানবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত লোক মারা যান ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একরকম গোটা শান্তিকামী মানুষই দাঁড়িয়ে ছিলেন জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধে যেমন ১ কোটি লোক মারা যান, তেমনি অনেকের মতে সাড়ে ৫ কোটি মানুষ নিহত হন দ্বিতীয় মহাসমরে। একথা জানা আছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যেখানে ৩৩টি দেশ সোজাসুজি যুদ্ধের কথা ঘোষণা করে, সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭২টি দেশ খোলাখুলিই স্বীকার করেছিল যুদ্ধের অস্তিত্ব।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সত্যি সত্যিই কত লোক মারা যান, আহত ও পঙ্গু হন, তার সঠিক সংখ্যা আজ পর্যন্ত জানা গেল না। 'হিস্টরিক মেমোরিয়াল অব দ্য পটসডাম এগ্রিমেন্ট : সেসিলিনহোফ' পুস্তিকায় স্পষ্টভাবেই এক জায়গায় উল্লেখ করেছে ফ্যাসিস্ট মিলিটারিস্ট আক্রমণে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। এই গ্রন্থেই দেশ-ভিত্তিক যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা হল : সোভিয়েত ইউনিয়ন ২০,০০০,০০০; পোলাণ্ড ৬,০০০,০০০; জার্মানি ৮,০০০, ০০০; যুগোশ্লাভিয়া ১,৭০০,০০০; রুমানিয়া ৭৭০,০০০; গ্রেট ব্রিটেন ও কমনওয়েলথ ৬৬৫,০০০; ফ্রান্স ৬২০০০০; ইতালি ৬৭০,০০০; গ্রীস ৫৭০,০০০; চেকোশ্লোভাকিয়া ৮৫০,০০০; অস্ট্রিয়া ৩৪৭,০০০; হাঙ্গারি ৭৯০,০০০; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৩৬৭,০০০; হল্যাণ্ড ২৫৫,০০০; বেলজিয়াম ১৬০,০০০; ফিনল্যাণ্ড ৯৭,০০০; বালগেরিয়া ৩২,০০০; আলবানিয়া ২৬,০০০; নরওয়ে ৯,০০০; ডেনমার্ক ৩,০০০ জন। অর্থাৎ ৪১,৯৩১,০০০ জন মারা যান। অবশ্য ৮ কোটির মতো লোক আহত বা পঙ্গু হয়। আবার অধ্যাপক ডঃ স্তেফান ডোর্নবের্গের ভূমিকাসম্বলিত গ্রন্থ দ্য পটসডাম এগ্রিমেন্ট'-এ ৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ৫ কোটি লোক মারা যান। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মুনী আলাদা আলাদা পরিসংখ্যান দিচ্ছেন। এবং এদের মধ্যে তারতম্য ঘটেছে প্রায় পঞ্চাশ লাখের মতো। কোন্ পরিসংখ্যানটি সঠিক ও তথ্যনির্ভর তা যদি কোন ঐতিহাসিক জানান বাধিত হবো।

পারমিতা দেব মজুমদার
ধানবাদ, বিহার।

(দশ)

অনেক খেটে-খুটে একটা রিপোর্ট তৈরী করে কলকাতার অফিসে পাঠিয়ে দিলাম। ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসেসারিজের হয়ে অনেক করে লিখলাম। লিখলাম, আমি নিজে গিয়ে ওদের ম্যানেজিং ডাইরেকটরের সঙ্গে আলাপ করে এসেছি। চমৎকার লোক। অমায়িক, বিনয়ী, সবচেয়ে বড় কথা ভদ্রলোক ব্যবসা বোঝে। এর হাতে আমাদের ভাল ব্যবসা হবে বলেই মনে করি। সুতরাং নতুন ডিলারশীপ এই কোম্পানীকেই দেওয়া হোক। শেষের দিকে আরও লিখলাম, আমি এক রকম কথা দিয়েই এসেছি। জামসেদপুর একটি আশাপ্রদ জায়গা, ঠিক মত কাজে লাগাতে পারলে এখান থেকে মোটা টাকার ব্যবসা হওয়া সম্ভব। কিছুদিন আগে এগ্রিমেন্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায়, সেখানে আমাদের স্বার্থ দেখার কেউ নেই। এইসব কথা বিবেচনা করে আশা করি লেটার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাঠাতে দেরী হবে না। এখানকার অফিস সম্বন্ধেও লিখলাম। নতুন করে ঢেলে নিতে হবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা। ছয়জন লোক নিয়ে আমার একটা সেকসন তৈরী করেছি, যাদের কাজ হবে ঘুরে-ঘুরে অর্ডার নিয়ে আসা এবং ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। গরমের সময় পাম্পের চাহিদা হয় প্রচুর। সেই অনুপাতে আমাদের সাপ্লাই খুব কম, ফলে ন্যায্য দামের অনেক বেশী প্রিমিয়াম দিয়ে মাল কিনতে হয়। এই অবস্থার জরুরী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমি প্রস্তাব করি, মাল মজুত রাখার জন্যে এখানে অবিলম্বে একটা গুদাম ঘর ভাড়া নেওয়া হোক। সেখানে নতুন মেসিনপত্রের সঙ্গে থাকবে স্পেয়ার পার্টস, যেটা কিনা এখন বাইরে থেকে চড়া দামে কিনতে হচ্ছে আমাদের। জেনে-শুনে বাইরের এজেন্টের হাতে অযথা টাকা তুলে দেওয়াটা সমীচীন হবে কিনা আশা করি কর্তৃপক্ষ সেই কথা বিবেচনা করে দেখবেন। রিপোর্টটা অনিমেষকে দেখালাম। অনিমেষ হেসে বলল, 'তুমি তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলে বরাবর, কিন্তু বেশ গুছিয়ে ইংরেজী লিখতে পার তো। তোমার উন্নতি মারে কে!'

অনিমেষকে টিপ্পনী কাটলাম, 'আমার তো মুরুব্বির জোর নেই।'

'মুরুব্বির চেয়েও বেশী কিছু আছে তোমার।'

'যেমন?'

অনিমেষের মুখ থেকে সুপ্রিয়ার নাম শুনতে ইচ্ছে করছিল। এত-দিনের মধ্যে অনিমেষ সুপ্রিয়ার নাম উচ্চারণ করে নি। কি জানি কেন, অনিমেষ যেন সুপ্রিয়ার কথা উঠলেই বিব্রত বোধ করে, ওকে এড়িয়ে যেতে চায়। অথচ সুপ্রিয়া তো সহজভাবে বলেছিল, অনিমেষ ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

'মিস্টার কাপুর।' অনিমেষের সুরে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ছিল না। ওর গলা খুব শান্ত মনে হল।

হাসতে হাসতে বললাম, 'এইসব কর্তারা কি রকম জানো। প্রচুর আমোদ-স্ফূর্তি করে করে যখন ওদের জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায়, তখন নতুন কোন খেলার দিকে দৃষ্টি পড়ে। ডাক পড়ে নির্বোধ কোন লোকের। সেই মানুষকে ওরা যত্ন করে রংচং মাখায়, পোশাক-পরিচ্ছদ পরায়, তারপর সাজান স্টেজের ওপর তুলে দিয়ে বলে, আমরা বাজনা বাজাচ্ছি, তুমি তালে তালে নাচো। যদি নাচতে পারলে ভাল, যদি মুখ থুবড়ে পড়ে যাও, ওরা আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠবে, এ গ্রেট ফান, ওদের এই ফান কথাটার মানে আজ পর্যন্ত আমার জানা হল না। তারপর ওরা আর একজন নির্বোধ মানুষকে ধরবে, তাকে নাচাবে, ফান করবে।' হাসতে হাসতে কথা বলতে শুরু করেছিলাম। কখন যে আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নি। শেষের দিকে আমার গলা বিষম ভারী শোনাল, 'অথচ, নাচার তো বিরাম নেই। সব জেনে বুঝেও নাচতে হয় আমাদের।'

আমার কথা শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেও অনিমেষ কথা বলল না। এক সময় বলে উঠল, 'হয়তো এই নাচাটাই আমাদের পার্ট। শুধু আমরা কেন, যারা আমাদের নাচাচ্ছে, দেখে নিও, তারাও নাচছে। নেচে নেচে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। পড়ে যাওয়াটাই তো মানুষের শেষ পরিণতি। তাই না?'

অনিমেষ যেন মানুষের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইল। মাথা নেড়ে বললাম, 'আমি শেষ পরিণতি-টরিনতি বুঝি না ভাই। আমি বুঝি শান্ত সুশৃঙ্খল জীবন। নদীর তরঙ্গে সাঁতার কাটতে পারি, কিন্তু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আমাকে দিশাহারা করে তোলে।'

অনিমেষ শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এই যে বড় বড় ঢেউ উঠছে-পড়ছে-ভাঙছে-আবার গড়ছে, একেই তো জীবনের স্পন্দন বলে, না কি! জীবন মানে তো সুস্থিরতা না। ডোবার জলের মত স্থির অচঞ্চল—'

'কিন্তু এ দুইয়ের মাঝামাঝিও তো কিছু একটা আছে। যেমন নদীর ছোট ছোট তরঙ্গ, যা মনে সংশয় আনে না, জীবনকে অস্থির করে তোলে না, অথচ ওদের গতিও আছে, ছন্দও আছে।'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'অস্থিরতা নিয়েই আমাদের জন্ম। দেখ না, জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু কি বিকটভাবে কাঁদতে থাকে, হাত-পা ছোঁড়ে। কেন? সে অস্থির বলে।'

'এ সব উপমা।'

'না অংশু। মানুষ ছোটকে দেখে বড় করে। একটা বীজ দেখে আমরা বিরাট বনস্পতির কল্পনা করতে পারি। এক বিন্দু জল দেখে বিরাট সিন্ধুকে কল্পনা করা মানুষের অসাধ্য না।'

'কী জানি ভাই, জীবন সম্বন্ধে আমি খুব ভাবিনা। কারণ ভেবে কোন লাভ নেই। সবচেয়ে হতাশ হয়ে পড়ি কখন জান। যখন দেখি, নিজের ওপর নিজেরই কোন প্রভুত্ব নেই।

সেদিন সমস্ত রাত ট্রেনে বসে আবোল-তাবোল কত কী চিন্তা করে গেলাম। অথচ সেইসব চিন্তা আমার মনে হওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। 'যদি এমন কোন ব্রেক জাতীয় জিনিস মাথায় ফিট করা থাকতো, যা চাপলেই চিন্তা থেমে যেত—'

অনিমেষ গম্ভীর মুখে বলল, 'মানুষ চিন্তা করতে ভালবাসে বলেই চিন্তা করে। সে যদি চিন্তা করতে না চাইতো, পথ খুঁজে পেত ঠিকই।'

'কি ভাবে?'

'ধরো সেদিন যে সমস্ত রাত তুমি ট্রেনে চিন্তা করতে করতে এলে, ইচ্ছে করলে ঘুমের অষুধ খেয়ে শুয়ে পড়তে পারতে। অবিশ্যি ঘুমের অষুধেও যে মানুষ সব সময় ঘুমোয় না, তার প্রমাণ বিভা। কিন্তু সেই চিন্তা না করার ইচ্ছাটা তোমার মধ্যে ছিল না। ট্রেনের সময়টা তুমি চিন্তা করে কাটাতে চেয়েছিলে, ওপরের মন নীচের মনের সেই খবরটা রাখে নি পর্যন্ত।'

কয়েক দিন অনিমেষদের বাড়ি যাওয়া হয় নি। বিভার কথা উঠতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিভা কেমন আছে?'

অনিমেষ বলল, 'বিভা মাঝামাঝিভাবে বাঁচতে পারে না। যখন ভাল থাকে খুব বেশী ভাল থাকে। সব সময় হাসে, আনন্দ করে, যখন খারাপ থাকে, তখন ও খুব কষ্ট পায়, কাঁদে, চিৎকার করে।'

বললাম, 'ওকে একবার কোলকাতায় নিয়ে গেলে হয় না?'

'কিছুদিন আগে সুপ্রিয়া এসে নিয়ে গিয়েছিল, চিকিৎসা করিয়েছিল, কিন্তু বিশেষ উপকার হয় নি।'

অনেক দিন পর সুপ্রিয়ার নাম শুনলাম। যেন কত যুগ-যুগান্তর পর।

'সুপ্রিয়া তোমাদের কী রকম আত্মীয়?'
'শুনেছি মার দূর সম্পর্কের বোন।'
'তা হলে তো তোমার মাসী সম্পর্ক।'
'হ্যাঁ।' বলে অনিমেষ চুপ করে রইল।

সুপ্রিয়া সম্বন্ধে কথা উঠলে অনিমেষ চুপ করে যায়। অথচ অনিমেষের মুখে সুপ্রিয়ার কথা শুনতে আমার ভাল লাগে। বললাম, 'সুপ্রিয়া কী অফিসের কাজে এসেছিল?'

'হ্যাঁ'

'কিন্তু আমি জানতে পারি নি।' কথাটা অনেকটা নিজেকে শুনিয়ে বলার মত করেই বলেছিলাম।

অনিমেষ শুনতে পেল। বলল, 'ও কি সব কাজ তোমাকে জানিয়ে করে?'

'ঠিক তা না। তবে এক অফিসে কাজ করি, কেউ কোথাও এলে-গেলে জানা যায়।'

'কাপুরও এসেছিল।'
'তাই নাকি?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'বড় অফিসে কেউ কোথাও এলে-গেলে বোঝার উপায় থাকে না। ছোট অফিসের কথা আলাদা। তুমি যে জামসেদপুর ঘুরে এসেছো, হয়ত সমস্ত পাটনা শহরের লোকই সেই কথা জানে।'

আমার মনে তখন সুপ্রিয়ার কথা ঘুরছিল। সুপ্রিয়া যে পাটনায় এসেছিল কথাটা স্রেফ আমাকে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু চাপা কেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল উচ্চ পদস্থ কর্মচারী নিম্নস্থ কর্মচারীকে কাজের কৈফিয়ৎ দেয় না। পদমর্যাদায় বা ক্ষমতায় সুপ্রিয়া আমার চেয়ে অনেক বড়। সেই সুবাদে ওর গতিবিধি আমার জানার কথা না। কিন্তু অফিসের সম্পর্ক ছাড়াও সুপ্রিয়ার সঙ্গে আমার আর একটা সম্পর্ক একদা গড়ে উঠেছিল। ইদানীং সে সম্পর্কটা হয়ত ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একদিন সম্পর্কটা খুব মধুর ছিল। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'সুপ্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে।' কথাটা বলে ফেলেই লজ্জা পেলাম। আমি যে এতক্ষণ ধরে সুপ্রিয়ার কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছি, এটা যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবার মতন।

অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তো মানুষমাত্রেই বদলায়।'

'কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে সুপ্রিয়া এমন কিছু বড় হয়ে যায় নি।'

অনিমেষ হাসল। হেসে বলল, 'মানুষ একদিনেই অনেক বড় হয়ে যেতে পারে।' একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলল, 'আমার বাবার মাথায় একটা চুলও আগে পাকা ছিল না। যে রাত্রে বিভা পাগল হল, তার পর-দিন সকালেই বাবার মাথায় অনেকগুলো পাকা চুল নজরে পড়েছিল।'

অনিমেষের যুক্তির অখণ্ডতা খণ্ডন করা গেল না। কিন্তু মুখে সেকথা স্বীকার না করে বললাম, 'তোমার বাবার চুল পেকেছিল দুশ্চিন্তায়, কিন্তু সুপ্রিয়ার সে ধরনের কোন চিন্তা আছে বলে মনে হয় না।'

'বাইরে থেকে মানুষের অনেক কিছুই বোঝা যায় না। একটা বড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব যে ওর ঘাড়ে, সেকথা কি বাইরে থেকে বোঝা যায়?

অনিমেষ বুঝতে পারে নি, যে সুপ্রিয়ার সংসারের কিছু কিছু কথা আমার জানা আছে। বলে ফেললাম, শুভেন্দু তো এখন চাকরি করছে, সুপ্রিয়ার ভার অনেকটা লাঘব হওয়া উচিত। মনে হল চকিতের জন্য অনিমেষের ভ্রূ দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত হল। নাকি দেখার ভুল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব কাটিয়ে ফেলে বলল অনিমেষ, 'হ্যাঁ, ওর ভার অনেকটা লাঘব হয়েছে। কোন দুটোর বিয়ে হলেই আর চিন্তা নেই।'

হেসে বললাম, 'চিন্তা শেষ পর্যন্ত মানুষের থেকেই যায়। নিজের বিয়ের ব্যাপার নিয়েও তো চিন্তা করতে হবে ওকে। আফটার অল সী ইজ এ উওম্যান। মেয়েদের বিয়েটা অফশন না, নিতান্তই প্রয়োজন।' ভেবেছিলাম, আমার কথার ধরনে অনিমেষ হেসে উঠবে। অনিমেষ হাসল না, গম্ভীর মুখে শুধু বলল, 'তা বটে'। বুঝলাম অনিমেষ সুপ্রিয়া-প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টানতে চাইছে।

আমার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ঘরে ঢুকল জয়ন্ত দেশাই। জয়ন্তকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। ঢুকেই জয়ন্ত আনন্দে ফেটে পড়ল। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার লেডী-লাভ এসে গেছে।'

অনিমেষ উত্তর দিল, 'কিন্তু উচ্ছ্বাসটা তোমারই বেশী।'

জয়ন্ত কী বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। অনিমেষের দিকে আরও দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু খবরটা তুমি জানলে কী করে?'

অনিমেষ মুচকি হেসে জবাব দিল, 'স্টেশন থেকে আমাকে ফোন করেছিল।'

'আর তুমি এখানে বসে আছ?' উত্তে-জনার মাথায় জয়ন্ত একটা পা অনিমেষের চেয়ারে তুলে দিল।

আমি একবার অনিমেষ, একবার জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। অনিমেষ আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, 'লীলাবতী দেশপাণ্ডে আজ পাটনায় এলেন।'

'সেই লীলাবতী, যাঁর কোমল বাহুতে শরীর ছেড়ে দিয়ে কাপুর সাহেব গাড়িতে এসে উঠেছিলেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ কথা বলল না। শুধু মুখ লম্বা করে ওপরে-নীচে মাথা দোলাতে লাগল।

জয়ন্ত বলল, 'দ্যাখো ডাট, তোমার আত্মসংযম ভাল। এক-এক সময় তোমার সংযমকে আমার আত্মপীড়া বলে মনে হয়।'

জয়ন্তর মুখে এ-ধরনের কথা মানায় না। শরতের মেঘের মত হাল্কা আর দ্রুত ওর গতি। কোন ভারী কথা ওর মুখে শুনলে কেমন যেন বে-সুরো লাগে। মনে হয় জয়ন্তর বেশ ধরে অন্য কেউ এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্তর পা-টানার লোভ সামলাতে না পেরে বললাম, 'অনিমেষ তখন ব্যস্ত ছিল, কিন্তু আপনি গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে পারতেন।'

জয়ন্ত মুখ ঝুলিয়ে বলল, 'লীলা গাড়ির জন্যে অনিমেষকে ফোন করেনি। ওর বাবার গাড়ি খুব ভোর থেকেই স্টেশনে পড়ে আছে।'

'দেশপাণ্ডে বুঝি মেয়েকে খুব ভাল-বাসেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ বলল, 'প্রত্যেক বাবাই তার মেয়েকে ভালবাসে, কিন্তু লীলাবতী দেশপাণ্ডের মেয়ের চেয়েও অনেক বেশী। বলতে গেলে দেশপাণ্ডের জগৎই হচ্ছে লীলা।'

'আর সেই লীলাবতীকে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা রাখে এই মানুষটি' বলে একটা আঙুল দিয়ে অনিমেষকে চিহ্নিত করল জয়ন্ত।

'লীলাবতী দেখতে কেমন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সী ইজ এ রিয়্যাল বিউটি।' বলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী একত্রিত করল জয়ন্ত।

জয়ন্তর কথা শেষ হতে না হতেই আমার ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মুখের কিঞ্চিৎ অংশ সেখানে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম। অনিমেষ বসেছিল আমার দিকে মুখ করে। জয়ন্ত অনিমেষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওরা কেউই দরজার ফাঁকে আটকে-পড়া মুখ দেখতে পায়নি। আমি বললাম, 'কাম ইন প্লীজ।'

অনিমেষ আর জয়ন্ত একই সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাল। তাকিয়েই অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। জয়ন্ত কী করবে ভেবে না পেয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠল, 'সী ইজ লীলাবতী।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললাম, 'এইমাত্র অনিমেষ বলছিল আজ আপনি এসেছেন।'

লীলাবতী ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ভার করে বলল, 'তবু ভাল, অনিমেষবাবু আমার কথা বলেন।' লীলাবতী পরিষ্কার বাংলায় কথা বলল। কথা বলতে বলতে লীলাবতী বারকয়েক অনিমেষের দিকে তাকিয়েছিল। সেই ফাঁকে ওকে দেখেছিলাম। মানুষের এত রূপ আগে কোথাও দেখেছি কিনা স্মরণ করতে পারলাম না। ও একটা গোলাপী শাড়ি পরেছিল। মনে হচ্ছিল শাড়ির রংয়ের সঙ্গে ওর গায়ের রং মিশে গিয়েছে। লীলাবতী লম্বা। স্বাস্থ্যবতী। লীলাবতী জয়ন্তর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর সুন্দর দাঁতের সারি নজরে পড়ল। মনে হচ্ছিল, কোন সুদক্ষ কারিগর খুব যত্ন নিয়ে ওর দাঁত সাজিয়ে দিয়েছে। লীলা খুব হাল্কা করে লিপস্টিক লাগিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। না লাগানোই স্বাভাবিক। এই সব মানুষের ঠোঁট এই ধরনের গোলাপী আভা ছড়ায় বলেই আমার ধারণা। ওর টিকলো নাক, আয়ত চোখ, ধনুকে ভ্রূ, এমনকি চোখের পাতার লম্বা লোমগুলো ওকে শিল্পীর আঁকা নিখুঁত একটি ছবি করে তুলেছিল। লীলাবতীকে দেখতে দেখতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, ও যখন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ', তখন আমি বিষম চমকে উঠলাম।

জয়ন্ত শব্দ করে হেসে উঠল, 'আপনার সম্বন্ধে এমন বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলাম যে, মিস্টার চ্যাটার্জি হয়ত সেইসব মিলিয়ে নিচ্ছিলেন।'

জয়ন্তর কথায় লীলাবতীও হেসে উঠল। ভগবান যাকে দেন, সব দেন। লীলাবতীর হাসিটা পর্যন্ত কী দারুণ মিষ্টি। হাসিতে মুক্তো ছড়ানোর কথাটা হয়ত ছেলেভুলনো গল্প, কিন্তু লীলার হাসিতে যেন কানে জলতরঙ্গ বাজল। লীলা একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আপনারা বসুন। আমি এলাম, আপনাদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে, আর আপনারা কী রকম সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছে আমি অবাঞ্ছিত কেউ। আমি হয়ত আপনাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি—' বলে লীলাবতী উঠতে যাচ্ছিল।

ওকে বারণ করলাম, 'আরে আপনি উঠছেন কেন, বসুন বসুন। অনিমেষ বসো, জয়ন্ত বসুন,' আমি নিজেও চেয়ারে বসে পড়লাম।

জয়ন্ত বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, 'আমার একটু জরুরী কাজ আছে।'

অনিমেষ ওকে ধমক দিল, 'তোমার কোন কাজ নেই। কিছুক্ষণ আগেই তো কাজ না থাকার কথা নিয়ে অনুযোগ করছিলে।'

জয়ন্ত যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি কমপ্লেন করছিলাম?'

অনিমেষ রসিয়ে রসিয়ে ঘাড় দোলাতে লাগল। জয়ন্ত আরও জোরে প্রতিবাদ করল, 'আমি যে কাজ করতে ভালবাসি না, একথা এখানকার চাপরাশী থেকে শুরু করে বড় সাহেব পর্যন্ত সবাই জানে। আবার দেখা হবে মিস দেশপাণ্ডে' বলে জয়ন্ত তাড়াহুড়া করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। জয়ন্তর এই ব্যবহারে আমি বিস্মিত হলাম। কিন্তু লীলাবতীর সামনে অনিমেষকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা যায় না।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে লীলাবতী বলল, 'জয়ন্ত অনেক পাল্টে গেছে বলে মনে হল। ওর যশোদার খবর কি?' লীলাবতী আমার দিকে তাকিয়ে যদিও কথাটা বলল, প্রশ্নটা যে অনিমেষকে করা হয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে অনিমেষের ব্যবহার। অনিমেষ প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স লোফালুফি করছিল। বাধ্য হয়ে আমাকেই লীলার প্রশ্নের জবাব দিতে হল, 'যতদূর জানি, যশোদা ভাল আছে।'

অনিমেষ ধীরে ধীরে বলল, 'না, ভাল নেই। যশোদার শিগগিরই বিয়ে।'

'কার সঙ্গে?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ বলল, 'নিশ্চয়ই জয়ন্তর সঙ্গে না। কোন এক বিরাট বিজনেসম্যানের ছেলের সঙ্গে।'

'কিন্তু তুমি কিম্বা জয়ন্ত কেউ এ-কথা তো আমাকে বলোনি অনিমেষ।' অনুযোগের সুরটা নিজের কানেই বাজল।

অনিমেষ উত্তর দিল না। শুধু ওর দেশলাই নিয়ে খেলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি আবার বললাম, 'যতদূর শুনেছি যশোদার সঙ্গে জয়ন্তর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল।'

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল বলল, 'পাকা কথা কাঁচা হতে বেশী সময় লাগে না। তাছাড়া এ-বিয়েতে যশোদার মত নেই।'

'কী আশ্চর্য!' সত্যি সত্যি আমার বিষম অবাক লাগছিল। এই কয়েকদিনের মধ্যেই যশোদার কথা জয়ন্তর মুখে এত শুনেছি যে, ওদের আলাদা করে ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। অনিমেষকে আবার প্রশ্ন করলাম, 'জয়ন্ত খবরটা জানতে পেরেছে কবে?'

'আজ সকালেই যশোদার চিঠি এসেছে। সে-ই লিখে জানিয়েছে।'

এতক্ষণে লীলাবতী কথা বলল, 'তাই জয়ন্ত পালিয়ে গেল। অথচ এই বিষয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে যাবারও কোন অর্থ হয় না। ব্যাপারটা ওর নিতান্তই ব্যক্তিগত। ওর মত ফূর্তিবাজ লোকের দুঃখ দেখলে সত্যি সত্যি ভারী কষ্ট হয়।' লীলাবতীর মুখে কথা ফুটে উঠল। ওর আয়ত চোখে দুঃখের ছায়া ঘন হয়ে এল।

অনিমেষ সিগারেট টানছিল। ছোট সিগারেটের শেষ অংশে নতুন সিগারেট চেপে ধরে আগুন লাগিয়ে নিচ্ছিল। বললাম, 'অনিমেষ বড্ড বেশী সিগারেট খাচ্ছো আজকাল।'

'অথচ ডাক্তার অনিমেষবাবুকে এত বেশী সিগারেট খেতে বারণ করেছিল।' লীলাবতী কথা বলতে বলতে ঘন ঘন অনিমেষের দিকে তাকাতে লাগল।

অনিমেষ নির্বিকারভাবে সিগারেট টানতেই লাগল। যেন এইসব কথাবার্তা কিছুই ওকে স্পর্শ করছে না। অনিমেষ এক এক সময় কী ভয়ানক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে! ও যে কোন কথা না বলে নির্বিকার চিত্তে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে, এ যেন লীলাবতীকে অগ্রাহ্য করার একটা চেষ্টাকৃত প্রয়াস। অথচ এ-ধরনের ব্যবহার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনিমেষের এই ব্যবহারের জন্য আমি ভেতরে ভেতরে লীলাবতী দেশপাণ্ডের কাছে যেন নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে শুরু করলাম। লীলাবতীকে লক্ষ্য করে বললাম, 'অনেকটা

পথ ট্রেনে করে এলেন, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, দুপুরে ঘুমোলেই পারতেন।'

লীলাবতী বিমর্ষভাবে হেসে বলল, 'দুপুরে ঘুম হয় না। তাছাড়া মনের মধ্যে একটা লোভও ছিল, ভেবেছিলাম, আমাকে দেখে আপনারা সবাই খুশী হবেন।

'কী আশ্চর্য! এখনও অনিমেষ কথা বলল না। বাধ্য হয়ে আমাকেই বলতে হল, 'বিশ্বাস করুন, আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি।'

লীলাবতী খুব জোরে হেসে উঠল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি দেখছি খুব ভদ্র আর অমায়িক লোক। মানুষকে কষ্ট দিতে কষ্ট পান।'

লীলাবতীর এই হাসিতে সত্যি সত্যি অস্বাভাবিক বিব্রত বোধ করলাম। জোর গলায় বলে উঠলাম, 'জয়ন্তর মুখে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখার শুধু ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছেটা যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে বুঝতে পারি নি।'

'খিয়ালি?' লীলাবতী যেন আনন্দে নেচে উঠল।'

'সত্যি বিশ্বাস করুন।'

লীলা চেয়ারের উপরে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে বলল, 'বিশ্বাস করলাম। শুধু যে বিশ্বাস করলাম তা-ই না, ভীষণ খুশীও হলাম।

নিজেকেই নিজের আদর করতে ইচ্ছা করল। সামান্য দুটো মিষ্টি কথা দিয়ে একজন মানুষকে খুশী করতে পারলে কার না আনন্দ হয়। তাছাড়া লীলাবতীর মত সুন্দরী মেয়েকে বিরস বদনে বসে থাকতে দেখলে কার কি লাগে জানি না, আমার খুব খারাপ লাগে। মনে হয় সমস্ত ছন্দপতনের জন্য আমিই যেন দায়ী।

অনিমেষ সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বললাম, 'কোথায় চললে?'

অনিমেষ বলল, 'একটা ব্রেক-ডাউন কল আছে, দেখে আসি।'

'আর একটু পরেই তো ছুটি হয়ে যাচ্ছে। কাল ভোরেই না হয় যেও।'

'নাঃ, কাজটা সেরেই আসি।' বলে অনিমেষ দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লীলাবতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার জন্যে আপনাকে যেতে হবে না অনিমেষবাবু। আমিই চলে যাচ্ছি।'

আমি উঠে এসে লীলাবতীর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আর একটু পরে সবাই একসঙ্গে উঠবো। আপনাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আমি আর অনিমেষ চলে যাব। তুমিও একটু বসে যাও অনিমেষ। তোমরা দুজনে গল্প কর, আমি একটা চিঠি ড্রাফট করছি।' বলে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেলাম। অথচ লিখবার মত কোন চিঠি আমার ছিল না। চিঠি লেখার অবকাশে আমি ওদের ভাল করে বুঝতে চেয়েছিলাম। ওদের রহস্যজনক ব্যবহার আমাকে অসম্ভব বিস্মিত করেছিল। কিন্তু অনিমেষ আর লীলাবতী একটাও কথা বলল না। মুখ না তুলেও বুঝতে পারছিলাম, অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও টেবিলের উল্টো দিক থেকে আমার চিঠি পড়া অনিমেষের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়, তবু আমাকে যথাসাধ্য সতর্ক হয়ে চিঠির খসড়া করতে হচ্ছিল।

হঠাৎ লীলাবতী কথা বলে উঠল, 'কাজের সময় এসে পড়ে আপনাদের ক্ষতি করলাম বলে মনে কিছু করলেন না তো মিস্টার চ্যাটার্জি।'

হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'আপনি এসে নিশ্চয়ই আমাদের কাজ করতে দেখেন নি।'

লীলাবতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আপনারা ভীষণ ফাঁকিবাজ।'

'যা বলেছেন।' বলে মুখ তুলে তাকাতেই অনিমেষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। অনিমেষের চোখে মুখে কোথাও কৌতুক ছিল না। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'ডাক্তার তোমাকে সিগারেট খেতে বারণ করেছেন, তবু এত সিগারেট খাও কেন?'

অনিমেষের চোখে নীরব হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আমি এখন সিগারেট খাচ্ছি না।'

অপ্রস্তুত না হওয়ার ভান করে বললাম, 'কিছুক্ষণ আগেই অসম্ভব সিগারেট খাচ্ছিলে।'

'তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার ওঠ।' বলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। চোখের সামনে কাগজের দিকে চোখ গেল। সেখানে কয়েকটা কাটাকুটি ছাড়া একটাও অক্ষত লাইন নেই। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

একসঙ্গে এসে অফিসের গাড়িতে উঠলাম। লীলাবতী মাঝখানে বসল। আমি আর অনিমেষ দু পাশে।

গাড়ি চলেছে। তিনজন পাশাপাশি বসে রয়েছি। কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ লীলাবতী বলে উঠল, রোববার কোন এনগেজমেন্ট আছে?'

বললাম, 'আমার তো একটাই এনগেজমেন্ট। প্রতি রবিবার অনিমেষের বাড়িতে খাওয়া। ওর বোন বিভা খুব ভাল রাঁধে।'

'আমি ওর রান্না খেয়েছি। নেমন্তন্ন করে কেউ খাওয়ায় নি অবশ্য। জোর করে একদিন খেয়ে এসেছি।' লীলাবতীর দিকে না তাকিয়েও বুঝলাম, ও চোখের ফাঁক দিয়ে অনিমেষকে দেখে নিল। অনিমেষ উত্তর দিল না। যেমন বসে ছিল, তেমনভাবেই বসে রইল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার আলো এসে গাড়ির মধ্যে পড়ছিল। অনিমেষকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন গভীর কোন চিন্তায় ডুবে রয়েছে। এখানেই অনিমেষকে আমি বুঝতে পারি না। যখন সবার মধ্যে থেকেও অনিমেষ এক গভীর নিঃসঙ্গতায় তলিয়ে যায়, তখন আমার ভয় করে। মনে হয়, একজন অতিপরিচিত মানুষ যেন কুয়াশার গাঢ় পর্দার আড়ালে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

'আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার কোন উপায় আমার নেই লীলাবতী। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' হঠাৎ অনিমেষ যে এভাবে কথা বলে উঠবে বুঝতে পারি নি। আমি আর লীলাবতী একসঙ্গেই প্রশ্ন করে উঠলাম, 'কেন?'

অনিমেষ নিজের মনেই যেন উচ্চারণ করল, 'কেন? এই কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে এটুকু জেনে রাখুন, সে উপায় যদি আমার থাকতো, আমি খুব খুশী হতাম। আমরা এখানে নামবো। এসো অংশু।' গাড়ি দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে অনিমেষ নেমে গেল। বাধ্য হয়ে আমাকেও নামতে হল। গাড়ির জানালা দিয়ে লীলাবতীর মুখ দেখা যাচ্ছিল। লীলা হাত তুলে আমাকে নমস্কার করল। রাস্তার আলো এসে লীলাবতীর মুখে পড়েছে। ওকে একজন নরম আর দুঃখী মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

রাস্তায় নেমে অনিমেষ ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। ফুরফুরে হাওয়ায় শরীর ও মনের ক্লান্তি কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে গেল। এক সময় বললাম, 'মেয়েদের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় প্রীতি যেমন বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়, সময় সময় প্রচণ্ড বিরাগও কিন্তু খুব সুখকর হয় না।'

অনিমেষ উত্তর না দিয়ে হাঁটতে লাগল। এতক্ষণ হয়ে গেল, অনিমেষ একটা সিগারেটও ধরাল না। এমন কী ভাবছে অনিমেষ যে সিগারেট খেতেও ভুলে গেছে। বললাম, 'তোমার কোন কাজ নেই, তা সত্ত্বেও নেমে পড়লে কেন? বাড়ি তো এখনও অনেক দূরে।'

অনিমেষ নীচু স্বরে বলতে লাগল, 'কিজানি কেন নেমে পড়লাম। অথচ না নেমেও আমার উপায় ছিল না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন ক্রমশই একটা অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। জানি না, আমি কি করবো। কি করতে পারি আমি।' বলতে বলতে আবেগে অনিমেষের গলা কাঁপতে লাগল।

অনিমেষের অসহায়তা আমাকে স্পর্শ করল। বললাম, 'যদি আপত্তি না থাকে, তোমার কথা আমাকে বলতে পার। সাহায্য করতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু বললে তোমার মনের ভার লাঘব হবে অনিমেষ।'

অনিমেষ আমার একটা হাত চেপে ধরল, ওর হাত ঘামে ভিজে উঠেছে। অনিমেষ যেন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে অনিমেষ বলে উঠল, কী বলবো, কেমন করে বলবো! যাকে কাছে পেতে মন চায়, সে কাছে এলে কেন দূরে সরে যেতে চাই। সেকথা আমি কেমন করে বোঝাবো। কে আমার কথা বুঝবে! এদিকটায় রাস্তা একটু ফাঁকা। আলোগুলো অনেকটা দূরে দূরে। অনিমেষের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। দু হাত দিয়ে অনিমেষের হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি বলো অনিমেষ। আমি তোমার কথা বোঝার চেষ্টা করবো।'

অন্ধকারের মধ্যে অনিমেষের কথা কানে আসতে লাগল। অনিমেষ যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে। ওর কথা অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল। 'লীলা আমাদের বাড়িতে যে দিন গিয়েছিল—বিভার রান্না খেয়েছিল, সেদিন বিভা সমস্ত রাত ঘুমোয় নি। শুধু চেঁচিয়েছে, আর ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত লীলা মনে করে নিজের গলাই টিপে ধরেছিল বিভা। আমি গিয়ে না পড়লে নিজেকেই নিজে খুন করে ফেলতো।' অনিমেষ থামল। কিন্তু অনিমেষের কথাগুলো যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। অনিমেষ গিয়ে না পড়লে বিভা নিজেকেই নিজে খুন করে ফেলতো! কেন নিজেকে খুন করে ফেলতো বিভা!

'অনিমেষ আবার চলতে লাগল, 'অথচ লীলাকে একথা বলা যায় না। লীলা বুঝবে না। মনে মনে বিস্মিত হবে, আমাকে পাগল ভাববে।'

'কিন্তু এ বিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত, বিভা শুধুমাত্র লীলাকে দেখলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে?'

'শুধু লীলাই না। সুপ্রিয়াকে দেখেও একবার এ রকম হয়েছিল ওর। অথচ যখন সুস্থ হয়, তখন কিছুই মনে থাকে না। ডাক্তাররা বলে, এ এক ধরনের পরনির্ভরশীলতা। বিভা আমার ওপর নির্ভর করে, আমাকে ভালবাসে। ও চায় না, এই ভালবাসার অংশীদার আর কেউ হয়। ভাবতে পারো, এমন কি মাও ওর সামনে আমার সঙ্গে বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে পারে না! বিভা সন্দেহের চোখে তখন মার দিকে তাকায়!' কথা বলতে বলতে অনিমেষের গলা ভারী হয়ে এল। অনিমেষ চুপ করল।

বললাম, 'আমার মনে হয়, লীলাকে এ বিষয়ে জানানো উচিত।'

'ও বুঝবে না। বুঝলেও মানতে চাইবে না। তার চেয়ে ও যদি বুঝতে পারে, আমি ওকে এড়িয়ে যেতে চাই, একদিন হয়তো দূরে সরে যাবে ও।'

হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের বাড়ির কাছে চলে এলাম। অনিমেষদের বারান্দার আলো জ্বলছে। বারান্দায় একটা ছায়া ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনিমেষ বলল, 'একটা ভালবাসার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে বিভা। এ যে ওর কী শাস্তি, আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝতে পারি। যতক্ষণ না ফিরবো, ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। খাবে না, বসবে না, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলবে না।'

'একটা কথা বলবো অনিমেষ?'

অনিমেষ বলল, 'বলো।'

'বিভার বিয়ে দাও। চেষ্টা করলে এমন ছেলে পাওয়া অসম্ভব না, যে অন্তত কিছু টাকা পণ নিয়েও—'

কথা শেষ হবার আগেই অনিমেষ চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'ছিঃ, এ কী বলছো তুমি!'

হঠাৎ নিজের কাছে নিজেই যেন খুব ছোট হয়ে গেলাম। খুব ছোট একজন মানুষ। আর অনিমেষকে খুব বড় কেউ বলে মনে হতে লাগল।

গেটের মুখে দাঁড়িয়ে অনিমেষ ডাকল, 'এসো।'

বিভা তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এসে অনুযোগের সুরে বলল, 'এত দেরী যে আজ। কথা ছিল না, সকাল সকাল এসে বেড়াতে নিয়ে যাবে।' আমাকে যেন বিভা এইমাত্র দেখল। দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'একী, আপনি বাইরে কেন? আসুন, আজ ক্ষীরের চপ করেছি, ভাল হয় নি তেমন, তবু খেয়ে দেখবেন, আসুন।'

'আজ না, আর একদিন।' বলে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত রাস্তা দিয়ে ছুটে চললাম। বিভার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত শক্তি আমি যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হোটেলে ফিরে এলাম। এসে শুনলাম, এক ভদ্রলোক আমার খোঁজে দুবার এসে ফিরে গেছেন। বলে গেছেন, আবার আসবেন। ঘরে এসে কাপড়-জামা ছাড়তে না ছাড়তেই দরজায় শব্দ উঠল। দরজা খুলতেই চোখের সামনে যাকে দেখতে পেলাম, তাকে দেখার কল্পনা এই মুহূর্তে ছিল না। চোখের সামনে রতন ব্রহ্মচারীর বিভ্রান্ত মূর্তি আমাকে বিস্মিত করল। বললাম, 'এই অসময়ে?'

ব্রহ্মচারী হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফেটে পড়লেন, 'আমিও ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার বাপ-ঠাকুর্দা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে কোনদিন জলস্পর্শ করেননি। সেই বংশের সন্তান আমি। অভিশাপ দিলে ফলবেই ফলবে।' সার্টের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ব্রহ্মচারী বোধ করি উপবীতের সন্ধান করতে লাগলেন।

বললাম, 'ব্যাপার কি ব্রহ্মচারী মশাই? এত উত্তেজিত হবেন না। বসুন।'

ব্রহ্মচারী না বসে দাঁড়িয়েই রইলেন। বড় বড় নিশ্বাসে ও'র ভারী বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড আবেগে ব্রহ্মচারী খণ্ড খণ্ড হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়বেন। এক সময় উনি বলে উঠলেন, 'জানেন স্যার স্কাউণ্ড্রেলটা কী করেছে!' ব্রহ্মচারীর শরীর আবার থর থর করে কাঁপতে লাগল। অত্যধিক উত্তেজনায় মানুষের হৃদপিণ্ড সময় সময় বিকল হয়ে যেতে পারে এমন একটা ধারণা থাকায় ভয় পেয়ে গেলাম।

ব্রহ্মচারীকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিতেই উনি দুই হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে ফেললেন। কিছুক্ষণ সেইভাবে বসে থেকে ব্রহ্মচারী মুখ তুললেন। অসম্ভব লাল আর ফোলা ফোলা চোখ দুটো। সমস্ত মুখে যেন কালি মাখানো। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'প্রত্যেকের জীবনেই এক সময় বিপদ আসে, কিন্তু তাতে মুষড়ে পড়লে তো চলে না।'

কথায় দারুণ কাজ হল। ব্রহ্মচারী বুক টান করে বসলেন। মাথা উঁচু করে বললেন, 'ব্রহ্মচারিরা একমাত্র ভগবান আর বাপ ঠাকুর্দা ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। আমিও দেশপাণ্ডেকে দেখে নেবো স্যার।' দেশপাণ্ডের নাম বলে ফেলেই যেন ব্রহ্মচারী বিব্রত বোধ করলেন। নিমেষের মধ্যে সেই ভাব কাটিয়ে বলে উঠলেন, 'বেইমানী দ্বারা আর যাই হোক, কোন মহৎ কাজ হয় না। আপনিই বলুন, হয় কি?'

ভালমন্দ উত্তর না দিয়ে ব্রহ্মচারীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ব্রহ্মচারী ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগলেন। উনি যেন কথা হারিয়ে ফেলছেন, 'বিশ্বাস করুন স্যার, খাওয়া-দাওয়ার পর সবেমাত্র চোখ দুটো বুজে এসেছে, অমনি ফাদার্স কমাণ্ড, রতন, এক্ষুনি চ্যাটার্জি সাহেবের বাড়ি যা। সৎ ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁকে দুটো মিষ্টিমুখ করিয়ে আয়। দেখুন স্যার, বলতে বলতে লোম কী রকম দাঁড়িয়ে গেছে। দেখুন—' বলে লোমশ একটা হাত আমার চোখের খুব সামনে তুলে ধরলেন ব্রহ্মচারী।

বলার মত কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে ছিলাম। ব্রহ্মচারী হঠাৎ আমার একটা হাত টেনে নিয়ে একগোছা নোট সেই হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললেন, 'ব্রাহ্মণ-সন্তান স্যার, ফাদার্স কমাণ্ড না মেনে উপায় নেই। ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। মিষ্টি কিনে খাবেন স্যার। আগরওয়ালা ব্যাটা কী কম শয়তান স্যার। উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাবার শরণাপন্ন হল।'

'আগরওয়ালা আপনার বাবার সন্ধান পেল কি করে?' বলতে বলতে সমস্ত রহস্য হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। হাত সরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'একটু ভুল করেছেন, রতনবাবু, টাকাটা যথাস্থানে দিন, কাজ হবে। আমার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত কোলকাতা অফিসই নেবে। আপনি এখন আসুন।' বলে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ব্রহ্মচারী আমার পা দু হাত দিয়ে চেপে ধরতে গেলেন। সরে গিয়ে বললাম, 'করছেন কী।' ব্রহ্মচারী শুনলেন না, পা চেপে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ যে এভাবে কাঁদতে পারে জানা ছিল না। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

বাধ্য হয়েই ব্রহ্মচারীকে জোরে ধমক দিতে হল, 'আপনি যদি এভাবে নাটক করেন, বাধ্য হয়ে আমাকেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

ধমকে কাজ হল। ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়ালেন। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'আপনি কোনদিন বয়স্ক কোন মানুষকে কাঁদতে দেখেছেন স্যার? দেখেননি। আমিও কাঁদি না। আজ হঠাৎ কী যে হল! হয়ত দয়ালু মানুষ দেখলেই মানুষের কান্না পায়।'

শান্তভাবে বললাম, 'আমি দয়ালু মানুষ না। তাছাড়া আমার কাছ থেকে দয়া বা করুণা আপনি নেবেনই বা কেন? ও দুটোই মানুষকে ছোট করে দেয়।'

'আপনার কাছে আমার ছোট হতে আপত্তি নেই স্যার। আগরওয়ালা যদি ডিলারশিপ না পায়, আমি মুখ দেখাতে পারবো না।' একটু থেমে ব্রহ্মচারী আবার বললেন, 'শুধু মুখ দেখানো না, আমাকে দেশছাড়া হতে হবে।'

আমার বিস্ময় ক্রমশই চরমে উঠছিল। 'আপনাকে দেশ ছাড়তে হবে কেন?'

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ কী ভেবে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না স্যার, আগরওয়ালা কিছু টাকা খরচা করেছে।'

'আপনি টাকা খেয়ে বসে আছেন? অথচ সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক থাকা উচিত না।'

ব্রহ্মচারী একটুও দমলেন না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কার যে কোথায় কী সম্পর্ক গড়ে উঠছে কে বলতে পারে স্যার। আপনিই কি ভেবেছিলেন, জামসেদপুরে কে আপনাদের কোম্পানীর মাল বেচবে না বেচবে তার জন্যে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। শুধু যে যেতে হবে তাই না, একটা নোংরা কাজ আপনার হাত দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে।'

আবার গোলক-ধাঁধার মধ্যে পাক খেতে শুরু করলাম। বললাম, 'নোংরা কাজ?'

'নোংরা কাজ ছাড়া কী বলবেন একে। দস্তুর কোম্পানী কি সত্যি সত্যি ডিলার হওয়ার উপযোগী?'

'কে আপনাকে বলেছে যে, দস্তুর কোম্পানী আমাদের ডিলার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে। আমার রিপোর্ট এখন পর্যন্ত কোলকাতায় পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ, পৌঁছলেও ডিসিসন হয়তো এখনও নেওয়া হয়নি।'

আমার কথা শুনে ব্রহ্মচারীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'আমাকে লুকোচ্ছেন কেন স্যার। আমি আপনার বন্ধু লোক, বিদেশে বাঙালী, বলতে গেলে আমরা তো এক ফেমিলিরই মেম্বার, তাই কিনা স্যার, বলুন। আপনি যা করেছেন বেশ করেছেন। দস্তুর ডিলারশিপ পাক আমার আপত্তি নেই। আগরওয়ালাকেও আর একজন ডিলার করে দিন স্যার। গরীবের এই কথাটা রাখুন, না হলে ধনে-প্রাণে মারা যাব।'

ব্রহ্মচারী আমার হাত ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিলেন। দূরে সরে গিয়ে বললাম, 'আপনি যদি না বসেন, আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব। কে আপনাকে বলেছে যে, দস্তুর ডিলার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে?'

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'সত্যি আপনি জানেন না? কী আশ্চর্য! আমি নিজের চোখে চিঠি দেখে এসেছি। আজকের ডাকেই চলে গেল।'

'কে আপনাকে চিঠি দেখিয়েছে?'

'কেউ না।' ব্রহ্মচারী অম্লানবদনে বলে ফেললেন।

'কেউ না দেখালে চিঠি উড়ে এসে আপনার হাতে পড়তে পারে না। চিঠি দেখানোর প্রশ্নটা বড় না। প্রশ্ন হচ্ছে আমার সাজেসন না নিয়ে হঠাৎ এই কাজ করা হল কেন?'

ব্রহ্মচারীর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তবেই বুঝুন স্যার কী সব হচ্ছে এখানে। দু'দিন পরে এখানে ফ্যাক্টরী হবে, লাখ লাখ টাকার লেনদেন হবে, তখন যে কী হবে!'

আমার মাথা ক্রমশই গরম হয়ে উঠছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'কিছুই হবে না। কিছুই হতে দেব না।'

'কিন্তু সবার বিরুদ্ধে একা লড়াই করার মত শক্তি কি আপনার হবে স্যার?' কথা বলে সাগ্রহে ব্রহ্মচারী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললাম, 'একা কেন, সেদিন কি আপনাকে সঙ্গে পাব না?'

'নিশ্চয়ই পাবেন স্যার। ন্যায় যেদিকে, আমি সেই দিকে। বাবা বেঁচে থাকতে বলতেন, দ্যাখ্ রতন—'

অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলাম, 'বাবার কথা থাক। একটা কথা শুধু আমাকে বলে যান, এই অফিসে বন্ধু বলে আমি কাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। আপন মনে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কী সব বিড় বিড় করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, 'যদিও লোকটাকে আমি কোনদিন ভাল চোখে দেখি না, তবু মিথ্যে কেন বলবো স্যার, আপনার বন্ধু হবার উপযুক্ত লোক এখানে একজনই আছে, অনিমেষ দত্ত।'

'অনিমেষ দত্ত লোক কেমন?' অনিমেষ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করে জানতে ইচ্ছে করল, বিশেষ করে ওর সঙ্গে লীলাবতীর সম্পর্ক আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল।

ব্রহ্মচারী বললেন, 'লোকটি সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ এক কথায় কিছু বলা যায় না। ও দারুণ ভাল, আবার দারুণ খারাপ। ভাল বলতে পয়সা-কড়ি ছোঁয় না। মেয়েমানুষের দিকে ঝোঁক নেই। কাজেও নাম আছে। খারাপ বলতে অসম্ভব অহঙ্কারী। মানুষের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে না পর্যন্ত। আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ক'টা কথা হয়েছে গুনে বলা যায়।'

'ওর সঙ্গে তো দেশপাণ্ডে সাহেবের মেয়ের খুব ভাব বলে মনে হল।'

'আপনি কি করে জানলেন স্যার?' ব্রহ্মচারী পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন।

'যে করেই হোক, জানি, কথাটা সত্যি কিনা বলুন।'

'হ্যাঁ সত্যি!'

'এ নিয়ে দেশপাণ্ডে কিছু বলেন না?'

'বলে না আবার! প্রচণ্ড গর্জায় স্যার। যেন শেকল-বাঁধা সিংহ। সেবারে তো আর একটু হলে আমার মুখেই একটা ঘুঁষি জমিয়ে দিতে যাচ্ছিলো দেশপাণ্ডে। দোষের মধ্যে আমি বলেছিলাম, ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট। লীলা আর অনিমেষকে নাকি বাজারে দাঁড়িয়ে গল্প করতে দেখেছিল কে, এই নিয়ে কী হুলস্থুল কাণ্ড। অথচ লোকটা এমন কাওয়ার্ড স্যার, নিজের মেয়েকে একটা কথা বলতেও সাহস করে না। অনিমেষকে দেখলে তো সাত হাত দূর থেকে পালায়।

'কেন?'

ব্রহ্মচারী কী বলতে গিয়েও যেন বললেন না। শুধু বললেন, 'বড়লোকের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে শুধু মাথার ব্যথা বাড়ে বৈ তো নয়। আমি গরীব। গেরস্থ মানুষ, সেইভাবেই থাকি। আর দেরী করবো না স্যার। আজ উঠি। বড় আশা করে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি শক্তিমান লোক, কিন্তু এভাবে ল্যাং খেয়ে যে পড়ে যাবেন, বুঝতে পারিনি।'

ব্রহ্মচারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বলে গেলেন, 'বাবা একটা কথা খুব বলতেন। বলতেন, শয়তানের সঙ্গে শয়তানি না করলে শয়তান জব্দ হয় না। কথাটা খুব দামী। আজ চলি স্যার।' ব্রহ্মচারী দু' হাত কপালে ছুঁইয়ে রেখে পিছু হটতে হটতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান স্যার। বয়সেও আপনার চেয়ে অনেক বড়, আমি বলে যাচ্ছি, ন্যায়ের পথ ধরে এগিয়ে চলুন, একদিন না একদিন আপনি জয়ী হবেনই।'

(ক্রমশঃ)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা : বেকার সমস্যা

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

কারা বেকার ?

যারা কাজ খোঁজে অথচ কাজ পায় না তাদেরই বলা হয় বেকার। ধরুন, আমার স্ত্রী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের বধূ—হঠাৎ ঠিক করলেন যে চাকরি করবেন। কারণ হতে পারে, বর্তমান স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের যুগে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল থাকা তিনি আর যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, কিংবা ছেলে-মেয়ে দুটি বড় হ'য়ে স্কুলে যেতে সুরু করছে আর ফলে দুপুরে তাঁর কোন কাজই নেই, কিংবা হয়ত মনে মনে ভেবেছেন ভদ্রলোকের মত(!) থাকতে হ'লে এই দুর্মূল্যের বাজারে আরও কিছুটা আয় বৃদ্ধি করা দরকার যা তাঁর অর্ধ-অকর্মন্য স্বামীর সামর্থ্যে কুলোবে না, কিংবা ঐ রকম আর কিছু। তা কারণ যাই হোক, এতদিন তিনি ছিলেন 'নিরাকারা', হঠাৎ হ'য়ে গেলেন বেকার (স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক কী হয় জানি না)। ফলে দেশের বেকারের সংখ্যায় এক যোগ হ'ল। এতদিন কোন ফরম পূরণ করতে হলে পেশার ঘরে তিনি হয়ত লিখতেন 'গৃহস্থালি' বা ইংরেজীতে হাউস-হোল্ড ডিউটিজ', এখন থেকে হয়ত লিখতেও কর্মপ্রার্থী' (প্রার্থিনী) বা 'জব-সিকার'।

চব্বিশ পরগণার এক গ্রামের স্কুলে পড়ত সাধন কর্মকারের ছেলে রতন, হাপরশালে বাপকে সাহায্যও করত। কিন্তু জাতব্যবসা আর চলে না, গ্রামীণ কর্মকারের তৈরী কাটারি-কাস্তে এমনকি লাঙলের ফলারও আর বিশেষ চাহিদা নেই। আর পড়াশুনোও রতনের ভাল লাগে না। সাধন তার ভাই পরাণকে বলে কয়ে রতনকে পরাণের কাছে নৈহাটীতে পাঠিয়ে দিলে—যদি একটা কাজ-টাজ পাওয়া যায়। পরাণ সেখানে এক চটকলে চাকরি করে।

বিহারের আরা জেলা থেকে এসে শহর-তলীতে খাটাল খুলেছিল রামবেয়াস রাই। দুধের ব্যবসা আর ভাল চলে না, পশুখাদ্যের দাম বেহারে বাড়ছে, সেই অনুপাতে দুধের দাম বাড়ানো হলে খদ্দের থাকে না। তাছাড়া খাটালের জমি নিয়েও নিয়ত ঝামেলা লেগে আছে। এর চেয়েও আশপাশের কলকারখানায় যদি একটা চাকরি পাওয়া যায়!

শেষপর্যন্ত রামবেয়াস খাটাল একরকম তুলেই দিল, বা তুলে দিতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু সে আর আরা জেলায় ফিরে গেল না। ফলে নগরাঞ্চলে বেকারের অলিখিত তালিকায় অদৃশ্য কালিতে আর একটা সংখ্যা যোগ হ'ল।

কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবংগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্নাতক পরীক্ষার ফল বেরুল (আজকাল আর একসংগে, এমনকি কাছাকাছিও বেরোয় না)। সফল ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০ হাজারের মত। এর মধ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ পেল বা ঐ শিক্ষায় গেল ১০ হাজারের মত (পশ্চিমবংগ রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সহ-সভাপতি ডাঃ অজিতকুমার বসু প্রদত্ত পরিসংখ্যান)। বাকী ৪০ হাজার রাতারাতি হ'য়ে গেল বেকার—যাদের বোধহয় একটু সম্মান করেই বলা হয় 'শিক্ষিত বেকার।'

স্নাতকোত্তর শিক্ষায় যে ১০ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী ঢুকল তাদের অধিকাংশই পাস করে বা ফেল করে বা মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং এই অধিকাংশও সম্ভাব্য বেকার। অবশ্য ছাত্রীদের অনেকে বরমাল্যের দৌলতে এই আশংকা থেকে আপাতত মুক্ত থাকবে, এবং পরে আমার স্ত্রীর মত কর্মপ্রার্থিনীর তালিকা পূর্ণ করবে।

আমার স্ত্রী, চব্বিশ পরগণার গ্রাম থেকে আগত রতন, পূর্বতন খাটালওয়ালা রাম-বেয়াস এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা পর্ষদের ছাপ মারা শিক্ষিত বেকার ছাড়া আরও এক-রকম কর্মপ্রার্থী আছে যা প্রচ্ছন্ন বা অর্ধ-বেকারত্বের কবলে পতিত। এরাও নিয়োগ-হীন, তবে পুরোপুরি নয়—মাত্র আংশিক-ভাবে। সুতরাং সমস্যা হ'ল উভয় শ্রেণীকে নিয়েই, এবং সমস্যাকে ব্যাপক অর্থে নিয়োগ-হীনতার সমস্যা বলা হয়।

নিয়োগহীনতা ও লাভজনক নিয়োগ :

অর্থনীতিতে উৎপাদনের যে কোন উপা-দান—জমি শ্রম মূলধন সংগঠন—অলস অবস্থায় থাকলেই তাকে নিয়োগহীনতা বলে অভিহিত করা হয়। শ্রমের ক্ষেত্রে এই নিয়োগহীনতার ফলে ঘটে সম্পূর্ণ অপচয়, কারণ শ্রমই সর্বাপেক্ষা ধ্বংসশীল উপাদান। একটি শ্রমহীন দিন চলে গেলে তা আর ফিরে আসবে না, শ্রম দপ্তরের খাতায় হয়ত লেখা পড়বে : ষয়াল ম্যান-ডে লস্ট। জমি যা প্রাকৃতিক সম্পদ। মূলধন-দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি এভাবে অব্যবহারের দরুণ সম্পূর্ণ অপচিত হয় না, বেশীদিন অব্যবহারে থাকলে কিছুটা অকেজো হয়ে পড়তে পারে মাত্র।

শ্রমিক যদি পুরোপুরি বেকার থাকে অপচয় হ'ল সম্পূর্ণ, আর নিয়োগহীন হয়ে থাকলে অপচয়কে আংশিক বলে ধরা হয়; যারা এইভাবে আংশিক নিয়োগহীন হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অর্থনীতির ভাষায় তাদের বলা যায় : লাভ-জনকভাবে নেযুক্ত নয় নট গেনফুলি এম-প্লয়েড। অর্থাৎ তারা দেশের উৎপাদন কার্যে যতটা সহায়তা করে উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারত তা বর্তমান অর্থব্যবস্থায় তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লাভজনকভাবে নিযুক্ত। এই দেশে শ্রমের অপচয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা করার জন্যে বোধহয় আর কোন তথ্য বা পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই।

বেকার-সমস্যার গুরুত্ব :

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উৎপাদনের উপাদান হ'ল সংখ্যায় দুই : প্রকৃতি ও মানুষ। অর্থাৎ প্রকৃতির দানকে কাজে লাগিয়ে—প্রাকৃতিক পরিবেশকে উপযোগী করে তুলে মানুষ তার মৌল অর্থনৈতিক সমস্যা—অভাব মোচনের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমের অপচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে সমাজ-ব্যবস্থা এই অপচয় হতে দেয়, তাকে অন্তত অপারগতার অভিযোগে অভিযুক্ত না করে উপায় নেই। এই কারণে শ্রমের অপচয়ের সমস্যা বা চলতি ভাষায় যাকে বলে বেকার সমস্যা আর তত্ত্বগত আলোচনার জন্যে পাঠ্য-পুস্তকে নিবদ্ধ নেই—তা আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজবিপ্লবের পূর্বাভাষ হতে পারে।

বলা হয়, সরকারের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের মৌল উদ্দেশ্য হ'ল জনসাধারণকে অভাব থেকে আগামী দিনের ভাবনা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু জনসংখ্যার একাংশ যদি সম্পূর্ণ বেকার এবং আর এক অংশ আংশিক নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে তবে নাগরিক মূল্যায়নে সরকারী অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে

ব্যর্থ ছাড়া আর কি বলে অভিহিত করা যায়? তাই বেকার-সমস্যার সমাধান সকল দেশেরই অর্থনৈতিক কর্মক্রমের লক্ষ্য—অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বিশ্বজনীন সমস্যা ঃ

অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বাইরে অত্যুন্নত, উন্নত বা স্বল্পোন্নত কোন দেশই স্থায়ী পূর্ণনিয়োগাবস্থার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। তাই দেখা যায়, তারা প্রায়ই নিয়োগহীনতার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কানাডার সাধারণ নির্বাচনে অন্যতম 'ইস্যু' ছিল এই বেকার-সমস্যা। বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, বিরাট মূলধন-সম্পদ সমন্বিত কিন্তু জনবিরল দেশ কানাডায় বেকারত্বের পরিমাণ হ'ল ৭ শতাংশের ওপর। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, উগান্ডা থেকে এশিয়ানদের বিতাড়নের মূলেও এই সমস্যা—উগান্ডাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক খোলা এবং প্রচ্ছন্ন নিয়োগহীনতা।

প্রকার ভেদ ঃ

তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মেনী, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি অত্যুন্নত বা উন্নত দেশ এবং ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের বেকার-সমস্যার মধ্যে বিশেষ প্রকার ভেদ আছে। অত্যুন্নত ও উন্নত দেশের বেকার-সমস্যা প্রধানত দু' ধরনের ঃ ঋতুগত বেকারত্ব এবং সাইক্লিক্যাল বা মন্দা বাজারজনিত বেকারত্ব। বছরের কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ জিনিসপত্রের চাহিদা কমে গেলে ঐ সব জিনিসপত্রের উৎপাদন হ্রাসের দরুণ যে নিয়োগ হ্রাস ঘটে তাকেই ঋতুগত বেকারত্ব বলা হয়। যেমন, শীতকালে আইসক্রীমের চাহিদা কমে গেলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয় তা' হল ঋতুগত বেকারত্ব। অপর দিকে ব্যবসাবাণিজ্যে তেজী ভাবের পর মন্দা দেখা দিলে সব জিনিসপত্রের চাহিদাই কমে যায়। ফলে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকারত্বই মন্দা বাজারজনিত বেকারত্ব বলে অভিহিত।

ভারতের বেকার-সমস্যা ঃ

কৃষিপ্রধান এবং ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ ভারতে ঋতুগত বেকারত্ব ব্যাপক হলেও যাকে মন্দাবাজারজনিত বেকারত্ব বলে তার সাক্ষাৎ বর্তমানে ঠিক পাওয়া যায় না। এর জায়গায় দেখা যায় যাকে বলে টেকনোলজিক্যাল বা কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত এবং স্ট্রাকচারাল বা সংগঠনজনিত বেকারত্ব। এর ওপর অবশ্যই আছে কৃষিগত বেকার-সমস্যা এবং শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা। শেষোক্ত সমস্যাই বোধহয় জটিল। কারণ, এই সব শিক্ষিত বেকাররা শুধু নিয়োগহীন নয়, তাদের অধিকাংশ নিয়োগযোগ্যতাহীনও বটে। অপর দিকে তারাই কিন্তু আবার বেকারদের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার শ্রেণী।

কলাকৌশলের পরিবর্তনের ফলে কি পরিমাণ বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে তা চারদিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়। ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারাভ্যানদের আর কোন প্রয়োজন রইল না; এই সাইকেল রিকসার যুগে ঘোড়ার গাড়ী অচল হয়ে গেছে; যন্ত্রচালিত তাঁত অনেকক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁতে নিযুক্ত শ্রমিকের অন্ন মেরেছে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রেও আধুনিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি কৃষি-শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে চলেছে। এই সব কৃষি-শ্রমিক বেকার নয়, ভিখারী হয়ে শহরের রাস্তায় ফুটপাতে রেল-ষ্টেশনে আশ্রয় নিচ্ছে। এরা উদ্বাস্তু নয়, জীবিকা থেকে উৎখাত নাগরিকগোষ্ঠী। এরা কিন্তু নিয়োগকেন্দ্রে নাম লেখাতে পারে না, মিছিল করে বেরোতেও শেখেনি বা প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব পায় নি। তাই তারা নিয়োগহীন হয়েও ঠিক বেকার নয়—ভিখারী।

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) থেকে দেখা যায়, মার্কস ও এঙ্গেলস্ ধনতন্ত্রের কলাকৌশলের পরিবর্তনের অপরিমেয় সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। মার্কসের বিশ্বাস ছিল, ফুল যেমন ফোটার পর শুকুতে শুরু করে, তেমনি কলাকৌশলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে নিয়োগহীনতার পরিমাণ বাড়িয়েই চলবে। এবং ফলে ধনতন্ত্রের সংকট ঘনীভূত হবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এখনও ঠিক তাই হয়নি। কর্মচ্যুত শ্রমিকদের নতুন শিক্ষাদান ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ সব দেশ কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকারত্বকে সাময়িক বেকারত্বে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আজকের দিনের সুইডেনের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুইডেনে একরকম জনহিতকর সেবা সংস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যার কাজ হ'ল কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটলেই শিল্পগুলিকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করা এবং কর্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনঃশিল্প দিয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যস্থানে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ফলে ঐ দেশে কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকারত্ব নেই বললেই হয়। আমাদের দেশে কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল না রাখতে পারার জন্যে এই শ্রেণীর বেকারের সংখ্যাই বিরাট।

সংগঠনজনিত বেকারত্ব বলতে বোঝায় শ্রমের তুলনায় উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের অপ্রতুলতাজনিত বেকারত্ব। ভারতে এই ধরনের বেকারত্বের মূলে কারণ একদিকে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি এবং অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মন্থর গতি। বলা হয়, শিশু পৃথিবীতে শুধু উদর নিয়েই আসে না, উদর পূর্তির জন্যে কাজ করবার দুটো হাত নিয়েও আসে। কিন্তু বর্তমান দিনে দুটো হাতই যথেষ্ট নয়, অন্যান্য উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন থাকলে তবেই হাত দুটো কাজে লাগে। যতজোড়া হাত কাজ করবার সুযোগ খুঁজছে তত পরিমাণ উপকরণ সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তাই অসংখ্য কাজের হাত অকেজো হয়েই আছে।

আমাদের দেশে কৃষিগত বেকার-সমস্যা ঋতুগত হলেও মূলত সংগঠনজনিত, পাশ্চাত্য দেশের মত চাহিদার সাময়িক হ্রাসজনিত নয়। এদেশে কৃষি এখনও বহুলাংশে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল বলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষিজীবীরা ৩ থেকে ৬ মাস বসে থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ না হলেও অর্ধ-বেকার বা প্রচ্ছন্ন বেকার। তা' ছাড়া বিকল্প নিয়োগের অভাবে কৃষিতে যত লোক ভিড় জমিয়েছে তত লোকের দরকারই নেই—এদের একটা মোটা অংশকে কৃষি থেকে সরিয়ে আনলে উৎপাদন হ্রাস পায় না। সুতরাং কৃষিতে বেকার-সমস্যা সংগঠনজনিত বেকার-সমস্যারই একটা দিক—বর্ধমান জনসংখ্যাপ্রসূত বর্ধমান শ্রমের যোগানের সঙ্গে তাল রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগানের অক্ষমতাই এর কারণ।

গ্রামাঞ্চলে এই প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ছাড়াও ওপন্ বা খোলা বেকারত্বও আছে, তবে তা হ'ল প্রধানত কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে, কলাকৌশলের পরিবর্তনের দরুণ কৃষিক্ষেত্রে যারা সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছে। এদের অধিকাংশই উদারান্নের জন্য শহরে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে। অবশ্য যারা অর্ধ বা প্রচ্ছন্ন বেকার তাদের অনেকেও শহরে গিয়ে ঠিক ভিড় না জমালেও ভিড়ের কাছে উঁকিঝুঁকি মারছে।

তারপর আছে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা। এর মূলে আছে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-পরিকল্পনা বা আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় ত্রুটিপূর্ণ ম্যানপাওয়ার বা মানবশক্তি পরিকল্পনা। এর জন্যে অবশ্য আমাদের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী হলো প্রথম যুগের গ্রোথ্ অর্থনীতিবিদরা। এই সব অর্থনীতিবিদের ধারণা ছিল যে শিল্প প্রসারের ওপর যতটা ব্যয় করা হবে মোট জাতীয় আয় ততই বৃদ্ধি পাবে। এই ধারণা ধ্রুব সত্য বলে মনে করে নিয়ে এশিয়ার অনেক দেশের মত ভারতও শিল্পসম্প্রসারণের জন্যে 'ক্র্যাশ প্রোগ্রামের' পথ বেছে নিয়েছিল। ফল হয়েছে ভয়াবহ—শিক্ষার মানের অবনতি, শিক্ষা-জগতে নৈরাজ্য, উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে নৈরাশ্য, শিক্ষিত বেকারের অকল্পিত সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্যতাহীনতা।

পরিসংখ্যানের মূল্যহীনতা ঃ

ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের পরিমানের পরিসংখ্যান না দেখাই ভাল, কারণ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের মধ্যে কোনটি নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। যেমন, পশ্চিমবঙ্গেই পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ধরা হয়েছে ২৩ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ—অর্থাৎ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ। এই ধরনের পরিসংখ্যানের মূল্য কি? তাই বেকারত্বের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি (দান্তওয়ালা কমিটি) পরিসংখ্যানের পদ্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে।

সমস্যার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ ঃ

যাই হোক, আমাদের দেশে জনসংখ্যার মত বেকারদেরও বিস্ফোরণ ঘটছে। এর চাপ গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলেই বেশী পড়ছে। কারণ, আধুনিক মজুরীভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার আকর্ষণ। নগদ মজুরীর আকর্ষণে লোকে গ্রামাঞ্চলের অলাভজনক বৃত্তি ছেড়ে শহরাঞ্চলে এসে কর্মপ্রার্থী হচ্ছে আর যারা কাজকর্মের অভাবে শহরে আসছে তারা ত আছেই।

দ্বিতীয়ত, কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বয়স্কদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত তরুণ-বয়স্কদের মধ্যেই বেশী—যারা তাদের রুজিরোজগারের ধান্দায় প্রথম বাজারে বেরিয়েছে। সুদূর নয়, অদূর ভবিষ্যতেই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বেকারদের সমস্যার মোকাবিলার জন্যে বিশেষভাবে চিন্তা করে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। না হলে, এই দুর্ভাগা দেশের ভাগ্যে আরও কি লেখা আছে জানি না।

সমাধানের সরকারী প্রচেষ্টা ঃ

কর্তৃপক্ষ অবশ্য বেকার-সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সুরু থেকেই সচেতন এবং বলা যায় যে, জনগণের মধ্যে পূর্ণ নিয়োগাবস্থা সৃষ্টি করা আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। প্রথম পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছিল ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা পূর্ণ নিয়োগের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। ঐ পরিকল্পনায় এক ১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিয়োগ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়।

তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং তৃতীয় ও চতুর্থের মধ্যের তিন বৎসরে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার প্রত্যেকটিতে নিয়োগ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির মত, জনসংখ্যার মত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখানেও পরিসংখ্যানকে পরিহার করা হচ্ছে। এমনকি পরিকল্পনা কমিশনও এই পথে চলেছেন—চূড়ান্ত চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্দিষ্ট না-করাই কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। এই চূড়ান্ত পরিকল্পনায় শুধু বলা হয়েছে ঃ যে সকল উন্নয়ন-কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে সেগুলি কার্যকর করা হলে বেশী পরিমাণে নতুন কাজ সৃষ্টি হবে।

মূল্যায়ন ঃ

নতুন কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্প্রসারিত নিয়োগ দু রকমের ঃ উৎপাদনশীল নিয়োগ এবং রিলিফ বা ত্রাণমূলক নিয়োগ। সম্প্রতি এই ত্রাণমূলক নিয়োগের ওপরই বেশী ঝোঁক পড়েছে দেখা যায়। এতে হয়ত অনিদ্রার ওষুধের মত কিছুটা আশু উপকার হতে পারে। কিন্তু নিরাময়ের পথ এ নয়—এক-শিক্ষক বিদ্যালয় ইত্যাদির দীর্ঘকালীন উপযোগিতা বিশেষ নেই। তাই আশু ফল-প্রদায়ী বটিকা সেবনের মত ত্রাণমূলক নিয়োগের ব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও এর ওপর নির্ভরশীলতা দিন দিন কমাতে হবে। তা ছাড়া কর প্রদানকারীদের অর্থ সাময়িক ত্রাণকার্যেই নিয়োজিত হতে পারে, বর্তমান হারে চিরন্তন ত্রাণকার্য নয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও ব্যাহত হতে বাধ্য।

কিভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে ঃ

মৌল সমস্যা হল কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এবং উৎপাদনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপ-করণের মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করা। অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতও তা করতে সমর্থ হয়নি। একদিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ কর্মপ্রার্থীর তালিকায় অচিন্তনীয় ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে, অপরদিকে সাড়া বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়ভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিশীল ও সম্প্রসারণাভিমুখী করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী করনীতি, শিল্পনীতি প্রভৃতির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে হবে যাতে লোক সঞ্চয়ে আগ্রহী এবং বিনিয়োগে উৎসাহী হয়। উৎপাদন ও নিয়োগের জন্যে এখনও যখন আমরা বেসরকারী উদ্যোগের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল তখন ঐ উদ্যোগকে সন্ত্রস্থ করে রাখা ভুল—যে-কোন শিল্পের মাথার ওপর অযথা জাতীয়করণের খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।

বিনিয়োগের এক অর্থ মূলধন গঠন—উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে বৈদেশিক মূলধন আনয়ন এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করতে হবে। এর জন্যেও প্রয়োজন সুস্পষ্ট শিল্পনীতির—এবং সুস্পষ্ট শ্রমনীতিরও। মোট কথা, পেটের জ্বালায় যে দুটো হাত কাজ খুঁজছে তাদের কাজে লাগাবার জন্যে অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থার পথে চলতে হবে। ঘন জনবসতিসম্পন্ন কিন্তু কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে যদি অনেক দেশ শিল্পোন্নত হতে পারে, মোটামুটি পূর্ণ নিয়োগব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, জীবনযাত্রার মানে উত্তরোত্তর উন্নয়নসাধন করতে পারে, তবে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ আমরাই বা বেকার সমস্যায় ভুগব কেন, আর জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই বা দারিদ্র্য-রেখার নীচে থাকবে কেন? কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ হল ত্রুটিপূর্ণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং ত্রুটিপূর্ণ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। আর বোধহয় সামাজিক উৎসাহের অভাব। অন্যান্য পরিপূরক করণীয়ের মধ্যে আছে কৃষিকার্য ও গ্রামাঞ্চলের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা। এদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব এবং গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে শ্বেত-বিপ্লব (দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি), নগরীকরণ প্রভৃতি বেশ কিছুটা কার্য সম্পাদন করেছে। কিন্তু আরও অনেক কিছু করতে হবে—অন্তত নগদ মজুরির আকর্ষণ কমাতে হবে এবং কৃষি ও অনুরূপ কাজ-কর্মকে আরও লাভজনক করে তুলতে হবে। এই ব্যাপারে রাজনীতি বা কোন ভাবাদর্শকে নাক গলাতে দিলে ভুল হবে।

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। শান্তনু-পত্নী গঙ্গাদেবীর মত মাতৃরূপ বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-পর্ষদগুলি যাদের নিয়োগহীনতার নদীজলে ইতিমধ্যেই ভাসিয়ে দিয়েছেন তাদের তুলে নিয়ে পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে ঐ সব সংস্থা বিপুল হারে প্রসব করে আর যেন ভাসিয়ে না দেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এও হল এক পরিকল্পনার প্রশ্ন—মানবশক্তি পরিকল্পনার প্রশ্ন। এই পরি-কল্পনাকে সর্বাত্মক পরিকল্পনার অংগীভূত করতে হবে। সাইমন কুজনেটস-এর মত আধুনিক সম্প্রসারণধর্মী অর্থনীতিবিদদের এই হল সুচিন্তিত অভিমত।

বিলুপ্ত রাজধানী

গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-লখ্‌নৌতি

গৌড়!

ঠিক চারশো বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে এই মহানগরী।

আজ আমি আবার এসেছি গৌড়ে। এই নিয়ে কতবার হলো? কেন এলাম আবার। সংখ্যাতত্ত্বপ্রিয় বন্ধুজনের উপহাস, আত্মীয়-স্বজনের বিরক্তি ও সন্দিগ্ধ কৌতূহল এবং নিস্পৃহতা, প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচিত জনের উদাসীনতাকে কখনো/রহস্যময় নীরবতায় কখনো সূক্ষ্ম আঘাতে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টায় কখনো সমীহ করে—আমাকে নিবৃত্ত করার সব উদ্যমকেই পরাস্ত করেছি, কিন্তু হার স্বীকার করেছি নিজের কাছেই। গৌড়ের দুর্বার আকর্ষণী শক্তির কাছে ধরা দিয়ে এই নিয়ে প্রায় পঁচিশ বারের মতো আমি এলাম এখানে!

গৌড় আমাকে 'হন্ট' করে। আমি জাতিস্মরের মতো ঘুরে বেড়াই গৌড়ের মাটিতে! আমি জানি, বাঙালীমাত্রকেই এই নামটি স্মৃতিচারী করে তোলে।

সে তো আজকে নয়, বহুকাল আগে থেকেই এই বিশেষ শব্দটি একটি বিশেষ দেশের, একটি জাতির, একটি বিশেষ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে।

মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের সময়ে যে গৌড়ের উদ্ভব, পরবর্তী একশ' বছরব্যাপী জরাবহ মাৎস্যন্যায়ে যার ক্ষণিক অবলুপ্তি এবং তারপর পালবংশের অভ্যুদয়ে যার পুনর্জাগরণ পরবর্তী সেনবংশ, খিলজী, পাঠান, হাবশী বা বাঙালী সম্রাটদের আমলে যার চূড়ান্ত স্ফূর্তি এবং আজো অসংখ্য কবির কাব্যে, লৌকিক জীবনের নানা আচরণে যার স্মৃতি ছায়া ফেলে—সেই সুপ্রাচীন ভূখণ্ডে এসে নিজেকে অভিভূত বোধ করি!

এই কি সেই গৌড়, পালবংশের রাজধানী যাণগড়ের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নবদ্বীপের মহীপতি বংশ সেনদের রাজধানী গৌড়—যার নাম পরিবর্তন করে সম্রাট লক্ষ্মণ সেন রেখেছিলেন লক্ষ্মণাবতী! এই লক্ষ্মণাবতীই কি পরবর্তী মুসলমান শাসকদের রাজধানী লখ্‌নৌতি—গৌড়!

আমি ফিরে তাকাই এর প্রাচীন ইতিহাসের দিকে। গৌড় নামের উদ্ভব সম্ভবত 'গুড়' থেকে। এককালে এখানে ইক্ষুর চাষ হতো অধিক পরিমাণে। গুড় উৎপন্ন হতো। সম্ভবত সেই থেকেই এই নামের উৎপত্তি—কোন সঠিক সিদ্ধান্তের কথা আমার জানা নেই। শুধু জানি, সুপ্রাচীন পাণিনি সূত্রে 'গৌড়পুর' নামে এক জনপদের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ আর কামরূপের শিল্প ও কৃষিপ্রসঙ্গ আছে। পাণিনির টীকাকার পতঞ্জলি পরিচিত ছিলেন গৌড়দেশের সঙ্গে। বাৎস্যায়নও কামসূত্রে গৌড় নাগরিকদের বিলাসব্যসন গৌড়-নারীদের মৃদুবাক্য ও মৃদু অঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন।
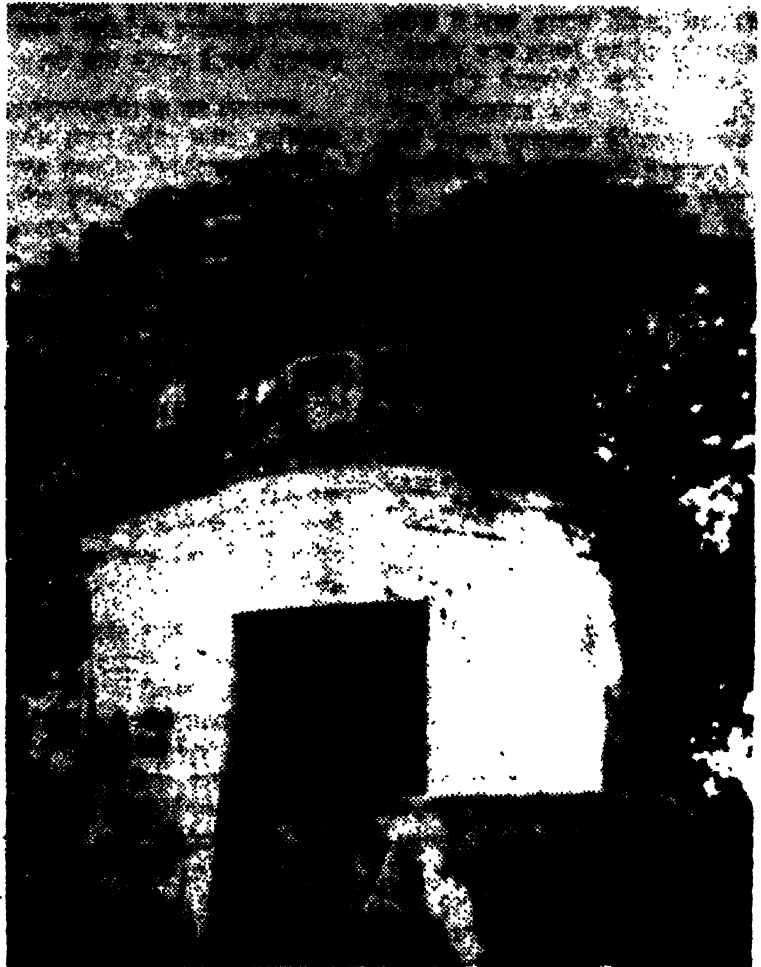
রামকেলির তমালতলার মন্দির। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের পদচিহ্ন আছে।

উৎপল চক্রবর্তী

মহাভারতে উল্লেখ আছে গৌড়-দেশের। বরাহমিহির গৌড়ক পৌণ্ড্র বঙ্গ সমতট বর্ধমান ও তাম্রলিপ্তক নামে ছয়টি জনপদের উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের উল্লেখ আছে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায়, মুরারির অনর্ঘরাঘবে কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে, কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে এবং অসংখ্য জৈন বৌদ্ধ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে, অজস্র শিলালিপি আর তাম্রলেখে। তবু, এত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সেই সংশয় রয়েই গেছে। বিভিন্ন যুগে গৌড় বলতে কি একটি বিশেষ ভূখণ্ডকেই বোঝাতো?

কখনো মনে হয়, মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমান ছিল গৌড়ের সীমারেখা, আর রাজধানী ছিল চম্পানগর। সেই চম্পাই কি এখন বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে চাঁপা গ্রাম!

ভবিষ্যপুরাণ বলে, গৌড়ের উত্তরে পদ্মা, দক্ষিণে বর্ধমান। জৈন গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয়, মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতীই সেই গৌড়। ঈশান বর্মন মৌখরীর হড়াহালিপি জানায়, 'গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্'। অর্থাৎ গৌড়ের সীমা সমুদ্র থেকে দূরে ছিল না। এই লিপি ষষ্ঠ শতকের। সপ্তম শতকে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়-তন্ত্র' সমগ্র ভারতবর্ষে নামটিকে ছড়িয়ে দিল। এই একটি শব্দের আড়ালে বাংলা ও বাঙালীর পরিচয় বিধৃত হয়ে রইল।

শশাঙ্কের গৌড় নিশ্চিতই মুর্শিদাবাদ অঞ্চল, কর্ণসুবর্ণ তাঁর রাজধানীর নাম, যা আজ রাঙ্গামাটি কানসোনা নামের এক বিশীর্ণ গ্রাম হয়ে ঐ জেলারই নিভৃতে অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। দীর্ঘ একশ' বছরব্যাপী অরাজকতার অশুভ তাণ্ডব। রক্তক্ষয়ী সমতট তাম্রলিপ্ত মাৎস্যন্যায়ের হিংস্র সংঘর্ষে বিশৃঙ্খল! অবশেষে একদিন সেই অন্ধযুগের অবসান ঘটিয়ে আবির্ভূত হলেন গোপাল দেব, নিপীড়িত জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি—বাংলার প্রথম গণনেতা! প্রতিষ্ঠিত হলো পালবংশ। রাজধানী স্থানান্তরিত হলো তাঁর জনকভূমি বরেন্দ্রভূমিতে—বাণগড়ে।

গৌড় নামটি আবার রাজ-উপাধিতে স্থান পেলো। পাল-সম্রাটরা গৌড়াধিপ বা গৌড়েন্দ্র বা গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হলেন।

দুশো বছর রাজত্বের পর পালবংশ কর্ণাটকীয় সেনবংশের হাতে দেশশাসনের ভার তুলে দিতে বাধ্য হলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হলো বাণগড় থেকে গৌড়ে। বরেন্দ্রভূমি থেকে মালদহে। সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের নামে নামান্তরিত হলো—লক্ষ্মণাবতী।

সেই লক্ষ্মণাবতীই কি এই গৌড়?

এখন যে রাস্তা মালদহ শহর থেকে দক্ষিণে রাজমহলের দিকে গিয়েছে, ঐ পথে কিছুদূর এগোলে বাগবাড়ী নামে এক জনপদের এক ভগ্নধ্বংসস্তূপ চোখ চমকে ওঠে। দেখা যায়, ডানদিকে বিশাল গড়ের ভগ্নাবশেষ, নীচে মৃত পরিখা। আর কিছু নেই, তবু লোকে বলে, এই হলো বল্লাল-বাড়ী যা এখন বাগবাড়ী নাম নিয়েছে আর এইখানেই ছিল বল্লালসেনের উদ্যান-বাড়ী—রাজপ্রাসাদ। কিছুদূরে অমৃতি গ্রামের কাছে পিছলি-গঙ্গারামপুর নামে এক জায়গায় ছড়ানো অসংখ্য প্রত্নচিহ্ন দেখিয়ে অনেকে বলেন, এইখানেই ছিল সম্রাট লক্ষ্মণ-সেনের শেষজীবনের বাসভূমি। বল্লালবাড়ী, রামভিটা, চণ্ডীপুর, পটলচণ্ডী, লোহাগড়, অমৃতি, কমলাবাড়ী ইত্যাদি গ্রামের নাম প্রাচীন হিন্দু যুগের সাক্ষ্য বহন করে আজো এবং ঐ কমলাবাড়ী গ্রামের কাছে সাগরদীঘির উত্তর-পশ্চিমে এক মাইল দূরে কানিংহামের সময়ও গৌড়ের অন্যতম প্রধানা দেবী গৌড়েশ্বরী পূজিতা হতেন।

গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল গৌড়-নগরী। মালদহের কালিন্দী নদী দিয়েই জলধারা প্রবাহিত হতো বেশী পরিমাণে। পরে গঙ্গা খাত পরিবর্তন করে। ফলে হিন্দুযুগের সেনযুগের লক্ষ্মণাবতীও স্থানান্তরিত হয়। শুধু গড়ের ভগ্নাবশেষ, পরিখার নিষ্প্রাণ দেহ, কয়েকটি গ্রামের নাম, কিছু প্রত্নচিহ্নের বুকে তার লুপ্ত-প্রায় অস্তিত্ব নিয়ে সে তার অতীতকে মুখর করে তুলতে চায়। ঐ বাগবাড়ীর কাছেই যে রাজনগর গ্রাম, ওখানে কি বল্লালসেনের কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে? এখন বোধহয় কিছুই পাবার আর উপায় নেই।

বাণগড়ের পর যে গৌড়-লক্ষ্মণাবতী তার চতুঃসীমা, কোন সৌধ, কোন মন্দির আজ আর নেই। রাজধানী পরিক্রমা করতে এসে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রস্তরমূর্তি কোন প্রত্নবস্তু, কয়েকটি স্থান, কয়েকটি গড়ের কংকাল আর সম্রাট লক্ষ্মণসেনের আমলে খনিত, মালদা শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে যাবার পথের পাশের বড় সাগরদীঘি দেখে লক্ষ্মণাবতীর অতীত ঐশ্বর্য অনুমান করে নিতে হয়। একাদশ শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ বখত্-ইয়ারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যখন অসহায় সম্রাট লক্ষ্মণসেন গঙ্গাতীরস্থ তাঁর অপর রাজধানী নদিয়া ছেড়ে সংকনাট বা বঙ্গের দিকে চলে যেতে বাধ্য হলেন, তখন সেই নদিয়াও ধ্বংস হয়ে গেল বখত্-ইয়ার-এরই হাতে।

তার চিহ্নও আজ কোথাও নেই। শুধু এখনকার নবদ্বীপ শহরের কাছে এক উঁচু ভূখণ্ড দেখিয়ে স্থানীয় মানুষেরা বলেন, ঐ হলো বল্লাল ঢিবি। ঐখানেই ছিল মর্মান্তরোগী সম্রাট বল্লালসেন-লক্ষ্মণসেনের রাজবাড়ী। হতে পারে। ভূখণ্ডটির উচ্চতা এবং অসংখ্য ছোট ছোট প্রাচীন ইঁটের সাক্ষ্য দেখে অনুমান হয়, এইখানে সেন-বংশীয় সম্রাটদের কোন স্মৃতিচিহ্ন মাটির গভীর গোপনে হয়ত লুকিয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এটি খুঁড়ে দেখার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কোন ব্যক্তিগত উদ্যমও অনুপস্থিত বলে, বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস আজো সঠিকভাবে জানা যায়নি।

বড় বিস্ময় লাগে, বাংলায় সেনবংশের রাজত্বের ইতিহাস কিছু কম দিনের নয়, এবং এ-বংশের দুজন সম্রাট বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের নাম আজও বাঙালীর স্মৃতিতে, লৌকিক ক্রিয়াকর্মে, প্রবাদে, জীবন্ত হয়ে আছে, অথচ তাঁদের রাজধানী, তাঁদের কোন স্মারকচিহ্ন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোথায় ছিল সম্রাট বল্লাল সেনের সেই প্রাসাদ, যেখান থেকে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে কর্ণাট-চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভাগদেকমল্লের মেয়ে রাম দেবীকে নিয়ে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে নিরঞ্জনপুরে চলে যান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' রচনা করছিলেন তিনি তখন। সেই গ্রন্থ অসমাপ্তই থেকে যায়।

কোথায় ছিল মহাকবি উমাপতি ধর, মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র, ধোয়ী শরণ ইত্যাদি 'নবরত্ন' পরিবৃত সম্রাট লক্ষ্মণ-সেনের রাজসভা। সে কোথাকার গঙ্গার তীর, যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন লক্ষ্মণসেন আর হলায়ুধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অসাধারণ দৃশ্য। দেখছিলেন তাঁরা, এক ফকির যেন অলৌকিক পায়ে হেঁটে আসছেন গঙ্গার ওপর দিয়ে। পার হয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সেই ফকির জিজ্ঞাসা করেন সম্রাটকে—

—আপনি কে?

—আমি পৃথিবীপালক সম্রাট লক্ষ্মণ-সেন। উত্তর দেন বিস্মিত সম্রাট। হাসেন সেই ফকির। বলেন,

—আপনি যদি পৃথিবী-পালকই হন, তবে ঐ যে বকটি মাছ ধরছে, ওকে মাছ ছেড়ে উড়ে যেতে আদেশ করুন।

বিস্মিত সম্রাট এবার ক্রোধান্বিত হন।

—ওই বক তির্যগ্‌যোনি। ও আমার কথা শুনবে কেন?

—আমার কথা শুনবে।

বলেন, আর বককে উড়ে যেতে আদেশ করেন ফকির। সম্রাটের বিস্ময়কে চমকে দিয়ে উড়ে যায় বকটি। এবার ফকিরের ক্ষমতায় অভিভূত বোধ করলেন সম্রাট। তাঁকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। আর মুগ্ধতার মূল্য হিসেবে পাণ্ডুয়ায় কিছু ভূখণ্ড দান করেন ফকিরকে মসজিদ তৈরীর জন্য। সেই মসজিদ আজো আছে মালদহের পাণ্ডুয়ায়। পীর শেখ জালালুদ্দীন তাব্রেজী নির্মিত সেই মসজিদ। যার ভিত্ খুঁড়তে গিয়ে বহুমূল্য রত্ন পেয়ে যান পীর এবং তা দান করেন লক্ষ্মণসেনেরই পারিষদবর্গকে।

কোথায় সেই প্রাসাদ, যার কক্ষে একদিন অনুতাপ অনুশোচনার তীব্র অনলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র! রাজ্যের প্রজা-বর্গকে রক্ষা করার দায়িত্ব যাঁর, সুনীতি রক্ষক এবং সুচরিত্রের খ্যাতিতে যিনি গৌড়ের সর্বত্র সম্মানিত, তিনি গত রাত্রে গৌড়েরই এক ছলনাময়ী নটীর মায়ার

কামিনীকের জন্য মুগ্ধ হয়ে নিজের শরীরী পবিত্রতা নষ্ট করেছেন! সন্দেহী সুদর্শন হলায়ুধকে মোহের কাছে পরাস্ত হতে দেখে সম্ভোগ-ক্লান্ত বারবধূ হেসে উঠেছে বিজয়িনীর মতো! আর নিজের স্ত্রী ভেবে বিলাস-মত্ত হয়ে পরে ভুল বুঝতে পেরেছেন যখন হলায়ুধ, তখন তাঁর আত্মধিক্কারে নিজেকে হত্যা করার সংকল্প দৃঢ় করার জন্য অস্থির পদচারণা শুরু করেছেন প্রাসাদ কক্ষে। অবশেষে সেই চরম লগ্ন! দৃঢ় অথচ প্রশান্তিতে বিষণ্ণ পায়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন হলায়ুধ! উদ্বিগ্ন সম্রাট আর পারিষদবর্গকে অকপটে জানালেন তাঁর ক্ষণিক মোহের ভুলের কথা! আর জানালেন, গৌড় রক্ষার জন্য তিনি তুষানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এ আদেশ দেশের আইনরক্ষক হিসেবে, মহাসান্ধিবিগ্রহিক হিসেবে নিজেই নিজের প্রতি জারী করেছেন। শঙ্কিত হলেন লক্ষ্মণ সেন! জানালেন, পিতার আমল থেকে যিনি সুপরামর্শ আর সুশাসনের দণ্ড হাতে রাজ্য রক্ষা করছেন তাঁকে বিসর্জন দিতে তিনি আদৌ প্রস্তুত নন। কিন্তু হলায়ুধ তাঁর সংকল্পে অটল! শেষে সকলের অনুরোধ, আদেশ শঙ্কাকে উপেক্ষা করে জ্বলন্ত তুষের আগুনে একটি পাবক শিখার মতোই জ্বলে উঠলেন মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র' গৌড় রক্ষার জন্য, সুনীতি রক্ষার জন্য একটি আদর্শ স্থাপন করলেন!

কিন্তু বোধ হয় ভুলই করেছিলেন হলায়ুধ! তিনি জানতেন না, গৌড়ে তখন ব্যভিচারের অন্যায়ের দুর্নীতির কি প্রাবল্য!

ধর্মানুরাগী, কাব্যপ্রিয়, জ্যোতিষী-নির্ভর সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সদ্ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে রাজ্যব্যাপী এক ষড়যন্ত্র আর বিলাস-ব্যসনের শিথিল উল্লাস দানা বেঁধে উঠছে। প্রকাশ্য রাজপথে গণিকারা প্রলুব্ধ করছে পথিকদের, সর্বত্রই অনাচার আর এরই সুযোগে এক শ্রেণীর লোক বিদেশী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্রাটের পতন ঘটাবার আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছে! ঐ পীরেরই কাছে দীক্ষা নিয়েছেন অনেকে! পাণ্ডুয়ার গোপ কালু ঘোষ নাম নিয়েছেন কালী পীর এবং হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বৃদ্ধ রাজা নদীয়ার প্রাসাদে বসে অশুভ সংকেত শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু কিছুই করার নেই আর! এবং এরই মধ্যে শোনা গেছে দূরাগত এক তুর্কী লুণ্ঠকের দর্পিত অশ্ব-ক্ষুর ধ্বনি! উত্তর ভারত, বিহার ধ্বংস করে গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসছেন মহাপরাক্রমী বখত-ইয়ার খিলজী! রাজ জ্যোতিষীরাও জানিয়েছেন এক দীর্ঘবাহু, কদাকার যবনের হাতে এদেশ বিনষ্ট হবে এমন কথা শাস্ত্রেই আছে! সংবাদ এনেছেন গোপন দূত, সেই দুর্ধর্ষ তুর্কী সেনানায়কের সঙ্গে শাস্ত্রের বর্ণনার সত্যিই মিল আছে। ত্রাসে-উত্তেজনায় গৌড় ছেড়ে চলে গেছেন বণিক ও নাগরিকেরা! নদীয়ার প্রাসাদে একা

অসহায় সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। না, রাজ্য ছেড়ে ভয়ে তিনি পালান নি। প্রজানুরঞ্জক, সুশাসক সম্রাটের নীতিতে এমন কোন নির্দেশ নেই!

অবশেষে ১২০১ সালের এক মধ্যাহ্ন! প্রাসাদে দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসেছেন সম্রাট। সোনার থালায় পরিবেশিত হয়েছে ভোজ্যবস্তু! আর সেই সময় প্রাসাদ দ্বারে উঠল তুমুল কোলাহল। ১৮ জন অশ্বা-রোহীর ছদ্মবেশে তোরণ দ্বার অতিক্রম করে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছেন নিষ্ঠুর বখত-ইয়ার' হত্যার বীভৎসায় মেতে উঠেছে তার অনুচরেরা! আর দেরী নয়! আসন ছেড়ে উঠে দ্রুত পায়ে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে গঙ্গা তীরে এলেন বৃদ্ধ সম্রাট! নৌকা প্রস্তুত ছিল ঘাটে! তাঁকে নিয়ে সেই নৌকো এবার এগিয়ে চলল বঙ্গ বা সংক-নাটের দিকে!

শেষ হয়ে গেল গৌড়ে হিন্দুদের আধিপত্য!

এর পর দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর-ব্যাপী তুর্কী পাঠান হাবশী আর বাঙালী মুসলমানদের রাজত্বকাল।

সেনানায়ক বখত-ইয়ার শাসন কাজের সুবিধার্থে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন সেই প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে, তাঁদের ভাষায় বারিন্দ-এ, পাল সম্রাটদের রাজধানী বাণ-গড়ের কাছে দেবকোট বা দেবীকোট-এ। কিন্তু সে ছিল অস্থায়ী সেনানিবাস মাত্র, রাজধানী ফিরে এল লক্ষ্মণাবতীতেই। কিন্তু এবার নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো লখনৌতি। গৌড়- লক্ষ্মণাবতী এবার হলো লখনৌতি-গৌড়। হিন্দু যুগের মন্দির-গুলির শীর্ষ লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। নতুন যুগের নতুন স্থাপত্যে শোভিত হলো গৌড় নগরী। গড়ে উঠল অসংখ্য মসজিদ, মিনার। জেগে উঠল নতুন গৌড়। এই সেই লখনৌতি! সেই গৌড়।

বল্লালসেনের নয়, লক্ষ্মণসেনের নয় মুসলমান যুগের গৌড়। হিন্দুযুগের গৌড়কে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। তবু, এই লখনৌতির আড়ালেই যে রয়ে গেছে লক্ষ্মণাবতীর স্মৃতি, এখন-কার অজস্র মসজিদের গায়ে যে প্রোথিত আছে হিন্দুধর্মের দেব-দেবীর মূর্তি বা তার আভাস, পোড়া মাটির অসংখ্য কাজে যে রয়েছে হিন্দু শিল্পকলার ইঙ্গিতময় রেখাচিত্র, লক্ষ্মণাবতীর শরীরই যে লখনৌতির সজ্জায় আজ আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত—এ সত্য ভুলতে পারি না মুহূর্তের জন্যও। তাই বাণগড়ের পর লক্ষ্মণাবতী পরিক্রমা করতে এসে লখনৌতি-তেই আসতে হয়। কৈশোর থেকে যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত যখন মালদায় ছিলাম তখন থেকে আজ অবধি, এত দূরে চলে এসেও বার বার এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ছুটে যেতে হয় গৌড়ে—আমি জানি, গৌড় বাংলার ইতিহাসের এক-একটি যুগান্ত-কারী ঘটনার সাক্ষী, গৌড় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে দিল্লীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনায়, ঘনঘটায়, রাজনীতির, শোণিতের চমকে, শিল্পসাহিত্যে ও ধর্মের জগতে এক-একজন যুগন্ধর প্রতিভার আবির্ভাবে ভারতের ইতিহাসে গৌড় এক অনন্য দ্যুতি, বিস্ময়কর অধ্যায়ের জনক হয়ে উঠেছে।

অথচ আজ তার সীমাহীন, শ্রীহীন মূর্তি! ১৫৭২ সাল। সম্রাট আকবর গৌড়-মণ্ডলের নাম পরিবর্তন করে 'সুবা-বাংলা' রাখেন। সেনাধ্যক্ষ মুনিম খাঁকে পাঠান গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ুদ খাঁর স্বাতন্ত্র্য লাভের বাসনাকে চূর্ণ করে দিতে। পরাস্ত হয়েছিলেন দায়ুদ, আর তাঁর রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই চির-কালের মতো হারিয়ে গেল গৌড় নামটি! এর পর শুরু হয় বঙ্গ বা বাংলার রাজত্ব! আর এই ভূখণ্ড? এত দিনের এত স্মৃতি-বিজড়িত এই নামটি হারিয়ে যাবার দুঃখ বোধ হয় গৌড় সহ্য করতে পারল না। এক কাল ব্যাধি গ্রাস করল গৌড়কে। গঙ্গা আবার খাত পরিবর্তন করল। ভয়ংকর প্লেগে মারা গেলেন স্বয়ং মুনিম খাঁ। সন্ত্রস্ত নাগরিকেরা ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন অন্যত্র। ঘন অরণ্য আবৃত করল গৌড়ের লজ্জা! যেভাবে হারিয়ে গেছে গঙ্গে কর্ণসুবর্ণ বাণগড় আর লক্ষ্মণাবতী—সেভাবেই হারিয়ে গেল লখনৌতি-গৌড়!

সে এক বেদনাময়, পীড়াদায়ক নির্মম ইতিহাস। লোভী লুণ্ঠক দস্যুদল পরে এক এক করে অপহরণ করল গৌড়ের পরিত্যক্ত সম্পদ, সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলির অলংকৃত পাঁজর খসিয়ে সম্রাট হুমায়ুনের 'জিন্নতাবাদ' বা স্বর্গপুরী গৌড়কে শ্মশানের ভয়ানক শূন্যতায় পরিণত করল পরবর্তীকালের মানুষেরা। রাজধানী তাণ্ডা থেকে রাজ-মহল, রাজমহল থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-বা বাংলা এই নামের আড়ালে আত্মগোপন করল বাঙালীর অযত্ন স্মৃতিবিজড়িত 'গৌড়' নামটি! হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে।

কিন্তু সত্যিই কি হারিয়ে গেল?

আজ আবার ঠিক চারশো বছর পর এই ১৯৭২ সালে যখন পশ্চিম বাংলার নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তখন পণ্ডিতজনের প্রস্তাবে সেই 'গৌড়' নামটিই আবার উচ্চারিত হলো। এখনো বহু প্রতি-ষ্ঠানের নামের সঙ্গে অসংখ্য কবির রচনায় এই নামটি ছায়া ফেলে রেখেছে দেখতে পাই। স্বীকার করতেই হবে গৌড় নামটির প্রতি বাঙালীমাত্রেরই একটি প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা আছে।

বাঙালী আমি তাই স্মৃতিতর্পণ করার চারশো বছর পর আর একবার পা রেখেছি গৌড়ের মাটিতে—চারশো বছর আগেকার রূপ কেমন ছিল তা স্মৃতির চোখে দেখব বলে!

সম্ভব হয় না তা। কুড়ি বর্গমাইল বিস্তৃত, বারো লক্ষ লোকের বাসভূমি, শুধু-মাত্র বারো হাজার পাথরেই যে কোন পরিবেষ্টিত বিশাল এই মহানগরীর সীমা যে কোথা

থেকে শুরু আর কোথায় বা তার শেষ এতবার এসেও তার কোন স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই না।

একাধিক সুউচ্চ বাঁধ আর গড় দিয়ে এ নগরী রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন গৌড়-সুলতানেরা, মণিময় প্রাসাদ আর সুরম্য অট্টালিকায় শোভিত করেছিলেন এই মহানগরীকে—প্রকৃতি আর মানুষের নির্মম অত্যাচারে আজ তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ মাত্র আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গড়ের মাথা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়, পরিত্যক্ত সম্পদের লোভে গৌড়ের বুক খুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে নির্বিবেক লুণ্ঠকেরা, সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ ভেঙে গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল প্রাসাদ, বাসগৃহের ইঁট পাঁচ টাকায় পাঁচশো গাড়ি কিনে উত্তরাধিকারীরা গড়ে তুলেছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ শহর! অর্থগৃধ্নু মানুষের হাত এড়াতে পেরেছে শুধু কয়েকটি মসজিদ—তাও ধর্মীয় কারণে। আর ধর্মকে যাঁরা প্রয়োজনমত ব্যবহার করেন তাঁদের শাবলের আঘাতে ঝরে গেছে অনেক মসজিদের মীনাকরা রঙীন কারুকার্য!

আজো ঝরে যায়। গৌড়কে শ্রীহীন করার হীন প্রয়াসে আজও মত্ত আছেন এমন অসংখ্য দর্শনার্থী যাঁরা দেশ-বিদেশ থেকে পিকনিক করতে বা বেড়াতে আসেন এখানে, সীমাহীন অজ্ঞতা নিয়ে যাঁরা রামকেলীর মন্দির, বারোদুয়ারী, দখল দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার, লুকোচুরি দরওয়াজা, কদম রসুল, চিকা মসজিদ, গুমটি দরওয়াজা, লোটন মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ দেখে ফিরে যান এবং যাবার সময় স্মারকচিহ্ন হিসেবে সংগ্রহ করেন অমূল্য প্রত্নদ্রব্য—সে যে-ভাবেই হোক!

কেউ নেই আর অসহায় গৌড়কে রক্ষা করার। রাজপ্রহরীর অস্তিত্ব তো কবে ধুলায় হয়েছে ধুলি, একালেরও কোন প্রহরী নেই, একজন গাইডও নেই যিনি অন্তত একটা মমতার আবেশ তৈরী করতে পারেন! ফলে পর্যটকের তৃষ্ণা মেটে শুধু দৃশ্যমান ঐ কটি মসজিদ, মিনার, মন্দির দেখে আর তার সামনে নীল এনামেল প্লেটে লেখা সরকারী পরিচয়জ্ঞাপক কিছু শব্দসমষ্টি পাঠ করে! একজন কর্মচারী আছেন গৌড় মিউজিয়ামে, আছেন একজন খাদেম যাঁর কাছে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে, কিন্তু তাঁরাও বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের সব পরিচয় জানাতে পারেন না। চিকা মসজিদ থেকে কিছু দূরে ঐ বিশাল বাইশগজী প্রাচীরের আড়ালে যে গৌড় সুলতানদের রাজপ্রাসাদ ছিল ফিরোজ মিনারের পাশে বাঁশবনের অন্ধকারে আজো যে নিভৃতে জেগে আছেন গৌড়ের প্রধান আরাধ্যা গৌড়েশ্বরী দেবী—সে সংবাদ কেউই পান না!!

আর, মালদহ শহর থেকে গৌড়ে যাবার পথে ডানহাতি সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে যাবার রাস্তার ধারে যে বিশাল বড় সাগর দীঘি—প্রকৃতপক্ষে ওখান থেকেই যে গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থান শুরু হলো, তার খবরই বা কজন রাখেন! এই সেই বড় সাগরদীঘি যেটি খনন করিয়েছিলেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। এবং এরই মাটি দিয়ে তৈরী হয়েছিল গৌড়ের নিকটবর্তী বিখ্যাত কাদামাটির দুর্গ একডালা। সেই একডালা যে কোথায় আজও তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি।

এক মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল চওড়া এই দীঘিরই উত্তরে যে উঁচু জায়গা সেটি ছিল গৌড়ের বাণিজ্য কেন্দ্র। কাছে পীরাণ-পীরের মসজিদে যাবার পথে যে পুরনো সাঁকো আছে, তার তলা দিয়ে নৌকো করে গৌড় শহরে ভেতরে মাল সরবরাহ করা হতো।

এরই কাছে দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির। গৌড়ের অন্যতম প্রধানা উপাস্য দেবী। হিন্দু যুগের আর এক স্মৃতি চিহ্ন। পিরান-ই-পীরের মসজিদ বা আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিস্থান এবং ঝনঝনিয়া মসজিদ নিকটবর্তী আর দুটি দ্রষ্টব্যস্থান। মুসলমান যুগের। সাগর দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে আখি সিরাজুদ্দীনের সমাধিস্থান। ইনি একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন এবং পাণ্ডুয়ার নূর-কুতুব-উল আলমের ধর্মীয় পিতামহ হিসেবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। শোনা যায়, নূর-কুতুবের পিতা শেখ আলাউল হক এঁর শিষ্য ছিলেন এবং আজো যখন ঈদ-উল-ফিতর এবং বকর-ঈদ উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা বসে তখন পাণ্ডুয়া থেকে ঝাণ্ডা, নূর-কুতুবের পাঞ্জা ইত্যাদি এখানে আনা হয়। পীরের সমাধিস্থানের সম্মুখের দেয়ালের দুদিকে যে শিলালেখ আছে তা থেকে জানা যায় সুলতান হুসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের সময় এখানকার প্রবেশ দ্বার ও সমাধিস্থান তৈরী হয়েছিল। প্রবেশ দ্বারগুলি এখন আর অক্ষত নেই। কিন্তু পোড়া ইঁটের কারুকার্য মণ্ডিত শোভা আজও ধ্বংস প্রাপ্ত দ্বারের শোভা বুকে ধরে রেখেছে। সমাধি যেখানে দেয়া হয়েছে সে জায়গাটি বেশ বড়। কথিত আছে, পীরের সঙ্গে তাঁর নিত্য-ব্যবহার্য কোরান-ই-শরীফ, তরবীহ্‌ এবং বই রাখার স্ট্যাণ্ডটিও তাঁর শিয়রের কাছে রাখা হয়েছে।

এরই কিছু দূরে ১৫৩৮ সালে সুলতান গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ শাহ'র তৈরী ঝনঝনিয়া মসজিদ, যাকে র‍্যাভেনশ জান-জান মিঞার মসজিদ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। মসজিদে প্রোথিত শিলালিপি-থেকে জানা যায় মালতী নামে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এবং নির্মাণ-সময়ের উল্লেখ থেকে মনে হয় সম্ভবত এইটিই গৌড়ে তৈরী সর্বশেষ মসজিদ। এর কিছুকাল আগে বা পরে লুকোচুরি দরওয়াজা তৈরী হয়। কে ছিলেন এই মসজিদ নির্মাণকারিণী মালতী আজ আর তা জানা যায় না। শুধু নীরব পাথরের অক্ষর তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছে। আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন বিশেষ পরব উপলক্ষে সেই মসজিদের ভেতর থেকে বিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রার্থনার স্বর ভেসে আসছিল। তাঁদের আন্তরিক আকুল আহ্বান, মনে হচ্ছিল, যেন এক-একটি যুগের সীমা অতিক্রম করে সেই পুরনো দিনগুলোকে স্পর্শ করতে চাইছে।

ফিরে আসতে হয় পুরনো পথেই। এবার মালদা-গৌড় সড়ক। এই পথেরই দুধারে ছড়ানো আছে গৌড়নগরীর অন্যান্য স্মারকচিহ্ন। কিছুদূরে এগোলে আগ্রহী চোখ থমকে দাঁড়ায় বাঁহাতি দুটো বড় পাথরের স্তম্ভ দেখে। লোকে বলে, এ-দুটো নাকি হাতি বাঁধা থাম। রাজার হাতি বাঁধা থাকত এখানে। ইতিহাস জানায়, আসলে এ-দুটি কোন রাজকর্মচারীর বাসগৃহের তোরণদ্বার। সেই বাসগৃহ কবে ধুলোয় একাকার হয়ে গিয়েছে, সেখানে আধুনিক মানুষ মাটির ঘর বেঁধেছেন—শুধু নিতান্ত বিসদৃশ ঐ দুটি পাথরের সাক্ষী অতীতের বৈভব আর বিত্তের কথা সদর্পে জানাতে গিয়ে যেন কেমন বিব্রত বিমূঢ় হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে!

আর কিছু দূরেই সেই বিখ্যাত পিয়াসবাড়ী দীঘি! গৌড়ের বন্দীশালা-সংলগ্ন বিশাল জলাশয়। শোনা যায়, এর জল আগে দূষিত ছিল এবং বন্দীদের এরই জল ছাড়া আর কিছুই পান করতে দেওয়া হতো না! আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে বলেছেন, সম্রাট আকবর নাকি এই নিয়মটি বন্ধ করে দেন। মেজর ফ্রাঙ্কলিন অবশ্য পরবর্তীকালে এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন, আসলে এর জল সুপেয় ছিল। বন্দীদের চোখের সামনে এই তৃষ্ণার শান্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের তা স্পর্শও করতে দেওয়া হতো না, ফলে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে তারা মারা যেত। সেই থেকেই এর নাম পিয়াসবাড়ী—অতীতের পিপাসার্ত কতকগুলো মানুষের তীব্র হাহাকারকে যেন আজো জাগিয়ে রেখেছে। এই দীঘির জলেরই তিন ফুট নীচে বাঁধানো ঘাটের কাছে দুটো পাথরের হাতি বাঁধা আছে। কে বেঁধেছে, কেন ওভাবে রাখা হয়েছে সে কেউ আজ আর বলতে পারেন না। শুধু যখন এখানে ডাকবাংলো তৈরি হচ্ছিল, তখন অসংখ্য দীর্ঘদেহী মানুষের নরকংকাল পাওয়া গেছে মাটির গভীর থেকে। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এগুলোই সেই হতভাগ্য তৃষ্ণার্ত কয়েদীদের অসহায় অস্তিত্ব! বিষণ্ণতা অনুভব করেন পর্যটক। কিন্তু সেই বিষণ্ণতার ব্যথা মুছে যায় আর একটু এগোলে, ডানহাতি কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে রামকেলির দিকে এগোলে।

রামকেলি! সেই রামকেলি গ্রাম, পাঁচশো বছর আগে নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্য যেখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন পরম-বৈষ্ণব সাকর মল্লিক ও দবীর খাস সনাতন ও রূপ গোস্বামীর সঙ্গে। এইখানেই ছিল তাঁদের বাড়ী। সুলতান হুসেন শাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন তাঁরা। ঐ রূপসাগর

আর সনাতন সাগরের তীরে আজো তাঁদের ভিটের শেষ চিহ্ন পড়ে আছে! এই সেই পথ, যে পথের ধূলিকণা পবিত্র হয়ে গিয়েছিল মহাপ্রভুর পূত চরণস্পর্শে, ঐ সেই তমালতলা যেখানে এসে উপবেশন করেছিলেন তিনি বিশ্রামার্থে। ঐ তো সেই আসন যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই সেই মন্দির যেখানে আজো রূপ সনাতনের পূজিত বিগ্রহ নিত্যসেবা লাভ করেন। তমালতলায় এখন একটি মন্দির তৈরী হয়েছে, আর ভেতর শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। তার পাশে আজো রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ডের জল অজস্র ঢেউয়ের হাতে মৃদুসুরে নামগানের সংগে যেন খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে।

তেমন উত্তাল হরিনামধ্বনিতে আর মুখর হয়ে ওঠে না রামকেলির বাতাস, যেমন পাঁচশো বছর আগে হয়েছিল। ঐ রূপসাগর আর সনাতনসাগরের জলও তেমন কোন পূত দেহের আনন্দসঞ্চরণে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে না। তবু সারা দেশের বৈষ্ণবজনের কাছে আজো রামকেলি এক পবিত্র তীর্থ, তাঁদের 'গুপ্ত-বৃন্দাবন'। এখন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে দশ দিনের জন্য এক মেলা বসে এখানে। ঐদিন মহাপ্রভু পদার্পণ করেছিলেন এই গাঁয়ে, তাঁর স্মরণে। দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তজন আসেন, দোকানপসরা, ম্যাজিক সার্কাস আর নামগানে আবার অতীতের রামকেলি যেন কয়েক দিনের জন্য জেগে ওঠে!

তমালতলার সম্মুখের পথ ধরে কিছু দূর এগোলেই সম্মুখে বিশাল বারদুয়ারী মসজিদ এবার দৃষ্টিকে বিস্মিত করাবে। যাঁরা কিংবদন্তীর গল্প জানেন, তাঁরা রোমাঞ্চিত বোধ করবেন, এক ভয়ংকর ঝড়-বাদলের রাতে এই পথ ধরেই একদিন সাদা ঘোড়ার চেপে সুলতান হুসেন শাহের আদেশে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন রাজকর্মচারী সনাতন গোস্বামী। জনমানব নেই পথে! একটা বিদ্যুৎ রেখার মতো সেই ঘোড়া অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনতে পেলেন সনাতন, পথের ধারের এক বাড়ী থেকে কে যেন বলছে,—এই দুর্যোগে কুকুর বেড়ালও বেরোয় না, এক রাজভৃত্য ছাড়া! কোথাও কি বজ্রপাত হয়েছিল সে সময়! থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই অথির বিজুলীর মতো সাদা ঘোড়া। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন সনাতন! অসহ্য জীবনযাপন আর রাজকার্যের বন্ধনের পীড়নে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব! সেই তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দর-কান্তির চরণস্পর্শ লাভ!

সে এক বিচিত্র কাহিনী! এই গৌড়েরই বাতাসের বুকে আজো তা ভেসে আছে যেন।

সম্মুখের ঐ বারোদুয়ারী ১৫২৬ খৃঃ সুলতান নসরৎ শাহের তৈরী ইঁট আর পাথরে গাঁথা সবচেয়ে বড় মসজিদ। বড় সোনা মসজিদ! সোনার চিহ্ন কোথাও নেই, নেই এই মসজিদের স্বর্ণাভ দিনের গরিমা! অনেক জায়গাই ভেঙে পড়েছে এখন! এককালে এর গম্বুজগুলো স্বর্ণাভ ছিল সম্ভবত, যেমন বেশ কিছু দূরে এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত ছোটো সোনা মসজিদের গম্বুজেও দেখা যায়। কিন্তু এগারো দুয়োর সম্বলিত এ মসজিদের নাম বারদুয়ারী কেন পর্যটকের এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এই যে, মসজিদ সংলগ্ন অঙ্গন ও পার্শ্ববর্তী জেনানা মহল বা বসার গ্যালারী প্রমাণ করে এটির অর্থ 'অডিয়েন্স হল' বা সমবেত মিলন কেন্দ্র ছিল। কোন কোন সুলতান নাকি একে কাছারী হিসেবেও ব্যবহার করতেন। মসজিদেরই আশে-পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো ইঙ্গিত দেয় হয়ত মাদ্রাসা এবং বিশ্রামশালা ছিল এ সব জায়গায়। অন্তত গৌড়ের বিবরণী-প্রণেতা আবিদ আলীর তাই-ই অনুমান। একটি সরকারী বাসভবন এখন তৈরী হয়েছে বারদুয়ারীর পাশে। সেখানে মিউজিয়াম-রক্ষক থাকেন। অতীত ঐশ্বর্যের বিপুল সম্ভারের পাশে হাল্কা ইঁটের বাড়ীটি কেমন দুর্বল মনে হয়। আর একটু এগোলেই এবার গৌড় দুর্গে ঢোকার উত্তর প্রান্তিক প্রধান তোরণ দাখিল দরওয়াজা! এর আর এক নাম সেলামী দরওয়াজা! এইখানেই সুলতানদের প্রবেশের সময় তোপধ্বনি করা হতো!

কান পাতলে শুধু ঝিল্লি ঘুঘুর ডাক ছাড়া কিছুই কানে আসে না আর। ভিতরে প্রহরীদের থাকার ঘরে শুধু বাতাসের হাহাকার, দু পাশে সুউচ্চ গড়ের উপর যেখানে আগে সেনানীদের ছাউনী ছিল সেখানে ঘন অরণ্য জটিল অন্ধকার রচনা করেছে, কোথাও-বা তাদেরও নির্মূল করে আধুনিক মানুষ ফসল ফলাবার প্রচেষ্টা করেছেন। সম্মুখে শুষ্ক-প্রায় পরিখা। গল্প জানায়, ঐ দরওয়াজা থেকে নাকি লোহার পাত ফেলে গমনাগমন হতো তারপর তা তুলে রাখা হতো—যাতে শত্রু সৈন্য পরিখা অতিক্রম না করতে পারে। এই পরিখার জলেই কি ডুবে মরেছিলেন শের-শাহের সেনাপতি খওয়াস খাঁ?

কে উত্তর দেবে আর! আমি তোরণ পেরিয়ে পিছনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলার পথ ধরে এগিয়ে বাঁহাতি ফিরোজ মিনারের কাছাকাছি এক বাঁশঝাড়ের নীচে মাটিতে শুয়ে থাকা গৌড়েশ্বরী দেবীর মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াই। এখানে-ওখানে ছড়ান রয়েছে ইঁট-পাথরের টুকরো। একটু দূরে পাথরের স্তম্ভ চারটি। এখানেই কি ছিল তাঁর মন্দির, একদা যেখানে নিয়মিত পুজো দিতে আসতেন গৌড়-নাগরিকেরা! এখন বছরের বিশেষ দিন ছাড়া কেউ আসেন না আর। অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছেন এই নিভৃত অরণ্যের আড়ালে, যেন আত্মগোপন করে আছেন বেদনায়—শ্রীহীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ যেন আর দেখতে চান না তিনি। আমি প্রণাম করি তাঁকে। চারশো বছর আগেকার মানুষের প্রণামের ধারাকে বহমান করার চেষ্টা করি। পিছন ফিরতেই চোখে পড়ে বাইশগজী প্রাচীরের রেখা। বাইশগজ উঁচু এবং পনেরো ফুট চওড়া এই সুবিশাল প্রাচীরের আড়ালেই ছিল গৌড় সুলতানদের প্রাসাদ। আজ তার কোন চিহ্ন নাই। ভেঙে গেছে প্রাচীরের পুরু দেয়াল, দরবার, রাজকক্ষ এবং হারেমে বিভক্ত বিশাল প্রাসাদের অস্তিত্ব রেণু রেণু হয়ে মিশে গেছে মাটিতে। অজস্র মীনা-করা ইঁট, চীনেমাটির বাসনের টুকরো, খিলানের ভগ্নাংশ, কার্ণিশের কারুকাজ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। বাইরে দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া এসে আঘাত করছে প্রাচীরে, ভিতরে টাঁকশাল দীঘির জল ছলছল করছে বেদনায়! বুনো ঝোপ আর বনফুলের গাছও থমকে দাঁড়িয়ে আছে!

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে চারশো বছর আগেকার এক থমকে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষের ছবি! গৌড় রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে দ্বিধান্বিত পায়ে অপেক্ষা করছেন কবি কৃত্তিবাস। ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস। তোরণদ্বারে প্রশস্তি লেখা আছে : 'তার তোরণ আশ্রয় দান করে আত্মাকে সুগন্ধি ওষুধির মতো বন্ধুদের।.. একটি অনির্বচনীয় তোরণ তৃপ্তিদায়ক, স্ফূর্তিজনক.. জীবন আশা এবং বিশ্রামের আবাস।'

বিশ্বাস করেন কৃত্তিবাস এই প্রশস্তির ভাষা। শুনেছেন তিনি সুলতান বারবাক শাহ কাব্যানুরাগী সহৃদয়। তিনি মহা-পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' উপাধি দিয়েছেন, মালাধর বসুকে দিয়েছেন 'গুনরাজ খাঁ' উপাধি। তিনি তাই সাতটি শ্লোক লিখে এনেছেন সুলতানকে শোনাবেন বলে। ভিতরে সুলতানকে ঘিরে বসে ছিলেন জগদানন্দ সুনন্দ, কেদার খাঁ, গান্ধর্ব রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রীবৎস ও মুকুন্দ। সসংকোচে সেখানে প্রবেশ করে বিনম্র সুললিত কণ্ঠে তিনি পাঠ করেছিলেন শ্লোকমালা! এবং অভিভূতও হয়েছিলেন সুলতান। চন্দনের ছড়ায় অভিষিক্ত করলেন তাঁকে। রামায়ণ রচনার অনুপ্রেরণা পেলেন কবি কৃত্তিবাস। রাজসভার বাইরে অপেক্ষমান বিশাল জনতা অভিবাদন জানাল কবিকে!

কোথায় কেউ নেই এখন। আমার সঙ্গী ডাঃ জিতেন চক্রবর্তী উচ্চকণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে তা হাহাকারের মতো লাগছিল। ভাবতেও কেমন বিস্ময় লাগে, কত ঘটনার কথা নীরব হয়ে আছে এখানকার বাতাসে। ঐ প্রাচীরের আড়ালে বসেই একদিন দূর রামকেলি গ্রাম থেকে ভেসে-আসা হরিনাম ধ্বনি শুনে চমকে উঠেছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। ঐ প্রাসাদেরই কোন এক কক্ষে প্রধানামাত্যিষী একদিন পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর প্রাক্তন প্রভু সুবুদ্ধি রায়ের [illegible]। ঐ প্রাসাদেই একদিন [illegible] ... [illegible] মেঝেতে এক লক্ষ টাকা [illegible]

পরিত্রাণ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন অনুরোধে। সুলতান উল্টো বুঝে বলেছিলেন এত কম টাকায় কি হবে! কোথায় সেই রত্নভাণ্ডার! খাজাঞ্চিখানার গহ্বরে এখন শুধু রিক্ততা! এই প্রাসাদেই বিষ দিয়ে সনাতনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তা আগে থেকে অনুমান করে গোপন পেটিকায় কাঁচা তেঁতুল নিয়ে ভোজনে বসেছিলেন সনাতন। বিষক্রিয়া নষ্ট হয় তাতে। সুলতান পরে তাঁর এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতিস্বরূপে গৌড়ের ঘরে ঘরে তেঁতুল গাছ রোপনের আদেশ জারী করেন। হয়ত কিংবদন্তীরই এক গল্প, কিন্তু অসংখ্য তেঁতুল গাছ দেখে এ সব গল্প মনের ভেতর আশ্চর্য আমেজ ছড়ায়!

এখান থেকেই তো দেখা যায় চিকা মসজিদ যার ভেতর একদিন শ্রীগৌরাংগ ভক্ত সনাতনকে বন্দী করেছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। হরিনামমুগ্ধ মুক্তিপাগল সেই বন্দীর কোন জলরেখা তার অন্ধকার বিবর্ণ দেয়াল থেকে কবে মুছে গেছে! নেই সেই প্রহরী হাবু শেখের পদচারণা, যাকে উৎকোচে বশীভূত করে গংগা সাঁতরে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সনাতন গোস্বামী। চিকা মসজিদের ডান পাশে তারে ঘেরা জায়গায় যে পাথরের খিলান-চাপা গর্তগুলো আছে, লোকে বলে ওগুলো নাকি ফাঁসির মঞ্চের জন্য তৈরী! সম্মুখে ঐ গুমটি দরওয়াজা গৌড় দুর্গে প্রবেশের পূর্বপ্রান্তিক গোপন পথ। এখন ওখানে একটি সংগ্রহশালা হয়েছে! এবং অমূল্য কিছু প্রত্নসম্পদ লোভী মানুষের হাত না এড়াতে পেরে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো! এরই বাঁপাশে লুকোচুরি দরওয়াজা—শাহ সুজার তৈরী গৌড় দুর্গে প্রবেশের আর এক তোরণ! উপরে নহবৎখানা! কল্পনার গল্প বলে, এখানে নাকি বাদশা বেগমরা লুকোচুরি খেলতেন! তারই বাঁপাশে কদম রসুল, যেখানে হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্ন রাখা হয়েছিল। এখন সেটি নিকটবর্তী মহদীপুর গ্রামের খাদেমের কাছে আছে! তার কাছেই ফতে খাঁর সমাধি—যার গঠনকৌশল মনে করিয়ে দেয় এটি কোন হিন্দু মন্দির ছিল। ইতিহাস বলে, রাজা গণেশ নাকি এটি তৈরী করিয়েছিলেন!

কদম রসুলে রক্ষিত মহম্মদের পদচিহ্ন নবাব সিরাজদৌল্লা একবার মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান, পরে মীরজাফর আবার তা গৌড়ে ফেরৎ পাঠান। এটি আরব দেশ থেকে প্রথম আনেন একজন পীর, সংগে একটি নিশানও আনেন। সেটি এখন পাণ্ডুয়াতে আছে। কদম রসুলের ভিতরে একটি কাঠের ভাঙা বাকস দেখা যায়! কথিত আছে, ঐটির ভিতরে করেই নাকি এগুলি আনা হয়েছিল। প্রাঙ্গনের বাইরে আজো বিশাল বিশ্রামশালার কংকাল দাঁড়িয়ে।

কে আসবেন আর এখানে বিশ্রাম করতে! কেমন কেউ আসেন না আর ঐ দূরের 'চিরাগদানী'র মাথায় আলো জেলে কোন সংকেত জানাতে! ঐ চিরাগদানীরই অপর নাম 'পীর আসা মন্দির' বা 'ফিরোজ মেনার'! এটি তৈরী করেছিলেন সেই মালিক আন্দিল! খেয়ালী দানবীর পরাক্রমী এক গৌড় সুলতান। আমি ঐ মিনারের দিকে তাকালে এখনও এক ভয়ানক দৃশ্য যেন স্পষ্ট দেখতে পাই! মিনার তৈরী শেষ হলে সম্রাট ফিরোজ শাহ, যাঁরই অপর নাম মালিক আন্দিল, রাজমিস্ত্রীসহ উঠেছেন মিনারশীর্ষে! গর্বিত মিস্ত্রী বলে, আরো মালমশলা পেলে আরো ভালো আর উঁচু করে গড়তে পারতাম এই মিনার। আনন্দিত ফিরোজ শাহের কানে কথাটি তীব্র এক ব্যংগের আঘাতের মতো বাজে! ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন অমিতব্যয়ী সুলতান! সামান্য মিস্ত্রীর এই স্পর্ধার উক্তিকে মুহূর্তমাত্রও সহ্য না করে তাকে নীচে ফেলে দেবার আদেশ দেন তিনি। তারপর এক মর্মান্তিক আর্তনাদ ভেসে ওঠে গৌড়ের বাতাসে।

কিন্ত সুলতান নীচে নেমেই আদেশ করেন ভৃত্য হিংগাকে—তুই এখনই মোরগাঁয়ে যা! বিমূঢ় হিংগা যাবার কারণ না জেনেই চলে যায়। সেখানে তাকে চিন্তিত দেখে এক তীক্ষ্মধী ব্রাহ্মণ বলেন, এখানে রাজমিস্ত্রীর বাস, তুমি তাদের একজনকে নিয়ে যাও।

হিংগা ফিরলে চমকে ওঠেন সুলতান। তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে উচ্চ রাজপদে সম্মানিত করেন। এই ব্রাহ্মণই সেই সনাতন। সনাতন গোস্বামী! হয়ত এও কল্পনার গল্প। লুকোচুরি দরজা পেরিয়ে মহদীপুরের দিকে যেতে যে সুন্দরতম লোটন মসজিদ তাকে ঘিরেও এমন গল্প, ঐ চামকাটি মসজিদ যেখানে আগে গৌড়ের চর্মকারদের পাড়া ছিল বা তাঁতিদের পাড়ায় তাঁতিপাড়া মসজিদ বা লোটনের সামনের কাঁচা রাস্তা ধরে এগোলে পাঁচখিলানের সাঁকোর কাছে গুণমন্ত মসজিদ—এসবকে ঘিরেই তো নানা কাহিনীর মায়াজাল। ঐ লোটন বিবির কাছে নাকি প্রতি সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী গৌড় নাগরিকেরা সমবেত হতেন। ঐ পাঁচখিলানের পাথরের সাঁকোর নীচ থেকে গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছে নাকি অনেকবার!

অনুরূপ আর একটি পাথরের সাঁকো আছে কোতয়ালী দরওয়াজা যাবার রাস্তায়। কোতয়ালী দরওয়াজা গৌড় দুর্গে প্রবেশের দক্ষিণ প্রান্তিক তোরণদ্বার! এইখানেই আগে প্রধান সামরিক ঘাটি ছিল। এখনও আছে। না সেই সুলতানদের নয়, এ যুগের সীমান্তরক্ষী বাহিনী! ওপারেই যে বাংলাদেশ। আগে ছিল যা পাকিস্তান নামে চিহ্নিত এক অজানা স্থান।

এখন অনুমতি নিয়ে ওপারে গেলে চোখে পড়বে ছোটসোনা মসজিদ। তার পাশে সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধে নিহত এক সেনানীর সমাধিস্থান। একই মাটি দুইটি যুগের দীর্ঘ ব্যবধানকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে যেন। যেতে পথে পড়বে তহখানা। নির্জন প্রান্তরে এক বিশাল আবাস-গৃহ আর সংলগ্ন এক মসজিদ। গৌড়ে সম্ভবত এইটিই এখন একমাত্র আবাস-গৃহ যা কালের এবং অত্যাচারী মানুষের হাত এড়াতে পেরেছে।

এখানে বাস করতেন গৌড়ের বিখ্যাত পরিব্রাজক শাহ নিয়ামতুল্লা। এখন তাঁরই এক বংশধর বাস করেন। অন্তত, আমার বিস্ময়কে চমকে দিয়ে সেই নির্জন অট্টালিকা থেকে যে বৃদ্ধ মানুষটি বেরিয়ে এলেন, তিনি তাই জানালেন।

আমি বিস্মিত চোখে সেই বাড়ীটি এবং এই মানুষটিকে দেখছিলাম। গৌড়ের সুলতানদের অনেক পরিচয় নানা গ্রন্থে শিলালিপি পুঁথি তাম্রলেখতে আছে, কিন্তু তখনকার সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবন-যাপন করতেন তার নজির বড় একটা কোথাও পাওয়া যায় না। পার্শ্ববর্তী মহদীপুর গ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষকমশায় শ্রীসৌমেন পান্ডের প্রযত্নে এখন একটি মূল্যবান সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে গৌড় নাগরিকদের ব্যবহৃত পাথরের একটি আশ্চর্য ট্রাংক বা স্যুটকেশ, বিভিন্ন তৈজসপত্র, গৃহস্থের মঙ্গল শঙ্খ, পুরনারীর গলার মালা, জলপাত্র ইত্যাদি দুর্লভ সামগ্রী আছে। এসব জিনিস অন্য কোন সংগ্রহশালায় আছে বলে আমার জানা নেই। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু গবেষক, গৌড়ের প্রাচীন জীবনযাত্রার অনেক মূল্যবান সাক্ষ্য সেখানে গেলে তাঁরা দেখতে পাবেন। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের কাছে জাতি হিসেবেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য। একবার টেস্ট রিলিফের কাজের সময় মাটির গর্ভ থেকে সংগৃহীত এক মাটির হাঁড়িতে এক জোড়া সোনার খড়ম, মসলিন, কয়েক জোড়া শাঁখা এবং কাঁড় মধ্য থেকে একটি শাঁখা সংগ্রহ করি। আজো সেটির দিকে তাকালে বহু যুগ আগের এক গৌড়নারীর শঙ্খশুভ্র হাত যেন স্পষ্ট দেখতে পাই!

মহদীপুর থেকে 'গড়ের' চিহ্ন দেখা যায়. অনুমান করি, গৌড় শহরের একটি দক্ষিণ প্রান্তিক সীমারেখা! এর উপরে এককালে সেনাবাহিনীর ছাউনী ছিল, কামান গর্জে উঠত। বহুকাল পর, প্রায় চারশো বছর পেরিয়ে সেই বজ্রনির্ঘোষ এবার আবার বেজে উঠেছিল পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধের সময় ঠিক সেইখান থেকেই।

কিছু দিন আগে ওখান থেকে প্রাচীন যুগের একটি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। এবং এই গড় কেটে যে রাস্তা তৈরী হয়েছে তা ধরে এগোলে যেখানে গুণমন্ত মসজিদ আছে তার পাশেও এবার যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে আস্তানা বানানোর সময় শরণার্থীরা একজন সুলতানের কবর

আবিষ্কার করেন। কিছুই ছিল না ভিতরে, অথবা কিছু ছিল—জানার কোন উপায় নেই আর! শুধু সেই শূন্যগর্ভ ইঁটে বাঁধানো সমাধিভূমি এক রহস্যময় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে নিজেকে।

এমন সমাধিভূমি অনেক আবিষ্কার করেছেন এর আগে অনুসন্ধিৎসু বা রত্নলোভী মানুষেরা! ফলে সুলতানদের সমাধিভূমি ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। বাইশগাজীর কাছে খাজাঞ্চীথানার উত্তর-পূর্বে বাংলাকোট নামে জায়গায় আগে যেখানে তাঁদের সমাধিস্থান ছিল ১৮৪৬ সাল নাগাদ তা ধ্বংস করে ফেলেন সম্পদলিপ্সু মানুষ। এমনভাবেই হারিয়ে গেছে পিঠাওয়ালী মসজিদ এবং নিম দরওয়াজা যা দেখতে অনেকটা দাখিল দরওয়াজার মতো ছিল। বাঙলাদেশের অন্তর্গত হওয়াতে এখন অনেক মসজিদই এপারের পর্যটকদের চোখে পড়ে না। বাংলার মতো গৌড়ও দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে।

লোটন মসজিদের সামনে দিয়ে ফিরে আসার সময় আবার থমকে দাঁড়াতে হলো। চাষের জন্য জমিতে কোদাল চালাচ্ছিলেন এক কৃষক। ঠিকরে উঠছিল ছোট ছোট প্রাচীন কালের ইঁট। হঠাৎই সেখানে বেরিয়ে পড়ল এক গৃহস্থ বাড়ীর ভিত। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভ হয়ে গেলাম। সম্ভবত কুমোর বাড়ী ছিল এটা। সারি সারি সাজানো মাটির হাঁড়ি, নানা ধরনের পাত্র, মৃৎপ্রদীপ। হাঁড়ির

ভিতরে কিছু আছে ভেবে উত্তেজিত হাতে কয়েকটি ভাঙাও হলো। না, কিছু নেই। সেই শূন্যতা। আমি কয়েকটি পাত্র আর মৃৎপ্রদীপ সংগ্রহ করলাম। তাঁতিপাড়ার পাশে এটা কি তবে গৌড়ের কুমোরপাড়া ছিল?

তাঁতিপাড়ার কাছে ঐ যে ছোট সাগর দীঘি, তার পাড়ে যে রুগ্ন একটি অট্টালিকার ভিত সেটা কি চাঁদ সওদাগরের ভিটে?

কদম রসুলের কাছে যে কুম্ভীর পীর দীঘি আর তার জলে যে বড় কুমীরটি ছিল, সে-ই কি লোকশ্রুতির সেই পীর-সাহেব? নিছক কল্পনার গল্প হয়তো এ'ও।

তবু আজো যখন গৌড়ের সেই শিখা-হীন মৃৎপ্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকি, এখন ইতিহাস, কিংবদন্তী, বিশ্বাস আর কল্পনার আলো চোখের সামনে অতীতের গৌড় — লক্ষ্মণাবতী - লখণৌতির ছবি ফুটিয়ে তোলে।

১৭৮৬ ও ১৮০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে মিস্টার ক্রাইটন সর্বপ্রথম গৌড় খনন করেন। তারপর ১৮০৮ সালে ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন, ১৮১০-১১তে মেজর ফ্র্যাঙ্কলিন এবং পরে রাভেনশ, রজনী-কান্ত চক্রবর্তী, আবিদ আলি, অক্ষয় মৈত্র ইত্যাদি গৌড়-ভক্ত ঐতিহাসিক পরিব্রাজক গবেষকদের প্রচেষ্টায় অতীতের গৌড়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং বিলুপ্তপ্রায় স্মারকচিহ্নের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিভিন্ন যুগে দেশীবিদেশী বহু পরিব্রাজক এসেছেন গৌড়ে। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ পরিব্রাজক দুয়ার্তে বারবোসা গৌড়ের রাজপথের বর্ণনা করেছেন, রাস্তাগুলি খুব চওড়া আর সোজা। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে দেখেছেন বরাবর সারে সারে গাছ লাগানো। এখানকার লোকের সংখ্যা খুবই বেশী এবং মানুষের ভীড়ে রাজপথগুলি সমাকীর্ণ। যারা রাজসভায় যেতে চায় তাদের ভীড় এত বেশী যে তাদের একজন আর একজনকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে না। এই শহরের একটা বড় অংশ সুরম্য ও সুনির্মিত প্রাসাদে ভর্তি।

ইবন বতুতা, ওয়াংতা-ইউয়ান, মা-হুয়ান, ফে-ই শিন, নিকলো কন্তি, বারবোসা, ডাকোস্তা প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক, বৃহস্পতি মিশ্র, কৃত্তিবাস, সনাতন, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ ইত্যাদি কবি মনীষীদের রচনায় অতীতের গৌড় বহুবার স্বপরিচয়ে ফুটে উঠেছে।

এখন সবই কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। স্থানীয় মানুষেরা এইসব অতিকায় মিনার মসজিদ দেখিয়ে বলেন এগুলই নাকি জিন পরীদের তৈরী! যুক্তিনিষ্ঠ মন হাসতে গিয়ে যেন এক অলৌকিক বিশ্বাসের মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। নির্জন এই শ্মশানভূমির শূন্যতার ভেতর ঐসব বিশালাকার সৌধগুলো মনে হয় না যেন কোন মানুষের তৈরী—এখানে কথনো কোনদিন জনবসতি ছিল। এখন অবশ্য গৌড়ের ভেতরে অনেক জায়গায় চাষ-আবাদ শুরু হয়েছে, জনবসতিও গড়ে উঠেছে। আশেপাশের কদমতলা, পিয়াসবাড়ি, মহদীপুরে গ্রামের লোকসংখ্যাও কিছু কম নয়। রাখাল বালকের বাঁশীর সুর, কৃষকের উদাত্ত আলাপ, হালের বলদের লেজ মোচড়ানো, আমবাগানে প্রহরারত মানুষের হাঁকডাক এখন গৌড়ের বাতাসকে চঞ্চল করে তোলে। শীতের সময় আসেন অসংখ্য দর্শনার্থী আর পিকনিক পার্টি।

কাজের শেষে সবাই ফিরে যান। বিষণ্ণ সন্ধ্যা নামে গৌড়ের বুকে। কোটি কোটি জোনাকি গৌড়ের অসংখ্য পলাতক অতৃপ্ত আত্মার মতো তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ খুঁজতে পাগলের মতো ছোটাছুটি করে, তেঁতুলগাছের পাতা দোলেন ঝিঁঝির পায়ের নূপুরের মতো বাজে, তীব্র যন্ত্রণার আকুতির মতো ফিরোজ মিনারের নীচে দিল্লীর একটানা সুর শোনা যায়, বন্দী জীবনের চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো ফুকরে ওঠে চিকা মসজিদের ভেতরের বাতাস, দাখিল দরওয়াজার কাছ থেকে প্রহর ঘোষণা করে শিয়ালেরা, বাইশগজী প্রাচীর ম্লান ছায়া ফেলে দীঘির জলে, পিয়াসবাড়ী দীঘির জল আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে জেগে থাকে— এমন কতকাল তাদের আর অপেক্ষা করে থাকতে হবে কে জানে! শুনেছিলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নাকি একবার গৌড়কে স্বাধীন বাংলার রাজধানী করবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ের নামের সঙ্গেও জড়িত করেছিলেন গৌড় শব্দটিকে।

কিন্তু তারপর তেমন ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা সরকারী উদ্যোগের কোন উল্লেখ-যোগ্য চিহ্নই আর চোখে পড়ে না। গৌড় দেখাবার জন্য কোন গাইড নেই। কোন পুস্তিকাও নেই। গৌড়ে থাকবার জন্য তেমন সুব্যবস্থাও নেই। অথচ বাংলার সবচেয়ে রূপময় এই ঐতিহাসিক স্থানটি নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায়! কলকাতা থেকে বাসে বা ট্রেনে মালদায় গিয়ে ট্যুরিস্ট লজ বা হোটেলে থেকে প্রায় এগারো মাইল দূরবর্তী গৌড় দেখতে যেতে হয় ট্যাকসি বা ঘোড়ার গাড়ী চড়ে। আর গিয়ে শুধু রাস্তার দুধারে যে মসজিদ মিনার আছে তাই দেখেই ফিরে আসতে হয়। সমগ্র গৌড়ের কোন ছবিই তাতে ফুটে ওঠে না।

সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতীর চিহ্ন আজকের গৌড়ে আর নেই। মালদা শহর থেকে কিছু দূরের ঐ বাগবাড়ী, অমৃতিগ্রাম, সাদুল্লাপুরের মহাশ্মশান, বড়সাগরদীঘি আর মহদীপুর বা গৌড় বা মালদার সংগ্রহশালায় রক্ষিত কয়েকটি নিদর্শন থেকে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন শুধু বখত্-ইয়ারের লখণৌতি বা পরবর্তীকালের পাঠান হাবশী আর বাঙালী সুলতানদের গৌড় শেষ কিছু পরিচয় বুকে ধরে অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে।

আত্মবিস্মৃত বাঙালী আপাতত কলকাতা বাঁচাতে ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের এই প্রয়োগ আমাকে আশান্বিত করে। তবু এখনো মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে, কলকাতা কি সত্যিই একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে?

এর উত্তর আমি জানি না। শুধু জানি, আধুনিক বিজ্ঞান যদি বহু যুগ আগের এক মহানগরী, এক বিলুপ্ত রাজধানীকে রক্ষা না করে, তবে ইতিহাসেরই অভিশাপে গৌড় তার সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে কলকাতাকে। বাংলার ইতিহাসে বারবার এই ঘটনাই ঘটেছে। গঙ্গে থেকে পুণ্ড্রবর্ধন, তারপর একে একে কর্ণসুবর্ণ, বাণগড়, লক্ষ্মণাবতী, দেবীকোট, লখণৌতি, পাণ্ডুয়া, গৌড়, তাণ্ডা, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ-রাজধানী বিলুপ্তির এই স্রোতে সবশেষে ভেসে যাবে কলকাতা!

আবহমান বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসকে যাঁরা ভালোবাসেন এখন তাঁদের কাছে কোন মুহূর্তেই এটি আর আকাঙ্ক্ষিত নয়।

কলকাতার সাংবাৎসরিক কলা অনুষ্ঠান ও একজন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শিল্পী

ভারতবর্ষের অধিকাংশ তথাকথিত শিল্পকলায়োয়নমূলক অতিকায় সংস্থাগুলি বার্ষিক সংকলনধর্মী প্রদর্শনী সারাংসারশূন্য রীতিতে পরিণত হয়েছে। যে সব শিল্পী সৎ এবং সক্রিয়ভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রতিবছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন শিল্পকর্ম বা শিল্পধ্যানে নিয়োজিত আছেন তাঁদের দশ-শতাংশও আজকাল আর এইসব সাংবাৎসরিক শিল্পমেলায় পসরা সাজিয়ে বসেন না। ফলে তথাকথিত শিল্পকলাদরদীদের (শিল্পীদের নয়) এই শিল্পোন্নয়নমূলক সংস্থাগুলির বৎসরান্তিক প্রদর্শনীগুলি অপাংক্তেয় এবং অবসরপ্রাপ্ত চিত্রকর আর ভাস্করদের না-হলেও-কিছু-এসে-যেত-না গোছের কাজের মেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস এণ্ড ক্রাফটস সোসাইটির কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারটির প্রতিকারের আশা নিয়ে ১৯৭৯-এর সাংবাৎসরিক প্রদর্শনীতে পেশাদারদক্ষতাসম্পন্ন চিত্রকর এবং ভাস্করদের অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য শুধু যে জনে জনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তা নয় প্রতিটি এক-হাজার টাকা মূল্যের ছটি পুরস্কারেরও ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু তাতেও যে প্রদর্শনীর মানের খুব একটা হেরফের হয়েছিল তা মনে হয় না।

কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর বাৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনীতেও আজ বেশ কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ সৎ, সক্রিয়, প্রতিভাশালী এবং প্রতিশ্রুতিময় চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপের ছবি নির্মাতারা অংশগ্রহণ করছেন না। ভারতবর্ষের শিল্পকলা জগতে পশ্চিমবঙ্গের যে কয়জন অঙ্গুলিমেয় শিল্পী স্বীয় ক্ষমতা-বলে জায়গা করে নিয়েছেন, তাঁদের দু-একজন ছাড়া আর কারও কাজ বেশ কয়েকবছর পরে একাডেমির প্রদর্শনীতে দেখা যাচ্ছে না। একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের অধুনা-অনুষ্ঠিত ত্রিসপ্ততিতম বাৎসরিক প্রদর্শনীও তার ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিম বাংলার প্রথম সারির সক্রিয় শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র নীরদ মজুমদার এবং অন্যান্যদের মধ্যে গোপাল ঘোষ ও গণেশ হালুয়ের কাজের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জায়গা থেকে যে বৃহৎ সংখ্যক শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আরনাওয়াজ, ড্রাইভার (মাদ্রাজ), বিদ্যাভূষণ (হায়দরাবাদ), পি ভি জানকীরাম (মাদ্রাজ), জয়ন্ত পারিখ (বরোদা) সূর্যপ্রকাশ (হায়দরাবাদ), পি টি রেড্ডি এবং এস জি বাসুদেব (মাদ্রাজ) শিল্পী হিসাবে কথঞ্চিৎ পরিচিত এবং বাংলাদেশের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন উল্লেখযোগ্য। দিল্লী, বোম্বাই, বরোদা, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ এবং মাদ্রাজের অধিকাংশ খ্যাতনামা শিল্পীর কাজ এই প্রদর্শনীতে অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় এই প্রদর্শনীকে কি পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের শিল্পকলার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী বলে অভিহিত করা যায়?

ভারতবর্ষের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও ছাপের ছবিতে গত দশ পনেরো বছরে যে-সব দিক সমৃদ্ধ হয়েছে এবং প্রধানত যাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে যে-সব সমৃদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে, সেসব দিকপালদের কাজের অনুপস্থিতির কারণে ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং ছাপার ছবির প্রধান প্রধান গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে এ-প্রদর্শনী থেকে কোন ধারণাই প্রায় জন্মায় না। ব্যতিক্রমঃ শুধুমাত্র নীরদ মজুমদারের ছবি এবং জানকীরামের একটি ভাস্কর্য নিদর্শন। জানকীরামের ভাস্কর্য থেকে হিন্দু-পৌত্তলিকতার নবীকরণ এবং নীরদ মজুমদারের ছবি থেকে তন্ত্রালঙ্কারিক বিমূর্ত চিত্রকলা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা যায়। এ-দুই ধারাই সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম দুই প্রধান ধারা এবং এই দুজন দুই প্রধান পুরুষ।

অনেকে বলতে পারেন যে নামী শিল্পীদের উপস্থিতিই কোন প্রদর্শনীর মান উন্নয়নকারক নাও হতে পারে; কারণ নামী এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যে সব সময়ে ভাল কাজ করেন, তা নয়। কোন প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা যদি নামী শিল্পীদের কাজের চেয়েও অখ্যাতনামা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন তবে তা সাতিশয় আনন্দজনক কাজ বলে অবশ্যই পরিগণিত হবে। কিন্তু একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনী দেখে এবম্বিধ শিল্পোন্নয়নমনস্কতার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

প্রথমেই ধরা যাক নামী শিল্পীদের কাজগুলি। নীরদ মজুমদারের ছবিতে নকশার এবং রঙের নতুনত্ব কিছুই পরিলক্ষিত হল না। উপরন্তু, আজ যখন নীরদবাবুর ছবিতে নকশার জায়গায় ড্রইং প্রধান হয়ে উঠেছে তখন ড্রইং সম্বন্ধে তাঁর আরও বেশী যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। সুনীলমাধব সেনের ছবি ধনীগৃহের শোভাবর্ধক নকশামাত্র। রথীন মিত্রের কাজ দেখে মনে হয় যে, তিনি ড্রইং এবং রঙের ব্যাপারে শিথিল হয়ে গেছেন। নির্মল দত্তর বাগে-

শিল্পী : মাকদুল খারিওয়াল

রিনার ছবিতে এদগার দেগার অক্ষম অনুকৃতি পীড়াদায়ক। অমরেন্দুলাল চৌধুরীর জল-রঙের দুটি ছবি যদিও অমল চাকলাদারের বছর দু-তিনেক আগের ছবির বর্তুলাকার রেখাছন্দের নকশাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় তবু তা ছন্দোগুণসমৃদ্ধ নকশা বলে গ্রহণ করতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকে না। তাঁর ছবির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা চিত্রক্ষেত্রের অসুচারু ব্যবহার। পশ্চিমবঙ্গের নামী শিল্পীদের যে স্বল্পসংখ্যক এ-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে একমাত্র গণেশ হালুয়ের দুটি কাজ উল্লেখযোগ্য। দুটি নিসর্গদৃশ্যে বর্ণান্তরের ব্যবহার দিয়ে শূন্য চিত্রক্ষেত্রকে তিনি যেভাবে অসীম দেশে পরিণত করেছেন এবং পরস্পর অসংলগ্ন খোঁচা (stroke) গুলিকে এ-ভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, তাঁর নিসর্গদৃশ্য একটি আপাতঃ-শান্ত চঞ্চল অভিব্যক্তি সৃষ্টি করে। সুবজ পাল মশাইয়ের বিমূর্ত রচনান্বয়ে রঙ কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। পশ্চিমবঙ্গের বহু নামী শিল্পী যাঁরা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেননি, তাঁদের কয়েকজনের ছবির স্বাদ তাঁদের অনুকারকদের ছবির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। এ অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতন।

পৃথ্বীশ শিকদারের কোলাজটিকে তো এ-সমালোচক বিকাশ ভট্টাচার্যের বলে ভুল করেছিলেন। সরলকুমার দাশের 'দি কিংমেকার' ছবিটিতে বিকাশের অক্ষম

অনুকরণ লক্ষ্যণীয়। মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের ছবি দুটিকে যে কেউ সঙ্গত কারণে সুনীল দাশের বলে ভুল করতে পারেন। অসিত মণ্ডলের ছবি দুটিতে গণেশ পাইনের বাহ্-রঙা রীতির অক্ষম অনুকরণ লক্ষ্যণীয়। কাঞ্চন দাশগুপ্ত তাঁর দুটি ছবির ভাব-কল্পনায় বিকাশকে এবং রূপায়ণ রীতিতে গণেশ পাইনকে অনুসরণ করেছেন। মৈনাক-শঙ্কর রায়ের এচিং-এর রূপকল্পনায় এবং রূপায়ন রীতিতে লালুপ্রসাদ সাউ এবং সুহাস রায়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। নির্মলেন্দু দাশের কাঠের-ছাপের কাজকে কেউ যদি সোমনাথ হোড়ের বলে মনে করেন তবে তাঁকে সে-কারণে ফিলিস্তাইন বলা যাবে না। ইন্দেরা মনজিতের পুরস্কারপ্রাপ্ত তেল-রঙের ছবিটি একটি বিমূর্ত রচনা, কিন্তু বিশুদ্ধ বিমূর্ত রচনার জন্য রঙ, রেখা এবং চিত্রক্ষেত্র সম্বন্ধে যে সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন শিল্পীর এখনও তা অনায়ত্ত। ডবলু আর কাপুরের তেলরঙের বাস্তব-ধর্মী রচনাটি ড্রইং এবং বর্ণনান্তর প্রয়োগের গুণে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। বিশ্বপতি মাইতির কাজ দুটির বিন্যাসপদ্ধতি এবং বর্ণকাভঙ্গ ভালো। প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি সূর্যপ্রকাশের। হায়দরাবাদের এই শিল্পী তেলরঙ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। প্রায় একরঙা এই ছবিটির বিন্যাস এবং বর্ণান্তর অভিব্যক্তিমূলক; ছবিটি একটি বিমূর্ত রচনা। সূর্যপ্রকাশের গুরু বিদ্যাভূষণের ছবিতে শিষ্যের দক্ষতার ছাপ অনুপস্থিত। বরোদার অরুণকুমার জয়সওয়াল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমান-ওজনের রঙের পুঞ্জের সাহায্যে চিত্রক্ষেত্র বিভাজিত করে একমাত্রিক রচনা গড়ে তুলেছেন; কিন্তু তাঁর কাজে তাঁর গুরু মণি সুব্রহ্মণ্যমের উপস্থিতি সোচ্চার। বরোদার মনু জে পারিখ (কলকাতার মনু পারেখ নন) দক্ষতার সঙ্গে স্নিগ্ধ এবং শ্বেত বর্ণ ও বর্ণান্তরের সাহায্যে হোকুসাইয়ের ধরনের আবহাওয়া গড়ে তুলতে চেয়েছেন; কিন্তু ছবির ঊর্ধ্বাংশের তলবিভাজন রীতি এবং রঙ তাতে বাদ সেধেছে।

প্রদর্শনীর ছাপের ছবি বিভাগটি একান্তই দুর্বল। ভারতবর্ষে ছাপের ছবি সাম্প্রতিকালে যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তার কোন পরিচয়ই এ বিভাগটিতে পাওয়া যায় না। এরই মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে আসা সোমনাথ হোড়ের কিছু ছাত্রের এবং বরোদা থেকে আসা জ্যোতি ভাটের কিছু ছাত্রের কাজের মধ্যে কথঞ্চিৎ মাধ্যম-মনস্কতা দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের কাজের মধ্যে সোমনাথ হোড় এবং জ্যোতি ভাটের প্রভাব এতই সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে এখনও তাঁদের ব্যক্তিশিল্পী বলে ধরতে দ্বিধা বোধহয়। এই বিভাগে মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা দেখিয়েছেন নির্মলেন্দু দাশ (একটি লিথো-গ্রাফ ও একটি কাঠের ছাপ), পার্থপ্রতিম দেব (দুটি লিনোকাট), প্রয়াগ ঝা (দুটি এচিং-ও-একোয়াটিন্ট), অমিত্র রায় (দুটি সেরিগ্রাফ) ও হরেকৃষ্ণ বাগ (রঙিন লিথোগ্রাফ)।

ভাস্কর্য বিভাগটিও দুর্বল। জানকী-রামের ধাতু নির্মিত 'ভবানী মা' মূর্তিটি দেখে কিন্তু এই প্রতিমা গড়ার উদ্দেশ্য অনুধাবন করা গেল না। শিল্পী নিশ্চয়ই পুজোর উদ্দেশ্যে এই প্রতিমা গড়েননি। উদ্দেশ্য যদি তা না হয়ে থাকে তবে আশা করা যেতে পারে যে শিল্পী এই দেবী সম্পর্কে কোন ব্যক্তিগত ধ্যানকে অভিব্যক্তি দানের উদ্দেশ্যে এই প্রতিমা গড়েছেন। কিন্তু প্রতিমালক্ষণের দিক থেকে এই প্রতিমা এতই ঐতিহ্যানুসারী এবং অন্যথায় এতই আলঙ্কারিক এর রূপ যে প্রতিমাশরীরে কোন ব্যক্তিগত ধ্যান মূর্ত হয়ে ওঠে না। এর চেয়ে মাদ্রাজেরই অন্য আরেকজন ভাস্কর, এস নন্দগোপালের ধাতু নির্মিত 'পশু' নির্মাণ কৌশলে, গঠনে, অলঙ্কারে এবং অভিব্যক্তির রূপায়ণে অনেক সার্থক। এটি প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য নিদর্শন। পি চন্দ্রবিনোদের লৌহনির্মিত ভাস্কর্যটির গঠনে কৌশল এবং কারিগরি দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট কিন্তু রচনাটি একেবারেই অর্থবাহী নয়। এ ধরনের ভাস্কর্য নির্মাণ না করে ধাতু-নির্মিত যন্ত্রের যন্ত্রাংশ বানালেও তো হয়; সেগুলো অন্তত মানুষের কাজে লাগে।

প্রদর্শনীটি দেখে সাধারণভাবে যা মনে হয়, তা হল প্রদর্শনীটি পেশাদার শিল্পীদের নয়, ছাত্রশিল্পীদের।
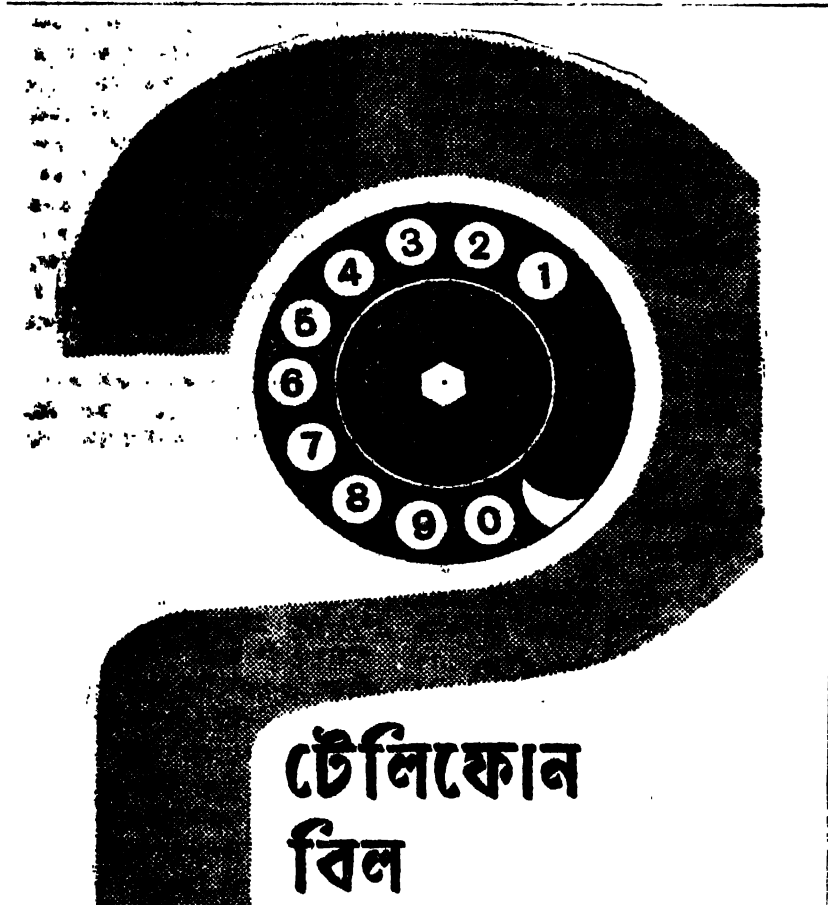
—প্রণবরঞ্জন রায়

স্বপ্ন

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

সকালের চনমনে রোদটা জানালা গলিয়ে একেবারে উপচে এসে পড়ে সুকান্তর বিছানায়। প্রথমটা কোনাকুনি, তারপর পাশ ফিরে শুতে না শুতেই তক্তপোশের অর্ধেকটা জুড়ে সুকান্তর কোমরের নীচ থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত পোড়াতে থাকে। ঘুম ভাঙ্গার অনেকক্ষণ পরেও সুকান্ত মড়ার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। রোদ্দুরের তেজটা শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠলে ক্ষীণ কোমরটা এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় 'দ'-এর মত ভেংগে তক্ত-পোশের আরেক কোণে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। যেন একটা বড় সাইজের গিরগিটি আহত হয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।

এইভাবেই পড়ে থাকতে হবে অনেকক্ষণ। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত বাড়ীর মেজাজী ঠিকে-ঝি এসে উনুনে আঁচ দিয়ে বা জলের কলে হুর হুর আর বাসন-কোসনের কর্কশ ধাতব আওয়াজ তুলে কাজ আরম্ভ করছে। সুকান্ত একদিন মিনমিনে গলায় বলেছিল, আরও একটু সকাল করে আসতে পার না বুঁচির মা! এক কাপ চা-এর জন্য সেই কখন থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি! বুঁচির মা খনখনে গলায় হাত-পা নাড়িয়ে জবাব দিয়েছিল, অমন যদি ভোর সকালে চা খাবার লালচ হয় দাদাবাবু তবে আর পাঁচটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিও। দশ বাড়ীর কাজ থাকলে কোন দিকটা আগে সামলাই বইলবে তো! সত্যিই তের টাকা মাইনের ঠিক ঝির কাছ থেকে এর থেকে ভালো সার্ভিস আর কি আশা করা যায়!

সারাটা বিছানা জুড়ে রোদ্দুর যখন দাপাদাপি আরম্ভ করে, ছায়া খুঁজে খুঁজে সুকান্ত যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বাসী মুখে অম্বলের চোঁয়া ঢেকুর যখন নোনা জল ছোটে সারা মুখ বিস্বাদ করে তোলে, তখন সুকান্তর ভোর সকালের চা এসে পৌঁছয়। হিড়হিড় করে চেয়ারটা তক্তপোশের কাছে টেনে এনে ঠকাস করে চা-এর কাপ, সিগারেটের বাকস, দেশলাই ও অ্যাশট্রেটা নামিয়ে কপালের উপর হাত রেখে আড় হয়ে শুয়ে-থাকা সুকান্তকে তীক্ষ্ন গলায় ডাক দিয়ে জাগিয়ে যায় বুঁচির মা।

সকালের দিকে শরীরটা দুর্বল লাগে। রোজকার মত আজও চমকে জেগে উঠে বালিশে কনুই ভেংগে সম্মোহিতের মত

ঝুঁকে পড়ে চা-এর কাপে চুমুক দিল সুকান্ত। তিক্ত বিস্বাদ চা। বোধ হয় পাড়ার মুদী দোকানের সেই চামড়ার গুঁড়ো চলছে আবার। অলসভাবে বাঁহাতে প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল সুকান্ত। আরও মিনিট পনের এমন চলবে। আশপাশের বাড়ীর সবাই যখন একজন-দুজন করে অফিসে বেরুতে আরম্ভ করবে, সুকান্ত ফোলা ফোলা চোখে, উসকো-খুসকো চুলে, পাজামার দড়ি সামলাতে সামলাতে থলি হাতে বাজারে বেরুবে। কোনও রকমে বাজার সেরে ফিরে থলিটা ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়ে দড়াম করে বাথ-রুমের দরজা বন্ধ করবে। পাঁচ মিনিট। তারপরেই বাইরে এসে হাঁক-ডাক আরম্ভ করবে, কইরে, মালা, তাড়াতাড়ি ভাত দে। অফিসের দেরি হয়ে গ্যালো।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে সুকান্ত বালিশে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অর্থহীন চোখে মেঝেতে একটা আরশোলার চরকীবাজি দেখতে লাগল। ছোট বোন মালা স্নান সেরে উঠে এ'ঘরে এল একবার। জানালার পর্দাগুলো টেনে-টুনে ঠিক করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল মালা। তারপর তেলচিটে চার-দেওয়াল একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে বেজার মুখ কোঁচকাল, তোর ঘরটার কি অবস্থা রে ছোড়দা? কোনও ভদ্রলোকের মেয়ে এসে এই ঘরে থাকতে পারবে? কবে থেকে বলছি তোকে ঘরটা একবার চুনকাম করা, অই দাগড়া দাগড়া গর্তগুলো মিস্ত্রী ডাকিয়ে ঠিকঠাক করা। তোর মত লোকের বিয়ে করাই উচিত নয়। যা নোংরা আর আলসে তুই না—।

এতদিনে সুকান্তর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। আজ বিকেলে মেয়ে দেখতে যাবার কথা। কোনও জবাব না দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে সুকান্ত বিস্ফারিত চোখে আরশোলাটার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। মালার বয়স উনিশ আর সুকান্তর পঁয়ত্রিশ। সুকান্তর প্রথম যৌবনে মালা নেহাৎই শিশু ছিল। মালার অলক্ষ্যে সে একবার দেওয়ালে টাঙান ছবিটার দিকে তাকাল। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে তোলা ছবি। স্বাস্থ্য আর লাবণ্যে ভরপুর একটি উজ্জ্বল মুখ সবিস্ময়ে বিছানায় শোওয়া গিরগিটিটাকে নিরীক্ষণ করছে। কয়েক বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে ওর সাবজেক্টে সন্ধ্যার দিকে ক্লাশের একটা পার্ট-টাইম লেকচারশিপের জন্য ঘোরাফেরা করেছিল কিছুদিন সুকান্ত। পায় নি অবশ্য। তখন ক্যাম্পাসের দেওয়ালের গায়ে বড় বড় করে লেখা একটা ছড়া বেশ মনো-যোগ দিয়ে পড়েছিল। কবির নামটাও দেওয়া ছিল, মনে নেই। কি যেন বলে এগুলোকে? ডগেরেল—

'উল্টে দিন, উল্টে দিন
নামগুলো সব উল্টে দিন।
সংখ্যাগুলো উল্টে দিন,
আরশোলাকে দুপুর রোদে
উল্টে দিন, উল্টে দিন।।'

সুকান্ত মনে মনে কবিতাটা আওড়াল কয়েকবার। নিজেকে একটা উল্টে যাওয়া আরশোলার মতই মনে হচ্ছিল। একটানা চৌদ্দ-পনের বছর কেরাণীগিরি, মাস্টারী, ক্যানভাসারী আর তেল-সাবান-দাদের মলমের বিজ্ঞাপন লেখবার চাকরির পর আর কি বাকী থাকে? বাবা হঠাৎ মারা যাবার পরই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল। চারটি অবিবাহিত বোন, অসুস্থ মা। বায়ো-স্কোপের রীলের মত গত পনের বছরের ইতিহাস সুকান্তর চোখের সামনে সারা-রা-রা করতে করতে হোলীর নাচ আরম্ভ করে দিল।

মালা নিঃসাড়ে বিছানায় পড়ে-থাকা সুকান্তর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কঠিন গলায় বলল, তুই কিন্তু ঠিক চারটের মধ্যে অফিস থেকে চলে আসবি ছোড়দা, দেরি করবি না। যেতে হবে সেই গিরিশ এভেনিউ। ওখান থেকে ফিরে এসে আমাকে আবার যেতে হবে আরেক জায়গায়।

সুকান্ত এতক্ষণে মুখ তুলে মালাকে একনজর দেখল। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবি? মালা অধৈর্য গলায় বলল, আছে এক-জায়গায়। আমার বন্ধু বাসন্তীর সঙ্গে যাব। সুকান্ত একটা প্রচণ্ড ধমকে মালাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে গেল। কিন্তু থমকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে মালাকে দেখল, তারপর নরম গলায় বলল, ও সব বাসন্তী-কাসন্তী ছাড়ো। পরীক্ষা এসে গেছে। এইবার একটু পড়াশোনার দিকে নজর দাও। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে-সুস্থে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মালা উদ্ধত ফণিনীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুকান্তর ঠাণ্ডা নিস্পৃহ চোখে কি দেখল সেই জানে। মিইয়ে গিয়ে গজরাতে গজরাতে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। ছোড়দার উপর যতই তুচ্ছতা অবজ্ঞা দেখাক, এ বাড়ীতে একমাত্র সুকান্তকেই যা একটু ভয় করে মালা।

রোজকার মত আজও অফিসে পৌঁছুতে দেরি হল সুকান্তর। একঘর লোকের সামনে কোনও ব্যাগ হাতে ট্যাং ট্যাং করে ঢুকতে মাঝে মাঝে বেশ অস্বস্তি হয় বই কি। কিন্তু উপায় কি? অই ভিড়ে বাসে-ট্রামে ছোট-লোকের মত মারপিট করে সুকান্ত কোনও দিন উঠতে পারবে না। সেকশন অফিসার বিরস মুখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে কোনও কথা না বলে আবার দু পাশের ফাইলের স্তূপের মধ্যে ডুবে গেলেন। সুকান্ত বুঝলো আজ কপালে গেরো আছে। অথচ সকাল সকাল খেতে বলেছে মালা। পাখাটা ফুল স্পীডে খুলে দিয়ে শার্টের বোতাম আলগা করে ঘেমো জামাটা কাঁধের দু পাশে সরিয়ে নিরাসক্ত ভঙ্গীতে সুকান্ত বসে রইল কিছুক্ষণ নিজের সীটে। অফিসের বেয়ারাটা কোথায় গেছে। এক গ্লাস জল এনে যে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যাবে—হাজার বার বললেও তার কানে যায় না। তেল তেল ঘামে সারা মুখ চটচট করছে। পাশের সীটের বিকাশ এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে কাজ করছিল। মুখ তুলে সুকান্তকে দেখতে পেয়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠে এসে চাপা গলায় বলল, এই যে তুই এসে গেছিস। আমি একটু বাইরে চললাম, একটু ম্যানেজ করে নিস। তারপর হনহন করে বেরিয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব দিয়ে ম্যানেজ করার পদ্ধতিটি বিকাশের অনেক দিনের। নানান রকম ব্যবসার দালালি করে বিকাশ। অফিসের চাকরিটা হাতের-পাঁচ। অনেক রকম লোক আসে বিকাশের খোঁজে। প্রত্যেকের নাম-ধাম জেনে রাখতে হয়। ওপরওয়ালা সাহেবের ঘরে ডাক পড়লে নির্জলা মিথ্যে কথা বলতে হয়। বাড়ী থেকে খেয়ে আসে নি, বোধহয় খেতে গেছে। এমন কি পেটটা বলছিল ভালো নেই, ল্যাভাটরি গেছে বোধ হয়। এমনি সব। মাঝে মাঝে মেয়েরাও আসে। দিব্যি সাজগোজ করা রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো সতেজ চেহারা। অফিসের আর পাঁচটা মরা মাছের মত চাউনীওয়ালা মেয়ে নয় তারা।

একটু স্বাভাবিক হয়ে সুকান্ত জামার হাতা গুটিয়ে ফাইল খুলে বসল। ইমার্জেন্সী কেস আছে কতগুলো। আজকেই ছাড়তে হবে। কিন্তু ঝুঁকে পড়ে ফাইলের প্রপোজালটা ভালো করে পড়বার আগেই বেয়ারা গোকুল এক গাদা নতুন ফাইল ঘাড়ে করে এনে সুকান্তর টেবিলে আছড়ে ফেলল। কলম গুটিয়ে সুকান্ত ক্ষিপ্ত গোকুলের দিকে তাকাল। বেয়ারাটা কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে পাশের টেবিলের কাচের গ্লাস তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা জল আনতে চলে গেল। এবার একটা তীব্র ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সামনে তাকাল সুকান্ত। গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে সেকশন অফিসার! সুকান্তর স্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি অপহরণের মূলে এর অবদান কম নয়। একটা শীর্ণ বন-বেড়ালের মত চেয়ারের এক কোণে বসে রাগে ফুঁসতে লাগল সুকান্ত।

আশপাশের ছোকরা কেরানীগুলোর রাজনৈতিক হত্যা, বাংলাদেশ, মুক্তিফৌজ, ইয়ান স্লেমিং ইত্যাদি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা ততক্ষণ থিতিয়ে এসেছে। সবাই অল্প-বিস্তর কাজে মন দিয়েছে। নিজের টেবিলের দিকে তাকিয়ে রীতিমত চিন্তিত বোধ করল সুকান্ত। জরুরী পলিসি ভিজিলেন্সের ফাইল সব। সুকান্ত সিনিয়র গ্রেড ক্লার্ক। কাজেই প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। এদিকে মালা শাসিয়ে রেখেছে চারটের মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে। আজ পাত্রী দেখতে যাওয়ার কথা। তাহলে সত্যি সত্যিই সুকান্তর বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে! একটুকরো মৃত হাসি ওর ঠোঁটের কোণে ফুটল। গত সাত-আট বছর ধরে বন্ধু-বান্ধবের বিয়েতে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে দিয়ে নিজেকে ইদানীং কেমন যেন বিপত্নীক বা সদ্য টি বি মুক্ত কেউ বলে মনে হয় সুকান্তর। একটু অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করল সুকান্ত।

...সিল্কের পাঞ্জাবির সংগে পায়ের কাছে লোটান চওড়া জরিপাড় ধুতি, কোলাপুরী শুঁড় তোলা চটি। ছিপছিপে একহারা চেহারায় ভারী সুন্দর মানিয়েছিল কিন্তু। ইউনিভার্সিটির গন্ধটা তখনও গা থেকে যায়নি। এক মাথা কোঁকড়া চুল, উন্নত নাক আর টানাটানা চোখ। উত্তর কলকাতার বিয়ে বাড়ীতে কুমারী মেয়ে মহলে একটা চাপা কৌতূহল খেলা করছিল। বরের বিশেষ বন্ধু। তাই আলাদা খাতির। একেবারে অন্দর মহলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। ফাল্গুনের সন্ধ্যায় ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। সানাই-এর করুণ অথচ ভারী মিষ্টি সুর সিঁড়ের মাথায় এসে আছড়ে পড়ছে কানে। আলোয় আলোময়—রমরম গমগম করছে সারা বাড়ী। অদ্ভুত ভালো লাগছিল সুকান্তর। কারণে-অকারণে সুন্দরী মেয়েদের সংগে মুগ্ধ দৃষ্টি বিনিময়ের মাদকতা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সুকান্তর সমস্ত অস্তিত্বকে। দীর্ঘদিন ভুলে যাওয়া কোন স্বপ্নের আবছা স্মৃতির মত সেই রঙীন মুহূর্তটা সুকান্তর চোখের সামনে ফুটে উঠছিল একটু একটু করে।...

অফিসে আসার পর থেকেই পেটে একটা ছোট্ট মোচড় অনুভব করছিল সুকান্ত। একবার টয়লেট-রুমে যেতেই হবে। প্রায় প্রতিদিনই এমন হয়। খোলা ফাইলের উপর পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় পাশের সেকশনের ভূপেন্দ্রমোহন এসে দাঁড়ালেন কয়েকটা টাইপ করা কাগজ হাতে। এই যে সুকান্তবাবু, আপনি তো ইংলিশে অথরিটি। শেলীর 'দি ক্লাউডস'-এর উপর একটা নোট করেছি। হেঁ-হেঁ আপনারা ইনটেলেকচুয়েল লোক. একটু দেখিয়ে নিলে সাহস পাই আর কি।

সুকান্ত কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ভূপেন্দ্রমোহনকে দেখল। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দিব্য উৎসুসে গৌরবর্ণ চেহারা। নিখুঁতভাবে কামানো দাড়ি-গোঁফ। পরনে ফর্সা কাঁচি-ধুতির উপর দামী আদ্দির পাঞ্জাবি। টিউশানী করেন ভদ্রলোক। মেয়েদের পড়ান। অল্পবয়েসী বনেদী ঘরের মেয়ে সব। বয়ঃসন্ধিকালে নারী রজঃস্বলা হয়।...ভূপেনবাবুকে দেখে কথাটার মানে সুকান্ত যেন কিছুটা বুঝতে পারল। সুকান্তর দৃষ্টি ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ হয়ে উঠতে লাগল চেয়ারে বসে।

...এই সুকুদা, তোমার বাঁদিকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাতটা আরেকটু বাড়াও। আঃ, ঐ তো পাতাগুলোর আড়ালে। ঈশ, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? অধৈর্য গলায় পাশের বাড়ীর চৌদ্দ বছরের মিঠু আতাফল গাছটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে সুকান্তকে পাকা আতাফল দেখিয়ে দিচ্ছিল।

সুকান্ত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বিভ্রান্তভাবে এক হাতে গাছের ডাল চেপে ধরে আরেক হাতে মিঠুর দেখান পাকা আতা খুঁজছে। হদিস না পেয়ে আরেকটা ডাল বেয়ে সুকান্ত টলমল করতে করতে উপরে উঠল। নীচে থেকে মিঠু তীক্ষ্ণ গলায় সাবধান করে দিল, এই সুকুদা আর উঠো না পড়ে যাবে। ঠিক তখনি মড়-মড় করে ডাল ভেঙে পড়ে গেল সুকান্ত নীচে শুকনো বন-তুলসীর ঘন ঝোপের উপর। মিঠুকে সুদ্ধ নিয়ে। ভাগ্যিস বেশী উঁচু থেকে পড়ে নি। আর স্প্রীং-এর গদীর মত ঝোপটা ছিল। ষোল-সতের বছর বয়সের সুকান্তর [illegible] শরীরটা মিঠুর নরম তুলতুলে [illegible] উপর। সুকান্তর কনুইটা চেপে বসেছে মিঠুর উন্মুক্ত বুকের ওপর। [illegible] মধ্যে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। [illegible] আবছা গলায় মিঠু কানের কাছে বলল, এই ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে। সম্বিত ফিরে পেয়ে সুকান্ত ধড়মড় করে উঠে বসে তাকাল চারদিকে। মধ্যাহ্ন শহরের [illegible] দুপুর। কেউ নেই কোথাও। মিঠু তেমনি অসহায়ভাবে হাটু ভেঙে ঝোপের উপর শোওয়া। দুর্ঘটনা এড়ানোর উত্তেজনা আর ঘামে ওর সারা মুখ রক্তাভ। বেণী খুলে উড়ে এসে কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে মিঠুর শোওয়া দেহটার দিকে তাকিয়ে রইল সুকান্ত কিছুক্ষণ। হাটুর উপর থেকে ফ্রকটা সরে গেছে। শঙ্খের মতো সাদা সুডৌল আর মসৃণ জঙ্ঘার অনেকটা অনাবৃত হয়ে আছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে সুকান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছে।... সারা শরীরে যেন বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেল তার।

ফ্রক ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করে মিঠুও উঠে দাঁড়াল। চুলগুলো গোছা করে পিঠের পাশে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, তুমি একটা হাঁদারাম। তারপর দৌড়ে গিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।...

দুপুরে টিফিনের সময় ক্যান্টিনে বসে কথা হচ্ছিল। অফিসের সুকান্ত, বিকাশ, চাকলাদারবাবু আর মিঃ খিংড়া। অর্ডার সাপ্লাই-এর কন্ট্রাক্টার মধ্যবয়সী মিঃ খিংড়া। সুকান্তদের আধা-সরকারী অফিসে ওদের একচেটিয়া বিজনেস। অফিস স্টাফের কাছ থেকে কি করে কাজ আদায় করতে হয় মিঃ খিংড়া জানে। সুন্দর বাংলা বলে। বিকাশ আর চাকলাদারবাবু অনেক দিন আগেই ওর অনুগত হয়ে পড়েছে। সুকান্তকে প্রায়ই অনুযোগ করে মিঃ খিংড়া, মিঃ সান্যাল, শরীরের দিকে একদম নজর দিচ্ছেন না! ইয়ংম্যান, এটা ভালো নয়। আমার সঙ্গে কিছুদিন আসুন, লাইফ কাকে বলে দেখবেন। রোজকার মত আজকেও কথাটা বলল খিংড়া।

বিকাশ ক্যাসফেসে গলায় হেসে বলল, সুকান্ত লাইফ দেখবে? তাহলেই হয়েছে। ওতো এক পেগ ড্রিংকস-এই কাত। তার উপর আরও কিছু হট স্টাফ দিলে সন্ধ্যার আগে বাথরুম ছুটবে! সবাই হা-হা করে হেসে উঠল বিকাশের বলার ভঙ্গী দেখে।

এর আগে দু-একবার গেছে সুকান্ত ওদের সঙ্গে। শেড দেওয়া নীরন আলোর আবছা অন্ধকারে নরম গদীমোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ঠান্ডা বীয়ারে চুমুক দিতে ভালই লাগে। খিংড়ার চেনা মেয়েও দু-এক জন আসে। দিব্বি মাজাঘসা সপ্রতীভ চেহারা। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাঁধে হাত রেখে গল্প করে। বিকাশ ঘু-ঘু ছেলে। দিব্যি উশুল করে নেয়। সুকান্তর প্রথম দিকে আগ্রহ ছিল। আজকাল মিইয়ে গেছে। আসলে মদটা ওর পেটে সহ্য হয় না। তবুও কৃষ্ণা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন এগিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কালোর উপর সুন্দর মসৃণ চেহারা। ওদের আলাপের সুবিধের জন্য পাশের ফাঁকা কেবিনে জোর-জার ঢুকিয়ে দিয়েছিল বিকাশ। কেবিন মানে একটা ছোট ঘর। খাট-পালঙ্ক আয়না সবই আছে। কুঁজোতে খাবার জল পর্যন্ত।

মিঃ খিংড়া অমায়িকভাবে উদার গলায় বলল, আজকেই চলুন না সন্ধ্যায়? আমার নতুন বান্ধবী মীনা জহুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সী নোজ হাউ টু এনটার-টেইন। সুকান্তকে খিংড়ার দরকার। পাবলি-সিটি বাজেট ওর হাতে।

সুকান্ত কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। সোয়া তিনটে বাজে। কিছুক্ষণ উশখুশ করে তারপর উঠে দাঁড়াল, 'আজ মাপ করতে হবে মিঃ খিংড়া. বাড়ীতে একটা খুব জরুরী কাজ আছে চারটের সময়।'

ওদের সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সুকান্ত ব্যস্ত-সমস্তভাবে দোতলায় উঠে গেল। সেকশন অফিসারকে বলে টেবিল গুছিয়ে রেখে ফোলিও ব্যাগ বগলে চেপে বেরিয়ে পড়তে-পড়তে সাড়ে তিনটে বেজে গেল।

রোদটা তামাটে হয়ে এলেও তেজ কমে নি। রাস্তায় বাসস্টপে লোকগুলো নির্বিকার শান্তভাবে ঐ গনগনে রোদের তাপে দাঁড়িয়ে আছে খাঁচায় বাঁধা গৃহপালিত জন্তুর মত। পোড়া তামাটে মুখ সব। সুকান্তর হঠাৎ জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ল। অৎস্‌উইচ, বেল-সেন কিংবা লুবিস্কার ঘেটো। সার বেঁধে দাঁড় করান মৃত্যুপথযাত্রী ইহুদী নারী-পুরুষ।...ডায়েরী অফ অ্যানি ফ্রাংক! এক-একটা ভাঙা নড়বড়ে বাস ঘড়াং ঘড়াং করতে করতে এসে ক্যাঁচ করে থামছে কি থামছে না, লোকগুলো সব হুমড়ী খেয়ে পড়ছে গেটের উপর। দু-চারজন বলবান ঠেলে-গুঁতিয়ে উঠতে পারল। বাকী সবাই ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। আর অমনি ডিজেলের কালো ধোঁয়ার কটু গন্ধ ছেড়ে বাসটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। নাঃ কোনও আশা নেই! একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ফোলিও ব্যাগটা বগলে চেপে ধরে সুকান্ত এক পাশে সরে দাঁড়াল।

সুকান্তর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, এই ভিড় ছেড়ে একটু ফাঁকায় সরে দাঁড়ালে একটা সুরাহা হতে পারে। হলও তাই। হুশ করে একটা ট্যাকসী এসে দাঁড়াল। ভাড়া চুকিয়ে আরোহী নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত টপ করে উঠে বসল ট্যাকসীতে। প্রশান্ত গলায় বলল, চলুন সাউথের দিকে। তার-পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সীটে গা এলিয়ে বসল। মদে আর ট্যাকসীতে পয়সা ওড়াতে সুকান্তর ভারী মায়া লাগে। কিন্তু এই আভিজাত্যটুকু না থাকলে বিয়ে-থা'র কথা কেন চিন্তা করা যায় না।

ট্যাকসীতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়-ছিল সুকান্ত। কেমন দেখতে-শুনতে মেয়েটা কে জানে! ছবিতে তো বেশ ভালই লেগেছে। পুরীর সমুদ্রের ধারে তোলা। হাওয়ায় আঁচল উড়ছে. লীলায়িত ভঙ্গীতে দাঁড়ান। বি-এ, বি-টি স্কুল টিচার। এর বেশী আর কি আশা করে সুকান্ত।... আশা-ভরসা...! ঠান্ডা ফেনায়িত বীয়ারে প্রথম চুমুক দেবার মত কৌতুকটা ঠোঁটের কোণে আর জিভের ডগায় অনুভব করল সুকান্ত। রেস-কোর্সের ধার দিয়ে ট্যাকসীটা ছুটে চলছিল। বেশ মিল আছে পুরোনো অনুভূতিটার সঙ্গে। মাদ্রাজ মেলের শ্লীপার কামরায় ওরা এগারজন। ছটি মেয়ে, পাঁচটি ছেলে। ইউনিভার্সিটি থেকে স্টাডি-টারে বেরিয়েছিল। অনেক রাত তখন। ঘুম আসছিল না। জানালায় মাথা রেখে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল সুকান্ত। হু-হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশের রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। সুকান্ত বুঝতে পারছিল একটু দূরে আধো-অন্ধকারে শোওয়া নন্দিতাও ঘুমোয় নি। নিউম্যাটিক বালিশটার কোণে মাথা রেখে অপলক চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে আছে। ভরসা পায় নি তন্বী শ্যামা...স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং নন্দিতা বোস। বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। পয়সা আছে ওদের। সুকান্তর বাড়ীর অবস্থা জানবার পর কিছু দিন আকলি-বিকলি করেছে। তারপর ছেড়ে চলে গেছে। ভালো বিয়ে হয়েছে কোন এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এখন সুখে ঘর-সংসার করছে।

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে বাঁ হাতটা সীটের উপর তুলে রাখার জন্য কাঁধটা টন-টন করছিল। ট্যাকসী একটা বাঁকুনী দিয়ে বাড়ীর রাস্তায় ঢুকতে সচকিতভাবে সুকান্ত সোজা হয়ে বসল। কাঁটায় কাঁটায় চারটে। এত নিখুঁত সময়জ্ঞান দেখে মালাটা আবার কি ভাববে কে জানে?

ট্যাকসী দাঁড় করিয়ে রেখে ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বাড়ী ঢুকল সুকান্ত। মালা অসময়ভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে। খুশী গলায় সুকান্ত তাড়া দিল, নে-নে জলদি কর। ট্যাকসী দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ঘরে ঢুকে ঘেমো শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলে আণ্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। সাদা প্যান্টের উপর হাল্কা স্ট্রাইপ দেওয়া নীল বুশ সার্ট আর হরিণের চামড়ার স্যাণ্ডালটা পরে গেলে কেমন হয়? বেশ কম বয়স মনে হবে। দাড়ি কামান আয়নায় মুখ দেখল সুকান্ত একবার। জুলফির কাছে অনেক চুলপেকে উঠেছে। নাঃ বড্ড বেশী চ্যাংড়া আর রোগা দেখাবে। ধুতি-পাঞ্জাবি? উঁহু বড্ড কেরানী কেরানী দেখায়। ঝিক্ক নিতে ভরসা পেল না সুকান্ত। তাড়াতাড়ি একটা ব্যবহৃত নেভীব্লু টেরিলিন প্যান্টের উপর ধোপদুরস্ত ফুলসার্ট চাপিয়ে পকেটে মনি-ব্যাগ গুঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেটটা সামান্য মোচড় দিচ্ছে। আরেক বার বাথরুমে যেতে পারলে ভালো হত। ওদিকে ট্যাকসী-ওয়ালা বাইরে অধৈর্য-হর্ন দিচ্ছে।

বাড়ী চিনে ওরা পৌঁছল প্রায় পাঁচটা নাগাদ। মেয়ের দিদির বাড়ী। কোনও রকম সজীবতার লক্ষণ চোখে পড়ল না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপার প্রথমটা এই রকমই হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ী, কিন্তু খুব সাজান-গোছান। হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করে দিদি ঘরে বসালেন। প্রথম দর্শনে সুকান্তকে এখনও মোটামুটি ভালই দেখায়। ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের চিহ্নগুলি সজাগ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই বয়সেই রগের কাছে জুলফি বরাবর অনেক চুল পেকে গেছে। গালের হনুর হাড় দুটো অস্বাভাবিক রকমের উঁচু হয়ে উঠেছে। কথা বলার সময় ঢলঢলে সার্টের কলার ডিঙিয়ে গলায় অ্যাডামস অ্যাপলটা বিশ্রীভাবে ওঠানামা করে। বেশ বোঝা যায়. ঐ ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ের আড়ালে একটি রস নিংড়ে বার করে নেওয়া শীর্ণ কোলকুঁজো মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করছে কোনও সঞ্জীবনী স্পর্শের জন্য। পাত্রীর দিদি সোজাসুজিই সুকান্তকে দেখলেন। মুখের উজ্জ্বল হাসিটা মিলিয়ে গেছে।

একটু পরেই ঘরের পর্দা সরিয়ে পাত্রী সহজ ও সপ্রতিভ ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকল এবং হাত তুলে নমস্কার করে স্মিত মুখে চেয়ারে বসল। নাম বলল, শ্রীমতী ব্যানার্জি. সুকান্তর বুকের ভিতর হৃৎ-পিণ্ডটা একবার ধ্বক করে উঠেই লাফালাফি আরম্ভ করে দিল। রীতিমত গৌরবর্ণ, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী একটি হাস্যোজ্জ্বল মেয়ে। সাতাশ আঠাশ বছর বয়েস। অথচ কোন জড়তা ও মালিন্যের চিহ্ন নেই।

সুকান্ত আড়চোখে দেখল মালার দাম্ভিক মুখও নরম হয়ে এসেছে।"

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর্ব শেষ হবার পর সামান্য জল-খাবার এল। শ্রীমতী ব্যানার্জি নিজেই উঠে গেল খাবার আনতে। সুকান্ত মুগ্ধ চোখে দেখল একটি শুভ্র রাজহংসীর লীলায়িত গতিভঙ্গী। অনেক দিন পর আবার উত্তর কলকাতার সেই বিয়ে বাড়ীর শানাই-এর করুণ অথচ মিষ্টি সুর সুকান্তর কানের কাছে বাজতে লাগল।

...পার্কস্ট্রীটের সন্ধ্যাটা মনে মনে কল্পনা করল সুকান্ত। ফুর ফুরে হাওয়া দিচ্ছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওর মেরুন রঙ-এর সিল্কের শাড়ী প্রায়ই খসে পড়ছে উন্নত সুডোল বুকের উপর থেকে। শ্যাম্পু-করা চুল উড়ে এসে পড়ছে কপালে বার বার। বিব্রত অথচ খুশীভাবে ও তাকাচ্ছে চারদিক। সামনের বড় রেস্টুরেন্টে ঢুকবে ওরা। একটু এগিয়েই দেখা হবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভারটাইজিং-এর কুশল গুপ্তর সঙ্গে। অ্যামেরিকান ঢং-এ চটকদার ইংরেজী বলে ও লেখে। মাইনে পায় নাকি দু হাজারের উপর। চেহারাটা অবশ্য চোখে পড়বার মত। সুকান্তকে বরাবরই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এসেছে কুশল গুপ্ত। এবার কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে, হ্যালো মিঃ সান্যাল, গুড ইভনিং, বলে হাসিমুখে দাঁড়াল। সুকান্তও সহাস্য মুখে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে দাঁড়াল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ওয়েল মিঃ গুপ্ত, মিট মাই ওয়াইফ—। গুপ্ত স্মিত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করবে। কিন্তু বুকের ভিতরটা হিংসায় জ্বলে যাবে। গুপ্তর স্ত্রীকে সুকান্ত দেখেছে আগে। বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু লম্বা, সিঁড়িঙ্গে অ্যানিমিক চেহারা। ঠিক সময় বুঝে সুকান্ত, ওকে সী ইউ, বলে এগিয়ে যাবে ওর কাঁধে হাত রেখে। সুকান্ত জানে গুপ্ত পিছন ফিরে তাকাবে। সুকান্ত তাচ্ছিল্য ভরে সিগারেটের শেষাংশ রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে ওর কোমরে হাত রেখে রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢুকবে দারোয়ানের সেলাম কুড়োতে কুড়োতে।...

কথাটা উঠল খাওয়া নিয়ে। মিষ্টি বেশী খেতে পারে না সুকান্ত। কয়েকটা দাঁতের এনামেল উঠে গেছে। মিষ্টি খেলেই ধরে। দিদির মুখভাব এবার বেশ গম্ভীর মনে হল। একটু প্রখর দৃষ্টিতে সুকান্তকে দেখে হাল্কা গলাতেই বললেন, খেতে পারেন না কেন? অম্বল আছে নাকি? সুকান্ত চোখ তুলে দেখল শ্রীমতী ব্যানার্জি কোচের চেয়ারে বসে আছে—নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত। মৃদু হেসে কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিল সুকান্ত। অল্প-বিস্তর অম্বল অ্যাসিডিয়াসিস নেই, কটা তার বয়সী বাঙ্গালী ছেলে আছে কলকাতায়। দিদি আবার কৌতূহলী অথচ দৃঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি খেতে পারেন না কেন, অম্বল আছে নাকি?

কি জবাব দেবে সুকান্ত? বহিরঙ্গেরীর জেনাস উৎকীর্ণভাবে অপেক্ষা করছে উত্তর শোনবার জন্য। নিজেকে থানায় ধরে নিয়ে আসা একটা ছিঁচকে চোর বা পকেটমারের মত মনে হতে লাগল সুকান্তর। ও'দের মত দিদির গলা দুটো জড়িয়ে ধরে বলবে নাকি, 'মাইরী বলছি দিদি, অম্বল-টম্বল কিছু নেই আমার। বেরিয়াম মীল করিয়েছিলাম, আলসার-ফালসার কিছু পায়নি ডাক্তার। সেই সকাল ন'টায় বাড়ী থেকে বেরোই, ফিরি রাত দশটার পর। এই রেস্টুরেন্ট-ফেস্ট-এ খাই। মাঝে-মধ্যে চোঁয়া ঢেকুর কি বুকগলা জ্বালা করে। আ—আমাকে আসলে মেরে দিয়েছে অ্যাম—এই পর্যন্ত মনে মনে বলেই তেমনিভাবে নিঃশব্দে জিভ কাটল সুকান্ত। এর উপর যদি শোনে আরও কদর্য পেটের রোগ আছে—।

নিজেকে সামলে নিয়ে সুকান্ত ইনটেলেকচুয়াল হবার চেষ্টা করল। পালিশকরা হাসির সঙ্গে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল দেখুন, ম্যান ইজ মরটাল। হু নোজ ফর হুম দি বেল টোলস্। অসুখ বা রোগ নেই এটা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে? এই তো দেখুন না কয়েকদিন আগেই আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক মারা গেলেন হঠাৎ। দিব্যি স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা। পরে শোনা গেল লীভার ক্যানসার হয়েছিল। এই পর্যন্ত বলে সুকান্ত একটু হেঁ-হেঁ করে হাসল। সামনে বসা গম্ভীর দিদি যেন একটু চমকে উঠলেন। স্ফীরিত ... সিগারেট খায় সুকান্ত, কালো কালো করে যাওয়া দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

এর পর আলাপটা আর বিশেষ জমল না। দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর সুকান্ত সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল, আজ চলি। মালা বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা আগেই আঁচ করেছিল। সেও নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে শ্রীমতী ব্যানার্জি হাত তুলে নমস্কার করল। ঠাণ্ডা নিরাসক্ত চাউনি। সুকান্তর নিরাশ্রয় দৃষ্টি মুগ্ধ হতে গিয়ে বিষণ্ণ হল। বিউটি অফ মেডুসা!

বাইরে জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তিরতির বৃষ্টি পড়ছে এখনও। সামনের দোতলা বাড়ীটার ছাদে তারের উপর মেলা একটা ভেজা রঙীন শাড়ীর উপর বসে একটা রুক্ষ রোঁওয়া ওঠা কাক মুখ ঘসছে আর থেকে থেকে কা-কা করে উঠছে। সুকান্ত একদৃষ্টে কাকটাকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে পাশে দাঁড়ান মালাকে বলল, চল ঐ সামনে বাস-স্টপ।

কলেজ স্ট্রীট ধরে, ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি বাসটা আসতেই সুকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর ভিড় ঠেলে, টাল-মাটাল করতে করতে এগিয়ে গিয়ে লেডিস্ সীটে বসা মালার হাতে টিকিটটা গুঁজে দিয়ে বলল, তুই বাড়ী চলে যা। আমার একটু কাজ আছে এদিকে। ফিরতে রাত হবে। তারপর ঝাঁকুনী দিয়ে বাসটা থামতেই টুপ করে নেমে ভিড়ের স্রোতে মিশে গেল।

সিগারেট ধরিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল সুকান্ত। এতক্ষণের এলোমেলো চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে অজস্র পাক খাচ্ছিল নরম মাটি খুঁড়ে ওঠা এক ভুঁই কেঁচোর মত। মাথাটা বিলকুল সাফ আর হাল্কা লাগছে এখন। মোড়ের পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল সুকান্ত। তারপর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ লোকের মতো আর-বোজা চোখে চারদিক এক নজর দেখে নিয়ে বাঁ দিকের মার্কা-মারা গলিতে ঢুকে গেল।

তখন অনেক রাত। ট্রামের ঘড় ঘড়, ডবল-ডেকার বাসের গর্জন স্তিমিত হয়ে আসতে আসতে থেমে গেছে। মাঝে মধ্যে একটা ট্যাকসী হুশ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা খালি রিকসা ঠং ঠং করে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ঠক্কাস ঠক্কাস ... খানা-খোন্দলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে মাতালের মত।

নিষিদ্ধ গলির তীব্র ঝাঁঝাল উত্তেজনাটা কেটে গেছে। একটা সুখকর অবসাদের আবেশ জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। স্খলিত পায়ে ঘুম ঘুম চোখে রাস্তা পার হল সুকান্ত। সামনে হাসপাতালের বড় গেটটা তখনও খোলা। কিছু বিকলাঙ্গ ভিখিরী আশ্রয় নিয়েছে ভিতরের শেডটার নিচে। ভিতরে ঢুকে প্রশান্ত মনে সুকান্ত দেখতে লাগল ইতস্ততঃ শোওয়া অন্ধ-আতুর মানুষকে। এ পাশে একটি বৃদ্ধ কুষ্ঠ রোগী ঘায়ের উপর থেকে ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে হাঁটু তুলে বসে হাত দিয়ে ভন-ভনে মাছি তাড়াচ্ছে আর হাক হাক করে থু-থু ছেটাচ্ছে চারদিক। আরেক পাশে একটা পাগলী টিনের ভাঙ্গা থালাটা মাথায় গুঁজে শোবার চেষ্টা করছে আর থালাটা বার বার পিছলে সরে যাচ্ছে দেখে আউ-আঁউ করে মুখ দিয়ে একটা বিজাতীয় শব্দ করে উঠছে। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গিয়ে ওদের মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে সুকান্ত টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

কপালের উপর হাত রেখে আধো-ঘুম আধো-জাগরণে আচ্ছন্ন অবস্থায় চিন্তা করতে চেষ্টা করছিল সুকান্ত। দেহের অস্তিত্বের অনুভূতিটা ঘুমের অতল সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে আবার ভেসে উঠছে হাল্কা শোলার মত। দিগন্ত বিশাবী সমুদ্র জল-কল্লোলের অস্ফুট গর্জনে কানের কাছে আছড়ে পড়ছে বার বার। সুকান্তর ইচ্ছা হল যেন সে ডুবে মরে যায় সেই অতলান্ত সমুদ্রে। মুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা। তারপরই ওর নিষ্প্রাণ দেহ রৌদ্র-

করোজ্জ্বল বিশাল জল-রাশির চঞ্চল ঢেউ-এর তালে তালে নাচতে নাচতে যুগ-যুগান্তর ধরে ভেসে বেড়াবে। সামুদ্রিক পাখীগুলি ওর চোখ দুটো ঠুকরে ঠুকরে খাবে। সূর্যের তীব্র তাপ বুক-পিঠ পোড়াতে থাকবে। মাছগুলো অন্ত্র-নালীর অংশ নিয়ে মহা ভোজের উল্লাসে মেতে উঠবে। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা নিচে ঝুঁকিয়ে টুপ্ করে সুকান্ত ডুবে যাবে নীল সমুদ্রের গভীর তল-দেশের বালুকাস্তীর্ণ বুকে জেগে-থাকা পাহাড় - পর্বত - কন্দরে শ্যাওলা আর অজস্র প্রাগৈতিহাসিক জলজ উদ্ভিদের মধ্যে। বরফের মতো ঠান্ডা নীল জলস্রোত টেনে নিয়ে যাবে ওর দেহ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। সেই লোনা-জলে তার দেহ থেকে মাংসের তন্তুগুলো ক্ষয়ে যেতে যেতে নরম রোঁওয়ার মত আস্তে আস্তে খসে পড়ে যাবে নিচে। সুকান্তর মেরুদন্ড, করোটি, পর্শুকা অবিশ্রান্ত জল-স্রোতে মেজে ঘসে ঝক্ ঝকে হয়ে উঠবে। তারপর এক সময় ঢেউ-এর ধাক্কায় একটি শ্বেত শুভ্র কঙ্কাল ভেসে উঠে কোনও বালুকাস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়বে নিঃস্প্রাণ দেহ শংখ বা ঝিনুকের মত। তারপর হয়তো কোনও বিমনা পথচারিণীর পায়ের চাপে সুকান্ত সান্যালের জীর্ণ কঙ্কাল গুঁড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত বালিতে রেণু রেণু হয়ে মিশে যাবে। এমনি এক বিষণ্ণ-মধুর অনুভূতির আশ্লেষে নিজেকে জড়াতে জড়াতে সুকান্ত এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

চল্লিশের দোরগোড়ায় এসে ॥

কায়সুল হক

কিশোর কালে
এক আশ্চর্য খেয়াল
আমার মাথায় বড়ো বেশি খেলা করতো:
সারা দুপুর বিকেল এমনকি সন্ধ্যা
আমি টো টো ক'রে ঘুরেছি শহর
বন্ধুদের নিয়ে বন্ধু খুঁজে চলেছি;
আমাদের হৈ হুল্লোড়ে
সারা শহরটা
আশ্চর্য উজ্জ্বল রোদ হয়ে যেত শীতের বিকেলে।
খুশির ধারায় স্নান সেরে
আমরা সকলে পবিত্র দেবশিশু হয়ে যেতাম।

আজ চল্লিশের কাছাকাছি এসে দেখছি
কিছু কিছু অদ্ভুত খেয়াল
এখনো মাথায় বাসা বাঁধে;
(হয়তো পুরনো সেই অভ্যাসের জের)
শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা
নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন,—
এইসবের জন্য
শব্দ শব্দই এখন তার পিছনে আমাকে ঘুরে বেড়ানোর
অবাধ লাইসেন্স দিয়ে ব'সে আছে।

জানি না কতটা শব্দ সচেতন হতে পেরেছি।
ভিতরের মানুষকে খুঁজে নিতে
আমার নিজের ভিতরের মানুষকে খুঁজে পেতে
অনেক অনেক সময়ের প্রয়োজন
মনে হচ্ছে, মানুষের ভিতরে মানুষ
এবং যথাযথ সব শব্দ
পেতে হলে
আমাকে কিশোর কালে ফিরে যেতে হবে
ফিরে পেতে হবে
সেই উদ্দাম দিনগুলোকে
এবং এই চল্লিশের পর আর যতদিন বাঁচবো
বন্ধু এবং মানুষ খুঁজে খুঁজে
অবিরাম পরিশ্রমে আমাকে কেবল ক্লান্ত হতে হবে,
আমার সময় একনিষ্ঠ সেবকের মতন একাগ্র
ঠিক ঠিক শব্দ বাছাইয়ের কাজে।।

তিনটি কবিতা ॥ [illegible]

তাই হোক

তোমাকে বুকে নিয়ে অগ্নিযুগ পার হয়ে এলাম:
এখন মৃত্যুকে ভয় কি?
মৃত্যু কি আগুনের চেয়েও শীতল?
তবে সেই শীতলতা এসেই আমাকে দীক্ষা দিক না [illegible]

কি চাই?

আমার পরমেশ্বরকে চাইছি না;
কিন্তু
তোমায় দিয়ে কি আমার সব চাহিদা পূরণ হবে?
তবে কেন তোমার চোখের পাড়ে পাড়ে আমি
জল সেঁচে করে ফিরছি?

শিল্প

মন কখনও তৈরী হয়?
কেমন করে তবে মূর্তি গড়তে বলছ?
কাদায় ছুরি পরা পায়ের যন্ত্রণায় তুমি
অস্থির উন্মাদ,
তারই প্রকাশ্য নিঃশ্বাস এই সৃষ্টি!

নির্জনতা ॥

অমল রাহা

পুরনো কবরের হাড়গোড়ে পা রেখে,
উঠে এসেছে একউঠোন নির্জনতা—
নির্জনতা কি শূন্য?
আমি তীব্র নির্জনতায় ভুগছি আজকাল [illegible]
লাটাই-ছেঁড়া ঘুড়ি
[illegible] মতো প্রাত্যহিক সংবাদ [illegible]
[illegible] থেকেও বেঁচে আছি কেমন মনে হয় না।

আমার জানালার কাছে জামরুল গাছে [illegible]
শিশির পতনের শব্দ শুনি—
নির্জনতা কি [illegible] শব্দে থেকে [illegible] পারে?
আমার পিতা, পিতামহরা ওই সব শব্দের স্ফটিকে
প্রতিমা গড়েছিলেন একদিন ঈশ্বরীর, মানবীর এবং
বিখ্যাত হয়েছিলেন মানবসমাজে:
আমার প্রতিভা ততদূর না হলেও ইদানীং
ওই সব শব্দ হাতে তুলে নিয়েছি
জামরুল গাছের শিশিরের নির্জনতার থেকে
কিন্তু কোন ঈশ্বরীর প্রতিমা গড়তে পারিনি মানবীর না
বরং ওই সব শব্দকে নিয়ে খেলতে খেলতে
ওই সব শব্দ দিয়ে ইস্পাতের ফলা বানিয়ে বানিয়ে
নিজেদের হত্যা করেছি...
এখন আমাদের কবরের হাড়গোড়ে পা রেখে
উঠে এসেছে একউঠোন নির্জনতা।

অঙ্গনা

সার্কাস শিল্পী

সার্কাস ম্যাজিক নয়। দর্শকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায় নেই। রিং-এর চারপাশে হাজার হাজার দর্শকের উৎসুক চোখের সামনে গুরুর কাছে শেখা বিদ্যার প্রমাণ দিতে হয়। দিনের পর দিন সুকঠোর সাধনায় এই বিদ্যা আমরা লাভ করি। ট্রাপিজ থেকে শুরু করে নানা খেলায় আমরা অংশগ্রহণ করি। সাইকেল চালনা, ব্যালান্সের খেলা, জীপ জাম্পিং এবং আরো কতোরকম খেলা। মোটামুটি-ভাবে সব খেলায় আমাদের ট্রেনিং নিতে হয়। তারপর যোগ্যতানুযায়ী এক একজনের উপর এক একটি খেলা দেখানোর দায়িত্ব পড়ে। তবে জন্তু-জানোয়ারের খেলায় আমাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। সে দায়িত্ব পালন করেন মুখ্যতঃ পুরুষ শিল্পীরা।

সার্কাস দলের সংস্পর্শে আমরা আসি খুব ছেলেবেলায়। আমরা প্রায় সবাই কেরালার মেয়ে। অন্য রাজ্যের মেয়েদের সার্কাসে কদাচিৎ দেখা যায়। এর পেছনে অনেকখানি অর্থনৈতিক কারণ আছে। কেরালার তেল্লিচেরীতে অধিকাংশ সার্কাস মালিকের বাস। সেখানকার অধিবাসীরা খুবই গরীব। ছেলেমেয়েকে মানুষ করার সঙ্গতি তাদের নেই। তাই তারা সার্কাস মালিকদের কাছে নিজের ছেলে-মেয়েদের খেলা শেখাতে দেন। আর আশা করেন, ভবিষ্যতে খেলা শিখে ছেলেমেয়ে তাদের অভাব মোচন করবে।

, আমার কথাই ধরুন না কেন। আমি সাত বছর বয়স থেকে সার্কাসে আছি। এখন বয়স উনিশ। সুদীর্ঘ বার বছর ধরে আমি কত না খেলায় অংশ নিয়েছি। নানা খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করেছি। এখন বেশ দুটি কঠিন খেলার দায়িত্ব আমার ওপর। জীপ জাম্পিং এবং একটি ব্যালান্সের খেলা। এই দুটি খেলা আমাদের সার্কাসের পক্ষে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। আর এতে ঝুঁকিও কম নয়। কোনদিন এক চুল এদিক সেদিক হলে যেমন জীপ জাম্পিং-এ জীবননাশের আশঙ্কা তেমনি ব্যালান্সের খেলায় সামান্য ত্রুটি হলে আমার সার্কাস-জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই এখনো আমাকে নিয়মিত ট্রেনিং নিতে হয় এবং অন্য সবাইকেও।

এই সার্কাসে আছি আমরা ১২০ জন মেয়ে। সবাইকে অবশ্য একসঙ্গে রোজ খেলায় অংশ নিতে হয় না। ঘুরে-ফিরে সকলের ডাক আসে। তবে তৈরি থাকতে হয়। একজন যদি কোন কারণে খেলা দেখাতে না পারে তবে আর একজনকে এগিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নির্ভরতার ভিত্তিতেই আমাদের শিল্পীজীবন গড়ে ওঠে। সার্কাসে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। আর শিক্ষার কোন ত্রুটি থাকারও কথা নয়। যে বয়সে সবাই

বইপত্তর বগলদাবা করে স্কুলে ছোটে তখন থেকেই আমরা সার্কাসে জীবিকার্জনের [illegible] লেগে যাই। তাই শিল্পীজীবনের পাঠক্রমে আমাদের খুব একটা ভুল হয় না।

তবে আমাদের লেখাপড়া শেখা তেমন হয় না। আমরা খেলা শিখি, লিখতে পড়তে জানি না অনেকেই। সার্কাসে তার সুযোগও নেই। খেলাই এখানে সব। আমরাও তাই মনে করি। ভাল করে যদি খেলা শিখতে পারি তবে আর কোন কিছু দরকার নেই। আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যাঁরা নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কথা বলতে পারে না। এজন্য অবশ্য আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। কোন জায়গায় তাঁবু পড়লে আমরা সহসা বাইরে যেতে পারি না মূলতঃ এজন্যই। তারপর রাস্তাঘাট না চিনতে পারার অসুবিধা তো আছেই। ফলে দেশের সর্বত্র খেলা দেখিয়ে বেড়ালেও দেশ দেখার সুযোগ আমাদের তেমন ঘটে না। তাঁবুতে তাঁবুতেই প্রায় সারাজীবন কেটে যায়। বেড়ানোর সুযোগ পাই কখনো সখনো। হয়তো একদিন দর্শনীয় স্থান ঘুরতে একসঙ্গে কয়েকজন দল বেঁধে যাই। সঙ্গে গাইড থাকে। আমাদের সার্কাসেরই। এমনিভাবে আমরা সিনেমাও দেখি।

অশোকবনে বন্দিনী সীতার কথা শুনেছিলাম। আর আমরাও প্রায় সার্কাসের তাঁবুতে একরকম বন্দিনী। তবে আমাদের কর্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে খুব সজাগ। তাই আমাদের প্রায়ই সুযোগ করে দেন। এবার কলকাতা এসে বেশ কয়েক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। সিনেমাও দেখেছি দু'একটি। কলকাতায় প্রথম এসেই আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা বারবার এই শহরে খেলা দেখাতে আসতে চাই।

হ্যাঁ, আমাদের এই সার্কাসের খ্যাতি এখন ভারতজোড়া। এজন্য আমাদের এবং আর সব শিল্পীর কৌশল যতখানি প্রশংসনীয় তার চেয়েও বেশি প্রশংসার দাবি রাখে রামু হাতী। 'হাতী মেরে সাথী' ছবিতে অভিনয় রামুর জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই ছবিতে রামু প্রায় আড়াই বছর ধরে কাজ করে। কাজ শেষে রামু যখন আবার ফিরে আসে তখন সে প্রায় চারদিন উপোস করেছিল। প্রিয় নায়কের কাছ থেকে বিচ্ছেদই এর কারণ। তারপর অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাকে আবার খাওয়ানো হয়। এখনও কয়েকটি ছবিতে সে অভিনয় করছে। রামুর গণেশপুজো আমাদের সার্কাসের বিরাট সম্পদ। আমার তো মনে হয় তার ক্রীড়া-কৌশলের কাছে আমরা ম্লান হয়ে যাচ্ছি। একথা ভেবে আমরা খুব আনন্দ পাই। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জেদ চেপে যায় আরো ভাল করে খেলা দেখানোর। আমাদের বাঘ-সিংহরাও খেলায় খুব পটু।

একটা কথা শুনলে সবাই অবাক হয়ে যাবেন যে, আমাদের সার্কাসের ৪৫টি বাঘ এবং ৩৫টি সিংহের জন্ম এখানেই। আমরা যেমন ছেলেবেলা থেকে এখানে আছি তেমনি ওরাও জন্ম থেকেই এখানে আছে। তাই আমাদের সম্পর্ক প্রায় আত্ম-পরিজনের মতো।

সামাজিক জীবন থেকে আমরা যেমন নির্বাসিত তেমনি বাড়িঘরের সঙ্গে আমাদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে ছুটিছাটা পেলে বাড়ি যাই। তখনই মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয়। এছাড়া আর কোন যোগাযোগ থাকে না। মা-বাবা অবশ্য প্রতি মাসে টাকা পান। আমার মাইনের টাকার একটা অংশ প্রতি মাসে সার্কাস কর্তৃপক্ষই ও'দের কাছে পাঠিয়ে দেন। এমনিভাবে ঘরবাড়ির কথা আমরা প্রায় ভুলেই যাই। সার্কাসের তাঁবুই আমাদের স্বাভাবিক জীবন। আমাদের অনেকে বিয়ে-থা করে এখানেই ঘর-সংসার পেতেছেন। বিয়ে করেছেন শিল্পীদের কাউকে। ছেলেপুলেও হয়েছে। তবে দু'তিনটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে কাউকে আর খেলা দেখাতে দেওয়া হয় না। তখন তিনি সার্কাসেই অন্য কাজে নিযুক্ত হন।

চাকরি আমাদের বড়ো একটা কারো যায় না। অন্ততঃ আমার তো সেরকম কোন ঘটনা মনে পড়ে না। মাইনেও আমাদের খুব একটা খারাপ নয়। সেই যখন প্রথম খেলা শিখতে আসি তখনই সার্কাস কর্তৃপক্ষ একটা মাসোহারা দিতেন। অবশ্য মা-বাবাকে। তারপর খেলা শিখে মাইনে পাচ্ছি। হাতে খুব কম টাকা পাই। কারণ খরচ করার কোন সুযোগ নেই। মাইনের একটা অংশ মা-বাবা পান আর বাদবাকি টাকা জমা থাকে। প্রয়োজন মতো সবকিছু আমরা পাই। জামাকাপড়, ঘড়ি, গয়না সব। এছাড়া বোনাস পাই। গ্র্যাচুইটি আছে। ছুটির কথা তো আগেই বলেছি। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা যে, চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। আর এই চাকরি চলে গেলে আমাদের বাঁচার পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা সবাই প্রায় এক জায়গার মেয়ে। শুধু একটি চীনা পরিবার আমাদের মধ্যে আছেন। এ'রা খেলা দেখান আমাদের সঙ্গেই। আমাদের তাঁবুতে অনেক নতুন মেয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে। এমনি হয় সব সার্কাস তাঁবুতেই। আমি যে বয়সে এসেছিলাম তার চেয়েও কম বয়সের মেয়েও আছে। সবাই খেলা শিখেছে। তেলিচেরীতেও খেলা শেখার একটা স্কুল অবশ্য আছে তবে সার্কাস দলই খেলা শেখার পক্ষে ভাল। সার্কাসই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু।

হ্যাঁ গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস সারা দেশেরই গৌরব। আমি এ দলের শিল্পী বলেই একথা বলছি না। ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনে আমাদের শিল্পীদের দক্ষতা সবিশেষ প্রশংসনীয়। রুশ দলও প্রশংসা করেছেন। আমাদের [illegible] ট্রেনার প্রতি মুহূর্তে নতুন ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের চিন্তায় মগ্ন। তাঁরা শুধু ভাবেন, দর্শকদের কিভাবে আরো বেশি আনন্দ দান করা যায়। তাঁদের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা কসরত আমরা দেখাই। আমাদের সাফল্যের জন্য আমরা শিক্ষাগুরুর কাছে যেমন কৃতজ্ঞ তেমনি ভগবানের অপার করুণাপাশেও আবদ্ধ। ভগবদ্-কৃপা ছাড়া আমাদের এই সাফল্য কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। শিবরাত্রির দিনে আমরা সব মেয়েরা ভগবান শিবের আরাধনা করি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে। পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেদিন আমরা রিং-এ খেলা দেখাতেও আসি না। এই দিনটি আমাদের প্রকৃত উৎসবের দিন। সকলের সব উৎসবে আমরা আনন্দের জোগান দিই খেলা দেখিয়ে, কিন্তু আমাদের উৎসব শুধু পালন করি আমরাই। নিভৃতে। মাত্র ১২০ জনের কলহাস্য মুখরিত পরিবেশে। কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সুনীতি। 'গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাসের' অন্যতম সেরা শিল্পী খেলা দেখাতে এক্ষুণি তিনি রিং-এ যাবেন। আর ক্রীড়া প্রদর্শনান্তে অজস্র দর্শকের হাত-তালিতে অভিনন্দিত হবেন। কিন্তু এই আনন্দের পাশাপাশি তাঁর বেদনা যে জীবনে তিনি আর কোনদিন ফিরে যাবেন না। সেই জীবন যা আর পাঁচজন মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। সার্কাসের উজ্জ্বল আলোয় তাই তাঁকে অতিরিক্ত হাসিখুশি মনে হলো। হারানোর বেদনা ভুলে বর্তমানের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে চান সুনীতি। তাই কথায় কথায় তিনি হাসেন আর হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে।

—প্রমীলা

উল্লেখযোগ্য খবর

শহীদ ভগৎ সিং-এর বৃদ্ধা জননী ৮৫ বয়স্কা শ্রীমতী বিদ্যাবতী 'পাঞ্জাব মাতা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী গিয়ানী জৈল সিং তাঁকে এই উপাধি প্রধান করেন। তাঁকে একটি মোটর গাড়ি উপহার দেওয়া হয় এবং মাসিক হাজার টাকা পেনসন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে শহীদ ভগৎ সিং-এর কয়েকজন সহকর্মীও উপস্থিত ছিলেন।

* * *

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা [illegible] এক [illegible]

এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়লে সংসারে গৃহিণীদের উপর প্রথম আঘাত আসে। তাই তিনি তাঁদের পরামর্শ দেন, তাঁরা যেন প্রতিটি রাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখেন এবং জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ছে আর সরকারী তরফে সে ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা জনগণকে, বিশেষ মহিলাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রয়োজনবোধে তাঁরা এসম্পর্কে বিতর্ক সভার আয়োজনও করতে পারেন।

* * *

প্রথম মহিলা নভশ্চর শ্রীমতী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা মহাকাশ পরিভ্রমণ করেন ১৯৬৩ সালে। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। মহাকাশ পরিক্রমায় মহিলাদের সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তবে আমেরিকা যে এব্যাপারে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছে সম্প্রতি তা জানা গেছে। শিগগিরই কোন মার্কিন রমণীকে আমরা মহাকাশে দেখতে পাবো। এবছরের গোড়ার দিকে আমেরিকা মহাকাশে সর্বপ্রথম স্টেশন বসানোর চেষ্টা করবে। আর এ দশকের শেষাশেষি ১২ জন অভিযাত্রী-সহ আর একটি স্টেশন বসানো হবে মহাকাশে এবং এই অভিযানে মহিলাদেরও স্থান হবে। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং সন্তানধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালিত হবে।

যাঁদের কথা কেউ জানে না

সেদিন হাঁটিতে হাঁটিতে রাজভবনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাসে উঠতে হবে। অফিসপাড়ার সময়টা বেশি সুবিধের নয়, অন্ততঃ ট্রামে বাসে ওঠার পক্ষে।

৫টা বাজে। অফিস কর্মচারীদের ভিড়ে বাস স্টপে রাস্তা বেশ ভরে উঠেছে।

শীতকাল। সুতরাং সূর্যদেবেরও ছুটি হয়ে গেছে। আর অন্ধকার নামতেও বেশি দেরী নেই।

একটার পর একটা বাস আনাজপত্তরের মতো লোকে ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছে। কোনটা দয়াবশত থামছে আবার কোন কোনটা থামার লক্ষণই প্রকাশ করছে না।

আমিও দাঁড়িয়ে আছি তীর্থের কাকের মত বাস ধরার তাগিদে। একটি বছর আঠারো উনিশের মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল—জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা শ্যামবাজারে কত নম্বর বাস যাবে বলতে পারেন?

বলে দিলাম। কিছুক্ষণ বাদেই মেয়েটি আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা এখান থেকে বরাহনগরে কোন বাস যায় না?

—হ্যাঁ। বলবে তো। একটু আগেই ৩নং বাসটা চলে গেল। ওটাই তো বরাহনগর যাবে। মেয়েটির মুখটা করুণ হয়ে উঠল। একটু থেমে বলল—কোনদিন বেরোয়নি তো, রাস্তাঘাট একদম চিনি না।

এবার ভালো করে মেয়েটিকে দেখলাম। চেহারাটা যথেষ্ট ভদ্রঘরের। বুদ্ধিরও যথেষ্ট ছাপ আছে। তবে বোঝা যায় একটা অসহায়ের ভাব চোখেমুখে।

কি জানি কৌতূহল পেয়ে বসল আমায়। প্রশ্ন করলাম,—কি কর? এখানে কেন এসেছো?

—কিছু করি না। এত চেষ্টা করছি, কোথাও একটা চাকরী পাচ্ছি না। তাই এখানে রিজিওন্যাল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে এসেছিলাম।

মনে মনে ভাবলাম, হায় এখনো ও জানে না এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সত্যিকারের চাকরি খুব বেশি জোটে না। শুধু বেকারদের নাম ভরানোই এখানকার আপাততম প্রধান কাজ।

—কত অবধি পড়াশুনো করেছো?

—হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছি। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তিও হয়েছিলাম। তবে আর পড়াশুনো হবে না।

—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—একটা ছোট ভাই। বয়স ন' বছর। ওকে নিয়েই তো ভাবনা। সব সময় কান্নাকাটি করে।

—বাবা নেই?

—বাবা দেড় বছর নিরুদ্দেশ। মা পাগল।

বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পরই মা পাগল হয়ে যান। তারপর মামারা নিয়ে চলে যায় মাকে। কোথায় আছেন তাও জানি না।

—তা তোমাদের কোন খোঁজখবর নেন না তাঁরা?

এবার একটু বিষন্ন হাসি ফুটিয়ে তুলল মেয়েটি ঠোঁটের কোণে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন আমাদের বাড়ীর এমনি অবস্থা ছিল না। দুবেলা খাওয়ার অভাব অন্তত ছিল না। সবাই আসতো তখন। দাদা কাজ করতো একটা ফ্যাকটরীতে। ফ্যাকটরী হোল লক-আউট। আর তারই ফলে আমাদের এই অবস্থা। দুদিন বাদে দাদাও কোথায় চলে গেল জানি না।'

আমি নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম ওদের হতভাগ্য জীবনের কথা।

ইতিমধ্যে বাস এসে গেল।

বাসে যেতে যেতে চোখের ওপর ভেসে উঠলো অসহায় দুটি চোখ। অনুভব করতে পারছিলাম ওর অবস্থা। কিন্তু প্রশ্ন হোল এদের কথা ভাববে কে?

ও তো অল্পশিক্ষিত। সুতরাং ওদের কথা পরে। আগে শিক্ষিতদের কথাই ভাবো। একথা বলবেন অনেকে। অথচ শিক্ষিত আর অল্পশিক্ষিত—ক্ষুধা সকলেরই সমান। আহারের সংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদেরই প্রয়োজন তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী। কিন্তু পাচ্ছে কই?

কত অসংখ্য পরিবার আজ এ-সংকটের মধ্যে। যে পরিবারের দায়িত্ব আজ একটি শিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত মেয়ের উপর তাদের যদি কোন কর্মসংস্থান না হয়, তবে তারা বাঁচবে কি করে?

যে পরিবারের পিতা অবসরপ্রাপ্ত তাঁর শিক্ষিত কন্যাটি যদি একটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি না পায়, তবে সে-পরিবারের উপায় কি হতে পারে।

কিংবা যদি ঐ অসহায় মেয়েটির মত যার কেউ নেই, আছে শুধু বাঁচবার অধিকার, সে বাঁচবে কাদের ভরসায়? এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারবে না। অথচ এ দুর্মূল্যের বাজারে কারো কারো চাকরি হচ্ছে। তার জন্য চাই লোকের জোর। এ তো মামুলি কথা।

ব্যক্তিগত ভাবে চাকরির প্রয়োজন প্রত্যেক মেয়েরই, একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু যখন দেখি প্রকৃত অর্থবান বাড়ীর মেয়েরা চাকরী করে আর সে চাকরীর পয়সা ফ্যাশানের খাতে কিংবা বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে, তখন প্রকৃত অভাবগ্রস্তদের কথা ভাবলে শিহরণ হয়।

তাই ভাবছিলাম, এরকম প্রকৃত দুঃস্থ পরিবারের চাকুরির উপযোগী মেয়েদের কথা কে ভাববে? যাঁরা ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকটে একটু বাঁচবার জন্য একটি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শিকার হচ্ছেন মানসিক যন্ত্রণার, তাঁরা সত্যি সত্যিই কি আলো দেখতে পাবেন না? আর না পেলে হয়তো একদিন তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বাধ্য হবেন তাঁরা উপার্জনের চোরাগোপ্তা পথ ধরতে। এছাড়া উপায়ই বা কি তাঁদের? বাঁচবার অধিকার তো সকলেরই আছে। বাঁচতে সকলেই চায়।

অথচ সুদূরপ্রসারী ঐ অন্ধকার পরিণতির কথা ভাবলেই সবচেয়ে ভয় হয়। এভাবে যদি অধিক সংখ্যক মেয়েরা অবক্ষয়ের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে সে-সমাজের পরিণতি হবে ভয়ংকর। মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি জন্ম দেবে অসুস্থ অস্বাভাবিক অসহায় সমাজ-জীবনের, যার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করা হবে অসম্ভব। তাই এ-ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, যে-যুগে মেয়েদের শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে বেরোতে হয়, পরিবারের ভরণপোষণের সরাসরি দায়িত্ব নিতে হয়, সে-যুগে মেয়েদের প্রতি অনেক নজর দেওয়া দরকার।

[illegible] সেনগুপ্ত

ফ্যাসান স্থায়ী নয়

ট্রামে-বাসে, ট্রেনে চলতে ফিরতে বিচিত্র সব কথা আমাদের কানে আসে। রাজনীতি, কালোবাজার, বাজারদর, খেলা-ধুলা সেরে যখন পোষাক-আসাকের আলোচনায় সকলে মত্ত হয়ে ওঠেন তখন আর তা সহজে বন্ধ হতে চায় না। এ আলোচনার বোধহয় অন্যরকম মাদকতা আছে যার কাছে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিও পিছু হটে যায়। আলোচনার লক্ষ্য হয়তো উপস্থিত কোন মেয়ে বা ছেলে, ক্রমশঃ সেটা মহামারির মত কোথায় কবে, কখন কাকে কে কি ভাবে, কি সাজে দেখেছেন তার বিশ্লেষণ চলে। মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু লাগে আবার সবদিক দেখেশুনে অনেক কিছুই মুখ বুজে হজম করতে হয়।

এমনি একদিন ট্রেনের কামরায় বর্তমান পোষাকের হালচালের খোশ গল্পের মাঝে নীরব শ্রোতা হিসেবে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। অবশ্য পোষাকের রং-চং-এ তাদের মত কাঁদুনী সুর আমার গলা দিয়ে বেরবে না কারণ পোষাক নানা ধরনের ফ্যাসানের আমদানী করে অথচ কোন ফ্যাসানই দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই আজকের অর্জিত পোষাক কালকেই হয়তো অন্য রূপে দেখা দেবে। সেটা একদিকে যেমন হবে রুচির বাহক, তেমনি শোভনতার পূর্ণ রূপ।

মুখ পালটাতে মানুষ চিরকাল ভালবাসে। একঘেয়ে খাবারে কারও রুচি থাকে না। তেমনি ফ্যাসান বদলাতে সকলেই সমান আগ্রহী। অনেকে স্টাইল ও ফ্যাসানকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। স্টাইল হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিরুচির ফল। তাই আমরা কথায় বলি ওর কথা বলার স্টাইল অপূর্ব, অপূর্ব ওর হাঁটার স্টাইল। সুতরাং ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা রুচির ওপর স্টাইল নির্ভরশীল। কিন্তু ফ্যাসান হচ্ছে প্রচলিত পোষাকের ছাটকাট। সুতরাং স্টাইল আর ফ্যাসানের মধ্যে রয়েছে একটা ফারাক। প্রচলিত ছাটকাটের পাল্লা দিতেই ফ্যাসানের জন্ম, আবার ফ্যাসানই পাল্টে দিচ্ছে প্রচলিত ছাটকাটকে। অতি কোন ফ্যাসানের আয়ুই স্বল্প। এই স্বল্পায়ুকে নিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। নতুন কি চলতে পারে বা চালালে বাজারে চালু হয় এই চিন্তায় একদল অস্থির। যেমন ধরুন আজকাল আমরা সবাই বলি 'ঠিক আছে জামাটাতে মাপের চেয়ে কাপড় কম হয়েছে ওতে একটু অন্য কাপড় জুড়ে দাও। তোমার জামাটাও সম্পূর্ণ হবে আবার ফ্যাসানে ফ্যাসান হবে।' অথচ আজ থেকে বছর কয়েক আগে জোড়া-তালির জামা তৈরীর কথা ভাবলে আতঙ্ক হতো। তখন সেটা ফ্যাসান না হয়ে কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো ঠেকতো। উপরন্তু হীনতার প্রকাশ হিসেবেও লোকে ভাবতো।

আসলে যুগটা ফ্যাসানের। জোড়াতালি হোক আর যাইহোক নতুন জিনিষই বাজারে ফ্যাসানের আমদানী করে।

সেই ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম কান ঢেকে চুল আঁচড়ানোর। এক মেমসাহেবের যে কোন কারণেই হোক একটা কান কাটা গিয়েছিল। অথচ সেই মেমসাহেবকে বড় একটা পার্টিতে নাচতে হবে। কান কাটা মেমসাহেব কান নিয়ে মহা চিন্তায় পড়লো। আহার-নিদ্রা সব বন্ধ হবার উপক্রম। অনেক ভেবেচিন্তে সে এক উপায় বের করল। পরদিন কান ঢেকে চুল আঁচড়ে বাজার মাত করলো। চালু হল কান ঢেকে চুল আঁচড়াবার প্রথা। রাতারাতি মোটামুটি সবই কান ঢেকে চুল আঁচড়ে নতুন ফ্যাসান হিসেবে সেটা চালু করলো।

একদল সমাজসেবী গেল গেল রবে মাঝে মাঝেই আঁতকে ওঠেন। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের সাজগোজই তাঁদের আতঙ্কের প্রধান কারণ। আতঙ্ক তো আছে নিশ্চয়ই। ফ্যাসান হবে সুরুচি অনুযায়ী, পোষাক হবে শ্রী আর সৌন্দর্যের সহায়ক। তাই যদি না হয়ে ফ্যাসানটাই অশোভন রুচির পরিচয় দেয় তখন অনেকেই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবেন। ভাববেন, দেশের কি হাল হল। এটা প্রকৃতই কলিকাল, ঘোর কলি। আক্ষেপে মাথার চুল ছিড়তে চাইবেন, কিন্তু সেই ফ্যাসানকে রুখবে কার সাধ্যি। যা উঠেছে তা অন্ততঃ কিছুদিন চলা চাই। একসময় হাত-কাটা, পেট-কাটা ব্লাউজে ভারতবর্ষে প্রধান প্রধান শহরগুলো ছেয়ে গেল। প্রধান শহর ছাড়া আধা শহর বা গ্রামেও তার জের চললো কিছুদিন। পোষাক পরা হল সত্যি, কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণের বন্দোবস্ত [illegible] হয়েছিল। অনেকে তো লজ্জার [illegible] দিকে চাইতেই পারতেন না। তারপর [illegible] গেল হাত-কাটা জামা কোথায় গেল পেট-কাটা রইল সামালা—সেখানে এলো ফতুয়া, দিদিমাদের আমলের লম্বা ঝুলের থ্রি কোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ। শুভাকাঙ্ক্ষীরা তখন আশ্বস্ত হলেন, দেশ বোধহয় এবার অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা পেল।

কিন্তু সে স্বল্পমেয়াদী [illegible] বেশীদিন টিকলো না। চালু হল মিনি স্কার্ট। অবশ্য মিনি স্কার্টের চলন তত ব্যাপক হয় নি। মিনি স্কার্টের [illegible] জনসাধারণ থেকে শুরু করে পত্র-পত্রিকায় ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলেছিল, সত্যিই [illegible] মুখরোচক আলোচনার বিষয়। [illegible] অশোভন নয় বিকৃত রুচির পরিচায়ক [illegible] সবাইকে ভাবিয়ে তোলে [illegible]। কিন্তু সেই মিনি স্কার্টই বা [illegible] কতদিন? না টেকাই স্বাভাবিক—[illegible] রূপবদল তো অত্যাবশ্যক। সেই [illegible] মিনি স্কার্টও প্রায় [illegible] অপসারিত হল।

এল লুঙ্গির যুগ। [illegible] মানান বেমানানের চিন্তা [illegible] লুঙ্গি ধারণ করলো। [illegible] সবরকম পোষাক মানিয়ে [illegible], কিন্তু [illegible] ক্ষেত্রে ভাবনা-চিন্তার অনেক [illegible]। বড়দের ব্যবহারের জন্য [illegible] পোষাক শাড়ীর কাছে আর [illegible] ঘেঁষতে পারে না।

ভাল-মন্দ সব মিলিয়েই [illegible] ফ্যাসান। মন্দের পাশাপাশি সুন্দর, [illegible] পোষাকের চলন আমরা প্রায়শই দেখি। সুতরাং 'ত্রাহি', 'ত্রাহি' ডাক ছাড়ার [illegible] কিছু নেই। কোন জিনিষ দীর্ঘস্থায়ী নয় ফ্যাসানের ক্ষেত্রে। মিনি স্কার্ট, হাত-কাটা, পেট-কাটা সব ছাপিয়ে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলের ম্যাক্সিই এখন আধুনিক ফ্যাসানের বাজার সরগরম করে রেখেছে। খারাপ ফ্যাসানের সমালোচনা হোক [illegible] নেই, কিন্তু ট্রামে, বাসে, ট্রেনে [illegible] সমালোচনার ভাষাটা রুক্ষ না [illegible] বাঞ্ছনীয়।
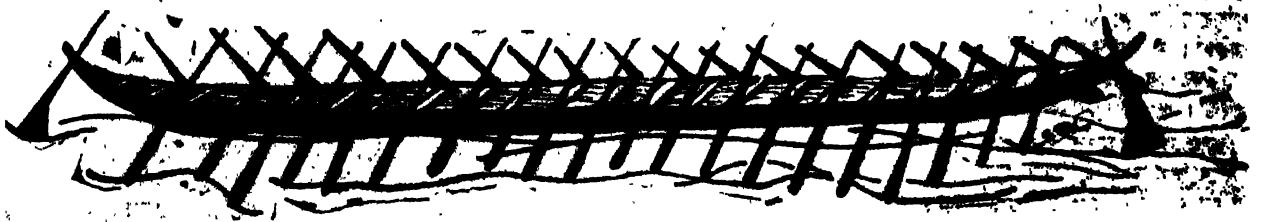
—[illegible]

যাত্রা দলের খোলা বদল

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

বছর দু-তিন আগের কথা। গ্রাম ছোট-নীলাদ্রির বনবাদাড় বুলডোজার আর ল্যান্ডমোয়ার চালিয়ে শিল্পনগরীর কর্তা-ব্যক্তিরা নিউ টাউনের পত্তন করেছেন। ভোরবেলা এমন জায়গায় এসে কে না মাঠে ঘাটে ঘুরতে চায়! বিশেষতঃ চাকরীর ধান্দা যার নেই—কটা দিনের ছুটীর অবকাশকে আনন্দময় করাই যার হাতের স্বর্গ। এমনি এক ভোরবেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে টাউনশিপের শেষ প্রান্তে গ্রামদিকে ফেলে যেখানে বাঁ-দিকে 'পুজোমণ্ডপ' সেখানে একটি বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আশপাশে জনা-কয়েক পুরুষ আর মহিলা। প্রথমে অবাক হলেও, মনে পড়ল এটি সেই বহু-আলো-চিত যাত্রাদল। তারপর ক'দিন এই দলের জনকয়েক থেকে শুরু করে অভিনয়—সব কিছুই দেখতে হয়েছে। ছোট টাউন, তদু-পরি সামনে থেকেই। সকালেই দেখা গেল নকল জরি বসানো পোশাকগুলি মাঠের রোদে শুকোচ্ছে। চলতে চলতে কানে গেল —"দাদা, আপনি বাজারে যাচ্ছেন, বিন্দু-দির জন্যে দুশো গ্রাম মাংস আনতে হবে—ভুলে যাবেন না, তা'লে আমায় ছিঁড়ে খাবে কিন্তু!" বিকেলে ওদের দলের বাবড়ি-চুলো বেঁটেখাটো একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। বিড়ি-সিগ্রেট, না, ওসব ছুঁলে তার হাড় গুঁড়ো করে দেবে 'মাস্টারকাকা!' তার কাছে পাকা খবর পাওয়া গেল সব ফিমেল! না, না, অত কিছুর জোগাড়। বড় বড় পার্ট অবিশ্যি মেয়েরা করে। ছোটখাটোর বেলায় আমরা আছি।' আবার রাত্তিরে যাত্রার আসর আলোয় আলোয় জমজমাট। মাঝখানে অভিনয় মঞ্চ। বেশ খানিকটা উঁচু জায়গায় স্টেজের মতো করা হয়েছে, ওপরে ঝুলছে ছোট ছোট মাইকের মাউথপীস। চাঁদ সওদাগরের ভূমিকা দীর্ঘ ওজস্বিনী বক্তৃতার পালা। অভিনয় করতে করতে বক্তৃতার দু-হাত দিয়ে 'আলোর পোকা' তাড়াচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যেই কয়েকটি পাজি পোকা তাঁর গলায় চলে গেল। 'থু-থু' করেও গলা পরিষ্কার হল না।... মোটামুটি অভিনয় ভালোই করেন কিন্তু এই বিপত্তির ফলে গুরুগম্ভীর পরিবেশ অকস্মাৎ হাস্যরোল তুলে কৌতুকময় দৃশ্যের অবতারণা করল। অবশ্য ব্যাপারটা নেহাতই সাময়িক। যাত্রার বাঁধা থাকার কথা সবই ছিল—যতদূর মনে পড়ে ছিল না কেবল 'নিয়তি'।

আজকের দিনের যাত্রাপার্টির সঙ্গে আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের যোগ-সূত্র সে আমলের মত নিকট হয় না। তারা বাইরের মানুষ, নিজেদের কাজ করে আবার অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু আগে তা ছিল না। বাংলাদেশে যন্ত্রযুগের সূচনার আগে, মোটামুটি এই শতকের গোড়ার দিকে কবি, তরজা যাত্রাকে ঘিরে জনজীবনের বিশেষ একটি মধুর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। আর তা সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র উল্লেখ করা চলে। অপু, শুধু অপু কেন নিশ্চিন্দি-পুরের ছেলে-বুড়ো সকলেরই মন চড়ক-তলায়—নীলমণি হাজরার যাত্রাদলকে কেন্দ্র করে আলোচনা, উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত ছিল না।...কুমারপাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ি তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাকস বোঝাই গাড়ি এক, দুই, তিন, চার পাঁচখানা!... সাজের গাড়ীগুলোর পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতো হাতে। পটু একজনকে দেখাইয়া কহিল—এ বোধহয় রাজা সাজে, না অপুদা?

'আকাশের রং একেবারে বদলাইয়া গেল।...' '...প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলোসজ্জিত আসরে রাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক ত বাকী নাই! বাবা কেন এখনো...?...'

সেনাপতি বিচিত্রকেতুকে আসরের বাইরে সাজ-পোশাক পরে বার্ডসাই টানতে দেখে অপু খুব অবাক হয়েছিল। তারপর যখন রাজকুমার অজয় এসে 'কিশোরীদা' বলে বিচিত্রকেতুর কাছে বিড়ি চাইল তখন বালক অপুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। অজয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করা, তারপর নিজেদের বাড়িতে ঢোলক-ওয়ালার বদলে অজয়ের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা—এ সবই তাৎকালিক সমাজচিত্রের অংশ। তখন গাঁয়ে যাত্রাদল এলে গরীব-বড়লোক নির্বিশেষে এক-এক বাড়িতে পালা করে দলের লোকেদের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত হত।

১৮৭২-এ ন্যাশানাল থিয়েটারের পত্তন হলেও তখনও বাংলাদেশে শহুরে হাওয়া ওঠেনি। লোকের কাছে কীর্তন, যাত্রা বা গীতিনাট্য, কবির লড়াই, তর্জা, খাইখেংড় এইসবই ছিল সামাজিক মানস-রসোপভোগের কেন্দ্র।

আমাদের ছেলেবেলায় অর্থাৎ ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে শহর বাজার বহরমপুরের কথাই বলি, ঘাটবন্দরে শশীবাবুর বিরাট বাড়ির বাঁধানো উঠোনে রাসের সময়ে যাত্রার আসরে চাদর মুড়ি দিয়ে যাত্রা দেখার নেশার জন্যে দাদার কাছে বেদম প্রহার জুটেছে। কিন্তু পুজোর সময়ে উমেশবাবুর প্রাঙ্গণে স্টেজ-বাঁধা হত—সেখানে ইংরেজী লেখা-অ্যামেচার থিয়েটার দেখতে গেলে তেমন অপরাধ হত না। অবশ্য কোনো সুযোগই ফস্কাতে দিতাম না। যাত্রার আসরের লম্বা লম্বা বক্তৃতা, তলোয়ার, গদা নিয়ে লড়াই—এসবই পরবর্তী সময়ে ছোটদের খেলা-ধুলোয় প্রতিফলিত হত। গালাগালিতে 'হিরণ্য কসিপু'ই ছিল সবচেয়ে ধিক্কারের ভাষা। যাত্রা হত কাশিমবাজারের বড় রাজ-বাড়িতে—তবে অতদূর মানে আড়াই-তিন মাইল পথ বন-বাদাড় ভেঙে যাওয়ার সাহস ছিল না তাই দেখা হয়নি। যাত্রার আগে জুড়ির গান চলত—নে-নে-নে' বেহালার ছড়ের সঙ্গে কানে হাতচাপা দিয়ে ঝাঁকড়া-চুলো মাথা দুলিয়ে গাঁজা খাওয়া চাঁছা গলার আওয়াজ এখনো যেন চোখ বুজলে শুনতে পাই। মুকুন্দ দাসের যাত্রার নাম তখন খুব শোনা যেত কিন্তু আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে তার গল্পই মুগ্ধ করেছিল। আমাদের পাড়ার চক্কত্তিবাড়িতে স্বদেশী যাত্রা হয়েছিল সেবার। প্রচার করা হয়েছিল 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' হবে। বড় বড় লোহার গজাল বসানো বিরাট দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! আসরে জমায়েৎ দর্শকমণ্ডলীর অনুরোধ 'কর্মক্ষেত্র' কিংবা 'পথ' পালা-গান হোক। ও দুটোই ইংরেজ সরকারের নিষিদ্ধ। অবশেষে কোন্ পালা হয়েছিল তা আজ কেউ বলতে পারবেন কিনা জানি না। তবে

'বন্দেমাতরম গানে নাচবে সকলে
কৃপাণ লইয়া হাতে
দেখুক বিদেশী হাস অট্টহাসি,
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে।'

এই গানটি যখন গাইছেন তিনি তখনই আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশের আবির্ভাব হল আসরে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

মুকুন্দ দাসের প্রভাব একদা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মহলেই যেন জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল নিষিদ্ধ দেশপ্রেমের। অর্থাৎ পুরাণ, ইতিহাস আর কল্পনার খাঁচা ভেঙে যাত্রাগান চলে এল বাস্তবের প্রত্যক্ষ সমস্যাসমর-ভূমিতে

তিরিশ চল্লিশ দশককে মোটামুটিভাবে সন্ধিক্ষণ বলা চলে। শহর বাজারে আধুনিক, শিক্ষিত বাবুমহলে যাত্রার আদর কমেছে তাঁরা কলকাতাই থিয়েটারী হাওয়াতে উল্লসিত। পুজো-পার্বণে স্টেজ বেঁধে মাইকেল, ডি এল রায়, গিরীশবাবুর নাটক মঞ্চস্থ করেন। জমি-দারবাবু বা ধনীর বৈঠকখানায় অ্যামেচার ক্লাবগুলো গজিয়ে উঠল। যাত্রা, কবিগান, তর্জা, খাইখেংড়ের দলকে গঞ্জ আর গ্রামের বৃহত্তর জনসাধারণের উপরই নির্ভর করতে হল। শহরে তারা কদাচ পেত কেবল হাটে, বাজারে, যারা মেহনৎ করে আর অল্পশিক্ষিত ব্যবসায়ী মহলে। তবে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব শখের থিয়েটার আর পেশাদার যাত্রা

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপে রায় কালিম্পানী [illegible]

দুটিতে পাশাপাশি চলতে থাকল—উভয়ে আনন্দ অবকাশের ভাগীদার হয়ে উঠল।

আমি ওসব বড় বড় বা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের অধিকারী নই। সাধারণ আর পাঁচজনের মতোই কালে-কস্মিনে যাত্রা, থিয়েটার দেখেছি। তাই যুগ নির্ণয়ে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে এটা লক্ষ্য করেছি যে, সিনেমা আর পেশাদার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যাত্রার রেওয়াজ একদা শহরাঞ্চলে লুপ্ত হতে বসেছিল। উন্নত, আধুনিক আলোকসজ্জা আর পট, সেইসঙ্গে জটিল মনস্তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ—সবটা জড়িয়ে নূতনের প্রতি মোহ যাত্রাকে ষোল আনা পল্লী অঞ্চলেই ঠেলে দিয়েছিল অর্থাৎ যেখানে সিনেমা নেই, যানবাহনের অসুবিধার জন্য এবং পেশাদার নাটুকে দলের আশানুরূপ দক্ষিণা প্রাপ্তির দুরাশা সেইসব স্থানেই যাত্রা ইত্যাদি সনাতন রমণীয় শিল্প টিঁকে রইল—আর শহরে দু-একটি বড় বড় দল এবং সেই সঙ্গে 'হাওড়া সমাজের' মতো শখের দল।

কবে কিভাবে যাত্রার পুনরুজ্জীবন হল এটা নিরূপণ করা সহজ নয়। মনে পড়ে, আমরা একদা বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে যেমন আউল-বাউল, রাইবেশে, ছৌ, ঝুমুর, গম্ভীরা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি তার কাছাকাছি সময়েই শোভাবাজারের রাজবাড়িতে যাত্রা-উৎসবের মহাসমারোহ ঘটে। বোধকরি সেটিই যাত্রার পুনরুজ্জীবনের পীঠভূমি। এক নাগাড়ে পর পর কয়েকদিন ধরে অনেকগুলি দলের পালা অভিনীত হয়। দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ঘটেছিল সেই অনুষ্ঠানে অসামান্য তার প্রমাণ ট্যাঁকের কড়ি দিয়ে দস্তুরমত টিকিট কেটেই দেখতে গিয়েছিলেন ওঁরা। হাউস ফুল।

বাঁধা স্টেজে থিয়েটার দেখার অভিনবত্ব-বোধ দর্শকের মনে থিতিয়ে আছে।। পরন্তু দীর্ঘকাল পরে দেখার ফলে 'যাত্রা'ই যেন নতুন বস্তু হয়ে ধরা দিল। কারণ যাই হোক বাংলার পুরনো একটি প্রধান কলাবিদ্যার প্রতি মানুষের অনুরাগ অল্পকালেই আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত হল।

শোভাবাজার রাজবাড়ির কথাই যখন উঠল তখন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের আমলের একটি কাহিনী শুনুন। অবিশ্যি সে-আমলে চিৎপুরে 'অপেরা পার্টির' ঢালাও আখড়া গড়ে ওঠে নি। নদীয়া, বর্ধমান, ঢাকা, বীরভূমের সীমান্ত পল্লী অঞ্চলই ছিল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। সে-কথা যাক। লোচন অধিকারী মশাই 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা অভিনয়ের চমৎকারিত্ব দিয়ে রাজা নবকৃষ্ণকে এমনই অভিভূত করলেন যে, পারলে শোভাবাজারের যাবতীয় সম্পত্তিই প্রায় অধিকারী মশাইকে দিয়ে দ্যান আর কি। অতোটা না হলেও বিস্তর টাকা লোচন অধিকারী পেয়েছিলেন শোভাবাজারের এই সংস্কৃতিগতপ্রাণ ব্যক্তিটির কাছে। ঠিক একই কাণ্ড ঘটে ছিল কাশিমবাজারের রানি রাসমণির বাড়িতে। নিখুঁত অভিনয় যে কী দর্শক মনকে চঞ্চল করতে পারে তার প্রমাণ নিদর্শন অধিকারীর দল। তখনকার আমলে নাম-ডাকওয়ালার জন্যে দান-খয়রাত কম বা ঐশ্বর্যের ঘটাপটা দেখানোই ছিল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। তবু এই কাণ্ড দেখে কলকাতার 'টক্কর-টেক্কা' দেনেবালা তাঁহা-জাঁহাবাজ জমিদার আর হৌসের রাজা-গজারা লোচন অধিকারীকে বায়না দিতে ভরসা পেতেন না। পাছে লোকটা ভুলিয়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে নেয়। মুখে অবশ্য বলতেন তাঁরা লোকটা বড় কাঁদায়। এত করুণ রস পয়সা দিয়ে কেনার কোনো মানে হয় না।

আজকে যেমন পেশাদার 'অপেরা' নামধেয় যাত্রা দলগুলি প্রধানত কলকাতায় হেড অফিস বানিয়ে কাজ কারবার করেন প্রথম যুগে সে-সব কিছু ছিল না। এমন কি পেশাই ছিল না, ছিল নেশা। লোকের মুখে মুখে প্রচার হল কৃষ্ণ ভাল কথা নতুবা দলটি জন্মাষ্টমীতে চাঁচর করে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা অনুষ্ঠান করতেন। ভক্তিই ছিল মূল প্রোতনা। প্রথম যুগে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা বা কালীয়দমনই ছিল [illegible] এবং অদ্বিতীয় বিষয়বস্তু। আর পরবর্তী কালে বর্ধমানের কাছে পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ, আনন্দ, রূপচাঁদ 'রামযাত্রা' করে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

গোপালচন্দ্র দাস বা গোপাল উড়ের [illegible] এখনো রসিকসমাজে সমাদর পেয়ে থাকে। বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী, [illegible] কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ, কাটোয়ার পীতাম্বর, ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ (ইনি চণ্ডী-যাত্রার জনক), বর্ধমানের লাউসেন বড়াল (ইনি মনসার ভাসান গানের প্রবর্তক), [illegible] কালাচাঁদ পাল গীতিনাট্য জগতের [illegible] এক দিকপাল।

তবে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর [illegible] পশ্চিম সকল বঙ্গেই ছিল [illegible] পিতা ভজনঘাটে বসতি করেন, [illegible] অসাধারণ রূপবান এই পুত্রের [illegible] জমিদার কৃষ্ণকমলের অপরূপ [illegible] এমনই মুগ্ধ হন যে, শিশুটিকে [illegible] বসলেন। ব্যাপার [illegible] চোটে কৃষ্ণকমলকে নিয়ে তাঁর বাবা [illegible] গেলেন। বছর [illegible] পর কৃষ্ণকমল আবার তাঁর মায়ের [illegible] পান। বোধকরি যাত্রার এই [illegible] জীবনের [illegible] তাঁর মনে [illegible]

[illegible] বর্ণনা করেছিলেন। তাই, পরে তাঁর 'নিমাই সন্ন্যাস' [illegible] অভিনয়ে অকৃত্রিম দরদ ফুটে উঠত। [illegible] অনুগত সাগরেদদের [illegible] [illegible] এনেছেন। বিভিন্ন প্রতিযোগী [illegible] পরাস্ত করে তিনি সকলের মনে এমনই [illegible] গেঁথে গেলেন যে, তাঁর আর ডাকা ত্যাগ [illegible]। তাঁর রচিত 'স্বপ্নবিলাস' 'রাই উন্মাদিনী' 'বিচিত্র বিলাস' সেকালে যথার্থই জনপ্রিয় হয়—তার প্রমাণ অল্পদিনের মধ্যে 'স্বপ্নবিলাস'-এর ৫০০০০ কপি বই বিক্রী। [illegible] ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। যাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা [illegible] তাঁরা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি [illegible] যোগাড় করে পড়তে পারেন।

আজকের দিনে যাত্রায় ছন্দোবন্ধ পরিবেশন লুপ্ত। বিমূর্ত প্রসঙ্গ অতিক্রম করে বাস্তবের উপরেই কাহিনী রচনা করা হয়। তা ছাড়া রাজনীতির পটভূমিও বিষয়বস্তুর অঙ্গীভূত হয়েছে। ইদানীং লেনিন, হিটলার, নেতাজীর জীবন নিয়ে গঠিত যাত্রার পালা জনসমাজে সমাদর পায় অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি এখন দেশের গন্ডী ছাড়িয়ে গেছে। অনেক আধুনিক উপন্যাসকেও যাত্রার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণের হাওয়া এসেছে।

এখন বিদেশেও কলকাতার যাত্রাদল আমন্ত্রিত হয়ে সফর করে বাংলার স্বীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আসেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বর্তমান কাঠামোয় যাত্রার পরিবেশন বাঁধা স্টেজের অনেক কাছাকাছি পৌঁছেছে। অনেকের মনে হয় যেন আগের সেই সুর আর রস যাত্রায় পাওয়া যায় না। সেই বীর রস, যা ভক্তি অথবা করুণ রসের প্লাবন এখন যেন উবে গেছে—কল্পনার অবকাশ শ্রোতা-দর্শকের অনেক কমেছে। হয়ত এ সবই সত্যি। তবু আজকের দিনে পেশাদার থিয়েটারের চেয়ে পেশাদার যাত্রাদলকে সাধারণ জন বেশি পছন্দ করেন। পুজোর সময় ত বটেই অন্যান্য স্থানীয় উৎসবের সময়ে এ'দের 'বাস' শহরে, শিল্পাঞ্চলে বা কৃষিজীবন যেখানে উন্নত সেখানে হাজির হয় এবং পর পর কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন পালা অভিনয় করে এ'রা অন্যত্র যাত্রা করেন।

[illegible] মে. [illegible]/ওয়াহিদা রহমান। পরিচালনা : স্বদেশ সরকার।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবুজ আলোর পদধ্বনি

শ্যামল চক্রবর্তী

আমরা দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ কারু কারু সম্পর্কে বলে থাকি—'বয়েস হলেও বুদ্ধি পাকেনি'। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি [illegible] গুণ থাকা সত্ত্বেও বোকার মত কাজ করেন কিম্বা নিজেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে উপস্থিত করতে পারেন না। আমাদের এদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কেও একথা বলা চলে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বয়েস প্রায় পঞ্চাশোত্তর হয়ে গেল এবং সবাক চিত্রের বয়সও চল্লিশ পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও এদেশের চলচ্চিত্র নানারকম শাসন-বিধির অন্তরালে এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে [illegible] হতে পারল না। জন্মলগ্ন থেকে এই [illegible] পর্যন্ত পরিবারের হয়তো বিভিন্ন দিকে উন্নতি করেছে, ফল প্রাপ্তিও ঘটেছে: তথাপি বাধানিষেধের গন্ডী থেকে মুক্ত হয়ে সবুজ প্রাণের বন্যায় এগিয়ে যেতে পারেনি এদেশের চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্র—প্রথম সৃষ্টির কালে ছিল শুধুমাত্র ছবি। কালক্রমে ছবিতে এল বিন্যাস, এল গতি। নির্বাকযুগে সেইসব ছবি দর্শককে আকৃষ্ট করার মানসে নানারকম কান্ডকারখানা করতো। তারপর নির্বাক যুগে ছবিতে গল্প বলা শুরু হল, বেশীর ভাগই কাল্পনিক ও উদ্ভট ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকতো। দর্শকের মন ভরতো না, শুরু হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। চলচ্চিত্র বিজ্ঞান-সম্মত শিল্প—তাই গবেষণা ও মানুষের চেষ্টা সফলতা নিয়ে এল। এল সবাক যুগ। ছবিতে কথা যোগ হল। এক কথায় বিরাট পরিবর্তন, দর্শক চমকিত। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে গেল। অর্থাৎ চলচ্চিত্র সমগ্র বিশ্বে, অসাধারণ প্রমোদ মাধ্যমরূপে উপস্থিত হল। পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে সমতা রেখে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পও এগিয়ে চলল—এর পরিধি বিস্তৃত রূপ নিল, বহু মানুষের মুখ এই ছবির জগতে প্রতিবিম্বিত হল। পত্রে পুষ্পে শোভিত হয়ে চলচ্চিত্র নামক বৃক্ষটি ক্রমেই বৃহত্তর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাইতে ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি স্যার ফিরোজ শোধনার ১৯৩৭ খৃঃ জানালেন—এদেশে বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পে ১২ কোটি টাকা খাটছে, ২০ হাজার লোক যুক্ত এবং প্রায় সাড়ে ছশো চিত্রগৃহ রয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানান যে, একটি চিত্র নির্মাণে বর্তমানে এক লক্ষ টাকার মত খরচ করতে হয়। অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃঃ সবাক চিত্র নির্মাণের মাত্র সাত বছরে এদেশের চলচ্চিত্রের এই দুর্বার গতি। সেকালে একটি শিল্পের প্রতি এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্র থেমে থাকেনি—ঐ পরিসংখ্যানের পর ক্রমে আরো এগিয়ে গেছে। এদেশে চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তায় যে কোন শিল্পকে পিছনে রেখে এগিয়েছে লক্ষ্মী বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের মিলিত শক্তি ও চেষ্টা বিরাট রূপ নিয়েছে। এই সত্তর দশকে এসে ভারতীয় চলচ্চিত্রে বছরে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা খাটছে, লক্ষাধিক লোক এই শিল্পে যুক্ত এবং সমগ্র দেশে তিন থেকে চার হাজারের কাছাকাছি চিত্রগৃহ। বর্তমানে একটি ছবিতে কোটি টাকাও খরচ হয়ে থাকে এবং ভারতীয় ছবির দ্বারা বিদেশ থেকে সরকারের বেশ কয়েকশো কোটি টাকা মুদ্রাও আয় হয়।

তেমনি সবাক যুগের প্রথমে এদেশের ছবিতে এল কাহিনী এবং সুষমা। ক্রমে এই শিল্প মাধ্যমটির উন্নতি হতে থাকল। আস্তে আস্তে সেট সেটিং, দৃশ্য পরিকল্পনা, অভিনয়, ধ্বনি প্রক্ষেপণের

যথার্থতা, সঙ্গীতের ব্যবহার যোগ হল। ছবি এগিয়ে চলল। ভাল ভাল ছবি সৃষ্টি হল, কৃতী পরিচালক ও শিল্পীকুলের চেষ্টায়। ১৯৩৯ সনের মধ্যে চলচ্চিত্র পেল প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস', ভি শান্তারামের 'আদমি', দেবকীকুমার বসুর 'চন্ডীদাস' এবং নীতিন বসুর 'ভাগ্যচক্র' ছবিগুলি। দর্শক ছবির উন্নতিতে পরিতৃপ্ত, ছায়াছবিও সেই পরিতৃপ্তিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় মগ্ন হল। সেই পরিক্রমায় চলচ্চিত্র এসে উপস্থিত হল 'পথের পাঁচালী' ছবির মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নবভাবের উন্মেষ ঘটল এই ১৯৫৫ সালে এবং এক দুর্বার সাড়া জাগল চলচ্চিত্র শিল্পে। 'পথের পাঁচালী' ছবি নিয়ে এল চলচ্চিত্রে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা। স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রচলিত রীতি ভেঙে নিয়ে এলেন প্রকৃত জীবনের স্পর্শ ছবির জগতে। এত দীর্ঘ বছর ধরে ছবি কথা বলছিল, কিন্তু ঠিক এমনটি নয়। রিয়্যালিটি বা বাস্তববোধ এল ছবিতে, যা নাকি ইতিপূর্বে উপস্থিত ছিল না। ভারতীয় চলচ্চিত্র নতুন দিকে মোড় নিল, এবার চলচ্চিত্র জীবনের কথা আরো গভীর-ভাবে বলতে শুরু করল, ছবি আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা পরস্পর একাত্ম হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ প্রদর্শিত পথে এগিয়ে এলেন আরো কয়েকজন, যাঁরা চলচ্চিত্রকে আরো গভীরভাবে দর্শকের নিকট আন্তরিক-ভাবে উপস্থিত করলেন। এঁদের সবার মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় চলচ্চিত্র পেল শিল্পসুষমা, আঙ্গিকগত উৎকর্ষতা, বাস্তবনিষ্ঠ কাহিনীর চিত্ররূপ ও বিশ্বের সম্মান। সত্তর দশকে এসে ভারতীয় চলচ্চিত্র এই পটভূমিতে বিরাজ করছে।

কিন্তু এরপরেও চলচ্চিত্রের বক্তব্য শেষ হয়নি। যেহেতু চলচ্চিত্র, আজ জীবনের কথা নির্মমভাবে উপস্থিত করছে, প্রচলিত রীতিনীতিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চিত্রপটে তুলে ধরতে চাইছে সেজন্যই চলচ্চিত্র এই মুহূর্তে আরো কিছু বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে উদগ্রীব। তার জন্যই চলেছে সংগ্রাম, দুঃসাহসিক মনোভাব এবং প্রচেষ্টায় কিছু করার তাড়না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ থেকেই যে অনুশাসন রয়েছে, যেসব সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে বাধানিষেধের গন্ডী, তাকে চাইছে দূরে সরিয়ে দিতে। এই নিয়েই আজকের চলচ্চিত্রের জগতে ঝড় উঠেছে। এই ঝড় হল চলচ্চিত্রে যৌন আবেদন বা অশ্লীলতা দেখানো হবে, কি হবে না। এবং একেই বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রে সবুজের পদধ্বনি।

এখন প্রশ্ন—চলচ্চিত্রে শ্লীল ও অশ্লীল বলতে কী বোঝায়। বিদেশের চলচ্চিত্রে এসবের কোন বাধানিষেধ নেই। কারণ ওদের সমাজব্যবস্থা বা দৈনন্দিন জীবনের মাপকাঠি আমাদের দেশের তুল্য নয়। ওদেশে যা সম্ভব হয়, এখানে আমাদের জীবনে তা ঘটে না। তেমনি ওদের চলচ্চিত্রে যা দেখানো সম্ভব, আমাদের দেশে সেই-রকম কোন কিছু উপস্থিত করার অসুবিধা রয়েছে। অথচ সমগ্র বিশ্বে চলচ্চিত্র শিল্পের একটা নিজস্ব পথ রয়েছে, যে পথে সবাই একইভাবে চলছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জীবনের সব কথাই তুলে ধরা হচ্ছে, সেখানে কোন বাধা-নিষেধের জোরে চলচ্চিত্র থেমে যায় নি। নরনারীর জীবনকে নিয়ে যে কাহিনী চিত্রায়িত হচ্ছে, সেই কাহিনীর একান্ত গোপনীয় ও আন্তরিক কথা থেকে দূরে গিয়ে প্রতীকের আশ্রয়ে চিত্ররূপ উপস্থিত হচ্ছে না। কিন্তু এদেশে নরনারীর গোপনীয় কথা বা মুহূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেই উপস্থিত করা হচ্ছে। গোল বেঁধেছে এখানেই।

চলচ্চিত্র যদি জীবনের সব কথাই তুলে ধরতে চায় তাহলে প্রতীকের আশ্রয়ে কোন কোন ঘটনা উপস্থিত হবে কেন। রিয়্যালিটির প্রশ্নে সব কিছুই উপস্থিত করতে হবে এই হল আজকের মূল দাবী। আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় সামাজিক অনুশাসনের গন্ডীর দ্বারা চলচ্চিত্র শিল্পকে চালিত করা হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। সময়ের পরিবর্তনে চিন্তায় ভিন্ন সুর আসে—বক্তব্যও নতুনভাবে উপস্থিত হয়। চলমান জীবনে যদি সর্বত্র নবজাগরণের ভাব এসে থাকে, তাহলে চলচ্চিত্র তার থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে কিছু স্রষ্টা এসেছেন যাঁরা জীবনের সব কথা তুলে ধরতে চান। এই চাওয়ায় অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ঘটছে এই বক্তব্য একপক্ষের। অপরপক্ষ বলছেন—না, অশ্লীলতা নেই কোথাও। জীবন যদি চলচ্চিত্রের একমাত্র মুখ্য বাহক হয় তাহলে এই জীবনের সব-দিকই এর সঙ্গে যুক্ত হবে। নরনারীর জীবনের একান্ত মুহূর্ত উপস্থিত করতে গিয়ে যদি বিছানার দৃশ্য বা চুম্বন-দৃশ্য উপস্থিত করতে হয় তাহলে সেই মুহূর্ত থেকে ফিরে আসা যাবে না। কিন্তু দর্শক, তাঁরা কি পারবেন সহ্য করতে? কেন পারবেন না—যদি বিদেশী চিত্রের সময় তাঁরা কিছু মনে না করেন, তাহলে দেশীয় চিত্রের সময় অন্য মত পোষণ ঠিক নয়। কিন্তু ভারতীয় জীবনযাত্রায় আমরা এমন ভাবে প্রস্তুত যে বিদেশী নিরাবরণ নর-নারীর নিরাভরণ দেহসৌন্দর্য দেখতে আঁতকে উঠি না—কিন্তু এদেশের আপনার জনের এই দৃশ্য সহ্য করা সম্ভবপর হয় না।

সেজন্যই আজ সোরগোল—'[illegible]', 'জররত', 'অনুভব' ইত্যাদি আরো অনেক ছবি নিয়ে। মনে পড়ছে কোন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'বিছানার দৃশ্য' দেখাতে গিয়ে আমি প্রতীকের আশ্রয়কেই উপযুক্ত মনে করি। যেমন বালিশ, চাদর দুমড়ে মুচড়ে [illegible] এবং নরনারীকে বিভ্রান্তভাবে উপস্থিত করলেই বোঝা যাবে কিছু একটা হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু সত্যজিৎ পরবর্তী যাঁরা এসেছেন তাঁরা আরো বেশী সাহসী, তাঁরা আরো এগুতে চান। চলচ্চিত্র সেন্সার কমিটি এখনও এই বিষয়ে সবুজ নিশানা দেখান নি, কিন্তু চলচ্চিত্রের দ্বারে সেই সবুজের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই তরঙ্গ রোখা কি সম্ভব হবে? অতি সম্প্রতি বাংলা-দেশের ঢাকায় একটি চিত্রে চুম্বনদৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুয়ারেই সেই পদধ্বনি এসে গেছে।

এখন প্রশ্ন চলচ্চিত্রে শ্লীল অশ্লীল বা যৌন আবেদনের মাপকাঠি কি হবে? অর্থাৎ কিভাবে এই দৃশ্য চিত্রায়িত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষ করে হিন্দী ছবিতে যৌন আবেদন যেভাবে প্রকট করে তুলে ধরা হচ্ছে সেটা অনেকক্ষেত্রেই অতি উত্তেজনার খোরাক জোগাচ্ছে। এরও কারণ হল যেহেতু নগ্নদৃশ্য বা চুম্বন ছবিতে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না সেজন্যই নানারকমের যৌন আবেদনের মাধ্যমে চিত্রকে দর্শকের নিকট আকর্ষণীয় করা। অথচ শিল্পসম্মতভাবে প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বনদৃশ্য বা বিছানার দৃশ্য অনেক কম উত্তেজক রূপে উপস্থিত করা সম্ভব। যদিও একথা সত্য যে, চুম্বন দৃশ্য বা বিছানার দৃশ্য মাত্রাতিরিক্তভাবে উপস্থিত হলে রসহানি ঘটবে এবং দর্শকের নৈতিক চিন্তায় আঘাত হানতে পারে। চলচ্চিত্র সেন্সার কমিটি এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে দিলে হয়তো আঁতকে ওঠার মতো কিছু ঘটবে না। অথচ বর্তমানে আমাদের চলচ্চিত্র এইদিকে পদক্ষেপের অভাবে থেমে যাবার মুখে। কেননা, দর্শক কিছু দুঃসাহসিক পরিবর্তন বা নতুনত্বের জন্য উন্মুখ। দীর্ঘদিন একঘেয়ে রক্ষণশীল মনোভাবের বাধানিষেধের জোরে আবদ্ধ থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র দর্শক মনোরঞ্জনের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। চিত্রস্রষ্টারাও অসফল চিত্রনির্মাণে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে বা শিল্পকে অন্ধকারে নিয়ে চলেছেন। সারা পৃথিবীর দর্শকদের যদি চুম্বন দৃশ্য বা নরনারীর একান্ত মুহূর্তের দৃশ্য চিত্রায়িত দেখে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন না ঘটে থাকে তাহলে আমাদের দেশের দর্শকদেরও ঘটবে না। প্রথম প্রথম হয়তো গ্রহণে অস্বস্তি বা বিতর্কের ঝড় আসবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সব কিছুই সহজভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। চলচ্চিত্র যখন তার নিজস্ব শিল্প-মাধ্যমে জীবননির্ভর হয়ে উঠছে সে সময় অযথা তার চলার পথকে গোঁড়ামির মানসিকতার রুদ্ধ করে রেখে এই শিল্পের সংকট ও ভবিষ্যত সফল অগ্রযাত্রাকে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখায় আটকে কোন শুভ ফল প্রাপ্তি ঘটবে না। কোন শিল্পকেই বাধা-নিষেধের জোরে বেঁধে রাখা যায় না। স্বকীয় গতিতে এগিয়ে যেতে দিলেই অনাস্বাদিত রূপ প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্র তা থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাই এই পদধ্বনিকে স্বাগত জানানো নীতিবিগর্হিত কাজ হবে না।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

নতুন দিনের আলো

ইউনাইটেড নেশনস্‌-এর পরিসংখ্যানে প্রকাশ, পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, যেখানে সমগ্র উপার্জনক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ষোল ভাগের বেশী লোককে কর্মচারী ও কেরানীর চাকরীর সংস্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকী উপার্জনক্ষম লোকের মধ্যে কেউ কৃষিজীবী, কেউ বা ব্যবসায়ী, আবার কেউ বা উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, শিক্ষক বা ঐ-রকম আর-কিছু। কাজেই আমাদের শিক্ষিত বেকারদের উচিত, চাকরীর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে না থেকে স্বাধীনভাবে কোনো-না-কোনো রকমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা এবং এ-ব্যাপারে সৎভাবে জীবিকা অর্জনের কোনো উপায় বা পন্থাকেই সম্মানহানিকর, ছোটো জ্ঞান না করা।—এই অত্যন্ত খাঁটি, সত্য কথাটি বলতে চেয়েছে ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম বাংলা ছবি বাদল পিকচার্সের অন্তম নিবেদন "নতুন দিনের আলো"। এবং এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করবার জন্যে আমরা অনায়াসেই এই ছবির প্রযোজক রাখালচন্দ্র সাহা এবং কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীকে অকুণ্ঠভাবে অভিনন্দিত করতে পারি। ফুচকাওলা, চানাচুরওলা, পানওয়ালা, 'বেচো-কাবু-চারআনা, যা নেবে তাই চারআনা', 'ইন্ডিয়া সুইটস্‌', 'তাজমহল সুইটস্‌', 'সাগর রেস্তোঁরা', 'মানসরোবর', ঝুনঝুনওয়ালা, গম্ভীরমল ঝলমল, নাগরদাস মনোহরদাস প্রভৃতি লাখো লাখো অ-বাঙালী যখন এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে বসে ছোট-বড়, হরেক রকম ব্যবসায়ের মাধ্যমে 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী :' প্রবচনটিকে সার্থক করে তুলছে, মিষ্টান্নের দোকান, মুদীর দোকান, কুমোরের কারবার প্রভৃতিও যখন ধীরে ধীরে বাঙালীর হাত থেকে অবাঙালীর কুক্ষিগত হয়ে চলেছে, তখন "নতুন দিনের আলো"র বক্তব্যটি যে অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ধান ভানতে শিবের গীতের মতো শোনালেও এই স্বীকারোক্তিটুকুর প্রয়োজন ছিল।

[illegible]/পরিচালক পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায় নায়িকা সোমা দেকে নির্দেশ দিচ্ছেন। কাহিনী : প্রফুল্ল রায়। ফটো : অমৃত

কার্ণিকা ফিল্মস পরিবেশিত হাতীর দাঁত চিত্রে রাকেশ পাণ্ডে এবং আশা সচদেব

"নতুন দিনের আলো"র কাহিনীতে দেখতে পাই, গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল নাটকের অনুসরণে পরিবারস্থ তিন ভাইয়ের মধ্যে

মেজোভাই মৃত্যুঞ্জয় হচ্ছে উকিল এবং খল, স্বার্থপর। ছোটো ভাই সঞ্জয় বি-এ পাশ করবার পরে পাঁচ বছর ধরে বেকার হয়ে আছে বলে মৃত্যুঞ্জয়ের বিরক্তির সীমা নেই। কিন্তু কিছু করে মাসোহারা পাঠিয়ে কর্তব্যের দায় এড়ানোর পরামর্শকে উপেক্ষা করে যখন পরলোকগত পিসতুতো ভাইয়ের মেয়ে মিনুকে বাড়ীতে এনে হাজির করল সঞ্জয় এবং জানল এতে সমর্থন আছে বড়ো বৌদির, তখন রোজগেরে উকিল মৃত্যুঞ্জয় রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং ঘোষণা করল, একান্নবর্তী পরিবার থেকে সে তার স্ত্রী ও বি-এ পাঠরতা পলিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। সাধারণ কেরানী, বড়ো ভাই ধনঞ্জয় পড়ল মহা ফাঁপরে: স্ত্রী, কিশোর সন্তান, ভাই সঞ্জয়, মিনু এবং নিজে—এই পাঁচটি মুখের অন্ন জোগানো তার একার রোজগারে প্রায় অসম্ভব। চাকরীর চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ঘুরেও যখন কিছুই হল না, তখন একজন শিক্ষিত যুবকের চায়ের দোকানের বিক্রি দেখে সে যেন বাঁচবার পথ খুঁজে পেল এবং স্নেহময়ী বৌদির হাতের চার গাছি সোনার চুড়ী বিক্রি করে পাওয়া তিনশো টাকা মূলধন নিয়ে পারঘাটায় খুলে বসল মিনু কাফে—চা এবং টুকিটাকির দোকান। মেজো ভাই মৃত্যুঞ্জয় আবার তৎপর হয়ে উঠল—চায়ের দোকানী হয়ে সঞ্জু তার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিচ্ছে। কিন্তু তার জঘন্য বিরোধিতা সঞ্জয়কে দমাতে পারল না; তার চায়ের দোকান, তার দোকানের 'মিনু পীজ' ঘুঘনি তাকে শেষ পর্যন্ত করল জয়যুক্ত।

অযথা আত্মসম্মানজ্ঞান মানুষকে সময় সময় মরিয়া করে তোলে। তবু মনে হয়,

নতুন দিনের আলো/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ছোটো ভাই সঞ্জুর বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিযানের মধ্যে কিছুটা বাড়াবাড়ি রয়েছে, যেমন রয়েছে পলির প্রণয়ীর প্রৌঢ় মা-বাপের কথা কাটাকাটির মধ্যে অশোভনাতার আতিশয্য। চিত্রকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলির অঙ্কনে বিশেষ কোনো সূক্ষ্ম তুলির কাজ না থাকলেও সেগুলি রক্ত-মাংসের অবয়ববিশিষ্ট আমাদের নিত্যকালের চেনাজানা মানুষ; তাই তাদের দুঃখে আমাদের চক্ষু যেমন আর্দ্র হয়েছে, তাদের আনন্দেরও তেমনই অংশীদার হতে কোনও রকম অসুবিধা হয় নি।

সু-অভিনয় ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। ছোটো-বড়ো, প্রত্যেকটি ভূমিকাই সুঅভিনীত। সঞ্জয়ের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর নীরব অভিব্যক্তিগুলি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাসূচক। স্নেহময়ী বৌদির চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সন্ধ্যারাণীর অভিনয়নৈপুণ্যে, যদিও বরাবর যুগোপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর সামগ্রিক অভিনয়ে আবেগের প্রকাশকে বেশ কিছুটা পরিমিত করবার

বিজয়িনী চিত্রের মিউজিক টেকের পূর্বে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুযোগ ছিল। সঞ্জয়ের প্রণয়িনী ও প্রেরণাদাত্রী নমিতা বেশে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। কিন্তু বি-এ পাশকরা সামান্য স্কুলমাস্টারের সাজ-পোশাক অপেক্ষাকৃত সাধাসিধা হওয়া উচিত ছিল। বড়ো ভাই ধনঞ্জয়ের ভূমিকায় প্রমোদ গাঙ্গুলী অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ অভিনয় করেছেন। একদা তিনি অল্প কয়েকটি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বহুদিন অদর্শনের পরে প্রৌঢ় বয়সে তাঁর এই চরিত্রাভিনয় রীতিমত চিত্তাকর্ষক। প্রথমে ফেক-গণৎকার ও পরে চায়ের দোকানে সঞ্জয়ের দোসর গণেশের ভূমিকায় অনুপকুমার তাঁর অভিনয়চাতুর্যকে উপভোগ্যতার পর্যায়ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। পর্দায় এই প্রথম দেখলুম তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায়কে। থিয়েটার সেণ্টারের প্রথিতযশা এই শিল্পী

দম্পতি আলোচ্য চিত্রে স্বার্থপরায়ণ উকিল মৃত্যুঞ্জয় ও তার সহধর্মিণী হেনার ভূমিকায় সার্থক অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদেরই সন্তান শ্রীজাম দেবরাজ রায় সেজেছেন মৃত্যুঞ্জয়-কন্যা অলির প্রণয়ী। যতক্ষণ তিনি ছবিতে আছেন, ততক্ষণই ভালো লাগে এবং এই সাফল্য নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। এ-ছাড়া উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় (মিনু), বিদ্যা রাও (পলি), বিকাশ রায়, বিনতা রায়, শমিতা বিশ্বাস, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা, যুগ্ম চিত্রশিল্পী পরিস্থিতি অনুযায়ী বহির্দৃশ্য গ্রহণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উজ্জ্বলা সিনেমার প্রক্ষেপক যন্ত্র-প্রোজেক্টার দুটি ভিন্ন ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করেছিল বলে এবং একটি লেন্স সম্ভবত ঈষৎ স্থানচ্যুত ছিল বলে ছবির ঔজ্জ্বল্যেও তারতম্য ঘটেছিল এবং সময় সময় ছবির অংশকে আউট অব ফোকাস বোধ হয়েছিল। বিজয় বসু ও সুবোধ দাসের শিল্পনির্দেশনা কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তব-ধর্মী। সুনীল বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনা ছবির টেম্পোকে এমন সুন্দরভাবে বজায় রেখেছে যে, মনে করবার উপায় নেই, এই ছবিতেই তিনি প্রথম স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করবার সুযোগ পেলেন। ছবির গান তিনটি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। কিন্তু তাঁর মতো অভিজ্ঞ গীতিকারের কাছ থেকে 'মার দিয়া হ্যায় কেল্লা'র সঙ্গে 'পরেছি বাদশাহী আল-খাল্লা'র মতো মিল আশা করা যায় না। ঠিক সমানভাবেই অভিযোগ করব সংগীত-পরিচালক নচিকেতা ঘোষের বিরুদ্ধে; ছবির গানে অযথা সুর নিয়ে কসরৎ করলে গান হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে না এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভের সুযোগও হারায়। কাজেই ছবির তিনখানি গানই হয়েছে, ছবির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে নি।

বর্তমানের নৈরাশ্যের রাজ্যে আশার নববাণী বহনকারী, অভিনয়সাফল্যমণ্ডিত, বাদল পিকচার্স-এর নিবেদন, হেমন্ত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত "নতুন দিনের আলো" দর্শকমাত্রকেই খুশীতে ভরিয়ে দেবে।

স্টুডিও সংবাদ

রূপশ্রী পিকচার্স-এর 'চতুরঙ্গ'-এ সুচিত্রা সেন

১৯৬০ সালে প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী চিত্রপ্রযোজনার কাজে ব্রতী হয়ে প্রথমেই নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' অবলম্বনে তপন সিংহ পরিচালিত শিল্প-সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় চিত্র। ঐ সময় থেকেই শ্রীগাঙ্গুলীর আন্তরিক অভিলাষ ছিল কবির 'চতুরঙ্গ' অবলম্বনে একখানি ছবি তৈরী করা এবং তার নায়িকা দামিনীর ভূমিকাটি সুচিত্রা সেনকে দিয়ে রূপায়িত করা। বছর তিনেক আগে বাঙলা 'আগিনা মাহ্লাতো'র প্রযোজনা শেষ করেই শ্রীগাঙ্গুলী 'চতুরঙ্গ" করবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু নানা কারণে ঐ সময়ে ছবিটির কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'স্ত্রীর পত্র' ছবিখানিকে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখে শ্রীগাঙ্গুলী ও শ্রীমতী সেন দুজনেই একমত হন যে, শ্রীপত্রীকেই 'চতুরঙ্গ' ছবির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হোক। বলা বাহুল্য, ঐ সঙ্গে চিত্রনাট্য রচনা করবার ভারও শ্রীপত্রীর ওপরই অর্পিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, হেমেন গাঙ্গুলীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রূপশ্রী পিকচার্স-এর পতাকাতলে 'চতুরঙ্গ'-এর শুটিং শুরু হবে এপ্রিল থেকে।

কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় প্রথম হিন্দী ছবি "হাতীকে দাঁত"

রবীন খেরা প্রযোজিত এবং বহু আলোচিত পরিচালক বি-আর-ইশারা লিখিত ও পরিচালিত রঙীন ছবি "হাতীকে দাঁত-"এর পূর্বাঞ্চল পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড। ছবিটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন রাকেশ পাণ্ডে এবং আশা সচদেব। সংগীত-পরিচালনা করেছেন রবীন্দ্র জৈন।

এম-এস-এম প্রোডাকসন্স-এর 'অভিনয়'

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, এম-এস-এম প্রোডাকসন্স-এর ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবি "অভিনয়"-এর মহরৎ হয়েছিল গেল স্বাধীনতা দিবসে টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সহকারী অনিল ঘোষ পরিচালিত এই ছবির দশদিন ধরে টানা শুটিং হয়েছিল অক্টোবর মাসে ঐ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতেই। এরপরে প্রযোজকরা দলবল নিয়ে বোম্বাই শহরে আসেন এবং ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত বোম্বাই শহর ও শহরতলীতে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেন।

ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন রাখী সালুজা, সমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত ও শেখর চট্টোপাধ্যায়। 'অভিনয়'-এর চিত্রগ্রহণ, সুরযোজনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

পাঞ্জাব-প্রযোজক রাজেন ভাটিয়ার দুখানি ছবি

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন ভাটিয়া তাঁর কিরণ প্রোডাকসন্স-এর নতুন ছবি "আজকী তাজা খবর"-এর মহরৎ করেন ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে বোম্বে

সাউন্ড স্টুডিওতে ছবিটির প্রথম গান রেকর্ড করে। হসরৎ জয়পুরী রচিত গানে সুরযোজনা করেছেন শঙ্কর জয়কিষেণ এবং গেয়েছেন কিশোরকুমার।

ঐদিনই তিনি ৩০দিনব্যাপী একটানা শুটিংও শুরু করেন। জনপ্রিয় গুজরাটি নাটক "ঢাকডোল" অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন এস, খলিল। ছবির চিত্রশিল্পী ও শিল্পনির্দেশক হচ্ছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ সাইগল ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন কিরণকুমার, রাধা সালুজা, পদ্মা খান্না, আই-এস-জোহর, আসরাণী, পেন্টাল, অর্পণা চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ।

রাজেন ভাটিয়া তাঁর দ্বিতীয় ছবি "জ্যোতিষী" শুরু করবেন ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে। বেদ রাহী লিখিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটি পরিচালনা করবেন বি-আর ইশারা।

কিরণ প্রোডাকসন্স-এর ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবি "জঙ্গলমে মঙ্গল" মুক্তির দিন গুনছে। মালয়লাম লেখক কে-পি কোট্টারাকারা লিখিত "রেস্ট হাউস"-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছবিটিতে আছেন দ্বৈত-ভূমিকায় প্রাণ, কিরণকুমার, রীণা রায়, সোনিয়া সাহনী প্রভৃতি।

মোহন ফিল্মস্-এর 'অনজান রাহে'

মোহন ফিল্মস্-এর নবতম নিবেদন 'অনজান রাহে'র এক নাগাড়ে কুড়ি দিন শুটিং হয়ে গেল পাঁচগণির আঞ্জুমান-এ-ইসলাম হাই স্কুলে। মোহন রচিত, প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন আশা পারেখ, ফিরোজ খাঁ, আকবর খাঁ, জহীরা, জালাল আগা, মনমোহন, জগদীশ রাজ, অসিত সেন প্রভৃতি। অতিথি শিল্পী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন কিরণকুমার এবং অচলা সচদেব। ছবির চিত্রনাট্য রচনা, সঙ্গীতপরিচালনা, সংলাপরচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে নবেন্দু ঘোষ, কল্যাণজী আনন্দজী, সাগর সরহাদি, এম-ডাবল্যু মুকাদাম, এ আর কাকাড় এবং এস. আর. সাবন্ত।

অম্বিকা চিত্রের 'মঞ্জিল'

আশিস বর্মন লিখিত কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায় নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অম্বিকা চিত্রের 'মঞ্জিল' ছবির জন্যে। রাজপ্রকাশ, জয় পাওয়ার ও রাজীব সুরি প্রযোজিত এই ছবির চারদিনব্যাপী শুটিং হয়ে গেল সম্প্রতি জুহুর একটি বাংলোতে। এই শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, ঊর্মিলা ভাট ও সতোন কাপ্পু। ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কে, কে, মহাজন ও রাহুল দেববর্মণ।

'নয়না'র চিত্রগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত

শক্তি ইন্টারন্যাশানাল-এর 'নয়না' ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হল আটদিন ধরে কিলিস্তান ও কেমাস স্টুডিওতে শুটিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কনক মিশ্রের পরিচালনাধীনে এ-ছবিতে অংশগ্রহণ করেছেন শশী কাপুর, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, রেহমান, ডেভিড, পদ্মা খান্না, ফরিদা জালাল এবং গজানন জাগীরদার। বদ্রুলভাই শাহ প্রযোজিত ছবিটির চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত-পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে কে-এইচ কাপাডিয়া, শঙ্কর জয়কিষেণ ও পি-জি সুপারে।

বিবিধ সংবাদ

দক্ষিণ কলিকাতায় নব নাট্যমঞ্চ

অনুমান বছর আঠাশ আগে দক্ষিণ কলিকাতার নাট্যামোদীদের জন্যে স্থাপিত হয়েছিল কালিকা থিয়েটার। কিন্তু কয়েক বছর চলবার পরে যখন এই থিয়েটারটি সিনেমায় রূপান্তরিত হয়, তখন লোকের মনে ধারণা জন্মেছিল, দক্ষিণ কলিকাতায় স্থায়ী থিয়েটার চলা সম্ভব নয়। এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড ও রাসবিহারী অ্যাভেনিউ-এর সংযোগস্থলের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গমঞ্চটি। প্রথমে এই মঞ্চে এককভাবে অভিনয় করতেন শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী। কিন্তু বর্তমানে শৌভনিক সম্প্রদায় ছাড়াও বহু নাট্যগোষ্ঠী এই মঞ্চে তাঁদের নাট্যক্রিয়া প্রদর্শন করছেন। ফলে সপ্তাহের সব কটি দিনই মুক্ত-অঙ্গন নাট্যরসিক দর্শকদের কাছে মুক্ত। কিন্তু মুক্ত-অঙ্গন কোনোক্রমেই পরিপূর্ণ রঙ্গালয় পদবাচ্য হতে পারে না। এতে না আছে একটি সুপ্রশস্ত ও [illegible] নাট্য-পীঠ, না আছে একটি আরামদায়ক আসন-সমন্বিত সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাগৃহ। কাজেই দক্ষিণ কলিকাতায় একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর রঙ্গালয় গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখ-ছিলেন শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক-বৃন্দ বেশ কিছুদিন ধরে। সম্প্রতি তাঁরা ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর কাছ থেকে

[illegible]/আশা পারেখ

[illegible] কমবেশী ১২ কাঠা [illegible] সংগ্রহ করে তার ওপর [illegible] অদ্ভুতীয় নামানু- [illegible] স্থাপনের জন্যে উদ্যোগী [illegible]। [illegible] ইচ্ছা আছে, এই মঞ্চের [illegible] তাঁরা [illegible] এবং অভিনয় সংক্রান্ত [illegible] ব্যবস্থা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, [illegible] প্রভৃতি চালানোর জন্যে উপযুক্ত [illegible] স্থাপন করবেন। মঞ্চালয়ের ইতি- [illegible] প্রদর্শনী, নাট্য পাঠাগার, নাট্য [illegible], [illegible] মাঠাভিনয়মণ্ড প্রভৃতিও [illegible] রূপায়িত। এই বিরাট পরি- কল্পনাকে রূপদানের জন্যে যথেষ্ট অর্থের [illegible]। এবং তারই জন্যে তাঁরা বর্তমানে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন '[illegible] সদন' মঞ্চে। আমরা তাঁদের এই [illegible] প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

[illegible] সংবাদ

[illegible] কলামন্দিরে ১৬ [illegible] '৭৩ সন্ধ্যা ৬।৩০টায় 'মারীচ [illegible]' মঞ্চস্থ করবে। রচনা ও নির্দেশনায় [illegible]।

জলসা

সাংবাদিক সম্মেলনে আলি আকবর খাঁ

'পাঁচ মাস আগে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর সঙ্গে সাংবাদিক মহলের সাক্ষাৎ ঘটেছিল পার্ক হোটেলে—আর পাঁচ মাস পরে আবার আমরা ওঁর দেখা পেলাম—বালিগঞ্জ সাকুলার রোডে সুবিখ্যাত আইনজীবী শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রথমবার তিনি এসেছিলেন অসুস্থ পিতার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার তদারক করতে। আর এবার?—

'এবার বেশীর ভাগ সময়ই কাটবে মাইহারে। কারণ আমি এসেছি বাবার সমাধি-মন্দির সম্পূর্ণ করতে'—

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খাঁ সাহেব এই কথাই জানালেন।

কিন্তু শিল্পরসিকদের হাত থেকে শিল্পী কোনোদিন রেহাই পান না। খাঁ সাহেবও পাননি।

গত ২২শে ডিসেম্বর অনুপ শিল্পী-গোষ্ঠীর অন্যতম কর্মসচিব শ্রীজ্যোতিষ গাঙ্গুলী ও সুব্রত ঘোষের যুগ্ম নেতৃত্বে রবীন্দ্র সদনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের একটি একক সরোদ বাদনের আসরের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের আহৃত অর্থ দুস্থ পুলিশ কর্মচারীদের পরিবারবর্গ, বিপ্লবী নিকেতন ও আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের তহবিলে দেওয়া হয়। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে চেক অর্পণ করেন শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী। মানপত্র পাঠ ও প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী এবং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র।

সাংবাদিক সম্মেলনে আলি আকবর খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করা হয়—দেশবাসীকে বঞ্চিত করে বিদেশে সংগীত শিক্ষাদানের কারণ কি?

'এদেশে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষা ও প্রচারের জন্য অনেক গুণী শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ আছেন। আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের দেবদত্ত সঙ্গীতের নাদ সাগর-পারেও যেন পৌঁছয়। প্রধানতঃ সেইজন্যই আমরা এই কাজে ব্রতী হয়েছি। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও এদেশে মনের মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর ওখানে আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক কলকাতার ঐ নামের শিক্ষায়তনেরই একটি শাখা। যাঁরা শিক্ষায় আছেন—আশিস, সস্ত্রীক শংকর ঘোষ, চিত্রেশ দাস, জাকির হোসেন—এঁরা সবাই বাঙালী এবং ভারতীয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মতই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ওদেশের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করেন।'

খাঁ সাহেবের সঙ্গীত প্রচারের ব্রত যে ব্যর্থ হয়নি, একাধারে ওদেশের শিক্ষার্থী, সমালোচক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিকোণ প্রত্যক্ষ করলেই সে সত্য স্পষ্ট হয়।

ওদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বাজানো অর্কেস্ট্রার টেপ রেকর্ড সাংবাদিকদের বাজিয়ে শোনান হয়। 'আড়ানা' রাগের ওপর প্রায় আধ ঘণ্টা বাজনা। সেতার, সরোদ, চেলো, গীটার, তবলা আরো নানারকম বাদ্যযন্ত্রে এই রাগভিত্তিক অর্কেস্ট্রা শুনে কে বলবে—এ বাজনা বেজেছে অ-ভারতীয় শিষ্য-শিষ্যাদের হাতে। খাঁ সাহেব এই অর্কেস্ট্রা পার্টির নাম দিয়েছেন 'সেকেন্ড মাইহার ব্যান্ড।'

দি নিউ ইয়র্কের জনৈক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রসঙ্গে আলি আকবর বলেন, 'বিটোভন ও মোজার্ট আমার অতি প্রিয় শিল্পী। এঁদের রচিত সঙ্গীতধারা আমি সরোদে বাজিয়ে থাকি, ওনলি দি মেলডিজ অফ কোর্স। ভায়োলিন এবং চেলো বাজাতেও আমার ভাল লাগে। আমার বাবা যে চাইতেন দেশী-বিদেশী সবরকম উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতই আমি শিখি। তাঁর মত হোলো এই যে পৃথিবীর সকল রকম ক্লাসিক্যাল

সঙ্গীতের [illegible] আমার [illegible] পূর্ণতম কামনা।

'আমার পরিবারের মানুষ হিসাবে সঙ্গীত আমার আত্মার ও জীবনের পরম সম্পদ। কেন আমি সঙ্গীতকে ভালবাসি, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ আমার ধর্ম—একে ভাল না বেসে আমার উপায় নেই।'

রবীন্দ্র সদনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

২২ ডিসেম্বর। রবীন্দ্র সদনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি শ্রোতা রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছেন বহুদিন বাদে যন্ত্রসঙ্গীতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ওস্তাদ আলি আকবরের বাজনা শোনার জন্যে। শিল্পী আসরে এসে বসতে তাঁদের হর্ষধ্বনি থামতেই চায় না। অনুষ্ঠান পরিবেশক শ্রীজ্যোতিষ গাঙ্গুলি জানালেন—সেদিনের সংগীত-সন্ধ্যা গুরু আলাউদ্দিনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত হচ্ছে। স্বর্গত গুরুর পত্নী শ্রীযুক্তা মদনমঞ্জরী দেবী (৯০ বছর বয়স্কা) ঠিক এই কারণেই উপস্থিত ছিলেন। সামনের সারিতে বসা—ছোটখাট সরল মানুষটিকে দেখে অতীতের অনেক কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল গুরু আলাউদ্দিনের সুকঠোর সংগীত সাধনার নীরব ও একনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন ইনি। হয়ত সেজন্যই দীর্ঘকাল সংসার সম্বন্ধে চিন্তা-মুক্ত হয়ে সেই মহাসাধক তাঁর সঙ্গীত-তপস্যায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন।

পিতা ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থেই আলি আকবর বাজনা সুরু করলেন আলাউদ্দিন খাঁ সৃষ্ট 'হেমবেহাগ' রাগ দিয়ে। কিন্তু রাগের অন্তর্নিহিত ভাবগাঢ়তা শ্রোতাদের ছড়ি পরতে না পড়তেই শিল্পীর ধ্যান ব্যাহত হয় মাইকের অমায়িকতায় যন্ত্রের সুরবিচ্যুতিতে, সর্বোপরি নতুন চামড়া লাগানো সরোদের অবাধ্যতায়। এত-গুলি দুর্বিপাকে বাজাবার মেজাজ পাওয়াটা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু যন্ত্রের ওপর অসাধারণ কর্তৃত্ব ও দীর্ঘ-কালের সাধনা-লব্ধ শক্তির বলে সব কটি বাধাকেই অনায়াসলব্ধ দক্ষতায় অতিক্রম করে জোড়ের অংশে আলি আকবর আবার ফিরে এলেন আপন অবিচলিত মানে। লক্ষণীয় বস্তু হোল এই যে, যন্ত্রের বিরোধিতার কারণে বা যে জন্যই হোক শিল্পী অলংকার, তেহাই অথবা লম্বা তানকে সম্পূর্ণভাবেই এড়িয়ে গেছেন। ছোট্ট তান ও ধ্রুপদী মেজাজের সন্দেশ দিয়ে রাগের মর্যাদা-গম্ভীর ছবিটি এঁকে গেলেন কয়েকটি আঁচড়ের সীমিত পরিসরে। কিন্তু তার মধ্যে থেকে গেল যে অসীমের বাজনা তা রসিকচিত্তকে অভিভূত না করে পারে?

গৎ ধরলেন 'মাঝ খাম্বাজে'—জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে কাজভোলা মাঝির উদাস গানের সুর, ভিজে মাটির গন্ধ সব মিলিয়ে লোকসঙ্গীতের মূল রূপটি অনাহত রেখেও ক্ল্যাসিক্যাল ধাঁচে পরিস্ফুট করে আলি আকবর তাঁর অতুলনীয় বাদনশৈলীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু আলি আকবরীয় ভাব ও কল্পনার পূর্ণরূপ পাওয়া গেল দ্বিতীয়ার্ধের দরবারী কানাড়া-র আলাপে। এই রাজকীয় রাগের সংহত বেদনার মর্যাদাব্যঞ্জক ভাবটি গ্রি-সপ্তক মীড়ের একটি অনুরণনেই মূর্ত হয়ে ওঠে। এরপর স্ব-সৃষ্ট একটি রাগের গৎ পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হোল। 'সাহানা' ও 'শ্যামবতী'র মিলন-সৃষ্ট এই রাগে ভাব-কারুণ্যের সঙ্গে ছন্দের বিদ্যুৎগতি যুক্ত হয়ে জীবনের বেদনা ও আনন্দভরা পলাতক মুহূর্তের ক্ষণিক মাধুর্যলোকে যেন মনকে পৌঁছে দেয়।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় রসঘন 'পিলু' রাগাশ্রিত ঠুংরি দিয়ে, যেখানে নানারঙা পুষ্পস্তবকের মত আনন্দসুন্দর রাগ-মালা সংগীত লক্ষ্মীর চরণে অর্পণ করলেন তাঁর বরধন্য ভক্ত। আলি আকবরীয় রীতিতেই তাঁর সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় তবলিয়ার পরিবর্তে সঙ্গত করেছেন তরুণ এবং উদীয়মান জাকির হোসেন। ইনি সুখ্যাত আল্লারাখার পুত্র। খাঁ সাহেব এঁকে প্রশস্ত অবকাশ দিয়েছেন সকল কলাকৌশল বিশদ-ভাবে প্রদর্শনের। জাকিরের ঠেকা সুস্পষ্ট সুন্দর, সাথসঙ্গতও আনন্দদায়ক। তবে সওয়াল জবাবে তাঁকে আরো তৈরী হতে হবে। আর একটি কথা—আমোদপ্রিয় অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের হাততালি মিললেও এ ধরণের বাজনা অন্তর্মুখী সংগীত-চিন্তার প্রতিকূল। আলি আকবরের মত সিদ্ধনাদী যন্ত্রের সঙ্গে এ ঠেকা চলতে পারে এবং তাঁর মত উদার-হৃদয় সকলরকম চাপল্য সস্নেহে মেনে নেবার মত শক্তি রাখে। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করতে হলে তাঁকে আরো বিবেচক ও সংযত হতে হবে।

নৃত্যনাট্যে আশা পারেখ ও গোপীকিষণ: সম্প্রতি কলামন্দির আয়োজিত এক নৃত্যনাট্য কোলকাতার কলারসিক মহলে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু ছিল দক্ষিণ ভারতের এক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বিত 'চোলা দেবী'। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীকানাই-লাল মুন্সী ও 'ধূমকেতু'—নৃত্যরচনাকারী সর্বশ্রী গোপীকিষণ, মালতী পান্ডে, কেদার বাবু প্রমুখ ভারতের প্রায় ১২ জন উচ্চাঙ্গ নৃত্যশিল্পী।

নৃত্যনাট্যের নায়ক নটরাজ গোপীকিষণ, নায়িকা শ্রীমতী আশা পারেখ। জনতার উল্লেখ বাহুল্য। মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্যকুশলা, রূপান্বিতা দেবদাসী চোলার রূপলাবণ্য ও লীলায়িত ছন্দে মুগ্ধ রাজা ও তার পারি-বারিক দ্বন্দ্বের সুরুতেই শত্রু-আক্রান্ত নগররক্ষার্থে তাঁর যুদ্ধযাত্রা, বিজয়, প্রত্যা-বর্তন ও রাজ্যের কল্যাণার্থে দেবদাসীর আত্মত্যাগ। এই ত্যাগই তাকে দেবীত্বে পৌঁছে দেয়।

কাহিনী রূপায়ণে যেটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল তার ক্ষতিপূরণ ঘটেছে শ্রীমতী আশা পারেখ, গোপীকিষণ ও অন্যান্য সকলের নৃত্যাভিনয়ে। এঁরা সবাই শুধু নৃত্য-শিল্পীই নন, [illegible] রীতিমত শিক্ষা [illegible] ও [illegible] অধিকারী।

উদ্দেশ্যমোতাবেক [illegible] কোনো মিলন নেই। [illegible] সারেই ভারতনাট্যম, কথক, [illegible] নৃত্যের অবতারণা করা [illegible] নৃত্য তার যথাযথ [illegible]

মন্দিরের নৃত্যাঙ্গনে আশা [illegible] বেশন করেছেন ভারতনাট্যম [illegible] সঙ্গে প্রণয় নিবেদন কথককে, [illegible] নৃত্যে লোকনৃত্যের ছাঁদে। কথক [illegible] সঙ্গে তাঁর পুষ্পকলির মত [illegible] হিল্লোল অনিন্দ্যনীয়। কিন্তু [illegible] লেগেছে লাস্যবিলাসিত [illegible] মধুরভাবের নায়িকা আশা [illegible] যায় না শুধু নৃত্যমুখরতার জন্য নয় [illegible] কুশলতার কারণেও। প্রেমিক [illegible] উজ্জ্বলতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে [illegible]-কিষণের উজ্জ্বল নৃত্যে। [illegible] বিষন্নতার চিত্তগ্রাহী [illegible] ভঙ্গিতে।

পরিচয়-লিপি না থাকায় সকলের নাম জানি না। কিন্তু কাপালিক, রাণী ও খল প্রণয়ীর ভূমিকাকারীদের নৃত্যাভিনয় দেখে স্তম্ভিত হয়ে [illegible] বাঙালী শিল্পীরা আজও [illegible]

সংগীতপরিচালক অবিনাশ [illegible] ভূমিকায় চন্দ্রকোষ, নাটভৈরব ও অন্যান্য রাগে রাজসভার দরবারী মেজাজ ও মন্দিরের [illegible] ভাবকে উদ্ভাসিত করেছেন। [illegible] কল্পনা আরো উন্নতমানের হওয়া উচিত। এই উপভোগ্য সন্ধ্যার জন্য কলামন্দির কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

সাংস্কৃতিকী হাওড়া: গত ৩ ডিসেম্বর ১৯৭২, সন্ধ্যায় 'সাংস্কৃতিকী হাওড়া'র ১৫তম মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সংস্থার কার্যালয় ১।১, চৌধুরীপাড়া লেনে। অনুষ্ঠানে 'পুরাতনী গান' পরি-বেশন করেন শিল্পী চণ্ডীদাস মাল। শিল্পী শ্রীমালের গাওয়া 'সে কেনরে করে অপমান', 'ওমিয়াবে ঘানেওয়াজে (শোরি মিয়া)' এবং 'কেন কর অভিমান' গানগুলো প্রত্যেই প্রসংশনীয়। সংস্থা এই উপলক্ষে সুন্দর একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

—[illegible]

রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার শেষে স্কোর বোর্ডের অবস্থা

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারত ২৮ রানে জিতে ইংল্যাণ্ডের অগ্রগতি ধরে ফেলেছে। বর্তমানে দুই দেশেরই একটা করে খেলায় জয়।

বি. এস. চন্দ্রশেখর
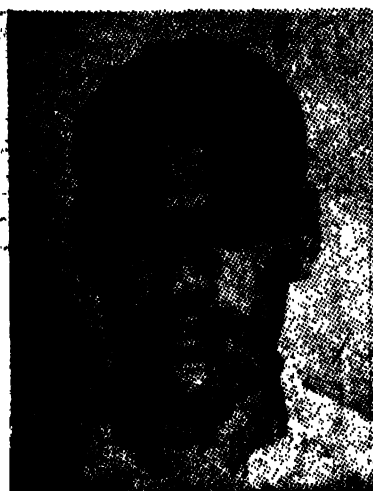
ইংল্যাণ্ড নয়াদিল্লীর প্রথম টেস্টে ৬ উইকেটে জিতে ১—০ খেলায় এগিয়েছিল। এই দুই দেশের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের এখনও তিনটে টেস্ট খেলা বাকি।

সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইংল্যাণ্ডের এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি 'বেদী এবং চন্দ্রশেখরের ম্যাচ' নামে ইংল্যাণ্ড-ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের জয়লাভের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বেদী এবং চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছিল সব থেকে বেশী। বেদী ৬৮ রানে ৫টি এবং চন্দ্রশেখর ৪২ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ৪র্থ দিনে লাঞ্চের ২৬ মিনিট আগে ভারতের ২য় ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে যায়। এই অবস্থায় খেলার বাকি ৫৫৫ মিনিটে জয়লাভের জন্যে যেখানে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে ১৯২ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে ঐ সময়েরই মধ্যে ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ইংল্যাণ্ডের ১০ জন খেলোয়াড়কে আউট করা। অর্থাৎ খেলার এই শেষ পর্যায়ে জয়লাভের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যান এবং ভারতের বোলারদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা ভারতের বোলারদের তুলনায় তাঁদের সহজ দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেননি। অপরদিকে ভারতের বোলাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ১০টি উইকেট নিয়ে খেলায় জয়লাভের ব্যাপারে বোলারদের ভূমিকার বিরাটত্ব প্রমাণ করে দিয়েছেন। শেষ দুদিনে নাটকীয়ভাবে খেলার গতি পরিবর্তনের দরুণ ক্রিকেট অনুরাগী মহলে যে উত্তেজনা, উদ্বেগ এবং আনন্দের ঝড় বয়ে গেছে তার তুলনা বিরল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের ১৭ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেটের পতনের পর ৫ম উইকেটের জুটিতে টনি গ্রীগ (৬০ রান) এবং মাইক ডেনেস (২৮ রান) ৮৮ রান তুলে ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলার গতি ফিরিয়ে আনেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যাণ্ডের পূর্ব দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান গ্রীগ এবং ডেনেস যখন ২য় ইনিংসের খেলা পুনরায় আরম্ভ করেন, তখন ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্য আরও ৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল, অপরদিকে ভারতের জয়লাভের

বিষেণ সিং বেদী
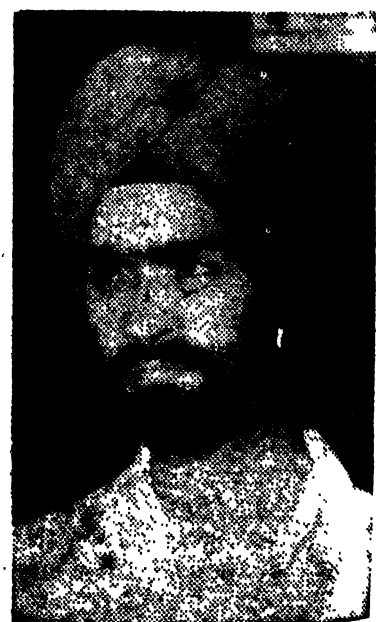
জন্যে প্রয়োজন ছিল ইংল্যান্ডের বাকি ৬ জন খেলোয়াড়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আউট করা। ক্রমশঃ-ক্রমশঃ খেলার হাওয়া ইংল্যান্ডেরই অনুকূলে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে বেদী এবং চন্দ্রশেখরের বোলিং সাফল্যে ভারতের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে গিয়ে ভারতকে জয়যুক্ত করে।

ভারতের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্যে দলের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। ভারতীয় খেলোয়াড়রা আত্মরক্ষামূলক খেলার ওপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন। প্রথম উইকেট জুটি গাভাস্কার এবং পার্কার ৮৮ মিনিট খেলে মাত্র ২৯ রান তুলেছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের এই অতি মন্থরগতিতে ব্যাট করার কোন সঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংল্যান্ডের বোলাররা কোন সময়েই ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে বল দেননি। তবে ইংল্যান্ডের ফিল্ডিং খুবই ভাল হয়েছিল, বিশেষ করে উডের। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি লুইস বোলার পরিবর্তনের ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম দিনের লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিল ৫৩ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ১১০ (৫ উইকেটে)। প্রথম দিনের ৩২০ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ ১ম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৪৮ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন সোলকার (১৯ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার (২৬ রান)। তাঁদের অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে এইদিন ৪৮ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ১৫ মিনিট আগে ভারতের ১ম ইনিংসের খেলা ২১০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা শেষ ৫টা উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ১৪৮ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ৬২ রান যোগ করেছিল। ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেছিলেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ফারুক ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর এই ৭৫ রানে ছিল ১০টা বাউন্ডারী।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ডের ৬টা উইকেট পড়ে মাত্র ১২৬ রান উঠেছিল। অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার অসুস্থ থাকায় এই দিনে খেলতে নামেননি। তাঁর বদলে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। ইঞ্জিনীয়ার খুব তাড়াতাড়ি বোলার বদল করায় ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা হাত জমিয়ে খেলার সুযোগ পাননি। তাঁর এই বোলার বদলের কৌশলে ইংল্যান্ডের ৬ জন খেলোয়াড় খেলা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ২৫ মিনিট আগে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ১৭৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৩৬ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডেরও পক্ষে সর্বোচ্চ রান (৩৫) করেন তাদের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অ্যালান নট। দলের কনিষ্ঠ খেলোয়াড় গ্রিগ ওল্ড ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ১২১ রান সংগ্রহ করেছিল। সেলিম দুরানী ২০৪ মিনিট খেলে তাঁর অপরাজিত

রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতের জয় : মাঠে দর্শকদের বন্যা নামার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে খেলোয়াড়রা ছুটেছেন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে ভারত এবং ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়বৃন্দ

... করেন। তাঁর এই ... ছিল ৭টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। এখানে উল্লেখ্য, ১ম টেস্টে তিনি দলভুক্ত হননি। ইন্দোরে এম সি সি-র বিপক্ষে তিনি নটআউট ৮১ রান করার সুবাদে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হন; কিন্তু ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে মাত্র ৪ রান করে দর্শকদের হতাশ করেছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, কলকাতার এই ২য় টেস্টের ২য় ইনিংসে তিনি ... ৩৩ রানের মাথায় পোককের বল বাউণ্ডারীতে পাঠালে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে এক হাজার রান পূর্ণ হয়ে ১০০৩ রান দাঁড়ায়।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস মাত্র ... রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা ১৪ মিনিট খেলে ২য় ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটে মাত্র ৩৪ রান যোগ করেছিল। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ৩২৪ মিনিট স্থায়ী ছিল।

বাকি ৫৫৫ মিনিটের খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯২ রান তুলতে ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪র্থ দিনেই ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১০৫ রান তুলে নেয়। ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলার ভিত খুবই আলগা হয়েছিল। মাত্র ১৭ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। বেদী ৩৮ রানে ৩টে এবং আবিদ আলি ১২ রানে ১টা উইকেট পান। খেলার এক সময় বেদীর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল : ওভার ৬-৪, মেডেন ৪, রান ৭ এবং উইকেট ৩। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল, খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যাণ্ডের আর মাত্র ৮৭ রান দরকার। তাদের হাতে তখনও ৬টা উইকেট এবং একদিনের খেলার সময় জমা আছে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের ৬ মিনিট পর ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ১৬৩ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ২৮ রানে জিতে যায়। ইংল্যাণ্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯২ রানের থেকে ২৯ রান কম সংগ্রহ করেছিল। পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভের ... তাদের জয়লাভের জন্যে যেখানে ৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে তারা বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ২১০ রান (ওয়াদেকার ৪৪ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৭৫ রান। কোট্টাম ৪৫ রানে ৩, ওল্ড ৭২ রানে ২ এবং আণ্ডারউড ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ও ১৫৫ রান (দুরানী ৫৩ রান। ওল্ড ৪৩ রানে ৪ এবং গ্রিগ ২৪ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ১৭৪ রান (নট ৩৫ এবং ওল্ড নট আউট ৩৩। চন্দ্রশেখর ৬৫ রানে ৫, প্রসন্ন ৩৩ রানে ৩ এবং বেদী ৫৯ রানে ২ উইকেট)

ও ১৬৩ রান (গ্রিগ ৬৭ এবং ডেনেস ৩৩ রান। বেদী ৬৩ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ৪২ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্থান

প্রথম টেস্ট খেলা

এডিলেডে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৪ রানে জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনে পাকিস্তান ১ম ইনিংসের ৭ উইকেট খুইয়ে ২৫৫ রান সংগ্রহ করেছিল। ৭ম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম এবং উইকেটকিপার ওয়াসিম বারি দলের ১০৪ রান তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ২৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ৩৬৩ রান সংগ্রহ করে ১০৬ রানে এগিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার আয়ান চাপেল যে ১৯৬ রান করেন তা তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান। এই নিয়ে তিনি টেস্ট খেলায় ... সেঞ্চুরী করলেন।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৫৮৫ রানের মাথায় শেষ হলে তারা পাকিস্তানের ১ম ইনিংসের ২৫৭ রানের থেকে ৩২৮ রানে এগিয়ে যায়। এই দিন অস্ট্রেলিয়া তাদের ১ম ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ২২২ রান যোগ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার রডনি মার্শ ১১৮ রান করেন। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপারের পক্ষে সেঞ্চুরী করার নজির এই প্রথম।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২১৪ (৯ উইকেটে)। এইদিন তারা ৬ উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ১১১ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে ১০৩ রান যোগ করেছিল।

পঞ্চম দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় অর্থাৎ পূর্ব দিনের রান-সংখ্যার মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৪ রানে জিতে যায়। শেষ দিনে মাত্র ৯ মিনিট খেলা হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ২৫৫ রান (ইন্তিখাব আলম নট আউট ৬৪ এবং ওয়াসিম বারী ৭২ রান। ম্যাসী ৬৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ২১৪ রান (সাদিক মহম্মদ ৮১ রান। ম্যালেট ৫৯ রানে ৮ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৫৮৫ রান (আয়ান চাপেল ১৯৬, রডনি মার্শ ১১৮ এবং এডওয়ার্ডস ৮৯ রান। মুস্তাক মহম্মদ ৬৭ রানে ৩ উইকেট)

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৯২ রানে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এডিলেডের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১১৪ রানে জয়ী হয়েছিল। তাদের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের আর একটা খেলা বাকি।

খেলার পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪২৫ রানের মাথায় শেষ হলে পাকিস্তান জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৯৩ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। তাদের হাতে খেলার সময় ছিল ৩২৫ মিনিট। পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৯২ রানে জিতে যায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১·০৪
ষাণ্মাষিক	টাকা ০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ ৩য় খণ্ড

৩৮ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 19th January, 1973 শুক্রবার, ৫ মাঘ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রেমিক সৈনিক ঃ

তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরের নীচে হিমশীতল পরিখার অভ্যন্তরে যে দুর্ধর্ষ সৈনিক ক্লান্ত বিষণ্ণ মুহূর্তে প্রেয়সী জীবনসঙ্গিনীর প্রেমসুন্দর মুখখানি কল্পনা করে উদ্দীপ্ত হতে পারে, রণে প্রেমে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই ব্যক্তি যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ কি? আর অসাধারণ বলেই না স্যার উইনস্টন চার্চিল ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় পুরুষ! সম্প্রতি লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক, বৃটেনের তিমির রাত্রির অতন্দ্র প্রহরী উইনস্টন চার্চিলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের এক পরিখা থেকে পত্নী শ্রীমতী ক্লেমেন্টাইনকে লেখা যে পত্র ক'খানি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঐ যোদ্ধা রাষ্ট্রনায়কের চরিত্রের আর একটি দিক উদ্ভাসিত করেছে।

যুদ্ধের তখন এক ভাটার সময়। শীতার্ত ফ্রান্সের এক অজ্ঞাত প্রান্তরে কর্দমাক্ত পরিখার অভ্যন্তরে শত্রুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন তরুণ সৈনিক উইনস্টন চার্চিল। নজর শত্রুর আশঙ্কিত আগমনের পথের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও মন পড়ে আছে প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনী ক্লেমেন্টাইনের কাছে। তিনি লিখছেন ঃ 'প্রিয়তমাসু, নারীর হৃদয় যে কত কোমল ও প্রেমময় হতে পারে তা তোমার সংস্পর্শে এসেই জেনেছি। তুমি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছ, তাই আজ এত সুখী আমি।

প্রেমিক সৈনিক অকপটে জানাচ্ছেন ঃ প্রতি রাত্রে তোমার ছবি আমি চুম্বন করি, আর প্রাণাধিকাসু, তার পরেই ভাবি যদি তুমি কাছে থাকতে তবে চুমোয় চুমোয় তোমার মিষ্টি মুখখানি ভরিয়ে দিতাম।

অভিযোগও আছে অনেক চিঠিতে, সে অভিযোগ ভুলে থাকার, চিঠি না দেওয়ার। অভিমানক্ষুব্ধ প্রেমিক সৈনিকের জিজ্ঞাসা—পরিখায় বন্দী স্বামীকে রোজ শত শত চিঠি না লিখে তুমি কেমন করে থাকতে পারো? তারই মধ্যে, ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে ক্লেমেন্টাইন (দয়াবতী) যখন লিখলেন—সময় চলে যায় আর প্রেমের সবটুকু চুরি হয়ে যায় সেই সঙ্গে, পড়ে থাকে শুধু বন্ধুত্ব—তখন অভিমানাহত স্বামীর সে কী আর্ত প্রতিবাদ ঃ ওগো প্রিয়তমা, তুমি বন্ধুত্বের কথা লিখোনা, আমি তোমার 'বন্ধুত্ব' চাই না। তুমি সম্পূর্ণরূপে শুধু আমার। তোমার আমার প্রেম সময় চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না। যতদিন যাবে সে প্রেম ততই হবে গভীর ও ঘনীভূত।

পরিণত বয়সে, পূর্ণ মর্যাদায় স্যার উইনস্টন চার্চিল ১৯৬৫ সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সেই ইতিহাস-পুরুষের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে তাঁর প্রিয়তমা ক্লেমি—লেডি স্পেন্সার চার্চিল আজও জীবিত আছেন। তাঁরই অনুমোদনক্রমে 'টাইমস' পত্রিকায় চার্চিলের পত্রগুচ্ছটি প্রকাশিত হয়।

করুণাময়ী ঃ

মৃত সন্তান যীশুর ক্লান্ত এলায়িত দেহ কোলে নিয়ে সাশ্রু নয়নে, নতনম্র মুখে বসে আছেন করুণাময়ী জননী মেরী,—ভ্যাটিকান প্রাসাদে সংরক্ষিত মাইকেল এঞ্জেলোর সেই অমর সৃষ্টি 'পিয়েতা' কিছুদিন আগে এক উন্মাদের কঠিন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভেঙে পড়েছিল। সে উন্মাদের ধারণা ছিল সেই যীশু, সুতরাং করুণাময়ী (পিয়েতা) জননীর কোলে স্থানলাভের অধিকার তারই। তাই সে অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে এমন আঘাত হেনেছিল যাকে যে বিশ্ববন্দিত ঐ মূর্তিটি হয়ত চিরকালের জন্য মানবজাতির রত্নভান্ডার থেকে অপসৃত হল বলে আশঙ্কা হয়েছিল সেদিন।

কিন্তু ক'দিন আগে ভ্যাটিকান প্রাসাদ থেকে এক সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে। সংবাদ শুনে মনে হচ্ছে, ঐ উন্মাদটি বোধহয় ভাল কাজই করেছিল সেদিন। ভ্যাটিকান প্রাসাদের সংরক্ষক জানিয়েছেন, মূর্তিটি শুধু যে ত্রুটিহীনভাবে সারানো হয়েছে তাই নয়, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে মূর্তিটির আরও যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকট হয়ে উঠেছিল সেগুলিও এবার ভাল করে সংশোধিত করা হয়েছে। ফলে মূর্তিটি যাঁরা আগে দেখেছেন তাঁদের পরিমার্জিত মূর্তিটি বোধহয় আরও ভাল লাগবে এবং যাঁরা দেখেননি তাঁদের শাশ্বত ভাস্করের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি প্রথম দর্শনের মুগ্ধ চমক হয়ত আরও বেশি হবে। তবে ভবিষ্যতে আবার যাতে কোন অঘটন ঘটতে না পারে তার জন্য এবার উনিশ মিলিমিটার পুরু বুলেট-অভেদ্য কাঁচের আড়ালে মূর্তিটিকে রাখা হবে।

আবার মৃত্যুদন্ড ঃ জীবনের বদলে জীবন—এই পুরানো তত্ত্ব অত্যন্ত প্রতিশোধাত্মক ও অমানবিক বিবেচিত হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিছক হত্যাকান্ডের জন্য মৃত্যুদন্ড ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধেরও চরিত্র বদল হতে থাকায় মৃত্যুদন্ড সম্পূর্ণ লোপ সম্ভব কিনা— এ নিয়ে মত বিরোধ ঘটে সমাজতাত্ত্বিক মহলে। এমন অনেক অপরাধ ইদানিং প্রায়ই ঘটছে যা সাধারণ হত্যাকান্ডের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর ও গুরুত্বপূর্ণ, এবং যাকে কোনমতেই ক্ষমা করা যায় না। এইসব অপরাধের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল বিমান ছিনতাই। মুখ্যত রাজনৈতিক কারণে যারা বিমান ছেনতাই-র মতো ভয়ংকর কাজে লিপ্ত হয় তারা অবশ্য প্রাণের মায়া না রেখেই সে কাজ করে। কিন্তু যদি মৃত্যুদন্ড রদের ঢালাও বিধানের মধ্যে বিমান ছিনতাইকারীদের অপরাধকেও গণনা করা হয় তাহলে বিমান-পথে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়বে, যা এখনই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্প্রতি বিমান ছিনতাইকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করার কথা সরকারিভাবে চিন্তা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট গত জুন মাসে মৃত্যুদন্ডকে সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষণা করে। তারপর বিভিন্ন জেলে আটক মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত তিন শতাধিক ব্যক্তির দন্ডদান স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু গত নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ক্যালিফোর্ণিয়া প্রমুখ কয়েকটি রাজ্যে মৃত্যুদন্ড সম্পর্কে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হলে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের বেশিভাগই এখনও মৃত্যুদন্ড বহাল রাখার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেল ক'দিন আগে ঘোষণা করেছেন, মানুষ অপহরণ, সরকারি ভবনে বোমা নিক্ষেপ, বিমানছিনতাই ও কারারক্ষী হত্যাকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইন প্রণীত হবে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

বিজ্ঞান গবেষণায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি সমাজজীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সূচনা করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক প্রয়োগ বহুযুগের পশ্চাদপদতা দূর করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এনে দিয়েছে। পশ্চিমী জগতে বিজ্ঞানীরা নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করে জনকল্যাণের জন্য তার প্রয়োগ করছেন। তার খানিকটা সুফল অনুন্নত দেশগুলোতেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজস্ব পরিবেশে প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানীরা যদি তাঁদের গবেষণার ফল দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারেন তাহলে সামাজিক অগ্রগতির পথ সুগম হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা নিতান্ত কম দিনের নয়। আমাদের বিজ্ঞানীরা পরাধীনতার যুগেও স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন নানাক্ষেত্রে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামণ, ডাঃ হোমি ভাবা, বিক্রম সরাভাই, প্রশান্ত মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা দুনিয়ার বিজ্ঞানীসভায় মহৎ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের দেশ দরিদ্র। তার প্রয়োজন যতটা আর্থিক সাধ্য তার চেয়ে কম। তার ফলে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা ব্যয় করতে পারি না। জওহরলাল নেহরুর সময়ে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সরকার অগ্রণী হয়ে দেশের নানা জায়গায় বিজ্ঞান গবেষণাগার গড়ে তোলেন। সি এস আই আর এ-র মারফৎ তরুণ বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে নিত্যনূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের জন্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অর্থব্যয় করতে না পারায় বিজ্ঞান গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি এখনও হয়নি। অনেক তরুণ বিজ্ঞানকর্মী স্বদেশে ভাল সুযোগ না পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন বিদেশে যাঁরা গবেষণারত তাঁদের আমরা স্বদেশে আনতে পারছি না। অবশ্য জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারের মতো খ্যাতনামা তরুণ বিজ্ঞানী স্বদেশ সেবার জন্য ভারতে ফিরে এসেছেন, এটা খুবই আশার কথা। এঁদের মতো বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে দেশ অনেক আশা করে। তাঁদের কাজের জন্য চাই অবাধ সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় অর্থ।

কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম যোজনায় বিজ্ঞান গবেষণায় জন্য জাতীয় আয়ের অন্তত এক-শতাংশ ব্যয়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা খুবই সময়োপযোগী এবং আশাব্যঞ্জক। এতকাল সরকারী ভান্ডার থেকেই বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ব্যয় করা হত। বেসরকারী সংস্থার ব্যয় ছিল সামান্য। বিজ্ঞান বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসি সুব্রমণ্যম জানিয়েছেন, পঞ্চম যোজনায় বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বড় বড় ব্যবসায় সংস্থাগুলোর উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কর বসাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত বৃহৎ ব্যবসায় সংস্থাগুলোকেই এই উন্নয়ন কর দিতে হবে। এতে সরকারী রাজস্ব বাড়বে আনুমানিক তিনশো কোটি টাকা। এই অর্থ একটি কেন্দ্রীয় ভান্ডারে জমা হবে। যে সমস্ত কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়নকর্ম সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তারা এই অর্থের ভাগ পাবেন তাঁদের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। শিল্পোন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় আয়ের এই অর্থ ব্যয় করা হবে। সমাজের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগই হবে কাম্য। ভারতবর্ষের সমাজের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যুগোপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পারে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সচেতন থাকতে হবে।

বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে গবেষণা হবে অর্থহীন। আমাদের শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাবে না। সম্প্রতি চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ এম ভগবন্তম দুঃখ করে বলেছেন যে, উদ্বোধনের দিনে চার হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও, পরে মাত্র ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সময়। বিজ্ঞান কংগ্রেসকে যদি নিছক মেলার মতো ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিনিধিরা একে বেড়াবার সুযোগ হিসাবে গণ্য করেন তাহলে দেশবাসী এ ধরনের সম্মেলন থেকে কী আশা করতে পারে। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্মেলনে যে-সমস্ত গবেষণাপত্র পড়া হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল নিচু মানের এবং দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। বিজ্ঞানীদের কাছে দেশের মানুষের প্রত্যাশার অন্ত নেই। পশ্চিমী দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের মতো মৌলিক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের প্রত্যাশা আমাদের বিজ্ঞানীদের কাছে নিশ্চয়ই দেশবাসী করতে পারে। তা ছাড়াও বিজ্ঞানের প্রয়োগ কীভাবে সমাজ উন্নয়নে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে করা যায় তার নির্দেশ দেশবাসী চায় বিজ্ঞানীদের কাছে। কেতাবী বিদ্যা বা গবেষণার চেয়ে ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণাই আমাদের দেশে বেশি জরুরি। সবেমাত্র বৃহৎ শিল্পযুগে আমরা পা দিতে যাচ্ছি। কোথায় কোন শিল্পের সম্ভাবনা বেশি সে তথ্য আমরা চাই বিজ্ঞানীদের কাছে। যন্ত্রের পাশাপাশি জনবল কীভাবে ব্যবহার করা যায় তাও বিজ্ঞানীরা আমাদের বলে দিতে পারেন। কারণ পশ্চিমী দেশগুলোর মতো স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক উৎপাদনের চেয়ে আমাদের জনশক্তিকে কাজে লাগানো সামাজিক অবস্থা বিচারে খুবই প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আমাদের নিজস্বতা বিকাশের সময় এসেছে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে ধার-করে-আনা যান্ত্রিক বা কারিগরীজ্ঞান দিয়ে দীর্ঘদিন আমাদের কাজ চলতে পারে না। প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে যাতে আমাদের সামাজিক বাস্তবতা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা আমরা প্রয়োগ করতে পারি সামাজিক কল্যাণে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আজ কাম্য।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে পত্রিকা ভবনে আয়োজিত বৈষ্ণব সম্মেলন ও স্মৃতিসভায় (ডান-দিক থেকে) উদ্বোধক প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কবি পান্না মাইতি, সভাপতি ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে।
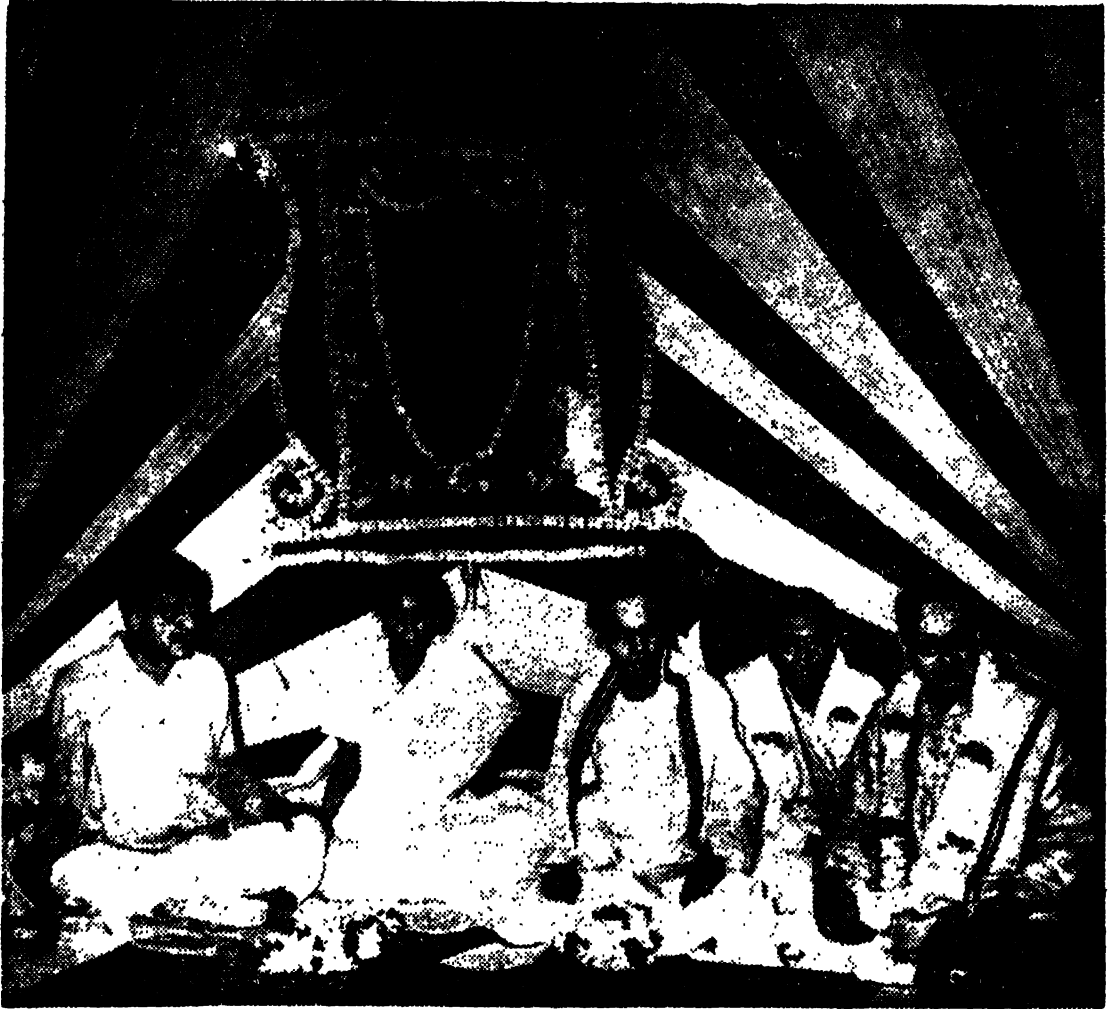
মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ১৯৬১ সালে খুব ভাল ফসল হয়েছিল। ভারতের ফুড কর্পোরেশন আশা করেছিলেন, সে বছর ঐ অঞ্চল থেকে দু লাখ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেখান থেকে যে খাদ্যশস্য পেয়েছিলেন তার পরিমাণ আট লাখ টন, অর্থাৎ প্রত্যাশার চারগুণ।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মনমাদ শহরে ফুড কর্পোরেশন তৈরি করেছিলেন সারা মহারাষ্ট্রের মধ্যে তাঁদের বৃহত্তম গুদাম।

আজ যদি কেউ সেই মনমাদ শহরে যান তাহলে তিনি কি দেখতে পাবেন! সন্দেহ নেই, তিনি দেখতে পাবেন একটা ভয়ংকর আকালের ছায়া। মনমাদের সেই গুদামে আজ কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের সঞ্চয় রয়েছে তা জানা নেই, তবে মাত্র তিন বছর আগে যেখানকার মানুষ মাঠভরা ফসলের হাসি দেখেছিলেন সেখানে আজ অন্নের জন্য হাহাকার উঠেছে। কোথাও দুবছর, কোথাও তিন বছর আকাশে বৃষ্টি নেই, মাটিতে রস নেই, গ্রামের মানুষের ঘরে খাবার নেই, কাজ নেই, পানীয় জল নেই। হাজার হাজার গরু জল ও খাবারের সন্ধানে অসহায়ভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। কাজের ও খাদ্যের সন্ধানে শহরে চলে আসছেন গ্রামের মানুষ।

শুধু মহারাষ্ট্রই নয়, গুজরাট, রাজস্থান, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যেও অন্নের জন্য এই হাহাকার উঠেছে। সরকারিভাবে কোথাও 'দুর্ভিক্ষ' কথাটা কারও

করা হচ্ছে না তাহলেও অবস্থাটা যে খুবই কঠিন সেটা অস্বীকার করা হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক পক্ষকালের মধ্যে সাতটি রাজ্যে ঝটিকা সফর করে এই ভয়ংকর আকালের চিত্র দেখে এসেছেন। সফর থেকে ফিরে এসে পোলিশ বেতারের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে খরার প্রকোপ চলছে। তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, সামনে খুবই দুর্দিন আসছে। এবারকার খরায় শিকার হয়েছে গোটা এশিয়া। তাই অন্য দেশ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা ভারতের পক্ষে কঠিন হচ্ছে—একথা শ্রীমতী গান্ধী মনে করিয়ে দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের প্রায় দুই কোটি মানুষ এই খরার কবলে পড়েছেন বলে প্রকাশ। কারও কারও মতে স্মরণকালের মধ্যে মহারাষ্ট্রে এত ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ অগ্র দেখা যায় নি। সরকারি হিসাবে, রাজ্যের ২৬টি জেলার মধ্যে ২১টি অর্থাৎ ৩৫,৬০০ গ্রামের মধ্যে ২৭০০০ গ্রামে 'দারুণ অন্নকষ্ট' দেখা দিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের যেসব জেলা আকালের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল আমেদনগর। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী আন্নাসাহেব সিন্ধে এই আমেদনগরের অধিবাসী। তিনি যখন সারা দেশের মানুষকে এই বলে অভয় দিচ্ছেন যে, যথেষ্ট খাদ্যশস্য আছে, বিদেশ থেকে আরও আনান হচ্ছে এবং রবি ফসলের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল তখন তাঁর নিজের জেলার সাতটি তালুকের মানুষ অন্নকষ্টে পীড়িত হচ্ছেন—এটা ঘটনার পরিহাস।

ওসমানবাদ জেলার ২৮ বছর বয়স্ক তরুণ কেশবরাও সিন্ধে এখন বোম্বাইয়ের এক বস্তির বাসিন্দা। শহরের নরিম্যান পয়েন্টে তিনি ইমারতি মালমশলা নামান-ওঠানর কাজ করছেন। অথচ, সম্পন্ন চাষী বলতে যা বোঝায় কেশবরাও তাই। কেননা, গ্রামে তাঁর জমির পরিমাণ ১৫০ বিঘা।

৬০ একর জমির মালিক অমরচাঁদ সানাপের তিনটে কুয়োর (তার মধ্যে দুটিতে বৈদ্যুতিক মোটর লাগান আছে) কোনটিতেই এক ফোঁটা জল নেই। এখন তাঁর পরিবারের ১৯ জনের মধ্যে ছজন সরকারি ত্রাণ প্রকল্পে পাথর ভাঙার কাজ করছেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার যেসব ত্রাণ প্রকল্প চালু করেছেন সেগুলির মধ্যে প্রধান হল এই পাথর ভাঙার কাজ।

একজন সাংবাদিক মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে সফর করে এসে তাঁর রিপোর্টের এক জায়গায় লিখেছেন, 'পাথর ভাঙার কেন্দ্রগুলিতে আমরা যা দেখে এসেছি সেটাই এই সফরের সবচেয়ে বেদনাময় স্মৃতি। দুর্ভিক্ষপীড়িত-দের কাজ পাওয়ার প্রধান সূত্র হল এই পাথর ভাঙার কেন্দ্রগুলি। জেলায় জেলায় জিপ গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা এই ধরনের অসংখ্য কেন্দ্র দেখেছি। ......মার্দিতে টালু পাহাড়ের গায়ে দু মাইল জুড়ে রয়েছে পাথরকুচির চৌকাগুলি। ১৩৫০ জন চাষী চার মাস ধরে পরিশ্রম করে এই চৌকাগুলি তৈরি করেছেন। হাতুড়ির এলোপাথাড়ি ঠুকঠাক আওয়াজে এখানকার স্থির বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠছে। ...যেসব বুড়ো মানুষের ছেলেদের হাল ধরার আর তাঁদের নিজেদের গল্পগুজব করে সময় কাটাবার কথা তাঁরা পাথর ভাঙছেন, যদিও কাঁধের উপর হাতুড়ি তোলার মত শক্তি তাঁদের নেই। ৭০ পার হয়ে যাওয়া এক বুড়ি মানুষের মত ফুঁসতে ফুঁসতে হাতুড়ি ঠুকছেন। আর একজনের কাছে গেলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছেন 'দিনে আমি এক টাকার বেশি কামাতে পারছি না। সেই টাকাও আমি গত তিন সপ্তাহ যাবৎ পাই নি। এই করতেই কি আমার জন্ম হয়েছিল?'

আলোক চিত্র : বিশ্বনাথ গোস্বামী

ঐ সাংবাদিক আরও লিখেছেন, 'সানতানাতে...পাঁচশ মানুষ কাজ করছেন। ...হলিউডে রোমান যুগের যেসব ছবি তোলা হয় সেগুলির দৃশ্য যেন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই দৃশ্যের সঙ্গে রোমান প্রভুদের জন্য কর্মরত দাসদের দৃশ্যের লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে।'

পাথরভাঙার মত নিরর্থক কাজ না করিয়ে যেসব ছোটখাট ধরনের সেচের কাজ করালে স্থায়ী উপকার হতে পারে তা করান হচ্ছে না কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা কর্তৃপক্ষরা বলছেন, ঐ ধরনের কাজ করাবার জন্য যন্ত্রপাতি, ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে।

অবশ্য পাথরভাঙা ছাড়া অন্য ধরনের কাজও যে হচ্ছে না তা নয়। যেমন আওরঙ্গাবাদ জেলায় ত্রাণ প্রকল্পে ৩৬৫০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করান হয়েছে।

কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কর্মহীন, জীবিকাহীন মানুষকে কাজ ও খাদ্য যোগাবার সমস্যা বেড়েই চলেছে। দুর্গত মানুষের চাহিদা যে হারে বাড়ছে, সেই হারে কর্মসংস্থান করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলার কর্তৃপক্ষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। আওরঙ্গাবাদ জেলায় ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাস্তা তৈরির যে প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ কাজের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ত্রাণ প্রকল্পগুলিতে কাজ করছিলেন ১,৭৬,০০০ মানুষ। জানুয়ারি মাসের গোড়ায় সেই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর, ফেব্রুয়ারিতে পাঁচ লাখ গ্রামবাসীর কাজ যোগাতে হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে অনেক ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়েছে; কিন্তু সেগুলিতে খাদ্যশস্যের যোগান খুবই অনিয়মিত। ফলে দুর্গত মানুষ বেসরকারি মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের শিকার হচ্ছেন।

আর একটি বড় ভাবনা গরুর ভাবনা। গরু যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তাতে এর পর যদি বৃষ্টি নামেও তাহলেও গরুর অভাবেই চাষ মার খাবে।

* * *

বিলাতের টাইমস পত্রিকায় লুই হেরেন সম্প্রতি লিখেছেন, 'মিঃ লে ডুক থো প্যারিসে যা করতে চাইছেন সেটা ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনার অতিরিক্ত একটা কিছু হতে পারে। মনে হচ্ছে, তিনি ও তাঁর সরকার যেমন ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেণ্ট জনসনকে পথে বসিয়েছিলেন সেভাবে তাঁরা যেন প্রেসিডেণ্ট নিকসনকেও খতম করতে চাইছেন।'

লুই হেরেন আরও লিখেছেন, 'ফরাসীরা প্যারিসেই পরাজিত হয়েছিল দিয়েনবিয়েন ফুতে নয়। আর সেই ঘটনায় ফ্রান্সের ইতিহাসই বদলে গিয়েছিল।...... আর একদফা প্রচন্ড বোমাবর্ষণের ঝুঁকি নিয়েও উত্তর ভিয়েতনামীরা যেভাবে (প্রেসিডেণ্ট নিকসনের সর্তগুলি নিয়ে) আলোচনা করতে অস্বীকার করছে তাতে মনে হয় যেন তারা আমেরিকার ইতিহাসও বদলাতে চাইছে।'

যে পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে সেটা হল এই যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অর্থাৎ আইনসভার সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট নিকসনের প্রচন্ড বিরোধ বাধছে। এই বিরোধের ফলাফল ভবিষ্যতে আমেরিকার বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বলে, সরকার যেমন রাষ্ট্রের একটি শাখা আইনসভাও তেমনি একটি শাখা এবং গুরুত্বে দুইই তুলমূল্য। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এই তত্ত্বটা কার্যত কোনভাবেই মান্য হচ্ছিল না। প্রেসিডেণ্টই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠছিলেন। এই নিয়ে মার্কিন সিনেট ও প্রতিনিধিসভার সদস্যদের ক্ষোভ চরমে ওঠে গত বছরের শেষের দিকে। প্রেসিডেণ্ট কারও সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে, কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে উত্তর ভিয়েতনামে প্রচন্ডতম বোমা বর্ষণের হুকুম দিয়েছেন সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে সরকার ও আইনসভার সমমর্যাদার কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই অসংগতির প্রতিকার করার জন্য এবার কংগ্রেস বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তাঁরা যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছেন অতীতে আর কখনও তেমন হয় নি।

ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, এবার মার্কিন কংগ্রেসে প্রাধান্য রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক দলের। আর প্রেসিডেণ্ট নিকসন হচ্ছেন রিপাব্লিকান দলের নেতা। উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধলে কতদূর গড়াবে বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে দুটি ব্যাপারে এই বিরোধ বেশ জোর পাকিয়ে উঠেছে। সিনেটের বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রজার্স ও প্রেসিডেণ্টের বিশেষ পরামর্শদাতা ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারকে তলব করা হয়েছিল। তাঁরা দুজনেই সেই তলব মানতে অস্বীকার করেছেন প্রেসিডেণ্ট নিকসনের হুকুমে।

পালটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মার্কিন কংগ্রেস বলছেন, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য উচ্চ পদে যাঁদের মনোনয়ন করা হয়েছে তাঁদের নিয়োগ তাঁরা অনুমোদন করবেন না। মার্কিণ সংবিধানের নিয়ম এই যে, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এইসব নিয়োগ কার্যকর হয় না।

১৩-১-৭৩ —পুণ্ডরীক

রতন ও স্বপ্নের মানুষ

তুলসী সেনগুপ্ত

ক্ষুদে চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে রতন তাকিয়ে দেখতে লাগল বংশীলালের খেলা। ভিড় ঠেলে যে কাছে এগুবে এমন ক্ষমতা রতনের নেই। ছেলের দল ওকে দেখলেই পেছনে লাগে; 'নুলো রতন হ্যাংলা' বলে বিরক্ত করে মারে। কিন্তু আজ অনেকদিন পর মনে হ'ল রতনের, পাড়ার ছেলেরা নতুন রসে মজেছে। মোহনপুরা অনেকদিন পরে যেন নতুন কিছু পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলেগুলো কেউ-ই ওর দিকে চেয়েও দেখছে না, এটা ভাবতেই রতনের বুকটা ভীষণ হালকা হয়ে যায়। আবার নজরে পড়লে গা-পিত্তি জ্বলতে থাকে। 'শালা রতন কী কারো খায় না পরে? যে নুলো রতন হ্যাংলা বলে ওর পেছনে লাগবে। 'মনে মনে ভাবে রতন, আসলে ছেলেগুলো এক-একটা শোর-এর বাচ্চা। নইলে কার পাকা ধানে মই দিয়েছে রতন যে, ওকে অমন করে জ্বালাবে। এসব ভাবনা বংশীলালের খেলা দেখার ফাঁকে কেন যে এল ভেবে পায় না রতন। এসব ভাবনা না ভেবে পিচুটি-ভরা ক্ষুদে চোখজোড়ায় বিস্ময় জাগিয়ে তুলে রতন ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকে বংশী-লালের খেলা। বংশীলালের খুতনির কাছে নেমে এসেছে জুলপি, চামড়া-সার রোগা ডিগডিগে চেহারা, লাল চোখ, দেখলে ভয় হয়, এই মানুষটাই এতগুলো ছেলেকে, শুধু ছেলে কেন, ছেলেদের বাপ-মায়েদেরও অভিভূত করে দিয়েছে খেলা দেখিয়ে। আর সংগে সংগে নিজের ওপর একধরনের ঘৃণা পেপঁচিয়ে ধরতে লাগল রতনকে। মনে মনে নিজেকেই গাল পাড়ল সে। আর সে গালাগালটা নিজের কানেই কীরকম বেখাপ্পা ঠেকল। ভাল লাগল না রতনের নিজেরই।

অনেক কষ্টে একটা উঁচুমতন ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বংশীলালের খেলা দেখায় মন দিল রতন। হারু মাস্টার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'রতন, তোর তো বেশ বুদ্ধি হয়েছে। সবাই কেমন ভিড়ে গুঁতো-গুঁতি করছে, আর তুই...বেশ, বেশ রতনা, বুদ্ধিই হচ্ছে সব; বুদ্ধি নেই তো কিছু নেই।' আপন মনেই যেন কথাগুলো বলে হারু মাস্টার পাশ কেটে চলে যায়। খেলা দেখা ভুলে গিয়ে হলদেটে দাঁত বের করে হাসে রতন। মনে পড়ে তার গোপালও ঠিক এই কথাই বলেছিল ওকে একদিন। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল রতনের। মাটির ঢিবিটা থেকে অতি সন্তর্পণে নেমে রতন ধীর পায়ে এগুতে লাগল বাড়ির দিকে। মাথার ওপরের আকাশটা ঝকঝক করছে। ঘাড় কাত করে আকাশটাকে দেখবার চেষ্টা করল। বিরাটাকার একটা আয়না যেন কেউ বসিয়ে রেখেছে আকাশটার গায়। ফলে চোখদুটো কেমন যেন ঝলসে গেল। ভাল করে আকাশটা দেখতে পেল না। পেছন থেকে বংশীলালের দলের ঢোল বাজনার শব্দ কানে এল। ডুম-ডুম-ডুম.. আর ভেসে আসছে বংশীলালের রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ... 'কলকাত্তাকা বংশীলাল দেখায় দুনিয়ার হালচাল, আও বাবু দেখো, ভানুমতীকা খেল'। বংশীলালের খেলা দেখায় মন দিলেও কেন যেন মনটা উড়ু-উড়ু করতে লাগল। মাথার ভেতরে হারু মাস্টারের কথাগুলো বড় বেশী তোলপাড় শুরু করে দিল। আর মনে পড়ল গোপালকে। ছোটবেলায় বসন্তে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল গোপালের। সমস্ত মুখ জুড়ে চাকা-চাকা দাগ। সেই গোপাল একদিন ওকে বলেছিল, 'বুঝলি রতনা, স্রেফ বুদ্ধি; বুদ্ধিই হচ্ছে সব। এই যে ভগবান আমার চোখ নিল, মুখটা এমন খাবলে খুবলে ছেড়ে দিল, আমি কী শালা তোর মতন পরের পাত চাটি'।

নুলো রতন রাগ করতে পারেনি ও কথায়। কেননা, গোপালের কথাটা শুনতে যতই খারাপ হোক, আসলে কথাটা খুব খাঁটি। এমন একটা দিন নেই, যেদিন ওর বাড়ির লোক ওকে গালাগাল না দিয়ে ভাত মুখে দেয়। গত রাতের কথাই মনে পড়ে গেল রতনের। কে বলবে বীরু আর সমু ওর আপন মায়ের পেটের ভাই। রতনের সঙ্গে কোন মিলই নেই ওদের। লেখাপড়া শিখেছে, দামী জামা গায় দেয়, ফর্সা ধবধবে জামা প্যান্ট ময়লা হতে না হতেই বগলদাবা করে নিয়ে চলে যায় লণ্ড্রীতে, সিগারেট ফোঁকে। পথ চলতি রতনের সামনে পড়ে গেলেও যেন দেখতে পায় না, কিংবা এমন চোখ কুঁচকে দেখে যার অর্থ, রতন বুঝতে পারে। বুকের ভেতরটা অসম্ভব গুমোট একটা অস্বস্তিতে ভরে যেতে থাকে। বীরু আর সমুর সংগে কখনো খেতে বসে না রতন। অথচ, ভীষণ ইচ্ছে করে ওদের পাশে গায়ে গা লাগিয়ে বসে বসে খেতে, গল্প

করতে। অনেক বলে কয়ে বামুন-দিদিকে রাজীও করেছিল রতন একদিন। কিন্তু রতনকে আগে থাকতেই পিঁড়িতে বসে থাকেত দেখেই ক্ষীর আর সমু কী-রকম যেন মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বামুন-দিদিকে বলেছিল, 'রাজপুত্তুরের খাওয়া হোক, তারপর আমাদের ডেকো'। অন্যদিন রতন যা হোক কিছু খায় : কিন্তু সেদিন ওর গলা দিয়ে কোন কিছুই যেন নামছিল না।—অনেক কষ্টে ভয়ে ভয়ে চোরের মত নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছিল রতন। সকলের ওই ধরনের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা রতন মুখ বুজে সহ্য করতো। দু-চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসতো। অনেক কষ্টে সকলের থেকে দূরে সরে গিয়ে, নদীর পাড়ের ওই বুড়ো বট-গাছটার নিচে নিজেকে আড়াল করে চোখের জল ফেলেছে। যখনই বুকের ভেতরটায় চাপ ব্যথা অনুভব করে তখনই দেখেছে রতন 'মা-মাগো' এই কটি কথা বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে। প্রচণ্ড দুঃখের মুহূর্তেই ও দেখেছে, মা যেন ওর পাশে ছায়া-মূর্তি ধরে হাজির হয়ে যায়। ও বেশ পরিষ্কার অনুভব করে তখন, মা যেন ওর মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়। আর বিড়-বিড় করে কী যে বলে মা, তা ঠিক ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না রতন। ব্যথায় টস্‌টস্ করে তার গলা বুক। চোখ-দুটো জ্বালা করতে থাকে। সবকিছু তখন তার কাছে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

রতন খুব করুণ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল গোপালকে, 'তা আমি কী করবো বল গুপীদা? ভগবান তোমায় গলা দিয়েছে, সেই গলায় তুমি গান গাও, লোকে শোনে, ভাল বলে, পয়সা দেয়। আমার তো তেমন কোন গুণ নাই।'

সেকথা শুনে এক চোখেই যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল গোপালের। রাগে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল তার। বলেছিল, 'যারা বলে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি', তারা আমার মতে মেরে-মানুষেরও অধম। বলেই হাঁফাতে থাকে গোপাল।

রতন দ্বিতীয় কোন কথা না বলে চুপ করে বসেছিল।

হঠাৎ কী হ'ল, গোপাল ওর হাতটা শক্ত করে ধরে বলেছিল, 'থেটার দেখেছিস কখনও থেটার'?

ঘাড় কাত করে উত্তর দিয়েছিল রতন, 'হ্যাঁ'।

শুনে মুখ হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল যেন গোপাল। বলেছিল, 'থেটারের রাজারাণী'... কথাটা না শেষ করেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য। তারপর এক সময় আপন মনেই যেন বলতে থাকে, 'জানিস রতনা এই কানা চোখ দিয়ে যখন জল গড়িয়ে পড়ে তা দেখে লোকে ভাবে, রাধা-কেষ্টর গান গাই, তাই ভাবের ঘোরে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আমার। কিন্তু কেউ-ই জানে না, আর জানবেই বা কী করে, মনের ব্যথা চোখে উঠে আসে, জল কাটে। তোকে বললাম এসব, তোকে বড্ড ভালবাসিরে রতনা।'

শুনে রতন বলেছিল, 'তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে গুপীদা?'

ওর দিকে কঠোর রুক্ষ দৃষ্টি হেনে বলেছিল গোপাল, 'যাও দুটো খেতে দিচ্ছে ক্ষীরু আর সমু, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এমন সব্বনেশে কথা কখনো বলিসনি'।

বোকার মত অনেকক্ষণ চেয়েছিল গোপালের দিকে রতন। তারপর কী ভেবে বলেছিল, 'তাহলে সারাজীবন আমি ওদের পাত চেটেই যাবো বলছো?'

সেকথার কোন উত্তর দেয়নি গোপাল।

এর দিনকয়েক পর ফের একদিন রতন গোপালকে বলেছিল, 'কিছুই তো বললে না। আমি কী করবো বলো?'

ধীর শান্ত গলায় গোপাল বলেছিল, 'যেমনটা বলবো, তেমন তেমন পারবি করতে?'

'কী?'

উত্তরে গোপাল হেসে বলেছিল, 'ওই যা বলেছিলাম, থেটার, থেটার করতে হবে। মেয়েছেলেদের দেখেই কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে হবে, মা, মা জননী, তিনদিন খাইনি মা, বড় জ্বালা মা, ঘরে ছোট ছোট ভাই-বোন...পারবি বলতে?'

সব শুনে চুপসে গিয়েছিল রতন। করুণ গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'তার চেয়ে তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল'—কেন যে ওরকম কথা বলেছিল রতন, তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। গোপালের সামনে এলেই কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে যায়। এক-চোখো গোপালের মুখে যে কী আছে, তা সঠিক না জানলেও, গোপালকে তার বড় আপন বলে মনে হয়।

অনেক দূরে থেকে ভেসে আসছে বংশী-লালের গলা। অদ্ভুত এক রহস্যময় জগতের দুয়ার খুলে যায় রতনের কাছে। কী রকম সকলকে বেকুব বানিয়ে বংশীলাল রুমালে বাঁধা আংটি সকলের চোখের সামনে থেকে উধাও করে দেয়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের হাত ধরে নাড়া দেয় বংশীলাল আর অমনি জিলিপী ঝরে পড়তে থাকে। যারা রতনকে 'নুলো রতন হ্যাংলা' বলে জ্বালায় তারা সব চুপসে যায়। মুখ চোখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তা দেখে আর সকলে হো-হো ক'রে হাসে। আর অমনি দে-দৌড়, দে-দৌড়। পালিয়ে যায় সকলে। রতনের মনটা সে সব দেখে খুশীর প্রজাপতি হয়ে ওঠে. ভাবে, বংশী-লালের মত যদি কোন কৌশল সেও আয়ত্ত করতে পারতো তবে সেও ওই খচ্চরদের ঢিট করতে পারতো। একটু এগুতেই লক্ষ্য করল রতন, দূরে দুটো নেড়ী কুত্তা কীসের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। আর ঠিক তারই ওপর বৃত্তাকারে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ডানা ঝাপটাচ্ছে কাক-শকুনের দল। রতন বুঝতে পারে, পচা-গলা কিছু একটা রয়েছে সেখানে, নুলো হাতটাকে অনেক কষ্টে উপরে তুলে নাক চাপা দিল। রোদ্দুরের ঝাঁঝ আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে। অনেকক্ষণ আগে থেকেই চোখদুটো জ্বালা করছিল—এখন পচা গন্ধের সঙ্গে কাক-শকুনের ওড়ার দৃশ্য চোখে পড়তে, আরও যেন জ্বালা করে উঠল। মনে হ'ল রতনের, ওর দু-চোখের শাদা জমিতে কেউ বুঝিবা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। বংশীলালের রোগা হাড় জিরজিরে চেহারাটা স্পষ্ট ভেসে উঠল আর একবার। বংশীলালের রক্তজবা চোখের দিকে চেয়ে কেন যেন মনে হয়েছিল রতনের,

[illegible] একমাত্র রতনের মতই মরো, কিংবা ভাগারের গলিত কোন মৃত-দেহ, যার ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ছেলে-বুড়ো মেয়েরা, কুত্তা আর কাক-শকুনের দলের মত। মনে মনে একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করল। রতনের মাংস খেয়ে খেয়ে ওদের অরুচি ধরেছে, আজ তাই বংশীলালের শরীরটাকে ভুক্করের দল চেটে-পুটে খাচ্ছে।

* * *

জোঁকার মত ও একা একা নিরিবিলিতে নদীর পাড়ে বসে সময় কাটায়। দেখে, পাড়ে বক-শালিকের দল খুঁটে খুঁটে খায় কত কী। উপরের আকাশে যেগুলি শাদা মেঘ মন্থর গতিতে একপাশ থেকে আর এক পাশে সরে যায়। সময় যে কীভাবে কেটে যায় রতন জানে না, বুকের মাঝে একরাশ ব্যথার চাপ সে সময় টের পায় না রতন। এভাবে সারারাত যদি এমনি নদীর পাড়ে বসে থাকে, বাড়ি না-ও ফেরে, তবে কেউ-ই তার খোঁজে আসবে না। 'মা-মাগো'—! একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরোয় মুখ দিয়ে। চোখদুটো জল-খাপসা হয়ে আসে। ভাবনার অদৃশ্য ভেলায় চড়ে ভাসতে থাকে রতন! মনের মাঝে গোপালের কথাগুলো আবার যেন শুনতে পায় ও। 'থেটার করতে হবে, থেটার'। হাসি পায় রতনের। আবার কষ্টও হয়। ওখান থেকে উঠে পড়তে গিয়েই নজরে পড়ে কাউকে ছাতকুড়ি [illegible] ওরই মত নিঃশব্দে বসে রয়েছে। দীর্ঘদিনের মধ্যে আর কাউকে এই নদীর পাড়ে বসে থাকতে দেখেনি। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়নি। হালকা এক ধরনের আলো তখনও ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। একটু এগিয়ে গেল রতন। বুঝি বা অকারণেই মুখ ঘোরাল লোকটা। অমনি রতনের বুকের মাঝে মাদলের দ্রিমি 'দ্রিমি উঠল। সকলের চোখের রহস্যময়মানুষ বংশীলাল বসে রয়েছে সেখানে। অতি উৎসাহে দ্রুত পা বাড়াল রতন।

বংশীলাল ওকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ও বংশীলালের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল।

বংশীলাল ধমক দেবার সুরে বলে উঠল, যা ভাগ'।

রতন একটু সরে গিয়ে ফের দাঁড়িয়ে রইল। কী মনে করে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে ম্যাজিক শেখাবে'?

সেকথায় বংশীলাল হেসে ফেলল। বসে, 'ম্যাজিক। হাঃ হাঃ হাঃ'!

সেই শব্দে চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা চুর-মার হয়ে গেল। পরে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল রতনকে। কোন সংকোচ বা দ্বিধা কিছুই ছিল না রতনের। সে একসময় বংশী-লালের গা ঘেঁষে বসে ওর গায়ের স্পর্শ গন্ধ নেবার চেষ্টা করল।

ডান হাতটা রতনের ঘাড়ে তুলে দিয়ে ধীর গলায় বংশীলাল বলে, 'তু লিখাপড়া করিস না'?

রতন ম্লান হাসল সে কথায়। বংশী-লালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'ভানুমতী তোমাকে খেলা শিখিয়েছে?'

খুব যেন একটা হাসির কথা বলল রতন। হাসতে হাসতে বলল 'হাঁ হাঁ ভানু-মতী'! ভানুমতীর নামটা অদ্ভুত ভাবে উচ্চারণ করল বংশীলাল।

রতন জিগ্যেস করল, 'ভানুমতীকে তুমি চেনো? আমাকে চিনিয়ে দেবে?'

বংশীলাল গম্ভীর হয়ে গেল সে কথায়। বলল, 'কো-ই চিনে না ভানুমতীকে। কুলো-দিন পারবে ভি না'।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বংশীলাল। রতনের পিঠে সস্নেহে হাত রেখে ওর নাম জিগ্যেস করে বসল, 'যা বাড়ি যা'। বলেই ঋজু পায়ে এগিয়ে গেল বংশীলাল।

রতন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল, রহস্যময় এই মানুষটা ফিকে অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশই

মিশে যেতে যেতে একেবারেই হারিয়ে গেল। এক সময় নিজেও উঠে পড়ল রতন।

আজকে হাটবার। অনেক চেনা-অচেনা মানুষের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করছে মোহনপুরের হাট। হাটে যাবার জন্য অদ্ভুত অদৃশ্য একটা টান অনুভব করল রতন। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল হাটের দিকে। দূরে থেকে পথের পাশে বংশীলালের তাঁবু নজরে পড়ল। আর অমনি বুকের ভেতরটা গুড়্‌গুড়্‌ করে উঠল রতনের। মনে পড়ে গেল বংশীলালের খেলা দেখাবার সময়কার কথাগুলো, 'কলকাত্তাকা বংশীলাল, দেখার দুনিয়ার হালচাল'। আর মানুষজন পরিবেষ্টিত বংশীলালের খেলা দেখাবার সময়কার বিশেষ ভঙ্গীটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেন এ-জগতের কেউ নয়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একজন বিশেষ রহস্যময় মানুষ ও। বাজনার তালে তালে লাল চোখের মণিদুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোয়। বিশেষ করে বছর আটেকের ছেলেকে একটা চুবড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে শানিত ছুরির ফলা বের করে উদ্‌ভ্রান্তের মত যখন বিড়-বিড় করে বংশীলাল, তখন লোকটাকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয়। কথা বলতে বলতে অদ্ভুত হাসে বংশীলাল, আর সেই হাসি আরও রহস্যঘন হয় ঢোলের ডুম ডুম ডুম বাজনার মধ্যে। এসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে পথ চলে রতন— অকারণেই হঠাৎ বুকের মাঝখানটা হিম হয়ে আসে। সমস্ত শরীর তখন থির-থির করে কাঁপে। পাদুটোকে ভীষণ ভারী মনে হয়। পা-দুটো অসম্ভব ভারী ঠেকলে কী ভেবে রতন বসে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য সেখানে। আস্তে আস্তে ভয়ের মেঘ কেটে যায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শরীর-মন শক্ত হয়ে গেলে পর তাঁবুর দিকে এগোয় রতন। দেখে তাঁবুর চার পাশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে পোড়া কাঠের টুকরো, কয়েকটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, শুকনো কলাপাতা, আরও কত কী। কয়লাটা রেখা ওঠা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। হঠাৎ নজরে পড়ে রতনের, তাঁবুর একটা খুঁটে দড়ির ওপর ঝুলছে রঙিন জামা-কাপড়, এমন কী ঝকমকে খানা শাড়ীও। তাঁবুর ভেতরে কী কেউ আছে? থাকলে নিশ্চয়ই ওদের কথাবার্তা কানে আসতো। তবুও ভরসা পেল না ভেতরে ঢুকতে। পর্দা সরিয়ে উঁকি মারতেই 'কওন, কওন হ্যায়'—বাজ পড়ার মত গলায় কে যেন গর্জে উঠল কথাগুলো। মুহূর্তে শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল রতনের। গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর দেয়, 'আমি রতন দাস'।

—'আ, ভিতর আ'।

ভিতরে গিয়ে দেখল লোকটা বংশীলাল নয়। জবরদস্ত এক বিশাল পুরুষ, আর তার গা ঘেঁষে বসে রয়েছে এক সুন্দরী মেয়ে। দু-চোখ ভরে দেখতে গিয়ে, সংকোচ হল ভীষণ, রতনের। ওকে অমন করে চেয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা হেসে উঠল। ফলে মেয়েটার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইল সেই জবরদস্ত লোকটা। এমন মধুর সুরেলা হাসি কী মানুষ হাসতে পারে? রিণ্‌-রিণ্‌ করে আওয়াজ উঠছে। মানুষটা ওর সামনেই মেয়েটাকে আদর করল। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট বোলাল। সেই লোকটা মেয়েটার দিকে একবার রতনের দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে বলল 'আঃ তু হামার সব দুঃখ দূরে করিয়ে দিলি, তু হাসলে হামার নেশা হোয়', পরক্ষণেই রতনের দিকে চেয়ে বলল, 'তু রোজ আসিস ইখানে, আমার পাখিকে তু হাসালি, তু বড় ভাল ছেলে রে...'। বলেই প্রচণ্ড শব্দ করে সমস্ত নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে হাসতে লাগল সেই লোকটা।

ভয়ে বিস্ময়ে রতনের বুকটা শুকিয়ে যেতে লাগল। অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধোয় 'বংশীলাল যে খেলা দেখায়, সেই ভানুমতী কী তুমি'?

মেয়েটা সে কথায় হাসতে পারল না। রতন দেখলো, সেই আলো-আঁধারি আবছা অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটা কেমন করে যেন মুখটাকে ঢাকল।

আর সংগে সঙ্গে সেই জবরদস্ত মানুষটা শব্দ করে হেসে উঠল। 'হাঁ, হাঁ-ই হচ্ছে ভানুমতী, হামার পাখি'। কথাকটি বলেই উঠে বসল লোকটা। কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ কী হলো, প্রাণখোলা হাসি হাসল লোকটা। মেয়েটার দিকে নজর যেতেই দেখতে পেল মেয়েটার মুখ অসম্ভব রক্তহীন, সমস্ত কপাল জুড়ে বিজবিজ করছে ঘাম।

ভীষণ রকমের এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করল রতন। শুধোল, 'কিন্তু বংশীলাল যে বলে ভানুমতীকে কেউ-ই চিনতে পারে না'?

'ঠিক, ঠিক বলেছে বংশীলাল'। কথাকটি বলেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল লোকটা। পরে মেঘ ডেকে উঠল গলায় তার, 'এ শালা হারামখোর বংশী ইধার আ...'।

কথা শেষ হতে না হতেই বংশীলাল মাথা গোঁজ করে এসে হাজির হল।

'এই শালা গোয়রাবা'? লোকটা হুকুম জারী করল বংশীলালের দিকে চেয়ে।

আর অমনি দেখলো রতন সকালের তেজস্বী বংশীলাল অনুগত ভৃত্যের মত লোকটার পায়ের কাছে বসে, পা টিপতে লেগে গেল।

রতন উঠে দাঁড়াল। ওকে উঠতে দেখে, ওরা কেউ-ই কোন কথা বলল না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রতন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভূষোকালির মত চতুর্দিকটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। উপরের আকাশে দু-চারটে পাখি পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে একবারের জন্য চমকে পেছন ফিরে দেখল রতন। তাঁবুর ভেতর থেকে সেই আগেকার মত চুনুচুনু করা হাসির শব্দ কানে এল। গোপালের কথাটা মনে পড়ল ঠিক সেই সময় রতনের। 'থেটার থেটার করতে হবে তোকে'। ভাবল, বংশীলাল পাকা থেটারের লোক। এখন কেমন পোষমানা সাপের মত জবরদস্ত লোকটার পা টিপে দিচ্ছে। চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। নুলো হাতটাকে অনেক কষ্টে, চোখের কাছে টেনে তুলে চোখের ওপর রাখল। কেন যেন অকারণেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে রতনের।

মহীশূরের হ্যালেবিড মন্দির

শ্রবণ বেল গোলা

শেষ বর্ষায় মেঘে আকাশ সেদিন মেদুর। ধারাবর্ষণ হয়ে গেছে দুপুরে আর বিকেলে।
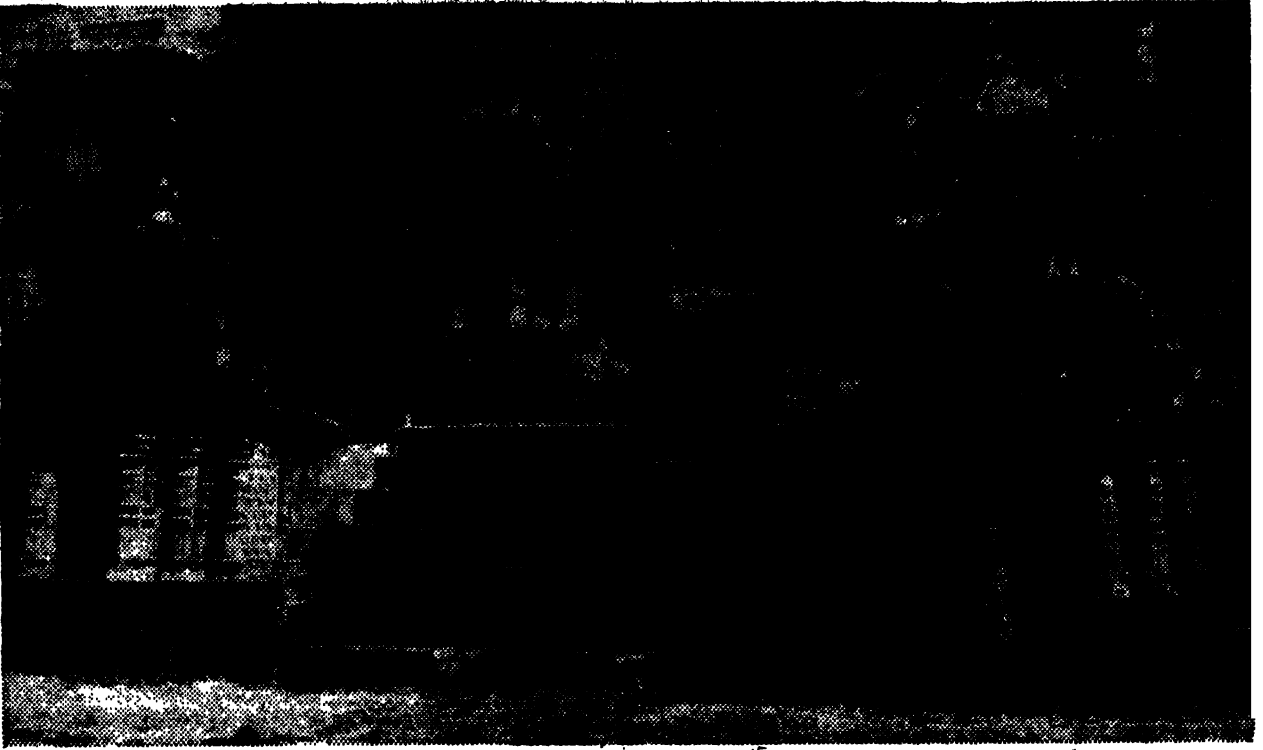
সন্ধ্যার পরও টুপ টুপ করে বৃষ্টি করে পড়ছিল উঠানে পেয়ারা পাতার ফাঁক দিয়ে, কাঁঠাল পাতার ফাঁক দিয়ে।

মোটঘাট বেঁধে রওনা হলাম স্টেশনে, রাত দশটার ট্রেন। মাইশোরের মানে মহীশূরের কয়েকটা জায়গা দেখবার ইচ্ছে। অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা বর্ষণসিক্ত, এলোমেলো সজল হাওয়া ট্যাক্সির কাচের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, সুন্দর কাচের অবগুণ্ঠনে ঢাকা আলোগুলি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে, অপার রহস্যময় লাগছে রাত্রির ব্যাঙ্গালোরের পথ। পথের পাশের গথিক ধাঁচের বাড়ীঘর, ফুলবাগান, মাঠ-ময়দান আর নিবিড় পত্রপল্লবে ঢাকা গাছপালা।

স্টেশনে দাঁড়ানো গাড়ি মোটর ট্যাক্সিগুলোর গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা জল লেগে রয়েছে, চক চক করছে বাতির আলোয়। বৃষ্টির মধ্যেও লোক চলাচলের বিরাম নেই। অহর্নিশি মানুষের গতি অব্যাহত।

ট্রেন আসতে তখনো কিছু সময় বাকি। তাকিয়ে দেখছিলাম স্টেশনের লোকজন। দক্ষিণীদের সঙ্গে বাঙালীর চেহারার খুবই সাদৃশ্য। শ্যামলা রঙ, শীর্ণ দেহ দক্ষিণ ভারতীয় নরনারীর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বুঝি বাংলারই কোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন আসতে আমরা ছোট একটি কুপেতে উঠলাম।

জন-কোলাহলমুখর স্টেশন পেছনে পড়ে রইল। গাড়ি সবেগে ছুটে চলল কোন অজানার দিকে।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

ট্রেন ছুটে চলেছে নিবিড় পাহাড়ী বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে। দূরে সবুজ পাহাড় শ্রেণী, নীচের উপত্যকায় বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত, তার ওপারে দূরে দূরে ইলেকট্রিকের থাম দেখা যাচ্ছে, ওই দিকেই আমাদের গন্তব্য যোগ-জলপ্রপাতের দিকে। ওখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে। ভারতে এই একমাত্র প্রদেশ মহীশূর যেখানে স্বাধীনতার আগেই গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে।

দূরে সুন্দর বাড়ীঘর, অনেক ফ্যাক্টরির দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কোন বর্ধিষ্ণু জনপদ নিশ্চয়।

স্টেশন এল। স্টেশনের পাশ দিয়ে চলে গেছে পাকা সড়ক, বস্তি, ঘরের দেয়াল, টালির ছাদ। অদূরে নদী, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভদ্রাবতী। মস্ত বড় স্টেশন। বিরাট কারখানা অদূরে। অনেক ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

ভদ্রাবতী একটি শিল্পনগরী। লোহা-স্টীল ওয়ার্কস, সিমেন্টের ফ্যাক্টরি, পেপার মিল কত কিছু এখানে। মহীশূরের জামসেদপুর।

আবার ধানক্ষেত। মেঘ-ভারে অবনত আকাশের নীচে আদিগন্ত প্রসারিত ধান-ক্ষেতের শোভা দেখে পূব বাংলার কথা মনে পড়ল।

বেলা এগারোটার সাগর স্টেশনে নামলাম। রিফ্রেসমেন্ট রুমে ঘণ্টা দুয়েক থাকতে হবে।

মধ্যাহ্নভোজন হল ওখানকার ফরেস্ট অফিসার মিঃ ওয়েলেসলির গৃহে।

মস্তবড় কম্পাউণ্ড, আর চারদিকে যে কি নিরালা, নির্জন! মিসেস ওয়েলেসলি বললেন, অভ্যেস হয়ে গেছে নিরালায় জঙ্গলে একা থাকতে থাকতে। এখন জনজ-পূর্ণ বড় শহরই বরং ভাল লাগে না। বন-জঙ্গলের গাছপালা এমন কি পশুপক্ষী

*

সবিতা সেনগুপ্ত

পর্যন্ত যে কি চমৎকার সঙ্গ দিতে পারে, আপনাকে আর কি বলবো।

বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ দুখানা গাড়ি বোঝাই হয়ে আমরা যোগ জলপ্রপাতের দিকে চললাম। মিঃ ওয়েলেসলি সপরিবারে এবং মিঃ ভাস্কর বলে আর একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী।

মিসেস ওয়েলেসলি বললেন, তাঁর বাড়ী থেকে যে কেউ যোগে যান তিনিও সঙ্গে থাকেন। যোগ জলপ্রপাত তাঁর কাছে কখনো পুরোনো হয় না।

পথ কখনো ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে। কখনো নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্রমে নীচের দিকে ঘন নিবিড় পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে এসে পড়ল। তারপর নীচের দিকে আরো নেমে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে ঘুরতে ঘুরতে এসে গন্তব্যস্থানে পৌঁছালাম।

দূরে থেকে জলপ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেঘমন্দ্রধ্বনি ভেসে আসছে যেন কোন দূরের আকাশ থেকে।

আরো এগিয়ে গেলাম।

একেবারে কাছাকাছি এসে দেখি তত-ক্ষণে ঘন কুয়াশায় সামনে দিকদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দৃষ্টি চলে না সেই কুয়াশা ভেদ করে, আর ভীমগর্জন শোনা যাচ্ছে সেই কুয়াশার পরপার থেকে।

এই যোগ ফলস্।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমরা সবাই। কাছে এগিয়ে ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালাম। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, বেশ শীত-শীত করছিল।

ডাকবাংলোর বারান্দাতে একেবারে সামনেই জলপ্রপাত। ভাবলাম মেঘাচ্ছন্ন দিন বলেই কি মেঘে ঢেকে গেল ধারাগুলি? শুধু শব্দ শোনা যাচ্ছে দূরাগত মেঘ গর্জনের মত।

আশ্বিনে যদিও দিন ছোট হয়ে আসছে, তবু মোটে ত বিকেল পাঁচটা, এখনি ত আঁধার নেমে আসার সময় হয় নি।

আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পরেই কুয়াশা সরে গেল, স্পষ্ট দেখতে পেলাম জলপ্রপাতগুলি।

শীতের কুয়াশাও নয়, বর্ষার মেঘও নয়। ভীমবেগে যে জলধারা ওপর থেকে নীচে পড়ছে, চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত সেই জলকণাগুলিই ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে বহুদূর ব্যাপ্ত করে নিবিড় কুয়াশার সৃষ্টি করছে, আর বিন্দু বিন্দু জলকণা বৃষ্টির গুঁড়োর মত চারদিকে ঝরে ঝরে পড়ছে।

আবার চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত জলকণার তৈরী কুয়াশায় দিক-দিগন্ত ছেয়ে গেল। আমরা তাকিয়ে রইলাম ঘন নিবিড় কুহেলির দিকে, আবার কিছুক্ষণ বাদে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল কুয়াশার আবরণ। দৃষ্টিগোচর হল পরিষ্কারভাবে যোগ জলপ্রপাতের চারটি ধারা, রাজা, রোরা রকেট, রানী।

এই সময় আকাশও একটু পরিষ্কার হল কিছুক্ষণের জন্য।

কবিগুরুর কবিতার পংক্তি মনে পড়ল।

'কুহেলি গেল আকাশে আলো দিল
যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।'

এমনিই হতে লাগল সারা বিকেল।

ডাকবাংলোর বারান্দার সামনে বাঁধানো চত্বর। ওপরে ছাদ রয়েছে অবশ্য। এই চত্বর জলপ্রপাতের একেবারে মুখোমুখি। সেই চত্বরে সারি সারি চেয়ার পাতা।

যার খুশি সে বসে বসে দেখছে। যাত্রীর ভীড় যথেষ্ট ছিল।

আমরা এর মধ্যে কফি পেয়ে গেছি। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসে গেলাম চেয়ারে।

ডাকবাংলোর সব কয়টি ঘর ভর্তি। আমাদের সঙ্গীরা চলে যাবেন, আমাদের থাকবার ইচ্ছে সে রাতটা।

অনেকক্ষণ পর ডাকবাংলোর প্রধান বিল্ডিং-এর পাশের বিল্ডিং-এ একটা ঘর খালি আছে জানা গেল। আমরা ওটাই দখল করলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল।

ঘুমের মধ্যেও সমস্ত রাত সেই জল-প্রপাতের বজ্রগর্জন সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ছিল। একটানা ঘুম হয়নি, থেকে থেকে গায়ের আচ্ছাদন ফেলে উঠে বসেছি আর অন্ধকারের মধ্যে জানালা দিয়ে জল-প্রপাত দেখার চেষ্টা করেছি।

দেখতে বিশেষ পাইনি আঁধারে, কিন্তু শ্রবণ ভরে গেছে প্রপাতধারার মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে।

'এই কি শব্দব্রহ্ম? বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে কে বাজাবে সেই বাজনা? উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা!' এই বিপুল জলদমন্দ্রধ্বনি শুনে সত্যিই চিত্ত আপন-বিস্মৃত হয়ে যায়। পৃথিবীতে যেন আর কিছু নেই আছে এই নির্জন পার্বত্য পটভূমিকা আর অন্ধআবেগে জলোচ্ছ্বাসের বিপুল গর্জন।

শেষ রাতে আমরা বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডে এখানে-সেখানে বাতি জ্বলছে। সামনের জটাজটিল ঘনপল্লব প্রশাখা বহুল বৃক্ষ দুটি অপূর্ব রহস্যময় লাগছে। অদূরের জলধারা কুয়াশায় দুর্নিরীক্ষ্য, প্রাঙ্গণের সম্মুখ ভাগ জলসিক্ত।

সামনে প্রপাতের নিকট থেকে কুয়াশা এগিয়ে আসতে আসতে কাছে আমাদের একেবারে কাছে এল, সামনে বহু দূরে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল জলকণাসৃষ্ট মেঘের আবরণ।

আবার কিছুক্ষণ বাদেই কুয়াশা সরে গিয়ে সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। রাত্রি শেষের স্বচ্ছ আঁধারে জলপ্রপাতের ধারা-গুলি কিছুটা আবার দৃষ্টিগোচর হল।

সকালে আবার ওইরকম।

মুহূর্তে কুয়াশা সৃষ্টি হচ্ছে, কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে যাবার পর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রপাতের ওপরের পাহাড়ের গা বেয়ে ধারা-গুলি ধারা এসে সবেগে নীচের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

কাল বিকেলে প্রধানত চারটে ধারা পাশাপাশি দেখেছিলাম। সকালে দেখলাম শীকরকণা সৃষ্ট কুয়াশা যখন সরে গেল ওই চারটে ধারার পাশাপাশি আরো কতগুলি ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে এসে সগর্জনে নীচে পড়ছে।

একটি ধারা খুবই বড় আর কি বিরাট উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যোগের ধারা এখানে সবচেয়ে প্রশস্ত।

রাজা, রোরা, রকেট রানী।

চারটে মূল ধারা।

নামগুলি বোধ হয় এদের ধরন-গাম্ভীর্য আর ঠাট-ঠমকের জন্যই রাখা হয়েছে। আটশ পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে ধারাগুলি নীচে গভীর কালো গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

আকাশ এখন বেশ পরিষ্কার নীল। জলকণার তৈরী মেঘ যখন সরে যাচ্ছে, তখন দেখতে পাচ্ছি সূর্যের আলোয় প্রপাতের ধারাগুলি রজতশুভ্র ফেনপুঞ্জসহ ভৈরব-রবে নেমে আসছে।

বিরাট পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দিগন্ত ব্যেপে চলে গেছে দৃষ্টি-সীমা পেরিয়ে। ওপারে পাহাড়ের কতদূর থেকে জলপ্রপাতের ধারাগুলি গড়িয়ে আসছে কে জানে তার ঠিকানা।

প্রপাত থেকে বিদ্যুতের জেনারেটর তের মাইল দূরে, তিন মাইল দূরে হেড-ওয়ার্কস। এটির নাম হল মহাত্মা গান্ধী হাইড্রো ইলেকট্রিকস ওয়ার্কস।

এখানে যাত্রীসমাগম প্রচুর।

ডাকবাংলোতে 'ভিজিটারস বুক' আছে, তারি চিত্তাকর্ষক সেটি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে কত লোক প্রতিবছর আসে দাক্ষি-ণাত্যের এই জলপ্রপাত দেখতে, আর কত রকমের মন্তব্য যে লিখে রেখেছে খাতাটার মধ্যে তার ঠিক নেই।

কেউ বা চাঁদের আলোয় এই ধারা দেখে প্রিয়া বলে একে সম্বোধন করে কবিতা লিখেছে, কেউবা এসেছে প্রখর গ্রীষ্মে যখন ধারার জল বিশুষ্কপ্রায় হয়ে যায় তখন। সে আবার হতাশ হয়ে বিরূপ মন্তব্যও করেছে। এমনি নানারকম মন্তব্যের মধ্যে একটি মন্তব্য হল what a waste, —মন্তব্যটি মহীশূরের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বেশ্বরাইয়ার।

যোগ ফলস্ দেখতে এসে শরাবতী নদীর বেগবতী ধারা দেখে তিনি এই নদীর বিপুল সম্পদ--সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারেন।

তাঁর মন্তব্য মহীশূরের মহারাজার কর্ণ-গোচর হল। মহারাজা তাঁকে ডেকে পাঠান এবং এ কথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করেন।

তখনো বৃটিশ শাসন অপগত হয়নি। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূর এবং ত্রিবাঙ্কুর এই দুইটি রাজ্যই সবচেয়ে অগ্রসর ছিল। প্রজাহিতকর কার্যে মহীশূররাজ কখনো কৃপণ ছিলেন না। তিনি [illegible]

চাইলেন যোগ জলপ্রপাতের যে বারিধারা যুগ যুগ ধরে পড়ে যাচ্ছে আজ সহসা স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া তাকে অপচয় বলে মনে করলেন কেন, এবং এই অপচয় নিবারিত হতে পারে কি ভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে।

জন্ম নিল হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ারই তত্ত্বাবধানে। এ'রই জন্য মহীশূরের গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলেছিল দেশ স্বাধীন হবার আগেই।

বস্তুতঃ স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। এই ব্যক্তিটির সম্পর্কে কিছু না বললে মহীশূরের যে কোন বর্ণনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ঊনশততম বৎসরেও এ'র দেহ ও মন ছিল আশ্চর্য সচল। আজ কজন ভারতীয় জানেন যে স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইযার কর্ম-জীবন শুরু হয়েছিল বম্বের পূর্ত বিভাগের একজন এঞ্জিনীয়ার হিসাবে? সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি হায়দ্রাবাদে নিজামের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং অবশেষে তাঁর নিজের প্রদেশ মহীশূরে দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রীর কর্মভার গ্রহণ করেন। মহীশূরের দেওয়ান তিনি বেশিদিন ছিলেন না। মাত্র বছর ছয়েক। এরই মধ্যে এই দেশীয় রাজ্যের এমন দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সাধন করেন যা প্রায় অবিশ্বাস্য।

এই ভারতবর্ষের শিল্প-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি নাকি ছিল এই যে সমস্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভদ্রাবতীতে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করেন এবং ইস্পাত আমেরিকায় রপ্তানি করে সেখানকার তৈরী ইস্পাতের চেয়ে কম দামে বিক্রী করে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেন।

মহীশূর শহর থেকে এগারো মাইল দূরে কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধটি, যার নীচে বিখ্যাত বৃন্দাবন উদ্যান রয়েছে শ্রীবিশ্বেশ্বরাইযারই কীর্তি। পৌনে দু মাইল এই বাঁধটি দাক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম বাঁধগুলির অন্যতম। বাঁধটির প্রবেশপথেই একটি বৃহৎ গেট দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই পাওয়া যায় নয়নাভিরাম বৃন্দাবন উদ্যান। এই উদ্যানের পুষ্পবিতানের বর্ণ ও সংখ্যা বৈচিত্র্যে এবং তাদের পরিকল্পনায় দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল উদ্যানের সঙ্গে বা কাশ্মীরের শালিমার উদ্যানের সঙ্গে তুলনা চলে।

দেশী ও বিদেশী দর্শনার্থীকে যা বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হল সপ্তাহান্তে এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবের রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলোকমালা অসংখ্য ফোয়ারার উৎক্ষিপ্ত জলকণায় যে ইন্দ্রধনুচ্ছটার সৃষ্টি করে সেই অপার্থিব দৃশ্য।

উদ্যানে বসে সমস্ত পরিবেশটিকে উপভোগ করতে বিশেষ সহায়তা করে ওখানকার হোটেলটি। ওদিকে কেবল কফি খেয়ে খেয়ে মনে আছে ওখানে ভাল চা পেয়ে অবাক ও তৃপ্ত দুই-ই হয়েছিলাম।

যে নদী থেকে যোগ জলপ্রপাতের সৃষ্টি সেই নদীর নাম শরাবতী।

কিংবদন্তী এই যে ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র একবার এসেছিলেন এখানে। তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে এখানে একটুও জল পেলেন না। তখন তিনি শরবিদ্ধ করে ধরিত্রীবক্ষ থেকে ধারাজল বার করলেন, আর তাই থেকে বেরিয়ে এল তৃষাহরা প্রাণদায়িনী ধারা নদী, নাম হল শরাবতী। শরাবতীর তীরের গ্রামের নাম তীর্থহল্লি।

সিমোগা জেলায় এটি। সমুদ্রসমতা থেকে ১৯৬০ ফিট উঁচু।

এই শরাবতী নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে। তখন শুনেছিলাম নতুন শরাবতী ভ্যালি হাইডেল প্রজেকটের উদ্বোধন করা হয়েছে কিছুদিন আগে। চল্লিশ কোটির মত টাকা খরচ হবে এতে। মহাত্মা গান্ধী হাইডেল ওয়ার্কস-এ যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় তার আটগুণ বেশি শক্তি এই নতুন পরিকল্পনায় উৎপন্ন হবে, আর এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে মহীশূর সর্বাগ্রগণ্য রাজ্য হয়ে দাঁড়াবে। এক ইউনিট বিদ্যুৎশক্তির দাম মাত্র তিন-চতুর্থাংশ পয়সা হবে। তখন শুধু মহীশূর নয়, বোম্বে মাদ্রাজ অন্ধ্র, কেরালা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেও বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। এসব শুনে বেশ ভাল লেগেছিল।

বেলা একটা দেড়টার সময় ফিরে চললাম বাসে। শরাবতী ড্যাম পেরিয়ে।

পথ একই রকম। দু-পাশে পাহাড়, মাঝে লাল সুড়কির পথ। পাহাড়ের ওপর একটানা ঘন নিবিড় সবুজ স্তবক।

কাল যখন আসছিলাম মিঃ ভাস্কর বল-

গোমতেশ্বর—অতি কায় জৈনমূর্তি

ছিলেন রাস্তাটা বড় খারাপ বাঁধানো পীচের রাস্তা হওয়া উচিত। মাইশোর গভর্নমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া উচিত একটু এদিকে। ব্যাঙ্গা লোরে বিধানসৌধের পেছনে অত টাকা ব্যয় না করে কিছুটা এই রাস্তার পেছনে দিলেও পারতো।

ব্যাঙ্গালোরের বিধানসৌধ দেখবার মত। কিন্তু এই তাক লাগানো গোছের বিরাট সৌধটির পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা নিয়ে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী হনমন্তাইয়ার বিরুদ্ধে সর্বত্র কঠোর সমালোচনা চলছিল।

বিকেল প্রায় চারটের সময় এলাম সাগর শহরে। এ অঞ্চলটি চন্দনের বন ও চন্দন-কাঠের কারুকাজের জন্য বিখ্যাত।

আমরা বাজারে চন্দন কাঠের দোকান ও তার লাগোয়া কারখানা দেখতে গেলাম। চন্দন কাঠের তৈরী ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি বাকস তার ডালার ওপর হস্তীর খোদাই করা নানারকম কৌটো চন্দনকাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী মালা ও ছোট ছোট পাখী, জীবজন্তু অনেক দেখলাম।

ছোট ছোট কয়েকটি জিনিস কেনা হল। শুনলাম দোকানের জিনিসপত্র অধিকাংশই চলে গেছে মহীশূরে সামনেই দশহরার উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হবে তাতে বিক্রীর জন্য। সেই জন্য বেশি জিনিস দেখাতে পারছে না।

মহীশূরের দশহরা গুজরাটের গণেশ চতুর্থী বা মাদ্রাজের বিনায়ক উৎসবের সম-গোত্রীয়, কিন্তু এদের ঠিক সমশ্রেণীর নয়। বস্তুত এর এত জাঁকজমক এবং আড়ম্বর দেখে বোঝা যায় না উৎসবটি জাতীয় না রাজকীয়। আর এ দুয়ের একটি যে আর একটিতে মিশে যায় মাঝে কোন সীমারেখা না রেখে সেইটেই লক্ষ্য করবার মত।

আদিতে যখন বিজয়নগর রাজবংশ থেকে এই উৎসবটি প্রবর্তিত হয় তখন হয়ত যা ছিল রাজার ব্যসন, কিন্তু এখন এটি নিঃসন্দেহে জনতার আনন্দ প্রমোদে পরিণত হয়েছে। বহু পুরাতন এই উৎসবটিকে জনতা নিজেদের বলে ভাবতে শিখেছে। এখন ত সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে পড়ে আছে শুধু গড়। তবু সেই গড়কেই পুরো এক সপ্তাহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয় এবং উৎসবের সারা অনুষ্ঠানের সব খুঁটি-নাটি বজায় রেখে সুসজ্জিত হাতীর ওপর স্বর্ণ সিংহাসনে বসে বর্তমান রাজ্যহীন রাজা শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন।

চন্দন কাঠের কারুশিল্প দেখা শেষ করে সন্ধ্যায় সাগর ছাড়লাম।

রাত সাড়ে নটা! সিমোগা স্টেশনে গাড়ি থামলো। আমাদের নামিয়ে নিতে গাড়িসহ লোক ছিল স্টেশনে, রওনা হলাম সার্কিট হাউসের দিকে।

ক্লিস্কি জেলার সদর শহর হল সিমোগা, বড় শহর প্রকাণ্ড প্রশস্ত পীচের রাস্তা। বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে জলসিক্ত রাস্তার ওপর আলোর ডোমগুলো ভিজছে জনশূন্য রাজপথ। মফস্বল শহরে যেমন হয়ে থাকে রাত দশটা না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়েছে যেন সারা শহরটি।

শহরের রাস্তা শেষ হয়ে বাইরের সড়ক সুরু হল। সুরকির পথ দুপাশে বড় বড় গাছ, রাতের অন্ধকারে কেমন রহস্যময় লাগছে।

এক সময় গাড়ি এসে সার্কিট হাউসের বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো।

রাতটাই শুধু থাকবো সেখানে। সার্কিট হাউসে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল।

খুব ভোরে উঠে দেখি চারদিকে অবারিত মাঠ দূরে পর্বতশ্রেণীর নীলাভ রেখা। মেঘমুক্ত আকাশে আসন্ন সূর্যোদয়ের রঙীন বর্ণাভাস। শীত শীত হাওয়া। আটটার মধ্যেই বাসে উঠলাম।

প্রথমে যাবো চিকমাগালুর। তারপর বেলুড় ও হালেবিতে।

বাস এগিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের উপত্যকায় মাঝে মাঝে কফি বাগান দেখা যাচ্ছে। অজস্র কফির চাষ ও ফলন এ অঞ্চলে হয়।

কফিপ্রিয় দাক্ষিণাত্যবাসী।

এক এক জায়গায় কফিক্ষেত বড় মনোরম লাগছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কফির চাষ করেছে, মাঝে মাঝেই আবার দীর্ঘশীর্ষ ইউক্যালিপ্টাস গাছের অরণ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে কফি বাগান। দূরে উপত্যকায় যেন সবুজ মখমল পেতে

নানা দিকেই বাঙালীর বসবাসের অনুকূল পরিবেশ।

তাই মনে হয় পূর্ববাংলার দুঃখী উদ্বাস্তুরা এখানেও কেউ কেউ ঠাঁই পেতে পারতেন।

সন্ধ্যার আগেই বেরুলাম বেলুড়ের বিষ্ণু মন্দির দেখতে।

কাছেই বিষ্ণু মন্দির।

যাত্রী নিবাসের পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে গেলেই দূর থেকে দেখা যায় বিষ্ণু মন্দিরের প্রকান্ড গোপুরম। একজন গাইডও মিলে গেল।

রমা রাও নাম। জাতিতে ব্রাহ্মণ। এ'র বিরাশী বছরের বৃদ্ধ পিতা মন্দিরের পুরোহিতদের অন্যতম।

এ'দের দেশ মহারাষ্ট্রে, কিন্তু দীর্ঘকাল এদিকে থাকতে থাকতে মারাঠী ভাষাও প্রায় ভুলে গেছেন।

গোপুরমের প্রবেশপথে প্রশস্ত সিঁড়ির এক পাশে জুতো খুলে রাখলাম।

গোপুরমের দুপাশে দুটি সিংহ মূর্তি।

ভিতরে ঢুকে মন্দিরের বিশাল পাথরে বাঁধানো চত্বরের মধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে মূল মন্দির, তার ওপাশেও দুটি ছোট মন্দির আছে।

মূল মন্দিরে ঢুকতে বাঁ পাশে প্রস্তর-খোদিত সিংহ মূর্তি। তার গলদেশ বেষ্টন করে আছে একটি বালক। কোন হয়শালা রাজার কিশোর বয়সের বীরত্ব কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

ডান পাশেও তাই।

বেলুড় ও হালেবিড়ের মন্দির দুটি মহীশূরের বিখ্যাত হয়শালা রাজবংশের কীর্তি।

মন্দিরের ওপরে নীচে, পাশে, দরজায়, প্রাচীরে, খিলানে, তোরণে সর্বদিকে প্রস্তর-খোদিত দেবদেবীর মূর্তি, বিষ্ণুর নানা অবতারের নানা লীলার।

ভেতরে মস্ত বড় মন্দির গৃহের মধ্যে বহু কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে।

মোট আটচল্লিশটি স্তম্ভ এবং প্রতিটি স্তম্ভ আলাদা কারুকার্যমণ্ডিত, কোনটার সংগে কোনটার মিল নেই। অজানা শিল্পীরা কোন বিস্মৃতিতে মিলিয়ে গেছেন। কালের প্রহার এড়িয়ে সজীব রয়েছে প্রস্তরের মধ্যে তাদের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি।

চেন্না কেশব অর্থাৎ কেশবসুন্দরের প্রতি উৎসর্গীকৃত এই মন্দির দর্শন করে ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে ইরাণী পরিব্রাজক আবদুর রেজাক বলেছেন যে তিনি এই অদ্ভুত মন্দিরের বর্ণনা দিতে সাহস করবেন না পাছে কেউ বলে যে লোকটা অত্যুক্তি করছে।

বিগ্রহের দিকে আরো সামনে এগিয়ে দেখলাম একটি গোল চত্বর।

রাজা বিষ্ণুবর্ধনের রাণী শান্তলা নাকি নৃত্য করতেন এখানে দেববিগ্রহের সামনে।

দ্বাদশ শতকে (১১৭১ খৃষ্টাব্দে) হয়শালা রাজবংশের রাজা বিষ্ণু বর্ধন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির ভবনের তিন দিকে তিন দরজা, পূবে উত্তরে আর দক্ষিণে। শিল্পীর চরম কল্পনা মূর্ত হয়ে আছে বিশাল দরজা-গুলির গায়ে।

মন্দির অভ্যন্তরে প্রস্তর স্তম্ভের গায়ে যেসব চিত্র আছে তার মধ্যে একটি দেখলাম শত্রুর সংগে মেঘনাদের যুদ্ধ। মেঘের আড়ালে পুষ্পক রথে মেঘনাদ যুদ্ধ করছে তীর ধনুক নিয়ে, সারথি রথ চালাচ্ছে, রথের আকৃতিটি অনেকটা রকেট বা বোমার মত দেখতে।

মন্দির গৃহের বহিরঙ্গে কারুকার্য অনেক আছে কিন্তু মন্দিরের একান্ত অভ্যন্তরে স্তম্ভে দেয়ালে সিলিঙে, ব্রাকেট ফিগারে এমন অতুলনীয় কারুকার্য ভারত-বর্ষের অপর কোন হিন্দু মন্দিরে নেই এই দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে ছাড়া।

গোল চত্বরের সামনেই বিষ্ণুর মূর্তি। দুয়ারে দ্বারী জয়া বিজয়া, ভিতরে সিংহাসনে ছোট বিষ্ণু মূর্তি, একপাশে শ্রীদেবী, একপাশে ভূদেবী, তার পেছনে মস্ত বড় বিষ্ণুমূর্তি, পরনে গরদের ধুতি, লাল পাড় বাসন্তী রঙ, নীল জামা গায়ে।

পীতবসন বনমালীর মাথায় ওপরে রৌপ্যনির্মিত চালচিত্র।

শংখচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি।

একটু পরে বিগ্রহের সামনে পর্দা টেনে ঢেকে দিলেন পুরোহিত।

সুরু হল কাড়া নাকাড়া নানা বাদ্যের গম্ভীর গম্ গম্ ধ্বনি।

বিশাল মন্দির গৃহের অভ্যন্তরে সেই মহানাদ ধ্বনিত হতে লাগল। হাত জোড় করে সবাই (স্থানীয় লোকও কিছু ছিল) দাঁড়ালেন দরজার দুপাশে।

একটু পরে পর্দা সরে গেল, ঝলমল করে শোভা পেতে লাগলেন চতুর্ভুজ দেবতা।

আবার সুরু হল আরতির বাজনা প্রদীপ হাতে পুরোহিত আরতি করলেন। তারপর মন্দির মধ্যে দন্ডায়মান আর একজন পুরোহিতের হাতে প্রদীপ এগিয়ে দিলেন, তিনি সামনের দুপাশে শ্রীদেবী, ভূদেবীসহ নারায়ণ মূর্তির সামনে আরতি করে দুপাশে দ্বারী জয়া বিজয়ার সামনে আরতি করে সামনে এগিয়ে এসে প্রদীপ তুলে ধরলেন। সবাই ভক্তিভরে স্পর্শ করল শিখার আগুন, ছোঁয়ালো কপালে মাথায়। এরপর পুরোহিত আরতি সুরু করলেন পঞ্চপ্রদীপের ঝাড় দিয়ে, তেমনি করে ভূদেবী শ্রীদেবীসহ নারায়ণ মূর্তির সামনে আরতি করলেন, তারপর আরতি করলেন দ্বারী জয়া বিজয়ার মূর্তির সামনে।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রমা রাও-এর বৃদ্ধ পিতা। তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশে এক সময় থেমে গেল আরতির বাজনা। তার রেশ রয়ে গেল বাজনা থামবার পরও অনেকক্ষণ। সমবেত জনতা মুদিত চক্ষে হাতজোড় করে রয়েছে তখনো।

এক সময় বেরিয়ে এলাম।

ভেতরে স্তম্ভগাত্রে, বাইরে প্রাচীরগাত্রে খোদিত অসংখ্য মূর্তি, অসংখ্য চিত্র।

কোন স্তম্ভ বেষ্টন করে আছে কারু-কাজকরা প্রস্তরবলয়। মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে ওপরে মাঙ্কি ক্যাপ পরা মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তখনকার দিনে কেমন আধুনিক টুপি ছিল ভাবতে আশ্চর্য লাগল।

বাইরে প্রস্তর চত্বরের ওপর একটা স্তম্ভ দেখলাম। স্তম্ভটির বিশেষত্ব এই যে এটা বাইরে থেকে তৈরি করে এখানে এনে স্থাপন করা হয়েছে। এমন কি স্তম্ভের পাদমূলকে ভিত্তির সংগে গেঁথেও দেওয়া হয়নি। এটা যে ভিত্তির সংগে গাঁথা নেই সেইটে পরখ করার জন্য আমরা টর্চের আলো ফেলে দেখলাম স্তম্ভটির পায়ের নীচের দিকে আলোর রেখা একদিক থেকে অন্যদিকে বেরিয়ে আসছে।

স্তম্ভটি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ থেকে নয়, সেই সুদূর দ্বাদশ শতাব্দী থেকে।

রাতের বয়স বাড়তে লাগল দাক্ষিণাত্যের সেই সুদূর নির্জন গ্রামে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে বিশাল গোপুরম্ পেছনে রেখে রাস্তায় নামলাম আমরা।

ডাকবাংলোয় ফিরতে হবে।

ডাকবাংলোতে রাতের আহার সেদিন অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছিল মনে আছে। বাবুর্চিটি অত্যন্ত করিতকর্মা ও চটপটে ছিল।

পরদিন সুপ্রভাত জানালো চারদিকের সবুজ মাঠ, দূরের নীলাভ পাহাড়।

এবার যাবো হালেবিড়ে!

মাত্র দশ মাইলের পথ। দুরদুরান্ত পরিব্যাপ্ত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি যতদূর দৃষ্টি যায়, অপূর্ব অপরূপ।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো হালেবিড়ের বিখ্যাত শিবমন্দিরের সামনে।

হালেবিড়ে হয়শালা রাজবংশের রাজধানী ছিল। এর স্থাপত্যকলার অনেক কিছুই মুসলমান আমলে বিধ্বস্ত হয়েছে ১৩১০ খৃঃ অব্দে।

কিন্তু এই শিবমন্দিরটি আজও অক্ষত আছে।

বেলুড়ের বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের দশ বছর পর রাজা বিষ্ণুবর্ধন এই মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। দীর্ঘ আশি বছর প্রায় দুই পুরুষের অনলস অবিরাম শিল্প-সাধনার পরও এটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মন্দির অভ্যন্তরে বিরাট শিবলিঙ্গ দর্শন করলাম। ইনি বিষ্ণুবর্ধন হয়শালেশ্বর।

এই মন্দিরের দুটি গর্ভ গৃহ, দুটিরই পৃথক দরজা আছে, একটি প্রশস্ত বারান্দা দ্বারা সংযুক্ত দুটি গর্ভগৃহ।

অপর গর্ভগৃহেও বিপুলকায় শিব-লিঙ্গ রয়েছেন, ইনি শান্তলেশ্বর।

(আগামীবারে সমাপ্য)

(১)

বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে পর পর দুটো ঠ্যালাগাড়ি চলেছে কোনো একটা 'সংসার'কে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বয়ে নিয়ে। অবশ্য যদি ওই মালপত্রগুলোকে 'সংসার' বলতে হয়।

দেখতে অদ্ভুত লাগে। যে সব জিনিসপত্র একটা পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল, সেগুলোকে একত্র ডাঁই করে তুলে দেওয়া হয়েছে ওই ঠ্যালা দুটোয়।

মলিন বিবর্ণ চৌকী আলমারির দেরাজ আয়না আলনা টেবিলের সঙ্গে ঠাশাঠাশি চলেছে অপেক্ষাকৃত শৌখিন দু' একটা সোফা চেয়ার বুকসেলফ। আর ওদেরই খাঁজে খুঁজে কৌশলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাঁড়ার ঘরের চাল গম ডাল মশলার শিশি বোতল, টিন জার ড্রাম।

সবই কেমন শ্রীহীন বিবর্ণ।

যার সংসার সে লোকটা যে বিশেষ মেকদারের লোক নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। আর তা হলে তো তার সংসারটা লরীর ওপর চড়ে বসতো। বোঝাই হতো চকচকে ঝকঝকে মালপত্রে। লোকটা এযাবৎ নেহাৎই ওই ঠ্যালাগাড়িটার মতই ঠেলে ঠেলে সংসার চালিয়ে এসেছে লড়বড় করতে করতে।

এটা মালুম হচ্ছে ওই জিনিসগুলোর চেহারা থেকে।

ওগুলো যখন একটা বসবাসের মতো বাড়ির মধ্যে সাজানো থাকতো, তখন হয়তো ওদের ওই জীর্ণ বিবর্ণ পুরনো চেহারাগুলোর মধ্যেও একটা শ্রী ছিল, শোভা ছিল, কাছাকাছি গেলে হয়তো দেখা যাবে, ওই টিন কৌটোর গায়ে গোছালো গৃহিনীর হাতের মার্কা টিকিট মারা— 'বেসন' 'কালোজিরে' 'হিং' মরিচ গুঁড়ো'।

আর হয়তো ওই কুৎসিৎ রংচটা ট্রাঙ্ক বাক্সগুলোর ওয়াড় আচ্ছাদনও খুঁজে পাওয়া যাবে এধারে ওধারে। শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে অথবা সস্তা ছিট দিয়ে তৈরী সেগুলো।

হয়তো পুরনো রঙিন শাড়ি থেকে বানানো পর্দায় দরজা জানলা ঢেকে, আর তুলো বেরোনো ছেঁড়া তোষকে নতুন সুজনি ঢেকে সৌষ্ঠব বজায় রেখে চলা হচ্ছিল, সেই শোভা সৌষ্ঠব ধুলিসাৎ হয়ে গেল, সংসারকে টেনে হিঁচড়ে ঠাঁই-বদল করতে গিয়ে।

পিছনের ঠ্যালাটা আরও কুদৃশ্য।

সংসারের অন্ত্যজ জিনিসগুলোর সদগতি করা হয়েছে তার ওপর দিয়ে। বালতি মগ তোলা উনুন, কাপড়কাচা গামলা, ঝুড়ি চুপড়িতে ভাঙা কয়লা, কাটা কাঠ কয়লা ভাঙা হাতুড়ি, মরচেপড়া শূন্য পাখির খাঁচা।

তার মানে লোকটা সংসারই ওঠাচ্ছে নিজে উঁচুতে উঠছে না। উঠলে এই জঞ্জালগুলোও বয়ে নিয়ে যেত না, ফেলে দিয়ে যেত।

বলতো আ ছি ছি, এগুলো কখনো 'সে বাড়িতে' মানায়?'

ভাগ্যের ওঠাপড়াতেই 'সংসার ওঠানো'র দরকার পড়ে। ভাগ্যের প্রসন্ন প্রসারিত হাত যখন গলি থেকে বড় রাস্তায় বার করে নিয়ে যায়, একতলার স্যাঁৎসেঁতে ঘর থেকে তিনতলার মোজাইক মেজেয়, তখন ওই দরকারটা আসে, আবার যদি সেই ভাগ্যের রূঢ় হাত তিনতলা থেকে ঠেলে ফেলে দেয় নীচের তলায়, জীবনের সুরেলা ছন্দ থেকে ছন্দপতনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে তখনও আসে দরকার।

শুধু শুধুই সংসার ওঠানো এটা দৈবাৎই ঘটে।

যেমন আমাদের ছেলেবেলায় ওই ঘটনাটা ঘটতে দেখতাম।

কিন্তু ওইগুলোই কি 'সংসার?'

ওই শিশি কৌটো টিন ড্রাম বালতি মগ খাট আলমারি কয়লা ভাঙা হাতুড়ি মশলাবাটা শিল?

তাই হবে হয়তো তা নইলে মা কেন বলতেন, 'সংসার ওঠাতে ওঠাতেই আমার জীবন গেল।'

এইগুলোকেই তো 'সংসার' বলতেন মা।

বাবাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জোরে জোরে বলতেন, 'জীবনে কখনো স্বস্তি করে সংসার করতে দিলে না তুমি আমায়। বেদের টোলের মত পাতছি আর তুলছি।'

বাবা যে এতে খুব একটা বিচলিত হতেন তা নয়, তখনকার মতো সরে পড়তেন।

আমাদের কাছে কিন্তু ওই সংসার ওঠানোটা রীতিমত একটি আহ্লাদের ব্যাপার ছিল। এক বাসা থেকে অন্য বাসায়, এক পাড়া বদলে অন্য পাড়ায়, সে এক উত্তেজনাময় রোমাঞ্চ।

বাড়ি ওঠা মানেই তো সংসারের নিত্য ছন্দ তচনচ হয়ে গিয়ে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। আর ছেলেবেলার মনে তো বিশৃঙ্খলাতেই উল্লাস। যেদিন বাড়ি বদল হবে, তার দুচার দিন আগে থেকেই ওই ছন্দে হাত পড়তো, ভারী জিনিসগুলো নড়িয়ে সরিয়ে একত্রে জমা করা হতো, কাঁচের বাসনপত্র, মায় খেলনা পুতুলের আলমারির সব জিনিস সাবধানে সন্তর্পণে আলাদা আলাদাভাবে বেঁধে একধারে রাখা হতো, দেয়ালের ছবিটবি নামিয়ে ফেলা হতো, আমাদের ক'ভাইবোনের বইখাতা শেলেট পেন্সিল দোয়াত কলম প্রায় সবই প্যাক করে ফেলা হতো। অতএব অবস্থাটা মনোরম তাতে আর সন্দেহ কী?

ওই প্যাক করার ব্যাপারে আমাদের মেজদাই ছিল সবচেয়ে উৎসাহী। কোথা থেকে যেন ভাল ভাল ব্রাউন পেপার সংগ্রহ করে এনে ফেলতো, আর পরিপাটি করে মুড়ে ফেলে দড়িটড়ি বেঁধে রেডি করে রাখতো।

বাবার চোখে পড়লে বাবা হয়তো বলতেন, 'তা' সবই বা বেঁধে ফেলছিস কেন? এই দুদিনও তো পড়বি?'

মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতেন, 'হ্যাঁ এই দুদিন যা পড়বে, তা' জানাই আছে, মিথ্যে ছড়িয়ে রেখে হারিয়ে টারিয়ে যাবে।'

ছেলেমেয়েদের মানে মেয়েদের কথাতো চুলোয় যাক ছেলেদের পড়া নিয়েও মা বড় মাথা ঘামাতেন না। হয়তো তখনকার

'কী বলবে' সে প্রশ্নের উত্তর চাইবার সাহস ছিল না আমাদের। আর থাকলেই বা, কারই কি জানা ছিল উত্তরটা ?

'লোকে কি বলবে ?'

এই প্রশ্নটাই ছিল একমাত্র সত্য।

বাড়ি দেখে কখনোই কিন্তু হতাশ হতাম না আমরা, দিদি আর আমি দুজনেই বোধকরি নতুনের ভক্ত ছিলাম। তাই তখুনি চুপি চুপি ঠিক করে ফেলতাম কোনখানে আমাদের জিনিসপত্তর রাখবো, কোনখানে আমাদের 'খেলাঘর' পাতবো।

হ্যাঁ, খেলাঘর একটা থাকতো বৈকি। শুধু আমাদের নয়, আমাদের কালের সব মেয়েরই। একটা খেলাঘর থাকবে না, এমন নিঃস্ব দুঃস্থ অবস্থা কেউ কল্পনাই করতে পারতো না।

আমরা বেশীর ভাগই ছাতে ওঠার সিঁড়ির মধ্যবর্তী বড় সিঁড়িটাকে নির্বাচন করতাম। ওই জায়গাটাই বাড়ির মধ্যে সব থেকে নিরিবিলি, আর অন্যের পদার্পণের আশঙ্কা কম।

ছাতে আর কে কত ওঠে ?

দৈনিক কাপড়চোপড় শুকোনো তো বারান্দাতেই হয়ে যায়, ছোটখাটো বিছানা পত্রও। ঘটা করে বিছানা রোদ্দুরে দেওয়ার থাকলে আলাদা কথা। আর শীতকালে মা মাঝে মাঝে উঠতেন বড়ি দিতে।

মার বড়ি দেওয়ার দিন কি সকালবেলা

দিয়ে হাতে ঝাঁটা বুলিয়ে মার ভাষায় 'ঝুঁটিয়ে মেরে' আসতো, তারপর মা গিয়ে খানিকটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দু' তিনটে কুলো কি ডালায় তেল মাখিয়ে রোদে রেখে আসতেন, অতঃপর ডাল বাটার গামলা নিয়ে উঠে যেতেন দীর্ঘসময়ের জন্য।

মা যখন নেমে আসতেন, তখন মার ফর্সা মুখটা লাল লাল হয়ে উঠতো, আর ওই শীতকালেও ঘাম গড়াতো কপালে গালে।

দাদা বলতো, 'আচ্ছা এই বড়ি ব্যাপারটা কি অনিবার্য? না হলে চলে না?'

মা অবাক হয়ে বলতেন, 'ওমা! ছেলের কথা শোনো! বড়ি না হলে গেরস্তবাড়িতে চলে?'

'কিনতে টিনতে পাওয়া যায় না?'

মা অবলীলায় বলে উঠতেন, 'তা হয়তো যায়। কলকাতার শহরে কড়ি ফেললে বাঘের দুধ মেলে তো বড়ি! কিন্তু কেনা বড়ি? গলায় দড়ি আমার!'

গলায় দড়ির পর তো আর কথা চলে না! অতএব দাদা বলতো, 'যাও মুখটা ঠাণ্ডাজলে ধুয়ে একটু ছায়ায় বোসো গে।'

মার ওপর দাদার একটু বেশী মায়া ছিল। যেন মা একটা বাচ্চা মেয়ে, আর দাদা তার অভিভাবক। এটা আমাদের কাছে বেশ মজার লাগতো।

অথচ মেজদা ঠিক বিপরীত ছিল! মেজদাকে বরং মার শাসনকর্তা বলা চলতো।

মা কোনো কিছু নিয়ে আক্ষেপ জুড়লেই মেজদা কাছে গিয়ে বলতো, 'বকবক করলেই তোমার সব দুঃখ নিবারণ হয়ে যাবে?' বলতো, 'ছোটখাটো সব ব্যাপার নিয়েই আক্ষেপ করলে, বড় ব্যাপারগুলোর আর গুরুত্ব থাকে না মা! ঝি আসতে দেরী করলে তুমি এমন করো যেন তোমার ব্যাংক ফেল হয়ে গেছে।'

মা রেগে উঠে বলতেন, 'দেরী করে এলে কতোটা অসুবিধে তোরা বুঝিস?'

মেজদা বলতো, 'বুঝবো না কেন? তবে এটাও বুঝি তোমার বাক্যবাণে তাকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে এসে তোমার চরণে এনে ফেলতে পারবে না।'

মেজদা সব সময় একসঙ্গে অনেকটা কথা বলতো। দাদার কথার অভ্যাস ছিল ছোট ছোট টুকরো টুকরো। দুজনে দুরকম।

জীবনের পথেও দুজনে দুপথে এগিয়েছে। দাদা বেছে নিয়েছিল অধ্যাপনার পথ, আর মেজদা 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর' নীতি অনুসরণ করে অনেক ওঠাপড়ার পর অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু সে তো মেজদা।

বাবা চিরদিনই একাসনে অবিচল ছিলেন। কোনো এক সাহেব কোম্পানীর বড়বাবু।

আমাদের যে অনবরত সংসার ওঠানো হতো, সেটা ভাগ্যের উত্থান পতনে নয়, স্রেফ বাবার বাতিকে।

বাড়ি বদল, বাবার একটা বাতিক ছিল। সেকালে 'হবি' কথাটা চালু ছিল না তাই বাতিকই বলা হতো। এ যুগের চালু ভাষায় বলতে পারা যায় ওটাই বাবার 'হবি' ছিল।

আর সেই স্বর্ণযুগে সে হবিতে অসুবিধেও বিশেষ ছিল না। বাড়ি বদলাতে ইচ্ছে হলে, উপযুক্ত ভাড়া দিতে চাইলে বাড়ি পাওয়া যাবে না, এমন অজগুবি কথা কেউ ভাবতেই পারতো না।

তবে আর 'ভাড়াটে বাড়ি' বলেছে কেন?

আমাদের জ্যাঠা কাকারা যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা নাকি আমাদের ঠাকুদ্দার তৈরী। অতএব বাবার পৈত্রিক বাড়ি। তবু বাবা স্বেচ্ছায় তার সব দাবিদাওয়া ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন, শুধু 'একঘেয়ে পচা পাড়ায় আর থাকা যায় না বাবা' বলে। এটা আমরা একটু বড় হয়ে শুনেছি।

মার অসন্তোষ বাণীর মধ্যে থেকেই উদ্ধার করেছিলাম আর কি!

মা বলতেন, 'নিজের ভাল লাগেনি লাগেনি, বাহাদুরী করে দাবিদাওয়া ত্যাগ করলুম বলে লেখাপড়া করে দিয়ে আসার কী ছিল? আমার ছেলে দুটোতো বঞ্চিত হলো?'

বাবা হেসে উঠে বলতেন, 'সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কর নিয়মে তোমার দুটো ছেলের ভাগে তো একটা ঘর জুটতো, কী করতো নিয়ে? মশারির পার্টিশান দিয়ে দুই ভাই বৌ নিয়ে শুতো?'

মা এরকম ব্যঙ্গবাণীতে দারুণ চটে যেতেন, আর বাবার ছিল ওই রকমই কথার ধরন। মা চটেমটে বলতেন, 'নাই জুতো, চাবি দিয়ে দখল রেখে আসতো।'

বাবা বলতেন, 'চমৎকার! তুমি কেন উকিল হওনি তাই ভাবি!'

'বেশ তো না হয় নাই হলো, ওঁরা তো তোমার অংশের জন্যে কিছু টাকাকড়িও ধরে দিতে পারতেন!'

বাবা এক্ষেত্রে গম্ভীর হয়ে যেতেন।

গম্ভীর হলেও হেসেই বলতেন, 'ও বাবা, এ যে দেখি উকিল টুকিল নয়, একেবারে অ্যাটর্নি! তা টাকাকড়িটা কে দেবে?'

'কেন, বটঠাকুর ঠাকুরপোরা?'

'কোন দায়ে? তাঁরা কি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন? বলেছেন, 'তুই এ বাড়ি থেকে চলে যা?' তাই খেসারৎ দেবেন? ওসব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না বুঝলে?' মা চুপ করে যেতেন। লজ্জায় কি রাগে কে জানে। আমরা অবশ্যই বাবার পক্ষে ছিলাম।

কারণ আমরা বাবার সেই পৈত্রিক বাড়িতে যখনি বেড়াতে বা কাজেকর্মে গেছি, আমাদের দম আটকে আসতো যেন। কেমন একটা বুকচাপা ভাব, সারা বাড়িটা জিনিসে বোঝাই, কতো যে লোক হিসেবই করতে পারতাম না। মনে হতো কতোক্ষণে পালাবো। অতএব বাবাকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারতাম না।

মাও কি আর তা না দিতেন?

মারই কি আমাদের ওই কাকিমা জ্যাঠিমাদের মতো কষ্ট করে থাকতে ইচ্ছে করতো? তবু—বাবাকে দোষ দেওয়ার একটা উপলক্ষ পাওয়া গেলে ছাড়বেন কেন? ও জিনিসটা আদৌ ছাড়তে রাজী হতেন না মা।

দিদি আর আমি আড়ালে বলাবলি করতাম, 'ইস! ভাগ্যিস বাবা তখন মার কথা শোনেন নি! শুনলে আমাদের কী দশাই হতো!'

আমরাও যেন ধরে নিয়েছিলাম, একটানা অনেকদিন একটা বাড়িতে থাকা খুব কষ্টকর।

এমনও হয়েছে কখনো কখনো, একই পাড়ার মধ্যেই অন্য বাড়িতে উঠে যাওয়া হতো। আসলে 'টু-লেট' দেখলেই বাবার মন নিসপিশ করে উঠতো। আর সেটা তো সচরাচরই দেখা যেতো!

অনেক দেখে শুনে, অনেক বুঝে সুঝে একটা বাড়িতে আসা হতো, বাবা বলতেন, বাস! এইবার স্থিতি বুঝলে নবৌ, এবার তোমার সংসারকে যতো পারো গুছিয়ে নিয়ে বোসো। এ বাড়ির তুলনা হয় না।'

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বাবার চোখে বাড়িটার নানান খুঁৎ ধরা পড়তে শুরু করতো।

তখন মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলতো।

বাবা বলতেন, 'এ বাড়ির বারান্দাটা বড় হলে কি হবে, দক্ষিণে নয়।'

মা বাবার মতলব বুঝে ফেলে রেগে গিয়ে বলতেন, 'কেন পুবই কি খারাপ?'

'দক্ষিণের মতন তো নয়।'
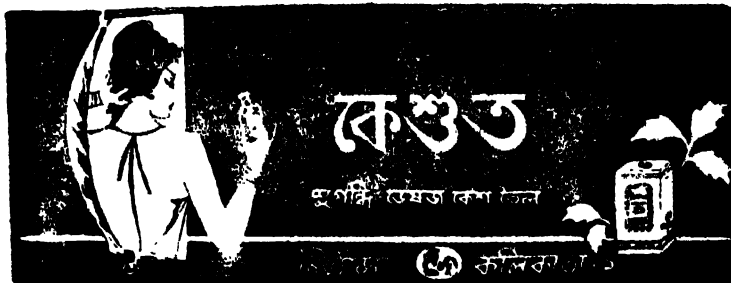
'আসার সময় তো খুব পছন্দ করে ঢুকলে।'

'তখন বর্ষাকাল, অতোটা বুঝিনি।'

'ঋতুতে ঋতুতে বাড়ি বদলাবে নাকি তুমি? নবাব না বাদশা?'

'তা' সামান্য চেষ্টায় যদি নবাব বাদশার সুখটা পাই মন্দ কী?'

'এ বাড়ির মতন গোছানো রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আর জোটাতে পারবে তুমি?'

'এর থেকে ভালও জোটাতে পারি। এ বাড়িতে রান্নাঘরে কল নেই, এবার সে রকম বাড়ি দেখবো।'

'এ বাড়ির ঘরগুলো কতো বড় বড়—

'এর থেকে অনেক বড় ঘরওলা বাড়ি কলকাতা শহরে আছে।'

'থাকবে না কেন রাজপ্রাসাদও আছে। গুড় ঢাললেই মিস্টি।'

'তবে সাধ্য মতন গুড়টা ঢালাই তো ভাল।'

'কেবল ওই ভালটাই দেখবে তুমি?' মা বেশ জোরে জোরেই বলতেন, কেবল ভাল বাড়িতে আরাম করে থাকা এই সার লক্ষ্য হবে মানুষের? আখের ভাববে না?'

বাবা হেসে উঠতেন 'আখের? ওটা কেউ ভেবে কিছু করতে পারে তোমার বিশ্বাস? আখের নিজের নির্দিষ্ট পথে চলে।'

'সংসারী মানুষ মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়া, এসব ভাবে।'

'আমি যে ভাবছি না তা কে বললে? মেয়ের বিয়ের সময় অনেক দেখো—।'

আমরা একই ঘরের মধ্যে থাকতাম না আমরা। আমাদের আলাদা ঘর দাদাদের আলাদা ঘর মা বাবার আলাদা। এবং আবার বাড়িতে [illegible] ডুতে।

বাবা [illegible] মত সবাই মিলে একই সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে থাকলে বুদ্ধি সুদ্ধিও ভেড়ার মতন হয়ে যায়, মনের [illegible] না।'

তা মনের বাড়বাড়ন্ত কি না বুঝলেও দিদির আর আমার যে নিজস্ব একটা ঘর ছিল এতেই আমরা বর্তে যেতাম।

নিজস্ব ঘর মানেই তো নিজস্ব জগৎ।

যে জিনিসটার স্বাদ আমাদের কোনো-দিকের কোনো তুতো বোনকেই পেতে দেখিনি। দেখবোই বা কী? সব বাড়িতেই তো দশ বারোটা করে ভাইবোন। আমাদের মেজপিসিমার চোদ্দজন ছেলেমেয়ে।

ওদের আবার নিজস্ব জগৎ জুটবে কোথা থেকে?

তবে মার কণ্ঠধ্বনি দেয়াল ভেদ করে এ-ঘরে এসেও পৌঁছতো।

'মেয়ের বিয়ে' শব্দটা শুনেই আমরা লজ্জায় সরে গিয়ে দুজনে ঠেলাঠেলি করে হাসি চাপতে বসতাম। যেন তখুনি কে আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ করছে।

'বিয়ে' শব্দটার মধ্যেই লজ্জার ব্যাপার আছে এটা ছিল সংস্কারের একেবারে মর্ম-মূলে। অথচ তখনও রীতিমত উৎসাহ আর আসক্তির সঙ্গে সংসার ওঠানোর ছড়ানো-ছিটানো ফেলে দেওয়া জঞ্জাল থেকে দরকারী জিনিস খুঁজে খুঁজে পুতুলের বাক্স বোঝাই করতাম।

এটাও তো বাড়ি বদলের একটা প্রধান আকর্ষণ।

কতো কতো জিনিসই কুড়িয়ে পাওয়া যেতো। ভাঙা হাত-আয়না বাহারী শিশি সিগারেটের রাংতা ক্যালেন্ডারের মেমের ছবি, দু-চারটে ডবল পয়সা সমুদ্রের ঝিনুক মরচে-পড়া চাবির রিং বাতিল তাসের কয়েকখানা পুরনো দাবাবোড়ের 'সেট'-এর দু-চারটে দলচ্যুত বোড়ে, এমনি কতো কিছু।

মনে হতো কী যেন নিধি পেলাম।

কোনটা কোনটা আমাদের পুতুলের সংসারের শোভা বর্ধন করবে আর কোনটা কোনটা খেলাঘরের কাজে লাগবে তখনই চিন্তা করতে শুরু করে দিতাম।

দিদি বলতো 'এই এখন কিছু করিস না, নতুন বাড়িতে গিয়ে সব সাজাবো।'

'রাংতা দিয়ে মুড়ে ডবল পয়সাগুলো টাকা করে নিয়ে যাই না দিদি?'

দিদি একটু চিন্তা করে পারমিশন দিতো 'আচ্ছা তা না হয় কর। বাড়ির কর্তার বাক্সয় থাকবে।'

বাড়ির কর্তা বলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই দিদির পুতুল-বাক্সে কর্তা গিন্নী ছেলে বৌ নাতিনাতনী মেয়েজামাই কোনো কিছুরই ঘাটতি ছিল না। এমনকি ঝি-ও ছিল একটা মাটির বেনে পুতুল।

এই সংসারের আদর্শ ছিল আমাদের মামার বাড়ি। কাজে কাজেই দিদির পুতুলের গিন্নী আমাদের দিদিমার ভাষায় কথা বলতো কর্তা দাদামশাইয়ের স্টাইল এবং অধস্তনরা প্রায় যথাযথ ভঙ্গীতে। পুতুলের ঘরের বৌমাও ছেলেকে পড়া-পড়া করে উৎখাত করতো।

আসল খেলাটা দিদিই খেলতো, আমি খিদমদগার মাত্র। দিদিতে আমাতে মোটে দু বছরের ছোট-বড় হলেও গড়নের জন্যে আমাকেই বরং বড় দেখাতো, কিন্তু দিদিকে আমি রীতিমত গুরুজন বলেই মনে করতাম। দিদি মরতে বললে মরতে পারতাম।

পুতুল খেলাটা ছিল বাক্সের মধ্যে, সবই কাল্পনিক প্রথায়। শুধু কথার মাধ্যমে দিদি ওই পুতুলবাহিনীকে নিয়ে সংসারলীলা করতো। এবং সেই কথাবার্তার মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কত কিছু ছিল না।

দিদি গিন্নীর ভূমিকায় বৌকে বকে ভূত ছাড়িয়ে দিতো, বৌয়ের ভূমিকায় আড়ালে গজ গজ করতো কর্তার ভূমিকায় 'বাজার খরচ' বেশী হতো বলে রাগারাগি করতো ছেলের ভূমিকায় তাস খেলতে, মাছ ধরতে চলে যেতো।

একা সকলের ভূমিকা অভিনয় করে যেতো দিদি, অনর্গল কথা কয়ে কয়ে।

খেলাঘরের ব্যাপারটা আলাদা।

সেখানে শুধু কথার চাষেই সব ফসল ফলতো না। হাতে-পায়ে কাজও করতে হতো।

যেদিন খেলাঘরে মন যেত, সেদিন ছোট্ট ছোট্ট কয়লার কুঁচি দিয়ে খুদে তোলা উনুনকে ধরানোর ভান করতো দিদি পিজ-বোর্ডে তৈরী এতটুকু পাখা দিয়ে জোর জোর বাতাস চালিয়ে উনুন ধরানো হলে ভাত চড়িয়ে দিতো এতোটুকু হাঁড়িতে। তারপর বঁটি-কাটারি শিল-নোড়া বাসনপত্র হাতা-খুন্তি নিয়ে লেগে যেত কোমর বেঁধে।

এসব সেট বেশীর ভাগই মাটির। কেউ কালীঘাটে গেলেই এক সেট হাঁড়ি-কুড়ি থালা-গেলাশ শিল-নোড়া চাকি-বেলুন এনে যেত। এমনকি ঝি কি তার মা গেলেও এনে দিত।

মার কাঁচের আলমারির মধ্যে বহুবিধ লোভনীয় খেলনার সেট ছিল কাশীর পেতলের খেলনা, বদ্যিনাথের লোহার খেলনা গয়ার পাথরের খেলনা।

এতোটুকু কুচি কুচি! সাঁড়াশী দেখলে হাসি পায় হাতা-খুন্তি দেখলে মন মোহিত হয়ে যায়।

কাঁচের বাইরে থেকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমরা, 'মা একটা বার করে দাও' এমন কথা বলার কথা ভাবতেই পারতাম না।

মার আজন্ম সঞ্চয় ওই খেলনাগুলোর প্রতি মার যেন অপত্যস্নেহ ছিল। বাঘিনীর মতো আগলে রাখতেন।

বাবা মাঝে মাঝে হাসতেন। বলতেন, 'ওগুলো তোদের মা অমন করে আগলায় কেন জানিস? স্বর্গে গিয়ে সংসার পাতাবে বলে। হালকা তো? আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে।'

মা চটে যেতেন তাই বলে রেগেমেগে বার করে দিতেন না।

দিদি চুপি চুপি বলতো, 'ওর অনেক খেলনাই আমি দেখে জানিস? লোকেরা যখন তীর্থটির্থ করে এসে ওসব এনে দেয়, ছোটদেরই দেয়। ওই একদম ছোট্ট লোহার খেলনাগুলো ছোটপিসি দেওঘর থেকে এনে কাকে দিয়েছিল? মাকে বুঝি?.. আর ওই কাশীর খুদে জাঁতি পানের ডাবর, মশলার সাজ ওই সব? মেজমাসী দেননি কাশী থেকে এনে? এমন চটপট আলমারিতে ঢুকিয়ে ফেললেন মা! দেখতেই দেন না!'

তা এসব তো চুপি চুপি।

জোরে জোরে বলবে এমন সাধ্যি কার?

(ক্রমশঃ)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সব আগুন নেভে, সব বৃষ্টি থামে

'কল্লোল যুগের' যে সব অগ্রণী লেখক আজো সক্রিয়ভাবে সাহিত্যসাধনা করে চলেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও জীবনী সাহিত্যের এই চারটি শাখা তাঁর নিরলস সাহিত্য-সাধনায় পরিপুষ্ট। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প ও উপন্যাস বাংগালী সাহিত্যপাঠকদের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল আনন্দ ও প্রেরণা জুগিয়েছে। সাহসিক এবং সাময়িক বিষয়বস্তু তাঁর উপন্যাস ও গল্পের উপজীব্য তাই তাঁর রচনার মধ্যে সর্ব সময়েই একটা 'টপিক্যাল ইনটারেস্ট' থাকে—তাঁর অতি সাম্প্রতিক সুবৃহৎ উপন্যাস 'বন্যা-কান্না'ও সেই সাময়িক সমাজ চিত্র। এই বিশাল উপন্যাসের পরিচয় সূত্রে কাহিনী অংশ বিধৃত করা প্রয়োজন তাই সংক্ষেপে কাহিনীটির কাঠামো পরিবেশিত হল।

বনছায়া একালের মেয়ে। ধনীকন্যা। তবু চাকরী করে, সাহিত্য-কর্ম করে। মনে মনে ভাবে একদিন সে সাহিত্যের জগতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। যা হয়ে থাকে এই সবক্ষেত্রে বনছায়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। সে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সম্পাদক ইত্যাদি মহলে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট। এই সব সাহিত্যিক সংসর্গের ফলে প্রায় একই সংগে দুজন মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের একজন সুবীর আধুনিক কবি আরেকজন সন্দীপ একজন উপন্যাস-লেখক। এরা দুজনেই দুঃস্থ কিন্তু আদর্শে অবিচল, ধনীকন্যা হয়েও বনছায়া এদের একজনকেই স্বামীত্বে বরণ করতে চায়। ধনী পিতা সরসিজ মনে মনে এঁচে আছেন ধনী ইনজিনিয়ার হিমাংশুকে সুপাত্র হিসাবে কন্যাদান করতে। বনছায়া যেখানে চাকরী করে তার কর্তা দেবজ্যোতিও বনছায়ার প্রতি নজর রেখেছে। সরসিজ একদিন হিমাংশুকে আমন্ত্রণ করলেন বাড়িতে সেখানে বনছায়াকে পছন্দ হল হিমাংশুর, বনছায়া একটা চাকরী প্রার্থনা করল সুবীরের জন্য এবং হিমাংশু রাজী হয়ে গেল। ছলনা করে বনছায়া সুবীরকে বিয়ে করল রেজেস্ট্রি করে। বিয়ে হয়ে গেল, পিতার প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় তিনি রেগে আগুন হলেন তাই একদিন সুবীরের কাছে গিয়ে উঠল বনছায়া পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে। বৌদির সিঁদুর কৌটো থেকে বেশ করে সিঁদুর নিয়ে পরল, সে আজ পরস্ত্রী।

যেন বিশ্বজয় হয়েছে, সুবীরের কবি সতীর্থগণ একটা ছোট-খাটো পার্টির ব্যবস্থা করল প্রবাহ সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে। হিমাংশু জ্বলে উঠল। তার তখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান কি ভাবে মেয়েটাকে জব্দ করা যায়। সে বনছায়ার "বস" দেবজ্যোতিকে চাপ দেয় বনছায়াকে তাড়াবার জন্য, দেবজ্যোতি বলে সুবীরকে তাড়াও। কিন্তু কারো চাকরী গেল না। হিমাংশু কৌশলে জেনে নেয় ওদের জীবন কেমন চলছে।

জ্বালা ধরে তার অন্তরে—ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিমাংশু। শত্রুতাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

হিমাংশু কৌশল করে সুবীরকে ওভারটাইম দিয়ে আটকায়। একটা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দেয়, বনছায়াও একটা কোয়ার্টার পেয়েছিল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সুবীরের কোয়ার্টারে এসে উঠল বনছায়া। কিন্তু নিঃসংগ সন্ধ্যাগুলি আর কাটে না। সন্দীপের কাছে গেল, সে তখন লিখছে, বনছায়াকে বেশী আমল দেয় না। বনছায়া কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়ে।

সুবীরের এই সব ভালো লাগে না, বনছায়াকে হিমাংশুর বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বনছায়া রাজী নয়।

এদিকে সুবীর নানা প্রভাবে মদ ধরল, বনছায়াকেও শেখালো মদ খাওয়া, বনছায়া স্বামীর কথায় বিশ্বাস করে রাজী হয়েছিল বটে, কিন্তু দুজনের মধ্যে ব্যবধান ক্রমে বেড়ে চলে। এদিকে একদিন বনছায়া আবিষ্কার করে সে সন্তানসম্ভবা। দৃঢ়চিত্ত বনছায়া এ সহ্য করতে পারে না, অনেক কৌশলে সে সন্তান নষ্ট করে এল ডাক্তারকে হাত করে। একদিন সুবীর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল, সংগে তার এক চটুল রমণী। নাম তার লাবণী। বনছায়া বোঝে সুবীর কত নীচে নেমেছে। এটাও হিমাংশুর আর এক কৌশল। এদিকে সেই সময় সুদীপ্তকে বনছায়া তার উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছিল। দৃশ্য ভালো লাগে না সুদীপ্তের।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সাময়িক বিরতি ঘটল। ক্ষমা চাইল, সুদীপ্তকে আমন্ত্রণ করে আনতে বলল। এদিকে সুদীপ্তকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করল বনছায়া। ঘনিষ্ঠ হল দুজনে। সুদীপ্ত ভাবে কি করবে, শিল্পীর দায়িত্ব অনেক, এমন কিছু সে করবে না যাতে তার শিল্পীসত্তা ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু আকর্ষণ কি কাটে। একদিন এল বনছায়ার বাড়ি বাকী উপন্যাসের অংশটুকু শুনতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয় সুবীর। সে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ বাড়লো। এক ঘরে সুবীর দলবল নিয়ে হৈ-হুল্লা সুরু করে। অপর ঘরে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিঘ্নিত হয়। সে সন্দীপের বাড়ি গিয়ে দেখে সন্দীপ অতি কষ্টে তার সেই ছিন্ন পাণ্ডুলিপিকে জুড়ছে।

সেইখানে বসেই উপন্যাসটি নকল করল বনছায়া। তারপর 'প্রবাহ' সম্পাদক পীযূষ দত্তকে একদিন মদের আসরে আমন্ত্রণ করে 'আমন্ত্রণা' উপন্যাসটি

প্রকাশের ব্যবস্থা পাকা করল। ...
প্রথম কিস্তিতেই বাজার মাৎ। সুবীর আবার চটল। সে জানতে চায় কিভাবে উপন্যাস উদ্ধার হলো, আর কিভাবে পীযূষ দত্তকে হাত করলো বনছায়া। হিমাংশুও চটল। সে সুবীরকে বলে এসব অশ্লীল লেখা বন্ধ করুন, আপনার স্ত্রীকে শাসন করুন। সুবীর চেষ্টা করেছিল পীযূষ দত্তকে প্রভাবিত করে উপন্যাসের প্রকাশ বন্ধ করতে কিন্তু পারে নি। কারণ পীযূষ দত্ত সাহিত্য বোঝে তাই রাজী হয় না "অবন্ধনা" উপন্যাস প্রকাশ বন্ধ করতে। হাসপাতালে যখন ছিল বনছায়া তখন সুবীর তাকে দেখতেও গেল না ফলে বিচ্ছেদ পাকা হল। হাসপাতাল থেকে ফিরে সুদীপ্তের বাড়ি গিয়ে উঠল বনছায়া। হিমাংশু আবার উত্তেজিত হয়ে সুবীরকে ওসকানি দেয় বিবাহ-বিচ্ছেদের, সুবীরও উকীল ধরে সুরু করে এবং বিচ্ছেদের মামলা রুজু করে। অভিরাম অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। তাকে সাক্ষী দিতে নির্দেশ দেয় বনছায়ার বিরুদ্ধে সে রাজী হয় না। অভিরামের চাকরী গেল আবার ফল বনছায়ার আশ্রয়ে।

এদিকে মামলা এগোয় না, দুপক্ষের কোনো আগ্রহ নেই। একদিকে যে অবন্ধনা'র ফিল্মরাইট কিনেছিল হিমাংশু সেই 'অবন্ধনা'কে ফিল্ম করা হবে এ সংবাদ নিয়ে এল লাবণী। এদিকে সন্দীপও একদিন বনছায়ার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল তুমি হাহাকার মরুভূমি কি হবে তোমাকে নিয়ে। সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। এদিকে লাবণী জানায় সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। এটাও আরেক চক্রান্ত। বনছায়া আবার সন্দীপের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে এল, এবার সেই অভিরাম তার বাড়ির কাজকর্ম করবে স্থির হল। লাবণী-সুবীরের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্ল্যান আঁটে। ব্যভিচারের অভিযোগ আনে। বিবাহের ছলনা করে ব্যভিচার। ফৌজদারি আসামী করে পুলিশ অফিসে এসে সুবীরকে ধরে নিয়ে গেল। বনছায়া এ সংবাদে ক্ষেপে গেল। সে সুবীরের স্বপক্ষে সাক্ষী দেবে স্থির করল। হিমাংশু আবার কৌশল খাটায়, বলে পনের হাজার টাকা খেসারৎ দাও লাবণী মামলা তুলে নেবে। সুবীর কোথায় টাকা পাবে—হিমাংশু পরামর্শ দেয় অফিসের ক্যাস থেকে নিতে, পরে না হয় পূরণ করা যাবে। পীযূষ সব শুনে সুবীরকে বলল কাজটা ভুল হল, কারণ বনছায়া সুবীরের সপক্ষে সাক্ষ্য দিত এবং মামলা ফেঁসে যেত। সুবীর জানল বনছায়ার এই সঙ্কল্প এবং একদিন তার বাড়ি গিয়ে উঠল। সুবীরকে বাঁচানোর জন্য বনছায়া দৃঢ়সঙ্কল্প। সে বেশ বুঝেছে এর পিছনেও সেই হিমাংশু, সেই মিথ্যা ফৌজদারীতে জড়িয়েছে সুবীরকে। অনেকের কাছে ঘুরল বনছায়া, পিতার কাছে গেল কিছু পেল না, সেখানে ভাই এসে রুখে দাঁড়াল, সন্দীপের কাছে হাত পাতল—সেও ফিরে আসবে একবার পাত্তা দেয় না। সুতরাং সেখানেও বিফল বনছায়া।

কেউই বুঝতে পারছে না বনছায়া এমন প্রাণপণ করে সুবীরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে কেন। হিমাংশুর সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ। বনছায়া বুঝেছে সুবীরকে অন্যায়-ভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে এবং সেই লাঞ্ছনার হেতু সে নিজে। বনছায়াকে জব্দ করার জন্য, বনছায়াকে পাওয়ার জন্যই হিমাংশুর এই সব প্রচেষ্টা এই সব জঘন্য কৌশল। শেষ পর্যন্ত একদিন হিমাংশুর কাছে ধরা দেয় বনছায়া। কিন্তু এই আত্ম-সমর্পণ সর্তহীন নয়।

হিমাংশু অবশেষে পরাজিত। বনছায়া বিজয়িনী।

বলা বাহুল্য প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্তসার কোনো পরিচয় নয়। শুধুমাত্র গল্পাংশ দেওয়া হল। উপন্যাসের মধ্যে বনছায়ার চারিত্রিক দৃঢ়তা, মহত্তা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিজ্ঞ লেখক তা প্রশংসনীয়। সুবীর যেন এ যুগের নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য পুরুষের প্রতীক। সে শুধু ভাগ্যের শিকার নয়, সে নিজেই নিজের অদৃষ্টের মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়েছে। সন্দীপ হিসাবী। তার প্রতিটি পদক্ষেপ পরিমিত এবং নিক্তির ওজনে নির্ধারিত। পীযূষ দত্ত ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট সম্পাদক। পিতা সরসিজ ব্লাডপ্রেসার ও স্ট্রোক ইত্যাদির শিকার এক জরদগব ধনীবৃদ্ধ। ভ্রাতা যথেষ্ট বিষয়ী এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন। আর হিমাংশু—একালের সভ্যতা, যার ভিত্তি হল অর্থ আর সামর্থ্য তারই প্রতীক। হিমাদ্রির সদৃশ অহঙ্কার আর জেদ তাকে শয়তানে পরিণত করেছে—কিন্তু তবু তার ওপর একটু সমবেদনা জাগে, হয়ত সে বনছায়াকে সত্যিই আপন করে পেতে চেয়েছিল। আর ক্ষুদ্র চরিত্র হলেও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী অভিরাম তার চারিত্রিক সততার পরিচয় দিয়েছে।

এই বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে আঁকা মানুষগুলি লেখকের রচনা কৌশলে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—একটু এদিক-ওদিক তাকালেই দেখা যাবে এই সব মানুষ আমাদের অতি পরিচিত। এবং আমাদের আশেপাশেই আছে। আর সবচেয়ে যা পাঠকচিত্তকে আকুল করে তা এই উপন্যাসের চমকপ্রদ নাটকীয় সংলাপ।

এই নিবন্ধের শিরোনাম এই উপন্যাস থেকেই সংগৃহীত।

বন্যা কান্না (উপন্যাস) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শঙ্খ প্রকাশন। ৭১।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম—১১·০০ টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

কলকাতায় শ্রীপ্লাতোন ভোরোংকো

স্বখ্যাত ইউক্রেনীয় কবি শ্রীপ্লাতোন ভোরোংকো গত পাঁচই জানুয়ারি, যুরেন সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দলের নেতা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। তিনি মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য পার্টিজান নেতা ছিলেন। ইউক্রেনের একটি অংশ যখন নাৎসীবাহিনী দখল করে, শত্রু-বাহিনীর পেছনে থেকে তিনি তখন পার্টি-জানবাহিনী সংগঠন করেন এবং বিশিষ্ট নেতৃত্ব দেন। তিনি পার্টিজান নেতা কোভাল-এর সহকর্মী ছিলেন। একাধিকবার তিনি আহত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে গেরিলাবাহিনীর জন্য তিনি যে গানগুলি রচনা করেন, রণ-ক্ষেত্রেই সেগুলির সুর দেওয়া হয়, এবং পার্টিজানদের কাছে সেগুলি অতি প্রিয় গান হয়ে ওঠে। শ্রীভোরোংকো জন্মেছিলেন অতি দরিদ্র কর্মকার পরিবারে। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। নিরক্ষর জননী ইউক্রেনের জাতীয় কবি তারাস শেভচেংকোর কাব্যগ্রন্থ কিনে এনে, সান্ধ্য পড়শীদের কাছে কবিতা পাঠ শুনতেন। ভোরোংকোর কাছে শেভচেংকোই আদি কবি—যিনি তাঁর উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। শ্রীপ্লাতোন ভোরোংকো অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি অন্তত এক কোটি কপি বিক্রি হয়েছে।

গত ৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যা ছটায় ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতির মৈত্রী হলে, ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি কর্তৃক আহুত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সভায় শ্রীভোরোংকোকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন, ইউক্রেনীয় জাতীয় কবি শেভচেংকোর কবিতার অনুবাদক কবি গোলাম কুদ্দুস। শ্রীভোরোংকোকে স্বাগত জানিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ সান্যাল বলেন, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত-ভারত-মৈত্রী সমিতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শহরে কবি ভোরোংকোকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে পেরে তিনি গৌরব বোধ করছেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীভোরোংকো পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, তিনি এ শহরে পদার্পণ করে ধন্য হয়েছেন। ১৯৬০ সালে একবার তিনি কলকাতা এসেছিলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের

কবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়নি। সভায় উপস্থিত তরুণ কবিদের সম্বোধন করে তিনি বলেন ইউক্রেনেও তরুণ কবির সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষণীয়। তাঁদের অনেকে বাংলাও শিখছেন প্রত্যক্ষভাবে বাংলাভাষা থেকে কবিতা অনুবাদও তাঁরা করছেন। শীঘ্রই তাঁদের উদ্যোগে প্রাচীন বাংলা কবিতার একটি মোটা সংকলন প্রকাশিত হবে। দু দেশের কবিরা পরস্পরের ভাষার কবিতা অনুবাদের মধ্য দিয়ে দু দেশের সাংস্কৃতিক মৈত্রী গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিতে পারেন। সভাস্থ কবিদের অনুরোধে তিনি একাধিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। সভাপতি কবি গোলাম কুদ্দুস শেভচেঙ্কোর কয়েকটি কবিতার বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন এবং শেভচেঙ্কোর জীবনকাহিনী ব্যাখ্যা করেন।

অনুবাদে শীর্ষস্থান

ভাষার পাঁচিল ভাঙতে হলে চাই অনুবাদকর্ম। আর তারই ভিতর দিয়ে পাঠকের হাতের মুঠোয় চলে আসে বিশ্বসাহিত্য। আসে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানান জাতের সৃজনশীল রচনাও।

এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল অনুবাদকর্মে বিশ্বের সেরা। এ দেশের অন্তর্ভুক্ত নানান প্রজাতন্ত্রের ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বসাহিত্যের সমীক্ষা সংক্রান্ত ১৯৭০ সালের যে হিসেব বেরিয়েছে তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর মধ্যে হয়ে গিয়েছে জায়গা বদল। জার্মান ভাষাতে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাই এখন সবচেয়ে বেশি। অবশ্য ফেডারেল রিপাবলিক ও গণতান্ত্রিক জার্মানি দুটো ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত জার্মান ভাষায় অনুবাদকর্মের মিলিত সংখ্যাই এই শীর্ষস্থান অধিকারের মূলে। এই দুই দেশ থেকে প্রকাশিত মোট অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা হল ৫,৯৩২। ঠিক পরের জায়গা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে। এই দেশ থেকে প্রকাশিত অনূদিত বইয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৫৮০। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপান ফ্রান্স যথাক্রমে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এদের গ্রন্থসংখ্যা হল যথাক্রমে ২,৯৪৪; ২,৫৬১, ২,০৬০, ১,৯১৫। এদের অনুসরণ করছে নেদারল্যান্ডস ১,৬৫১, ইতালি ১,৫৮৭, সুইডেন ১,৫৩৯ এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ১,৪৪০। আর [illegible] অনেক অনেক নিচে।

এই আন্তর্জাতিক সমীক্ষা থেকেই জানা যায় লেনিনের রচনাই সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে। আগের বছর যেখানে ছিল ২০৭, সেখানে ১৯৭০ এ লেনিন রচনাবলীর অনুবাদ সংখ্যা [illegible] বেশি হয়ে [illegible] ৪৯০। এরপর সবচেয়ে বেশি অনূদিত লেখক [illegible] স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে যথাক্রমে শেকসপীয়র ১৬২, জুল ভার্ন ১৫৮, গী

মান ১১৯, আগাথা ক্রিস্টি ৯৫, দস্তয়েভস্কি ৭৮, বালজাক ৭৫, মার্ক টোয়েন ৭১, হেমিংওয়ে ৬৬, পার্ল এস বাক ৬৫, স্টাইনবেক ৬১।

স্বপ্ন হলেও বাস্তব

ঠিক তারকা বললে ভুল হবে। বরং তার চেয়ে আরো কিছু বড়ো। আরো কয়েকটি বিশেষণ ঐ 'তারকা'র আগে বসালেই ভালো হয়। মার্কিনী দুনিয়ার এ-রকমই দশ গুণ সুপার স্টারদের নিয়ে একটি বই বেরিয়েছিল আমেরিকায় ১৯৭০ সালে। ঠিক দু বছরের মাথায় তারই তৃতীয় সংস্করণ বেরুলো দিল্লি থেকে। বইটির নাম দ্য পসিবল ড্রিম।

বিশ্বখ্যাত নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস অটোমোবাইল সেফটি ল' বদলানোর জন্যে আইনের লড়াই চালিয়ে যে তরুণ আইনজ্ঞ বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন একদা সেই র‍্যালফ ন্যাডার প্লাজা স্যুট, বেয়ারফুট ইন দ্য পার্ক, দ্য অড কাপল, দ্য লাস্ট অব দ্য রেড হট লাভারস প্রভৃতি আলোড়নকারী গ্রন্থের লেখক নাট্যকার নেইল সিমন, নিউইয়র্ক সিটি ব্যালে, ব্রডওয়ে এবং টেলিভিশনের জনচিত্তজয়ী নায়ক এডওয়ার্ড ভিলেল্লা ক্লিভল্যান্ডের কৃষ্ণাঙ্গ পৌরপ্রধান কার্ল স্টোকস অলিম্পিকের স্বর্ণপদকজয়ী আইস স্কেটার ঝকমকে উজ্জ্বল তরুণী পেগি ফ্লেমিং নামজাদা সাংবাদিক বিল ময়ারস যুবক যুবতীর মন চনমনকারী নিগ্রো গায়িকা শার্লি জেরেট, নোবেল পুরস্কারবিজয়ী জেমস ওয়াটসন প্রমুখ 'সুপার স্টার'দের জীবনের বিচিত্র কথা কেমন করে তাঁরা অনেক ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করে শেষ পর্যন্ত খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছেন যে যার নিজের ক্ষেত্রে সে কথাই তুলে ধরেছেন লেখিকা মার্থা গ্রস তাঁর 'দ্য পসিবল ড্রিম' গ্রন্থে। লিখেছেন কখনো নাটকীয় ভঙ্গিতে আবার কখনো আলাপচারিতার ঢঙে। ফলে গোটা সংকলনে এসেছে বেশ মনোরম আমেজ। সাংবাদিক মার্থা গ্রস জন্মেছিলেন মিসৌরির সেন্ট লুইসে।

নতুন বই

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন—এরিক ফন দানিকেন। অজিত দত্ত অনূদিত। লোকায়ত প্রকাশন। পরিবেশক : দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ ৫৭ সি কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ১২। দশ টাকা

এরিক ফন দানিকেন-এর এটি দ্বিতীয় বই প্রথমটি—'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ'—আগেই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বইতেই দানিকেন উপস্থিত করেছেন মানুষ কি করে মানুষ হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর একটি সিদ্ধান্ত তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে। সিদ্ধান্তটি এই রকম: আজ থেকে হাজার চল্লিশ বছর আগে একদল বুদ্ধিমান জীব আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং পৃথিবীর মানুষের ক্রোমোজোমে মগজ ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই মানুষ বুদ্ধিমান জীব এবং তার এত দ্রুত উন্নতি। গ্রহান্তরের এই বুদ্ধিমান জীবরাই পৃথিবীর মানুষের কাছে দেবতা। তাঁদের দানেই মানুষ মানুষ। সিদ্ধান্তটি চাপানো নয়। এ জন্যে তিনি জীববিদ্যা প্রত্নবিদ্যা নৃবিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, গোটা দুনিয়া ঘুরে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শাস্ত্র ও পুরাণের হদিশ খাড়া করেছেন। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত, এবং জোরগলায় এই ঘোষণা যে একমাত্র এই সিদ্ধান্তের আলোতেই মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব বিজ্ঞানীরা এতোই ওড় খড় করুন না কেন। তাঁর মতে, মানুষ [illegible] জীব অচমকা মগজবান হয়েছে জৈবিক বিবর্তনে এ ধরনের ঘটনাটি সম্ভাবিত ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক কালের সব পুরাতত্ত্ব নিদর্শন তাঁর মতে, গ্রহান্তর থেকে দেবতাদের আগমনেরই সাক্ষ্য। শাস্ত্র ও পুরাণ এই দেবতাদেরই বহু স্মৃতি। এমনকি, দানিকেন বলছেন, দেবতাদের দানে মগজসমৃদ্ধ হবার পরেও মানুষ যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে তাও দেবতাদের কল্যাণেই। তিনি বলছেন এটা খুবই সম্ভব যে যে জ্ঞান আজ আমরা অর্জন করতে চলেছি সেই জ্ঞান সেই অজানা নক্ষত্রচরেরা সঙ্গে করে এনেছিলেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের জেনেটিক কোডের সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁদের প্রবুদ্ধ করে তুলেছিলেন। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের মূলেও যে আকস্মিকতা থাকছে তার মূলেও রয়েছে এই দেবতাদেরই আশীর্বাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন কেন? ভূমিকায় দানিকেন বলছেন, প্রত্যাবর্তন কেন? আমরা কি নক্ষত্রের রাজ্য থেকেই এসেছিলুম? চিরশান্তির আকাঙ্ক্ষা, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা স্বর্গের কামনা—এসবই মানবচেতনার গভীরে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে। সে কামনা সে আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে কোন সেই বিস্মৃতপূর্ব কাল থেকে। মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে

যে-বাস্তব-রূপায়ণের তাগিদ, তা থেকে কিছু অনুমান করা সম্ভব? একি শুধুই 'আকাঙ্ক্ষা' না কি, সে-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার আকাঙ্ক্ষা? নক্ষত্রলোকের জন্যে এই আকুলতার মধ্যে কি লুকিয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতরো কিছু? আমার বিশ্বাস, নক্ষত্রলোকে ফেরার এই আকুলতাকে জীইয়ে রেখেছে 'দেবতাদেরই' রেখে যাওয়া কোন উত্তরাধিকার। আমাদের পার্থিব পূর্বপুরুষদের স্মৃতি আর মহাকাশ থেকে আসা উপদেষ্টাদের স্মৃতি, দুই-ই আমাদের মানস পটে চির-সমুজ্জ্বল। মানব মস্তিষ্কে বুদ্ধির বিকাশকে বিবর্তনের ক্লেশসাধ্য দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরিণতি বলে আমার মনে হয় না। বিবর্তনের দীর্ঘসূত্রতার তুলনায় এ ঘটনা ঘটেছে তড়িৎগতিতে, অকস্মাৎ। আমার ধারণা, 'দেবতারাই' আমাদের পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কে বুদ্ধি 'বপন' করেছিলেন। আর সে দেবতাদের নিশ্চয়ই জানা ছিল বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা কৌশল।'

বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ—'নক্ষত্রলোকে বিহার'। নভশ্চরণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যা কিছু সম্ভব করে তুলেছে ও তুলতে পারে তার সাহায্য নিয়ে দানিকেন দেখিয়েছেন যে বহু আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রলোকে বিহার করাটাও পৃথিবীর এই স্বল্পায়ু মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। তারপরেই প্রশ্ন তুলছেন তাই যদি হয় তাহলে মহাবিশ্বে এমন কোন জীবের অস্তিত্ব কেন থাকবে না যাঁরা হাজার হাজার বছর আগেই গ্রহান্তর গমনের ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন, তথা আমাদের এ-গ্রহে পদার্পণও করেছিলেন।'

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—'জীবনের সন্ধানে'। দানিকেন এখানে প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতোই পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে জীবনের উদ্ভবের কাহিনী শুনিয়েছেন, তারপর কোটি কোটি বছর ধরে জীবনের বিবর্তন। কিন্তু মানুষ কেমন করে? দানিকেন বলছেন, 'প্রাক-মানব জীব, যাদের চেহারা তখনো বাঁদরের মত, তাদের থেকে নিয়ানডার্থালদের, অর্থাৎ যে-মানবগোষ্ঠী আমাদের পূর্বপুরুষ, তাদের অতি দ্রুত পৃথকীভবন দেখে প্রত্নতাত্ত্বিক-কুল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আলো এ ঘটনার মোটামুটি যে-ব্যাখ্যা তাঁরা দেন, তা হল স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন। আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষদের সেই নাটকীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাক-নৃতাত্ত্বিক কালকে যদি মেনে নিই তাহলে আমার প্রকল্প অনুযায়ী, অর্থাৎ অজানা বুদ্ধিমান জীবদের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে আদিম মানুষের কৃত্রিম পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে 'দেবতারা জেনেটিক কোডকে কাজে লাগিয়ে প্রথম কৃত্রিম-পরিব্যক্তি ঘটিয়েছিলেন খৃষ্ট-পূর্ব ৪০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগে। এবং দ্বিতীয় পরিব্যক্তি ঘটিয়েছিলেন আরো কাছাকাছি কোন সময়ে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ৭,০০০ থেকে ৩,৫০০ বছর নাগাদ।' এর মধ্যে একটা কাল-প্রসঙ্গের ব্যাপার আছে, নৃতাত্ত্বিকরা যদি তা মেনে নেন 'তাহলে কেমন করে আমাদের পূর্বপুরুষদের উৎপত্তি ঘটলো, কেমন করেই বা তাঁরা বুদ্ধিমান হলেন, এসব প্রশ্নের জবাব তো পলকে মিলে যাবে।'

পরের প্রবন্ধ—'শখের পুরাতাত্ত্বিকের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা'। এই প্রবন্ধে দানিকেন হাজারটা প্রশ্ন তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া যায় না, সবকিছুরই অমোঘ নির্দেশ গ্রহান্তর থেকে অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান, বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অতিমাত্রায় অগ্রসর একদল জীবের পৃথিবীতে আগমনের দিকে। তাঁরা ছিলেন 'রক্ত-মাংসে গড়া বাস্তব জীব"—তাঁরাই সম্পাদন করেছিলেন বিরাট সব প্রাযুক্তিক কর্ম বিশাল সব প্রত্নতাত্ত্বিক কান্ডকারখানা। তাঁরাই আমাদের কাছে 'দেবতা' তাঁরাই যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছেন মানুষের আদর্শ, মানুষের ধর্ম। শাস্ত্রে ও পুরাণে এই 'দেবতাদেরই' স্তুতি।

এমনি আরো আটটি প্রবন্ধ আছে এই বইয়ে। 'স্মৃতির মণিকোঠা' প্রবন্ধে জোরালো যুক্তিসহ এই বক্তব্য উপস্থিত করেছেন যে গ্রহান্তর থেকে আগত বুদ্ধিমান জীবরা আমাদের জীবনের কার্ডে প্রচুর তথ্য 'পাঞ্চ করে দিয়ে গিয়েছিলেন'—তারই নির্দেশে পরবর্তী কালের সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা। 'পবিত্র-পুঁথি সন্ধানে ভারত ভূমিতে' প্রবন্ধে আছে বেদ ও মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা, অন্যত্র পৃথিবীর আরও বহু ধর্মশাস্ত্র নিয়ে। ঋগ্বেদ ও মহাভারত সমেত বহু প্রাচীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে দানিকেনের বই চাঞ্চল্যকর নিঃসন্দেহে। তবে কথাটি এই যে বিজ্ঞানীরাও দাবি করেন তাঁরা সবকিছু জেনে বসে আছেন, সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। বরং যতো বেশি জানছেন, না-জানার পরিধিও ততোই বাড়ছে। কিন্তু যতোটুকু জেনেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে মিসিং লিংক থাকতে পারে, ফাঁকি নেই। নরবানর থেকে মানুষের বিবর্তনে, বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায়, কোথাও কোনো গোঁজামিল দিতে হয়নি। ভূতের অস্তিত্ব মেনে নিলে যেমন সবকিছুর চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এক্ষেত্রেও তাই—'দেবতাদের' মর্ত্যে আগমন। এই দেবতারা রক্তমাংসের জীব ছিলেন বটে কিন্তু একআধটাও ফসিল রেখে যাননি। শুধু আছে শাস্ত্রে ও পুরাণে তাঁদের স্মৃতি, আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মনগড়া ব্যাখ্যায় তাঁদের কৃতকার্যের সাক্ষ্য। আর এই 'দেবতাদের' কল্পনা অবশ্যই রোমাঞ্চকর, ভূতের কল্পনার মতো। এবং সম্ভবত বিভ্রান্তিকরও—এ-কারণে যে মানুষের কিছু করার নেই, সবই পূর্বনির্দিষ্ট ও পূর্ব-নির্ধারিত, 'দেবতাদের' দানের ফল ইত্যাদি।

অজিত দত্তর অনুবাদ, এককথায় চমৎকার। বইয়ে ৭৭টি ছবি আছে, তার মধ্যে অনেকগুলো আর্টপ্লেট—প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের, যেগুলো দানিকেন 'দেবতাদের' সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করতে চান।

কাব্যানল (প্রবন্ধ)—বারীন্দ্র বসু। রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন, ২৪, মাগুরআটি রোড, কলিকাতা-২৮। সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'নিবেদন' অংশে লেখক শ্রীবারীন্দ্র বসু জানিয়েছেন, 'আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষ যুক্তির মানদণ্ডটিকে সব সময় সক্রিয় রাখতে।' শ্রীবারীন্দ্র বসু যে সমস্ত বিষয় অবলম্বন করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছেন, সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিহারীলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-

ভাবনা ও কাব্যবিচার প্রসংগ আলোচনায় লেখকের পক্ষে নিরপেক্ষ মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ ইতিপূর্বে এ'রা ছাত্রপাঠ্য হওয়ায় ও নানা-ভাবে বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদদের কাছে আলোচিত হওয়ায় এ'দের একটি প্রায় স্থায়ী আলোচিত রূপ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে বারীন্দ্রবাবু যে সত্যই একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে আলোচনা গুলিতে সং সমালোচকের সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিচেতনা', 'কবি বিহারী লাল প্রসংগে', 'অ-দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত' ও 'বলাকাঃ কবি, কাব্য ও তত্ত্ব'—এই চারটি দীর্ঘ প্রবন্ধের সংকলন হল 'কবিমানস' গ্রন্থটি। বারীন্দ্রবাবুর আলোচনা কোথাও আবেগে যুক্তিহীন হয়নি, আবার যুক্তিতর্কে পড়ে এতটুকুও সাহিত্যরস বর্জিত হয়ে ওঠেনি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে বারীন্দ্রবাবু সমালোচনা করে গেছেন। কোথাও কোথাও মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু বারীন্দ্রবাবু যা বলেছেন তাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্থায়ী সিদ্ধান্তগুলিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় মেলে। বারীন্দ্রবাবুর এ গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ এর সহজ সরল ভাষা ও সাবলীল প্রকাশভংগী। স্বভাবী ছাত্র-পাঠক ও সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীর কাছে এ গ্রন্থ নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

তাঁর নাম (কবিতা-পুস্তিকা)ঃ ডকটর ভবেশচন্দ্র চৌধুরী; অনুবাদ ডকটর সুকুমার বসু ও শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত, সম্পাদনা ডকটর সবদ। জ্ঞানসাগর পাবলিশিং হাউস বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি। মূল্য এক টাকা।

ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে দর্শনাচার্য ডকটর ভবেশচন্দ্র চৌধুরী হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। মাত্র কিছুকাল আগে তিনি লেখেন একটি কবিতা পুস্তিকা His Name! নব্য বেদান্তের আলোয় বাঁচত এই মূল্যবান কাব্য-অর্ঘ্যে তুলে ধরলেন ভারতীয় পুরাণের এক মূল্যবান দিক। লিখলেন বিষ্ণু পুরাণের প্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপুর কাহিনীর সারমর্ম। কীর্তিত হল ভগবানের প্রতি অবিচল আস্থার শুভ পরিণাম।

সম্প্রতি এই ইংরিজি কবিতা-পুস্তিকার অনবদ্য কথানুবাদ করেছেন ডকটর সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত। এবং এই অনুবাদ এমনই ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত যে ভাষান্তর বলেই মনে হয় না। ফলে শুধু ভক্তের কাছেই নয় কাব্যানুরাগীদের কাছেও এই অনূদিত কবিতা-পুস্তিকাটি সমাদৃত হবে।

কাজিয়া।। জীবন সরকার। অনাদিনী। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস। কলকাতা-৪৫। দাম ঃ চার টাকা।

লেখকের প্রথম গ্রন্থ এটি—নির্বাচিত ছোটগল্পের সংকলন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬-'৭১-এ লেখা এই গল্পগুলি।

জীবন সরকার খ্যাতনামা লেখক নন, কিন্তু সং লেখক এবং স্বতন্ত্র জাতের লেখক। আধুনিকতার কৃত্রিমতা নেই তাঁর রচনায়; যেমন সরল বক্তব্য তেমনি সহজ অনাড়ম্বর তাঁর ভাষা।

সহৃদয়তা জীবন সরকারের রচনার একটি মহৎ গুণ। এই গুণেই তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনাই হয়ে উঠেছে সজীব। 'কালো হাঁস'এর 'মণ্ডল'র ব্যর্থ জীবন নদীর জলে তলিয়ে যাবার আগে পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। 'কাছিমটাকে মারতে লেখকের সংগে দরদী পাঠককেও যেতে হয় ধলেশ্বরী নদীতে।

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী—সম্পাদক অশোক কুণ্ডু। অশোক নিলয়, বোড়হল, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী। দশ টাকা।

শ্রীঅশোক কুণ্ডু তেরশ আঠাত্তর সাল থেকে এই সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' প্রকাশের প্রারম্ভ কাল বলে 'উৎসর্গ' অংশে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তেরশ উনআশি সালে পরিবর্ধিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশিত। শ্রীকুণ্ডুর এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। লেখকের উদ্দেশ্য—এমন একটি বই সংকলিত করা যা থেকে 'বাংলা সাহিত্যের নাড়ী-নক্ষত্র জানা যাবে'। উদ্দেশ্য সাধু নিঃসন্দেহে কিন্তু সফল করা যে সহজসাধ্য নয়, বর্তমান গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। একটি বিশেষ বছরের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে যদি বর্ষপঞ্জী হয়, তবে এ গ্রন্থ তা পূরণ করে না। সম্পাদক বহু বিষয় বাদ দিয়েছেন বা নিজের আয়ত্তে নেই বলে এড়িয়ে গেছেন।

বস্তুত মাত্র একক সম্পাদনায় 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রকাশ সম্ভব নয়। নতুন পত্রিকার প্রকাশ তালিকা' যিনি তৈরী করছেন সেখানে যে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সততা থাকবে, তাকে সমভাবে রেখে আবার তিনিও সম্পাদনায় অন্যান্য কাজগুলি করবেন সমান দক্ষতায়—তার প্রমাণ এ গ্রন্থে নেই। এককভাবে হতে পারে, কিন্তু তার জন্য যে অভিনিবেশ অনুসন্ধান প্রয়োজন, তা সম্পাদক দিতে পারেননি। ইতিপূর্বে 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা দেখেছি, অধুনা 'বাগর্থ' প্রকাশন সংস্থা 'জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী'র গ্রন্থমালায় এক-একজন সাহিত্যিক ধরে গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। সে সমস্ত গ্রন্থে, পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় রেখেছেন, বর্তমান সম্পাদক সেক্ষেত্রে হতাশ করেছেন। কতকগুলি বিষয় প্রবন্ধকারে ... বোঝা গেল না—তাতে আকৃতি অকারণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছদ্মনামের তালিকায় ... ছদ্মনাম বাদ পড়েছে, অনেক ছদ্মনামের সংগে আসল নাম ঠিক নয় বলে মনে হয়েছে। সম্পাদকের তরফ থেকে এ বিষয়ে আরও তৎপর এবং সঠিক হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থটি আরও সুপরিকল্পনা ও সমবেত প্রয়াসের ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত।

নীল আলোর হরিণ (কাব্য সংকলন)— বেণু দত্তরায়। এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

শ্রীবেণু দত্তরায় তরুণ কবি। সম্ভবত এ'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আলোর হরিণ'। মোট সাঁইত্রিশটি গীতিকবিতার সংকলন হল আলোচ্য গ্রন্থটি। কবি সচেতনভাবেই ছন্দ সম্পর্কে পরীক্ষার কাজে নেমেছেন কয়েকটি কবিতায়। চরণকে ভাবের সংগে স্বাভাবিক করে চরণভাঙা ও ভাবের ওঠা-নামায় স্তবক গঠন করেছেন বিচিত্রভাবে। কবি রোমান্টিক। তাই গীতি-কবিতাগুলিতে লিরিক মূর্ছনা যেন-বা স্বতঃস্ফূর্ত। কয়েকটি কবিতায় কবি রোমান্টিক কল্পনার সুস্থ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চিত্র-রচনার মধ্যে অনুভূতির গভীর অভিজ্ঞতা ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

খুনের আরেক নাম রাজনীতি (উপন্যাস)। প্রশান্ত রায়চৌধুরী। ... পাবলিকেশন, ৭-এ, ... নিয়োগী লেন কলকাতা-৪। দশ টাকা।

যে রাজনৈতিক পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসটি রচিত, সে পটভূমিটিকে লেখক নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে উপস্থিত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক বিপ্লব বসু রাজনীতি করে। এ উপন্যাসের আরম্ভ উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালে, শেষ ১৯৭০-এ। বিপ্লব বসুর জন্ম ৯ আগস্ট, উনিশ শ বিয়াল্লিশ। তাই তার পথপ্রদর্শক, তার রাজনীতির গুরু দাদু, যার কাছে সে বাবা মারা যাবার পর মানুষ হয়, নাম রাখেন বিপ্লব। বিপ্লবের কৈশোর-যৌবনের বান্ধবী জলী, সে বিপ্লবের রাজনৈতিক জীবনের প্রেরণাদাত্রী। বিবাহ করে ছাত্রী মনীষাকে, কিন্তু শ্যালিকা মণিকা তার রাজনৈতিক জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় মনীষা প্রচণ্ড অভিমানে মৃত্যু বরণ করে ও মণিকাকে বিবাহ করার জন্য সুপারিশ করে যায়। মণিকা-বিপ্লবের বিবাহিত জীবনে আসে 'শান্তি'—একটি সন্তান। উপন্যাসের শেষে জলীর স্বামী হত্যার মিথ্যা দায়ে বিপ্লব ধরা পড়ে জেলে যায়, আর ফেরেনি। বিপ্লবের জীবনের গতিতে রাজনীতি কিভাবে খুনকেই সত্য করে, রাজনীতির অর্থ বদলে দেয়, এ উপন্যাস তাই অন্তরঙ্গতার সংগে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্র সুঅংকিত। গ্রন্থটি রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মত। লেখকের বিষয়-ভাবনা নিরপেক্ষ কিন্তু রূঢ় বাস্তব সংগে উজ্জ্বল।

প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক বৈষ্ণবকুলতিলক মহাত্মা শিশিরকুমারের মৃত্যুবার্ষিকী প্রতিপালিত হল গত ১০ই জানুয়ারী। স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ যে সত্যই ক্ষণজন্মা মহাপ্রাণ মনীষী ছিলেন, তা তাঁর জীবনের অসামান্য কর্মদক্ষতা থেকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি একাধারে যেমন ছিলেন স্বদেশপ্রাণ, দেশহিতব্রতী ও পরোপকারী, তেমনি একনিষ্ঠ সাংবাদিক, বহুবিধ গ্রন্থের প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও বদান্যশীল ব্যক্তি। বহু দুর্লভ গুণের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে।

যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে তাঁর আবির্ভাব হয় ১৮৪২ সালে এবং আজ থেকে ৬২ বৎসর পূর্বে ১৯১১ সালের ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্নে ২ ঘটিকায় তাঁর তিরোধান ঘটে। শিশিরকুমারের পরলোকগমনের সংবাদ তৎকালীন ভারতের তথা বাংলাদেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সকল শ্রেণীর পত্রিকাতেই বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং শোকসভার আয়োজনও হয় বহু স্থানে। বর্তমানে তাঁর চিত্রসহ তিরোধান দিবসের সংবাদ বিভিন্ন মহাপুরুষ ও সাধুসন্তদের সঙ্গে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাতেও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মহাত্মা শিশিরকুমার পরম বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন, তৎকালীন নবভাবে ভাবিত, সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনের মুখপত্র মাসিক 'দেবালয়' নামক পত্রিকায়, ১৩১৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শিশিরকুমারের তিরোধান সম্পর্কে যে বিশেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে সেটি আমরা সম্পূর্ণ তুলে দিলাম। এ থেকে তাঁর প্রতি এই পত্রিকাগোষ্ঠীর অনন্যসাধারণ ভক্তি ও মূল্যায়নের যাথার্থ্য সম্যকভাবে অনুভাবিত হবে। রচনাকারের নাম কুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

"নব্যভারতের ইতিহাসে এমন একটা দিন আসিয়াছিল, যখন শিক্ষিত ভারতবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকদের ন্যায় মনে করিত যে, আমরা আমাদের অতীতকে একেবারে উপেক্ষা ও অমান্য করিয়া, প্রতীচ্য সভ্যতা ও সাধনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক নিজেদের দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত ও মহীয়ান্ করিব। সভ্যতার ইতিহাসে সমাজ-জীবনে এপ্রকারে একটা সন্দেহ ও সমালোচনার যুগ আসিয়া থাকে—ইহা অভিব্যক্তির সনাতন ব্যবস্থা, সুতরাং সেই অতীত যুগের নেতৃবৃন্দও আমাদের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

এই যুগের অবসানে যখন অন্য একটা যুগের,— একটা সমন্বয়ের যুগের আবির্ভাব হইল—যখন 'কুষ্মাণ্ড' বুঝিল 'চন্দ্র সূর্য কেহ নয় মাটী তার খাঁটি'—আমরা আমাদের অতীতকে ছাড়িয়া বড় হইব না, প্রাচীনকে তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা যথাযথ দান করিয়া, নবীনের সহিত তাহার যথার্থ সমন্বয় সাধনই আমাদের মঙ্গলের পথ—এই যে নবযুগ ইহার প্রভাতে আমরা যে সমস্ত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই শিশিরকুমার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

জাতীয় ভাবই শিশিরকুমারের যথার্থ ভাব—ইহাই তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ, এই ভাবের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের ভাষা বৈদেশিক স্বদেশপ্রেমের অনুবাদ নহে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়া স্বদেশপ্রেমের বাক্যগুলি আয়ত্ত করেন নাই—ইহা তিনি তাঁহার পল্লীভবনে বসিয়া অতি শৈশবে সহস্র সহস্র উৎপীড়িত কৃষকের কাতর আর্ত্তনাদের মধ্য হইতে পাইয়াছিলেন। এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা ও আদর্শের জন্যও তিনি পাশ্চাত্য জগতের মুখাপেক্ষী হয়েন নাই—বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের জীবনী ও শিক্ষা তাঁহাকে সে উন্মাদনা ও সে শক্তি দান করিয়াছিল।

স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন জাতীয় ভাবের আদি ও সর্ব্বপ্রধান কবি—তিনি ভারতের জাতীয় একতার মনোমুগ্ধকর ছবি একটা যথার্থ ভিত্তির উপর রাখিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নবীনবাবুর আত্মজীবনীতে যখন পড়ি যে, তাঁহার স্বদেশ প্রেম যশোহরে অবস্থিতিকালে শিশিরবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন বুঝিতে পারি প্রত্যক্ষভাবে কার্য করা ব্যতীত সাধারণের অগোচরে শিশিরবাবুর জীবনী ও শিক্ষা কত বড় কার্য্যসাধন করিয়াছে।

ভারত-বন্ধু কেইন্ সাহেব শিশিরকুমারের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই দেশের অধিবাসীগণের অবস্থা সম্বন্ধে শিশিরকুমারের যে জ্ঞান ছিল তা বড়ই দুর্লভ। এই কথাটি যে একটি কত বড় সত্য তাহা আমরা অনেক সময়েই ভাবিয়া দেখি না। তৎপ্রণীত Indian Sketches নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে বাঙালী মাত্রের অনেক চিত্তগত অবসাদ ও নিরাশা দূরীভূত হইবে। আমাদের অতীত ইতিহাস ভীরুতা, অজ্ঞানতা বা স্বার্থপরতার কাহিনী নহে, আমরা বৈদেশিকগণের কথাকেই বেদবাক্যবৎ অভ্রান্ত ধরিয়া তাহারই পুনরা-

ব্যস্ত করিয়া চলিয়াছি—প্রধানত এই জন্যই আমাদের মধ্যে এত গৃহকলহ, এত খণ্ডতা। আমাদের অতীত একটি নিন্দার কথা নহে, ইহা শিশিরকুমার অতি কৃতকার্য্যতার সহিত দেখাইয়া গিয়াছেন। বিহারী সর্দ্দার একজন দস্যু হইলেও সে আমলের বাঙালী নির্জ্জীব ও মনুষ্যত্বহীন ছিল না, আমাদের প্রপিতামহগণ যথার্থভাবেই স্বায়ত্ব শাসনের শক্তির অধিকারী ছিলেন, আমাদের বৃদ্ধা পিতামহী মাতামহীগণ জ্বলন্ত চিতায় যখন স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সহিত সহমরণে যাইতেন, তখন আমরা কেবল বর্ব্বরতা ও কুসংস্কারই দেখিতে পাই—কিন্তু ইহার মধ্যে যে বিশ্বাস, যে ভক্তি, যে আধ্যাত্মিকতা নিহিত রহিয়াছে তাহা কেবল ভারতবাসী হিন্দুকে নহে জগতের সমস্ত জাতিকেই উন্নত ও মহীয়ান করিতে সক্ষম। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে আমরা কেবল ভীরুতাই দেখিয়াছি, কিন্তু সেই সময়ের সভ্যতা যে একটা উন্নততর ও মহত্তর পদার্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই সেই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

জাতিকে যথার্থভাবে জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে, অতীতের সম্মুখে দাম্ভিক সমালোচকের মত দাঁড়াইলে হইবে না; জিজ্ঞাসু শিষ্যের মত বিনীতভাবে জানু পাতিয়া বসিতে হইবে, তবেই আমরা স্বদেশের প্রেমসাধনায় শিক্ষালাভ করিতে পারিব—ইহাই শিশিরকুমারের জীবনের একটি প্রধান শিক্ষা।

ভারতবর্ষের যাহা অন্তর্প্রকৃতি, যাহা উপনিষদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতির মধ্যে পরিস্ফুট হয়, সেই উচ্চ আধ্যাত্মিকতাই শিশিরকুমারের মাথার মুকুট এবং তাহাই যথার্থভাবে শিশিরকুমারকে তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীগণের মাথার মুকুট করিয়াছে। আজকাল সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়তাবাদ একই হুজুক হইয়া পড়িয়াছে, এখন হয়ত সে ঝেঁক একটু কমিতেছে, কিন্তু মাঝে ইহা একটা খুব গর্ব্ব করিবার বস্তু হইয়াছিল। সেই যুগে শিশিরকুমারের উন্নত আধ্যাত্মিকতা নব্য ভারতকে অনেক পরিমাণে যে প্রকৃতিস্থ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙালী দার্শনিক সভ্য জগতের মনীষিগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, বাংলাদেশে আবির্ভূত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম কেবল বর্ত্তমান ভারতকেই গৌরবযুক্ত করিবে না বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনা এমন স্থানে আসিয়া স্থগিত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মহাধর্ম্মের প্রেরণাই তাহাকে এখন আরও উন্নতস্থানে লইয়া যাইতে পারে। দরিদ্র বাঙ্গালী ইহা অপেক্ষা গৌরবের কথা আর কিছুই বলে নাই। এই যে উক্তি এ উক্তির মূলেও শিশিরকুমারের সাধনা ও শিক্ষা বিদ্যমান।

শিশিরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শিক্ষিত বাঙালী ও ভারতবাসীকে এবং সমগ্র সভ্য জগতকে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, যাহা জীবনের উচ্চতম অধিকার, তাহা প্রদান করিবেন, সে কার্য্য তিনি অনেক করিয়া গিয়াছেন, পার্থিব দেহে যতদূর সম্ভব ততদূরেই তিনি করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি তাঁহার তিরোভাবের দিন প্রাতঃকালে তৎপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থের শেষ ফর্মার প্রুফ স্বয়ং দেখিয়া গিয়াছেন। এখনও তিনি অশরীরী রহিয়াছেন, উপযুক্ত পাত্রে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।

ধর্ম্মশীলতা ও লোকহিতৈষণা পরস্পর বিরোধী নহে, গভীর ভগবৎ প্রেমের সহিত, দেশের জন্য সাধারণের জন্য অকাতর পরিশ্রমই জীবনের আদর্শ। আর এই আদর্শের জন্য বৈদেশিক গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে না, দেশেই যে মহান আদর্শ রহিয়াছে ইহা শিশিরবাবুর জীবনের আর একটি খুব বড় শিক্ষা।

শিশিরকুমারের জীবনের একটি শিক্ষা এই দরিদ্র দেশের সর্ব্বত্র স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাখা প্রয়োজন। যিনি খেলাইতে জানেন, তিনি কাণাকড়ি লইয়াও খেলিতে পারেন। দেশের সেবা করিবার, স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা সত্যই যাহার মনে জাগিতেছে, তাঁহার নিরাশ হইবার কারণ নাই;—শিশিরকুমার কত বিঘ্ন কত বিপদ ও কত অভাবের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্রত উদযাপন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে নিতান্ত শক্তিশালীর প্রাণেও আশা ও আনন্দের উদয় হইবে।

এখন শিশিরকুমার নিত্য বৃন্দাবনের অনন্ত আনন্দমধ্যে বিদ্যমান হইলেও, দেশের দুঃখে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত —দেশ তাঁহাকে বরণ করিয়াছিল, তিনিও দেশকে ধন্য করিয়াছেন—তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইব।"

•

প্রমথনাথ সান্যাল সম্পাদিত 'সাহিত্য-সংবাদ' পত্রিকার ১৩১৯ সালের মাঘ-সংখ্যায় শিশিরকুমারের বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠানের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বের এই স্মৃতিসভার সংবাদটি থেকেও তাঁর প্রতি তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহের শ্রদ্ধার একটি প্রকৃষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। সংবাদটি হচ্ছে—

স্মৃতি-সভা

"বাঙ্গালার সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ শিশিরকুমারের স্বর্গারোহণের দিন স্মরণ করিয়া বিগত ৪ঠা মাঘ শুক্রবার তাঁহার পার্থিব কর্মক্ষেত্রে উৎসব-সমারোহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহার ভক্ত, অনুরক্ত, সুহৃদ, আত্মজন অনেকেই সে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার বাঙ্গালীর কি ছিলেন, বাঙ্গালীর তিনি কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী হয়তো এখনও তাহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যতই দিন যাইবে, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, ততই তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

তিনি কর্ম্মী ছিলেন, তিনি জ্ঞানী ছিলেন, তিনি ভক্ত ছিলেন। একাধারে তাঁহাতে তিন ভাবেরই বিকাশ পাইয়াছিল। তিনি যখন স্বদেশের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া রাজনীতির আন্দোলনে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সেই মধ্যাহ্নালোকে দিক্‌-দিগন্ত উজ্জ্বল হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অতীত ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলসূত্র যাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন, শিশিরকুমারের কর্ম্ম-জীবন তাঁহাদের স্মৃতিপটে চিরঅঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে এ-দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন গুরু বলিলেও বলা যাইতে পারে।

অন্যদিকে, তাঁহার 'অমিয়-নিমাই চরিত' তাঁহার জ্ঞানভক্তির মন্দাকিনী ধারা। তিনি কিরূপ জ্ঞানী, কিরূপ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, একমাত্র 'অমিয়-নিমাই চরিতের' উল্লেখ করিলেই সে দৃষ্টান্ত প্রকটিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল; শিশিরকুমার তাহাতে নবজীবনের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকিবে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের নামও কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। তাঁহার ন্যায় ভাব-বিভোর ভক্ত অধুনা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন নামগানে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইতেন, তাঁহাতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইত বলিয়া ভক্তগণ বিশ্বাস করেন। তেমন সরল শান্ত ভগবদ্‌ভক্ত আর কি আমরা দেখিতে পাইব।

যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। শিশিরকুমার গিয়াছেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তবে তাঁহার প্রভাব বাঙ্গালী জাতির মধ্যে চিরজাগরূক রহিবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তাঁহার ন্যায় মহাত্মার বিষয় যত আলোচনা হয়, তাঁহার ন্যায় মহাত্মার কর্মকাহিনী যতই স্মরণ করা যায়, ততই মঙ্গল। শিশিরকুমারের ন্যায় মহতের স্মৃতি-সভায়, তাঁহাদের কর্ম্মকাহিনীর আলোচনায়, প্রাণে উচ্চ ভাবের সঞ্চার করে। তাঁহার ন্যায় মহতের কথা স্মরণে, মন মহত্ত্বের দিকেই প্রধাবিত হয়।"

নালান্দার ধ্বংসস্তূপ
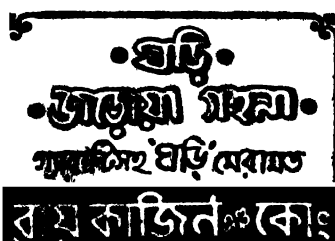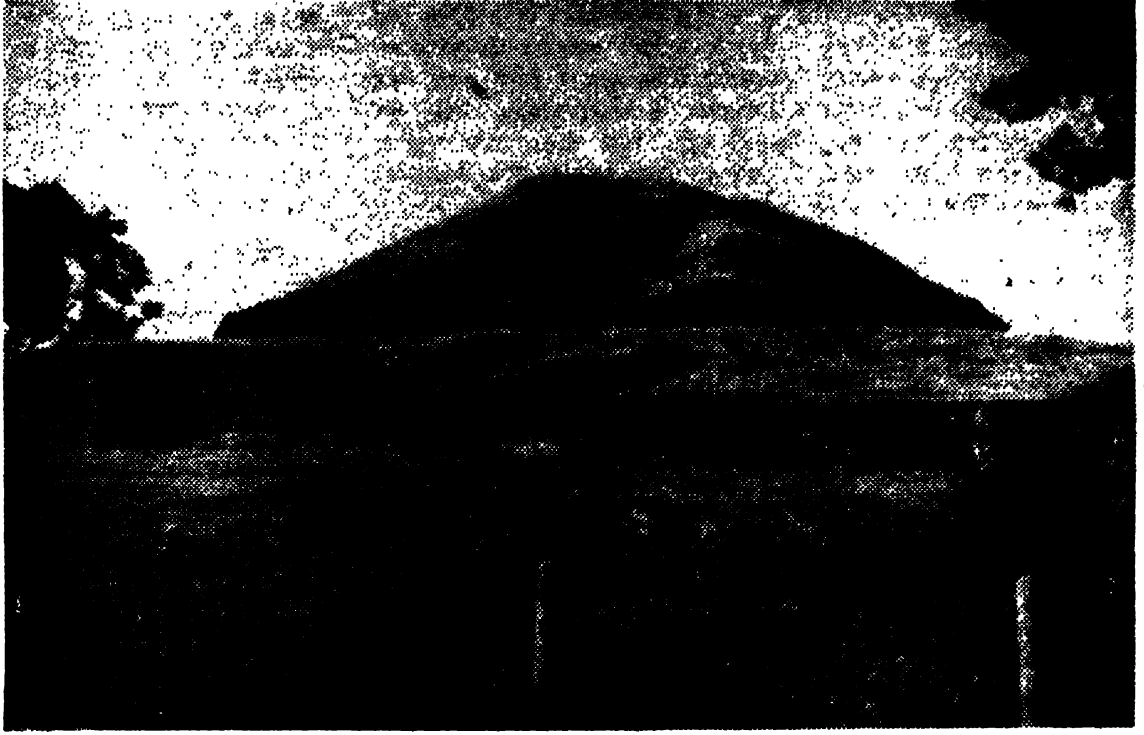
ইতিহাসের সাক্ষী ॥১

শ্যামল পাঠক

কিছুই ঠিক ছিল না আগে হঠাতই এবার বেরিয়ে পড়েছিলাম। প্রতিবেশী শংকর আমার ভাইয়ের মতো, মোগলসরাই-এ কাজ করে। ছুটিতে ও বাড়ী এসেছিল। শুনলাম পাটনাতে ওদের একটি শাখা অফিসে কাজ শেষ করে ও মোগলসরাই ফিরবে। শুনেই আমি সংগী হলাম। চলার পথে দেখে এলাম ইতিহাসের সাক্ষীদের। প্রাচীন ভারতের গৌরব ও ঐতিহ্যের চিহ্ন নিয়ে আজো তারা অনেকেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের সে প্রাণ-প্রাচুর্য আর নেই। নেই অনেক কিছুই। মহাকাল তাদের গ্রাস করেছে। তবু যেটুকু ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে, প্রতি মুহূর্তেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতের অতীতের সমৃদ্ধি ও আদর্শের কথা। তাই ইতিহাসের পটে বার বার মিলিয়ে দেখতে চেয়েছি বর্তমানকে। যতই দেখছি মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি। ফিরে এসেও তাদের কথা ভুলতে পারিনি। আমার সমস্ত মনকে জুড়ে রয়েছে ইতিহাসের সেই সকল ক্ষত-বিক্ষত প্রহরী। সেই সংগে ভালবেসেছি চলার পথে ক্ষণিকের বন্ধুদের। তাদের কথাই কি ভোলা যায়?

পঁচিশে অক্টোবর, বুধবার রাত্রে মাত্র দুখানা কম্বলের বিছানা সম্বল করে আর সামান্য পোষাক সংগে নিয়ে যাত্রা করলাম পাটনার পথে। হাওড়া স্টেশনে টিকিট কেটে জনতা এক্সপ্রেসে উঠে জায়গা করে বসলাম। আমাদের সামনের বেঞ্চে এক মধ্যবয়স্কা ভদ্র-মহিলা। তাঁর সংগে বারচৌদ্দ বছরের একটি ছেলে ও সাত-আট বছরের মেয়ে। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথায় যাব। শুনে বললেন উনিও পাটনায় থাকেন। স্বামী ইঞ্জিনীয়ার। এর আগে ওঁরা দিল্লী ছিলেন। বহু বছর পরে কলকাতায় এসেছিলেন। অনেক কথা হল। কথাবার্তার মাধ্যমে অল্প সময়েই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। কখন যেন মাসিমা বলতে সুরু করেছিলাম। মনেই হচ্ছিল না কয়েক ঘন্টা আগে ওঁকে চিনতামই না। নানা গল্পে সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল। এক সময় উনি আমাকে কিছু মিষ্টি খাওয়াতে চাইলেন। আমি অস্বীকার করায় বোধহয় ক্ষুণ্ণ হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে আবার ঘনিষ্ঠ হবে বললেন জান, তোমার মতো বয়সেরই আমার একটা ছেলে ছিল। আমার স্বামীর কাছে অনেক ছেলেই চাকরীর খোঁজে আসত। একবার একটা ছেলে এল। সে আমার সেই ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে গেল বেনারস। সেখানে গংগায় ওরা স্নান করতে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার খোকা পা পিছলে পড়ে যায় ঘাটে। মাথায় নাকে আঘাত লাগল। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে হাস-পাতালে পাঠান হল। খবর পেয়ে আমরাও ছুটে এলাম। কিন্তু খোকার আর জ্ঞান ফিরল না। কোনদিন সে আর আমাকে মা বলে ডাকবে না। মাসিমার চোখ সজল হয়ে উঠল। আঁচলে চোখ মুছে চুপ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, অনেক রাত হল আজ থাক। উনি ঘুমোবার চেষ্টায় রইলেন। শংকর তখন ঘুমে অচেতন। আমি চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোর সংগে অন্ধকারের স্রোত তখন বাইরে মাতামাতি করছে।

ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত বগি ঘুমে ঢলে পড়েছে। ততক্ষণে বেশ শীত পড়েছে। ব্যাগের ভিতর থেকে কম্বলটা বের করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। পাশের দিকে বেঞ্চে নজর পড়তে দেখলাম এক ভদ্রলোক একা জেগে। পাশে স্ত্রী ও শিশু পুত্র ঘুমিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন আমিও এভাবে ঘুমোতে পারি না।

উনি কালীঘাট থেকে এসেছেন। কয়েক-দিনের জন্য রাজগীরে বেড়াতে যাবেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে আর স্টেশন পেলেই চা খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে সূর্যের আলো ফুটে উঠল। গৈরিক মাঠের মধ্যে সূর্যের আলো পড়ে এক অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করল। পাহাড়ী মাটিতে সূর্যের লাল আলো পড়ে যেন রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। শংকর তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ঠেলে তুলে সেই দৃশ্য দেখালাম।

গাড়ী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। একের পর এক স্টেশন পিছনে ফেলে সকাল সাড়ে দশটায় পাটনা স্টেশনে এসে থামল। সকলকে বিদায় জানিয়ে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে এলাম। স্টেশনটি বেশ বড়। বাইরেও অনেকটা খোলা জায়গা। একটা রিক্সা নিলাম। দুদিকের বাড়ী-ঘর দেখতে দেখতে গান্ধীময়দান পেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে শংকরদের অফিসে এসে পেঁছালাম।

অফিসে বলেছিলেন গ্রাণ্ড-ম্যানেজার কালী ব্যানার্জি। শংকর পরিচয় করিয়ে দিল। আমি মাঝে মাঝে কাগজে লিখি শুনে উনি তো খুব খুশী। ওখানেই পরিচয় হল প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও বাবলু ঘোষের সঙ্গে। দুজনেই ওখানে কাজ করেন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই ওরা আমাকে আপন করে নিলেন। কালীবাবু চায়ে আপ্যায়িত করলেন। অনেক সময় ধরে গল্প-গুজব করে সময় কাটালাম। তারপর একটি হোটেলে খেয়ে ফিরে এসে প্রশান্তবাবুর বিছানাতেই শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে বেড়ালাম সকলে মিলে। তখন শহর আলোয় ঝলমল করছে। শহরের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ গল্প করে রাত্রে হোটেলেই আহারপর্ব শেষ করলাম।

পাটনার হোটেলে খেতে বেশ খরচ হয়। সবকিছুই, এমন কি ডাল-তরকারীও আলাদা দামে কিনতে হয়। আর তরকা নামে ডাল-সর্বস্ব যে তরকারী তা আমাকে খুবই নিরাশ করল। দামের ব্যাপারেও পাটনায় আমি খুশী হতে পারলাম না। যাই হোক রাত্রে ফিরে এলাম। অফিসঘরেই মেঝেতে ঘুমানোর আয়োজন করা গেল। আয়োজনই বটে। আগেই বলেছি দুটি মাত্র কম্বলই আমার ভরসা। একটি কম্বল বিছিয়ে অপরটি গায়ে দিলাম। আমার অবশিষ্ট জামা-প্যান্ট ভাঁজ করে তোয়ালে মুড়ে বালিশ বানালাম। পরিশ্রান্ত দেহে বেশ সুখশয্যাই মনে হল। কিন্তু ইতিমধ্যে অসংখ্য মশা আমাদের আক্রমণ করেছে; বোধহয় ওদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে। সঙ্গে মশারি নেই, অতএব যুদ্ধ একতরফা। এদিকে শীতও পড়েছে বেশ। শেষে নিরুপায় হয়ে শীতের মধ্যেই পুরোদমে পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! এই অবস্থাতেও বেশ কিছুটা ঘুমিয়েছিলাম।

পরদিন ভোরে রাজগীর যাবার কথা। রাত সাড়ে তিনটের সময়েই আমার ঘুম ভেঙে গেছে, বোধহয় মশারাই এ্যালার্ম। ঘুম থেকে উঠে আলো জেলে দেখলাম কম্বলের বাইরে থাকা আমার হাত ও মুখ ফুলে গেছে—শংকরেরও। উঠেই হৈ-চৈ করে সকলকে ঠেলে তুললাম। আমার সঙ্গে শংকরের যাবার কথা। কিন্তু একটু পরে প্রশান্তবাবু ও বাবলুবাবুকেও ব্যস্ত হয়ে তৈরী হতে দেখা গেল। ওঁরা বললেন, আমরাও কিন্তু যাচ্ছি। অথচ আগেরদিন রাত্রেও যেতে চাননি।

খুব ভোরেই আমরা রওনা হলাম। বাস-স্ট্যাণ্ডেই চা-পর্ব শেষ করে ভোরের বাসে যাত্রা করলাম। বাসে দেখলাম অধিকাংশ যাত্রীই বাঙালী। অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলাম। ইতিমধ্যে বাস ছেড়ে দিল। খুব দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল রাজগীরের দিকে। জানালা দিয়ে দেখলাম সবুজ ক্ষেত, গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রাম, কখন বা আঁকা-বাঁকা নদী। মনে হল শিল্পীর ক্যানভাসে ধরা পড়েছে কতগুলি নিখুঁত রঙীন ছবি। প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। পাটনা থেকে রাজগীর চৌষট্টি মাইল পথ। এতটা পথ, কিন্তু মনে হল বেশ তাড়াতাড়িই পেঁছে গেলাম।

অনেক দূর থেকেই রাজগীরের পাহাড়-শ্রেণী দেখা যাচ্ছিল। উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে-ছিলাম। বাস থামতেই নেমে পড়লাম। দু-চোখ ভরে দেখলাম পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত মুক্ত প্রকৃতির লীলাভূমি--প্রাচীন মগধের রাজধানী এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও মুসলমানদের তীর্থস্থান রাজগীর বা রাজ-গৃহকে। রাজগৃহ ছিল প্রাচীন ভারতের এক সমৃদ্ধিশালী নগরী। এই ঐতিহাসিক ভূমিতে ভারতের ইতিহাসের অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। এই ভূমিতেই বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভের আগে একসময়ে পাঁচ বছর তপস্যা করেছিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের পরেও মগধ সম্রাট বিম্বিসারের সময়ে এই স্থানটি ছিল ভগবান বুদ্ধের অত্যন্ত প্রিয়। বিম্বিসারের শাসনকালেই রাজগৃহ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। এই সময়েই অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাবীরও রাজগীর এবং নালন্দায় কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। বুদ্ধদেব ও মহা-বীর দুজনেই ছিলেন অজাতশত্রুর সম-সাময়িক। অজাতশত্রুর পর উদায়ীভদ্র সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালেই পাটলীপুত্র নির্মিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-গৃহের গৌরবও হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য হিন্দু, বৌদ্ধ জৈন ও পর্যটকদের দৃষ্টিতে রাজগীরের মাহাত্ম্য আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। কিন্তু আজ আর সেই রাজগৃহ নেই, সেই তার রাজমহিমা। শুধু দেখা যায় চারদিকে ছড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপ। মুগ্ধ হয়ে দেখছি আর ভাবছি।

একটু পরেই কিছুটা এগিয়ে .... একটা চায়ের দোকানে পেট ভরে জলখাবার ও চা পান করলাম। তারপর একটা টাঙ্গা ভাড়া করে ঘুরতে আরম্ভ করলাম। দেখলাম বিপুল গিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও বৈভার গিরি। প্রতিটি পাহাড়েই হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈনদের মন্দির আছে। পাহাড়গুলির দৃশ্য অতি মনোহর। টাঙ্গা ছেড়ে বৈভার গিরিতে উঠলাম। প্রথমে দেখলাম ব্রহ্মকুণ্ড, সপ্তধারা ও কাশীধারা কুণ্ড। পুলের উপর দিয়ে সরস্বতী নদী পার হয়ে এখানে আসতে হয়। সরস্বতী মন্দির এবং অন্যান্য মন্দিরও দেখা হল। বহু তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের কুণ্ডে স্নান করতে দেখলাম। সপ্তধারার গরম জল নাকি নানা রোগ নিরাময় করে।

ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিম দিক দিয়ে পথ বৈভার গিরির উপরে উঠে গেছে। এই পথে উপরে উঠে পিপ্পল গুহা দেখলাম। এটিকে নিরীক্ষণ মিনার এবং জরাসন্ধের বৈঠকও বলা হয়। বৌদ্ধ-সাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব নাকি এখানে প্রায়ই আসতেন। এটি বড় বড় পাথরে নির্মিত কৃত্রিম গুহা। এখান থেকে আরো উপরে আধুনিক জৈন মন্দির দেখে সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সপ্তপর্ণী গুহায় পৌঁছালাম। এখানে পর পর কতগুলি কোদিত গুহার শ্রেণী আছে। শুনলাম বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের পরে প্রথম বৌদ্ধ-সংগীতি ও ভিক্ষু সম্মেলন এখানেই হয়েছিল।

পাহাড়ে উঠে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এক জায়গায় আমরা বসে পড়লাম কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য। অদূরে দেখলাম একটি বাঙালী মেয়ে তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে। আমাদের দেখে হেসে বলল, শিবমন্দির না দেখে কিন্তু ফিরবেন না। তাহলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। তপনবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, সেইজন্যই তো আসা। এতটুকু সংকোচ নেই মেয়েটির। এর পরই সে ভাইয়ের সঙ্গে ছুটে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। একটু বেচাল হলেই গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বোধহয় প্রকৃতির রূপ দেখে ও বেড়াতে আসার আনন্দে ও নিজের তারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অন্তত মেয়েটি।

তখন আমরা বসে রয়েছি অনেক উঁচুতে। এখান থেকে উপত্যকা ও অন্যান্য পাহাড়গুলিকে দেখে তার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হতে হয়। কয়েকটা ছবি তুললাম। তারপর এগোলাম শিবমন্দিরের রাস্তার দিকে। রাস্তার উপরেই দেখলাম প্রাচীন জৈন মন্দিরের অবশেষ। মধ্যে ঋষভদেব, পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের মূর্তি আছে। মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর। এখান থেকে কিছু দক্ষিণে এগিয়েই দেখা পেলাম সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর একটি ভগ্ন শিবমন্দিরের। মন্দিরের বাইরের মণ্ডপের কেবল স্তম্ভ-গুলিই বিরাজ করছে। মন্দিরগর্ভে রয়েছে শিবলিঙ্গ ও মুণ্ডহীন নন্দীর মূর্তি। এবার আমরা নেমে এলাম বৈভার গিরিকে বিদায় জানিয়ে। শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছিল এই ভেবে যে, একদিন বুদ্ধদেব, মহাবীর এইসব পথে ভ্রমণ করতেন। প্রাচীন ভারতের কত ইতিহাসই রচিত হয়েছে এই ভূমিতেও

পাহাড় থেকে নামতে কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল না। নামতে নামতে বাকসুবোধ বলছিলেন এত কাছে আমরা আছি কিন্তু এতদিন আসা হয়নি। আপনি না এলে হয়তো এসব দেখাই হতো না। বললাম, সেইজন্যই তো কথায় বলে, গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না। ওঁরাও একমত।

বৈভারগিরি থেকে নেমে টাঙ্গায় চড়ে উপত্যকা অঞ্চলে একে একে দেখলাম মনিয়ার মঠ, স্বর্ণভাণ্ডার, বিম্বিসার বন্দীগৃহ প্রভৃতি। মনিয়ার মঠ থেকে পশ্চিম দিকে স্বর্ণভাণ্ডার অবস্থিত। জনশ্রুতি যে এখানেই রাজা বিম্বিসারের কোষাগার ছিল। আর মণিয়ার মঠের দক্ষিণে পাটনা গয়া রাজপথে এগিয়ে এক জায়গায় চওড়া দেওয়ালে ঘেরা জায়গার নাম বিম্বিসার বন্দীগৃহ। শুনলাম, এখানেই অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। টাঙ্গা এগিয়ে চলল বানগঙ্গার দিকে। উদয়গিরি ও সোনাগিরির মধ্যবর্তী উপত্যকায় বয়ে চলেছে বানগঙ্গার ধারা। এখানকার প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্য দেখে আমরা সকলেই মোহিত হয়ে গেলাম। কাছেই দক্ষিণ দিকে দেখলাম বিরাট বিরাট পাথরে নির্মিত প্রাকার। প্রাচীন নগরের এটিই ছিল সুরক্ষাত্মক দেওয়াল। এই প্রাকারটি নাকি পাহাড়গুলির শিখর অতিক্রম করে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল বিস্তৃত। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এই প্রাকারটি কোন মাল মশলার সাহায্য ছাড়াই তৈরী হয়েছিল সেই প্রাচীনকালে। অথচ আজও সে তার অস্তিত্ব অনেকাংশেই বজায় রেখেছে। এখান থেকে চললাম রত্নগিরির দিকে। এখানে টাঙ্গায় চড়তে কিন্তু বেশ লাগছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীর অবশেষের মধ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর টাঙ্গার দোলানীতে মনে হচ্ছিল একদিন তো এখানে এইভাবেই পথের ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটতো রথ নিয়ে। অবশ্য সেই দিন এখন স্বপ্নমাত্র। শুধু পড়ে আছে তার স্মৃতিগুলি।

এলাম রত্নগিরিতে। এখানেও অনেক মন্দির আছে। রত্নগিরির দ্বিতীয় শিখরে জাপান বৌদ্ধ সংঘের অক্লান্ত উদ্যমের ফলে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্বশান্তি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। বিশ্ব-শান্তি স্তূপ দর্শনের জন্য রত্নগিরির উপর রজ্জুপথ আছে। বিশ্ব-শান্তি স্তূপ দর্শন করে গৃধ্রকূটে বুদ্ধদেবের বহু স্মৃতি বিজড়িত গুহা দুটি দেখলাম। এই শৃঙ্গটি রত্নগিরিরই একটি অংশ। ফেরার পথে বেনুবন ও রাজগীর গ্রাম দেখে একটি বাঙালী হোটেলে এলাম। তখন ক্ষিধেয় আমরা সকলেই অস্থির। হোটেলে তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার রওনা হলাম। স্নান করা আর হল না। কুণ্ডে প্রচণ্ড ভীড় দেখে স্নান করতে ভরসা পাইনি।

বাস স্টপে এসে শুনলাম নালন্দার বাস আসতে দেরী হবে। কিন্তু সময় আমাদের সীমিত। তাই ওখানেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে ভাগে একটি ট্যাক্সি নিলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট মেয়ে। মেয়ে দুটি খুবই চঞ্চল। স্কুলে পড়ে। নালন্দা সম্পর্কে ওদের খুবই উৎসাহ। ট্যাক্সিতে ভদ্রমহিলা বলছিলেন, ভালই হল আপনারা সঙ্গে থেকে। অনেকেই এই সময় আসতে নিষেধ করেছিলেন। কালই বাড়ী ফিরে যাবো। আজ না গেলে নালন্দা দেখা হবে না, তাই চলে এলাম। বললাম, ভালই করেছেন। কিন্তু নালন্দা নির্জন স্থান। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। আর বাস রাস্তাও অনেকটা দূরে। তাই অনেকেই বিকেলে যেতে চান না। ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবো। রাজগীর থেকে নালন্দা সাত মাইল উত্তরে। কথায় কথায় আমরা এসে পড়লাম।

সেদিন শুক্রবার, তাই টিকিট কাটতে হল না। ভিতরে প্রবেশ করতেই সামনে নজর পড়ল মুখ্য স্তূপটির দিকে। চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। আশ্চর্য নীরবতা। যেন প্রাচীন কাল থেকে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে কোন ঋষি। অথচ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পীঠস্থান এই নালন্দাই একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। আজ আমরা দেশ-বিদেশে যাচ্ছি উচ্চশিক্ষার জন্য। কিন্তু সেদিন দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত এখানে আসতেন অধ্যয়নের জন্য।

পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত শাসক কুমার গুপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম থেকেই নালন্দা ছিল বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই বিখ্যাত হয়েছিল। গুপ্ত বংশের শাসন কালেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির চরম সীমায় ওঠে। মহারাজ হর্ষবর্ধন ও পাল বংশের রাজারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া আরো অনেক রাজার দানে নালন্দা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন জ্ঞান-চর্চার জন্য এখানে আসেন তখন মহাপণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। সেই সময়ে দশ হাজার ছাত্র ও দেড় হাজার অধ্যাপক এখানে বাস করতেন। নালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখানে ছাত্রদের অধ্যয়ন ও খাওয়ার জন্য কোন খরচ লাগত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণ যেমন জ্ঞানদানে
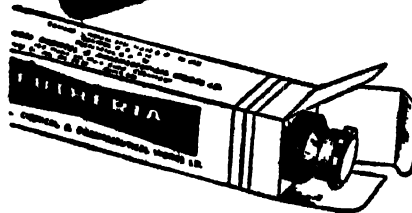
নালন্দার মধ্য ধ্বংসস্তূপ

আগ্রহী ছিলেন শিষ্যরাও তেমনি জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট হতেন। নালন্দার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে আচার্য নাগার্জুন আর্যদেব, জিনমিত্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল গুণমতি শীলভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের সুরু থেকে নালন্দারও অবনতি আসন্ন হল: ১১৯৭—১২০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বক্তিয়ার খিলজী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেন। এই সময় ভিক্ষুদের হত্যা করে পুস্তকালয়টিও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে চৈত্য, বিহার, মন্দির সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

ঘুরে ঘুরে বহু স্তূপ ও বিহার দেখলাম। মধ্য স্তূপের সিঁড়ি বেয়ে স্তূপের শীর্ষে উঠলাম। এখান থেকে সমস্ত ধ্বংস ক্ষেত্রটিই দেখা যাচ্ছিল। মাটি খনন করে এসব উদ্ধার করা হয়েছে। মধ্য স্তূপটি কতগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ দ্বারা পরিবেষ্টিত চতুষ্কোণ বৌদ্ধ মন্দির। দেওয়ালের উপর বুদ্ধমূর্তি নির্মিত। বিভিন্ন বিহারের অঙ্গনে দেখলাম অষ্টকোণ কূপ, উনুন প্রভৃতি।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে ফিরে এলাম বাইরে। একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে বসলাম সবাই। চা-পান শেষ করে অদূরেই ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় গেলাম। এখানে নালন্দার ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রচুর মূর্তি শীলমোহর খেলনা, বাসন, শিলালেখ, দগ্ধ চাউল প্রভৃতি রাখা হয়েছে। এই মিউজিয়ামটি খুবই সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন।

মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে একটা টাঙ্গা নিয়ে বাস। রাস্তায় চললাম। আমাদের চালকটি কিন্তু নিতান্তই কিশোর। চলতে চলতে ওর সঙ্গে আমরা যেন মিশে গেলাম। ছেলেটি ছোট হলেও বেশ আলাপী। ওর বাবা অসুস্থ, কাজ করতে পারে না। তাই ওদের ছোট্ট সংসারের হাল ওকে এই বয়সেই ধরতে হয়েছে। শুনে খুবই কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। বাস স্টাণ্ডে এসে ওর ভাড়া মিটিয়ে বিদায় জানালাম। বিষণ্ণ মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে গাড়ী নিয়ে ও ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফেরার পথে যেতে হবে পাওয়াপুরী। বিহারশরীফ থেকে আট মাইল দক্ষিণে। শুনলাম বিহার-শরীফের বাস অনেক দেরীতে আসে। কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করতেই অস্বাভাবিক ভাড়া চেয়ে বসল। বিরক্ত হয়ে আমরা পিছিয়ে এলাম। ওখানে ট্যাক্সিতে মিটার নেই। যে যা নিতে পারে। ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। বোধহয় বেশীদিন বিয়ে হয়নি। ভদ্রলোক ঐ ট্যাক্সিতে আমাদের শেয়ারে যাবার জন্য বললেন। কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। দেখলাম ভদ্রমহিলার মুখ ভার চোখ ফোলা। বারবার তিনি চাপা স্বরে বলছেন, এই তো সন্ধ্যা হয়ে এল। এখন বাস না পেলে? তবু রাজগীর, নালন্দা একদিনে দেখতে হবে। ভদ্রলোককেও কিছুটা বিব্রত মনে হল। এমন সময় একটা শেয়ারের ট্যাক্সি এল, ভেতরে অনেক লোক। ভদ্রলোক কোনরকমে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে উঠলেন। এতক্ষণে ভদ্রমহিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখে হাসি দেখা দিল। আমাদের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হাসলেন। যেন আমাদের হারিয়ে দিলেন। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। আমরাও হাত নাড়লাম।

তখন আমরা বেশ জমিয়ে গল্প করছিলাম কয়েকজন স্থানীয় চাষীর সঙ্গে। মাঠ থেকে ওরা ঘরে ফিরছিল। আমরাই ডেকে কথা বললাম। কী সরল ওরা। কলকাতা সম্পর্কে ওদের তো খুবই উৎসাহ। একজন বলেই ফেলল যে, ভাগ্যে থাকলে একবার কলকাতা দেখে যাবে। দেখলাম ওরা বেশ গরীব, কিন্তু দারিদ্র্য ওদের ঔদার্যকে গ্রাস করতে পারেনি। একটু পরেই আমরাও শেয়ারের ট্যাক্সি পেলাম। ছুটলাম পাওয়াপুরীতে। ওখানে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল।

পাওয়াপুরীতে জৈনদের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। এখানে দুটি মন্দির আছে। যেখানে মহাবীর দেহত্যাগ করেন একটি মন্দির সেখানে। এটি গ্রামে অবস্থিত। আর যেখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল, সেখানে পরবর্তীকালে পদ্মদীঘির মাঝখানে সুন্দর শ্বেতপাথরের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। চমৎকার মন্দিরটি! রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোকে যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। চেয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। শংকর বলল এবার ফেরা যাক। ফিরলাম বিহার শরীফ। ওখান থেকে পাটনার বাস ধরলাম।

শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, শীত লাগছে বেশ। ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে বাস ছুটল। বাসের সমস্ত জানালা বন্ধ, তবুও ঠাণ্ডা লাগছে। রাত প্রায় এগারোটায় বাস পাটনা এসে থামল। বাস থেকে নেমে আমরা সোজা হোটেলের দিকে চললাম খাবার জন্য। শরীর তখন ক্লান্ত। অবসন্ন দেহে হোটেল থেকে ফিরে এলাম আস্তানায়। শুয়ে পড়তেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হলাম পাটনা শহরটা ভাল করে দেখবার জন্য। তখন শংকর বলল, সকালে একটু কালীদার বাসায় যেতে হবে। বৌদি আপনাকেও যেতে বলেছেন। অফিসের কাছেই কালীবাবুর বাসা। যেতেই বৌদি শংকরকে বলে উঠলেন, এতক্ষণে আসা হল! আমি তো ভাবলাম ভুলেই গেছ আমাকে। বসতে বললেন আমাদের। অনেক গল্প করলেন। সকালের চা-পর্বও এখানেই সমাধা হল। ফেরার আগে বললেন রাত্রে কিন্তু এখানেই আপনারা খাবেন। পাটনার হোটেলে খেতে আমার উৎসাহ নেই। সুতরাং খুশীই হলাম।

রাস্তায় নেমে একটা রিক্সা ভাড়া করলাম। একে একে দেখলাম বিভিন্ন কলেজ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্রেটারিয়েট ভবন, বিধানসভা ভবন, মিউজিয়াম ও গোলঘর। গোলঘরটি ইংরেজ আমলের গম্বুজাকৃতি বিরাট গুদামখানা। বাইরের দিকে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। উপরে উঠে দেখলাম, এখান থেকে গঙ্গা ও সমস্ত শহরটাই প্রায় দেখা যায়। শহরের প্রান্তে দেখলাম ছোট্ট বিমানঘাটি। সবশেষে কুমরাহার গ্রামে অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। কালের ধ্বংসশীল প্রভাবে তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। পাটনারই প্রাচীন নাম ছিল পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র ছিল অশোকের রাজধানী। অশোকের সময়েই এই রাজপ্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল।

যাই হোক পাটনা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হল না। এখানকার বিধানসভা ভবন ও হাইকোর্টের বাড়ী-গুলিতে ছাদ নেই, উপরে টালি বা খোলা দিয়ে বাংলো কায়দায় ছাওয়া। মিউ-জিয়ামটি অবশ্য খুবই সুন্দর। এখানে মাঝে মাঝেই পথে রিক্সা, সাইকেল ও অন্যান্য গাড়িতে জট বেঁধে যায়। ট্রাফিক আইনেরও অনেকেই ধার ধারে না। যে যেখান দিয়ে পারে চালিয়ে দেয়। চলার পথে এখানে বেশ কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হল। শুনলাম প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এখানে অনেকেই সু-প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর সংখ্যাও অনেক। একটি বাঙালী সাংস্কৃতিক সংস্থার পাকা পূজা-মণ্ডপ ও ব্যায়ামাগার দেখলাম। এখানে নাকি বাঙালীদের আরো কয়েকটি সাংস্কৃতিক সমিতি আছে। তাঁরাও প্রতি বছর দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। পাটনায় এসে এখানকার একটি বাংলা সাময়িকপত্রও চোখে পড়েছিল। পথে এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কিছুদিন হল তিনি চাকরী নিয়ে এখানে এসেছেন। কথায় কথায় বললেন যাই বলুন এখানকার প্রবাসী বাঙালীরা কিন্তু খুবই আত্মকেন্দ্রিক। আন্তরিকতা বড় একটা নেই। জানি না ভদ্রলোক কোথাও আঘাত পেয়েছেন কিনা।

ফিরতে অনেক দেরী হল। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, আগের দিন স্নান করা হয়নি, বেশ অস্বস্তি লাগছে। এদিকে প্রচণ্ড ক্ষিধেও পেয়েছে। ফেরার পথে তাই আগেই খেয়ে নিলাম। ফিরে এসে একটু বিশ্রাম করে মাথায় কয়েক বালতি জল ঢালতেই শরীর ঠাণ্ডা।

দুপুরে ঘুম দিয়ে সন্ধ্যায় উঠলাম। শংকর ওর এক বন্ধুর বাড়ী গেল। আমি আর গেলাম না। সকালে অনেক ঘুরেছি, চুপচাপ বসে থাকতেই তখন ভাল লাগল।

সন্ধ্যার পরে একটা চায়ের দোকানে বসে চা পান করছি, দেখলাম কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। ও'দের মধ্যে একজন প্রশান্তবাবু ও বাবলুবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, ক'দিন আছেন? বললাম, আজ পর্যন্তই। ওখান থেকে ফিরে এসে চুপ-চাপ ও, হেনরীর গল্পের বইটা নিয়ে বসলাম। রাত নটার সময় কালীবাবু এলেন, বললেন মনে আছে তো? শংকরের খোঁজ করলেন। বললাম বন্ধুর বাড়ী গিয়েছে এখনো ফেরেনি। উনি বললেন, ও এলেই কিন্তু আপনারা চলে যাবেন, ডাকতে হয় না যেন। রাত সাড়ে দশটায়ও শংকরের পাত্তা নেই। কালীবাবু আবার এলেন। শুনে বললেন, ও ঐ-রকমই পাগল। কিছুই খেয়াল থাকে না। ওখান থেকেই হয়তো খেয়ে ফিরবে। চলুন আপনি খেয়ে নেবেন। একাই আমি খেয়ে এলাম। বৌদি বললেন, শংকরের কাণ্ডটা দেখলেন? খেয়ে না এলে যত রাতই হোক ওকে পাঠিয়ে দেবেন।

রাত বারোটায় শংকর এলো। আসতেই আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, কী ব্যাপার, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ও বলল, বন্ধু না খেয়ে কিছুতেই আসতে দিল না। অনেক বার বলেছিলাম, শুনলো না। আপনি খেয়েছেন তো? বললাম, আমার জন্য দেখছি তোমার খুবই চিন্তা! এরপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন মোগলসরাই যেতে হবে। সেই কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল মিছিলের চিৎকারে। পাটনায় এসে এই ব্যাপারটা নতুন দেখলাম। যে কদিন ছিলাম প্রায় প্রতিদিনই ভোরবেলা মিছিলের চিৎকার শুনেছি, অবশ্য বেশী লোকের নয়। প্রথম দিন তো বুঝতে না পেরে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সকাল-বেলায় স্নান সেরে, জিনিস-পত্র গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা রিকসায় উঠলাম স্টেশনে যাবার জন্য। কালীবাবু সকালেই এসেছিলেন, প্রশান্তবাবু এবং বাবলুবাবুও রাস্তা পর্যন্ত এলেন। ও'রা বললেন, আবার আসবেন কিন্তু। বললাম, না এলেও আপনাদের ভুলবো না। রিকসা এগিয়ে চলল, হাত নেড়ে ও'দের বিদায় জানালাম।

স্টেশনে পৌঁছে কিছু জলখাবার খেয়ে নিলাম। শংকর টিকিট কাটতে গেল। টিকিট কেটে আমরা প্ল্যাটফরম-এ এলাম। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে আমরা একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ জমতে সুরু করেছে। বোধ হয় বৃষ্টি হবে। একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের গতি দ্রুত হল। সেই সঙ্গে মন হল উন্মনা। নানা স্মৃতি মনে গেঁথে পাটনা থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু মনে হল, কারা যেন তখনও আমাকে পিছন থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

(আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত)

মধ্যপথে ।। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ওদিকে পড়ন্ত বেলার রক্তিম আলপনা-আঁকা পথ,
সেখানে নিজেকে ছেড়ে দাও তুমি খুশীর খেয়ালে
এদিকে ধূসর ধূসরতর অন্তর্বাহিকা,
তোমার স্মৃতিগন্ধে সুরভিত।
মধ্যপথে থেমে থাকা অসম্ভব,
অন্ধ নিষাদ সন্ধ্যাতারা শর হাতে ওৎ পেতে আছে অদূরে।
পিছনের পথের মায়া টানছে,
সামনের আলোকিত পথ হাতছানি দিচ্ছে,
নিরালা ঝর্ণার মতো আপন মনে উচ্ছ্বসিত তুমি,
বুকের মধ্যে পাখির কাকলি:
নিজেকে উদ্ভাসিত করে, উৎক্ষিপ্ত করে,
হাউই-এর মতো ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে,
দেখার ইচ্ছা হয়—
নিবিড় নীলিমার পটভূমিকায়
উচ্ছল উৎসের অনাবৃত বুকের মতো তোমার রূপ
শুনতে ইচ্ছা হয়—
বসন্ত বনে কোকিলের স্বরের মতো তোমার আলাপ।

ঐশ্বর্যের খেলো পোষাক, বুদ্ধির চুলচেরা হিসেবে,
ফেলে দিয়ে, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে, ধন্য হতে চায় দেহমন

সার্থক প্রেমের সমুদ্রে সাঁতার কেটে, নাকি দুঃসহ ঘৃণার
দগ্ধ হতে!

ওদিকে পড়ন্ত বেলার রক্তিম আলপনা-আঁকা পথ,
এদিকে ধূসর ধূসরতর অন্তর্বাহিকা।

রৌদ্রে অনালোয় ।। শুভ মুখোপাধ্যায়

তুই যেন মা চৌপহরে পাগলপারা,
চারভিতে তোর ছড়িয়ে যেন কপাল সিঁদুর
তুমি তখন বিপুল হেঁকে বলছ শুধু
আমার প্রতিচ্ছায়,
যেমন রেখো অবরোহী
মুগ্ধ এখন বসত জুড়ে প্রাকৃত ইচ্ছায়।

ঝিমি এখন পাগল ছেলের
ভাজছে ধানের খই
মাগো এমন উন্মীলনে
কপাল সিঁদুর কই।

নিষ্ঠুর রাবণ, তুমি ।।

রঞ্জিতকুমার সরকার

তোমার নিরাভরণ ঘুড়ি নেমে এসেছিলো
আমার শব্দবহুল বিছানায়,
উদ্ভ্রান্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে একটি সন্ধানী মাছি
নীলাভ ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছে
আমার দ্রুতগামী স্বপ্ন,
চিত্রকল্পনার মধ্যে সটান চলে যাচ্ছে
আমার রুক্ষ দুহাত—
এই দায়িত্বশীল ঋতু-আলেখ্য
এবং তার আপ্লুত আবহসংগীত
আমাকে নির্বাসিত চেয়ারে বসিয়ে দ্যায়
চেয়ে দ্যাখো, হে কিন্নর—
তোমার বীভৎস তালাচাবি
আমাকে বন্দী করে ভীতিভবকাবীময় গণ্ডি,
নিষ্ঠুর রাবণ তুমি গণ্ডী ছিঁড়ে নিয়ে চলো
উচ্ছৃংখল অশোককাননে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন অফিসে সোজা দেশপাণ্ডের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেশপাণ্ডে একটা ফাইল গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম 'একটা জরুরী দরকার ছিল।'

দেশপাণ্ডে মুখ না তুলেই হাতের ইসারায় চেয়ারে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পরেও যখন মুখ তুললেন না আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, 'জামসেদপুরের ডিলার অ্যাপয়েন্ট করার ব্যাপার নিয়ে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কাল হেড অফিস থেকে ডিলার অ্যাপয়েন্ট করে চিঠি দিয়েছে।'

'হেড অফিস কেন? ইস্টার্ন জোন তো কোলকাতার আণ্ডারে।'

দেশপাণ্ডে ঘাড় তুলেই নামিয়ে নিলেন। বললেন, 'হেড অফিস হয়ত মনে করেছে, ইণ্ডিয়ার সমস্ত জোনই তাদের আণ্ডারে। যাকগে, যে-কথা বলছিলাম, ওরা দস্তুর অ্যাণ্ড কোম্পানীকে মাল বেচার ভার দিয়েছে।'

'আমাকে জামসেদপুরে পাঠানো হল কেন?' নিজের কানেই নিজের গলা বিশ্রী কর্কশ শোনাল।

দেশপাণ্ডে চশমা খুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'আপনাকে জামসেদপুরে পাঠিয়েছিলাম আমি। দস্তুর কোম্পানীকে অ্যাপয়েন্ট করেছে হেড অফিস, বুঝতেই পারছেন, এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অসহায়।'

উত্তর দেবার মত কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, 'কাল আমার মেয়ে এসেছে। ও একা একা এখানে বোর ফিল করে। সময় করে যদি ওকে সঙ্গ দিতে পারেন ও খুশী হবে।'

'আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো' বলে উঠে পড়লাম। একটা গ্লানি যেন আমার অন্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শশাঙ্ক মুখার্জিকে একরকম কথাই দিয়ে এসেছিলাম। লোকটা হয়ত আমার ওপর বিশ্বাস করে বসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে ভাববার চেষ্টা করলাম, ও একজন মাতাল। মাতাল হলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। মনুষ্যত্ব না হারালে নিজের স্ত্রী কিম্বা ছেলেকে মারে না মানুষ। শশাঙ্ক যে একজন দুশ্চরিত্র মাতাল এ-কথা ভাবতে পেরে উপরে উপরে আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে এলাম। মনে মনে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, জামসেদপুরে নিশ্চয়ই দশ কয়েকজন বাঙালী ব্যবসাদার আছে। তাদের মধ্যে একজনের বেশী কেউ মদ খায় নিশ্চয়। সুতরাং শশাঙ্ক মুখার্জিই যে করবীর স্বামী তার কোন মানে নেই। হলেও, করবীর স্বামীকে সাহায্য করার নৈতিক দায়িত্ব আমার থাকবার কথা না। করবী ইচ্ছে করলে আমাকে ওদের জামসেদপুরের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারত। কিন্তু দেয়নি। তার মানে, করবী আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। যদি চাইত করবী অন্ততঃ আমাকে একটা চিঠি দিতে পারতো। এখন করবী কোথায় আছে? ওর ছেলে দেবাশিস কি করবীকে আমার কথা বলেছিল? শুনে করবী কি ভেবেছিল কে জানে। হয়ত ভেবেছিল, লোকটা অত্যন্ত লোভী। পুরনো সম্পর্ক ধরে আবার নতুন করে কাছে আসতে চায়। হয়ত করবী মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিম্বা কে জানে সুখীও হয়েছিল বা। ভেবেছিল, আমি এখনও ওকে মনে করে রেখেছি।

অফিসে বসে এই সব আবোল-তাবোল কথা ভাবা উচিত না। এতে কাজের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু করবী আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। যত মন থেকে ওকে তাড়াতে চাইছিলাম, ততই ও ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। এক এক সময় করবীকে যেন খুব স্পষ্টভাবে দেখতেও পাচ্ছিলাম। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে করবীর ওপরের ঠোঁট একটু ফুলে ওঠে। সেই ফোলা ফোলা ভাবটাও তখন দেখতে পাচ্ছিলাম। করবীর গা দিয়ে একটা মৃদু সৌরভ আসতো সেই ঘ্রাণ যেন আমাকে স্পর্শ করতে লাগল।

করবীকে নিয়ে যখন এভাবে খেলা করছিলাম, ঘরে এসে ঢুকলেন তেওয়ারীজী। একটা চিঠি আমার টেবিলে রেখে দিতে দিতে বললেন 'চিঠিটা গোপনীয় তাই নিজে দিয়ে গেলাম। আপনার পড়া হয়ে গেলে রেখে দেবেন এসে নিয়ে যাব।' এটাই হেড অফিসের চিঠিটা, যার কথা কিছুক্ষণ আগেই দেশপাণ্ডে বলেছেন।

চিঠি দিয়েই তেওয়ারী বেরিয়ে গেলেন না। অন্যান্য দিন হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে দুই-একটা কথা বলতাম। আজ পরাজয়ের গ্লানি মন ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। মানুষ ভাল লাগল না। বললাম, 'আমি একটু জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। আপনার কি কোন দরকার আছে?'

তেওয়ারী দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, 'তেমন বিশেষ কিছু না। অফিসের গাড়ি সব সময়ই থাকবে, আপনার যেখানে যাবার যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। দরকার হলে নিয়ে যাব।' খোলা ফাইলের ওপর মাথা আরও ঝুঁকিয়ে দিলাম।

'আর একটা কথা। মিস দেশপাণ্ডে যদি আসেন আপনি কি ডিস্টার্বড ফিল করবেন?'

চোখ না তুলেই বললাম 'সেরকম করাটাই তো স্বাভাবিক। অফিস টাইমে অফিস সংক্রান্ত কাজ এবং কথাবার্তাই হওয়া উচিত।'

তেওয়ারী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন 'মিস দেশপাণ্ডে এখন অনেকদিন এখানে থাকবেন। অথচ সঙ্গী সাথী ওঁর কেউ নেই।'

'কেউ নেই বললে ভুল হবে। দু-একজন আছে নিশ্চয়।' ইচ্ছে করেই অনিমেষের নাম উচ্চারণ করলাম না।

'যারা আছে, তাদের সঙ্গে ও'র মেলামেশা করা উচিত হবে কি।'

হঠাৎ তেওয়ারীর ওপর বিষম রাগ ধরে গেল। বলে ফেললাম, 'অফিসে বসে আমি অফিস সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য কথা বলতে ইচ্ছুক না। সে অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। আর একটা কথা, মিস দেশপাণ্ডে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, লাঞ্চটাইম কিম্বা অফিসের পরে আসতে পারেন।'

'বেশ।' বলে তেওয়ারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। একটা অস্থিরতা ক্রমশই আমাকে ঘিরে ধরছিল। মনে হতে লাগল, এইভাবে চেয়ারে বসে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে, অনিমেষকে ফোন করলাম। অনিমেষ বেরিয়ে গেছে। জয়ন্তকে ফোন করে জানলাম, জয়ন্ত আজ অফিসে আসেনি। অথচ চুপ করে বসে থাকতে অসহ্য লাগছিল। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলাম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একখণ্ড আকাশ চোখের সামনে যেন স্থির হয়ে রয়েছে, না, স্থির হয়ে নেই। নীল আকাশের নীচ দিয়ে হাল্কা মেঘ দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। শরতের আকাশ দেখতে আমার ভাল লাগে। অথচ কতদিন আকাশ দেখি না। কতদিন হল কলকাতা ছেড়ে এসেছি। কতদিন মাকে দেখি না। বড়মামাকে দেখি না। মেজমামা, ছোটমামা, মামীদের, তাপস, মীরা, অজয় ওদের দেখি না। কতদিন দমদমের বাড়িতে যাই না। পাড়ার ছেলে বিলাসকে দেখি না। আরও অনেকের কথা মনে পড়ল। ওদের কতদিন দেখি না। সবশেষে সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। সুপ্রিয়ার চেহারা একবারে ভুলে গেছি। কিছুক্ষণ আগে চেষ্টা না করেও করবীর মুখ খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম, এমনকি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে ওর ওপরের ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে তা-ও দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু বারবার চেষ্টা করতে সুপ্রিয়ার মুখ মনে করতে পারলাম না। সুপ্রিয়ার চোখ চেরা-চেরা মতন ছিল, কিন্তু বারংবার দুটো টানা টানা চোখ দেখতে পাচ্ছি কেন? অথচ এ-ধরনের চোখ আমার জানাশোনা কোন মানুষের নেই। চোখদুটো অসম্ভব বড়, আর কান পর্যন্ত টানা। কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, কার চোখ, কোথায় দেখেছি।

আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা গুরু গুরু আওয়াজ কানে আসতে লাগল। যেন কত শত যোজন পেরিয়ে সেই শব্দ আমার বুকে এসে বাজছে। আমি কান পেতে সেই শব্দ শুনতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই বড় চোখদুটো আমাকে এক অপূর্ব রোমাঞ্চের জগতের মধ্যে নিয়ে গেল। বড় বড় ঢাক বাজছে, ধুপধুনো জ্বলছে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে কে যেন নাচছে। আমার চোখের খুব সামনে কান পর্যন্ত টানা সেই চোখ, মাথায় চূড়া, হাতে খড়্গ, ত্রিশূল, পায়ের নীচে অসুরে, ওর বুক দিয়ে রক্ত ঝরছে।

নিমেষের মধ্যে সমস্ত ছবিটা আমার চোখের খুব সামনে ভেসে উঠল। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আর মাত্র সাতদিন পরে পুজো।

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দেশপাণ্ডে তখনও ঝুঁকে পড়ে একটা ফাইল দেখছিলেন। ঘরে ঢুকেই বললাম, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমার দিন কয়েকের ছুটি চাই। পুজোয় কোলকাতায় যাব।' ছুটে আসার দরুণ তখনও হাঁপাচ্ছিলাম।

দেশপাণ্ডে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ ঘুরে আসুন।'

'আমি কবে যাব?'

দেশপাণ্ডে হাসলেন। 'যেদিন আপনার ইচ্ছে হবে। এখানকার অফিস নিয়ে ভাববেন না। আমরা চালিয়ে নেব। তাছাড়া আপনার ডিপার্টমেণ্টে তো লোকও রয়েছে। কয়েকদিন তারাও চালিয়ে নিতে পারবে।'

মনে হল দেশপাণ্ডেকে শুকনো ধন্যবাদ দেওয়ার চেয়েও আমার বিশেষ কিছু বলা দরকার। অথচ কী বলবো ভেবে পেলাম না। উনি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, বললেন, 'আমি যখন এখানে এসেছিলাম, একটুও ভাল লাগতো না, কিন্তু এখন ভালবাসা জন্মে গেছে। আপনিও হয়তো একদিন পাটনার প্রেমে পড়বেন।'

'এ-জায়গা আমার একটুও ভাল লাগছে না।' কথাটা নিজের কানেই বাজলো। একজন দুর্বল মানুষের কথা বলে মনে হল।

'কোলকাতায় গিয়ে মিস্টার কাপুরকে এ-বিষয়ে বলতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, কিছুদিন থাকার পর আপনার আর খারাপ লাগবে না। আমার মেয়েরও এক অভিযোগ, জায়গাটা অসম্ভব একঘেয়ে। অথচ ছুটিতে না এসেও পারে না।'

'আপনি আছেন বলেই মিস দেশপাণ্ডেকে এখানে আসতে হয়।'

'অথচ কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে বম্বে যেতে হবে। সেখান থেকে দিল্লী হয়ে ফিরবো।'

'আপনি কবে যবেন?'

'আপনি ফিরে এলে। দুজনে একসঙ্গে বাইরে থাকা চলে না।' দেশপাণ্ডে এমনভাবে বললেন যেন উনি পদমর্যাদায় আমার সমান কেউ। কথাটা শুনে ভাল লাগল। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল।

ছুটির পরও অফিসে বসে রইলাম। সেলস লেজার খুলে মাল বিক্রির হিসাব দেখছিলাম। অথচ ডিপার্টমেণ্টের কাউকে বললে তারা খুশী মনে একটা স্টেটমেণ্ট তৈরী করে দিতে পারত। নিজেকে যতীনবাবু যতীনবাবু মনে হতে লাগল। আগে ভাবতাম, ভদ্রলোক ছুটির পরে অহেতুক অফিসে পড়ে থাকেন কেন। এখন মনে হতে লাগল যতীনবাবু একজন দারুণ দুঃখী মানুষ। দুঃখী না হলে কেউ অফিসের মত নীরস একটা জায়গায় ছুটির পরেও বসে থাকতে পারে না। একবার মনে হল অনিমেষদের বাড়ি যাই। পরক্ষণেই মনে হল, অনিমেষ আজ একবারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। হয়ত আমার পারিবারিক ব্যাপারে নাকগলানো ভাল চোখে দেখেনি অনিমেষ। অনিমেষ যদিও লীলার বিয়ের বিষয় নিয়ে আদর্শবাদী মানুষের মত কথা বলেছিল, আমার মনে হল, হয় অনিমেষ একজন স্বার্থপর মানুষ, না হয় হৃদয় বলে কোন পদার্থ ঈশ্বর ওর মধ্যে দেননি। হৃদয়বান মানুষ লীলাবতীর মত সরল এবং সুন্দরী মহিলার সঙ্গে এমন বিশ্রী ব্যবহার করতে পারে না। যদিও অনিমেষ একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল, কিন্তু লীলাবতীকে দেখলেই মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই অনিমেষ বুঝতে পারতো, কথাটার মধ্যে আর যাই থাক যুক্তি নেই। ইচ্ছে করলে অনিমেষ লীলাকে সব কথা খুলে বলতে পারত, লীলার তাহলে ওদের বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতো না। পৃথিবীর অনেক মানুষই সরল হতে পারে না। সরল হতে পারে না বলেই এই মানুষগুলো পৃথিবীকে ক্রমশ জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

নিজেকে একজন সরল মানুষ বলে মনে হতে লাগল আমার। সরল না হলে আসার আগে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুটো মন-রাখা কথা বলে ওকে সুখী করে আসা চলতো। আমার ভাগ্যের অনেকখানি নির্ভর করছে সুপ্রিয়ার ওপর। ও চাইলে আমার ভাল করতে পারে, ইচ্ছা করলে আমাকে অন্ধকারে তলিয়ে দিতে পারে। আমি নিজের ভাল চাই। আমি কেন, জগৎ-সুদ্ধ মানুষ তাই চায়। মনে পড়ল, এখানে এসে সুপ্রিয়াকে চিঠি দিয়েছিলাম। সুপ্রিয়া সে-চিঠির উত্তর দেয়নি। মা, বড়মামা সবার চিঠি পেয়েছি। মা খুব সংযতভাবে চিঠি লিখেছে। মা যে এত সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারে, কোনদিন জানতাম না। দূরে সরে না গেলে মানুষের আসল মূর্তি দেখা যায় না। বড়মামা আমাকে ভালবাসেন সে-কথা আমার অজানা নয়। কিন্তু এত গভীরভাবে যে ভালবাসেন আগে কি বুঝতে পেরেছিলাম। বড়মামা লিখেছেন, মার জন্যে কোন চিন্তা নেই। হট্টগোলের সংসারে মা সুখেই আছে। আমার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করার সময়টুকুও নাকি মা হারিয়ে ফেলেছে। লেবু (বড়মামার ছোট ছেলে) মার খুব নেওটা হয়ে গেছে। সব সময়ই পিসী পিসী করে মার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব শেষে বড়মামা লিখেছেন, নিতু এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। তোর বিয়ের সম্বন্ধে যদিও কোন কথা বলেনি, ওকে দেখে মায়া লাগল। মনে হল সংসারের চাপে নিতু যেন ক্রমশই বুড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ বয়স তো

[illegible] একটা [illegible] [illegible] করে [illegible] বড় মায়। তোর [illegible] খবর দিও। বড় প্রোজেক্টে পাকা হলে, আর দেরী করার লাভ নেই। বাড়ি করে খুকীকে নিয়ে যা। তারপর ভাল একটা দিন দেখে তোর বিয়ে দি-ই। সুষমা খুব ভাল মেয়ে। সব-দিক বিবেচনা না করে আমি কখনও সুষমাকে বিয়ে করতে বলতাম না। কত অন্তরঙ্গভাবে চিঠি লিখলেন বড়মামা। ভাবতেও আনন্দ হয়, এত দূরে থেকেও কয়েকজন মানুষ আমার কত কাছে কাছে রয়েছে। মা, বড়মামা, বড়মামী। আর সব মামা-মামীরাও নিশ্চয় আমার মঙ্গল চিন্তা করছেন। পুজোর পরে একটা বাড়ি ঠিক করে মাকে নিয়ে আসবো, কাঁহাতক আর হোটেলে থাকা যায়। তাছাড়া সেই যে প্রশ্নটা, মানুষ বাঁচে কেন? শুধু কি নিজের জন্য? মা কেন বেঁচে আছে তাহলে? নিজের ভবিষ্যৎ বলতে কী আছে মার? সবই তো আমাকে নিয়ে। আমার যাতে সুখ হয়, আনন্দ হয় স্ত্রী পুত্র সংসার—এই সব নিয়েই তো মার আশা-আকাঙ্ক্ষা।

প্রকাণ্ড লেজারের খোলা পৃষ্ঠার সামনে বসে আমি যেন নিজের জীবনের একটা হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। পুরনো পৃষ্ঠার পাতায় পাতায় অসংখ্য অঙ্কের আঁকিবুকি। নতুন পাতায় কী লেখা হবে কে জানে। নিজের জীবনের শূন্য পাতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন টেলিফোন তুলে নিয়েছি খেয়াল করিনি।

হ্যালো, কাকে চান?'

'মিস দেশপাণ্ডে আছেন?'

'কথা বলছি, আপনি কে? মিস্টার চ্যাটার্জি?'

'আপনি তো বেশ গলা চিনতে পারেন। অথচ আপনার আওয়াজ অন্যরকম শোনাচ্ছিল।'

মনে হল লীলাবতী হাসল। উত্তর দিল না। বললাম, 'শুনলাম, আপনার খুব একা একা লাগে। সময় কাটাবার জন্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

'কে বলেছে?' লীলাবতীর গলার স্বর খুব শান্ত।

'যেই বলুক, কথাটা তো সত্যি।'

'হ্যাঁ, সত্যি। ভাবছি দু-একদিনের জন্যেই বাইরে কোথাও যাব। এখানে আর ভাল লাগছে না। শুধু আপনাদের বিরক্ত করি, কাজের সময় ডিস্টার্ব করি—'

'আমাকে মাপ করবেন। নানা কারণে মন ভাল ছিল না। হঠাৎ যদি কিছু বলে থাকি, সেটা মনের কথা না।'

মনে হল লীলাবতীর অভিমান ভাঙল। ও বলল, 'আপনাদের আবার মন খারাপ হয় নাকি?'

'জানি না আপনি অযথা নিজের বহু বচন ব্যবহার করলেন কেন। আমি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি। সময় সময় আমার মনও খারাপ হয়। যদিও মন নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করা আমার স্বভাব না।'

লীলাবতী খিল খিল করে হেসে উঠল 'আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।'

'আগে পারতাম না, এখানে এসে শিখেছি। এখানে এসে আরও দু-একটা কথা শিখেছি মানুষ নিজের চেয়ে, নিজের—কী বলবো ভ্যানিটিকেই বেশী প্রশ্রয় দেয়।'

'কার কথা বলছেন?' কৌতূহলের চেয়ে লীলাবতীর বিস্ময়টাই কানে বেশী করে বাজল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম 'এখানে এসে ব্রহ্মচারী বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। লোকটি এক অদ্ভুত মানুষ, নিজের চেয়ে নিজের—' লীলাবতীর প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ ব্রহ্মচারীর নামটাই মনে পড়ে গেল। অথচ ব্রহ্মচারীর দোষটাকে ভ্যানিটি বলে কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। মনে মনে যখন কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, লীলার মিষ্টি গলা কানে এল, 'আপনি কি এখন ফ্রি?'

'আমি সব সময়ই ফ্রি। যখন ইচ্ছা হয় আসবেন, না হয় ডেকে পাঠাবেন।'

লীলাবতী খুশী হল। বলল, 'এখানে এসে বড় একা একা মনে হয়। অথচ বম্বেতেও যে খুব লোকজনের মধ্যে থাকি তা না। কেন যে এরকম হয়।'

মনে মনে বললাম 'তুমি মরেছো।' মুখে বললাম, 'যদি বলেন, আপনাদের বাড়িতে যেতে পারি।'

লীলাবতী আনন্দে লাফিয়ে উঠল 'খুব ভাল হয় তাহলে।'

লীলাবতী গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ওদের বাড়িটা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে। দেশপাণ্ডের খুব গাছগাছড়ার সখ। দিনের অনেকটা সময়ই বাগানে কাটান তিনি। নিজের হাতে গাছের পরিচর্যা করেন। লীলাবতী হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল। 'কী ভাগ্য নিজেই থেকে এলেন।'

'আপনাদের বাড়িতে আসতে পারা তো ভাগ্যের কথা। অনেকদিন ধরেই শুনেছি, আজ চোখে দেখলাম।'

'কী দেখলেন?'

'দেখলাম, যে আপনারা অতিথিদের খুব যত্ন করেন।'

লীলা খিলখিল করে হেসে উঠল। তখনও দিনের শেষ আলোটুকু নিভে যায় নি। আকাশের পশ্চিম দিকে তখনও কিছু আলো অবশিষ্ট রয়েছে। সেই আলো যেন ওর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

লীলাবতী বলল, 'চলুন, পেছনের বাগানে গিয়ে বসি, আপনার ভাল লাগবে।'

সত্যি সত্যি বাগানে এসে বিস্মিত হয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড বড় বাগান। মাঝখানে রংবেরং-এর বিরাট একটা ছাতা পোঁতা রয়েছে, নীচে গুটিকয়েক চেয়ার। মাঝে ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। বললাম, 'সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন দেখছি।'

লীলাবতী কথা বলল না, শুধু হাসল। বললাম, 'চলুন আগে আপনাকে বাগানটা ঘুরে দেখি, তারপর চা খাবো।'

লীলাবতীর সঙ্গে ওদের বাগান দেখতে লাগলাম। লীলা আমাকে ফুল চেনাতে লাগল, 'এটা চেরী গাছ। বাবা কালিম্পং থেকে আনিয়েছেন। খুব কষ্ট করে গাছটাকে বাঁচানো হয়েছে। আর দুই মাস পরে গাছে ফুল ধরবে, তখন দেখবেন সমস্ত গাছটাকেই গোলাপী দেখাবে।' চকিতে লীলাবতীর মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ল। আকাশের লাল রং এসে ওর মুখে পড়েছে। লীলাবতী যেন জ্বলছে।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'তখন গাছটার যে কী চেহারা হবে, আমি বুঝতে পারছি।'

লীলা বুঝল না। প্রশ্ন করল, 'কী চেহারা হবে?'

'ও তখন জ্বলবে ঠিক আপনার মত।'

কথা শুনে লীলাবতীর মুখ গাঢ় লাল হয়ে উঠল। বললাম, 'নতুন আলাপেই একটা রসিকতা করে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।'

লীলাবতী ঘাড় নেড়ে বলল, না, কিছু মনে করি নি, আসুন।'

লীলাবতী একটা বোগেনভেলিয়া ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই গাছটা আমি নিজের হাতে পুঁতেছিলাম। গাছটা একটুকু ছিল। ভেবেছিলাম মরেই যাবে। দেখুন কত ফুল ধরেছে এখন। ওকে আমি খুব ভালবাসি।'

কথা বলতে বলতে লীলাবতী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলতে লাগল, 'মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে সার্থক করতে চায়, অথচ এ নিয়ে কত ভুল বোঝা-বুঝির পালা। মানুষ সব ব্যাপারেই স্বার্থ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এতে স্বার্থের কী আছে বলুন তো। এই যে গাছটায় এত ফুল ফুটেছে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে, ও যে সফল হয়েছে, এতে কার বেশী আনন্দ, কার বেশী স্বার্থ।'

বললাম, 'আপনার। যেহেতু গাছের সমস্ত মালিকানা আপনার। গাছটা যদি রাস্তার পাড়ে, কিম্বা অপর কোন বাগানে জন্মাত, কিম্বা ঈশ্বর না করুন, বাগানটা যদি অপর কোন লোকের হাতে চলে যায়, সেদিন কিন্তু এই গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি এত আনন্দিত হবেন না।'

লীলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হয়ত আপনার কথা ঠিক। কিন্তু গাছের কী যায় আসে তাতে। কোন বাগানে সে জন্মাল গাছের তাতে তো কিছুই এসে যায় না। কী ফুল ফোটালো সেটাই তো বড় কথা।'

লীলাবতীর মুখে ঠিক এ ধরনের কথা শোনার জন্য তৈরী ছিলাম না। ওর সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা মনে পোষণ করে আসছিলাম। কাপুর একদিন মত্ত অবস্থায় লীলাবতীর বাহুর মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিলেন। লীলাবতী ওঁকে গাড়িতে এনে বসিয়েছিল। লীলাবতী আমার কাছে ঘন হয়ে এল। ওর শাড়ির স্পর্শ এসে আমার গায়ে লাগল। লীলাবতী বলল, কী ভাবছেন

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। বললাম কিছু না।

'আমি জানি আপনি কি ভাবছিলেন।' লীলার চোখে মুখে কৌতুক। 'আপনি ভাবছিলেন আমরা খুব বড়লোক। বড়লোক হলে মানুষ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তাই না

না না তা কেন ভাবছিলাম আপনি কত সুন্দর কথা বলতে পারেন।'

লীলাবতী শব্দ করে হেসে উঠল, আমরা একটা ঝোপের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওর হাসির শব্দে কয়েকটা ছোট পাখি কিচিরমিচির করে উড়ে গেল। লীলার হাসি আরও বেড়ে গেল। হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এক সময় হাসি থামিয়ে লীলাবতী বলল, হাসতে আমার খুব ভাল লাগে। অথচ ইচ্ছে করে না। মনে হয় কোথায় যেন একটা বাধা রয়েছে।

কিন্তু আপনার তো কোন বাধা নেই। অভাব অভিযোগ মানুষকে হাসতে ভোলায়। আপনার সেই ধরনের কোন বাধা নেই।

লীলাবতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চাপা স্বরে বলে উঠল কে বলেছে আমার অভিযোগ নেই, অভাব নেই। আমার তীব্র অভিযোগ আছে। প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। কথা বলতে বলতে লীলাবতী যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। কে বলবে এই লীলাবতীই কিছুক্ষণ আগে বাঁধভাঙা নদীর মত আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল ওর হাসির শব্দে গুটিকয়েক পাখি গাছ ছেড়ে আকাশে উড়তে শুরু করেছিল। একজন মানুষ যদি অপর একজন মানুষকে অকারণে অপমান করে তাকে অবহেলা করে তখন কী মনে হয় আপনার। মনে হয় না, আমি একজন শক্তিহীন অসহায় মানুষ।'

'প্রত্যেক মানুষই তো অসহায় মিস দেশপাণ্ডে।

আমি বিশ্বাস করি না। স্বাভাবিক-ভাবে মানুষ খুব সরল। এই যেমন ধরুন, আপনি আপনার তো কোন অভাব অভিযোগ নেই থাকার কথা না।' লীলাবতী এমনভাবে কথা বলল যেন সত্যি সত্যি একজন পরিপূর্ণ সার্থক মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তাই। সহসা আমার মনে হতে লাগল একজন পুরুষ মানুষ জীবনে যা চায় আমি তাই পেয়েছি। সুখ শান্তি ধনদৌলত ঐশ্বর্য এবং ভালবাসা। লীলাবতী আমাকে দেখে নিয়ে আবার বলতে লাগল জানি না মানুষ মানুষকে এত কষ্ট দেয় কেন। কিসের আনন্দে একে অপরকে এমন ক্ষতবিক্ষত করে। লীলাবতী চুপ করল। ছোট ছোট ফুল গাছের ওপর দিয়ে রংবেরং-এর প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের রঙীন পাখা আর ফুলের রং দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে সেই প্রশ্নটা জেগে উঠল মানুষ বাঁচে কেন? মানুষ কি শুধু মরতে পারে না বলেই বেঁচে থাকে নাকি বাঁচার মধ্যে একটা সুখ আছে আনন্দ আছে সার্থকতা আছে তাকে উপভোগ করবার জন্যেই এই বেঁচে থাকা।

এক সময় ধীরে ধীরে বললাম 'আপনার দুঃখ দেখে আমার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাবা আমাকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের গল্প বলছিলেন। সিদ্ধার্থ কী করে বুদ্ধদেব হলেন সেই সব। শুনতে শুনতে একসময় আমি প্রশ্ন করে ছিলাম টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও মানুষ দুঃখকষ্ট পায় কেন? বাবা সেদিন কোন উত্তর দেন নি। হয়ত ভেবেছিলেন সেই বয়সে এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারবো না। আজও যে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি তা না তবু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আপনার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি লীলাদেবী।

হঠাৎ লীলাবতী আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল বুঝতে পেরেছেন আপনি? ওর এই আকুলতা আমাকে স্পর্শ করল। নরম গলায় বললাম মানুষ এক জায়গায় সবাই সমান। দুঃখে সবাই এক ভাবেই কাঁদে। একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বললাম সবচেয়ে মজার কথা। জানেন? মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে অন্য একজনও ঠিক তার মতই কাঁদছে। তার বেদনা তার কষ্ট বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও সেটা যে রয়েছে তা তো অস্বীকার করা যায় না।

লীলাবতী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল 'আপনি কার কথা বলছেন?'

'অনিমেষের। ভেবেছিলাম অনিমেষের কথা লীলাবতীকে পরিষ্কার ভাবে বলব না কিন্তু বলে ফেললাম।

অনিমেষের অনিমেষের দুঃখ রয়েছে? বেদনা রয়েছে? আমার মত বেদনা?'

'হ্যাঁ। [illegible] এইদিন [illegible] নিজের মুখে স্বীকার করেছে। কী [illegible] জানেন। বলেছে, যাকে কাছে পেতে মন চায় সে এলে কেন দূরে সরে যেতে চাই, সে কথা কেমন করে বোঝাবো।'

'অনিমেষ বলেছে একথা?' বলতে বলতে লীলাবতী যেন অন্যরকম হয়ে গেল। তখনও প্রজাপতিগুলো পাখনা মেলে ফুলের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল লীলাবতী যে কোন মুহূর্তে ওদের সঙ্গে মিলেমিশে ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়তে থাকবে। আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো [illegible] আপনি আমার সত্যিকারের একজন [illegible] লীলাবতী [illegible] সঙ্গে আমার একটা হাত দুহাতের মধ্যে চেপে ধরল।

মানুষের কী [illegible] যে লীলাবতীর [illegible] আগে পর্যন্ত [illegible] ভেঙে পড়তে দেখেছি [illegible] সেই লীলাবতীর [illegible] দুঃখে আনন্দে [illegible] হয়ে উঠল। মানুষের বাঁচার [illegible] একটা কথাই [illegible] জেগে ওঠে, সে [illegible] জানতো সে কী চায়'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাগানের শেষ সীমানায় এসে পড়েছি। লীলাবতী তখনও [illegible] একজন [illegible] প্রথম [illegible] মানুষ বলে [illegible] মনে হয়েছিল [illegible] পারলে আমি [illegible] দেখলাম যে আমার ধারণা ভুল হয়নি।

অনিমেষের প্রথম যেদিন দেখেন আপনার কী মনে হয়েছিল [illegible] প্রশ্ন করে ফেললাম।

অনিমেষকে দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমি তখন বাবার অফিসে বসেছিলাম। অনিমেষ এসে ঘরে ঢুকলো [illegible] ক্যালর [illegible] একটা [illegible] নকসা। ও সেটা বাবার টেবিলের ওপর বিছিয়ে দেখে অনেকক্ষণ ধরে কী সব বললো। আমি যে একজন [illegible] মেয়ে শুধু না সুন্দরী মেয়ে ওর সামনে বসে রয়েছি [illegible] দেখল না পর্যন্ত। আমার ভীষণ রাগ [illegible] লোকটা যে শুধু দাম্ভিক তাই না সেজায় অভদ্রও। ও বাবার সঙ্গেও কর্কশভাবে কথা বলছিল। সময় সময় বাবার মুখ লাল হয়ে উঠছিল। সেইদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম। কী প্রতিজ্ঞা করলাম শুনবেন। লীলাবতী চোখ তুলেই আমাকে দেখে নিল [illegible] প্রতিজ্ঞা করলাম এই লোকটাকে এমন শিক্ষা দেব যা ও জীবনে ভুলতে পারবে না। লীলাবতী চুপ করলো।

প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

লীলা চোখ তুলে তাকাল। ওর চোখে ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার বিষন্নতা। 'তারপর আর কি। সবই তো বুঝে ফেলেছেন। চলুন, চা খাবেন।'

চায়ের টেবিলে এসে বসলাম। তখন চারিদিকের অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। লীলাবতীর মুখ অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। ও নীচু হয়ে চা ঢালতে লাগল। সেভাবেই বলল, 'একটা অনুরোধ করবো আপনাকে। অনিমেষকে আজকের কথা বলবেন না।'

'কেন?'

'মানুষ এক জায়গায় অন্তত মাথা উঁচু করে থাকতে চায়। ও যেন আমার দুঃখের কথা জানতে না পারে। তা ছাড়া, আমার দুঃখ হয়ত তেমন কিছু না। আবেগের মুহূর্তে কী বলতে কী বলে ফেলেছি।'

বুঝলাম লীলাবতী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে। নিজের দৈন্য ঢাকতে চাইছে। বললাম, 'কথা দিচ্ছি, অনিমেষকে এ বিষয়ে কিছু বলবো না।'

দেশপাণ্ডে আমাকে দেখে খুশী হলেন। বললেন, 'আমার ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল। গোটা কয়েক কাজ ছিল, সেরে আসতে হল।' কথাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে বললেও, মনে হল লীলাবতীকে শুনিয়েই বললেন তিনি। লীলা ভালমন্দ উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লাম। আমরা তখন ড্রইংরুমে বসেছিলাম। দেশপাণ্ডে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, দেশপাণ্ডে আসার পর থেকে লীলাবতীর কথা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গেটের মুখে এসে বললাম, 'কয়েকটা দিন আপনার হয়ত একটু একা একা লাগবে। আমি কোলকাতায় যাচ্ছি। আজ আপনার বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিলাম।'

'তাই নাকি? আমিও কোলকাতায় যাব। আমার এক কাকা আছেন। অনেকদিন তাঁদের দেখি না।' লীলাবতী যেন আনন্দে নেচে উঠল।

'কিন্তু আপনার বাবার হয়ত এখন যাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা দুজনে একসঙ্গে বাইরে যেতে পারি না।'

'আমি তো আপনার সঙ্গে যাব। ভয় নেই, আমি একটা বোঝা না। দস্তুরমত লেখাপড়া জানা আপ-টু-ডেট মেয়ে। জানেন, আমি এখন সিক্সথ ইয়ারের ছাত্রী। একা একা ট্রাভেল করার অভ্যেস আছে আমার। তবে আপনি যাচ্ছেন, সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব এই আর কি। আপনি যাবার দিন ঠিক জানাবেন, আমিও টিকিট কাটবো।'

উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। লীলাবতী আবার বলল, 'আমি কিছুদিন এখানে থাকবো। আপনাকে খুব জ্বালাতন করবো।' বলে উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ল।

বললাম, 'আপনার পরীক্ষা?'

'পরীক্ষা দেব না।' ও এমনভাবে বলল, যেন সেটা কোন সমস্যাই না।

বললাম, 'আপনাকে দেখে একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি খুব সেন্টিমেন্টাল।'

'মানুষ মাত্রেই সেন্টিমেন্টাল। যে বলে আমি সেন্টিমেন্টাল না, সে ভেতরে ভেতরে কষ্ট পায়। যেমন, আপনার বন্ধু।'

কথা না বলে বেরিয়ে এলাম। শরতের শিরশিরে হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। রোঁয়ায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে। মনে নেশা ছড়াচ্ছে। হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ল। আমাকে দেখে সুপ্রিয়া নিশ্চয় খুব অবাক হবে। এত তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাবার জন্যে বিরক্তও হবে বোধ হয়। নির্ঘাৎ দু দশটা উপদেশও দিয়ে দেবে। উপদেশ দেওয়া যার স্বভাব, সে কিছুতেই স্বভাব বদলাতে পারবে না।

ট্রেন একঘণ্টা লেট ছিল। দেশপাণ্ডে আমাদের তুলে দিতে স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে আমাকে আবার মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনি ফিরে এলেই আমি কিন্তু বেরোবো।' ভদ্রলোক বেশ বুদ্ধিমান। কী রকম কায়দা করে আমাকে ঠিক সময় মত ফিরে আসতে বললেন। দেশপাণ্ডে যতক্ষণ ছিলেন লীলাবতী একটাও কথা বলে নি, জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম দেখছিল। দেশপাণ্ডেও লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলেন নি।

ট্রেন ছাড়তেই লীলাবতী আমার দিকে ফিরে বসল। কামরায় আরও দুজন লোক ছিল। আগে থেকেই তারা আসছিল। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার শুয়ে পড়ল। লীলাবতী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি যে কেন হঠাৎ চলে এলাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না।' আমি কথা বললাম না দেখে ও আবার বলল, 'আপনার এরকম হয় না কখনও। এই হঠাৎ কিছু করে বসা।'

'সাধারণ মানুষের হঠাৎ কিছু করে বসা শোভা পায় না।'

আমার কথা শুনে লীলাবতী আধো-গলায় বলল, 'সাধারণ অসাধারণের প্রশ্ন না। আপনার এরকম হয় কিনা?'

মনে মনে ওর কথায় বিরক্ত হলাম। মুখে সে ভাব না দেখিয়ে বললাম, 'এখন পর্যন্ত হয় নি। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে।'

লী[illegible] বলল, '[illegible] একদিন হয়েই [illegible] দেখবেন।'

উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। লীলাবতী বলল, 'কিছু বললেন না যে?'

'আপনি তো প্রশ্ন করেন নি। যা বললেন, শুনে গেলাম।'

'আমার কী মনে হয় জানেন, এক এক অবস্থায় মানুষ এক এক রকম ব্যবহার করে। এই যেমন আমি। পার্টিতে গেলে আমি অসম্ভব ড্রিংক করি। ভীষণ নাচি। পিকনিকে গেলে বেজায় চেঁচাই লাফাই, গান গাই। পাটনায় এলে বেশীর ভাগ সময় কিছুই করতে ভাল লাগে না। কিছুদিন থাকার পরেই পাটনা থেকে পালিয়ে যাই। আবার কিছুদিন পরেই পাটনায় আসার জন্য ছটফট করি।'

হেসে বললাম, 'পাটনা আপনাকে পাগল করে দেবে দেখছি।'

লীলাবতী মুখ কাঁচুমাচু করে বলল 'সত্যি এক এক সময় মনে হয়, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। আচ্ছা, এক একজন মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন বলতে পারেন?'

লীলাবতীর গলায় একটা আকুলতা ফুটে উঠল। নরম ভাবে বললাম, 'যাকে নিষ্ঠুরতা বলে ভাবছেন, আসলে হয়তো সেটা মোটেই নিষ্ঠুরতা না। এমনও তো হতে পারে, উপায় থাকে না বলেই মানুষকে নিষ্ঠুরতার ভান করতে হয়।' বলি বলি করেও অনিমেষের আসল ব্যাপার কথা লীলাবতীকে বলতে পারলাম না। লীলাবতী যদি একদিন অনিমেষের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, ওরা দুজনেই হয়ত শান্তি পাবে।

লীলাবতী খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'উপায় মানুষকে খুঁজে বার করতে হয়। নিষ্ঠুরতার মধ্যে আর যাই থাক; কোন বাহাদুরী নেই।'

হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললাম, 'এত লোক থাকতে আপনিই বা অনিমেষকে ভালবাসতে গেলেন কেন? ওর মধ্যে কী এমন দেখলেন!' প্রশ্নটা নিজের কানেই কীরকম বিশ্রী শোনাল। আবার বললাম, 'আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর অনিমেষের প্রতিষ্ঠা এক না। এবং মানসিক দিক দিয়েও দুজনে ঠিক বিপরীত ধরনের। আপনি চঞ্চল, অনিমেষ ধীর স্থির মানুষ। আপনি কথা বলতে ভালবাসেন, অনিমেষ কথা শোনে। আপনি হাসেন, অনিমেষ খুব কম হাসে। আপনি দেখতে এত সুন্দরী, আর অনিমেষ তো খুব সাধারণ একজন মানুষ। অনিমেষ সম্বন্ধে এভাবে কথা বলছি বলে মনে কিছু করবেন না। অনিমেষ আমার বন্ধু। বন্ধু বলেই ওর সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলতে পারলাম।'

(ক্রমশঃ)

চিত্রকর অলোক ভট্টাচার্যের ড্রইং-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট এন্ড কালচারের প্রদর্শনী কক্ষে। প্রদর্শনীতে এই তরুণ চিত্রকর তাঁর গত দেড় বছরে আঁকা ২৩টি ড্রইং দেখালেন। শিল্পী ড্রইং বলতে সত্যি সত্যিই রেখাঙ্কন বোঝেন। আজকাল যেমন অনেকে ড্রইং বলে কাগজে আঁকা তেল রঙ এবং জল রঙের ছবিও চালিয়ে দেন, অলোক তা করেন না। চিরাচরিত ধারণানুযায়ী অলোক মনে করেন, চিত্রক্ষেত্রে বর্ণ প্রলেপিত হলেই তা খানিকটা ক্ষেত্রদখলকারী পুঞ্জের রূপ পায়, রেখা থাকে না। এবং রঙ তার নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে চিত্রতলে আবির্ভূত হয়। অলোক তাই তাঁর রেখাঙ্কনগুলিতে রঙের ব্যবহার করেন নি। এ-গুলি শাদা কাগজের উপরে কালো অথবা নীল-কালো কালিতে আঁকা ড্রইং। টোন বা কালোর অথবা নীল-কালোর নানান বর্ণান্তর, যথা ঘন কালো থেকে মাঝারি কালো আবার তার থেকে হাল্কা কালো, অবশ্যই ঘটেছে এ-সব ড্রইংয়ে, কিন্তু ছবি মূলত একরঙা থেকে গেছে। বর্ণান্তরের কথা যখনই বলেছি, তখন আশা করি বোঝা গেছে যে অলোকের ড্রইংয়ে রেখা প্রধান উপজীব্য হলেও, রূপায়ণের একমাত্র হাতিয়ার নয়। কালোর পুঞ্জও ছবির-জমির অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাজ করে। তা না করলে বর্ণান্তর ঘটবে কেমন করে?

মনুষ্যাবয়বই অলোকের প্রধান উপজীব্য। অলোকের ছবির বিষয়বস্তু মানুষের বর্তমান অবস্থা। মানুষের শ্রম, মানুষের কর্ম, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অত্যাচার, হিংসা, দ্বেষ, রিরংসা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা, বঞ্চনা, ভীতি, মৃত্যু, অপমৃত্যু ও মানবিকতা থেকে পতন ইত্যাদি অলোকের ড্রইং-এর বিষয় বস্তু। এইসব বিষয় বস্তুর রূপায়ণের জন্য অলোক যন্ত্রণা কাতর, বুভুক্ষু, নিপীড়িত অসম বলশালী সুদেহী কর্মী মানুষের ছবি' এঁকেছেন। এঁকেছেন অত্যাচারীর ছবি, বিচারালয়ের ছবি, মরলোকের নরকের ছবি, সেই সব দুঃস্থ বাজনদার-সঙ্গীতকারদের ছবি যারা শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য [illegible] চিত্তবিনোদনের জন্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে নির্লিপ্ত থেকে 'শিল্প' উৎপাদন করে যায়।

অলোকের ড্রইং-এ নানান রীতির রূপায়ণ দেখা যায়। মনে হয় তিনি এখনও প্রত্যয়ের শৈলীতে উপনীত হতে পারেন নি। প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি 'কনভিক্ট', এটি এবং 'ক্রেস্টফলেন' এক রীতির ছবি। সরু এবং ভাঙ্গা সীমারেখা দিয়ে মনুষ্যাকার গঠন করে টোন এবং শেডের সাহায্যে আলো-ছায়া সৃষ্টি করে শরীরে ঘনত্ব এবং ডৌল বোঝান হয়েছে। প্রতিমা-লক্ষণের দিক থেকে এই ড্রইং-এর মানুষেরা প্রকৃতিবাদী রীতিতে অঙ্কিত। কিন্তু চিত্রতলে রূপবন্ধ বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী রীতি অনুসৃত হয়নি। 'কনভিক্ট' ছবিটিতে পক্ষী-চক্ষু জাতীয় দৃষ্টি-কোণের ব্যবহারের ফলে একটি কৌণিক প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে এবং ফলতঃ ছবিটি একটি আশ্চর্য নাটকীয়তা পেয়েছে। 'ক্রেস্টফলেন' ছবিটিতে কিন্তু শাদা এবং কালোর সমানুপাতিক বিতরণ ছবির রূপবন্ধগুলির গতিময়তা ক্ষুন্ন করেছে। দ্বিতীয় জাতের শৈলীর সাক্ষাৎ মেলে 'মাইটি পুল', 'ম্যান এন্ড নেচার' এবং 'গ্রোপিং' নামের ছবিগুলিতে, 'রিপ্রেসড ভিসিবিলিটি' ছবিটি প্রথম এবং দ্বিতীয় জাতের শৈলীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট। দ্বিতীয় জাতের ছবির মধ্যে সলিচিউড' ছবিটি স্মরণীয়। মুখের অভিব্যক্তি এবং বর্ণান্তর ও রেখা যে ভাবে শূন্যক্ষেত্রকে বাঙময় দেশের ব্যাপ্তি দিয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। বাজনদারদের ছবিগুলিকে তৃতীয় জাতের বলে ধরা যেতে পারে। এদের বিন্যাসে সহজ-চক্ষুমাত্রিক দৃষ্টিকোণকেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং চিত্রতলে বহির্জাগতিক পারম্পরিকতাকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও দুটি পৃথক ভাগ করা যেতে পারে। 'টু মিউজিশিয়ানস' পুঞ্জপ্রধান ছবি কিন্তু এই সিরিজের অন্যগুলি রেখাপ্রধান। রেখাপ্রধানই হোক বা পুঞ্জপ্রধানই হোক, রেখার শ্লথগতিতে বা কালো রঙের পুঞ্জে শিল্পী যে সব বাজনদারদের চিত্রিত করেছেন তাদের অবয়বের ভঙ্গিতে রেখা ও রঙের চরিত্রের গুণে এক অদ্ভুত বিষাদ আরোপ করতে পেরেছেন। 'ক্লাইম্বারস' ছবিটি চতুর্থ জাতের ছবির উদাহরণ। এই ছবিটিতে বর্ণান্তরের বদলে একই ভাবের কালোর পুঞ্জের আবয়বিক চেহারাকে অলঙ্করণের বিভিন্নতায় বর্ণালয়ে শিল্পী চিত্রদেশকে বিভাজিত করেছেন। অনেকগুলি মনুষ্যাবয়বকে অঙ্কন করে তাদের শারীরিক ভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে একটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। মনুষ্যাকারকে বর্তুলময় অবয়বের সমাহার রূপে রূপায়িত করেছেন। সমস্ত রূপকল্পটিতে মিকালাঞ্জেলো থেকে রুবেন্স পর্যন্ত বারোক শৈলীর প্রভাব। 'পেইনড' ছবিটি প্রথম এবং চতুর্থ রীতির সমাহারে রূপায়িত। রাস্তার ধারে মা ও ছেলের ছবিটি রেখার চরিত্র বৈগুণ্যে এবং বিন্যাসে একটি দুর্বল গল্প-বলা ছবি এবং প্রতীকটিও অতি ব্যবহারে জীর্ণ। এ জাতের ছবি প্রদর্শনীতে ঐ একটিই ছিল। না থাকলেও ক্ষতি বৃদ্ধি হত না। 'টার্গেট' ছবিটি ষষ্ঠ জাতের ছবির অন্যতম নিদর্শন ও অতিনাটকীয়তা দোষে দুষ্ট। এবং 'ড্রইং থ' ছবিটি সপ্তম জাতের ছবির নিদর্শন।

অলোক নানান জাতের রেখা ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত এবং তাঁর রেখা ঋজু ও বলিষ্ঠ ছন্দোময়। পেলব ও সূক্ষ্মছন্দের রেখা তাঁর হাতে তেমন খোলে না। অবশ্য তিনি যে সব বিষয় নিয়ে মগ্ন তাতে ও-জাতের রেখার প্রয়োজন কম। চিত্রক্ষেত্রে পুঞ্জের এবং পুঞ্জের ও বর্ণান্তরের সাহায্যে ঘনত্ব প্রদর্শনেও তিনি কম পারদর্শী নন। কিন্তু অনেক সময়ে তাঁর বর্ণান্তর ঘনত্ব জ্ঞাপক হয় না চিত্রক্ষেত্রকে দেশ করে তোলে না। শাদা কালোর বিতরণ সম্পর্কে তাঁর আরও বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শাদা-কালোর সামানুপাতিক বিতরণ অনেক সময়ে তার ছবি রেখার গতিকে এবং মনুষ্যাবয়বের গতিকে ব্যাহত করে। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু অনেক সময়ে বিপরীতমুখী দ্বান্দ্বিক গতি ও ছন্দ চায়—সে সম্বন্ধেও অলোককে সচেতন হতে হবে। তাঁকে সচেতন হতে হবে হাত, মুখ, চোখ ইত্যাদি অবয়বের কয়েকটি প্রতীকী ব্যবহারের সম্বন্ধে। এর অনেকগুলি অতি ব্যবহারে জীর্ণ। বারোক থেকে রোমান্টিক এবং পরবর্তীকালে জর্মন একসপ্রেসনিস্ট শিল্পীরা এই সব প্রতীককে এত বেশী ব্যবহার করেছেন যে এগুলি কতকগুলি নির্দিষ্ট অর্থে মণ্ডিত হয়ে গেছে। শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টি নেতিবাচক হস্তমুদ্রা বা হাতের আঁকড়ানোর ভঙ্গি, বঙ্কিম গ্রীবা, পলায়নপর পদমুদ্রা ঊর্দ্ধাকাশ দর্শনমগ্ন মস্তক ভঙ্গি, চিত্রক্ষেত্রে কালোর প্রাধান্য, চিত্রক্ষেত্রে অবয়বাংশের অনির্দিষ্ট সংস্থাপন ইত্যাদি বারোক, রোমান্টিক এবং জর্মন

এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের কল্যাণে অনির্দিষ্ট মৃত্যু কারক অন্ধকার নিয়তির বিরুদ্ধে আতঙ্কিত ভীত সন্ত্রস্ত শক্তিধর একক মানুষের হতাশ যুদ্ধের দ্যোতক হয়ে গেছে। জানি না অলোক নিজে এই জীবন দর্শন স্বীকার করেন কিনা? কিন্তু মানুষের জীবন যুদ্ধজনিত ট্র্যাজেডি নিয়ে যেসব শিল্পীরা ভেবে থাকেন তাঁরা সহজেই নিজেদের এই বিরাট শিল্প-ঐতিহ্যের অনুগামী করে ফেলেন। অলোক অত্যন্ত দক্ষ, শক্তিমান এবং ভাবুক শিল্পী, তাই আমি তাঁকে এই সহজ সমাধান সম্পর্কে সচেতন করে তুলবার উদ্দেশ্যে এত কথা বললাম।

এক মহিলার একক ও একটি যৌথ প্রদর্শনী

চিত্রশিল্পী সুলতান আলীর কন্যা মুমতাজ সুলতান আলী বয়সে নবীনা। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁর কাজের প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দিল্লী আর্ট কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তা মাদ্রাজনিবাসী এই তরুণী সম্প্রতি কলকাতাবাসী হয়েছেন। কলকাতায় তাঁর কাজের প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গেল ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রদর্শনী কক্ষে। মুমতাজ ছাপের-ছবি নির্মাতা। এই প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর ১৯৭১-৭২ সালে রচিত কুড়িটি ছাপের ছবি দেখান। ছাপের ছবির কোন প্রথাসিদ্ধ মাধ্যমে এ-ছবিগুলি রচিত হয় নি। যদিও তিনি তাঁর প্রদর্শনী তালিকাটিতে তাঁর কোন কোন ছবিকে এচিং এবং অধিকাংশ ছবিকে রঙিন ইনতালিও বলে বর্ণনা করেছেন, তবু সন্দেহ থেকে যায় ও'র ছবির মাধ্যমকে ঐ সব নামে অভিষিক্ত করা যায় কিনা। কারণ, একটি বাদে তাঁর কোন ছবিই ধাতু-নির্মিত পাতের উপর খোদন বা নরুন অথবা এসিড বা অম্লজানের সাহায্যে রচিত হয় নি। দিল্লীর ছাপের-ছবি নির্মাতা জগমোহন চোপরার প্রাক্তন শিষ্যা মুমতাজ, জগমোহনের মতনই 'ফেভিকোল' নামে আঠা-জাতীয় দ্রব্যের সাহায্যে স্বার্ডের উপর প্রাথমিক রচনা তৈরী করে, পরে তার উপর বোলারের সাহায্যে রঙ লাগিয়ে, তার থেকে কাগজের উপর ছাপ নিয়েছেন। এই মাধ্যমকে এচিং বা ইনতালিও নামে অভিহিত করা যায় কিনা বিবেচ্য।

মুমতাজের ছবির কয়েকটি সহজ আকর্ষণীয় ক্ষমতা আছে। মুমতাজ নিয়মিতভাবে কাজ করেন এবং অনেক কাজ করেন: ফলে মাধ্যম ব্যবহারে এক ধরনের অনায়াস দক্ষতা লক্ষণীয়। এবং যেহেতু বহুদিন ধরে তিনি এক ধরনের কাজ করছেন তাই কাজে দ্বিধা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষাজনিত অস্থিরতা দেখা যায় না। প্রতিটি রেখা, বুনটের কাজ, অলংকরণ, রঙ লাগানো বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমতাজ বেশ সহজ প্রকাশ এক অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। এটাই মুমতাজের প্রধান গুণ। মুমতাজের ছবির অপর যে দিকটি দর্শকের দৃষ্টিকে সহজেই আকৃষ্ট করে—সেটিকে গুণ বলে ধরা হবে কিনা সে বিষয়ে বর্তমান সমালোচকের সন্দেহ আছে। মুমতাজের প্রতিটি ছবি এক, দুই বা তিনটি প্রধান মোটিফ বা রূপবন্ধ কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই রূপবন্ধগুলি মনুষ্য অথবা জীবায়ব ভিত্তিক। এই মনুষ্য অথবা জীবায়ব ভিত্তিক রূপবন্ধগুলি পরিচিত কোন দেবতা অথবা দেবী অথবা তাদের বাহনের রূপকল্পনানুসারে গঠিত অথবা একাধিক দেব অথবা দেবীর রূপকল্পের সমাহারে গঠিত। বর্তুলাকার, বক্রাকৃতি ও লতা-গারিত্র্যের রেখার অলংকরণে মুমতাজের প্রতিমারা ছবিতে স্বপ্রকাশ। দেবপ্রতিমা এবং তাদের আলঙ্কারিক প্রকাশ মুমতাজের ছবিকে একপ্রকার আকর্ষণীয়তায় মণ্ডিত করেছে। এই আকর্ষণ নান্দনিক নয়। এটা মুমতাজের ছবির কোন বিশিষ্ট লক্ষণও নয়। ভারতীয় হবার তাগিদে মাদ্রাজের আধুনিক চিত্রশিল্পীরা নব্য-হিন্দু হয়ে, চয়োলাল যুগের প্রস্তর নির্মিত এবং ধাতু-নির্মিত ভাস্কর্যের যে রৈখিক এবং দ্বিমাত্রিক অনুবাদ কর্মে নিবিষ্ট, মুমতাজের এবং মুমতাজের পিতা সুলতান আলীর চিত্রকলায় তারই এক বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। এটা যে বিশ্বাস প্রসূত নয় তা মুমতাজের ছবি থেকেই বোঝা যায়। মুমতাজের ছবির দেবদেবীরা কোথাও অভিব্যক্তিমূলক নয়, অর্থাৎ ছবির এই দেবী বা দেবমূর্তিরা দর্শকের মনে তাদের ক্ষমতা বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন ধ্যানরূপ সৃষ্টি করে ভয় ভক্তি বা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। ছবির এই সব দেব-দেবীরা তাঁদের অলঙ্কার সর্বস্বরূপ নিয়ে ছবির ভূমিতেই সদা বিরাজমান। তারা নেহাৎ-ই রূপবন্ধ। এ-তো গেল প্রতিমালক্ষণ নিয়ে বক্তব্য যাকে প্রখ্যাত মূর্তিতত্ত্ববিদ এরউইন প্যানোফস্কি বলেছেন শিল্পের বিষয় নিয়ে আলোচনা।

আঙ্গিকগত দুর্বলতাও কিছুর। বিষয় এবং বিষয়ীর একাত্মীকরণ না হলে আঙ্গিক-গত দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী। দ্বি-পাক্ষিক চিত্রক্ষেত্রে কোন প্রতিভাসিক রূপবন্ধ স্থাপন করলেই চিত্র-ক্ষেত্র ত্রিমাত্রিক দেশ হয়ে উঠতে চায়। যাঁরা দ্বি-মাত্রিক চিত্রক্ষেত্রকে ত্রি-মাত্রিকতা দান করতে চান তারা পারস্পেকটিভ বা প্রেক্ষিত রচনার কোন-না-কোন নিয়ম মেনে নেন। আর যাঁরা দ্বি-মাত্রিকতার বাঁধন মেনে নিয়েই চিত্র রচনা করেন—তাঁরা হয় বিমূর্ত শিল্প করেন, না হয় রূপবন্ধ সমূহকে এমনভাবে সংস্থাপন করেন বা বর্ণান্তর (tonal gradation) এবং বর্ণভেদ (colour composition) এমনভাবে ঘটান বা রেখায় পারম্পরিকভাবে এমনভাবে সাজান যাতে দর্শনেন্দ্রিয়ত্বে বোধ জন্মায় যে ঘনত্বরীবিশিষ্ট রূপবন্ধগুলি বহুস্তর-বিশিষ্ট চিত্রদেশে অবস্থান করছে। কিন্তু মুমতাজের ছবির মোটা-ভারি রেখায় ঘেরা দেবদেবী রূপবন্ধগুলি একান্তভাবে একতল মাত্রিক। রৈখিক অলঙ্কার-বাহুল্যের কারণে রূপবন্ধগুলি আরও বেশী একতল-মাত্রিক হয়ে পড়েছে। অথচ রেখাচ্ছায়ার (shading) ব্যবহারে ঘনত্ব আরোপের প্রচেষ্টা ধরা পড়ে। বর্ণান্তর ঘটানোর মধ্যেও চিত্রতলকে দেশ করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। কিন্তু রেখাছন্দের পৌনপুনিকতা, রূপ-বন্ধাংশের পৌনপুনিক সংস্থাপন, সব ধরনের রূপবন্ধের একজাতের শৈলী-করণ এবং শূন্যক্ষেত্রের সামানুপাতিক বিন্যাস ছবিতে এমন একটি অলংকরণ সৃষ্টি করেছে যাতে চিত্র দ্বিতলমাত্রিক নকশা হয়ে উঠেছে। মুমতাজের চিত্রের আরেকটি নঞর্থক দিক তার জমির বুনটের সঙ্গে নকশার অসহযোগিতা। ছবির বুনটের রেখার স্পর্শ-গ্রাহ্যতা ও জৈব অস্থিরতা নকশার সম্পূর্ণ-ভাবে অনুপস্থিত। বৈপরীত্য এতই প্রকট যে তারা কোন দ্বন্দ্বমূলক নাটকীয়তা সৃষ্টি করে না।

আঙ্গিকগত দুর্বলতা ছাড়াও, কারু-কৌশলের দুর্বলতাও মুমতাজের ছবিতে দুর্লক্ষ্য নয়। ছাপের স্পষ্টতা চাপের সাম্য ইত্যাদি যে গুণগুলি ছাপের ছবির কারু-কৌশলগত গুণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তা অনেক সময়ে রঙিন ছবিতে ধরা পড়ে না। শাদা-কালো ছবিতে অথবা চাপের ছবিতে (embossed) সে দোষগুণগুলি বেশ ভাল ধরা পড়ে। মুমতাজ তার যেসব ছবিতে চাপের (embossing) কাজ করেছেন সেখানে তাঁর ছাঁচ (matrix) তৈরীর দুর্বলতা ধরা পড়েছে চাপের সাম্যের অভাব নকশার অস্পষ্টতা ইত্যাদি দোষগুলি ঐ ছবিগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে এ দোষ মুমতাজেরও নয়, দোষ তাঁর মাধ্যমের। ধাতুপাত্র খোদাই করা না শিখলে ছাপের ছবিতে রেখা ব্যবহার শেখা হয়ে ওঠে না. লিথোগ্রাফ না করলে ছাপের ছবির জমি ভরাট করার কায়দা রপ্ত হয় না।

একই সপ্তাহে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনী কক্ষে 'ক্যানভাস' শিল্পীচক্রের সভ্যদের বাৎসরিক চিত্র ও ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে এগারোজন চিত্রকরের এগারোটি বিভিন্ন মাধ্যমে রচিত চিত্র এবং দুজন ভাস্করের প্লাস্টার অফ প্যারিস এবং পোড়ামাটিতে গড়া চারটি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়। শিল্পীরা সকলেই চারুকলাবিদ্যায় নিয়মিত শিক্ষাপ্রাপ্ত। বয়সে তরুণ হলেও, এ'রা সবাই বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং প্রদর্শনীতে দেখাচ্ছেন। কিন্তু সে অনুপাতে প্রদর্শনীর মান আশানুরূপ নয়। তাছাড়া কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনী কক্ষটি যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর পক্ষে অনুপযুক্ত। যে কোন শিল্পীকে বসিয়ে দিতে হলে তাঁর ছবি কলকাতা তথ্যকেন্দ্রের লোংরা ধূলি কালি লাঞ্ছিত বিসমভাবে আলোকিত, ফেটে হয়ে যাওয়া সোনালীরঙের এবড়ো-খেবড়ো কাঠের বোর্ডে ঝোলানো যথেষ্ট। শিল্প-বস্তুকে ভালোভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার আয়োজনটি বড় কম নয়।

—প্রণবরঞ্জন রায়

বাংলাদেশের মেয়ে

চন্দ্রাবতীর প্রেম

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অদূরে ফুলেশ্বরী নদী। নদীর পারে পাতুয়ার গ্রাম। যেন একটি ছবি। চারিদিকে তার ফুলের বাগান। সেখানে হাজার রকমের ফুল।

রোজ ভোরবেলা একটি মেয়ে ও এক তরুণ যুবক একই বাগানে ফুল তুলতে আসে।

একদিন তরুণী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? তুমি তো আমাদের গাঁয়ের লোক নও।'

মেয়েটির নাম চন্দ্রাবতী। সেই গ্রামের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশীদাসের মা-হারা একমাত্র সন্তান।

ছেলেটির নাম জয়চন্দ্র। সে বললে, 'আমি তোমাদের গাঁয়ে থাকি না। কিন্তু আমি দূরের মানুষ নই। তোমার গ্রাম আর আমার গ্রাম এই নদীর দুই পারে।'

দু'জনের আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হল। দু'জনের মধ্যে যেন অলক্ষ্যেই এক নিবিড় মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। একদিন চন্দ্রাবতী একটি মালতীর মালা জয়চন্দ্রকে উপহার দিল। সেদিন দু'জনেরই মনে এক নতুন ভাবের স্ফুরণ।

কয়েকদিন পরে চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রের কাছ থেকে এক পত্র পেলো। জয়চন্দ্র লিখেছে, 'আমি তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ। তোমার সঙ্গ পাবো বলেই রোজ ভোরবেলা ফুল তুলতে যাই। তোমার দেওয়া মালা নিয়ে আমি সারাদিন কেঁদে কাটিয়েছি। আমার মা-বাবা নেই, মামার বাড়িতে থাকি। যদি তোমার সদয় উত্তর পাই তবেই এ অঞ্চলে থাকবো, নয়তো চিরকালের মত তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূর দেশে চলে যাব।'

• • •

চন্দ্রাবতীর বাবা বংশীদাস শিবের ভক্ত। প্রত্যহই চন্দ্রাবতীর আনা ফুল দিয়ে শিব-পূজা করতেন। সেদিনও তিনি যথারীতি শিবের পূজা করলেন এবং পূজার শেষে প্রার্থনা জানালেন, 'হে দেবাদিদেব! আমি সম্পত্তিহীন ব্রাহ্মণ, তুমি আমার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। শিগগিরই যেন ভাল বরের প্রস্তাব নিয়ে ঘটক আমার বাড়ি আসে।'

সেদিন পিতার পূজার আয়োজন করে দিয়ে চন্দ্রাবতী নিজের ঘরে গিয়ে আবার জয়চন্দ্রের পত্রটি পড়ল। তারপর মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে অন্তরের আকুতি জানালো, জয়চন্দ্রকে সে যেন স্বামীরূপে পায়। জয়চন্দ্র ভিন্ন অন্য কাউকে সে পতিত্বে বরণ করতে পারবে না।

জয়চন্দ্রের চিঠি পাবার পরে যেন চন্দ্রাবতীর মনে একটা দারুণ লজ্জার ভাব এসেছে। সংক্ষেপে সে তার পত্রের জবাব দিয়েছে, লিখেছে, আমি কি বলব, বল! আমার বাবা আছেন। তাঁকে তো বলা দরকার। আমি বড় লজ্জা বোধ করছি। কিন্তু তুমি দূর দেশে চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে।

কী এক মধুর লজ্জায় চন্দ্রাবতী জয়-চন্দ্রের সামনে আসতে পারে না। সে ভোর রাত্রে, জয়চন্দ্র বাগানে আসবার আগেই, ফুল তুলে নিয়ে আসে, যাতে জয়চন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা না হয়। কিন্তু তার মন জয়চন্দ্রের প্রতি প্রেমে প্লাবিত হোয়ে রইল।

পরদিন বংশীদাসের কাছে এক ঘটক এসে একটি সুপাত্রের সন্ধান দিল। পাত্রের নাম জয়চন্দ্র চক্রবর্তী। ফুলেশ্বরীর অপর পারে সুন্ধা গ্রামে তার বাস। নানা শাস্ত্রে সে সুপণ্ডিত এবং বিশেষ রূপবান।

বংশীদাস কোষ্ঠী বিচার করলেন। রাজযোটক মিল। তিনি সানন্দে সম্মত হলেন। বিবাহের দিন স্থির হোয়ে গেল।

* * *

এদিকে জয়চন্দ্র সন্ধ্যা গ্রামের একটি মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যহ ভোরবেলা সে নদীর ধারে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার জন্য বসে থাকে। চন্দ্রাবতীর কথা সে ভুলে গেছে। নতুন প্রেমে সে তখন আত্মহারা।

বিবাহের দিন সমাগত হল। বংশী-দাসের বাড়িতে বহু লোকজনের সমাবেশ। উলুধ্বনি, আনন্দ-কলরব।

এমন সময়ে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত। খবর এলো, জয়চন্দ্র হঠাৎ এক মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করেছে।

আনন্দ কোলাহল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল, চারিদিকে হাহাকার উঠল। কিন্তু চন্দ্রাবতী নিশ্চল, নিস্তব্ধ—যেন পাষাণ প্রতিমা। তার জন্য ঘর ভরা লোক বিলাপ করছে। কিন্তু সে নীরব। কোন কথা নেই তার মুখে।

দিন যায়, রাত্রি আসে। এমনিভাবে দিন কেটে যাচ্ছে। চন্দ্রাবতীর আহার নেই, নিদ্রা নেই, সহচরীদের সঙ্গে আলাপ নেই। বংশীদাস সবই বুঝলেন। এ ব্যাপারে কন্যার কী দোষ? তিনি নিজে ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত। শাস্ত্র বিচার করে তিনি পুনরায় কন্যার বিবাহ দেবার জন্য উদ্যোগী হলেন। অশেষ রূপবতী কন্যাকে তিনি বহু গ্রন্থ পড়িয়েছিলেন। তাই এই রূপসী ও বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করতে অনেকেই রাজী হল।

কিন্তু চন্দ্রাবতী বললে—

"পিতা মোর বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।
শিবপূজা করি আমি, শিব পদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখো, কর অনুমতি।।"

বংশীদাস তাঁর কন্যার মনের গতি বুঝলেন। তিনি মেয়ের কথা রাখলেন। বললেন, 'বেশ। তুমি আজীবন কুমারী-ব্রত অবলম্বন করে থাকো এবং রামায়ণ লেখো।'

চন্দ্রাবতী একাগ্রচিত্তে শিবের আরাধনায় ব্যাপৃত হল এবং পিতার নির্দেশে রামায়ণ লিখতে লাগল। সে রামায়ণ লেখা তার শেষ হয়নি।

ফুলেশ্বরী নদীর তীরে চন্দ্রাবতীর শিবের মঠ বহুদিন বিদ্যমান ছিল। তার রামায়ণী গান ময়মনসিং-এর মেয়েরা বিবাহ উপলক্ষে গাইত।

* * *

শিবের আরাধনায় চন্দ্রাবতী সব কিছু ভুলে আছে, এমন সময় তার কাছে জয়-চন্দ্রের এক পত্র এলো। যে-রমণীকে বিবাহ করে জয়চন্দ্র স্বধর্ম ত্যাগ করেছে, চন্দ্রাবতীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে রমণী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। জয়চন্দ্র লিখেছে—

"শুন রে প্রাণের চন্দ্রা, তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই।।
অমৃত ভাবিয়া আমি খেয়েছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল হলাহল।।

তারপর জয়চন্দ্র আরও লিখেছে—আমার ক্ষমা ভিক্ষার মুখ নেই। কিন্তু জন্মের শেষ একটি ইচ্ছা আছে, তোমাকে একবার দেখবো।—

"—না ছুঁইব, না ধরিব, দূরে থেকে রইব।
পুণ্য মুখ দেখি আমি অন্তর জুড়াব।।
একবার দেখিয়া তোমা ছাড়িব সংসার।
কপালে লিখেছে বিধি মরণ আমার।।"

জয়চন্দ্রের চিঠি পড়ে চন্দ্রাবতীর মন বিপর্যস্ত হল। তার সংযম ও ধৈর্যের বাঁধ পড়ল ভেঙে। কিন্তু পিতা বংশীদাস বিধর্মী বিশ্বাসহন্তা জয়চন্দ্রের সঙ্গে মেয়েকে দেখা করবার অনুমতি দিলেন না। পিতার আদেশ ও উপদেশের মর্ম চন্দ্রাবতী উপলব্ধি করল। সে আসকথার নিষেধ জানিয়ে জয়চন্দ্রকে পত্র দিল। তারপর ফুল বেলপাতা নিয়ে শিব মন্দিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যোগাসনে বসে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করল, তার অন্তরের সমস্ত তোলপাড় থেমে গেল, এমন কি জয়চন্দ্রকেও সে ভুলে গেল।

—"যোগাসনে বসে কন্যা নয়ন মুদিয়া।
একমনে করে পূজা ফুল বিল্ব দিয়া।
কিসের সংসার, কে বা জয়চন্দ্র, কে বা
পিতা মাতা।
পূজিতে ভুলিল কন্যা সংসারের কথা।।"

* * *

জয়চন্দ্র অস্থির। কিসের তাড়নায় সে যেন দিশাহারা। চন্দ্রাবতীর দেখা সে কি আর পাবে না? শেষ পর্যন্ত সে আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। ছুটে এলো এপারে। কোথায় চন্দ্রা। কোথায় চন্দ্রাবতী। জানলো, সে শিব মন্দিরে পূজো করছে। জয়চন্দ্র সেই মন্দিরে গিয়ে বন্ধ দরজায় ঘা দিল। কোন সাড়া নেই। বারবার চন্দ্রাবতীর নাম ধরে ডাকল। কেউ উত্তর দিল না। জয়চন্দ্র চিৎকার করে বলল—

"দ্বার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দাও মোরে।
পাগল হইয়া জয়চন্দ্র ডাকে উচ্চস্বরে।।

কিন্তু চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রের সেই কাতর ডাক শুনতে পেল না।

"যোগাসনে আছে কন্যা সমাধি শয়ানে।
বাইরের কথা কিছু নাহি পশে কানে।।
না খোলে মন্দির দ্বার, নাহি কয় কথা।
মানতে লাগিল যেন শক্তিশেলের ব্যথা।"

হতাশ হয়ে জয়চন্দ্র পাগলের মতো চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে দেখলো, অদূরে অজস্র রক্তবর্ণ ফুল ফুটে রয়েছে। সে অনেক ফুল তুলে নিয়ে এলো এবং সেগুলি নিংড়ে রস বার করে সেই রক্তরাঙা রসে মন্দির কপাটে লিখল—

"শৈশবের সঙ্গী তুমি, যৌবনের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী।।
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হৈলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত।।

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রাবতীর সমাধি ভঙ্গ হল। তার মন কেন জানি হঠাৎ উতলা হয়ে উঠল। সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ল। ও কি লেখা ওখানে? কে লিখল? লেখা পড়ল চন্দ্রাবতী। মনের ভিতর হাহাকার করে উঠল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে সে নদীর ধারে জল আনতে গেল।

নদীর পাড়ে গিয়ে চন্দ্রাবতী দেখল, সেখানে জনমানব নেই। নদীতে উজান।

তারপর?

"একলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়চন্দ্রের দেহ।।
দেখিতে সুন্দর যেন চাঁদের সমান।
ঢেউ-এর উপরে ভাসে পৌর্ণমাসী চাঁদ।।
আঁখিতে পলক নাই, মুখে নাই বাণী।
পারেতে দাঁড়াইয়া দেখে উম্মত্তা
কামিনী।।"

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী

ষাট বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার এ-বছরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। চণ্ডীগড়ে চার হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের হীরক-জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, গত ৩রা জানুয়ারী। কয়েক-জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী সমেত বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবার আগে ভারতের আরো কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার বাৎসরিক সম্মেলনও এই চণ্ডীগড়েই অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এমনি একটি সংস্থা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি, এ-বছরই যার রজত-জয়ন্তী বছর। অন্যান্য সংস্থার অধিবেশন বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায়।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মূল সভা-পতি এ-বছরে ডঃ এস ভগবন্তম। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীসুরুষ ভান অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়েছেন। সপ্তাহ-কালব্যাপী এই অধিবেশনে বহু গবেষণা-মূলক নিবন্ধ পাঠ করা হচ্ছে এবং বিদেশের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ভাষণ দিচ্ছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণটি এবারে কিছুটা অন্য ধরনের। প্রশংসাসূচক কথার চেয়েও কড়া সমালোচনার সুর অনেক বেশি, কখনো কখনো মনে হতে পারে এমনকি ধিক্কার-সূচক। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শ্লথগতিতে তিনি স্পষ্টই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, বিশেষ করে দুটি ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। একটি হচ্ছে মেডিক্যাল সাহায্য অপরটি গৃহ-নির্মাণ। দুটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ, তাঁর মতে, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পশ্চিমী ধ্যান-ধারণার দ্বারা চালিত হওয়া। আমাদের দেশের মেডিক্যাল স্নাতকরা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাহ্য হচ্ছে কিনা, মেডিক্যাল শিক্ষার মাপকাঠি তা হওয়া উচিত নয়। এখন চাই অজস্রের ডাক্তার, যারা গ্রামে ও পার্বত্য অঞ্চলে যেতে রাজী থাকবেন। আধুনিক ডাক্তারদের মতো উচ্চশ্রেণিসংপ্রাপ্ত যদি তাঁরা না হন, তাতে আপাতত কোনো ক্ষতি নেই। আজকের দিনে মেডিক্যাল শিক্ষার যা ব্যবস্থা, আর বিরাট খরচ, তা বজায় থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেও স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজন পূরণ করা যাবে না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরো একটি লক্ষণের জন্যেও প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, মনে হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা তাদেরই আরো দিচ্ছে যাদের আছে, যাদের নেই তাদের বঞ্চিত করছে। এর ফলে থাকা ও না-থাকার দলের বিভেদ তীব্রতর হচ্ছে।

বিদেশী সহযোগিতার ব্যবস্থা, লাই-সেন্সের নীতি ও গবেষণার জন্যে শিল্পের দান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কঠোর মন্তব্য করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আরো একটি উল্লিখিত বিষয়—উদ্ভিদ ও [illegible] সংকট, যার ফলে সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন। ভারতেও অতিরিক্ত মাত্রায় কীটঘ্ন রাসায়নিক ব্যবহার করার ফলে ফসলের ব্যাধি দেখা দিয়েছে, শাক-সবজিতে বিষাক্ত অবশেষ থেকে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিজ্ঞানীদের সংখ্যার দিক থেকে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পরিমাণের দিক থেকে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ।

কিন্তু গত ষাট বছরে এই বৃহত্তম দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি নিয়ে গর্ব করা চলে না, বিশেষ করে যদি মনে রাখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কী বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অধিবেশনের সভাপতি ডঃ এস ভগবন্তমের ভাষায়, মানুষের জীবনধারণের মান উন্নয়নে ভারতের বিজ্ঞানসাধনা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব একটা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। পঞ্চাশ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞানের ও কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বছরে তাদের সাফল্য চমকপ্রদ। আজ থেকে ষাট বছর আগে, যখন ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন হয়েছিল, তখন মার্কিন বিজ্ঞান-জগতেরও শৈশব অবস্থা। কিন্তু তাঁরা কানায় কানায় পূর্ণ—স্বনির্ভর, স্বমহিম। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরেও ভারতের অগ্রগতি সে-তুলনায় সামান্য।"

ডঃ ভগবন্তম তাঁর ভাষণে আরো যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে পরিবেশ দূষিত হওয়া এবং তার ফলে উদ্ভিদ ও জীব-জগতের সংকট সম্পর্কিত কথাবার্তা। তাঁর মতে, অন্তত ভারতে এই সমস্যা প্রকট নয় এবং ধর্তব্যও নয়। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেছেন—জল দূষিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তার আগে জল যাতে সবাই পায় সেই ব্যবস্থাটা করা

দরকার। 'জনগণের বিরাট একটি অংশ অপুষ্টিতে ভুগে মারা যাচ্ছে। তাদের যথেষ্ট খাবার জোটে না, খাওয়া জোটে তার খাদ্য-মূল্য নামমাত্র।' পরিশেষে তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের ওপরে আমলাশাহীর খবরদারিতে এই অবস্থার প্রতিকার হবে না।

জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রজত-জয়ন্তী

জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রজত-জয়ন্তী স্মারক পুরস্কারটি পেয়েছেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (আই সি এ আর) অধিকর্তা ডঃ এম এস স্বামীনাথন। তিনি সম্মানিত হলেন শস্যের প্রজনন-শক্তির উন্নয়নে এবং কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার অগ্রগতিতে তাঁর অবদানের জন্যে। ভারতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারে তাঁর সাহায্য অনেকখানি। মেক্সিকোর গম ভারতের মাটিতে ফলিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে তাঁরও হাত ছিল।

চণ্ডীগড়ে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি যে রজত-জয়ন্তী স্মারক ভাষণটি দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো। ১৯৮১ সালে ভারতে প্রয়োজন হবে, তাঁর হিসেব অনুযায়ী, ১৮৫ মিলিয়ন বা সাড়ে আঠারো কোটি টন গম। সঙ্গে সঙ্গে আরো বলেছেন, এই হিসেব শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই, কেননা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করলে ভারতের মাটিতেই এই বর্ধিত মাত্রার উৎপাদন সম্ভব।

তাই তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন, এখন চাই বর্ধিত মাত্রার ফলন, বিরাট আকারের ফলন। টিঁকে থাকবার জন্যে চাই আরো বেশি সংখ্যক উদ্ভিদ, আরো বেশি সংখ্যক জীব। আগাছা আছে, মারী ও মড়ক আছে—উদ্ভিদ ও জীবের এখন এমন বিশেষ ক্ষমতা চাই যেন টিঁকে থাকতে পারে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য-সরবরাহের সমতা আনতে হলে অবশ্যই চাই উদ্ভিদের সংখ্যাবৃদ্ধি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তা অসাধ্য নয়। ভারতে কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় একটা অচল অবস্থায়, কাজেই আগামী দিনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে নতুন রকমের কিছু করা দরকার।

বিকীরণজনিত রোগে প্রতিরোধ-ক্ষমতা

ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের জৈবরসায়ন ও খাদ্য টেকনোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ এ শ্রীনিবাসন চণ্ডীগড়ে একটি আশার কথা শুনিয়েছেন। কথাটি বিকীরণজনিত রোগে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি সম্পর্কিত।

সকলেই জানেন, আধুনিক জগতে যে-কেউ যে-কোনো সময়ে পারমাণবিক বিকীরণের শিকার হতে পারেন। যুদ্ধেই হোক (যেমন হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে হয়েছিল) বা কোনো দুর্ঘটনাতেই হোক, পারমাণবিক বিকীরণের সংস্পর্শে এলে মানুষের আর রক্ষে নেই, এমন কি কয়েক মিনিটের মধ্যে মারাত্মক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

ডঃ শ্রীনিবাসন বলেছেন, তাঁর সহকর্মীরা স্তন্যপায়ী জন্তুদের ওপরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, মারাত্মক মাত্রার কম পরিমাণ (অর্থাৎ খুবই অল্প পরিমাণ) বিকীরণ ঘটলে তার প্রভাব দূর করা সম্ভব।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার। বিকীরণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মানুষের পক্ষে যতোটা দুরূহ, জন্তু-জানোয়ারের ততোটা নয়। গোটা পৃথিবী যদি পারমাণবিক বোমায় ধ্বংস হয়ে যায় তখনো সম্ভবত আরশোলারা বেঁচে থাকবে—তার মানে তীব্র মাত্রার বিকীরণও আরশোলার পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু মানুষের বেলায় অতি সামান্য মাত্রার বিকীরণও প্রাণঘাতী।

ট্রম্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় আশার বাণী এই যে—মানুষ না হোক, স্তন্যপায়ী জন্তুরা অল্প মাত্রায় বিকীরণ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব। আর স্তন্যপায়ী জন্তুর বেলায় যা সম্ভব, মানুষের বেলায় তা চিরকালই অসম্ভব থাকবে এমন কথা বিজ্ঞানীরা কখনো বলেন না।

দুরারোগ্য টাইফয়েড

ভেষজ বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই যা আশঙ্কা করছিলেন, অবশেষে তাই ঘটেছে। টাইফয়েড রোগ এমন আকার ধারণ করেছে—বা, সঠিকভাবে বলতে হলে, টাইফয়েডের ব্যাসিলাই এমন কায়দা শিখেছে—যে অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধেও রোগ সারে না বা ব্যাসিলাই ধ্বংস হয় না। অর্থাৎ টাইফয়েড হয়ে উঠেছে দুরারোধ্য। অ্যান্টিবায়োটিকেও এখন আর কাজ হচ্ছে না।

এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর দুটি জায়গা থেকে এ-ধরনের দুরারোগ্য টাইফয়েডের খবর পাওয়া গিয়েছে। মেক্সিকো ও কেরল। শেষোক্ত স্থান থেকে এই রোগের বিবরণ দিয়েছেন কালিকট মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ সি কে জে পাণিকর ও ডাঃ কে এম বিজয়া। তাঁরা জানিয়েছেন, ১৯৭২ সালের মে মাসে তাঁদের হাতে এমন কয়েকটি টাইফয়েড রোগী এসেছিল, ক্লোরামফেনিকল প্রয়োগ করেও যাদের সারানো যায় নি। না ক্লোরাম-ফেনিকলে, না টেট্রাসাইক্লিনে, না স্ট্রেপ্টো-মাইসিনে। টাইফয়েডের চিকিৎসায় এতকাল ক্লোরামফেনিকলই ছিল অব্যর্থ ওষুধ। দি দেখা যাচ্ছে, এটি তো বটেই, এ-জাতীয় অন্যান্য ওষুধও ব্যর্থ হচ্ছে। তার মানে কী? টাইফয়েডের ব্যাসিলাই—যা, যাকে বলা হয় স্যালমোনেলা টাইফি—এমন প্রতিরোধ-ক্ষমতা লাভ করেছে যার ফলে ক্লোরামফেনিকলকেও ঠেকাতে পারে ও দিব্যি টিঁকে থাকে। মেক্সিকোতে যে দুরারোগ্য টাইফয়েড দেখা দিয়েছে তার ব্যাসিলাই এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিশিষ্ট। কেরলেও তাই। অথচ এই দুটি স্থানেই টাইফয়েডের প্রকোপ যথেষ্ট।

ব্যাপারটি ঘটেছে এ-কারণে যে ক্লোরাম ফেনিকলের প্রয়োগ—বা, সাধারণভাবে বলতে গেলে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ—যততত্র হতে শুরু করেছে, অতি সামান্য সব কারণেও, এমন কি বিনা কারণেও। মোক্ষম অস্ত্র অনবরত ব্যবহার করে চললে তার মোক্ষমত্ব আর থাকে না। যাকে বিনাশ করার জন্য সেই মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করার কথা, আগে থেকেই অভ্যস্ত হতে হতে সে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে বসে। তারপরে তাকে বিনাশ করা সেই মোক্ষম অস্ত্রের পক্ষেও সম্পূর্ণ অসাধ্য হয়ে পড়ে।

ভেষজ বিজ্ঞানীরা তাই আবেদন জানিয়েছেন, ক্লোরামফেনিকল বা এ-জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে রোগ সারানো হবে, এই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে সেগুলোর প্রয়োগ একমাত্র এই রোগের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে বন্ধ করা হোক।

কেরল এই ভারতেরই একটি রাজ্য। কেরল থেকে এই কলকাতায় ও অন্যত্র অনবরত লোক যাতায়াত করে থাকে। কাজেই এই বিশেষ ধরনের টাইফয়েড রোগটি ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। তবে ভেষজ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, মোটামুটি স্বাস্থ্যবিধি-গুলো মেনে চললে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সকলেই হয়তো স্বীকার করবেন, আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি যেটা অমান্য করা হয় তা হচ্ছে স্বাস্থ্য-বিধি, সবচেয়ে বেশি যেটা অগ্রাহ্য করা হয় তা হচ্ছে শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা। ফলে রোগ অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ-অবস্থায় সমাজের অগ্রসর ও শিক্ষিত অংশ চিকিৎসকদের কাছে এটুকু আশা করা যেতে পারে যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার তাঁরা যেন নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন, যত্রতত্র প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন। রোগীরাও সচেতন থাকতে পারেন। দু-একটা হাঁচি-কাশি হলেই ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, ছোট-খাটো অসুখ সারিয়ে তোলার ব্যবস্থা শরীরের ভিতরেই আছে। আর যদি ছুটতেই হয় তো এমন ডাক্তারের কাছে কদাচ নয় যিনি হাঁচি-কাশির চিকিৎসাতেও অ্যান্টিবায়োটিক বরাদ্দ

শীতের চিড়িয়াখানায়

শুভঙ্কর পাঠক

এইখানে আকাশ অনেকটা পরিচ্ছন্ন, উদাসীন ও রোম্যান্টিক মনে হয়। এর আকর্ষণই আলাদা। আলীজিরিয়ার বোয়াদেল্য়ার ঈশ্বরের প্রাণময় আলবোর কাছে যেমন আকাশ-মাটির যৌথ ডাক শুনতে পেতেন, ঠিক সেইভাবে এখানে কেউ আকাশ দেখতে আসেন না। তবু সকালে, সন্ধ্যায় দুপুরের গড়িয়ে বিকেল হয়। বাচ্চাদের কোলাহল আর মানুষের ভীড় বাড়ে। পাখির শিস, বাঘের ডাক, সিংহের গর্জন শোনা যায়।

সব মিলিয়ে শীতের চিড়িয়াখানায়, একেকটি দুপুরে, একেকটি বিকেল যেন অলৌকিকতার রহস্য মাখা।

যে-কোনো ছুটির দিন, অফিসের সব চাইতে ব্যস্ত মানুষটিকে যদি হালকা মেজাজে দেখতে চান, তাহলে চিড়িয়াখানায় আসুন। হয়তো দেখতে পাবেন, খবরের কাগজ বিছিয়ে তিনি শুয়ে আছেন মিষ্টি রোদ্দুরে। কিংবা সতরঞ্চি বিছিয়ে তাস-পাশা খেলছেন। ডাইনে বাঁয়ে ছড়ানো কমলালেবুর খোসা। গোটা তিনেক টিফিন ক্যারিয়ার। এবং স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ক্রিকেটের ধারা বিবরণী কিংবা হিন্দী সিনেমার গান শুনছেন ট্রানজিস্টারে।

অর্থাৎ এখন তিনি খোলা-মেলা। একান্তভাবেই ঘরোয়া।

উত্তরায়ণের সূর্য হেলে পড়েছে দক্ষিণে। দিনের আয়তন কমেছে। মৌসুমী হাওয়ার বিলাপ নেই। পাহাড়ের দীর্ঘশ্বাস ঘন হয়ে নেমে এসেছে সমতলের মাঠে, জনপদে এবং চিড়িয়াখানায়। ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই তা জানেন। তাঁর গায়ে এখন একটা কমলারঙের সোয়েটার। ছেলে-মেয়েরা কাছে নেই। ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ধারে।
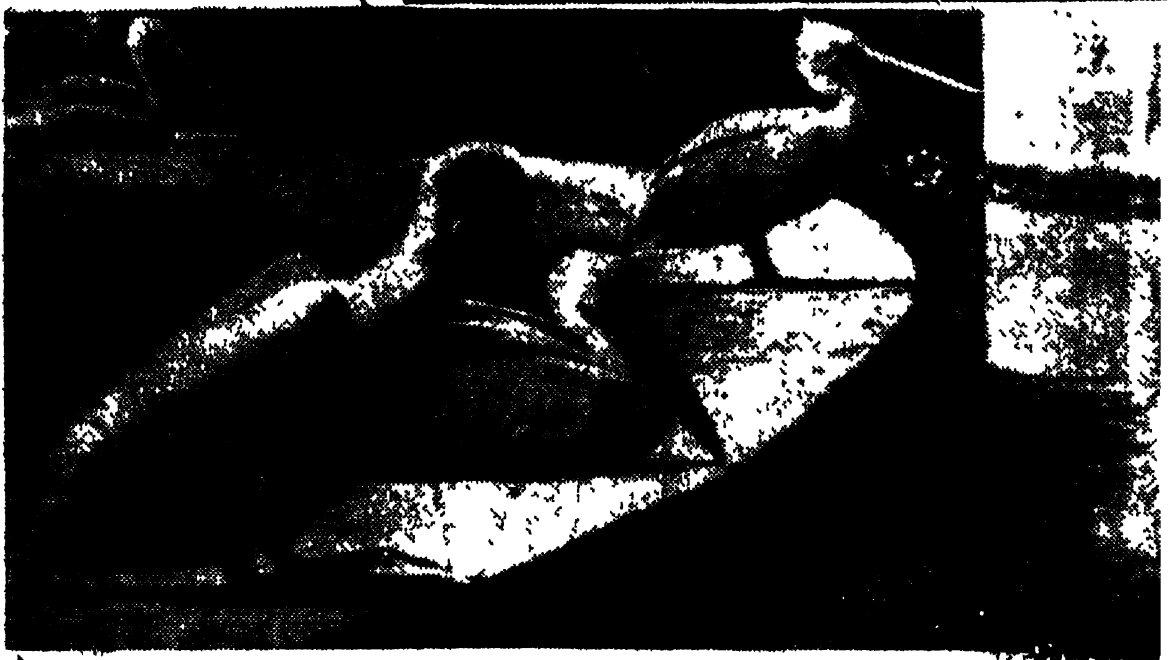
কি যেন দেখছে?

—কি? পানকৌড়ি?

শরীরের প্রসাধন

—রা। কয়েকটা নীল রঙের ডানাওয়ালা পাখি। গার্গানি। ওদের চোখ শাদা। ডানায় সামান্য সবুজের ছোঁয়া মেশানো। আর বুকের দিকে খানিকটা ধূসর রঙের আভাস। এই পাখিগুলি ফি-বছর সুদূর সাইবেরিয়া সীমান্ত থেকে আসে আলিপুরে চিড়িয়াখানায়।

এরা শীতের অতিথি। শীত ফুরোলেই চলে যাবে।

আমি পাখিবিশারদ নই। সব পাখির নাম জানি না। রেড ইন্ডিয়ানরা জানে, কোন পাখি কোন মাসে হ্রদের জলে সাঁতার কাটে। গাছের ডালে শিস দেয়। পাখিদের চলাচল আর পর্যটন-রীতি অনুসারে ওরা দিনের হিসেব করে। ক্যালেন্ডার মাসের নাম রাখে।

আমরা নক্ষত্রে বিশ্বাস রেখেছি। তাই পাখিদের নামে সময়কে চিহ্নিত করি নি।

পাখিতত্ত্ববিদদের মধ্যে হলডেন, হুইসলার, জুলিয়ান হাক্সলে ও সেলিম আলির অনুসন্ধান থেকে জেনেছি, হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রঙ পাল্টায়। পাখিরাও তাদের বাসস্থান বদল করে। শীতের শুরুতে উত্তরাঞ্চলের পাখিরা উড়ে আসে দক্ষিণের উষ্ণ সমতলে।

কেননা, উত্তর মেরু এখন অন্ধকার।

সেখানে দিনের সূর্য প্রায়শ নির্বাসিত। নক্ষত্রের আলোয় পাখিরা দেখতে পায় তুষারপাতের দৃশ্য। কোথাও তৃণগুল্মের চিহ্ন নেই। গাছগাছালিও অদৃশ্য। এই দুঃসময়ে ওরা এগারো শ মাইল পাড়ি জমায় আকাশ পথে। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে। শীত শেষ হলেই ওরা আবার ফিরে যাবে নিজের রাজ্যে। অর্থাৎ ফিরতি পথে আবার এগারো শ মাইলের জার্নি। যাওয়া-আসা, দুইয়ে মিলে বাইশ শ মাইলের পথ-পরিক্রমা।
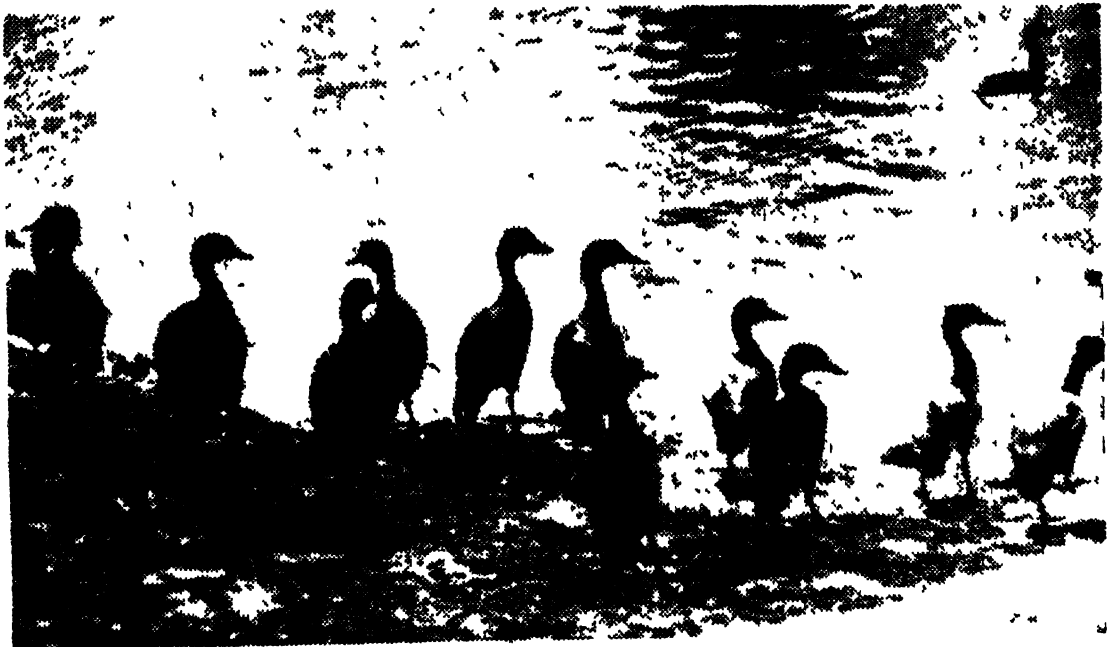
আলিপুরের চিড়িয়াখানার যে-পাখিরা আসে, তারা মূলত লাদাক, তিব্বত ও সাইবেরিয়ার বাসিন্দা। এ খবর অনেকের জানা নেই। জানা থাকলে ভুল তথ্য পরিবেশন করতেন না।

একটা ঘটনার কথা বলছি।

সেদিন স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা অনেকগুলি ছেলেকে দেখলুম, চিড়িয়াখানার হ্রদের ধারে। কমলা রঙের এক ঝাঁক হাঁসের দিকে তাকিয়ে তারা চোখ ফেরাতে পারছিল না। হাঁসগুলির ডানার শাদা, কালো, আর গাঢ় সবুজের সমারোহ। তাদের সঙ্গে ছিলেন জন দুই বয়স্ক ভদ্রলোক। বোধহয়, স্কুলের মাস্টারমশাই হবেন। তাঁরা ছেলেদের বোঝাচ্ছিলেন যে, এই পাখিগুলি বাংলাদেশের নদীনালায়, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায়। শীতের মরশুমে চিড়িয়াখানায় এসে গেছে, অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে।

আসলে, ঐ ভদ্রলোকেরা পাখিগুলির নাম জানেন না।

ইংরেজীতে ওদের নাম রাডি শেলড্রেক। বাংলায় চখাচখি বলা যায়। দক্ষিণ যুরোপের সর্বত্র, উত্তর আফ্রিকা, লাদাক ও তিব্বত অঞ্চলে ওদের দেখা যায়। পিনটেল বা সিন্ধুহংসজাতীয় মরাল বাংলাদেশে কমই আসে। শুধু চিড়িয়াখানার মহোৎসবে ওরা সাধারণত অনুপস্থিত থাকে না। ওদের মাথায় ত্রিশূল-চিহ্নের মতো বাদামী রঙের একটা চিহ্ন দেখা যায়।

তাছাড়া, এই শীতে চিড়িয়াখানায় এসেছে আরো অনেক নতুন পাখি।

যেমন ম্যালার্ড, স্পটেডবিল, গ্যাডওয়েল, শভেলার, কমনটিল, গ্রেটার ও লেসার হুইসলিংটিল উইজেন, পচার্ড, কোম্বডাক প্রভৃতি। লেসার হুইসলিংটিল আকারে পাতিহাঁসের চেয়েও ছোট। ওড়ার সময়ে ওরা বিদ্যুৎগতিতে শব্দ করে ওড়ে। প্রয়োজনে গাছে আশ্রয় নেয়। সেজন্যে অনেকে ওদের গেছো পাখি আখ্যা দিয়ে থাকে। শ্যাম, কোচিন মালয়, সুমাত্রা, জাভা বোর্ণিও, ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ওদের দেখা যায়।

তাই বলে, এই পাখিরা চিড়িয়াখানার প্রধান আকর্ষণ নয়। বাড়তি আকর্ষণ-হিসেবে দর্শনীয়। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ তাদের স্থায়ী আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন, গাছগাছালির আবরণ বানিয়ে, জলাশয় তৈরী করে ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে।

এখানে কেউ পাখি শিকার করতে পারেন না। কিন্তু হাতির পিঠে চড়তে পারেন।

ঐ যে ভদ্রলোক এখন দাঁড়িয়ে আছেন বাঘের খাঁচাটার সামনে। তাঁকে আমি চিনি না। আপনিও চেনেন না। যে-কোনোদিন চিড়িয়াখানায় গেলে, তাঁকে না হোক, তাঁর মতো কাউকে নিশ্চয়ই অনুরূপভাবে দেখা যাবে। চেহারা থেকে অনুমান হয়, উনি কোনো বেসরকারী ফার্মের কনিষ্ঠ কেরানী।

অর্থাৎ সবচেয়ে ভীরু, নিরীহ এবং গোবেচারা মানুষ। বড়ো সাহেবের ধমক খেতে খেতে জীবনের তিন-চতুর্থাংশ কেটে গেছে। অথচ, এখন তিনি দুরন্ত চিতাবাঘটার দিকে তাকিয়ে যথেষ্ট সাহস দেখাচ্ছেন। যেন ইচ্ছে করলে, ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে। তাদের তিনি বোঝাচ্ছেন, যৌবনে তাঁর কেমন সাহস ছিল। চেষ্টা করলে, ভালো শিকারীও হতে পারতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে হন নি। অফিসের কাজে এমন ব্যস্ত থাকেন যে, বন্দুক চালাবার ফুরসৎ-ই হয় না।

চিতা বাঘটার ঘুম ভেঙেছে। হাই তুলছে। আড়মোড় ভাঙছে। ভদ্রলোক বাচ্চাদের নিয়ে, দ্রুততার সঙ্গে, সামনের খাঁচাটার দিকে এগোচ্ছেন। বাচ্চারা এই ব্যস্ততার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না।

অন্যদিকে কয়েকটি তরুণ-তরুণী কি যেন কৌতূহলী হয়ে দেখছে, শীতের পোষাক পরে।

স্কুল-পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের এখন ছুটি। তাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, বুকলিস্ট বেরিয়েছে। কিন্তু পড়াশোনার তাড়া নেই। শীতের চিড়িয়াখানায় তাদেরই উপস্থিতি বেশী। গরমের ছুটিতেও তারা আসে বা আসতে পারে। তাদের বাদ দিলে চিড়িয়াখানার গোটা আনন্দটাই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়।

এখন অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত। ছেলেরাও মুক্ত। পরীক্ষার ফল যা হবার হয়েছে। এখন তাদের বিশ্রামের কাল। ঘুরে বেড়াবার সময়। রেওয়ার জঙ্গল থেকে যে-বাঘটিকে চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছে, তাকে দেখার জন্য ছেলেমেয়েদের কী ভীড়! সুন্দরবনের অরণ্য থেকে রয়েল বেঙ্গলের যে-বাচ্চাটিকে পাঠানো হয়েছিল বৃটেনের রাজকীয় চিড়িয়াখানায়, তাকে দেখার জন্য কি লণ্ডনের ছেলে-মেয়েরা অনুরূপ ভীড় জমিয়েছিল।

১৯১১ সালে ছাপা একটি পাঠ্যবইতে পড়েছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নাবিকেরা যখন সমুদ্রপথে লণ্ডনে যাচ্ছিলেন, তখন সেই বাঘের বাচ্চাটি ছিল নিরামিষাশী। জাহাজের একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। দশ বছর পরে যখন ঐ বাঘের বাচ্চাটির সঙ্গে মিস্ত্রীর দেখা হয়, তখনও সে পুরনো বন্ধুত্বের স্মৃতি ভোলেনি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যে-সব বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার, ভালুক, জেব্রা, বনমানুষ, গেরিলা প্রভৃতি আছে, তারাও সমত্ন-ভাবে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত। নানা রকম পরিবেশ ও আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল। সে খবর সাধারণ দর্শকের জানা নেই। তবু আশ্চর্যজনক-ভাবে তারা বেঁচে আছে। দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। মেছোকুমীরগুলি রোজ অনেক-গুলি ল্যাটা মাছ খায়। বালতির ক্যানক্যানে শব্দ করলে পাড়ের কাছে ছুটে আসে।

জল-হাতিরা এই রকম শব্দ করলে ভ্রূক্ষেপ করে না। ওরা কি খায়, কে জানে?

রোদ পোহাতে পোহাতে সবাই দূর থেকে দেখে পাহাড়ী মতো জায়গাটায় পাংশুটে রঙের একটা সিংহ। এই শীতে সিংহরাও রোদ পোহায়?

তাহলে সিংহীটা নেই কেন?

নিশ্চয়ই মরে গেছে। সিংহটা এখন একা, নিঃসঙ্গ। সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, একটা সিংহের সঙ্গে কোথায় যেন একটা বাঘিনীর মিলন ঘটেছে। প্রকৃতির রাজ্যে এ রকম অসম মিলন হয় না। চিড়িয়াখানায় হয়। শীতের বিকেল গাঢ় হয়ে এলে, চিড়িয়াখানার লেকের ধারে, দু' একজন তরুণ যুবক বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে খবরের কাগজ বিছিয়ে। দিনের সংবাদ ওদের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে হতে নতুন খবর তৈরী হয়।

চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তার খোঁজ রাখেন না।

নানা বয়সী মানুষের গায়ে এখন নানা রকমের সোয়েটার, কোট, আলোয়ান, শাল, কমফোর্টার। অধিকাংশই উজ্জ্বল রঙের। লাল, নীল, আকাশী, ভায়োলেট, ব্রাউন, কমলা, গোলাপী। য়ুরোপের মানুষ গ্রীষ্মের শুরুতে ছাড়া এত রঙের পোষাক সাধারণত পরে না। চিড়িয়াখানার আলো-ছায়ায় নানা কণ্ঠের সঙ্গে নানা বর্ণের এই আনাগোনা যেন রহস্যময় পরিবেশ তৈরী করে।

হে শীত! হে শীতের সূর্য! চিড়িয়াখানায় তুমি আরো দীর্ঘস্থায়ী হও।

কলকাতার অস্বস্তিমুক্ত জায়গা আর বিশেষ নেই। গড়ের মাঠের ধারো আনাই চলে গেছে খেলোয়াড়, ক্রীড়া-রসিক আর প্রেমিক-প্রেমিকাদের দখলে। কিন্তু এখানে নির্জনতা আছে, ফিসফিস করে কথা বলা যায়। স্বজনে এসেও কেউ জনতা তৈরী করেন না।

সব মিলিয়ে, সবাই এখানে স্বচ্ছন্দ। মাথার ওপরে ওড়ে, ইংরেজী 'ভি' অক্ষরের মতো, বালিহাঁসের ঝাঁক। ভোর চারটে নাগাদ ওরা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আসে। আবার, সন্ধ্যেবেলা আকাশের রঙ বদল হলে নোনা অঞ্চলে ফিরে যায়।

কিন্তু জ্যোৎস্না রাতে যায় না।

সেই রকম একেকটি রাতে চিড়িয়াখানার খালবিল আশ্চর্য অলৌকিকতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। হাঁসের ডাক, ডানার ঝটপট শব্দ, ওপরের জ্যোৎস্না এবং প্রকৃতির নির্জনতায় প্রায় দশ সহস্র পাখির উপস্থিতি কি চিড়িয়াখানার কোনো দর্শক কোনোদিন দেখতে পাবে?

সে বড় আশ্চর্য সময়! সে বড় আশ্চর্য রাত!

—আমি যাচ্ছি সুধা, স্কুলের সময় হয়ে এসেছে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডেকে বললাম সুধাকে।

—দাঁড়াও, আমি হাত ধুয়ে এখনই আসছি—ঘরের ভেতর থেকে সুধা একটু অপেক্ষা করতে বলল আমাকে।

বারান্দায় এসে আমার হাতে পান দিয়ে মাথায় আঁচল টেনে প্রণাম করে সুধা বলল ফিরতে দেরি করো না কিন্তু। আজকে তোমার জন্মদিন।

—তোমার দিনক্ষণ খুব মনে থাকে ত? হেসে বললাম আমি।

—তোমার জন্মদিনের কথা আমার মনে থাকবে না ত, কি মনে থাকবে শুনি? মা বেঁচে থাকলে সকাল থেকেই ঘটা পড়ে যেত তোমার জন্মদিনের।

সুধার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম। কি অপরূপ মানিয়েছে তাকে ডুরে শাড়ীতে। মঙ্গলবারের হাট থেকে একখানা শাড়ী কিনে এনেছিলাম তার জন্যে। স্নান করে ডুরে শাড়ী পরে, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরে মঙ্গলময়ীর সাজে সেজেছে সে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুধা হেসে বলল—অমন করে কি দেখছ?

—তোমাকে।

—আমাকে কি আজ নতুন দেখলে?

—যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন তোমাকে নূতন করে দেখছি। তোমার ভেতর দিয়ে নূতন মানুষের দেখা পাই আমি।

—আহা, তুমি যেন কি? দিনে দিনে তোমার নূতন ভাবের উদয় হয়।

—সত্যি তাই। যৌবনকে আমি ধরে রাখতে চাই; বিদায় জানাতে চাই না।

—আমার বয়েস বাড়ছে না?

—বাড়ছে বইকি!

—তা হলে?

—তোমার বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তোমাকে আমি নূতন করে পেয়েছি।

—সত্যি?

—খুব সত্যি।

যৌবনের উন্মাদনায় যখন ভাটার টান ধরে তখনই স্বামীস্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধন নূতন করে ধরা পড়ে। ভাবের আবেশ কাটিয়ে চোখে ভাসে তাদের সত্যিকারের রূপ।

—চোখও বদলে যায় বল? তাই তুমি অমন করে আমাকে নূতন সাজে সাজিয়ে ভালবাস, নূতন করে দেখতে পাও।

—হয়ত তাই। তোমাকে আজকাল আমার কি মনে হয় জান?

—কি গো?

—জন্ম জন্ম ধরে যেন তোমাকে পেয়েছি আমার কাছে—তুমি আমারই।

সত্যি তাই। তোমার কথা ভাবলে আমারও মনে হয় যেন কত যুগ যুগ ধরে তোমার আমার পরিচয়।

- পরিচয়ের সে সূত্র ধরেই নিত্য নতুন করে খুঁজে পাই তোমাকে। শুধু এক জন্মের নয় কত জন্মের পরিচয় এক সাথে ভিড় করে জমে ওঠে তোমাকে ঘিরে।

—তুমি আমার বাইরে দেখো আমার ভিতরকে শুধু একা মনে হয়, কেন বলত? যখন তুমি ফিরবে, কখন তোমাকে দেখব, তাই আমার বিকেল হলেই বসবার কাজে থাকি।

—প্রাণের টানের জন্য। তুমি আমার অভাব বোধ কর বলেই আমাকে দেখতে চাও। কাছে পেলে তোমার বুকে জেগে ওঠে পাওয়ার আনন্দ। নিজের কথা ভুলে তোমার সত্তা তুমি বিলিয়ে দাও আমার ভেতর। তাই তোমার ভেতর এই অভাব-বোধ।

—এত বছর হল আমাদের, সংসারে ছেলেমেয়েদের দায় দায়িত্ব এসে গেছে, তা সত্ত্বেও আমরা কি বদলাই নি?

—না, এক-একটা বছর পার হয়ে আমার প্রাণ নতুন তোমাকে উপলব্ধি করতে শিখেছি, তোমাকে বুঝতে পারছি, জানতে পারছি নতুন করে। সে কারণে বয়স বাড়লেও আমরা বদলাই নি। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এসেছি নিজেদের দিকে।

—প্রেমের মাধুর্যে আমরা মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি তাহলে? তাকেই কি নতুন করে পাওয়া বলছ?

—ঠিক তাই। তুমি আমার কথার অন্তরে লুকোনো অর্থ বুঝতে পেরেছ।

শরতের আকাশে জলহীন মেঘ হাওয়ায় ভর করে দূরে দেশ থেকে ভেসে আসছে। শিউলির গন্ধ প্রাণে জাগিয়েছে যৌবনের উন্মাদনা। সোনালী রোদে মায়া সংসার ছড়াচ্ছে। আমার কথায় সুধা মৃদু মৃদু হাসছিল আমার চোখে চোখ রেখে। তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না আমি। সে যেন আমাকে বেঁধে রেখেছে তার অধরের মৃদু হাসিতে, তার চোখের চাউনির গভীর বাঁধনে।

বেলা বেড়ে চলেছে। স্কুলের দেরি হবে, তা জেনেও সুধার না বলা কথাকে উপেক্ষা করে তাকে ছেড়ে চলার ক্ষমতা আমার নেই। তাকে আদর জানাতে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। তার একখানি হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—'আসি'।

এসো. ফিরতে দেরি করো না।

* * *

খাটের বাজুতে হাত লেগে ঘুম ভেঙে গেল আমার। মনে হল, এতক্ষণ জেগেই কথা বলছিলাম সুধার সঙ্গে। তার চোখ, মুখ আমার চোখে ভাসছে। এমন কি তার গলার স্বর পর্যন্ত তখনও আমার কানে বাজছে। বিছানায় বসে ভাবলাম, সুধা কে? কোনদিন তাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না ত? এমন মিষ্টি মুখ, মধুর হাসি কখনও আমার নজরেও পড়ে নি। তবে কি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের আবেশে আমার জন্মান্তরের প্রিয়া এইভাবে দেখা দিয়ে গেল আমার সঙ্গে, আমার বিক্ষুব্ধ মনে শান্তির প্রলেপ দিতে? ভাবতে চেষ্টা করলাম কোথায়, কোন জন্মে দেখা পেয়েছিলাম সুধার, অতীতের স্মৃতি হাতড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কোথায় কতকাল আগে হারিয়ে এসেছি তাকে।

মফঃস্বল শহরে আমার বদলী হয়েছে কিছু দিন আগে। পরিদর্শকদের হয়ে সেকেণ্ডারি স্কুল ইন্সপেকশন করতে এসেছি এই পাহাড়তলিতে। পাহাড়ী নদীর ধারে, ইন্সপেকশন বাংলোতে উঠেছি দু'দিনের মতন। বাংলোতে দুটো শোবার ঘর, একটা ড্রয়িং রুম—সামনে বারান্দা। ছিমছাম করে সাজানো ঘরগুলো। বাংলোর সামনে ফুলের বাগান। বড় বড় গাছ তার চারধারে। ছায়াঘেরা সমস্ত জায়গাটা। বাংলোটি আমার পছন্দসই। বিকেলের ট্রেন ধরে সন্ধ্যার আগে এসে উঠেছি বলে, আবছা অন্ধকারে জায়গাটি ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়নি।

বিছানায় বসে কানে এল একটানা ঝিঁঝির ডাক, নদীর কলধ্বনি। গভীর রাত—চারদিক ছমছম করছে। আলো না জেলে অন্ধকারে বসে ভাবতে লাগলাম স্বপ্নে দেখা সুধার কথা। বারবার তার কথা আমার মনে পড়ল—আজ তোমার জন্মদিন, ফিরতে দেরি করো না।

সত্যিই ত, আজ তে'সরা অগ্রহায়ণ আমার জন্মদিন। কেমন করে সুধা জানল সে কথা। আমার মনেই ছিল না, আজকে আমার জন্মদিন। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সুধাই আমাকে জানিয়ে গেল সে কথা। ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি।

* * *

স্কুল থেকে ফিরে দেখতে পেলাম সুধার মুখ ভার। ঘরে ফিরতে দেরি করেছি বলে হয়ত তার অভিমান হয়েছে আমার উপর। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম, ইচ্ছে করে দেরি করিনি। আজ স্কুলে একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে।

গম্ভীর মুখে সুধা বললে, 'থাক, তোমার মজার কথা, শোনার সময় নেই আমার। হাত-মুখ ধুয়ে এস শিগ্গির! হা-পিত্যেস করে আমি বসে আছি কখন থেকে।

শান্ত ছেলের মত ঘাটে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতে, ঠাঁই করে গালিচার আসনে বসতে বলল সে আমাকে। প্রদীপ জেলে আরতি করে, থালা ভরে নানা রকমের খাবার দিল খেতে। মুখ বুজে এক-এক করে সব খেয়ে ফেললাম। সুধার মুখে তৃপ্তির হাসি। ঘরের ভিতর গিয়ে সে আর এক প্রস্থ পিঠে পুলি এনে ধরল আমার সামনে।

হাত দিয়ে বললাম—আর খেতে পারব না। তুমি উপোস করে আছ সারাদিন। কিছু মুখে দাও।

—সে হবে এখন, আমার কাজ এখনও বাকী।

ঘরের ভিতর উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একখানা দামী নতুন চাদর এনে আমার গায়ে জড়িয়ে বলল—কোলকাতার কাছ থেকে কিনেছি আজকে, তোমার জন্মদিনে উপহার দেব বলে। তোমার পছন্দ হয়েছে?

—খুব সুন্দর, শীতের সময় গায়ে দিয়ে স্কুলে যাব রোজ।

গায়ে দিও লক্ষ্মীটি। পোশাক আসাকে তোমার আজকাল মোটেই খেয়াল নেই। এক জামা-কাপড়ে [illegible] কাটিয়ে দাও।

—কি হবে আমার সাজগোজ করে? যার জন্য সাজ করব সে ত আমারই চিরদিনের [illegible]।

—বারে! বাইরের লোকের কাছে বুঝি তোমার কোন মর্যাদা নেই। তোমার সাধারণ পোশাক দেখে তারা কি ভাবে বলত?

—ভাবলেই বা, কি যায়-আসে তাতে। নিজের ভেতর নিজেই মগ্ন হয়ে আছি। ঠাকুরের মুখে গান শোনোনি—'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও না কো মন পরের ঘরে।'

—তুমি আজকাল ভারী দুষ্টু হয়েছ। যতই তোমার সাহিত্য চর্চা বাড়ছে, ততই তুমি উদাসীন হয়ে যাচ্ছ। শেষটায় একদিন না আমাকেই ভুলে বস।

সুধার কথা শুনে হেসে বললাম—শক্তিকে বাদ দিয়ে কি শিবের অস্তিত্ব থাকতে পারে? তুমি আমার শক্তির উৎস। তোমার জোরেই আমি সাহিত্য চর্চা করি।

—রাখ, তোমার ওসব বানানো কথা। তুমি আজকাল এত বেশী ভাবুক হচ্ছ যে আমার ভয় করে মাঝে মাঝে। হয়ত তুমি সব ছেড়ে দেবে একদিন।

—কি দেখে তুমি তা বুঝলে?

—তোমার চালচলন দেখে বেশ বোঝা যায়, সংসারে টান তোমার কমে এসেছে। নিজের শক্তির উপর আস্থা তোমার অটুট।

—অনাসক্ত থেকে কর্তব্য করে যাওয়াকে আমি সংসারধর্ম ভাবি বলে হয়ত, তোমার তা মনে হয়। আমার সব কিছুর উপরে তুমি।

—তা বুঝি। তা জেনেই ত আমার যত ভাবনা। তুমি কখন কি করে বস। তোমার মত সরল মানুষকে ভুল বোঝা সহজ।

—তা বুঝুক, সংসারের উপর আমার যতটা টান আছে, তার অর্ধেকও নেই চাকরীর উপর। মানুষকে মানবিকতার শিক্ষা কি দিতে পেরেছি বল? সে জেনেই কলম ধরেছি মানুষের কথা সবার কাছে বলতে।

—সাহিত্যের সেবা সহজ নয়। অনাদর, অবহেলা, বিরুদ্ধ-সমালোচনা লেখকের ভাগের লেখাজোখা। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বরাতের জোর দরকার।

শুক্লা একাদশীর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের গাছপালায়। চাঁদের দিকে আঙুলে বাড়িয়ে সুধা বলল—চল একটু ঘুরে আসি বাগানে। সারাদিন খুব খালি খালি লেগেছে তোমাকে কাছে না পেয়ে।

সুধাকে সঙ্গে করে পায়চারি করতে লাগলাম বাগানে। কোন গাছে কেমন ফল হয়, কখন ফুল ফোটে সে ঘুরে ঘুরে বলছিল আমাকে। বাগানের গাছপালা সব যেন তার চেনাজানা—একান্ত পরিচিতের মত। বাড়ীর লোকেরা কে কবে কোন চারা পুঁতেছিল তাও তার কণ্ঠস্থ। সুধার গৃহিণীপনার খুঁটিনাটি খবর রাখিনি কোন দিন। তাই আশ্চর্য হয়েছিলাম তার পরিচয় পেয়ে।

একটা দোলন চাঁপার গাছে থোকায় থোকায় ফুল ফুটে থাকতে দেখে, তাকিয়ে ছিলাম গাছের দিকে। ফুলের গন্ধে আত্মহারা হয়ে সুধাকে কাছে টানতে গিয়ে দেখলাম সে নেই সেখানে। চোখের পলকে কোথায় উধাও হয়ে গেল সে? ভাবলাম লুকোচুরি খেলছে সে আমার সঙ্গে। গাছতলায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম সুধা নেই। বাগানে কোথাও দেখলাম না তাকে। জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায় উবে গেল ভেবে ডাকলাম—সুধা, সুধা।

দীঘির জলে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার ডাক ভেসে গেল মাঠের বুকে। আমার পা টলে উঠল, পায়ের নীচের মাটি কেঁপে উঠল, ঘর দালান নড়তে লাগল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, ভয় পেয়ে চীৎকার করে ডাকলাম—সুধা, ভূকম্পন হচ্ছে, কোথায় তুমি?

সুধার জবাব পেলাম না। চোখের সামনে ঘরবাড়ী, ঠাকুরমন্দির, বাগান-বাগিচা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কাউকে খুঁজে পেলাম না। ভগ্নস্তূপের উপর বসে কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারলাম না। আমার গলা থেকে স্বর ফুটে বেরুল না। সুধার শেষ কথা মনে হল—সাহিত্যিকের জীবন বেদনায় ভরা অনাদর, অবহেলা তার সঙ্গের সাথী।

খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ চোখে পড়তে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বিষাদে ভরে গেল আমার মন। স্বপ্নের কথা মনে করে এক ঠাঁই চুপ করে বসে রইলাম। বুঝতে পারলাম, কোথায় কি ভাবে সুধাকে হারিয়ে এসেছি আমি।

স্নান করে, খাওয়া দাওয়া সেরে স্কুল ইন্সপেকসনে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। স্কুলের সেক্রেটারী আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যেতে এলেন ইন্সপেকসন বাংলোতে। বাংলো থেকে স্কুলের দূরত্ব দশ মিনিটের পথ। নদীর পাড় ধরে স্কুলে যাওয়ার রাস্তা। তার সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে রাস্তার ধারে চোখে পড়ল মজাদীঘি ভর্তি লাল পদ্মফুল, পোড়ো বাগান, প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ।

দীঘির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাতের দেখা স্বপ্ন আমার মনে উঁকি দিয়ে গেল। জোর করে মন থেকে স্বপ্নে দেখা ঘটনাকে দূরে সরিয়ে এগিয়ে চললাম স্কুলের দিকে। স্কুলের গেটে ঢুকতে গিয়ে আমার মনে হল এ জায়গা যেন আমার কত চেনা জানা। বিস্তৃত ময়দানের বুকে স্কুলের বাড়ী, ছাত্রদের হোস্টেল, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, সবকিছু নতুন করে গড়া।

অফিস ঘরে বসে সেক্রেটারীর সঙ্গে স্কুলের প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় তিনি জানালেন সত্তর বছর আগে গড়জঙ্গলপুর গ্রামের দানশীল জমিদার কৃষ্ণমোহন চৌধুরী এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। অঞ্চলের সর্বপ্রথম স্কুল এটি। তাঁর ছেলে সাহিত্যিক পরিমল চৌধুরীর প্রাণপাত চেষ্টার ফলে স্কুলের সুনাম হয়েছিল এককালে। কত ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে এ স্কুল থেকে পরিমলবাবু ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার।

ঊনিশ শ' চৌত্রিশের ভূমিকম্পে এ-গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ী ভেঙেচুরে যায়। স্কুলবাড়ীরও অস্তিত্ব লোপ পায়। চৌধুরীবাবুদের দালান ভেঙে পড়ে, পরিমলবাবু সপরিবারে মারা যান। তারপর স্কুলের দুর্দিন নেমে আসে। তিনে তালে চলতে চলতে স্কুল বন্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আশপাশের গাঁয়ের লোকের দাক্ষিণ্যে, সরকারী সাহায্যে এর বাড়বাড়ন্ত। নূতন করে মালটিপারপাস স্কুল গড়ে উঠেছে—'কৃষ্ণমোহন বাণী বিতান'।

চৌধুরীবাড়ীর ইতিবৃত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলাম সেক্রেটারীবাবুর কাছ থেকে। পরিমলবাবু আর তাঁর স্ত্রী সুধার নামে স্কুলের একটা নূতন ব্লক তৈরী হয়েছে তিনি জানালেন আমাকে। অফিসের নথিপত্র দেখে, স্কুলের ব্লকগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। তিনতলার দক্ষিণ দিকের ব্লকে মার্বেল পাথরের একটি ফলকের উপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল—'সাহিত্যিক পরিমল চৌধুরী, তাঁর সহধর্মিণী সুধারানী চৌধুরীর স্মৃতিরক্ষার্থে'।

মার্বেল ফলকে আমার চোখ আটকে রইল। রাতের দেখা সুধা জীবন্ত হয়ে যেন আমাকে বলতে চাইল—'এই ত আমি, কোথায় তুমি খুঁজছিলে আমাকে?'

বুক গুমরে উঠল। আগামীকাল ক্লাস পরিদর্শন করার আশ্বাস দিয়ে নেমে এলাম অফিস রুমে। হেডমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম—পরিমলবাবুর লেখা কোন বই লাইব্রেরীতে আছে কিনা? বেছে বেছে দু খানি বই তিনি দিলেন আমাকে। নূতন সংস্করণ—শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখা। বই দু' খানি হাতে নিয়ে ফিরে এলাম বাংলোতে। ফেরার পথে পোড়ো ভিটে, মজা দীঘি দেখিয়ে সেক্রেটারী বাবু জানালেন—এখানেই ছিল 'পরিমলবাবুদের ভদ্রাসন।

জিজ্ঞেস করলাম—তাদের বংশের কেউ বুঝি থাকে না এখানে?

—তারা কেউ বেঁচে নেই। দূর সম্পর্কের এক ভাগনে থাকেন কলকাতায়। দেশে তিনি আসেন না বড় একটা। জমি-জমা সব বিক্রী করে দিয়েছেন। পোড়ো ভিটে, মজা দীঘি চৌধুরী বংশের ঐতিহ্য বুকে ধরে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম পদ্মের শোভা, শুনছিলাম ভ্রমরের গুঞ্জন। আমাকে এক দৃষ্টিতে ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেক্রেটারীবাবু মালিকে বললেন—সাহেবের জন্য কিছু ফুল তুলে বাংলোতে নিয়ে এস।

আনমনা হয়ে পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম সুধার কথা। বাংলোতে ফিরে অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। বসার ঘরে ফুলদানিতে সাজানো পদ্মগুলি যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে। বিকেলে চা খাওয়ার পর সেক্রেটারী বিদায় নিলে, বাংলোর চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর নাম করে নদীর পাড় ধরে চলতে লাগলাম চৌধুরী বাড়ীর পোড়ো ভিটে লক্ষ্য করে।

সন্ধ্যার তখনও বাকী। চৌধুরীদের বাগানে ঘুরে দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে চৌকিদার বাধা দিয়ে বলল—ওখানে সাপ খোপের বাসা হুজুর। দিনেও লোকে ঢোকে না ও বাগানে। সাহস দিয়ে তাকে বললাম—তোমার হাতে বাঁশের লাঠি আছে, ভয় কি? জঙ্গলে লাঠির ঘা মেরে সাপ তাড়িয়ে আমরা ঢুকে চল।

জংলা আগাছায় ভরা সারাটা বাগান। বড় বড় গাছগুলোর ডালপালা ছাটা শ্রীহীন। দীঘির ভাঙ্গা ঘাটে বসে চোখে পড়ল একটি প্রাচীন দোলন চাঁপার গাছ। পা-পা করে এগোতে লাগলাম গাছটার দিকে। তার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম উঁচু ডালে দুটো চাঁপাফুল ফুটে আছে। চৌকিদারকে বললাম—ডাল সমেত ফুল দুটো পেড়ে আনতে পারবে?

—কেন পারব না হুজুর! গাছে চড়ে ফুল এনে আমার হাতে দিল সে। মনে পড়ল এই ফুলেরই ঘ্রাণ আমি পেয়েছিলাম গত রাতে। মনে হল, সুধা হারিয়ে গেছে এই দোলন চাঁপার তলা থেকে। আঁধার নেমে আসছিল। রাতে জঙ্গলের ভেতর থাকা নিরাপদ নয় জানিয়ে চৌকিদার বার বার আমাকে হুঁসিয়ার করে দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ফিরে আসতে হল চৌধুরী বাড়ীর পোড়ো ভিটে ছেড়ে।

পরিমল বাবুর বই দু খানা রাত জেগে পড়লাম। আমারই মনের কথা যেন লিখে গেছেন তিনি। শেষ রাতে তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল আমার দু' চোখ জুড়ে।

* * *

ডুরে শাড়ি পরা সুধা হাসতে হাসতে বলল—কেমন মজা করেছিলাম বলত কাল রাতে? আমি তোমার পেছনেই ছিলাম। তুমি দেখতে পাওনি আমাকে। তোমার স্কুলের মজার ব্যাপারের চেয়ে ভাল মজা হয়নি? মনে পড়ল, সত্যি ত সামনে খুঁজেছিলাম সুধাকে, পেছন ফিরে তাকাইনি একবারও।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুধা বলল—কি ভাবছ এত?

—ভাবছি, গতকাল যে দেখলাম ভূকম্পন, ঘর দালান ভেঙে পড়ছে, সে সব কি মিথ্যা?

—ও তোমার মনের ভ্রম। তুমি দেশের ভাঙা গড়ার কথা, নোতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা অনবরত ভাব কিনা, তাই বুঝি ও রকম দেখছ। এই দেখ আমাদের দালান, বাগান বাগিচা সব ঠিক আছে।

চেয়ে দেখলাম, সুধার কথাই ঠিক, সব আগের মতই আছে। তাকে বললাম, ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি লাগছে, দীঘির ঘাটে বসি চল। আমি এগিয়ে চললাম—সুধা আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। আমাকে ঘুরে ক্লান্তি লাগছে, দীঘির ঘাটে বসি এখানে, তোমার জন্য এক গ্লাস দুধ গরম করে আনি।

—তাড়াতাড়ি এস। তোমাকে না দেখে কি অস্বস্তি লাগছিল আমার, ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না আর।

—না গো না, দেরি করব না মোটেও। তুমি দেরি করে ফেরার জন্য আমার যে কষ্ট হয়েছিল, সে কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম আমি।

সুধা তার কথা রেখেছিল—এক গ্লাস গরম দুধ হাতে নিয়ে ফিরে এসে আমার পাশে বসে গলা জড়িয়ে আদর করে বলল—সবটুকু খেয়ে ফেলতে হবে।

—তা হবে না, ফিরে ফিরে চুমুক দিয়ে দুজনে ও গ্লাসের দুধ খাব।

—বেশ, তাই হবে, তবে তুমি প্রথমে চুমুক দিয়ে প্রসাদ করে দাও, আমি পরে খাব।

জোছনা ঢলে পড়েছিল, পশ্চিম আকাশের গায়। রাত বেড়ে চলছে জানিয়ে সুধা বলল—টুটু, গোপাকে খেতে দিয়ে আসি। বসে বসে গল্প করব তোমার সঙ্গে।

—বেশ তাই যাও, শীঘ্র এস, দেরি করো না।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে আর বলতে।

সুধা যাওয়ার সময় আমাকে আদর করে গেল দু' হাতে গলা জড়িয়ে ধরে। তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকেও আদর জানালাম আমি। সুধা চলে গেল।

ঘাটে বসে বসে ফুরফুরে হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি ভোর হয়ে এসেছে। পূবে আকাশে অরুণোদয়ের লালিমা, গাছে গাছে পাখীর কাকলী। চোখ মুছে ভাবলাম সারা রাত কি ঘাটেই ঘুমিয়েছিলাম আমি? সুধা ফিরে আসে নি আমার কাছে?

• • •

জেগে দেখি বাংলোর ঘরে খাটে শুয়ে আছি। তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম চৌধুরীবাবুদের ভিটে লক্ষ্য করে। সুধা আমাকে টানছে সেখানে। বনঝাদাড় ভেঙ্গে ঘাটে এসে বসলাম যেখানটিতে বসে সুধা আমাকে আদর জানিয়েছিল কাল রাতে। সুধার কথা ভাবতে ভাবতে আমার বুক ভরে এল অজানা বেদনায়। ভাবলাম ভালবাসার কি শেষ নেই। জন্ম হতে জন্মান্তরে সে পিছু পিছু ফেরে?

চৌধুরীবাড়ী কি আমারই গতজন্মের খেলাঘর? সুধা কি আমারই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা প্রিয়তমা? ভাঙ্গা ঘাটে বসে

ভাবতে লাগলাম একা একা। প্রত্যুষে সেক্রেটারি বাবুর নদীতীরে বেড়ানোর অভ্যেস। আমাকে দেখতে পেয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন—এখানে একা একা বসে কেন স্যার?

ইচ্ছে করল মুখ ফুটে বলি—পরিমল চৌধুরী, প্রসুন রায়চৌধুরীর নূতন পরিচয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে তার জন্মান্তরের প্রিয়াকে দেখতে এসেছে তার আবাল্যের খেলাঘর জন্মভিটেকে।

মনের কথা চেপে গিয়ে বললাম—ভাবছিলাম, চৌধুরীবাবুরা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। স্কুলের উন্নতিকল্পে পরিমলবাবুর অবদান যথেষ্ট। তাদের পোড়ো ভিটে সরকারের পক্ষ থেকে রিকুইজিসন করে সুধাদেবীর নামে একটি মেয়েদের স্কুল গড়ে তুললে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধে নেই। সে কথা জানিয়ে আমি সরকারের তরফ থেকে সকল প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

মনের আনন্দে সেক্রেটারিবাবু আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিনই ম্যানেজিং কমিটির জরুরী মিটিং ডাকার ব্যবস্থা করলেন। রিজোলিউশনের কপি আমার সঙ্গে দিলেন। বিকেলের ট্রেনে উঠাতে স্টেশনে ছাত্র, শিক্ষক, বয়স্ক লোকেরা এলেন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য আমার প্রচেষ্টাকে শতমুখে অভিনন্দিত করলেন তাঁরা। মনে মনে বললাম, সুধার স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা। তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াবে আজ থেকে।

ট্রেন ছেড়ে দিল—হু হু করে বাতাস বয়ে গেল, ট্রেনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে। তার ভেতর আমি শুনতে পেলাম সুধার ডাক—ফিরতে দেরী কোর না কিন্তু।

সদরে ফিরে প্রথমেই সুধারাণী গার্লস স্কুলের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ল্যাণ্ড একুইজিশন করিয়ে, বিল্ডিং গ্র্যাণ্ট স্যাংশন করে তিন মাসের ভেতর সকল ব্যবস্থা সেরে ফিরে এলাম গড়কমলপুরে। বন-জঙ্গল সাফ করে, প্ল্যান তৈরী করে বিল্ডিংয়ের কাজ সুরু হয়ে গেল। আমার স্বপ্নে দেখা গাছপালা, ঘাট, দীঘি সব নূতন করে তৈরী হল। বছর না ঘুরতে সুধারানী গার্লস স্কুলের উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করার ডাক পড়ল আমার।

বক্তৃতা দিতে উঠে বারবার আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। শুধু একটা কথাই বললাম—যে মহিয়সী নারীর প্রেরণা পরিমলবাবুর শক্তির উৎস ছিল এককালে, তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমার দেশের মা-বোনেরা একদিন তাদের স্বামী-সন্তানকে অনুপ্রাণিত করবে দেশের সেবায়, এই আমার কামনা।

আমার অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে জানিয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। উত্তরে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, পরিমলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর অবদান স্মরণ করেই তাদের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি সাহায্য করেছি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। সাহিত্যিকের যোগ্য মর্যাদা দিতে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল—যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা গড়ে উঠবে কালে কালে।

দু' মাসের ভেতর আমার বদলীর আদেশ এল। গড়কমলপুর স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে যেতে হবে ভেবে ব্যথা অনুভব করলাম। সুধাকে দেওয়া কথা হয়ত আর রাখতে পারব না। আমার বদলীর সংবাদ শুনে হেডমাস্টার, সেক্রেটারী সবাই শহরে ছুটে এলেন। মেয়েদের আয়োজিত বিদায় সম্বর্ধনায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে।

শেষবারের মত গড়কমলপুরে এলাম সুধার কাছ থেকে বিদায় নিতে। ছাত্র, শিক্ষক, গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ছাপিয়ে আমার কানে ভাসতে লাগল সুধার কথা—আমার ভয় হয়, একদিন হয়ত তুমি আমাকেও ভুলে যাবে।

মানপত্রের উত্তর দিতে উঠে বললাম—স্বর্গত পরিমল চৌধুরী ও সুধা দেবীর মহান উদ্দেশ্য যেন দেশবাসী চিরদিন মনে রাখেন, তাতেই আমার কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

সুধারানী গার্লস স্কুলের নূতন বিল্ডিং বাগান বাগিচা সংস্কার করা দীঘি, দীঘির ঘাট, সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমার স্বপ্নে দেখা দালান বাড়ী, বাগান, বাগিচা দীঘির ঘাটের সঙ্গে তাদের অদ্ভুত মিল খুঁজে পেলাম। আমার মনের ভাব বুঝে সেক্রেটারী বললেন 'চৌধুরীবাবুদের গড়ের অনুকরণে আমরা তৈরী করেছি সবকিছু।'

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের শুভেচ্ছা নিয়ে বিদায় নিলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম পরিমলবাবুর লেখা বই দুখানি। কথা দিয়ে এলাম নূতন সংস্করণ বর্তমান-কালের উপযোগী করে লিখে পাঠাব। বই-দুখানির স্বত্ব সংরক্ষিত থাকবে স্কুলের—লেখকের নাম থাকবে 'পরিমল চৌধুরীর, পরিবর্ধক হিসেবে থাকবে আমার নাম।

মাঠ, ঘাট, পথ, প্রান্তর পার হয়ে ট্রেন ছুটে চলল শহরের পানে। আমার চোখে ভাসতে লাগল স্বপ্নে দেখা সুধার হাসি হাসি মুখ, তার কথা—ফিরতে দেরী করো না। তাকে বলে এলাম—তোমাকে ছেড়ে থাকার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমার শক্তির উৎস। যেখানেই থাকি না কেন, তোমার শত স্মৃতি দিয়ে ঘেরা গড়কমলপুরে আমি ফিরে আসবোই।

বাতাসের শন্ শন্ শব্দ, ইঞ্জিনের গর্জন—দুয়ে মিলে আমার মনে হল, সুধা যেন আমাকে বলতে চাইছে—কথা দাও, ফিরে আসবে তুমি?

বুঝলাম, সুধা আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাতে চাইছে। তাকে বললাম, কথা দিলাম, নিশ্চয় ফিরে আসবো তোমার কাছে।

*পরিমল চৌধুরী আর প্রসুন রায়চৌধুরী যে একই আত্মার ভিন্ন প্রকাশ।

অঙ্গনা

সৌন্দর্য সাধনা

আর সবকিছুর মতো সৌন্দর্যও সাধনার বস্তু। পরীক্ষায় পাশের জন্য যেমন পড়তে হয়, তেমনি সুন্দর হবার জন্যও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা প্রয়োজন। আমরা সবাই যে জন্মসূত্রেই সুন্দর এমন নয়। কেউ কেউ রূপের ডালি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ কেউ চলনসই আর বাদবাকি সব সাদামাটা। যে রকমই হোক না কেন সকলেরই প্রয়োজন দেহচর্চা অর্থাৎ সৌন্দর্যের সাধনা—যার গোড়ার কথা হলো ত্বক পরিচর্যা।

শিশুর ত্বক নয়নলোভন। সুন্দর টানটান নিটোল। কিন্তু বয়স বাড়লে সেই ত্বক হয়ে যায় শিথিল। তখন তা আমাদের আকর্ষণ করা তো দূরের কথা বরং বিকর্ষণ করে। ত্বকের উপর দেহ-সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে। সেকথা মনে রেখে ত্বকের পরিচর্যায় আমাদের একান্ত

মনোযোগী হওয়া দরকার। ত্বকের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য রক্ষায় রক্তের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের শুদ্ধতায় ত্বকের পরি-পোষণ হয়। উপযুক্ত মাত্রায় এবং বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনে দেহবর্ণ উজ্জ্বল হয়। এজন্য ব্যায়াম করা দরকার। একথায় অনেক মেয়ে ঘাবড়ে যায়। তাঁরা এই ভেবে শংকিত হন যে, ব্যায়াম করলে তাঁদের শরীর পুরুষালি পেশীমণ্ডিত হবে এবং রমণীসুলভ কম-নীয়তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই আশংকা একেবারেই অমূলক। ব্যায়ামে পুরুষের মতো মেয়েদের পেশী পরিস্ফুট হবে না।

বরং একটি বিরাট উপকার হবে এবং তা হলো ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। এই গুণ হারালে ত্বকে ভাঁজ পড়ে আর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। খুব একটা ভারি ব্যায়াম এজন্য দরকার হয় না। নিয়-

নিত যোগাসন করলেই ত্বকের স্থিতি-স্থাপকতা বজায় রাখা সম্ভব। আর রক্ত সঞ্চালন তো বটেই। ব্যায়ামের সংগে সংগে নির্মল বায়ুসেবনও প্রয়োজন।

নিরোগ ত্বক ভাগ্যের ব্যাপার। সুন্দরী রমণীও ত্বকের কমনীয়তা হারাতে পারেন যদি না গোড়া থেকে এ সম্বন্ধে সতর্ক হন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ত্বক সংক্রান্ত নানা জটিলতার উদ্ভব হয় কৈশোরাবস্থা থেকে। আমাদের ত্বকের নিচে অনেক ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে তেল উৎপন্ন হয়। ত্বকের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য। কোন কারণবশতঃ এই গ্রন্থি-গুলি অনেক সময় বিগড়ে যায়। এ থেকে এতো বেশি পরিমাণে তেল উৎপন্ন হয় যে ত্বকের পক্ষে তা খুবই প্রয়োজনাতিরিক্ত। এর ফলে ত্বকের তেল নির্গমনের পথও বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্বাভাবিকভাবেই ত্বকের উপর তার নানারকম প্রভাব পড়ে। ব্রণ আর ফুস্কুড়ির উৎপাত শুরু হয়। চেহারাও খারাপ হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে ডাক্তারদের অভিমত হলো যে, ব্রণ এবং ফুস্কুড়ির আক্রমণ নেহাতই সাময়িক এবং তা আপনা থেকেই সেরে যায়। কিন্তু ডাক্তারের কথা শুনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ঠিক হবে না। ত্বক সংক্রান্ত কোনকিছু উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করা চলবে না।

ত্বকের রোগে খাওয়া-দাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এসময় খাওয়া-দাওয়া যথাসম্ভব সাদাসিধে হবে। খাদ্যবস্তুতে চিনি এবং কার্বোহাইড্রেট-এর মাত্রা যেন কম হয়। শাকসব্জি এবং ফল-মূলের উপর মূলতঃ নির্ভর করতে হবে। যদি খুব তেল চকচকে ত্বকে ব্রণ-ফুস্কুড়ি হয় তবে একটি ঘরোয়া চিকিৎসাও চলতে পারে। প্রথমে সাবান দিয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। তারপর এক বাটি গরম জলে পরিষ্কার নেকড়ায় সামান্য মধু দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে সেই জলে মুখ ধুয়ে ফেললে তেল চবচকে ভাবও কমবে আর ব্রণ-ফুস্কুড়িও সারবে। তবে ম্যাজিকের মতো একদিনেই এতে ফল পাওয়া যাবে এমন নয়—কয়েক দিন লাগবে।

আমাদের মানসিক অবস্থার সংগে ত্বকের সম্পর্ক খুব নিবিড়। মনের অবস্থা যদি ভাল না থাকে সংগে সংগে দেহবর্ণে তার প্রভাব পড়বে। এমনও দেখা যায় যে কেউ কেউ মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখেন। কাউকে কোনকিছু বুঝতে দেন না। এমনি লোক দেখানো হাসিখুশি থাকেন। কিন্তু দেহবর্ণে তার প্রতিফলন ঘটে। ত্বকের কাছে কোন কিছু লুকানো যায় না। এ যেন মনের দর্পণ। মানসিক অবস্থার ছায়াপাত এখানে ঘটবেই। ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল। স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়ে তা ত্বকে ফুটে ওঠে। রং ফিকে হয়। ইতিমধ্যে যদি কোন আনন্দ সংবাদ আসে আর মনে উল্লাসের জোয়ার খেলে যায় তবে ত্বকে সংগে সংগে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ত্বকে যেন ঝিলিক খেলে।

ত্বক সুস্থ রাখতে হলে মনকে স্বাভাবিক রাখতে হবে। সব সময় হাসিখুশি। তাই সারাদিনের কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে যে, কোন কিছুতেই মন যেন বিগড়ে না বসে। সারা দিন শান্ত থাকা যায়। প্রচুর জলে স্নান এজন্য খুব দরকার এবং অনেকক্ষণ ধরে। চান করতে করতে গুনগুন করে দু-এক কলি গান ভাঁজলে মন আরো প্রসন্ন থাকে। চান করতে গিয়ে গান গাওয়া নিয়ে আমরা ঠাট্টা করি। মস্করা করে বলি, বাথরুম সঙ। কিন্তু স্বাস্থ্যের সংগে এর যোগাযোগ খুবই নিবিড়। আর সেই সংগে যে ব্যায়ামের কথা প্রথমেই বলেছি সেদিকেও নজর দিতে হবে। যোগাসনে মন প্রশস্ত থাকে।

অপুষ্টি ত্বকের আর একটি মারাত্মক ব্যাধি। আমাদের অনেকেই ত্বকের উপযোগী খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে মাথা ঘামাই না। তাই শরীর ঠিক করতে গিয়ে আরো বেঠিক হয়ে যায়। ইদানিং, একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে শরীর স্লিম রাখার ব্যাপারে নিয়ে। এ সম্বন্ধেই সকলেই কমবেশি কৌতূহলী। শরীরের অযথা মেদ বাদ দিতে হবে। এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। তাই সবাই ডায়েট করতে শুরু করেছেন। নিয়ম করে খাওয়া-দাওয়া করেন। তার বাইরে কিছু নয়। চর্বি তো একদম নয়। কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে চর্বিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। চর্বির অভাবে ত্বক অপুষ্ট হয়। আবার স্নায়ুপোষক ভিটামিন বি-র অভাবে ত্বকের স্বাস্থ্যে গুরুতর অবনতি ঘটে। দেহত্বক বিবর্ণ হয় এবং ফাটতে শুরু করে। এতো খাদ্যবস্তুজনিত অপুষ্টির কথা। আবার বাইরে থেকেও ত্বকের পরিচর্যা প্রয়োজন। নাহলে ত্বক শুষ্ক হবে এবং নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এক্ষেত্রে ভাল ক্রীম ব্যবহার করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। তবে ক্রীম ব্যবহার করতে হবে নরম আর গরম হাতে। এজন্য কিছুক্ষণ হাত গরম জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর ক্রীম ব্যবহারে ত্বক গরম হবে। এলার্জির ভাব থাকলে প্রসাধন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সৌন্দর্য-সাধনায় শুধু ত্বকের পরিচর্যা করে নিবৃত্ত হলেই চলবে না। সমস্ত শরীরই হলো সৌন্দর্যের আধার। তাই সবদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে ত্বকের পরই চুলের প্রসংগ এসে পড়ে। নারীর কেশরাজি তার সৌন্দর্যের একটি প্রধান অংগ। এক সময়ে সবাই পছন্দ করতেন আজানুলম্বিত কেশ। এখন আর সবাই একমত নন। অনেকে সুন্দর ববড্ হেয়ার পছন্দ করেন। আবার কেউ বা কাঁধ পর্যন্ত। ববড্ অথবা কাঁধ পর্যন্ত যাঁরা চুল রাখেন তাঁদের খোঁপা বাঁধার কোন প্রয়োজন হয় না। তবে যাঁরা আজো আজানুলম্বিত কেশের অনুরাগী খোঁপা তাঁদের বাঁধতে এবং পরিচর্যার দায়িত্বও পালন করতে হয়। খোঁপা হবে চেহারা অনুযায়ী। গলা যাঁদের কম লম্বা তাঁদের উঁচু খোঁপায় সুন্দর দেখাবে। আর যাঁদের গলা লম্বা তাঁরা ঢিলেঢালা বড় খোঁপা বাঁধুন কাঁধ পর্যন্ত নামিয়ে। অবশ্য খোঁপা বাঁধার মেহনত এখন আর অনেকে করেন না। বাজার থেকে তৈরি করা খোঁপা কিনে তাঁরা কাজ চালান।

চুলের সংগে সংগে এসে যায় চোখের কথা। মৃগনয়না রমণী কাব্যের বিষয়বস্তু। তবে সবাই তো আর এ ধনে ধনী নয়। কিন্তু তা বলে আপশোস করে কোন লাভ নেই। চোখ হলো ব্যক্তিত্বের মুখ্য অংগ। তাই এদিকে সবিশেষ নজর দিতে হবে। চোখের দৃষ্টিকে করে তুলতে হবে আকর্ষণীয়। এজন্য আই-ব্রো পেন্সিল আই লাইনার আর আই শেডের সাহায্য প্রয়োজন। চোখের উপরের পালকে আই শেডের নিপুণ টান দিতে হবে। এর পর আই লাইনার প্রয়োগ করতে হবে। আর চোখ যদি খুব ছোট হয় তবে চোখের নিচেও আই লাইনার ব্যবহার করতে হবে। এতে যে শুধু চোখের সৌন্দর্য খুলবে তাই নয় ব্যক্তিত্বও অনেকখানি বাড়বে। এ প্রসংগে একটা কথা মনে রাখা দরকার আই শেড রাতের নিরুত্তাপ মুহূর্তে ব্যবহার করাই ভাল।

এমন অনেক আছেন যাঁরা মুখশ্রীর যত্ন নেন কিন্তু সংলগ্ন গ্রীবাদেশকে অবহেলা করেন। গ্রীবার সযত্ন পরিচর্যা সৌন্দর্য-বোধের উত্তম নিদর্শন। মুখের রঙের সংগে গ্রীবার রঙ অভেদ হওয়া চাই। দুয়ের ত্বক প্রসাধন প্রায় একইরকম। সুন্দর গ্রীবা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্লাউজ অথবা চোলী যাই হোক না কেন গ্রীবা অনুযায়ী গলার ডিজাইন হবে। যদি গ্রীবা ছোট হয় তবে জামার গলা হবে বড়। আর গ্রীবা লম্বা হলে বন্ধ গলা কামিজ খুব ভাল মানাবে। এরূপ গলায় ঝুলিয়ে নিন একটি লকেট।

কালিদাসের কাব্য অনুসারে পীন-পয়োধরা রমণী হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। সুগঠিত বক্ষ নারীর সৌন্দর্যের পরম সম্পদ। উত্তম বক্ষের জন্য উপযুক্ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কারো কারো বক্ষ অপরিপুষ্ট থাকে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। বক্ষ সুগঠিত রাখার জন্যও ব্যায়াম আবশ্যক।

এমনিভাবে শরীরের প্রতিটি অংগের যত্ন নিতে হবে। শুধু ভাত রাঁধতে পারলেই যেমন রান্না জানা হয় না তেমনি মুখের যত্ন নিলেই সৌন্দর্যবোধ স্পষ্ট হয় না। ত্বক থেকে মুখ আর মুখ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই সৌন্দর্য-সাধনা হবে সফল।

—প্রমীলা।

ব্যাগ !
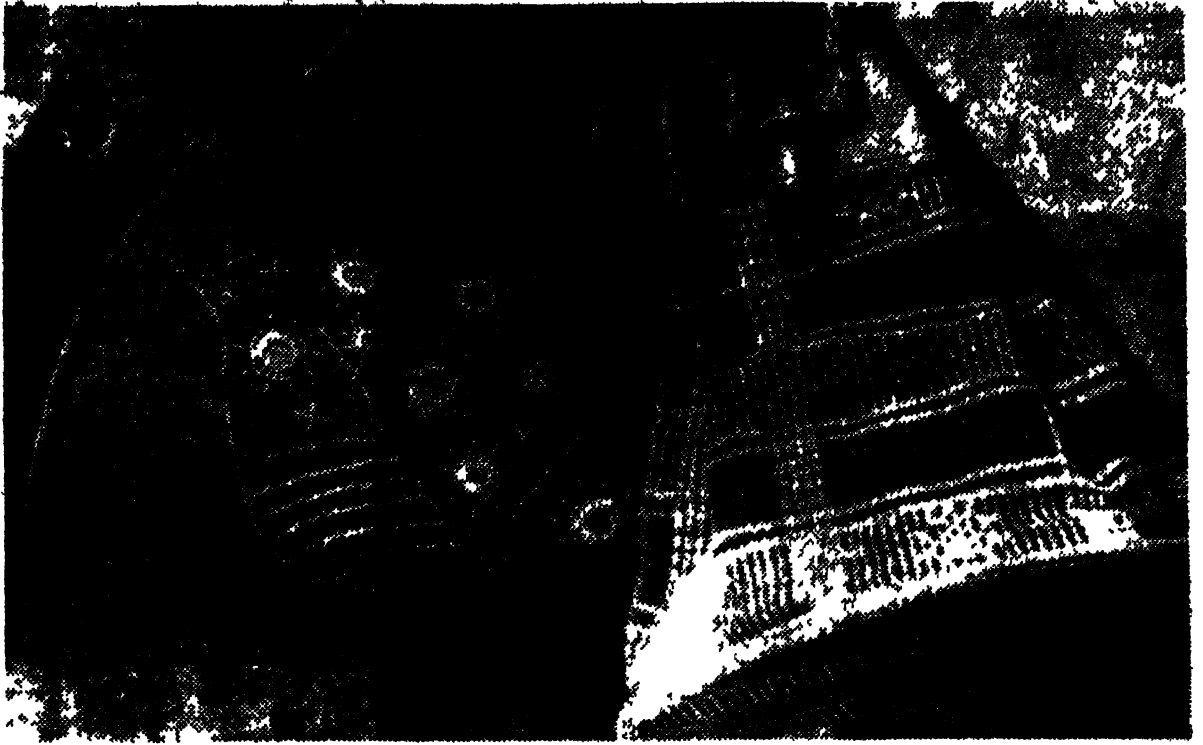
আমার এক বান্ধবী চটের তৈরী একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে কিছু সওদা করার প্রয়াসে জনবহুল এক রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল। মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করছি জনকয়েকের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার বান্ধবীর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটির দিকে আটকে যাচ্ছে। চটের তৈরী ব্যাগ হাল আমলের এক নতুন ফ্যাসান। অথচ এই ফ্যাশনকে নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনা শুনছিলাম। কেউবা খানিক বিস্ময়ে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিল বেশ তো বাজার, রেশন থেকে শুরু করে লিপস্টিক চিরুনী নিয়ে ঘোরা যাবে এই ব্যাগে।

একটু সনাতনপন্থীরা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, কি যে হয়েছে কিছু একটা নিলেই হ'ল। ফ্যাশন ব্যাগের কায়দা ক'রে একটু সাজিয়ে নেওয়া।'

এটাই বড় কথা। কায়দার প্রয়োগেই তো নতুন নতুন ফ্যাশানের জন্ম। শুধু ফ্যাশান কেন! ব্যাগ যে কি—ওদের কথা শুনতে শুনতে ব্যাগকে নিয়ে একটু ভাবতে ভাল লাগল।

ব্যাগের প্রতি আমাদের একটা অকৃত্রিম ভালবাসা আছে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই ব্যাগের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করি। শয়নে স্বপনে এই ব্যাগকে নিয়ে আমাদের কত রোমান্স। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ব্যাগের ঝনঝনানী শুনিয়ে কখন মুগ্ধ করতে চায়, কখনো বা সুখে-শান্তিতে ঘর বাঁধতে চায়। শূন্য ব্যাগের রিক্ততায় কত প্রেমিকাকে না বিরহ যাতনা ভোগ করতে হয়।

আজকাল জীবনটা এতবেশী বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে যে রাতে শুয়ে অনেকেই ঘড়া ঘড়া মোহরের টুং টুং আওয়াজ শোনার চেয়ে থলে ভর্তি টাকা বা ব্যাগপূর্ণ অর্থ কল্পনা করতে ভালবাসে।

শুধু কি ব্যাগই প্রাক-বিবাহে বিরাট সমস্যার কারণ। বিবাহোত্তর জীবনে সবার অলক্ষ্যে একে ঘিরে রয়েছে কত সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি তার কতটুকু খবর কে রাখে? কর্তা যদি ব্যাগ ভর্তি বাজার এনে গিন্নীর সামনে একটু কায়দা করে ঢালতে পারেন—রুই-এর বড় মুড়ো, গঙ্গার ইলিশ, টাটকা সব্জি—কোন্ গিন্নী না একটু মুচকে হেসে গদগদ ভাষায় কর্তার সুনজরের প্রশংসা করবেন! দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রা বাদ দিয়ে পাশের বাড়ীর পুঁটির মাকে পান চিবোতে চিবোতে কর্তার গুণগান করবেন না এমন গিন্নীও কি আছে! অবশ্য এ ব্যাপারে কর্তাকে একটু বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন হতে হবে। সপ্তাহের মাঝে ভরা ব্যাগ দেখালে চাকুরীজীবী গিন্নীর বক্র চক্ষুর সামনে তাঁকে বোকা বোকা হেসে একটু ছলছুতোয় বলতে হবে 'এটা সস্তা, ওটা টাটকা বাকীগুলো কালকের।'

এই থলেই আবার বেদনার বোঝা বয়ে বেড়াতে ইন্ধন জুগিয়ে দেয়। কোনদিন গিন্নী হয়তো রসালো কোন খাবারের কথা ভাষা দিয়ে হাত নেড়ে কর্তাকে বুঝিয়ে দিলেন। কর্তার হয়তো সেদিন বুকের ব্যাগ গড়ের মাঠ, গিন্নীর ভয়ে ঘাড় কাত করে বাজারে গেলেন, ফিরে এলেন প্রায় শূন্য ব্যাগেই। বুঝতেই তো পারছেন স্বামী-ভদ্রলোকটির অবস্থা। গিন্নী বাজারের থলিটা হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়েও ফেলতে পারেন। সপ্তাহখানেক স্বামী ভদ্রলোকটি কি অসহ্য কষ্টে'ত ভুগবেন। শখের একটু জিনিস গিন্নীকে না দিতে পারার কষ্ট ও ভাবনা কি কম? শুধু কষ্ট আর ভাবনার কথাই বা বলি কি করে। ব্যাগ ছিনতাই-এর ভয়াবহতার কথা কে না জানে।

নির্দিষ্ট দিনটিতে রেশন ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বুক ঢিপঢিপ দাঁত শিরশির, চোখ টনটন কার না করে—কর'ত বাধ্য। রেশনের একগুচ্ছ টাকা জোগানে রুক্ষকেশকে শুভ্র করার পথ সুগম নয়। তারপর টাকা জোগান হ'ল তো দুশ্চিন্তা ভাত চিবোতে কাঁকরের ঠেলায় দাঁতের কি হাল হবে। ফুঁকর বাড়তে চশমার পাওয়ারেরই বা কত হের-ফের হবে।

এত ভয়-ভাবনা সত্ত্বেও নারীর সৌন্দর্য বাড়াতে ব্যাগের অবদান অনেকখানি। এবার ব্যাগটা একটু বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করছি। লেডিস ব্যাগ বা ভ্যানিটি ব্যাগ। সেক্ষেত্রে ব্যাগকে আমরা বাজারের বা রেশনের থলে বা ব্যাগের সমগোত্র ভাবতে পারি না। এর কত ডিগনিটি। পুরো সাজসজ্জার ভোল পালটে দেয়, চেহারা খোলতাই করে। শুনেছি লেডিস ব্যাগকে নিয়ে অল্পবয়েসী ছেলেদের নানা জল্পনাকল্পনা। বয়স্ক ভদ্রলোকেরা তো হামেসাই একটা প্রশ্ন তোলেন, এতবড় ব্যাগগুলোতে থাকে কি?

যাই থাকুক সেটা তো আর বড় কথা নয়। প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের বিবিধ সামগ্রীতে এই ব্যাগগুলো ভরপুর। দরকারী অদরকারী হরেকরকমের জিনিস যেমন খাটে বিছানো তোষকের তলা বোঝাই—এও অনেকটা সেই ধরনের। জানি না অত্যাধুনিকারা হয়তো চটে উঠবেন। তাঁরা হয়তো অপ্রয়োজনীয় কিছু দিয়ে ব্যাগ বোঝাই-এ নারাজ। আসলে মাথায় ব্যাগটাই ঘুরছে—কারও মন রাখার কথা ভাবছি না।

এই ব্যাগ ব্যবহারের কৌশল নিয়েও চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। নিত্য ব্যবহার্য ব্যাগ থেকে শুরু করে জন্মদিন, অন্নপ্রাশন বিয়ে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উৎসবে ব্যাগের ধরন-ধারণও আলাদা। শাড়ী, চাদর চটি এদের সঙ্গে মিলিয়ে যদি ব্যাগ না নেওয়া গেল তবে সাজটাই অসম্পূর্ণ।

নতুন করে ব্যাগে ফ্যাশানের আমদানী এটা মেয়েদের এক বিশেষ উদ্ভাবন শক্তি। চামড়া, ফোম এগুলো বাদ দিয়ে বাড়ীতে হাতে তৈরী ব্যাগও এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে ফ্যাশানের বাজারে।

একসময়ে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ব্যবহারে মেয়েরা উতলা হ'য়ে উঠেছিল। এ-ব্যাগ ব্যবহারে নাকি কেমন ইনটেলেকচুয়েলের ছাপ আছে। আসলে ব্যবহারকারিণীর গতি প্রকৃতি বোঝাতে ব্যাগের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

শান্তিনিকেতনী ব্যাগকে পিছনের সারিতে ফেলে ফোম এসে দাঁড়ালো সামনে। স্রোতের মতো দ্রুতগতিতে সকলের হাতে ফোমের ব্যাগ শোভাবর্ধন করতে অগ্রণী হ'ল। হালে দেখছি হাত থেকে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে একদলের আগ্রহ বেশী। এতে ফ্যাশান কতটা হয় জানি না তবে স্বাধীনভাবে হাত দুটো নাড়াবার সুযোগে ভীড় রাস্তায় একটা সুখ আছে নিশ্চয়।

কাপড়ে তৈরী ব্যাগের দিকে অসম্ভব ঝোঁক এখন দেখা যাচ্ছে। শুধু কাপড় নয় চটও এ ব্যাপারে অনেকখানি অগ্রণী। রঙীন চটের ব্যাগের শোভা কোন অংশেই কম নয়।

আসলে ব্যাগ সে ব্যাগই। নারীপুরুষ উভয়ের জীবনের সঙ্গে এক গভীর যোগ। ফ্যাশান করতে যেমন ব্যাগের প্রয়োজন, জীবন বাঁচাতেও কি তার মূল্য কম?

—অঞ্জলি চৌধুরী

ফটো : অমরেন্দু দে

চোখের সামনে বিস্ময়ের কম্পন ও উপলব্ধির জগতে আলোড়ন যদি এক নতুনতর ইতিহাসের দিগন্ত উন্মোচনের ইঙ্গিত হয়, তাহলে হয়তো বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে বিবর্তনের স্রোত বাংলা থিয়েটারকে আজ অনেক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিতে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সুর মিলিয়ে এসেছে আজকের নতুনতর চিন্তার আলোয় আলোকিত থিয়েটার। আজকের নাটক পুরনো ভাবনার জীর্ণতায় ক্লান্ত নয়, আজকের প্রযোজনা গতানুগতিক অভিনয় রীতির মর্মান্তিক পুনরাবৃত্তি নয়। যে থিয়েটার আগে ছিল, যে প্রযোজনার ধারা আগের শতকে চলতো তার প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নয়, বিবর্তনের ইতিহাসকে স্বীকৃতি জানিয়ে এটা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে গত পঁচিশ বছরের বাংলা থিয়েটার এক চিরন্তন শৈল্পিক মহিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। জীবন থেকে দূরে যে থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল তাকে জীবনাভিমুখী করে তারই মধ্যেই শিল্পের দীপ্তি আবিষ্কার, এ এক অসাধারণ ঘটনা। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির মুহূর্তে এই ঐতিহাসিক সত্যটুকুকে আরো প্রসারিত আলোয় তুলে ধরা উচিত নয় কি?

এই ধরনের থিয়েটারের স্বরূপ কি, তা বলতে পারবেন তাঁরাই যাঁরা স্বীকৃতি জানিয়েছেন আজকের নাট্যপ্রযোজনাকে। হয়তো প্রশ্ন থেকে যায় এ সব দর্শক কারা! কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত, না সাধারণ জনমানসের অংশীদার? এই অন্য ধরনের থিয়েটারই কি এই বিশেষ ধরনের দর্শক তৈরি করেছে, না বিবর্তনের স্রোতে স্বাভাবিকভাবেই ভেসে এসে দর্শকদের চাহিদাতেই সৃষ্টি হয়েছে এই থিয়েটার! এই মৌল প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়ে একটি কথাই আমাদের আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে গর্ব বোধ হয় যে বাংলা থিয়েটার আজ নাট্যামোদীর মনে সিরিয়াস চিন্তার আলোড়ন তুলেছে। আগে নাটকের অস্তিত্ব হয়তো নাট্যপ্রযোজনার কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, আর এখন আসল নাটকের প্রাণধর্ম আলোচিত হয় নাটক শেষ হওয়ার পর। আজ মঞ্চ থেকে ঘটনা, সংলাপ ও সংঘাত নেমে এসেছে জীবনের নানা উপলব্ধি ও মননের আবর্তে।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক পরিকল্পনায় বাংলা নাটক এনেছে আজ বিস্ময়কর এক পরিবর্তন। যে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক জগতের অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো নিয়ে বাংলা নাটক মুখর হয়ে উঠেছিল, তা থেকে সরে এসে আজ যুগ-প্রয়োজনেই জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনকে নাড়া দিয়েছে, তাকে দুমড়ে মুচড়ে চলমান করেছে এক নতুন আবেগে আর স্পন্দনে। আজকের সমাজজীবন, আজকের যুগযন্ত্রণা— তার মধ্য থেকেই উঠে আসছে চরিত্র, তাদের কথাই তৈরী করছে সংলাপ, তাদের সমস্যাই ভাষা দিচ্ছে সংঘাতকে। প্রতাপাদিত্য, সাজাহান, নাদির শাহ, অর্জুন প্রভৃতির জীবন সংঘাত আজ আর ভালো লাগছে না। ভালো না লাগার কারণ এইসব চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, শুধু যে অসম্ভব রকমের চলমান জীবনের সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি তার গভীরেই আজ স্পন্দিত হয়ে চলেছি তার এর আস্বাদনেই হয়তো নাট্যশিল্পের পূর্ণতম সিদ্ধির ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। আমরা অবশ্য এ কথা নির্দ্বিধায় বলবো যে আমাদের আগেকার নাট্যপ্রযোজনা নিঃসন্দেহে একটা যুগের ইতিহাস বহন করেছে। আর তাই রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষপূর্তির উৎসবে আজ বহু পুরনো ক্লাসিক নাটক অভিনীত হচ্ছে।

নতুনতর নাটক অর্থাৎ যা 'অন্য ধরনের থিয়েটার' বলে খ্যাত, তা গড়ে উঠেছে ফর্ম বা কনটেন্টকে কেন্দ্র করেই। অ্যাবসার্ড নাটক, প্রতীকধর্মী নাটক—আজকের এই সব বলিষ্ঠ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক নাট্য ভাবনার, চিন্তার বিভিন্ন স্তর। যে সব বিষয়কে আমরা মঞ্চের আলোয় প্রকাশের অনুপযুক্ত ভাবতাম, তা বেশ দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতার সঙ্গে মঞ্চে তুলে ধরা হচ্ছে। যৌনজীবনের সংঘাত আর যন্ত্রণাও ভাষা পাচ্ছে নাটকের গতিবেগে আবার তা শুধু 'সেক্স'-এর প্রচার হিসেবেই তলিয়ে যায় না যথার্থ নাট্যপ্রযোজনার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবেই চিহ্ন রাখে। অ্যাবসার্ড নাটকের মধ্যে যে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভাব্যতা তার মধ্যেও লুকিয়ে থাকছে নতুন এক জীবন রস-সিক্ত বিদ্রোহের সুর, যে সুর জীবনের অতল পর্যন্ত তুলেছে তীব্রতম আন্দোলন। বিদেশী নাটকের ভাবানুসারে রচিত নাটকও ওপারের নাট্যনিরীক্ষার সঙ্গে আমাদের চিন্তার সেতুবন্ধন করছে। কোন বিশেষ নাট্যপ্রযোজনার নাম উল্লেখ না করে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বাংলা নাটকে এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত বাংলা নাট্যপ্রযোজনার ধারাকে বিশ্বের নাট্যআন্দোলনের এক অন্যতম শরিক করে তুলেছে নিশ্চয়ই।

তবে একটা কথা। এই যে আলোড়ন, এই যে বিস্ময়ের সুগভীর আন্দোলন, এর সবটাই কিন্তু অপেশাদারী সৌখীন নাট্যগোষ্ঠীদের নিবিড় নিষ্ঠাজড়ানো প্রয়াসের বলিষ্ঠ এক ফসল। এঁরাই বাংলা নাটককে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে, এঁদেরই ভাবনায় গড়ে উঠেছে ভাবীকালের বাংলা নাটকের এক বিশেষ গৌরবদীপ্ত চেহারা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যবসায়িক থিয়েটারে আজো সেই পুরনো চিন্তানির্ভর ধারার মর্মান্তিক পুনরাবৃত্তি সেখানে হচ্ছে। লাগেনি কোন পরিবর্তনের দোলা। এই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন রাখলে তারা বলেন— দর্শক যা চায় তাই তাদের দিতে হয়। এই কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অনুরোধ—তারা দয়া করে সৌখীন নাট্যগোষ্ঠী বিশেষ করে বহুরূপী, নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রভৃতি সংস্থার প্রযোজনা দেখুন, তা হলেই তারা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের নাটক দেখায় উৎসাহ দর্শকদের উৎসাহ কম আছে কি না। সত্যিকারের নাটকের প্রাণধর্ম বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ক্যাবারে নর্তকীর উত্তেজক নগ্নাভিগামী দেখিয়ে যেখানে দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা হয় সেখানে ভালো নাটক খুঁজতে যাওয়া ন্যাকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ কথা খুব সত্য যে দর্শকদের এভাবে আকৃষ্ট করার অর্থ তাদের শিল্প-ভাবনার গভীরতম স্তর থেকে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা। যথার্থ নাট্যশিল্পের বিচারে এটা নিঃসন্দেহে [illegible] অপরাধ। অথচ এদিকে [illegible] উদাসীন। অথচ নাটক নিয়ে যখন নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তখন সবারই উচিত সেই ধারাকে একটা সুষ্ঠুরূপে প্রবাহিত করা

দেওয়া। এ ব্যাপারে ব্যবসায়িক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও দর্শকদের কি কোন ভূমিকা বা কর্তব্যবোধ নেই?

প্রশ্নটা ভাবতে হবে যেমন সেখানকার নাট্যপ্রযোজককে, তেমনি ভেবে দেখতে হবে দর্শকদের। থিয়েটার নিয়ে যেখানে ব্যবসা সেখানে চলবে এক রকমের প্রযোজনা, আর থিয়েটারকে ভালোবেসে যারা থিয়েটার করে তাদের প্রযোজিত নাটকের চেহারা হবে অন্য রকম—এই ব্যবধান চলতে দেওয়া কি ঠিক? আর যদি নাই ঠিক হয়, তবে কেন এই ব্যবধান, কেন সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড নাট্যআন্দোলনের ইতিহাস তৈরী হবে না, কেন সবার প্রচেষ্টা একটি আলোকিত ঐক্যে এসে মিলবে না! ভালো থিয়েটার, অর্থাৎ 'অন্য ধরনের' থিয়েটার কি দর্শক পয়সা দিয়ে দেখেন না? নিশ্চয়ই দেখেন। তার বহু প্রমাণ আছে। হয়তো কিছুটা লাভের পরিমান কম হবে প্রথমে, তবে শিল্পের খাতিরে কিছুটা ব্যবসায়িক দৃষ্টি প্রথমে ছেড়ে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

আজকের দর্শকই এর বিচারক। কি করে সর্বত্র যেখানে বাংলা নাটক অভিনীত হয় সেখানে শিল্পমূল্যের থিয়েটার যাতে হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে তাঁদেরই। আজ শহর থেকে মফঃস্বল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যে নাট্যআন্দোলনের ঢেউ তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই তো চোখে পড়বে নিশ্চয়ই যে কি ধরনের নাটক দর্শক আজ চাইছেন, দর্শকের মন-প্রাণ আন্দোলিত হয়ে উঠছে কোন্ প্রযোজনার গভীরে ডুব দিয়ে।

স্বীকার করি অন্য স্বাদের থিয়েটারের রস উপভোগ করতে হলে দর্শকের মানসিকতা ও উপলব্ধির ক্যানভাসটিকেও বড়ো করতে হয়। এই ব্যাপারটার যেখানে অভাব হয়, সেখানেই 'আমার কন্ঠনালীতে সর্পটা আটকে গেছে' উচ্চারণ করে যে যন্ত্রণাদগ্ধ নায়ক, তাঁর চরিত্র বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু তাই বলে অনুভবের এই ফাঁকটুকু পূরণ করা হবে না কোনদিনও—এ ধারণাও ঠিক নয়। দর্শকদের তো তৈরী করতে হবে প্রযোজকদের। পথের পাঁচালীর পর বাংলা চলচ্চিত্রজগতে যেমন নতুন দর্শক তৈরী হয়েছে, তেমনি 'রক্তকরবী' নাটক প্রভৃতি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার নতুন নাট্যানুরাগী পেয়েছে—এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই।

শিল্পসম্মত থিয়েটারের ওপরেই একটি দেশের চিরন্তন নাট্যশিল্পের ঐতিহ্য নির্ভর করে। এ ব্যাপারে দর্শক ও প্রযোজকদের চিন্তার মেলবন্ধন প্রয়োজন। বাংলা রংগমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা নিশ্চয়ই আশা করবো বাংলা থিয়েটারের শৈল্পিক সম্ভার আরো অর্থময় হবে, ঘুচে যাবে প্রযোজনার সব রকম ব্যবধান।

বাঙালী মনিষীর নাট্যাভিনয়

শৈলেনকুমার দত্ত

সংস্কৃতির একটি দিক যেমন অভিনয়, চিত্তবিনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়ও তেমনি অভিনয়-দর্শন। তাই সাধারণ অসাধারণ সব ব্যক্তিই অভিনয় দেখে আনন্দ পান। বুদ্ধিজীবী অভিনয় দেখেন মানসিক চিন্তাবৃদ্ধির জন্যে, শ্রমজীবী দেখেন দেহমনের শ্রীবৃদ্ধিলাভের জন্যে।

বাঙালী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। বিদ্যাসাগর-রামগোপাল ঘোষ - প্যারীচাঁদ মিত্র - মধুসূদন - রামকৃষ্ণদেব - বিবেকানন্দ - শ্রীঅরবিন্দ - চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই অভিনয় দেখে প্রভূত আনন্দ পেতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখে বিচলিত দর্শক বিদ্যাসাগরের চটিজুতো ছুঁড়ে মারার প্রচলিত ঘটনা অভিনয় জগতে আজও একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্র - রমেশচন্দ্র এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নামও এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তিনি যেমন নাট্যাভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন তেমনি নিজেও ছিলেন একজন সুঅভিনেতা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত বেনীসংহার নাটকে অভিনয় করে তিনি যশোলাভ করেন। নিজে অভিনয় না করলেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষ ছিলেন। মেট্রোপলিটন থিয়েটারে বিধবা বিবাহ প্রভৃতি নাটক প্রধানত তাঁরই তত্ত্বাবধানে অভিনীত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের আর এক ঋত্বিক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও একজন সুঅভিনেতা ছিলেন।

এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর - মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। পাথুরেঘাটার ঠাকুর বাড়িতে থিয়েটারের জন্যে যে-কমিটি গঠিত ছিল, বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন তার কার্যকরী সদস্য ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার শুধু অভিনয় দেখেই আনন্দ লাভ করতেন না নাট্যাভিনয়ে তাঁদের উদ্যোগও কম ছিল না। ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয় প্রধানত এঁদেরই উদ্যোগে।

মনীষীদের মধ্যে ভোলানাথ চন্দ, গৌরদাস বসাক, রমানাথ লাহা প্রভৃতিরা সুঅভিনয় করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন একজন কুশলী অভিনেতা। বিখ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর তাঁর ভ্রাতা রাধামাধব করের মত সুঅভিনয় করতেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলিউ সি বোনার্জী ওরফে উমেশচন্দ্রের অভিনয়ে খুব আগ্রহ ছিল। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকাভিনয়ে তিনি শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। দর্শকরূপে উপস্থিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও উমেশচন্দ্রের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'রেইস এণ্ড রেইত' পত্রিকা-সম্পাদক সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সুঅভিনয় করতেন।

নাট্যকারদের মধ্যে প্রায় সকলেই অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হলেন গিরিশচন্দ্র এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন—'বিলেতে জন্মালে গিরিশবাবু সার উপাধি পেতেন।' গিরিশচন্দ্র অভিনয় করে যে সব চরিত্রগুলি অমর করে রেখেছেন সেগুলি হল —সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ, লীলাবতীতে ললিতমোহন, কৃষ্ণকুমারীতে ভীম সিংহ, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ পাণ্ডব গৌরবে কঞ্চুকী, নীলদর্পণে উড সাহেব, প্রফুল্লে যোগেশ, ম্যাকবেথে ম্যাকবেথ, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র, জনায় বিদূষক, সিরাজদ্দৌল্লায় করিম-চাচা এবং বিল্বমঙ্গলে সাধক। সধবার একাদশীতে নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে নাট্যকার দীনবন্ধু বলেছিলেন 'মনে হচ্ছে নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্যে লেখা।' কৃষ্ণকুমারী নাটকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে নিজের রাজবেশ ও তলোয়ার পরিয়ে দিয়েছিলেন। গিরিশ-শিষ্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর অভিনয়ে অমরচরিত্র হল—'বিল্বমঙ্গলে' নামভূমিকা, 'নীলদর্পণে' সৈরিন্ধ্রি প্রভৃতি।

ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারবর্গের অনেকে অভিনয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় বাংলা সংস্কৃতির আর একটি গৌরবময় অধ্যায়। সীতা দেবীর ভাষায় বলতে গেলে—'রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব! তাঁহার সবকিছুর তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই মিলিত।.....তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন।' নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িও একস্থানে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।'

বিদ্বজ্জন সমাগমের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীরা। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় দেখে সকলে আনন্দে অভিভূত হন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তার

উত্তেজনায় তিনি একটি কবি-প্রশস্তি রচনা করে ফেলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
বাল্মীকি প্রতিভা দেখাইতে পুনর্বার।

বিদ্বজ্জন সমাগমের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কালমৃগয়া' নাটিকারও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এ নাটিকার প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নেমেছিলেন দশরথের ভূমিকায়। অন্যান্য ভূমিকাতেও ঠাকুর পরিবারের অনেকে অভিনয় করেন।

'রাজা ও রাণী' নাটকটি নতুন করে লিখে রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন 'তপতী' এবং পরে কোলকাতায় মহাসমারোহে তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সত্তর বছর বয়সেও কবি স্বয়ং রাজার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। সকলে বিস্ময় প্রকাশ করেন কবি কেমন করে ওই বয়সে প্রেমের অভিনয় করবেন এবং তাঁর প্রলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু দাড়িরই বা কী হবে! কিন্তু কার্যত কি দাঁড়িয়েছিল সেটি একজন প্রত্যক্ষদর্শী কবি জসীম উদ্দীনের লেখায় সুস্পষ্ট—'অভিনয়ের সময় দেখা গেল দাড়িতে কালো রং খাইয়া মুখের দুই পাশে গালপাট্টা বানাইয়া দিয়া কবি এক তরুণ যুবকের বেশে স্টেজে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তপতী নাটকে রাজার ব্যর্থ প্রেমের সেই মর্মান্তিক হাহাকার কবির কণ্ঠমাধুর্যে আর আন্তরিক অভিনয়-গুণে মানুষের উপর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন সেকথা সর্বজনবিদিত। তাঁর অভিনয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল—রাজা নাটকের ঠাকুর দাদা' নটীর পূজা নাটকের 'ভিক্ষু-উপালী' বিসর্জন নাটকের জয়সিংহ ফাল্গুনী নাটকের অন্ধ বাউল অচলায়তন নাটকের আচার্য অদীনপুণ্য শারদোৎসব নাটকের সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেক গুণী অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ এবং বর্ণকুমারী, শরৎকুমারী, ইন্দিরা দেবী ও প্রতিভা দেবীও অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথও অভিনয় শিল্পে পারদর্শী ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু সুদর্শনই ছিলেন না সু-অভিনেতাও ছিলেন। তাঁকে স্ত্রী-ভূমিকায় অনবদ্য মানাতো। নটীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে কেউ ধরতেই পারতো না যে, তিনি মহিলা নন। কৃষ্ণকুমারী নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকায়ও তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত 'এমন কর্ম করব না' (অলীকবাবু নাটকের পূর্বনাম) নাটকে 'সত্যাসিন্ধুর' ভূমিকায় অভিনয় করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। অলীকবাবুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং 'হেমাঙ্গিনী' ও 'পিসনির' ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে শরৎকুমারী ও বর্ণকুমারী।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী এবং রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবীও অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে কোলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে পাত্রপাত্রী ছিলেন—

বিক্রম—রবীন্দ্রনাথ, সুমিত্রা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবদত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ, নারায়ণী—মৃণালিনী।

সেযুগে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর একত্রে অভিনয় করা নিয়ে যে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু তাঁরা অভিনয়কে এত ভালবাসতেন যে, এসব সমালোচনাকে কোন আমলই দেন নি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। প্রতিমা দেবী তাঁর স্মৃতিচিত্র'র এক স্থানে অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন—'ডাকঘর নাটকের পার্টে অবনীন্দ্রনাথের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। শোনা যায় কবিগুরু বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনকড়ি চরিত্রটি বিশেষ করে তাঁর কথা মনে করে লিখেছিলেন। এই পার্টে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। ফাল্গুনী এবং ডাকঘরের মোড়লের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন আজও তাঁদের স্মৃতিপটে সে ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে।' বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র একবার তাঁর তিনকড়ির পার্ট দেখে বলেছিলেন—'এরকম সব অ্যাক্টর যদি আমার হাতে পেতুম, তবে আগুন ছুটিয়ে দিতে পারতুম।'

ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে এসে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি অনেক কথা উপস্থিত মত বানিয়ে বলতে পারতেন। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাঁর অভিনয় অনেকের প্রশংসা অর্জন করে।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খুব বেশি অভিনয় না করলেও তিনি একজন সুঅভিনেতা ছিলেন কোলকাতার সঙ্গীত সমাজে একবার তাঁর 'সীতা' নাটকের অভিনয় হয়· সেই অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে শক্ত সিংহের ভূমিকাতেও তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনও অভিনয়ে খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে অভিনয় করেও তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন।

বাংলা শিশু-সাহিত্যের অমর স্রষ্টা সুকুমার রায়ও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ননসেন্স ক্লাবে অভিনয় অনুষ্ঠান প্রায়ই হত এবং সেসব অভিনয়ে তিনিই হতেন মুখ্য অভিনেতা। তাঁর অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে অনুজা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন 'ননসেন্স ক্লাবের অভিনয় এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে দেখেছে তারাই জানে। মুখে বর্ণনা করে তার বিশেষত্ব ঠিক বোঝানো যায় না। বাঁধা স্টেজ নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও মেক আপ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথার সুরে ভাবে ভঙ্গীতে তাদের অভিনয় বাহাদুরি ফুটত। দাদা নাটক লিখত অভিনয় শেখাত আর প্রধান পার্টটা সাধারণত সে নিজেই নিত। প্রধান মানে সবচেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট হাঁদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সুকুমার রায়ের অভিনয় প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম জীবনে অভিনয় করতেন। পরবর্তীকালে কৈশোর স্মৃতিতে তিনি নিজেই লিখেছেন—'...অভিনয় করেছি, অভিনয়ের জন্য সুখ্যাতিও পেয়েছি। নিজের রোগা চেহারার জন্য রঙ্গমঞ্চে নামতে আজ লজ্জা পাই নইলে হয়তো রঙ্গমঞ্চে অন্তত একখানার সখের অভিনয়ে অভিনয় করতাম।'

শান্তি নিকেতনে অভিনয় পর্বের যে আয়োজন হত তাতে বাংলাদেশের বহু গুণী শিল্পী অভিনয় করতেন। এঁদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৩২১ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে অচলায়তন নাটকের যে অভিনয় হয়, তাতে পিয়ার্সন সাহেব পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে সৌখিন নাট্যাভিনয় বেশ প্রসার এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। সেই সঙ্গে বাঙালি মনীষীদের নাট্যাভিনয় স্মরণ করলে তাঁদের যথোচিত সম্মান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কল্যাণ হবে।

চিঠিপত্র

'স্বদেশের ইতিহাস' : লেখকের উত্তর

'অমৃতে' প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'স্বদেশের ইতিহাস' নামে চিঠিটি পড়ি কিছুদিন আগে। এই প্রসঙ্গে তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বংশধারা : রঙ্গনায়িকা' নামে ধারাবাহিক রচনাটির আসল বিষয়বস্তু হচ্ছে নবাবী শাসনের অন্তরালে বাংলার বেগমদের সক্রিয় ভূমিকার কাহিনী। সেদিন পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁরা নবাবদের শাসনকাজের ওপরই শুধু প্রভাব বিস্তার করেন নি যুদ্ধ-বিগ্রহ সন্ধিস্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারেও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন। আর তাঁদের এই কাহিনী আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নবাবদের জীবনের অনেক ঘটনা এসে পড়েছে। শুধুমাত্র কোনো নবাবের জীবন কাহিনী লেখা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমার 'ছোটি বেগম' লেখাটির ভূমিকা থেকে দুটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে : তার (ঘসিটি বেগমের) জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কয়েকটি ঘটনা ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। এই বিচ্ছেদ চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে পলাশীর যুদ্ধে। শ্রী সিরাজ আমার এই উক্তিকে অন্যমনস্ক, অসতর্ক এবং বাস্তবতা বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। আমি তাঁকে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে 'অমৃতে' চারপৃষ্ঠাব্যাপী ছাপানো 'ছোটি বেগম' লেখাটিতে এই উক্তির সমর্থনে অজস্র তথ্য পরিবেশন করেছি। তিনি লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখতে পেতেন যে সিরাজের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে ঘসিটি বেগম ক্ষমতা ঐশ্বর্য সব কিছু হারিয়ে কিভাবে চারদিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করে ছিলেন। সিরাজের বিপক্ষ দল এই ঘসিটি বেগমকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠছিলো। এই দলে ছিলেন জগৎ শেঠ, মীর জাফর রাজবল্লভ রায় দুর্লভরাম প্রমুখ নামকরা ব্যক্তি। কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করার মতো সাহস এঁদের ছিলো না। তাই তাঁরা গোপনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন। এই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রাজ্য দখল করতে চাইছিলো অনেকদিন থেকেই। এবার তারা পেয়ে গেলো সেই সুবর্ণ সুযোগ। এভাবে একদিকে ঘসিটি বেগম ও তার প্রধান অনুচরবর্গ এবং অন্যদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসককুল—এই দুই প্রধান বিপক্ষ শক্তির মিলিত চক্রান্তে এলো সেই পলাশীর যুদ্ধ। পতন ঘটলো একটা স্বাধীন দেশের এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হোলো প্রতিষ্ঠা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন আজকাল এ ধরনের রচনা লিখতে গিয়ে আমরা অনেকেই নাকি সোজা তৎকালীন ইংরেজের কূটচালিত কলমের শরণাপন্ন হই। অন্য কারো কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। শুধু নিজের বক্তব্যটুকুই তুলে ধরছি। কোনো অন্ধ নীতি, কোনো ভ্রান্ত ধারণা কিংবা আমাদের দেশের ইতিহাস নিয়ে কোনো বিদেশীর একপেশে রচনা—এগুলোর কোনোটাই আমার মনের ওপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করে নি। অবশ্য সব বিদেশী লেখকের বই-ই যে মন্দ তা কখনো বলব না। এঁদের মধ্যে দু'-একজন সেকালের ঘটনাবাজিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উপস্থিত করেছেন যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের লেখার সঙ্গে নবাবী আমলের সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নবাবী আমলের সরকারী ভাষা ছিলো ফারসী। সে সময়কার সমস্ত ঘটনা ঐ ভাষায় লিপিবদ্ধ। আমি 'বঙ্গ নবাব : বঙ্গনায়িকা' নামে এই ধারাবাহিক রচনাটি লিখতে গিয়ে সমকালীন ঐতিহাসিকদের লেখা ফারসী গ্রন্থ দলিল ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছি। অবশ্য এগুলোর বেশিরভাগই ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে গেছে। আর যেসব এখনো অনূদিত হয়নি সেগুলো ফারসী-জানা পণ্ডিতদের সাহায্যে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঐতিহাসিক করম আলির 'মুজফফরনামা' গোলাম হোসেন খাঁ তবাতাবাই-এর 'সিয়র উল-মুতাখখরীন' সালিমউল্লার 'তারিখ-ই বঙ্গাল' গোলাম হোসেন সালিমের 'রিয়াজ উস সালাতিন' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে অশেষ পরিশ্রমে এইসব গ্রন্থ এবং অন্যান্য দলিল থেকে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বার করে তা আমার রচনায় পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সুতরাং তৎকালীন ইংরেজের কূটচালিত কলমের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার ক্ষেত্রে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মশায়কে আমি শেষে এটুকু বলতে চাই যে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত এবং সত্যানিষ্ঠ মন নিয়েই আমার ধারাবাহিক রচনাগুলি লিখেছি। এগুলোর কোথাও ঘটে নি সত্যের কোনো অপলাপ ঘটে নি ঐতিহাসিক তথ্যের কোনোরকম বিকৃতি। গভীর বাস্তবতার পটে ফেলে বিচার করেছি এই আমলের ইতিহাস। নবাবদের সমকালীন এদেশী লেখকদের পরিবেশিত তথ্যগুলির ওপর নির্ভর করে আমি কোনো কাল্পনিক উপাখ্যান লিখি নি, বরং ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। আর সেই সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো সেণ্টিমেণ্ট বা ভাবপ্রবণতা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে নি। সেণ্টিমেণ্ট উপন্যাসে চলে, কিন্তু ইতিহাস রচনায় তা একেবারে অচল।

—অংশুরঞ্জন সেন
নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫৩।

উনিশ শতকের নবজাগরণ : একটি সমীক্ষা

গত ১৫ই ডিসেম্বর, '৭২ সংখ্যা অমৃতে শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্তের 'উনিশ শতকের নবজাগরণ : একটি সমীক্ষা' নিবন্ধটি পড়লাম। লেখক প্রথম অনুচ্ছেদে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর যে সমালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। কোনো রচনা থেকে বিশেষ ক্ষুদ্রাংশ উদ্ধৃত করলে অনেক সময়েই তাতে উদ্ধৃত অংশটির ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যায়। 'গণবিদ্রোহ ও ভগবান' নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটির নিবন্ধটিতে এই তখন হচ্ছে এমন একটি সময় যখন দরিদ্র শ্রমজীবী অন্ত্যজ সাঁওতালরা তাদের অশিক্ষিত ... ইংরেজ ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে বিদ্রোহ সংগঠিত করছে শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা (যে শ্রেণীটিকে আইনস্টাইন প্রায় সমাজের শিরোভূষণ বলতে চেয়েছেন) সে তুলনায় কত লঘু বিষয় নিয়েই না মেতে ছিলেন তখন। দুটি শ্রেণীকে পাশাপাশি বসিয়ে বিচার করলে ধরা পড়ে এই বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনার গতি তুলনায় কত সৌখিন শ্লথ। এবং কার্যক্রমের প্রয়াস কত অলস। শ্রীযুক্ত ঘোষ এ দুটি ভয়ংকর তফাতের কথাই উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য নবজাগরণকে অস্বীকার করার তত্ত্ব অনুপস্থিত বলে আমার ধারণা, বরং তিনি তাকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন শুধু বলতে চেয়েছেন অশিক্ষিত সাঁওতালদের নবজাগরণের তুলনায় এ নবজাগরণ অনেকটা লঘু ধাঁচের।

'বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সমস্যা' নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটুকুও উত্তরসূরি বুদ্ধিজীবীদের সমরূপ সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য বলেই আমার মনে হয় প্রাসঙ্গিকভাবে এগুলি দীর্ঘ আলোচনা অপেক্ষা রাখে।

—সুনীল কোনার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

খেলাঘর চিত্রে কবরী এবং আবদুল্লা আনোয়ার খান

ঢাকার ছায়াছবি

বাবুল চৌধুরী পরিচালিত সত্য সাহা সুরারোপিত [illegible] রঙিন চিত্র
রাজ্জাক ও [illegible]

তেজগাঁও ঢাকার এফ ডি সি একটা জায়গাই বটে! এমুখ থেকে সেমুখ পর্যন্ত ব্যস্ততার তরঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে। রোববার, শনিবার বলে কোন কথা নেই। এখন অবশ্য এফ ডি সির নাম—বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা।

'এখানে ছবির কাজ [illegible] শেষ হওয়ার পর মুক্তির জন্যে খুব বেশি দিন লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হয় না। ছবির মুক্তির দিন ঠিক করেই সাধারণত ছবি তৈরি হয়ে থাকে।'

একথা জানালেন ওপার বাংলার প্রতিষ্ঠিত সংগীত পরিচালক সত্য সাহা।

'ঢাকা ছাড়া অন্যত্র চলচ্চিত্র কর্মীদের গতি নেই',— এমন কথা এখন আর বলা ঠিক নয়। তার উদাহরণ ত [illegible], কবরী, সুচন্দা।

সুচন্দার কোন খবর না দিয়েই কলকাতায় চলে যাওয়ায় এখানকার পরিচালক-প্রযোজকরা মাথায় হাত রেখেছেন। জহির রায়হানের লেখা উপন্যাস 'বরফ গলা নদী'র চিত্ররূপ দেবার জন্যে সুচন্দা নাকি উঠে পড়ে লেগেছেন, একথা ঢাকায় চলচ্চিত্র মহলের গমগমে [illegible] ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুচন্দার আগামী ছবি হচ্ছে—নটীর অনেক নাম, জীবন তৃষ্ণা [illegible] হরিশচন্দ্র, [illegible], গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি।

জয়ন্তী অতিক্রান্ত বহু উর্দু ছবির অভি-নেত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখলাম।

—কলকাতার কোনও ছবি দেখেন নি?

—জী, দেখেছি। অনেক আগে। তখন আমি অনেক ছোট। ফিল্ম লাইনে আসিনি। ফিল্ম লাইন ত দূরের কথা, তখনকার কথা আমার কিছুই মনে নেই। তখন ত খুউব ছোট ছিলাম।

—আপনার মতে এপার বাংলার সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী কে?

—আমার কাছে সবাই ভাল। সবাই কো-অপারেশন করে। আমিও করি। আসল কথা আমার ওয়েল উয়িশব অনেকেই রয়েছেন।

এবার ও'কে একটা প্রশ্ন করলাম হাসতে হাসতে।

—আগে যখন ছবি করতেন তখন যতটা না খুশি হতেন, এখন স্বাধীন বাংলায় ছবি করে তার চেয়ে বেশি খুশি নন?

—সেটা ত বটেই। এখন অভিনয় করে আনন্দ পাই বেশি। এ পর্যন্ত বলেই কথা সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বলল :

—তবে যুগ বলে কোন কথা নেই। শিল্পী হিসাবে যখনই আমি অভিনয় করি, তখনই সেই মুহূর্তে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করার চেষ্টা করি।

শাবানার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৬৬ সালে নতুন সুর ছায়াছবির নায়ক রহমানের ছোট বোনের ভূমিকায়। তখন ও'র বয়স সবে মাত্র নয়।

কথায় কথায় এক সময় শাবানা বললেন :

—না আমি কোনদিন অভিনয় শেখার সুযোগ পাইনি। অভিনয় করতে করতে নিজেকে তৈরি করেছি মাত্র। আপনাদের পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মত এখানেও সিনেমা শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠা নিশ্চয়ই উচিত। তাতে অভিনয়ের মান আরো উন্নত হবে।

শাবানার অভিনীত ছবিগুলির মাত্র হল—দুটি মন দুটি আশা, ঝড়ের পাখি, দস্যু রাণী, অবুঝ মন, জনতার আদালত, আঁধারে আলো, বধূমাতা কন্যা এবং আরো অনেক।

সত্যি, 'সি ইজ ওনলি একসেপশন্যাল।' এটা আমার কথা নয়। ওপার বাংলার কাহিনী-গীত-রচয়িতা গাজী মাজাহারুল আনোয়ারেরই কথা।

জীবনসংগীত / পরিচালনা : মুস্তাফা মেহমুদ। আনোয়ার হোসেন, রোজী, সুচন্দা ও রাজ্জাক।

বনানী কথাচিত্রের স্বীকৃত চিত্রে নায়িকা শাবানা এবং হাসান ইমাম। পরিচালনা : আজিজুর রহমান। সঙ্গীত : সত্য সাহা

প্রেক্ষাগৃহ

আমাদের নাট্য আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমল পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে যা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তা করেছেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করেই নিজের অন্তরের তাগিদে নাটকের পরে নাটক লিখে গেছেন এবং মাঝে মাঝে তাদের অভিনয়ও করেছেন। প্রথমে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দোতলায় ও বেথুন কলেজে, পার্ক স্ট্রীটে সত্যেন ঠাকুরের বাড়ীতে, পরে নানা উৎসব উপলক্ষে শান্তি-নিকেতনে এবং এরও পরে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সী), নিজের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর (মহর্ষিভবনের) উঠানে, নিউ এম্পায়ার ছায়া সিনেমা ও কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমানে শ্রীসিনেমা) তাঁর অভিনয়ের আসর বসতে দেখেছি। রঙ্গমঞ্চের গঠনে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা গেছে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর উঠানে: কখনও বাংলার পল্লীগ্রামের চণ্ডী মণ্ডপ আবার কখনও সাঁচীর তোরণ ও প্রাচীর সম্মুখস্থ চত্বর হয়ে উঠেছে তাঁর রঙ্গপীঠ। একটি প্রতীকধর্মী পটভূমিকার সামনে সমগ্র নাটক বা নৃত্যনাট্যটিকে মঞ্চস্থ করাই ছিল তাঁর রীতি। নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে যুগরুচির প্রতি কবির তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিল। তাই দেখি, প্রথমে যা ছিল 'রাজা রাণী', কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে তাই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল 'ভৈরবের বলি' এবং বোধ করি, ১৯২৮ সালে মাত্র মূল কাহিনী বজায় রেখে ওরই নতুন রূপ হল 'তপতী'। তেমনই দেখা যায়, 'রাজা'র পরিবর্তিত রূপ 'অরূপ রতন' এবং সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্য রূপ 'শাপমোচন'। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে উপেক্ষা করলেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কবিকে তথা তাঁর রচনাকে দর্শকসম্মুখে পেশ করেছেন ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর 'দিদি' গল্পটিকে 'অকলঙ্ক শশী' নামে মঞ্চস্থ করে। এর পরে ১৯২৫ থেকে পরপর চিরকুমার সভা (প্রজাপতির নির্বন্ধ), গৃহপ্রবেশ, বিসর্জন, শোধবোধ, পরিত্রাণ, শেষরক্ষা (গোড়ায় গলদ), যোগাযোগ প্রভৃতি রবীন্দ্র-রচনাকে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে দর্শক-সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়।

কিন্তু ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বরে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মকাল থেকে শুরু করে ১৯৪৪-এ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক বিজন ভট্টাচার্য প্রণীত 'নবান্ন' অভিনীত হবার আগে পর্যন্ত বাংলা নাটক এবং তার অভিনয় নিয়ে আর যা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা-কিছু অগ্রগতি সমস্তই হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়েই, তার বাইরে নয়। নাটক-পাগল বাঙালী শুধু যে নাট্যাভিনয় দেখতেই ভালোবাসে, তাই নয়, তারা নিজেরাও সুযোগ-সুবিধা পেলেই অভিনয় করতে মেতে ওঠে। জন্মাবধিই দেখে আসছি, কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে সৌখীন নাট্যসমাজ, ড্রামাটিক ক্লাব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখেছি, প্রতিটি ক্লাবই বিশেষ কোনো মঞ্চসফল নাটক নিয়ে অভিনয় করতে উদ্যোগী হতেন এবং তাঁরা অভিনয় করতেন হয় কোনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে, আর নয়ত প্রশস্ত বাড়ীর উঠানে বা কোনও খোলা জায়গায় ভাড়া-করা স্টেজ খাটিয়ে। ঘরের অভ্যন্তর, বাজ দরবার, রাজ-পথ, নদীর ধার, গ্রাম্যপথ, জঙ্গল প্রভৃতি সকল দৃশ্যই থাকত পর্দায় অঙ্কিত এবং সেই সব পর্দা প্রয়োজনানুসারে কপিকলের সাহায্যে ফেলা বা গোটানো হত। আমরা সৌখীন সম্প্রদায় দ্বারা কি শহরে, কি পল্লী-গ্রামে অভিনীত হতে দেখতুম 'প্রফুল্ল', 'চন্দ্র-গুপ্ত', 'সরলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', জনা', সাজাহান, আলিবাবা, জয়দেব বিবাহ-বিভ্রাট, আবু হোসেন প্রভৃতি নাটক ও নাটিকা। এবং নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, সৌখীন অভিনয়ে স্ত্রী ভূমিকাগুলি অলংকৃত করতেন পুরুষেরাই। আজ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, নারীচরিত্রে আমরা এমন কয়েকজন পুরুষকে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখেছি, যাঁরা কি সৌন্দর্যে, কি অভিনয়-

আঁধার পেরিয়ে/শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : তপন সিংহ। ফটো : অমৃত

কুশলতায় সাধারণ মঞ্চের নামকরা অভিনেত্রী-দের অনায়াসেই পরাস্ত করতে পারতেন।

সাধারণ রংগমঞ্চের বাইরে নতুন কোনো অভিনয়ধারার প্রবর্তন বা দৃশ্য-সংস্থাপনায় লক্ষ্য করবার মতো কোনো নতুন পথনির্দেশ আমাদের নজরে না পড়লেও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবার ব্যাপারে কলকাতার দুটি নাট্যসংস্থাকে আমরা মাঝে মাঝে উদ্যোগী হতে দেখেছি। এক, বৌবাজারের 'আনন্দ পরিষদ' এবং দুই, বাগবাজারের শিশির ইনস্টিটিউট। মনে পড়ে, প্রথম সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'কে নাট্যাকারে মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠী বিধায়ক ভট্টাচার্যকে নাট্যকার রূপে নাট্যামোদীদের সামনে উপস্থাপিত করেন।

কিন্তু 'নবান্ন'-এর অভিনয়ই প্রথম দেখাল, নতুন নাটক নিয়ে নতুন অপরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রী নতুন আঙ্গিকে নাটককে মঞ্চস্থ করে অসামান্য জনপ্রিয়তা এবং আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারে। আমরা প্রথম দেখলুম, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরেও অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করা সম্ভব। অবশ্য এর আগে মধু বসু তার 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'-এর বিভিন্ন অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকাগুলি নারীদের দিয়েই অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু তথাকথিত 'ইঙ্গবঙ্গ সমাজের' নারীদের এম্পায়ার মঞ্চে অবতরণকে সাধারণ নাট্যামোদীরা ততটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু তৃপ্তি ভাদুড়ী বা শোভা সেনের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে যখন নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করে 'নবান্ন'-এর সামগ্রিক সাফল্যের অংশীদার হল, তখন আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের সামনে উপার্জনের একটি নতুন পথ খুলে গেল।

কলকাতার তিনটি বা চারটি সাধারণ রঙ্গালয় যখন তাদের নাটক অভিনয়ের জন্যে মাত্র বারবনিতাকুল থেকেই অভিনেত্রী সংগ্রহ করায় অভ্যস্ত, এক-দুই-তিন করে বহুরূপী, লিটল থিয়েটার, শৌভনিক প্রভৃতি নাট্য-সংস্থা জন্মগ্রহণ করল আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকেই নটনৈপুণ্য অভিনেত্রীদের দলস্থ করে। লিটল থিয়েটার উৎপল দত্তর নেতৃত্বে মিনার্ভা মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সৌখীনতা পরিহার করে পেশাদারী বৃত্ত গ্রহণ করল। বহুরূপী মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার মঞ্চ ভাড়া করে সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রী করতে লাগলেন তাঁদের নাট্যা-ভিনয় দেখবার জন্যে। এবং শৌভনিক তাঁদের নিয়মিত নাট্যপ্রদর্শনী শুরু করলেন দক্ষিণ কলকাতায় নবগঠিত 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চে। উৎপল দত্ত তার সম্প্রদায়ের জন্যে নিজেই নাটক রচনা করতে লাগলেন। নাট্যরসিক দর্শকরা দেখল 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'তীর' প্রভৃতি নাটকের সার্থক অভিনয় এবং এই অভিনয়গুলির মাধ্যমে দেখতে পেল, নতুন নতুন মঞ্চআঙ্গিক ও দলগত অভিনয়ের—গ্রুপ অ্যাকটিংয়ের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বহুরূপী মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও 'রাজা', ইবসেনের 'পুতুল খেলা', 'দশচক্র', গ্রীক নাটক 'রাজা ইডিপাউস', বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' প্রভৃতি। এঁদের মঞ্চআঙ্গিক পরিচ্ছন্ন হলেও বিশেষ কোনো নবদিগন্তের ইঙ্গিত বহন করেনি। 'মুক্ত-অঙ্গন'-এর অপরিসর মঞ্চে এক-একটি প্রতীকধর্মী দৃশ্যের পটভূমিকাকে আশ্রয় করে শৌভনিক সম্প্রদায় তাঁদের নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ করতে থাকলেন।

এঁদের দেখাদেখি আরও দল গড়ে উঠতে লাগল। উদ্দেশ্য একই—রথ দেখা এবং কলা বেচা। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, নাটক করার সখ মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা রয়েছে প্রতিটি গোষ্ঠীরই। প্রত্যেকেরই কাছে নাট্যাভিনয় হচ্ছে পথ এবং পাথেয়। আগে যা ছিল 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র সামিল, আজ তাই হয়ে উঠেছে বেশীর ভাগ নাট্যআন্দোলনকারীর কাছেই রুজি-রোজগারের একমাত্র পথ। রাজ-নৈতিক চেতনা যে কারুকে কারুকে নাটক রচনায় ও তাকে মঞ্চস্থ করায় উদ্বুদ্ধ করে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু 'ক্যালকাটা থিয়েটার'এর প্রতিষ্ঠান, নট-নাট্যকার-নাট্য-প্রযোজক বিজন ভট্টাচার্যের মতো আদর্শ-বাদীদের এক আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু বেশীরভাগই তাঁদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছেন টিকিটঘরের দিকে; তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থোপার্জন। এবং এর জন্যে তারা 'ছেড়ে দিলুম পথটা, বদলে ফেললুম রংটা' করতেও পিছপা নন। তাই দেখি, বহু একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে নাটকের মতো নাটক 'কোটিকে গোটিক' এবং তাদের অভিনয়ে না দেখি কোনো নতুন ধারা না মেলে কোনো নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত।

[illegible]

ঠাগনী/পরিচালক তরুণ মজুমদার ও সন্ধ্যা রায়।　　　　ফটো : অমৃত

চিত্রসমালোচনা

তথ্যচিত্র 'নেতাজী'

নেতাজীর জন্মদিন বাঙালীর কাছে একটি অত্যন্ত পুণ্যদিন। তাই তাঁর জন্ম-সপ্তাহের আগেই ২০ জানুয়ারীতে ফিল্মস্ ডিভিসন (পূর্বাঞ্চল) তরুণ চৌধুরী পরিচালিত দু' রীলের তথ্যচিত্র 'নেতাজী'র শুভ মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে একটি আনন্দদায়ক কাজ করেছেন। শ্রীচৌধুরী কৃত ছবিটি নেতাজীর জীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনা সম্পর্কিত স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্রখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত। তারই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে নতুন তোলা নেতাজীর কয়েকটি স্ট্যাচুর চলচ্চিত্র, আই-এন-এর পূর্বভারতীয় রণাঙ্গন কোহিমা অঞ্চলের চলচ্চিত্র প্রভৃতি। 'কংগ্রেস ছাড়বার পরে আমি কি করব', নেতাজীর এই স্মরণীয় উক্তি দিয়ে ছবিটির শুরু। পরে আসে টাইটেল এবং তার পরে নেতাজীর জন্ম থেকে আরম্ভ করে তাঁর আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়া, দেশজননীর ডাকে দেশবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতা ব্রতে আত্মবিসর্জন করা, ১৯৪১-এর সেই স্মরণীয় রাত্রে বাসভবন ত্যাগ ক'রে কাবুলের পথে পাড়ি দেওয়া, জার্মানী পৌঁছে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর আই-এন-এ সৈন্যদল গঠন, সাবমেরিণে ক'রে জাপানে পাড়ি দেওয়া, রাসবিহারী বসু কর্তৃক সুভাষচন্দ্রকে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগের সর্বময় কর্তৃত্ব দান, তাঁর স্বাধীন ভারত-সরকার গঠন ও 'দিল্লী চলো' অভিযান, প্রকৃতির নির্মম বিরুদ্ধতায় সংকল্প সিদ্ধির পথে বাধা ইত্যাদি বহু উত্তেজক প্রকৃত তথ্যসম্ভারে ছবিটি সমৃদ্ধ। প্রথমে ডঃ শিশির বসুর ও পরে বিখ্যাত ভাষ্যকার প্রতাপচন্দ্রের নেপথ্য ভাষণ ছবিটিকে একটি বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছে। এই তথ্য-বহুল 'নেতাজী' ছবিটির প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিবিধ সংবাদ

নকল সোনা : হিমাংশু চক্রবর্তী প্রযোজিত নবজাত প্রোডাকসন্সের নতুন আঙ্গিকের ছবি 'নকল সোনা' খুব শীঘ্রই (এ মাসের মাঝামাঝি) বসুশ্রী বীণা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করবে। বাংলার চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, গীতিকার, সুরকার সংগীত শিল্পী, প্রযোজক ও অন্যান্য কলাকুশলীদের জীবনের প্রতিদিনের হাসিকান্না, ব্যথা বেদনাকে কেন্দ্র করে ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—বহু সফল ছবির পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জী। সুর সৃষ্টি করেছেন নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, শ্যামল মিত্র ও স্বপ্না দাশগুপ্তা। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখার্জী।

চরিত্র চিত্রণে আছেন—বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রায় সকলেই। ছবিটিতে কলাকুশলী, শিল্পী, প্রচারসচিব, সম্পাদক ইত্যাদি প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা স্বনামে এবং স্বীয় চরিত্রে রূপদান করেছেন। বহু বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে এ-ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে —কল্যাণী, পিনাকী সেনগুপ্ত (অপুর সংসার খ্যাত), নবাগতা রূপা চৌধুরী সাবিত্রী চ্যাটার্জি সর্বেন্দ্র, জহর রায় প্রবীন মজুমদার চিন্ময় রায় কৃষ্ণা বসু, জগদীশ মণ্ডল, কাজল মজুমদার, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা, পারিজাত বসু, মণীশ দাশগুপ্ত, শ্যামসুন্দর ঘোষ, নচিকেতা ঘোষ, শ্রীপঞ্চানন, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখার্জি, হিমাংশু চক্রবর্তী, পরিচালক পিনাকী মুখার্জি, পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি, চিত্রগ্রাহক বিজয় ঘোষ, সম্পাদক অমিয় মুখার্জি, তপতী দেবী, বাসন্তী চ্যাটার্জি, মৃণাল মুখার্জি, নব্যেন্দু চ্যাটার্জি, পার্থ মুখার্জি ইত্যাদি সব মিলে প্রায় ১০৮ জনকে দেখা যাবে। মিলি পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান—পদাবলী সংস্থা আসছে ২৪ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় রবীন্দ্র সদনে প্রখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তের সফল ইউরোপ সফরের জন্য এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও পরে তাঁরই মূকাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে নেপথ্যে অংশ গ্রহণ করবেন তাপস সেন (আলো), সুরেশ দত্ত (মঞ্চ), খালেদ চৌধুরী (পোশাক), দীপক চৌধুরী (সংগীত) এবং অনন্ত দাস (রূপসজ্জা)। শ্রীদত্ত এবার কয়েকটি নতুন মূকাভিনয় দেখাবেন।

মল্লিকা : বীরেশ্বর বসু পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শ্রীবসু তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য জরাসন্ধের 'মল্লিকা'র চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। সবিতা চিত্রমের পতাকাতলে ছবিটির চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই সুরু হচ্ছে।

বিধাননগরে ইন্দ্রজাল : গত ২৯ ডিসেম্বর ৭৪তম কংগ্রেস অধিবেশনের শেষ দিন। এই বিশেষ দিনটির সাংস্কৃতিক মঞ্চে অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল যাদুকর মদন কুণ্ডুর ইন্দ্রজাল। হাজার হাজার দর্শক ও প্রতিনিধিদের সামনে শ্রীকুণ্ডু তাঁর দলবলসহ এক আকর্ষণীয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। মদন কুণ্ডু সর্বপ্রথমে যে খেলাটি দেখান সেটি হচ্ছে একটি লেখা থেকে। লেখাটি হঠাৎ একটি পতাকায় পরিণত হয়েই পর মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধীর সহাস্য মুখ দেখা যায়।

এই খেলাটি দেখে দর্শকগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। এরপর মদন কুণ্ডু যে সমস্ত খেলাগুলি দেখান সেগুলিও কম বিস্ময়কর নয়, যেমন স্পুটনিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে তুচ্ছ করে উড়ে যাচ্ছে জীবন্ত একটি মেয়ে হাওয়াতে ভেসে দর্শকদের নমস্কার জানাচ্ছেন ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের শেষে ২২ বছরের যুবক মদন কুণ্ডুর আশ্চর্যজনক ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার দর্শক করতালি দিয়ে যাদুকরকে অভিনন্দন জানান।

তাছাড়া গত ২রা জানুয়ারী মদন কুণ্ডু কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। এখানেও তিনি তাঁর অদ্ভুত ধরনের বিস্ময়কর খেলাগুলি দেখিয়ে সাংবাদিকদের বিস্মিত করে দেন।

বিদেশে যোগেশ দত্তের মূকাভিনয় : ভারতীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত সম্প্রতি বার্লিন, ফ্রান্স, লণ্ডন ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে মূকাভিনয় পরিবেশন করে ভারতীয় মূকাভিনয়ের

ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। বিদেশী সংবাদপত্র ভারতীয় মূকাভিনয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্ছসিত প্রশংসা করে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদত্ত ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের অভিনয় অধ্যায় এবং কথাকলি ও ভারতনাট্যম নৃত্যকে ভারতীয় মূকাভিনয়ের ব্যাকরণ বলে আখ্যা দেন। পাশ্চাত্যের কোন প্রভাবই এর ওপর নাই।

শ্রীদত্তের মূকাভিনয়ের বেশীরভাগ বিষয়বস্তু ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উপর ভিত্তি করে রচিত ও পরিবেশিত। বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মতে শ্রীদত্তের মূকাভিনয়ের মান ফ্রান্সের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূকাভিনেতা মার্শেল মার্সের মূকাভিনয়ের সমতুল্য। একটি বিদেশী সংবাদপত্রের উক্তি : 'সমগ্র বিশ্বে মূকাভিনয় শিল্প হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তার উৎকর্ষে শ্রীদত্তের অবদান অনস্বীকার্য।'

পরলোকে শিল্পনির্দেশক অনুপ কাক্কাড়

থাণ্ডালাতে একটি ছবির কাজ করতে করতে শিল্পনির্দেশক অনুপ, আর, কাক্কাড় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫ ডিসেম্বরে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫২ বছর।

মঞ্চাভিনয়

দুটি সুঅভিনীত একাংকিকা :

কিছুদিন আগে দুটি একাংকিকা বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল থিয়েটার সেণ্টারে। একাংক নাটক দুটি হোল 'ওই ওরা আসে' ও 'পাতা ঝরে যায়'। প্রযোজনা করলেন 'বর্ণচোরা' গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

গতিবেগসমৃদ্ধ প্রথম নাটকটির সংঘাত দুর্বার হয়ে উঠেছে গ্রাম্য পটভূমিকায় এক চাষী, তার স্ত্রী, সুদখোর মহাজন আর ফরেস্টারকে কেন্দ্র করে। ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট জীবন থাকায় নাটকীয় গতিও তীব্রতর হোতে পেরেছে প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই। নাটকটির সংলাপও গভীরতম শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। অভিনয়েও শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখতে পেরেছেন। সুদখোর মহাজন 'পাণ্ডা গড়াই' চরিত্রে চুণীলাল দাশগুপ্ত সুন্দর সপ্রতিভ অভিনয় করেছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ হোল অমল দত্তের 'রাজু'। নাটকটির অন্য দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে ছিলেন চনী ভট্টাচার্য ও আরতি ঘোষ।

পরের নাটক 'পাতা ঝরে যায়' মনস্তত্ত্বের আলোকে লেখা। মূলত তিনটি চিত্রশিল্পীই এই নাটকের গতিবেগে প্রাণ দিয়েছে। এই তিনটি চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন রঞ্জিত মণ্ডল, শম্ভুনাথ সাহা, উৎপল দত্ত। নাটকের অন্যান্য শিল্পীতালিকায় ছিলেন শুভ লাহিড়ী, অধীর ভট্টাচার্য, অঞ্জন বড়ুয়া, ভোলানাথ বিশ্বাস, প্রশান্ত রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন মুখার্জি, আশিস বসু, বুলো ভৌমিক।

ভিক্ষুক : নীতিহীনতা, প্রচণ্ড লোভ ও মানবিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয় আমাদের সমাজজীবনকে একদিকে যেমন আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে, তেমনি অন্যদিকে আমরা চাইছি এই অন্ধকার থেকে আলোর পৃথিবীতে উত্তরণ, যেখানে আমরা আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধে গড়ে উঠতে পারবো। রুদ্রদত্ত রচিত 'ভিক্ষুক' নাটকটি বোধ হয় এই দিকেই ইংগিত দিয়েছে। নাটকটি সমস্যা তুলেই শেষ হয়ে যায়নি সমাধানের বেশ কিছু আভাসও আছে এই নাটকে। জীবনরস সম্বন্ধে এই নাটকটি কিছুদিন আগে 'কালীগঞ্জ শিক্ষাসদন' মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'সাউণ্ড অফ মিউজিক' গোষ্ঠীর শিল্পীরা। প্রয়োগপরিকল্পনায় বেশ কিছু নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন সত্যরঞ্জন বসু।

সুপ্রযোজিত এই নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন গোপাল রায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, শঙ্কর নাগ, দিলীপ সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব গুহ কমল সান্যাল বঙ্কিম বোস, জ্যোতিষ ভৌমিক, কল্যাণী দেব, অসীম চ্যাটার্জি, বিজন মুখার্জি।

ফেরারী ফৌজ : গত ১১ ডিসেম্বর, '৭২ কমার্শিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব (ইস্টার্ন রেলওয়ে, চিৎপুর) তাদের দশম নাট্যার্ঘ্য উপলক্ষে উৎপল দত্তের মঞ্চসফল 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি সুহাস ভট্টাচার্যের দক্ষ পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এদের দলগত সংগতি প্রশংসনীয়। অভিনয়ের বিচারের দিক থেকে হিতেন দাশগুপ্তের চরিত্র-চিত্রণে বলরাম রায় সর্বোত্তম। শ্রীরায়ের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারায় ও বলিষ্ঠ কন্ঠের অভিনয় মাধ্যমে চরিত্রটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। তাকে মানিয়েছেও চরিত্রানুগ। এর পরই উচ্চমানের অভিনয় করেন নারায়ণ গাঙ্গুলী (জ্যোতির্ময়), শৈলেন মজুমদার (যোগীন) ও হরিশঙ্কর চক্রবর্তী (অশোক)। যথাক্রমে বঙ্গবাসী ও রাধা চরিত্রে চিত্র ও মঞ্চখ্যাতা মলিনা দেবী ও নীলিমা দাস স্মরণীয় অভিনয়ে তাদের পূর্ব যশ অক্ষুণ্ণ রাখেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রশংসার দাবী রাখেন— সুহাস চক্রবর্তী, অশ্বিনী ঘোষ, হিরণ্য চ্যাটার্জি, মাখন দত্তচৌধুরী, সরোজ পোদ্দার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সমাজপতি, রবি রায়, মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত, দেবু সান্যাল, হরিপদ পাল ও অধীর কর। রুণু বড়াল স্ত্রী-চরিত্র শচীর ভূমিকায় তার সম্ভাবনাময় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। শ্রীমতী বড়ালের সৃষ্ট শচী, বহুদিন মনে রাখার মত। গোপা চরিত্রে শিশু-শিল্পী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী সুঅভিনয় করে। মুকুন্দ দাস এর চরিত্রে অলোক বাগচী তার কন্ঠসঙ্গীতে দর্শকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হন। আলোর কাজ যথাযথ। মঞ্চ ও আবহসংগীত সুপ্রযুক্ত।

সাজাহান অভিনয়

অ্যালায়েন্স অ্যাসিওরেন্স গ্রুপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান'। বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'সাজাহান'-এর অভিনয় প্রবাদ বাক্যের মতো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাই এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যা বলার দাবি রাখে তা হলো এ'দের অভিনয়। অফিস দলে এরকম শক্তিশালী নাট্য-প্রযোজনা খুব একটা চোখে পড়ে না। সেদিনের অভিনয়ে নাটকের চরিত্রের অন্তর্লীন নির্যাস প্রতিটি দর্শকের অন্তর স্পর্শ করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে

ছত্র সাজাহান চরিত্রাভিনেতা শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। পুত্র স্নেহান্ধ সম্রাটের চরিত্রের এটি একটি সার্থক রূপায়ণ। তাঁর হাঁটা, চলা, কথা বলার ভঙ্গি উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। তারপরেই যার কথা আসে তিনি হলেন শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঔরংজেব চরিত্রে তাঁর অভিনয় সহজ সুন্দর এবং স্বাভাবিক। জয়সিংহ চরিত্রে রাধারমণ ভট্টাচার্যকে ভাল লাগে। কিন্তু নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র দিলদারের ভূমিকায় শ্রীসন্তোষকুমার দাস অত্যন্ত খেলো অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্র যখন অভিনয় কুশলতায় রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে তখন এই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতান্ত নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। এই ত্রুটি বাদ দিলে সাজাহান নাট্য প্রযোজনা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয়ে উল্লেখের দাবি রাখেন সর্বশ্রী অলোক মিত্র, সমীরকুমার হালদার, শ্যামল ঘোষ প্রমুখ।

পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন চলচ্চিত্র-খ্যাত শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল অভিনয় :

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি ও কর্মীদের ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রঙ্গনায় প্রফুল্ল নাটক অভিনয় করেন ২৭ ডিসেম্বর। পরিচালনা করেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। যোগেশের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশের ভূমিকায় হীরেন্দ্রকুমার বসু সুন্দর অভিনয় করেন। অজিত ঘোষ, দেবাশিষ সেন, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ দাশ, সত্যেন রায়চৌধুরী, জয়দেব সাহা, চিত্রিতা মণ্ডল, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, ইরা মিত্র, মেনকা দাসের অভিনয়ও উল্লেখ করবার মত।

২৯ ডিসেম্বর 'পথের দাবী' পরিচালনা করেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। হীরেন্দ্রকুমার বসু, রবীন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, জয়দেব সাহা, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত দাশ, সত্যেন চৌধুরী, রাধাবল্লভ দাশ, বিজয় চক্রবর্তী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা সাহা, ইরা মিত্র, মেনকা দাশের অভিনয় বিশেষ দাগ কেটে যায় দর্শকদের ওপর।

স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ : বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে হালিশহর স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'। পরদিন যুগপূর্তি উৎসবে এই সংস্থার শিল্পীরা আরও মঞ্চস্থ করেন সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রংয়ের দিন'। এদিন নৈহাটীর সপ্তর্ষি নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করেন রতনকুমার ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে'। উভয় দিনের অনুষ্ঠান স্থানীয় দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপের তরফে নাটকগুলি পরিচালনা করেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। উক্ত সংস্থার আয়োজনায় অষ্টম বার্ষিক একাংক নাট্য প্রতিযোগিতাও এবার যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হ'ল। স্থানীয় দর্শকরা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করলেন এ-ধরনের অনুষ্ঠান হালি শহরে কোনদিন হয়নি। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ : সামগ্রিক প্রযোজনায় (১ম) দক্ষিণেশ্বরের 'সৌভিক' এ'রা মঞ্চস্থ করেছিলেন অমল রায়ের 'কেন না মানুষ'। এছাড়া এই সংস্থা আরও যে যে পুরস্কার পান তা হল : শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গৌতম মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা মনোরঞ্জন ঘড়া, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক গৌতম মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির নাট্যকার অমল রায়। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে শিল্পীলোক (ভাটপাড়া) এবং যুগ্মভাবে আদি মৈত্রী সংঘ (নৈহাটী) ও শ্বেতকরবী (কলিকাতা)।

নহবত : সত্য ব্যানার্জির প্রাণচঞ্চল নাটক 'নহবত' সম্প্রতি গ্রীভস কটন রিক্রিয়েশন ক্লাব পরিবেশন করলেন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। হীরালাল ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সুঅভিনীত এই নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন প্রকৃতি সাহু, অতীশ চক্রবর্তী, হীরালাল ভট্টাচার্য, সীতানাথ পাল, অরুণ চক্রবর্তী, সত্যেন দত্ত, দীপক বসু, দীপেন সরকার, প্রণব ঘোষ, রত্না ঘোষাল, গীতা নাগ, অনল সরকার, মানিক ভট্টাচার্য, যুগল পাইন, পরেশ ব্যানার্জি, কানাই পাত্র, তড়িৎ চ্যাটার্জি, সমর পাল, কবিতা সুর।

নীলদর্পণ : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রামাটিক ক্লাব সম্প্রতি 'নীল-দর্পণ' নাটকটির অভিনয় করলেন 'রবীন্দ্রসদনে'। নাটকটির নির্দেশনায় বীরু মুখার্জি অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। প্রধান চরিত্রগুলোতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হোলেন বিভূতি ঘোষ, গৌর শ্রীমানি, সুকুমার মাইতি, পি কে মণ্ডল, কল্যাণী অধিকারী, অনুরাধা গুপ্তা, প্রভাত ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, শাশ্বতী রায়, গীতা কর্মকার।

অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন হরদেব মুখার্জি, নিরঞ্জন দত্ত, দিলীপ রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস, দেবু রায়-চৌধুরী, রমেশ বসুচৌধুরী, বিন্দু মুখার্জি, মঞ্জুশ্রী বসু, অমর ঘোষ, ধ্রুব বিশ্বাস।

পাথরের চোখ : শচীন ভট্টাচার্যের 'পাথরের চোখ' নাটকটি সম্প্রতি 'প্রতাপ' মঞ্চে অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন 'রঙ্গশিল্পী নাট্যগোষ্ঠী'র শিল্পী সদস্যরা। নাটকটি যে পরিবেশনায় সুন্দর হয়ে ওঠে, তার জন্য প্রশংসা যেমন নির্দেশক রবীন কুমার দাবী করতে পারেন, তেমনই তার একই রকম কৃতিত্বের অধিকারী শিল্পীরা।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন বন্দনা বিশ্বাস, প্রভাত মুখার্জি, গণেশ ঘোষ, অমিতাভ মুখার্জি, রবীন কুমার, রাধাকান্ত করণ, দুলাল দে, প্রভাত সরকার, বীরেন দাস, লাহা দাস, অশোক মজুমদার, খোকন মুখার্জি।

যুগলবন্দী—রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর খাঁ

অবিস্মরণীয় যুগলবন্দী

সিংহী পার্ক চলন্তিকা আয়োজিত আলি আকবর ও রবিশঙ্করের যুগলবন্দী সঙ্গীতজগতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ একাধিক।

প্রথমতঃ বহুদিন বাদে এঁদের যুগলবন্দী। দ্বিতীয়ত বহুদিন বাদে সেই প্যাণ্ডেলে এই ধরনের অনুষ্ঠান শোনা গেল, যে প্যাণ্ডেলের অবয়ব। সঙ্গীতের পরিবেশ বিশৃঙ্খল করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রবেশপত্র ক্রেতারা শীতের সন্ধ্যায় পশ্চাৎপটে কোনোরকম ছাউনির অভাবে এবং নম্বরহীন সীটের অবন্দোবস্তে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় চার হাজার দর্শকের প্রবেশের একটিই দ্বার, যা আধহাত করে খুলে এক একজনকে প্রবেশ করানো হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গীতানুরাগীদের পূজার মত নিষ্ঠাকে আর একবার বিস্মিত শ্রদ্ধায় প্রত্যক্ষ করলাম। আর দেখলাম কি অপরিসীম শ্রদ্ধা তাদের আলি আকবর ও রবিশঙ্করের ওপর। তাই এখনকার এই অস্থিরতার যুগেই এই অয়াসসাধ্য পরিবেশকেও এঁরা নীরবে, অবিচলিতচিত্তে মানিয়ে নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন তাঁদের বড় আদরের শিল্পীযুগলের বাজনা শোনবার জন্য। শিল্পীরাও অগণিত ভক্তবৃন্দের যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। অনুপ্রেরিত শিল্পীদের বাজনা মধ্যরাত্রের সীমাকেও অতিক্রম করেছে আর শ্রোতারা উপভোগ করেছে প্রতিটি মুহূর্তের রোমাঞ্চ। কখনও সমুদ্রের ঢেউএর মত কত ছন্দের লয়ের ওঠাপড়া—এই মহাশিল্পীর নানারঙা রাগের ভাষায় কথা বলাবলি। এখনকার সঙ্গীতাসরের শ্রোতাদের জীবনে এমন মুহূর্ত বড় একটা আসে না।

শুরু হোলো 'মারবা' রাগের আলাপ দিয়ে। পরিমিত পরিসরের সীমিত আধারে এঁরা মেলে ধরলেন অসীমের ব্যঞ্জনা। বিলম্বিত অঙ্গের সুরবিস্তারে কখনও একটি কখনও দুটি স্বরের ক্রম-উন্মীলনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রান্তের কখনও অস্ফুট মৃদু অনুরণনে কখনও মন্দ্রস্বরে রাগরূপ আভাসিত হোলো ভারতীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্যের শুদ্ধতায়। জোড়ের অঙ্গে ছন্দ ও সুরের বিন্যাসে উভয়ের কল্পনার বিপুল বিস্তারের ইন্দ্রধনু, যেবা অদ্রামনর যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। ক্লাসিকাল মর্যাদার সঙ্গে রংবাহারের অভিনব সমাবেশ দুই সৃষ্টিধর্মী শিল্পী তাঁদের সঙ্গীতভাবনার মুঠো মুঠো ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিলেন।

ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বছরের পর বছর বিদেশী পরিবেশে বিদেশী শ্রোতাদের মধ্যে থেকেও ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্মুখীন ধ্যানলোকে এক লহমায় পৌঁছে গেলেন কেমন করে? গুরুর আশীর্বাদে? দীর্ঘদিনের অনলস সাধনা? না, বিধিদত্ত অলোকসম্ভব প্রতিভা? হয়ত এতগুলি সম্পদের এই বিরল সমন্বয়েই সঙ্গীতজগতে এঁরা এমন আশ্চর্য অঘটন ঘটাতে পারেন।

জোড়ের অঙ্গে বিদ্যুৎঝলকের মত আলি আকবরের সাপটের উত্তরে রবিশঙ্করের দ্রুত তানের গমক রবিশঙ্করের মন্ত্রের মত নিটোল জমজমার নৃত্যরেশের সঙ্গে সব মিলিয়ে আলি আকবরের অশেষ প্রকাশকুণ্ঠ লাজুক বেদনার রসসিক্ত চাপা আবেগ যে বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে তা যেন রঙিন ধ্বনিরেখার একটি কবিতা। আর নানা পর্বের রূপমাধুর্য সৃষ্টি করেও 'মারবা' রাগের আধ্যাত্মিক মর্যাদা যেন কেন্দ্রীভূত রসের মতই সকল সৌন্দর্যকে এক সংহত গাম্ভীর্যে ভূষিত করেছে। বিশেষ করে রেখাব ধৈবতের প্রাপ্য মিটিয়েও সা'এর সাসপেন্স বজায় রাখা? আর সকলকে চমকে দিয়ে আকস্মিকতায় শ্রোতাদের চিত্তকে দুলিয়ে দিয়ে [illegible]-তারে 'সা'-য় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের হাসি বিনিময়ের মুহূর্তে ওঁদের মনে হয়েছে গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা, স্বপ্নবিহারী যাঁরা বেঁচে থাকেন।

দ্বিতীয় রাগ 'দেশ'। এ রাগে বিরহ-বেদনা আছে কিন্তু সেটা যেন দয়িতের জন্য দয়িতার নয়, বন্ধুর জন্য বন্ধুর। আবেগমধুর আকুলতার তীর্থে দুই শিল্পী-বন্ধু যেন এসে পৌঁছলেন, বহু যুগ বাদে। আর দীর্ঘদিনের অদর্শনের উদ্বেল আর্তি কখনও রেখাব পঞ্চমের গমকে মীড়ের ছন্দে কল্পনায় যে সমরূপ পৌঁছেছিল তা কি কল্পনাতে আনতে পারতাম যদি না সে কল্পলোক সৃষ্টি করে মেলে ধরতেন স্বয়ং আলিরাই? আলি আকবরের এক

একটি 'বাজ' যেন গুহার ভেতর থেকে গমগম করে উঠছিল, সেই নাদধ্বনিকে নানান অলংকারে সাজিয়ে দিলেন রবিশঙ্কর। চোখের সামনে যে রূপ ভেসে উঠল তা শুধু 'দেশ' রাগেরই রূপ নয়,—এ হোলো আলি আকবর রবিশঙ্করের মিলিত শিল্পরূপ, যা সঙ্গীতজ্ঞ বনার স্বর্গচিহ্নিত বরেণ্য মূর্তি। এর পরেই এলেন 'মিশ্র পিলু'-তে ভালবাসায় মধুরতম অধ্যায়ে। এখানে প্রেমিক-প্রেমিকার নানা উচ্ছ্বাসের কত না রংবাহার। কখনও ভাটিয়ারের ধ্যানে বিভোর, কখনও ছায়ানটের নৃত্য-উচ্ছল, কখনও শিবরঞ্জনীর রোমান্স আবার বাহারের নূপুরধ্বনিতে দুই শিল্পী রং ও রসের অফুরণে উৎসবের সীমায় উঠে বিশেষ অনুরোধে সমাপ্ত করলেন 'সিন্ধু ভৈরবী'র সিন্ধু প্রার্থনায়।

আর আল্লা রাখা? দুই শিল্পীর বাঙা হৃদয়কে ছন্দের মেল-বাঁধনে বেঁধে আনন্দবর্ধক পূর্ণ করলেন। তাই বলছিলাম, এমন সার্থক মুহূর্ত শ্রোতাদের জীবনে দুর্লভ।

গাঙ্গুলি কলেজ অফ মিউজিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান: ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ জমে উঠেছিল গাঙ্গুলি কলেজ অফ মিউজিকের বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনের মুখর সুর ও ছন্দে। স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েই অনুষ্ঠান। রস উপভোগ ছাড়াও সঙ্গীতমত্ত কলকাতায় শিল্পীরা তাঁদের শিক্ষা ও সাধনায় কতটা এগিয়ে চলেছেন তারও একটা হিসেবনিকেশ পাওয়া গেল।

প্রথম সন্ধ্যার আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন মণিলাল নাগ। ইনি বাজালেন হেমন্ত। বর্তমান তরুণের গোষ্ঠীর যন্ত্রবাদকদের মধ্যে মণিলাল এর মধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন—শুধু প্রতিভার কারণেই নয়—অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের প্রসাদে ইনি এগিয়ে চলেছেন এক বিশেষ জায়গায় এসে থেমে যান নি। এঁর সম্বন্ধে এইটিই হল পরিবেশনযোগ্য সংবাদ।

সেদিন ইনি বাজান হেমন্ত'। গুরু আলাউদ্দিন সৃষ্ট এই রাগ আলাউদ্দিন ঘরানার সকল বৈশিষ্ট্যেই পরিবেশিত হয়েছে। রাগের ভাবের প্রতি সতর্ক প্রহরা রেখেছেন। এই পরিমিতিবোধেই যথার্থ শিল্পীমনের পরিচয় মুদ্রিত ছিল। আর এই শিল্পবোধকে যথাযোগ্য পথে পরিচালিত করেছে ওস্তাদ কেরামৎ খাঁর তবলা সঙ্গত। আসর সুরু হয় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ দিয়ে। রাগ 'শিবরঞ্জনী'।

[illegible] পরিবেশন করেন শ্রীমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর বিস্তারের অংশ ভাল এবং তৈরী। তবে মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে কণ্ঠের যতটা ওজন আছে ওপরের দিকের বিহারে সে ভারসাম্য ছিল না। এদিকে লক্ষ্য রাখলে যথাযোগ্য মানে পৌঁছতে এঁর দেরী হবে না।

পূরবী মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত 'কেদারা' রাগের খেয়ালে আমীর খাঁর গায়নশৈলীর বিশ্বস্ত নজীর বিদ্যমান ছিল। তবে আর একটু যদি বিস্তারে অনুপ্রবেশ ঘটত এঁর সম্বন্ধে কিছুই বলার থাকত না।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ছিলেন এ রাতের প্রতীক্ষিত শিল্পী। কোশী-কানাড়ায় আলাপ জোড় ঝালা ও গতের প্রতিটি পর্বে গুরু আলাউদ্দিনের বাদনশৈলীর পূর্ণাঙ্গ এবং অনুশীলিত পরিচয় ছাড়াও যে বস্তুটি শ্রোতাদের মন কেড়েছে তা হল শিল্পীর রঙিন মনের আবেগ। অমর দের তবলাসঙ্গতও সুন্দর।

শেষ দিনে কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন রুক্মাবাঈ সেনগুপ্ত। রাগ 'নন্দ'। এঁর রাগ বিশ্লেষণ স্বচ্ছ। কণ্ঠও সুরেলা। শুধু উচ্চগ্রামে আর একটু যদি খোলা আওয়াজ হত। এঁর সঙ্গে তবলাসঙ্গতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন সাধন নন্দ।

শেষ অনুষ্ঠান মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক নৃত্যে শিল্পীর উচ্চমান বজায় ছিল। অমর দের তবলাসঙ্গতে যতীন ভট্টাচার্যের সরোদে 'কোশী-কানাড়া' বেশ জমে উঠেছিল। মুণাম্বর খাঁ মালকোশ পরিবেশনে তাঁর স্ব-মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেহালায় রবীন ঘোষের 'নটভৈরব' আনন্দ দিয়েছে রাগ-জ্ঞান ও যন্ত্র মুন্সিয়ানার যুগ্ম আকর্ষণে। রবীনবাবুর শান্ত মেজাজটি সকল তরুণ শিল্পীর অনুকরণীয়।

শেষ রাতে প্রাজ্ঞ শিল্পী এ কাননের 'ভাটিয়াল' রাগে সঙ্গীত চিন্তা ও পরিবেশনের এক সুষ্ঠু রূপ মেলে

আসরের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্পী শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। তবলায় কেরামতুল্লা খাঁ। রাগ বসন্ত মুখারী। পরিণত মানের চিন্তা দৃপ্ত গম্ভীর বোল কল্পনাসমৃদ্ধ বিস্তার ও তানে শ্যামবাবুর সঙ্গীত সাধনার উজ্জ্বল আলো বিকীরিত হয়েছে।

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করছেন তাঁরা হলেন মনোজ পাল (সরোদ) মীরা মেহতা (সেতার) নির্মলকুমার গাঙ্গুলি (তবলা-লহরা) প্রবীর ভট্টাচার্য চঞ্চল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (তবলা)।

সৌরভের জন্মদিনে:

দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান সৌরভের প্রতিষ্ঠাদিবস পালনোৎসবের উন্মোচন করে শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ বলেন 'মাত্র চার বছরেই সৌরভ' সঙ্গীতমহলে নিজেকে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই নয়, আদরণীয় করে তুলতে পেরেছে। এর মূলে আছে প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপা শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ পরিশ্রম অধ্যবসায় ও অন্তরের বিরাট স্বপ্ন। এঁর সাধনা সফলতার পরিণতির পথে এগিয়ে চলুক, এঁর ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণতায় পৌঁছাক—আজকের দিনে এই আমার প্রার্থনা।'

শ্রীপাহাড়ী সান্যাল তাঁর আনন্দোচ্ছল ভাষণে সভায় যেন প্রাণের জোয়ার প্রবাহিত করেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠান সুরু হয় ললিতা ঘোষের গান দিয়ে। গানে কোন বিশেষ ম্যানারিজম ছিল না। ছিল না সাধ্যের অতীত কোন অসম্ভব কঠিন কারিগরী দেখাবার স্থূল ওস্তাদিয়ানা। সহজ, সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে পরিবেশিত ভজন, গীত ও দাদরা সুরেলা কণ্ঠের অনুরণনে এক মনোহর পরিবেশ রচনা করে। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের তবলাসঙ্গত ছিল এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

পরের অনুষ্ঠান যন্ত্রসঙ্গীতের। শিল্পী কল্যাণী রায়।

ঠিক এই সময়েই আসরে প্রবেশ করেন জাপানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা। টেপ-রেকর্ডের আধুনিকতম মডেল নিয়ে হেড-ফোন কানে দিয়ে একাধারে এঁদের অনুষ্ঠান রেকর্ড করা ও তারিফ করা দেখবার মত।

কল্যাণী রায় সুরু করেন 'কাফি-কানাড়া' দিয়ে। কাফির শান্ত মাধুর্য কানাড়ার গাম্ভীর্যের স্পর্শে যে সংহত রূপলোকে পৌঁছেছিল তার মধ্যে শুধু শিল্পীর হাতের কারুকৃতিই নয় গভীর-বোধের ছাপটিও ছিল বলেই সকলের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছে।

দ্বিতীয় রাগ 'পিলু'। এনায়েৎ খাঁর ঘরানার সেই পুরাতন বন্দেজ অতীতের পর্দা টেনে মজলিসী আসরের ছবিখানি যেন দর্শকের চোখের সামনে মেলে ধরে।

বিশেষ অনুরোধে ইনি একটি লোক-সংগীতের মিষ্টি ধুন বাজিয়ে আসর সমাপ্ত করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জ্ঞানবাবুর সুযোগ্য শিষ্য তরুণ তবলাবাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে এই প্রথম নামী শিল্পীর সঙ্গে বাজাবার সুযোগ দেওয়া আর অনিন্দ্য এ সুযোগের অপব্যবহার করেন নি এইটেই পরিবেশনযোগ্য সংবাদ। আগের চেয়ে তার বোল আরো সুস্পষ্ট। কানীর কাজে সুখের ছোঁয়াও লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় দিনে ছিল প্রধানতঃ শিশু উৎসব। নমিতা চট্টোপাধ্যায় ও দীপালী রায়ের নৃত্যপরিচালনায় শিশুদের নাচ-গুলি বড়দের চিত্তও আনন্দে নাচিয়ে দিয়েছে। নৃত্যের বিষয় ছিল সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের 'গন্ধবিচার', 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার' 'ফেরী-ওয়ালা'। শিশুরা প্রকৃতির সবচেয়ে কাছের। তাই আনন্দ হাসি উল্লাসে তাদের সাড়া দেওয়ায় সহজ সুন্দর রূপটি প্রকাশ পায়। প্রায় প্রতিটি শিশুশিল্পীর ভঙ্গীর সাবলীলতা আনন্দ ছড়িয়েছে

উপরি পাওনা হিসাবে শোনা গেছে, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কণ্ঠের ছড়াগান।

জ্ঞানবাবু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নানান ক্ষেত্রে পারদর্শী স্থানীয়। কিন্তু ছড়াগান ও কৌতুকগীতিতেও তাঁর শিশুসুলভ অভিব্যক্তি এমন মনোরম এ খবর অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি না সেদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর গান শোনার সুযোগ ঘটত। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এই দিকটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সৌরভের কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ। —চিত্রাঙ্গদা

স্বাধীন ভারতের খেলাধুলা

কমল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাধীনতা অর্জনের পর পঁচিশ বছর পূর্তির লগ্নে ক্রীড়ামোদী জনগণের মনে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি জাগে, তা হলো, এই পঁচিশ বছরে খেলাধুলোর আসরে ভারত কতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছে ? অস্বীকার করবার উপায় নেই, খেলাধুলোর জগতে এই পঁচিশ বছরে আমাদের অগ্রগতির ক্ষেত্র সীমিত; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা উত্তর পঁচিশ বছরের খেলাধুলোর ইতিহাসের অনেকখানিই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। উত্থানের ক্ষেত্র সীমিত, পতনের ক্ষেত্র সেই তুলনায় ব্যাপক। পঁচিশ বছর আগে বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে যে সব দেশ ছিল পিছনের সারিতে, দ্রুত উন্নতির সোপান বেয়ে তারা আজ আমাদের নাগালের বাইরে এগিয়ে গিয়েছে। এই সব দেশের চোখ-ধাঁধানো অগ্রগতির আলোকে ভারতের ক্ষীণ অগ্রগতি চোখেই পড়ে না।

ভারতে অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় দল সর্ব প্রথম অলিম্পিক আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দু' দুটি পেনাল্টীর সুযোগ অপচয়ের ফলে ফ্রান্সের কাছে ১—২ গোলে পরাজিত হলেও ভারতীয় ফুটবলের মান সম্বন্ধে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ভারত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক আমাদের হাতছাড়া হয়। ভারত শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থান পায়। ১৯৬০ সালে ভারত প্রথম রাউন্ডেই পরাজিত হয়। এবং পরবর্তী তিনটি অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল পর্যায়েই উঠতে পারেনি।

এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত ১৯৫১ এবং ১৯৬২ সালে বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৬২ সালে প্রতিকূল পরিবেশে ভারতের জয় নিঃসন্দেহে কৃতিত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৯৬৬ সালের পর থেকে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারত কোন ক্রমেই এঁটে উঠতে পারেনি। ব্রহ্মদেশ বিগত দুটি এশিয়ান গেমসের ফুটবল চ্যাম্পিয়ন। এই ব্রহ্মদেশের কাছে ০—৯ গোলে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ফুটবলের আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের মাথা কাটা গেছে।

পূর্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ফুটবলে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, তাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইস্রায়েল যেখানে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, সেখানে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি পিছনের সারিতে। অথচ ফুটবল নিয়ে কী মাতামাতি এবং হৈ-হুল্লোড়-ই না হয় আমাদের দেশে।

আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী ৯০ মিনিটের খেলা, বুট পরা আবশ্যিক করার ফলে আমাদের নিজস্ব ক্রীড়ারীতি পাল্টাতে হয়েছে, এ-কথা সত্যি। কিন্তু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলাই প্রত্যাশিত। সেই সূত্রেই চার ব্যাক প্রথা এবং অন্যান্য পরীক্ষা -নিরীক্ষা। কিন্তু টেকনিকই তো সব নয়। দলগত সংহতি এবং গোলে শট নেওয়ার ব্যাপারে দুর্বলতার সংক্রামক ব্যাধি থেকে কি আমাদের পরিত্রাণ নেই ?

বিশ্ব হকিতে ভারতের দীর্ঘ বত্রিশ বছরের একাধিপত্য খর্ব হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছরে, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কেনিয়া, উগান্ডা, পোল্যান্ড—প্রতিটি দেশ অক্লান্ত অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মূলধন নিয়ে হকিতে প্রভূত উন্নতি করেছে। তা'ছাড়া ভারত-দেহের বিচ্ছিন্ন অংশ পাকিস্তান হকিতে ভারতের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে (০—১) ভারতের পরাজয়ের ফলে হকির স্বর্ণ পদক প্রথম হাত ছাড়া হয়। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে গ্রুপের খেলায় জার্মাণী ও স্পেনের সঙ্গে ড্র করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ভারত হকির হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেছিল। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে গ্রুপের খেলায় নিউজীল্যান্ডের কাছে পরাজিত এবং স্পেনের সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত রাখলেও ভারত সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়। কিন্তু সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে (১—২) পরাজিত হওয়ায় সোনা বা রূপো কোনোটাই ভারতের ভাগ্যে জোটে নি। তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই ভারতকে ফিরে আসতে হয়।

১৯৭১ সালে স্পেনে বার্সিলোনা শহরে প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার আসরেও সেমি-ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের ফলে ভারত তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১৯৭২ সালে মিউনিক অলিম্পিকে গ্রুপ খেলায় হল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং কেনিয়ার সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত হলেও ভারত সেমিফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু এবারেও পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের ফলে ভারতের স্বর্ণ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়। আর পাকিস্তানকে পরাজিত করে সর্ব প্রথম ইউরোপীয় দেশ পশ্চিম জার্মানী হকির স্বর্ণ পদক বিজয়ী হয়। হল্যান্ডকে পরাজিত করে ভারত তৃতীয় স্থান লাভ করে। অর্থাৎ, সোনা গেলো, রূপো গেলো, আমরা আজ ব্রোঞ্জে এসে ঠেকেছি। অদূর ভবিষ্যতে তা-ও বুঝি যায়-যায়। আর আমাদের তুলনায় অন্যান্য দেশ কতখানি এগিয়ে এসেছে, একবার চিন্তা করুন।

খেলাধুলোর অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের ফলাফল আশাপ্রদ নয়। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে কুস্তির আসরে ভারতীয় মল্লবীর কে ডি যাদব সর্বপ্রথম ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী হন। অলিম্পিকে হকির বাইরে সেই আমাদের প্রথম পদক প্রাপ্তি।

১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে অ্যাথলেট মিলখা সিং, 'উড়ন্ত শিখ' নামে যাঁর পরিচিতি, ৪০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করলেও, তাঁর স্থান ছিলো চতুর্থ। টোকিও অলিম্পিকে গুরবচন ১১০ মিটার হার্ডলস রেসে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। অ্যাথলেটিকসে ভারতের উল্লেখ করার মত আর কোনো নজীর নেই।

অলিম্পিক মুষ্টিযুদ্ধে ১৯৪৮, ১৯৫২ এবং ১৯৭২ এই তিনবার ভারত অংশ গ্রহণ করে। মিউনিকে মুনাস্বামী ভেনু, যিনি ১৯৭০ সালে এশিয়ান গেমসে রৌপ্য পদক জয় করেছিলেন, কোয়ার্টার ফাইনালে পয়েন্টে পরাজিত হন। ভারতীয় হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলেন। তেহরাণে অনুষ্ঠিত পঞ্চম এশীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় (১৯৭১) স্বর্ণ পদকের অধিকারী নারায়ণান এবং মেহতাব সিং-ও পয়েন্টে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন।

এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমস মিলিয়ে ভারত এপর্যন্ত ৯২টি পদক (৩২টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য এবং ৩৩টি

(ব্রোঞ্জ) বিজয়ী হয়েছে। ১৯৫৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মল্লবীরদের অর্জিত পদকের সংখ্যা ৫৪ (১৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য এবং ২৫টি ব্রোঞ্জ) এবং মুষ্টিযোদ্ধারা এনেছেন ১১টি পদক (৫টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য এবং দুটি ব্রোঞ্জ)। যদিও এশিয়ান গেমসের অ্যাথলেটিকসে আমাদের স্থান জাপানের পরে, কিন্তু পদক বিজয়ের হিসেব খতিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, জাপানের থেকে আমাদের পদক সংখ্যা অনেক কম।

মাটি যতই উর্বর হোক না কেন, নিয়মিত চাষ না করলে প্রত্যাশিত ফসলের আশা করা বৃথা। আমাদের বিশাল দেশে ক্রীড়া প্রতিভার অভাব নেই। অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিয়ে, কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী না হলে, আগামী দিনের সারথিদের তৈরী করতে হবে। এতদিন কাগজে-কলমে পরিকল্পনা হয়েছে ভূরি ভূরি; টাকাও খরচ হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ হয় নি কিছুই। স্কুল কলেজে ছাত্রদের মধ্যে খেলাধুলোয় আন্তরিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে, অনধিক সতের বছরের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতা আরো বাড়াতে হবে। জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্র যেখানে প্রতি বছর একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে, সেখানে আমাদের দেশে ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমস এবং ১৯৬৭র বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। বিষয়টি শুধু দুঃখেরই নয়, লজ্জারও। টোকিও-তে অলিম্পিকের মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের পক্ষে যা স্বপ্নেরও অতীত। এই সমস্ত প্রতিযোগিতার সূত্রে তাদের দেশে স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, জিমন্যাসিয়াম গড়ে উঠেছে এবং খেলাধুলোর মানও উন্নত হয়েছে।

এই পঁচিশ বছরে আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় টেনিস স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রিটিশ [illegible] [illegible] কোন খেলোয়াড় উইম্বলডনের সেমি ফাইনালে উঠতে পারেন নি। একমাত্র কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন গউস মহম্মদ। ১৯৫০ সালে উইম্বলডন প্রতিযোগিতার খেলোয়াড়দের ক্রম-তালিকার পঞ্চদশ স্থানে ছিলেন দিলীপ বসু। কিন্তু স্বাধীনতার পর রমানাথন কৃষ্ণান পরপর দুবার উইম্বলডনের সেমি ফাইনালে খেলেছেন। কৃষ্ণান ভারতীয় টেনিসের গৌরবোজ্জ্বল যুগের স্রষ্টা। তিনিই আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপের আসরে ভারতীয় টেনিস শক্তির বার্তাবহ। ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে ডেভিস কাপের সেমিফাইনালে পরাজিত হলেও ১৯৬৬ সালে ব্রাজিলকে পরাজিত করে মেলবোর্নে সর্বপ্রথম ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারত রানার্স আপ হয়েছিল। টেনিসে জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল, আখতার আলিও যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। কৃষ্ণান-জয়দীপের যুগ শেষ হয়েছে; এখন নবীনদের পালা। এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন না করলেও এঁদের ঘিরে আমাদের প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়।

ব্যাডমিন্টনে ত্রিলোকনাথ শেঠ, নন্দু নাটেকার, সুরেশ গোয়েল, পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে খ্যাতি অর্জন করেছেন, টমাস কাপে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা ব্যাডমিন্টনে আবার পিছিয়ে পড়েছি। জাপান অনেক দেরীতে ব্যাডমিন্টনের আসরে অনুপ্রবেশ করে আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে।

বিলিয়ার্ডের আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন উইলসন জোনস। ১৯৫৮ এবং ১৯৬৪ সালে তিনি বিলিয়ার্ডের বিশ্ব খেতাব বিজয়ী। সাম্প্রতিককালে মাইকেল ফেরেরা, শ্যাম সরোফ এবং সতীশ মোহন বিলিয়ার্ডে বিশ্ব মানে পৌঁছতে পেরেছেন।

[illegible] [illegible] বিশ্ব আসরে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন [illegible] কর্নেল সিং।

বাস্কেটবল, সাইক্লিং, ভলিবল, জিমন্যাসটিকস, সাঁতার, টেবিল টেনিসে আমরা এখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো কীর্তির অধিকারী হতে পারিনি।

স্বাধীনতার পরবর্তী পঁচিশ বছরে ক্রিকেটে ভারতের অগ্রগতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৭১ সালে ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

স্বাধীনতা লাভের আগে (১৯৩২-৪৬) সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতবর্ষ তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চারটি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলে প্রতিটি সিরিজেই হেরেছিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই চারটি টেস্ট সিরিজের দশটি খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল : জয় ০, হার ৬ এবং ড্র চার।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ বিগত পঁচিশ বছরে (১৯৪৫—৭১) ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড—এই পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট যে ছাব্বিশটি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় সাত, হার তের এবং ড্র ছয়। এই ২৬টি সরকারী টেস্ট সিরিজের ১১৪টি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার ফলাফল : জয় ১৭, হার ৪৩ এবং ড্র ৫৪।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের সাতটি 'রাবার' জয় : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এক এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে এক। অপরদিকে ভারতবর্ষের সতেরটি টেস্ট খেলায় জয় : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এক, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সাত এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই।

দর্শক

ডুর্যান্ড কাপ ফাইনাল

১৯৭২ সালের ডুর্যান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায় এবং দ্বিতীয় দিনের খেলার ৭৭ মিনিটে একটা বল মাটিতে আছাড় খেয়ে এস ব্যানার্জির হাতে লাগলে রেফারী পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেন তা থেকে বিজয়ী দলের জয়সূচক গোলটি করেন। দ্বিতীয় দিনে উভয় দলই বেশী রকম রক্ষণাত্মক খেলায় আত্মনিয়োগ করায় খেলা উন্নত পর্যায়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া উভয় দলের কয়েকজন খেলোয়াড় চড়া মেজাজে খেলে মাঠের পরিবেশ দূষিত করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান উভয়ই দশবার করে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে খেলে ডুরান্ড কাপ পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৭ বার এবং মোহনবাগান ৬ বার। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে চারবার। এই চারবারের ফলাফল : ১৯৬০ সালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যুগ্ম বিজয়ী, ১৯৬৪ সালে মোহনবাগান এবং ১৯৭০ ও ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল বিজয়ী।

আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস

দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত একাদশ আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলা ১৪৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রথম স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে উড়িষ্যা (১৩৬ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান বিহার (৯৫ পয়েন্ট)। প্রতিযোগিতায় কেবালার অষ্টাদশী কলেজ-ছাত্রী নানী রাধা সর্বাধিক পদক জয়ী হয়েছেন—স্বর্ণ ৩ এবং ব্রোঞ্জ ২। এবারের আসরে নতুন আন্তঃ রাজ্য রেকর্ড হয়েছে মোট ১৯টি এবং এরই মধ্যে আছে নতুন জাতীয় রেকর্ড মাত্র ১টি এবং আগের জাতীয় রেকর্ডের সমান রেকর্ড ১টি। কুমারী নানী রাধা ২০০ মিটার দৌড় ২৫.১ সেকেণ্ডে শেষ করে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই ১০০ মিটার দৌড় ১২.২ সেকেণ্ডে শেষ করে আগের জাতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেন।

এবারের অনুষ্ঠানে ১৯টি আন্তঃ রাজ্য রেকর্ড এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : পুরুষ-বিভাগে ২টি, মহিলা বিভাগে ৪টি, বালক বিভাগে ১১টি এবং বালিকা বিভাগে ২টি।

পদক জয়ের খতিয়ান
(প্রথম চারটি রাজ্য)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
পশ্চিমবাংলা	১৫	১৩	১৬	৪৪
উড়িষ্যা	১৬	১৩	১১	৪০
বিহার	১০	১০	৫	২৫
মহীশূর	৯	১১	৫	২৫

টসের ফলাফল পরীক্ষা : ভারতের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার এবং [illegible] অধিনায়ক টনি লুইস (ডানদিকে)

ভারত সফরে এম সি সি

বাঙ্গালোরে আয়োজিত এম সি সি বনাম দক্ষিণাঞ্চলের তিনদিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এই খেলায় চারটি সেঞ্চুরী হয় : এম সি সির পক্ষে নট (১৫৬) এবং ফ্লেচার (নটআউট ১০০)। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলের পক্ষে মনসুর আলি (নটআউট ১০০) এবং জয়ন্তীলাল (নটআউট ১০৩)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণাঞ্চল : ২৭৪ (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ। মনসুর আলি নটআউট ১০০ এবং প্যাটেল ৯৩ রান। কোট্টাম ৫০ রানে ২ এবং বার্কেনশ ৭২ রানে ২ উইঃ।)
ও ২১৪ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেঃ। জয়ন্তীলাল নটআউট ১০৩ রান। বার্কেনশ ৪৫ রানে ২ এবং গিফোর্ড ২৫ রানে ২ উইকেট)

এম সি সি : ২৯৯ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেঃ। নট ১৫৬ এবং ফ্লেচার নটআউট ১০০ রান। আবিদ আলি ৭১ রানে ২ এবং ভেঙ্কট ১০৬ রানে ২ উইকেট)
ও ১০৪ রান (১ উইকেটে। উড ৪৩ এবং অ্যামিস নটআউট ৫১ রান)

অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্থান

সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া [illegible] রানে জিতে ১৯৭৩ সালের টেস্ট সি[illegible] ৩—০ খেলায় 'রাবার' জয়ী

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে পাকিস্তানেরই জয়লাভের সম্ভাবনা বেশ আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় চরম ব্যর্থতার জন্য তারা জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান মাত্র একবার জিতেছে (১৯৫৬-৫৭ সালে করাচিতে ৯ উইকেটে)।

পাকিস্তানের অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমেই ব্যাট করতে পাঠিয়ে বিশেষ ভালো করেননি। পাকিস্তানী খেলোয়াড়রা অনুকূল উইকেট পেয়েও অস্ট্রেলিয়াকে কাবু করতে পারেননি। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া হেসে-খেলে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ৩০৬ রান সংগ্রহ করেছিল। উল্লেখযোগ্য রান—আয়ান রেডপাথের ৭১ এবং রস এডওয়ার্ডসের নটআউট ৬৯।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৩৪ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন অস্ট্রেলিয়া তাদের ১ম ইনিংসের বাকি পাঁচটা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ৩০৬ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ২৮ রান যোগ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে পাকিস্তান তাদের ১ম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২৫০ রান সংগ্রহ করে—অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩৩৪ রানের থেকে ৮৪ রান কম। লাঞ্চের পরই পাকিস্তানের খেলায় ভাঙন ধরে—৭৫ রানের মধ্যে ৫টে উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দলের এই ভাঙন ঠেকিয়ে রাখেন ৫ম উইকেট জুটি মুস্তাক মহম্মদ এবং আসিফ ইকবাল। এই ৫ম উইকেট জুটি এই দিন দলের অতি মূল্যবান ১৯০ রান তুলে অপরাজিত থাকেন—মুস্তাক নট-আউট ৬১ রান এবং ইকবাল নট-আউট ৪৭ রান।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩৬০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৬ রানে এগিয়ে যায়। এই দিনের খেলায় পাকিস্তান তাদের শেষ ৬টা উইকেটের বিনিময়ে পূর্বদিনের ২৫০ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ১১০ রান যোগ করেছিল। রাত্রিতে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আগে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। মুস্তাক মহম্মদ ১২১ রান করেন—টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এটি চতুর্থ সেঞ্চুরী এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম। এখানে উল্লেখ্য, তাঁরা চার ভাই মিলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এইভাবে ১৯টি সেঞ্চুরী করেছেন: হানিফ ১২টি মুস্তাক ৪টি, উজীর ২টি এবং সাদিক ১টি। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই পরিবারের চার ভাই একত্রে ১৯টি সেঞ্চুরী করেছে এমন দ্বিতীয় নজির নেই।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—তাদের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ৯৪ রান উঠেছিল। খেলার এই অবস্থায় পাকিস্তানের জয়লাভের সম্ভাবনাই খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে হিসাব নিয়ে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের তিনটে উইকেট হাতে জমা রেখে মাত্র ৬৮ রানে এগিয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানের হাতে আছে ২য় ইনিংসের পুরো খেলা এবং খেলার দুদিন সময়। সুতরাং খেলার গতি তখন পাকিস্তানেরই অনুকূলে।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ১৮৪ রানের মাথায় শেষ হয়। চতুর্থ দিনে মাত্র ৭ রান যোগ হলে অর্থাৎ দলের ১০১ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার এই অন্তিমকালে ৯ম উইকেট জুটি বব ম্যাসী এবং ... জন ওয়াকার খেলতে নেমে ... দাঁড়িয়ে দেন। তাঁরা ১৫০ ... উইকেট জুটিতে মূল্যবান ... রান যোগ করেন। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১৮৪ রানের মাথায় শেষ দুটো উইকেট (৯ম ও ১০ম) পড়ে যায়। ম্যাসী ৪২ রান করে আউট হন। এর আগে টেস্ট খেলার এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রান ছিল ১৮।

পাকিস্তান খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫৯ রান তুলতে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৪৮ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে পাকিস্তান যখন অসমাপ্ত ২য় ইনিংস খেলতে নামে তখন তাদের জয়লাভের জন্যে আর ১১১ রানের দরকার ছিল। হাতে জমা ছিল ৮টা উইকেট। পাকিস্তান কিন্তু জয়লাভে এরকম একটা সুন্দর সুযোগ হাতছাড়া করে। অস্ট্রেলিয়ার কড়া বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের দুর্গ ভেদ করে পাকিস্তান বিজয়-মঞ্চে পৌঁছতে পারেনি। পাকিস্তানের ২য় ইনিংস ১০৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫২ রানে হেরে যায়। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের এই ১০৬ রান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড।

অস্ট্রেলিয়ার এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভের সমস্ত কৃতিত্ব তাদের দুই পেস বোলার ওয়াকার এবং লিলির। ওয়াকার ১৫ রানে ৬টা এবং লিলি ৬৮ রানে ৩টে উইকেট পান। ওয়াকার তাঁর শেষ ৫টা উইকেট পান ৩০টা বল দিয়ে মাত্র ... রানের বিনিময়ে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া: ৩৩৪ রান (রেডপাথ ৭১ এবং এডওয়ার্ডস ৬৯ রান। সেলিম আলতাফ ৭১ রানে ৩ এবং সরফরাজ নওয়াজ ৫৩ রানে ৪ উইকেট)

ও ১৮৪ রান (বব ম্যাসী ৪২ রান। সেলিম আলতাফ ৬০ রানে ৪ এবং সরফরাজ নওয়াজ ৫৬ রানে ৪ উইকেট)

পাকিস্তান: ৩৬০ রান (মুস্তাক মহম্মদ ১২১, নাসিমুল গনি ৬৪ এবং আসিফ ইকবাল ৬৫ রান। ম্যাসী ১২৩ রানে ৩ এবং গ্রেগ চ্যাপেল ৬১ রানে ... উইকেট)

ও ১০৬ রান (জাহির আব্বাস ৪৭ রান। ওয়াকার ১৫ রানে ৬ এবং লিলি ... রানে ৩ উইকেট)

অমৃত পাবলিশার্স ... লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসনৎপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে ... ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১·০৪
ষাণ্মাসিক	টাকা ০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

Friday 26th January, 1973 শুক্রবার, ১২ মাঘ, ১৩৭৯

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ

যুগান্তর পৌষ সংখ্যা অমৃতে 'পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়েছিলাম। নিবন্ধটি কথামৃতক এবং ভ্রমণেচ্ছুদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। এই লেখাটির কাছে এই আশা রয়েছে বলেই এর সামান্যতম ঘাটতিও আমাকে বেদনা দিয়েছে।

সরকারী চাকরী নিয়ে আমি প্রায় তিন বছর দার্জিলিঙে কাটিয়েছি। তাই এর সঙ্গে সম্যক পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। লেখক যথাযথভাবে দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, কার্সিয়াং প্রভৃতি শৈলশহরগুলোর পরিচয় সেখানে যাওয়া এবং থাকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধের কথা সবই তুলে ধরেছেন। এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ভ্রমণকারীদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই নিবন্ধটি লেখা হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয় এই নিবন্ধে টঙলু, সন্দকফু ও ফালুট-এর নাম একবারও উল্লেখিত হয়নি।

অথচ এই তিনটি জায়গা সাধারণ ভ্রমণকারীদের কাছে নিঃসন্দেহে নতুন! এবং টুরিস্টদের কাছে এর গুরুত্বও অপরিসীম। দার্জিলিঙ থেকে রওনা হয়ে সুখিয়াপোখরি পেরিয়ে মানেভঞ্জং চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে টঙলুর দিকে তাকালে আপনার বুকটা হয়ত কাঁপবে মাথাটা ঝিমঝিম করবে (যদি আপনি নতুন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে থাকেন)। খাড়া পাহাড়ের গায়ে সাপের মত আঁকাবাঁকা সরু রাস্তার উপর চলমান পিঁপড়ের মত ছোট ল্যান্ড-রোভারগুলোকে দেখে আপনমনেই হয়ত বলে উঠবেন, গাড়ীগুলো একুনি পড়ে যাবে না তো! পরিবেশে হবেন রোমাঞ্চিত। কিন্তু সমস্ত আশঙ্কাকে নিজেকে উপেক্ষা করে আপনি যখন স্বচ্ছন্দে টঙলু গিয়ে পৌঁছুবেন তখন আপনার আনন্দ দেখে কে! পি-ডবলু-ডি ইন্সপেকশন বাংলো বা ইয়ুথ হোস্টেলে আশ্রয় নিতে পারেন। অবশ্য ইয়ুথ হোস্টেলকে আরো আধুনিকী-করণের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলোর বাইরে এসে প্রথমে [illegible] চোখে পড়বে অপেক্ষাকৃত নীচু [illegible] অঞ্চলগুলো। এক দিকের [illegible] অবাধ জলরাশির [illegible] ঐ অদূরে দার্জিলিঙ শহর একটা দ্বীপের মত ভেসে রয়েছে। ওদিকে তাকান পশ্চিম, কাঞ্চনজঙ্ঘা সিস্টার্স, এভারেস্ট রেঞ্জ রূপোর [illegible] মত জ্বলজ্বল করছে। এ কি বিস্ময়!

আবার চড়াই-উৎরাই রাস্তা। মুহূর্তে মুহূর্তে মনে হবে কোনো দুর্ঘটনা হবে না তো। অথচ বিশ্বাস করুন দুর্ঘটনার কোনো নজীর আমার জানা নেই। বরঞ্চ প্রতি পদের সেই ভয়কে জয় করার পর প্রতি মুহূর্তে সে কি দুর্লভ আনন্দ! পথেই পাবেন কালপুকুরি। এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারুন। কোন মতেই ডুবে যাবে না। আসলে জলের উপরিভাগ বরফ হয়ে গেছে; নীচে রয়েছে জল। তারপরও বেশ খানিকটা রোমাঞ্চকর অভিযানের পর সন্দকফু। বাংলো ইয়ুথ হোস্টেল—সবই রয়েছে।

সেবার সন্দকফু গিয়ে পৌঁছুলে সেই ঠাণ্ডাতেও ভীষণ জলের তেষ্টা পেয়েছিল। বাংলোর বেয়ারার কাছে জল চাইলে সে ঝুড়ি করে এক টুকরো বরফ নিয়ে এলো। তারপর রসিকতা করে বললো বাবু, আপনারা জল আনতে যান কলসী করে; আর আমরা জল আনি ঝুড়ি করে। এ এক আজব জায়গা। সত্যি গিয়ে দেখি, পাহাড়িয়া ঝরণা দুরন্তবেগে জলপ্রপাতের ভঙ্গীতে নীচে নামতে গিয়ে একটুকরো বিরাট বরফের থামের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলের ঢেউয়ের প্রতিটি ভাঁজ বরফের টুকরোর গায়ে গায়ে আঁকা। এ যেন কোনো মহৎ শিল্পীর সৃষ্টি। এ কি রোমাঞ্চ! এ কি কখনো ভোলা যায়!

বাইরের দিক একটিবার তাকিয়ে দেখুন দিগন্ত অবধি বিস্তীর্ণ সমস্ত জায়গাটাতে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রডোডেন্ড্রনের আমন্ত্রণ সমস্ত পর্বতমালা জুড়ে। বিকেলবেলা তাই দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে পায়চারী করছিলাম। পেছন থেকে শব্দ শুনতে পেলাম ডক্টর, ওভাবে ফুলগুলোকে মাড়িয়ে যাবেন না। থমকে গিয়ে পায়ের দিকে তাকাতেই দেখি, অসংখ্য নাম-না-জানা ফুল পায়ের নীচে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু একি পা রাখবো কোথায়! চারিদিকে যে ফুলের চাদর পাতা। অনেকদিন আগে পড়া ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের একটি লাইন মনে পড়লো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বর্ডার পুলিশের সেই লোকটা আমার অবস্থা দেখে হাসছে।

সানরাইজ! সন্দকফু থেকে সূর্যোদয় দেখা! তার বর্ণনা দেবো, এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। সে শুধু দেখা যায়, বোঝা যায়, আনন্দরসে ডুবিয়ে স্মৃতির খাঁচায় তুলে রাখা যায়—জীবনের এক অবর্ণনীয় স্মৃতিসুধা হিসেবে। শুধু এটুকু বলতে পারি—যারা সন্দকফু থেকে সূর্যোদয় দেখেছে তারা টাইগার হিল বা ডেলস্ ক্লিপ নিয়ে লাফালাফি করবে না।

আর ফালুট! তখনো আমি ফালুট যাইনি। আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলো, ডক্টর, তুমি কখনো ষোড়শী তন্বীকে চুমু খেয়েছ? বললাম না। কিন্তু কেন? সে বললো, তাহলে তোমাকে কি করে বোঝাই বলতো? শুক্লপক্ষের রাতের ফালুট জীবনের সেই প্রথম চুমু খাওয়ার অনুভূতি —যা মানুষ জীবনে শুধু একবারই পায়। সম্পাদক মহাশয়, একে অশ্লীল বলে বাতিল করে দেবেন কিনা জানি না। কিন্তু আমি আমার অ-কবি বন্ধুর উক্তিটি হুবহু তুলে দিলাম ফালুট ভ্রমণের সেই অনির্বচনীয় রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে বোঝাবার জন্যে।

এরও পরে আমি ফালুট গেছি। কি এ কি বিস্ময় একি রোমাঞ্চ! যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে এভারেস্ট—চিরতুষারাবৃত সমস্ত শৈলশিখরগুলো আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত বাড়ালেই বুঝি হাতে লাগবে। কিন্তু হায় .....!

ম্যানেভঞ্জং চেকপোস্টে বসে বসে অফিসার-ইন-চার্জ বন্ধুটির সাথে গল্প করছিলাম। জার্মান টুরিস্ট ভদ্রলোক নিজের ছাড়পত্র মেলে ধরে বলছিলেন, জানেন, সমস্ত ইউরোপ আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু এত সুন্দর পর্বতশ্রেণী জীবনে দেখিনি। এ যে অবিস্মরণীয়! ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আগত অসংখ্য টুরিস্টদের সন্দকফু, ফালুট যেতে দেখেছি, তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুনেছি। অথচ কোলকাতায় বসে আমরা এদের খবর রাখি না। যারা টুর এবং টুরিস্টদের উৎসাহিত করতে চান তাঁরাও যেন এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন।

সম্পাদক মহাশয়, আমাদের দেশের এসব অনন্যসাধারণ অথচ অবহেলিত জায়গাগুলোকে ভ্রমণোৎসাহীদের কাছে তুলে ধরবার জন্যে আপনার বহুল প্রচারিত সাময়িকীর কলমে একটু জায়গা ছেড়ে দেবেন না?

ডাঃ নীলকৃষ্ণ পাল,
গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র, স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী এবং ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা একই সপ্তাহে উদ্‌যাপন করছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে তার রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীপ্ত জীবনেতিহাস ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সুভাষচন্দ্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক সেনানায়ক। জাতীয় কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মীরূপে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন দুবার। তাঁর সময়েই জাতীয় কংগ্রেস তৎকালীন বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে চরম মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে যা পরবর্তীকালে গান্ধীজীর নির্দেশে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে।

সুভাষচন্দ্রের আমলেই ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপরেখা প্রণয়নের জন্য গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিটি। জওহরলাল নেহরুকে তার সভাপতি মনোনয়ন করেন তিনি। ডাঃ মেঘনাদ সাহার মতো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের তিনি দেশ গঠনের এই বুনিয়াদী কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। জওহরলাল নেহরু সেই স্বপ্নকে দেন বাস্তব রূপ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সুনিশ্চিত কর্মযজ্ঞ এখনও চলছে। জওহরলালের উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে চলেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

সুভাষচন্দ্রের অন্যতম, তাঁর জীবনের মহত্তম কীর্তি, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দান। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালী তিনি। সামরিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে এবং স্বাধীনতালাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি শ্রমে, নিষ্ঠায় এবং অক্লান্ত অনুশীলনে প্রথম ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। এ এক ইতিহাসের পরম বিস্ময়। আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সার্থকতা হল তার বিপ্লবী চরিত্র। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি চিরতরে বিসর্জন দিয়ে এই মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী প্রকৃত অর্থে একটি জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং অভ্রান্ত নেতৃত্বই তা সম্ভব করেছিল। সুভাষচন্দ্রই এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের আঘাতেই ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি যায় ধ্বসে। তারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। আজ ওই মহান মুক্তিযোদ্ধা, জননায়ক এবং ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবীর প্রতি জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

২৬ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্রী ভারতের প্রয়োবিংশতি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বৎসর এটা। স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতবর্ষ নিজস্ব সংবিধান প্রবর্তন করে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র রূপ গ্রহণ করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রবর্তন করা ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও সংকল্পেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলোতে এর তুলনা মেলা ভার। সংবিধানই জনগণের অধিকার এবং তার সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষায় জনগণ যে সংকল্প ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় তা প্রতিফলিত। একথা কথা ঠিক সংবিধানে ঘোষিত বহু লক্ষ্য এখন অপূর্ণ। শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার হওয়া সত্ত্বেও এখনও আমাদের দেশে নিরক্ষরতা ব্যাপক। তাহলে গণতান্ত্রিক সংবিধান চলছে কিসের জোরে? জনগণই বা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করছেন কিভাবে? এর উত্তর হল, অক্ষরজ্ঞান সীমাবদ্ধ হলেও ভারতের সাধারণ মানুষ, গ্রামবাসী, শ্রমিক ও কৃষক তাঁদের পারিপার্শ্বিকতার এবং সহজ বুদ্ধিতে গণতন্ত্রের আদর্শ ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন শিক্ষা লাভ করেছে নিজেদের জীবন থেকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই গণসংগঠন ও সামাজিক কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বিচার-বুদ্ধি হয়েছে প্রখর, গণতন্ত্রের কল্যাণকর্ম সম্পর্কে তারা অবহিত। দেশোন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনায় যত ব্যর্থতা বা ত্রুটিই থাক না কেন, নিম্নতম স্তর পর্যন্ত তার কিছুটা ফল গিয়ে পৌঁছেছে গত পঁচিশ বছরে। হয়তো তা আশানুরূপ হয় নি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকেই হৃদয়ঙ্গম করেছে যে, হিংসার পথে নয়, সংঘর্ষের পথে নয়, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথেই আমাদের দেশের সার্বিক সমস্যা সমাধান করতে হবে। সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা যেন এ সত্য না ভুলি। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে যে বিরাট কাজে হাত দেওয়া হয়েছে—সমাজ থেকে দারিদ্র্য মোচন—তা যেন সার্থক হয়। সাধারণতন্ত্র দিবসে এটাই হোক আমাদের বড় সংকল্প। এর জন্য চাই জনগণের নিষ্ঠা, কঠোর শ্রম এবং আত্মত্যাগ। জনগণের স্বার্থেই সামাজিক উন্নয়নসূচী রচিত হয়েছে, সর্বসাধারণের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এই সংকল্প ও আদর্শ জয়ী হোক। সারা দেশবাসী এই প্রার্থনাই উচ্চারণ করছে।

নেতাজী ভবন

(কার্যকরী পরিচালক নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো ডাঃ শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।)

আমার মা, বিভাবতী বসু, ছিলেন নেতাজীর মেজবৌদি। তাঁর সঙ্গে নেতাজীর সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অন্তরঙ্গ। তিনি তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতেন। এবং মা যেমন করে ছেলের মেজাজমর্জির খবরাখবর রাখেন, অনেকটা তেমনিভাবেই, তিনিও নেতাজীর মানসিক পরিবর্তনের আভাস পূর্বাহ্নেই টের পেয়ে যেতেন। নেতাজীও অকারণে কোনো কথা তাঁর মেজবৌদির কাছে গোপন করতেন না।

১৯৪১ সালের কথা বলছি।

সেদিন মধ্যরাত। ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৭ই জানুয়ারী। ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ী থেকে নেতাজী যখন ছদ্মবেশে ইতিহাসের পথে পাড়ি জমালেন, তখন অনেকের কাছেই ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার মায়ের কাছে তা মনে হয়নি। দেখা গেল, সেই মুহূর্তে তিনি অন্য অনেকের মতো বিচলিত না হয়ে, নেতাজীর স্মৃতি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বোধহয়, বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষ একদিন তাঁর ফেলে-যাওয়া স্মৃতিকে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করবে, মূল্যবান মনে করবে।

ঘটনাটা উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, ১৯৪৬ সালে যখন আমার বাবা শরৎচন্দ্র বসু আমার ঠাকুরদার তৈরী এলগিন রোডের বাড়ীটিকে নেতাজী ভবনে রূপান্তরিত করলেন, তখন মায়ের উৎসাহ কম ছিল না। ১৯৪৭ সালের ২৩ জানুয়ারী, শরৎচন্দ্র এই বাড়ীটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে। এবং নেতাজী-চর্চা জাতীয় আন্দোলন ও স্বাদেশিকতাবোধের উৎস হিসেবে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নেন।

এই প্রসঙ্গে কিছুটা পেছনের ইতিহাসও বলা দরকার।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো তখনো তৈরী হয়নি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্মী ও নেতাজীর অনুরাগীরা প্রথম এই বাড়ীটিতে ১৯৪৬ সালে মিলিত হয়েছিলেন, স্বদেশের কাজে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প নিয়ে। তখন তাঁরা জনসেবামূলক কাজই করতেন। আজাদ হিন্দ অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা ছিলেন নানারকম পাবলিক অ্যাকটিভিটির সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু আমার বাবা এবং আজাদ হিন্দ অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা, কেউই এত অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের সামনে কত কাজ! নেতাজীর জীবন ও দর্শনকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৯৫৭ সালে শরৎচন্দ্র বসুর উদ্যোগে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা গঠন করেন, বর্তমান সংস্থাঃ নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো।

সম্বল সামান্য। হাতে তথ্য নেই। তথ্য কোথায়? আমার মা এগিয়ে এলেন, আলোক-বর্তিকার মতো। নেতাজীর পোশাক-আশাক,

চিঠিপত্র, সবই তিনি স্মৃতি হিসেবে রক্ষা করতেন। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রথম সংগ্রহ ছিল, তাঁর দেওয়া ঐ স্মৃতিচিহ্নগুলি।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়রা বড়ো ইতিহাস-বিমুখ জাতি। ইতিহাসের নির্দেশ সম্পর্কে উদাসীন।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে, এ সত্য উপলব্ধি করেছি, বারবার। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কাজে হাত দিয়ে স্বদেশী ঐতিহাসিকের প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছি ঠিকই, কবি-সাহিত্যিক রাজনীতিকদের সহযোগিতাও কম পাইনি, কিন্তু তথ্যের জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে বিদেশী সাহায্যের ওপরেই বেশী করে।

উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায়, ফ্রাউ ফেত্তারের নাম।

ভিয়েনাবাসিনী ঐ ভদ্রমহিলা, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। নেতাজীর চিঠিপত্র, এমন কি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কাটিং পর্যন্ত পেয়েছিলাম, তাঁরই মারফতে।

এইসব কথা ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এইভাবে আমরা সাহায্য পেয়েছি জাপান থেকে, জার্মানি থেকে। এমন কি আমেরিকা থেকে।

এই তো সেদিনের কথা।

১৯৬৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী, ডক্টর আলেকজান্ডার ওয়ার্থ এসেছিলেন নেতাজী ভবনে, নেতাজী সম্পর্কে ভাষণ দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, তিনি
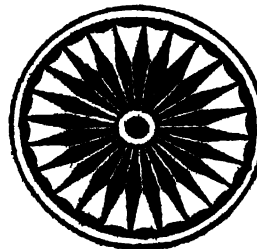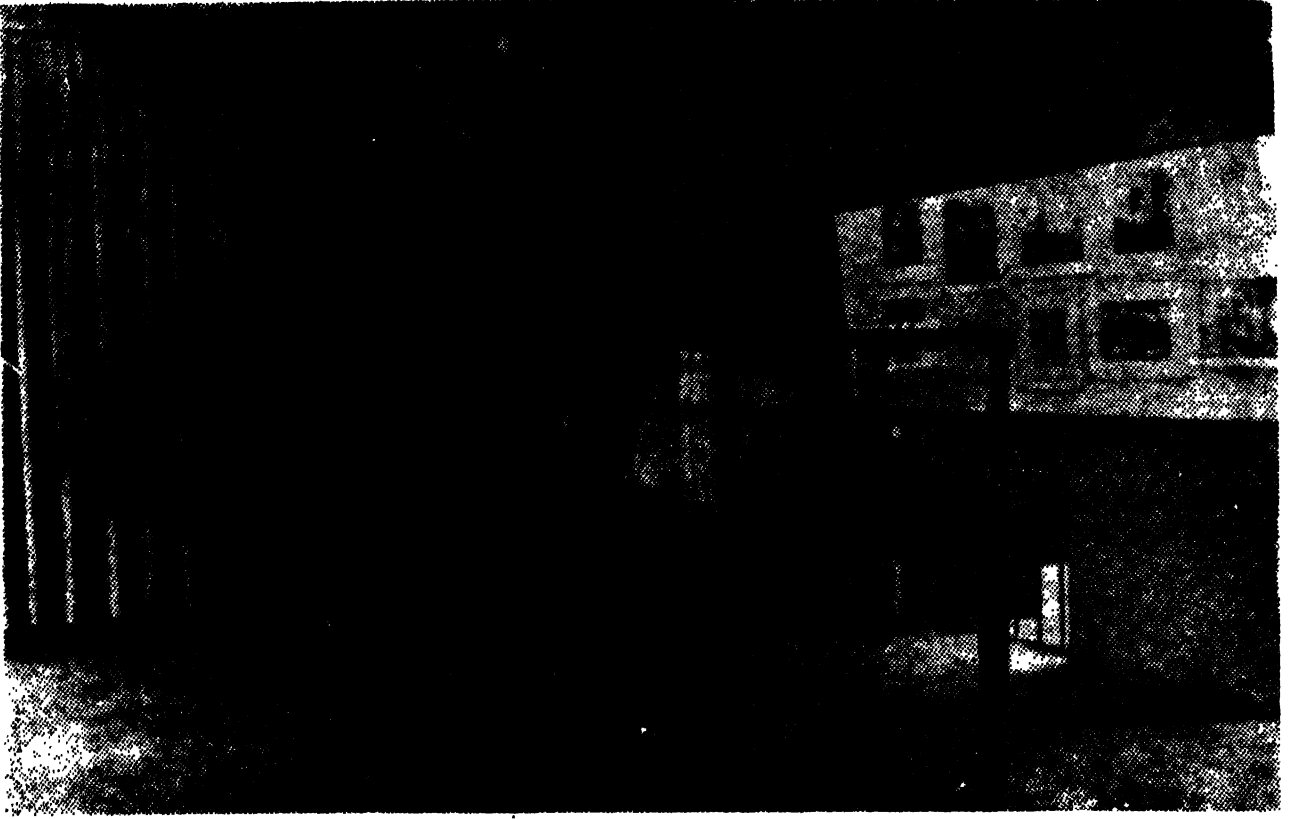
ছিলেন জার্মান ফরেন অফিসের বিশেষ ভারতীয় বিভাগের অফিসার। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত অ্যাডাম ভন ট্রট জু স লজের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

কিছুকাল আগে, তিনি জার্মান ভাষায় নেতাজী সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন।

তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, বহু অজ্ঞাত তথ্য। বহু ডিপ্লোম্যাটিক ডকুমেন্ট এবং দুষ্প্রাপ্য দলিল। যুদ্ধকালীন অবস্থার কিছু ছবি এবং ফিল্ম পর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

এইভাবেই আমরা এগিয়েছি, দিনের পর দিন। তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করেছি। কখনো নিজেদের চেষ্টায়, কখনো-বা বৈদেশিক সাহায্যের সূত্রে থেকে। তাঁদের মধ্যে কেউ বা ছিলেন, নেতাজীর সঙ্গে পরিচিত কিংবা অনুগামী। আবার এমন মানুষ আছেন, যাঁরা নেতাজীকে দেখেননি কখনো, কিন্তু নেতাজী সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণায়রত।

যেমন, ইয়োচি ইয়োকোবারি।

জাপানের এই তরুণ গবেষক নেতাজীকে কখনো দেখেননি। কিন্তু নেতাজী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। ন্যাশনাল লিবারেশান মুভমেন্ট ডিউরিং দি ওয়ার—এই বিষয়ে তিনি গবেষণা করে যাচ্ছেন গত দশ বছর ধরে। তবু তাঁর কৌতূহলের শেষ নেই।

নেতাজীর অনেক ছবি, নেতাজী সংক্রান্ত ডকুমেন্ট, কাগজপত্রে প্রকাশিত সংবাদের কাটিং, ফিল্ম তিনি আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন একে একে। এখনো পাঠানোর বিরাম নেই। এবং এইসব নথিপত্রের ভিত্তিতে তৈরী একটা অল্প দৈর্ঘের ছবি এবার দেখানো হবে, সারা ভারতবর্ষে।

ইতিহাসের পথ এমনি নির্মম। এবং সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো এই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়োজনে এবং নেতাজী সম্পর্কিত গবেষণায় আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নেতাজী মিউজিয়াম। নেতাজী এবং জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাঁদের সাহায্য করাই, এর প্রধান উদ্দেশ্য। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো বের করেছেন, নেতাজীর লেখা ও নেতাজী-সম্পর্কিত কুড়িটিরও বেশী বই।

ইচ্ছে আছে, আমরা গোটা নেতাজী ভবনটাকেই নেতাজী মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তুলব। সেজন্যে বাড়ীটার আধুনিকী-করণের প্রয়োজন হবে। ঐতিহাসিক দলিল-পত্র ও নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য এয়ার কন্ডিশান্ড ঘরেরও দরকার। একটা আধুনিক অডিটোরিয়ামসহ নেতাজী সম্পর্কিত চলচ্চিত্র তৈরী, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ও রিসার্চ স্কলারশিপের ব্যবস্থা করার জন্য পনের লক্ষ টাকার একটা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, আমরা নিয়েছি, আরেকটি আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা। তাতে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের (১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত) ওপর যাতে গবেষণা করা যায়, তার উপযুক্ত একটি লাইব্রেরী থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে, আলোচনা কক্ষ, একজিবিশন হল, ল্যাবরেটরী, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার এবং আন্ত-র্জাতিক অতিথিশালা।

এই বছর ইন্টার ন্যাশনাল নেতাজী সেমিনার হচ্ছে নেতাজী ভবনে। দেশী, বিদেশী বহু গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু নেতাজী সম্পর্কে ভাষণ দেবেন।

তবু জিজ্ঞাসার শেষ নেই। কেউবা বলেন, নেতাজীকে চীনে, না, রাশিয়ায় নাকি দেখা গেছে। কেউবা প্রশ্ন করেন, শৌল-মারীর সন্ন্যাসী কি নেতাজী নয়?

আমি জানি না, নেতাজী কোথায় আছেন। আমার মনে হয়, ঐগুলি সবই গুজব। এবং গুজবের মধ্যেও একটা সত্য আছে। সেই সত্যটা হলো, নেতাজীর দেশ-বাসী বিশ্বাস করতে চায় না যে, তিনি নেই।

আমার ধারণা, নেতাজী একটা ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। অল্প সময়ে তাঁর সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। এ সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে, বছরের পর বছর। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে, সেইজন্যেই গড়ে তোলা হচ্ছে লাইট হাউসের মতো, আমাদের জাতীয় সংগ্রাম, নেতাজীর জীবন ও দর্শন আলো-চনার প্রাণকেন্দ্র রূপে।

এ ব্যাপারে ভারত সরকার খুব সাহায্য করছেন।*

---

* সাক্ষাৎকারঃ গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

উন্নতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

পূর্বাঞ্চলের জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ

কথাটা প্রথম উঠেছিল গত বছর নভেম্বর মাসে। পাটনাতে পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী একটা বৈঠকে বসেছিলেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ—বিদ্যুতের ঘাটতি। সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ঐ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে এক জোট হয়ে দাবী করেন যে, পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাবার জন্য এখানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিতে হবে।

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঐ সম্মেলনে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, বিদ্যুৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাবদ মোট যে চারশ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে তার মাত্র দশ শতাংশ লগ্নী করা হয়েছে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। অথচ এই রাজ্যগুলিতে ভারতের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বাস করেন এবং এখানকার অধিবাসীদের শতকরা ৭০ জনই দরিদ্র।

মন্ত্রী ডঃ রাও নাকি নভেম্বর মাসের ঐ সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীদের যুক্তিগুলি মনোযোগসহকারে শুনেছেন এবং বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ডঃ রাও যে আশ্বাসই দিন না কেন, প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির একটা বড় রকমের বদল না হওয়া পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখতে পাওয়ার কোন আশা নেই। এবিষয়ে দিল্লী এখন পর্যন্ত যে নীতি নিয়ে চলছে তা হল এই যে, যেসব রাজ্যের হাতের কাছে কয়লা নেই শুধু সেই সব রাজ্যেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেহেতু যথেষ্ট কয়লা রয়েছে সেহেতু সেখানে কয়লার অগ্নশক্তিকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হবে—এটাই হচ্ছে সরকারী নীতি। আর এই কারণেই ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত যে চারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে তাদের একটির ঠিকানা মহারাষ্ট্র, একটির রাজস্থানে একটির তামিলনাড়ুতে এবং চতুর্থটির উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ দেশের উত্তরে পশ্চিমে ও দাক্ষিণে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছড়ান আছে, শুধু পূর্ব ভারতের কোঠাতেই শূন্য।

পূর্ব ভারতকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মানচিত্রের বাইরে রাখার এই নীতি কি কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন? এই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যাবে তারই উপর নির্ভর করছে পাটনা বৈঠকে উত্থাপিত দাবীর ভবিষ্যৎ।

এ বিষয়ে এখন কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলির আলাপ-আলোচনা চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতে একথা মনে করা যাচ্ছে না যে, দিল্লীকে তার নীতি বদল করতে রাজি করান খুব সহজ হবে। পাটনা বৈঠকের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় এক বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি সুব্রহ্মণ্যম মুখ্যমন্ত্রীদের দাবী নাকচ করে দিয়েছেন।

এই বিষয়ে নয়াদিল্লীর মনোভাবের আর একটি ইঙ্গিত সম্প্রতি পাওয়া গেল। উত্তর বিহারে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য বিহার সরকার একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের পরামর্শদাতা কমিটি এই প্রস্তাব নামঞ্জুর করে দিয়েছেন।

অথচ, নয়াদিল্লীকে একথা বোঝান হয়েছে, সারা ভারতে কয়লার দাম এক করে দেওয়ার পর এখন পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি কয়লার সহজলভ্যতার দরুন বিশেষ কোন সুবিধা পাচ্ছে না। তাছাড়া, তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলিকে যে নিরেস জাতের কয়লা ব্যবহার করতে হচ্ছে তাতে বয়লারগুলির ক্ষতি হচ্ছে ও সেগুলির আয়ুক্ষয় হচ্ছে। বিহারে ন্যাচারাল ইউ-

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

রেনিয়ামের যে সঞ্চয় আছে সেটা এই অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগান যায়, এই যুক্তি মেনে নেওয়ার জন্যও নয়াদিল্লী এখন পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের কাছে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনা নয়াদিল্লীতে পাঠিয়েছেন। ১২০ কোটি টাকার এই পরিকল্পনায় ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। রাজ্য যোজনা পর্ষৎ এখন এই বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সংক্রান্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ সিংহ কয়েক দিন আগে কলকাতায় এক আলোচনা-সভায় বলেছেন, 'পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।' রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য ডঃ সন্তোশ চক্রবর্তী ঐ আলোচনা-সভায় বলেছেন, সমুদ্রের কাছে সুবর্ণরেখার উপত্যকায় কোথাও এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করলে ভাল হবে।

পশ্চিমবঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা যাঁরা করছেন তাঁদের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের এককালীন খরচ খুব বেশী বলে আপত্তি উঠতে পারে। এই আপত্তি কাটাবার জন্য পরিকল্পনাকারীরা যে প্রস্তাব বিবেচনা করছেন সেটা হল এই যে, হলদিয়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় যদি এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তাহলে ঐ অঞ্চলে শিল্প ও কৃষির একটা বৃহৎ আয়োজন গড়ে তুলে তার প্রয়োজনে ঐ বিদ্যুৎকে কাজে লাগান যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, এই ধরনের একটি বৃহৎ শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে যদি ৬০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, তাহলে সেখানে উৎপন্ন বিদ্যুতের খরচ পড়বে ইউনিট প্রতি ২·৮ থেকে ৩ পয়সা। হলদিয়া বিদ্যুতের যে খরচ এখন ধরা হয়েছে তার তুলনায় এই অংকটা অনেক কম। এখন যে হিসাব আছে তা হল, হলদিয়ায় বিদ্যুতের খরচ পড়বে ইউনিট প্রতি ৯ পয়সা।

একজন বিশেষজ্ঞ হিসাব করে দেখিয়েছেন, এই ধরনের একটি শিল্প ও কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা যায় ও সেখানে যদি ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যায় তাহলে দিনে ৬ লাখ টন সার ও ৫ লাখ টন অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা যেতে পারে। যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে ১২ হাজার অগভীর নলকূপ ও ৯ হাজার গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সঞ্চার করা যাবে।
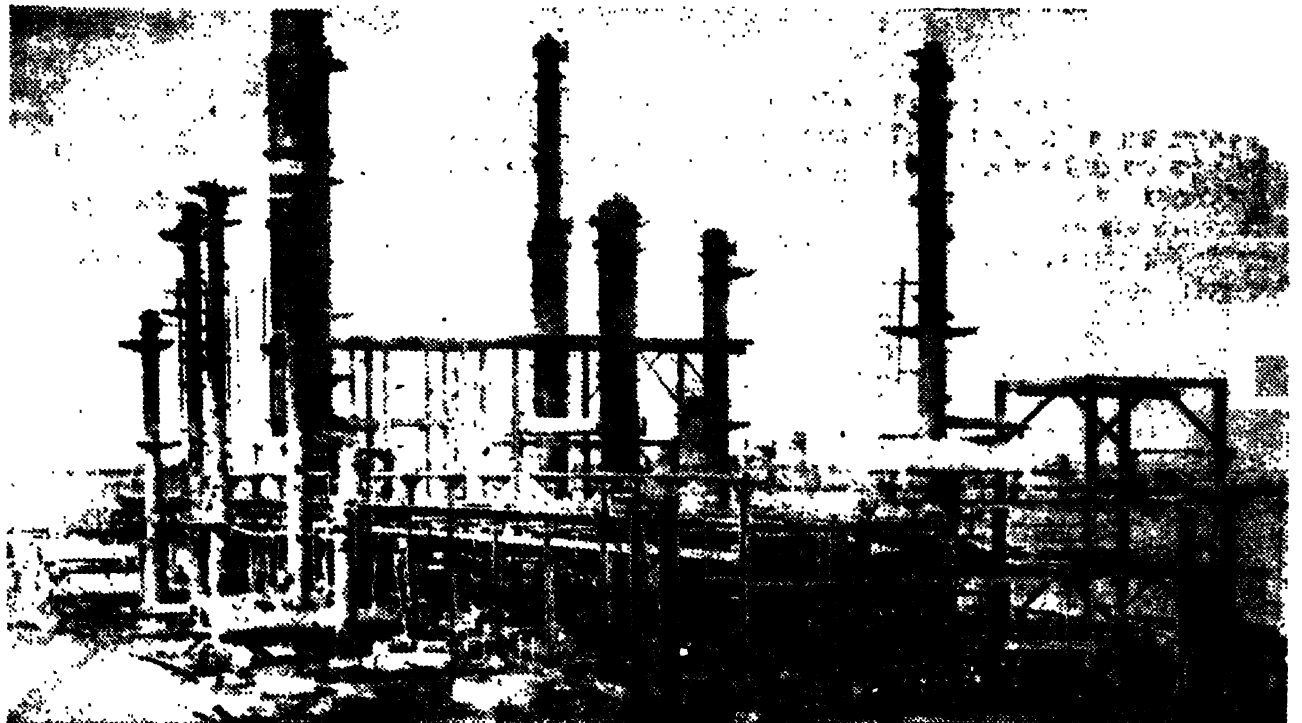
পরিকল্পনাটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ডঃ কে এল রাও-এর এক দফা আলোচনা হয়েছে বলে প্রকাশ।

তবে এখন পর্যন্ত দিল্লীর যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে তাতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

কলকাতার জন্য পাতাল রেল

বিশ্বাস করা যাচ্ছে এখন কলকাতার পাতাল রেল সম্পর্কে। গত ২৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে প্রকল্পের জন্য মাটি খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছে। যানবাহন সমস্যায় বিড়ম্বিত কলকাতার মানুষ এখন আশা করতে পারেন যে মাটির তলার রেল অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের সমস্যার অন্তত কতকটা সুরাহা করবে।

এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত রেল চালু করা হবে। এতে খরচ পড়বে ১৪০ কোটি টাকা। রেললাইনটির দৈর্ঘ্য হবে ১৬·৪৩ কিলোমিটার। দমদম জংশন স্টেশনের কাছেই ঐ স্টেশনের পশ্চিমে পাতাল রেলের স্টেশন তৈরী হবে। সেখান থেকে বেলগাছিয়া রোডের মুখ পর্যন্ত পাতাল রেলের লাইন সুবার্বন রেল লাইনের সমান্তরালে মাটির উপর দিয়ে যাবে। বেলগাছিয়া রোডের মুখ থেকে বাকী সবটুকু রাস্তা এই পাতাল রেললাইন মাটির তলা দিয়ে যাবে। পাতাল রেলের মোট ১৭টি স্টেশন থাকবে। তার মধ্যে দমদম স্টেশন ছাড়া অন্য সব স্টেশনই থাকবে মাটির তলায়। দুই স্টেশনের মধ্যে গড় দূরত্ব হবে ১·০৩ কিলোমিটার।
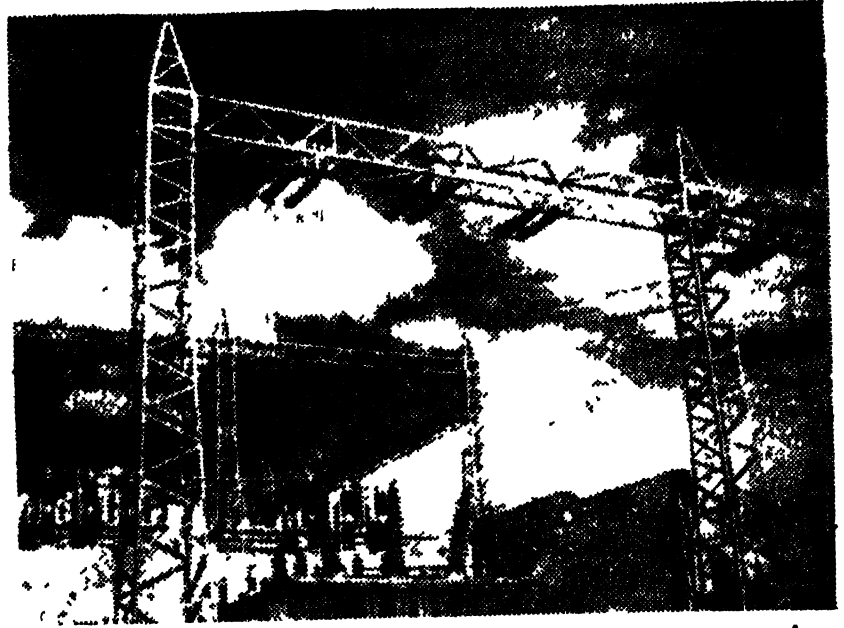
২৯ ডিসেম্বরের ঐ অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালের শেষে যাতে পাতাল রেললাইনে পরীক্ষামূলকভাবে গাড়ী চালান যায় সেভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই পাতাল রেল তৈরী করতে গিয়ে যেসব অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা নিয়ে ইতিমধ্যে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করার আগে মাটির তলার জলের পাইপ, পয়ঃপ্রণালী, গ্যাসের মেইন, ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার প্রভৃতি সরাতে হবে। জায়গায় জায়গায় যানবাহন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হতে পারে। কোথাও কোথাও রাস্তাও চওড়া করার দরকার হতে পারে। এই সব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেমন কলকাতার নাগরিকদের সহযোগিতার দরকার হবে তেমনি বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ, পৌর প্রশাসন ইলেকট্রিক গ্যাস ইত্যাদি সংস্থা প্রভৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রাখতে হবে। তার জন্য বিরাট প্রস্তুতির দরকার।

দ্বিতীয় হুগলী সেতু

কলকাতার উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কাজও ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলী সেতু যেটা সম্পূর্ণ হলে নেতাজীর নামে চিহ্নিত করা হবে বলে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন।

গত বছর ২০ মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

কলকাতার দিকে প্রিন্সেপ ঘাট আর হাওড়ার দিকে দীনবন্ধু কলেজের উত্তরে মিউনিসিপ্যাল পার্ক — এই দুই বিন্দুকে যুক্ত করবে এই নতুন সেতু। সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ২৭০০ ফুট এবং জোয়ারের সময় নদীর জলরেখা থেকে সেতুটির মধ্যবর্তী অংশের উচ্চতা হবে ১১৩ ফুট। এই ধরনের ইস্পাতের তার দিয়ে ঝোলান রিভেট-করা সেতু আমাদের দেশে এই প্রথম তৈরী হচ্ছে। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হতে সময় লাগবে আনুমানিক পাঁচ বছর এবং ব্যয় হবে জমি সংক্রান্ত ও আনুষঙ্গিক খরচসহ মোট ৩৩ কোটি টাকা।

এই সেতু তৈরী হলে বর্তমান হাওড়া ব্রিজের উপর যানবাহনের চাপ অনেকটা কমবে। সেতুটি হাওড়া শহরের উন্নতিরও সহায়ক হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

পশ্চিমবঙ্গ

রাজনৈতিক দল

দিলীপ মালাকার
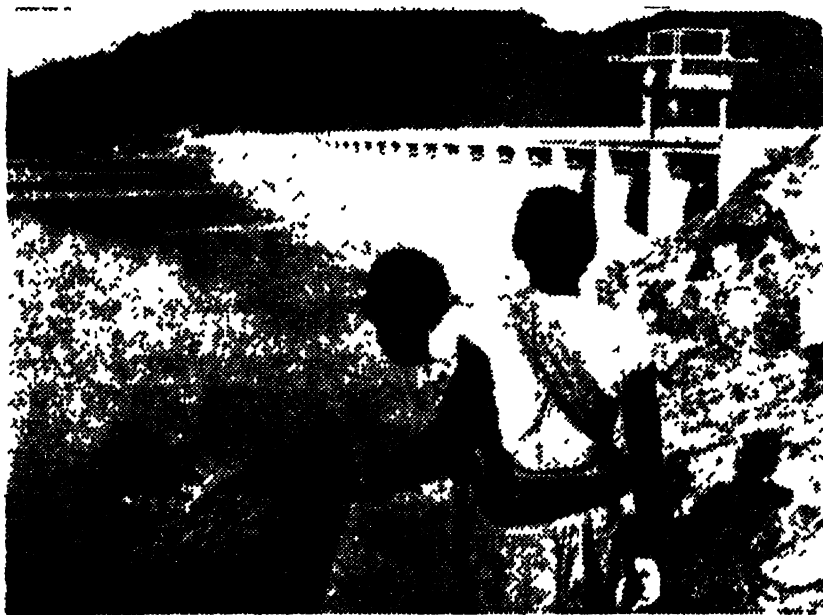
বৃটিশ আমলে পরাধীনতার যুগে বহু আদর্শবান তরুণ ও যুবক এগিয়ে এসেছিলেন ছোট-বড় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরাধীনতার নাগপাশ কাটতে। স্বদেশী করাই ছিল তাঁদের জীবন-ব্রত। বৃটিশ আমলেই বড় পার্টির কার্যকলাপে আস্থা হারিয়ে তাঁদের অনেকে ছোটখাটো রাজনৈতিক দল ও বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তখন কিন্তু সবারই উদ্দেশ্য ছিল একটিই—দেশকে স্বাধীন করা।

দেশ স্বাধীন হবার পর সেদিনের বহু ছোট দল, বিপ্লবী দল বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল। তাদের দু-একটা দল এখনও কোনো রকমে টিমটিম করে টিকে আছে।

দেশ স্বাধীন হল, কংগ্রেস সরকার গঠিত হল। রাজনৈতিক মতবাদে বিরোধ দেখা দিল নেতাদের মধ্যে। তাঁদের কেউ কেউ বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়লেন। এবার উদ্দেশ্য এক রইল না। শাসনযন্ত্র দখল করে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী জনগণের সেবা করাই হল তাঁদের উদ্দেশ্য। বহু আদর্শবান তরুণ ও যুবক বড় দল ভেঙে ছোটখাটো দল গড়লেন। এঁদের অনেকেই বিপ্লবী। কিন্তু কেউই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে গেলেন না। নির্বাচনের সময় এলে সবাই জোড়-জোড়ে ব্যস্ত হলেন। সবার আশা তাঁরা নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করবেন। দেশকে নতুনভাবে সাজাবেন। কিন্তু প্রথম বিশ বছর ছোটখাটো দলগুলো শুধু বিধানসভায় বিরোধী আসনে গরম বক্তৃতাই করে গেলেন। শাসন ক্ষমতায় এসে নতুন কিছু করার সুযোগও পেলেন না।

আদর্শবান রাজনৈতিক নেতারা যে-যাই বলুন না কেন, ছোট-বড় সব রাজনৈতিক দলেব লক্ষ্য একটিই এবং সেটি হল নির্বাচনে জিতে শাসন ক্ষমতা দখল করা। সব দলের ভাগ্যে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সোজা কথা নয়। পাঁচ-দশ কিম্বা পনেরটি আসন নিয়ে সরকার গঠন করা যায় না। তাই ছোটখাটো দলগুলো কোনো একটি বৃহৎ দলের সঙ্গে ভিড়ে যায় মন্ত্রিসভা গঠন করতে। যে জোটে তাবা যোগদান ক'রে সেই জোটের পরামর্শে তাদের চলতে হয়। জোটের উত্থান-পতনেব সঙ্গে তাদেব ভাগ্য জড়িত' তাই জোটের পতন হলে তাদেরও পতন ঘটে। এই ধারাই আমরা দেখে আসছি পশ্চিমবঙ্গেথ রাজনৈতিক ইতিহাসে কয়েক যুগ ধবে। এ-দৃশ্য শুধু পশ্চিমবঙ্গেব বাজনৈতিক পটেই দেখা যায় না, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এক চিত্র। একটি ছোট দল হঠাৎ বড়তে পরিণত হয়েছে তেমন দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না। বড় কোনো দলের বিপর্যয় হলে সর্বত্রই ছোট-মাঝারির দল নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে বলেই আমরা জানি।

নির্বাচনে কোন ছোটখাটো দল স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়ে সুবিধে করতে পেরেছে বলেও আমবা দেখতে পাই না—পশ্চিমবঙ্গ তাব দৃষ্টান্ত। কয়েকটি ছোটখাটো দল স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা চালিয়ে একবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তেমন নজীর আমরা দেখেছি ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের কয়েকটি নির্বাচনে, এই পশ্চিমবঙ্গে। সে-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করছি।

১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর দক্ষিণ ও আধা দক্ষিণপন্থী দলগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। মধ্যপন্থীদের অবস্থাও তথৈবচ। কেবলমাত্র বামপন্থী ছোটখাটো দলগুলো এখনও টিকে আছে। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ এখন খুবই সীমিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে গত দশ বছর ধরে সি পি এম দল একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। বিধানসভায় এদের আসন সংখ্যা ছিল প্রচুর। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে সি, পি, এম দল আসন লাভ করেছিল ১১১টি। ১৯৭২ সালে পেল মাত্র ১৪টি। আসন সংখ্যা হিসেবে একটি বিরাট দল হয়ে গেল ছোটখাটো দল।

সি, পি, আই দল হিসেবে বড় কিন্তু আসন সংখ্যা মাঝারি। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে এরা পেয়েছিল ১৩টি আসন।

১৯৭২ সালে পেল ৩৫টি। কিন্তু তার নিজের একার ক্ষমতায় নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার জন্যেই এতগুলো আসন লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কটাক্ষ করে বলেছিলেন, সি, পি, এম এখন ছোট দলগুলোর মধ্যে একটি।

দল হিসেবে এখনও সি, পি, এম বড় দল। যে দল এককালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল, সে দল গত এক বছর ধরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর একেবারেই নীরব। তাদের অ্যাকটিভিটিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সি, পি, এম জোটে ছোটখাটো দল আর, এস, পি; এস, ইউ, সি; ওয়ার্কার্স পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, সি, পি,আই ইত্যাদিরা ১৯৭২ সালের ৪ঠা অকটোবর একবার জনসভা ডেকে সামান্য হৈচৈ করেছিলেন। তারপর দেখা গেল ১৯৭৩ সালের ৯ই জানুয়ারী আরেকটি জনসভা। ব্যস এই পর্যন্তই তাদের গতিবিধি। এই জোটের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর, সি, পি, আই ১৯৭২ সালের নির্বাচনে একটিও আসন লাভ করতে পারেনি। এদের বাদ দিয়ে সি, পি, এম এবং তার জোটের কয়েকটি দল গত এক বছর ধরে বিধানসভা বয়কট করে চলেছে। কিছুকাল যাবৎ আর, এস, পি দল আবার নতুন কথা বলছে। তাঁরা ভাবছেন বিধানসভায় যোগদান করবেন। সম্প্রতি তাঁদের দলের সম্মেলনে পৃথক আন্দোলনের কথাও বলা হয়েছে। তাঁরা গণবিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করবেন বলেও ঘোষণা করেছেন।

মূল বাঙলা কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য এখন কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। মূল বাঙলা কংগ্রেস থেকে সরে এসে সুশীল ধাড়া এবং তাঁর অনুরাগীরা যে বাংলা কংগ্রেস গঠন করেছেন তাঁরা ১৯৭২ সালের নির্বাচনে একটিও আসন লাভ করতে পারেননি। দল হিসেবে এখনও টিকে আছে বটে। কিন্তু গত এক বছরে তাদের কোনো অ্যাকটিভিটি দেখা যায় নি। কেবলমাত্র '৭৩ এর জানুয়ারীতে তাঁদের সাধারণ সম্মেলন বসল। এই পর্যন্ত। বিপ্লবী বাঙলা কংগ্রেস তার অফিসেই সীমাবদ্ধ। তার বেশী কিছু নয়। এই দলটিও সি, পি, এম ছায়ায় রয়েছে।

পি, এস, পি; এস, পি ইত্যাদি মিলে সোস্যালিস্ট দল। সেই সোস্যালিস্ট দল পশ্চিমবঙ্গে নীরব। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাদের মধ্যে চলেছে অনৈক্য। তার জের দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে।

দল হিসেবে সি, পি, আই বড় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত তার কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তার গতিবিধি সমর্থক হিসেবে সি, পি, আই কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন এবং তাঁরা ভবিষ্যতেও করবেন বলে জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি সি পি আইএর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাকেও ছোট দলের মধ্যে নাম লেখাতে হবে।

স্বাধীনতার আগে ও পরে বহুবার কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকে ছোটখাটো দল গড়েছিলেন। তাঁদের কোনো কোনো দল এখন বিলুপ্ত। কোনো কোনো দল এখনও কোনো রকমে টিকে রয়েছে শুধু নামে। কাজে নয়। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে যে বিভেদ শুরু হল তার পরিণতি দেখা গেল ১৯৭০ সালে। আদি ও নব কংগ্রেস হিসেবে বিভক্ত হল। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নবকংগ্রেস বিধানসভার ২৮০টি আসনের ২১৬টি আসন লাভ করল। আর আদি কংগ্রেস কেবলমাত্র ২টো আসন। এই হিসেবে আদি কংগ্রেস এখন ছোটখাটো দল। তার অ্যাকটিভিটিও ছোটখাটো দলের মতন। চার বছর পরে যখন আবার নির্বাচন হবে তখন তাঁরা কোথায় গিয়ে ঠেকবেন তা কে জানে?

বর্তমান শাসক দল এখন কংগ্রেস এবং তার দলেও চলছে দলাদলি। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের বিধানসভা সদস্যদের নিয়ে ইয়ং লেজিসলেটিভ ফোরাম গঠিত হয়েছে। ওদিকে দিল্লীতে গঠিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরাম-এর কর্তারাও পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের উপদল গড়বেন। শাসক কংগ্রেসের দলাদলির ফলে উপদল অথবা ছোট দল হলে ভবিষ্যতে আবার একটি ছোট দলের আবির্ভাব হবে কিনা কে বলতে পারে।

এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে ছোট দলের ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল নয়। কারণ বড় দলই শাসন ক্ষমতা হাতে পায়। তারাই রাজ্য চালায়। ছোটখাটো দল থাকার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কারণ ছোট দলগুলো গণতন্ত্রের ছোট ছোট স্তম্ভ। ছোটখাটো স্তম্ভ ভেঙে গেলে গণতন্ত্র জখম হতে বাধ্য। কিন্তু ছোটখাটো দলগুলোর বাঁচা-মরার ভার তো সেই সব দলের নেতা ও জনসাধারণের হাতে। সেখানে বড় দলের কোনো হাত আছে বলে মনে হয় না। বিগত চারটি নির্বাচনে ছোটখাটো দল কেমন করে ক্রমবিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে চারটি নির্বাচনে পনরটি মরসুমী দল পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক পট থেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রায় সব দেশেই কিছু মরসুমী দল গজিয়ে ওঠে এবং নির্বাচনের হারজিতের ওপর তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেসব দলের কোনো সঠিক রাজনৈতিক মতবাদ, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংগঠনের কোনো ভূমিকা থাকে না, তাদের অবলুপ্তি ঘটে সবার আগে।

১৯৬৭ সালের পর থেকে আমরা এই অপমৃত্যু ঘটতে দেখেছি। তারা শুধু নির্বাচনে জিততে শোচনীয় অসফলতা দেখিয়েছে। তাদের কোনো সাংগঠনিক সংস্থা ছিল না। এই দলগুলোর অধিকাংশই কংগ্রেস দলত্যাগীদের দ্বারা গঠিত।"

১৯৬৬ সালে বাংলা কংগ্রেস গড়লেন অজয় মুখার্জি ও সুশীল ধাড়া। সেই 'বাংলা কংগ্রেস' ভেঙে হুমায়ুন কবীর গড়লেন ১৯৬৯ সালে লোক দল। জাহাঙ্গীর কবীর গড়লেন ওই বছরে জাতীয় দল। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে আশু ঘোষ গড়লেন ১৯৬৯ সালে আই, এন, ডি, এফ দল।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে বিরাট ভাঙন ধরল, জন্ম হল নব ও আদি কংগ্রেসের। নব এখন আসল কংগ্রেসরূপেই পরিচিত। আদি কংগ্রেস মরসুমী দলে পৌঁছেচে।

১৯৭০ সালে বাংলা কংগ্রেস থেকে গড়ে উঠল বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। ১৯৭১ সালে আবার বাংলা কংগ্রেসে ভাঙন ধরল। সুশীল ধাড়ার নেতৃত্বে গঠিত হল আর একটি বাংলা কংগ্রেস। গত পাঁচ বছরে চারটি নির্বাচনে উপরোক্ত প্রায় সব কটি দলই অবলুপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র আদি কংগ্রেস দুটি আসন নিয়ে কোনো রকমে টিকে আছে। আগামী নির্বাচনে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

বাংলা কংগ্রেস ১৯৬৭ সালে প্রার্থী দেয় ৩৫ জন এবং আসন লাভ করে ১৩টি, ১৯৬৯ সালে প্রার্থী দেয় ৪৯ জন আসন লাভ করে ৩৩টি। ১৯৭১ সালে প্রার্থী দেয় ১৩৭ জন কিন্তু আসন পায় ৫টি। ১৯৭২ সালে সুশীল ধাড়া পন্থী বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেয় ১৯ জন, আসন পায় শূন্য।

১৯৬৯ সালে লোকদল প্রার্থী দেয় ৭৯ জন, জাতীয় দল দেয় ১৯ জন প্রার্থী, আই, এন, ডি, এফ দেয় ৯৮ জন প্রার্থী। তার মধ্যে কেবলমাত্র আই এন ডি এফ পায় একটি আসন, বাকী দুটো দল একটিও আসন পায়নি।

১৯৭১ সালে বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস তিনজন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পায়, ১৯৭২ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে একটিও আসন পায়নি।

আদি কংগ্রেস ১৯৭১ সালে ১৫৪ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছিল ২টি আসন ১৯৭২ সালে ৬৪ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পায়। প্রার্থী সংখ্যানুপাতে তাদের আসন লাভ ব্যর্থতারই পরিচয় দেয় এবং এইভাবেই মরসুমী দলগুলোর অপমৃত্যু ঘটছে।

বিশ বছরে কংগ্রেস ভেঙে বহু উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণে কয়েকটি মধ্য-বামপন্থী দল গড়ে ওঠে ও ভেঙে যায়। যেমন কে, এম, পি; পি, এস, পি; এস, এস, পি ইত্যাদি। এইসব ছোট দলগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরে আরও কয়েকটি উপদলের সৃষ্টি হয়। সেই সব মরসুমী দলগুলো

না পেয়ে এখন তারা বিলুপ্ত অথবা তাদের কর্মীরা অন্য দলে যোগদান করেছে।

পুরুলিয়া লোকসেবক সংঘও কংগ্রেসের কিছু দলভাঙ্গা লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে লোকসেবক সংঘ ৫ জন প্রার্থী দিয়ে ৫টি আসন লাভ করে ১৯৬৯ সালে ৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৭১ সালে ৯ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন আর ১৯৭২ সালের নির্বাচনে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ।

এককালে লোকসেবক সংঘের প্রতিপত্তি ছিল পুরুলিয়া জেলায়। এখন তাদের রাজনৈতিক প্রভাব নেই বললেই চলে। সেখানে কংগ্রেস জাঁকিয়ে বসেছে। কংগ্রেস থেকে ভেঙ্গে এসে যে সব ছোট দল গঠিত হয়েছিল, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে তাদের ব্যর্থতায় বহু আসন কংগ্রেস আবার ফিরে পেয়েছে।

মধ্যপন্থী দল ছাড়া অনেক ছোট দল গত পাঁচ বছরের নির্বাচন লড়াইয়ে যখন তারা কোনো বৃহৎ জোটের সঙ্গে থেকেছে তখন সেই জোটের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করেছে তাদের আসন লাভ। যখন ইউ, এল, এফ জোট ক্ষমতাশালী ছিল তখন তাদের জোরে বহু দল নির্বাচনে উতরে গেছে, আবার ইউ এল, এফের বিপর্যয়ে তাদেরও বিপর্যয় ঘটেছে।

এককালের কংগ্রেস থেকে ভেঙে আসা পি, এস, পি এবং এস, এস, পি যখন বৃহৎ জোটে ছিল তখন তারা মন্দ আসন পায়নি। কিন্তু তাদের দলে ভাঙন ও এবারকার সোস্যালিস্ট দলের একা নির্বাচনী লড়াই-এ তাদের ব্যর্থতাই ঘোষণা করে। ১৯৬৭ সালে পি, এস, পি ২৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৭টি আসন পেয়েছিল এস এস পি দিয়েছিল ২৬ জন প্রার্থী এবং পেয়েছিল ৭টি আসন। ১৯৬৯ সালে পি এস পি ২৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৫টি আসন পায়, এস এস, পি দল ১৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৯টি আসন পায়। ১৯৭১ সালে পি এস পি দল ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন ও এস, এস, পি দল ২৫ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন লাভ করে। এরপর তাদের দুই দলে ভাঙনে ও মিলনে সোস্যালিস্ট দলের আবির্ভাব। ১৯৭২ সালে সোস্যালিস্ট দল কোনো জোটে যোগদান না করে ২৬ জন প্রার্থী দিয়ে একটিও আসন পায়নি।

গোর্খা লীগ ও ঝাড়খণ্ড দল ধর্মীয় নয় কিন্তু বিশেষ জাতিসত্তার দল। এই দুই দলের মধ্যে গোর্খা লীগ একইভাবে রয়েছে কয়েক বছর ধরে। তবে ঝাড়খণ্ড দলের বেলায় তা ঘটেনি। গোর্খা লীগ ১৯৬৭ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন পেয়েছিল, ১৯৬৯ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৭১ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন ও ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন লাভ করে। ঝাড়খণ্ড দল ১৯৬৯ সালে ৫ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, ১৯৭১ সালে ৪ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন, ১৯৭২ সালে ২৩ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িক, আধা-সাম্প্রদায়িক ও চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলো পশ্চিমবঙ্গে গত চারটি নির্বাচনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এই দলগুলো সর্বভারতীয় দল বলে টিকে আছে কিন্তু বিধানসভায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই। এইসব দলগুলোর শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ইত্যাদি কোনো সংগঠনে প্রভাব নেই বলে তারা বেশী ভোটও তুলতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জামানত জব্দ হয়েছে।

১৯৬৭ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ৫১ জন আর আসন পায় মাত্র একটি, স্বতন্ত্র দল প্রার্থী দেয় ২০ জন আসন পায় একটি। ১৯৬৯ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ৪৭ জন আসন পায় শূন্য, স্বতন্ত্র দেয় ৪জন প্রার্থী আসন পায় শূন্য। প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ দেয় ৪০ জন প্রার্থী আসন লাভ করে ৩টি। প্রাউটিস্ট দল প্রার্থী দেয় ৪ জন আসন পায় শূন্য। হিন্দু মহাসভা প্রার্থী দেয় ৪ জন আসন পায় শূন্য। রিপাবলিকান পার্টি দেয় ৪ জন প্রার্থী আসন পায় শূন্য। ১৯৭১ সালে জনসংঘ প্রার্থী দেয় ২৫ জন আসন পায় একটি। হিন্দু মহাসভা দুজন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ ৫৫ জন প্রার্থী দিয়ে পায় ৭টি আসন। ১৯৭২ সালে জনসংঘ ১৬ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পায়। প্রাউটিস্ট দল ৬ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। হিন্দু মহাসভা ২ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, মুসলিম লীগ ২৯ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ ১ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন লাভ করে। এই হিসেব থেকে সাম্প্রদায়িক ও দক্ষিণপন্থী দলগুলোর ভূমিকা পরিষ্কার করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এদের অস্তিত্ব মোটেই পরিষ্কার নয়। তাদের বিলুপ্তি না ঘটলেও দল হিসেবে গুরুত্ব খুবই কম।

ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলোর অবস্থা নির্ভর করেছে ইউ এল, এফ জোটের শক্তির ওপর। যখন ইউ, এল, এফ জোট শক্তিমান ছিল তখন তারা আশানুরূপ আসন লাভ করত। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে বামপন্থী মোর্চার শক্তি কমতে থাকলে তারা অধিকসংখ্যক প্রার্থী দিয়ে কম আসন লাভ করেছে। তবে এইসব ছোট-খাটো বামপন্থী দলগুলো একেবারে বিলুপ্ত হবে না এইজন্যে যে, এদের প্রত্যেকেরই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র মহলে নিজস্ব সংগঠন রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নে এদের এখনও ব্যক্তিগত প্রভাব রয়েছে। সেই জোরেই এঁরা টিকে থাকবেন। বিধানসভায় যদিও এঁদের প্রতিপত্তি থাকছে না।

এককালের শক্তিশালী ফরোয়ার্ড ব্লক ১৯৬৭ সালে ৪২ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছিল ১৩টি আসন ১৯৬৯ সালে ২৮ জন প্রার্থী দিয়ে ২১টি আসন, ১৯৭১ সালে ৫৩ জন প্রার্থী দিয়ে আসন পায় মাত্র ৩টি আর ১৯৭২ সালে ১৮ জন প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে শূন্য আসন। বিধানসভায় নিশ্চিহ্ন হবার পর দল হিসেবে কোনো রকমে টিকে আছে। ইতিমধ্যে এই দল থেকে কিছু সদস্য পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে।

আর এস পি দল কখনই খুব বেশী প্রার্থী দেয়নি। অল্পসংখ্যক প্রার্থী দিয়ে যথার্থ সংখ্যায় আসন লাভ করেছে। যেমন ১৯৬৭ সালে ৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৬টি আসন, ১৯৬৯ সালে ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ১২টি আসন ১৯৭১ সালে ৪১ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন ও ১৯৭২ সালে ১৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন লাভ করে সমতা বজায় রেখেছে।

বামপন্থী জোটের মধ্যে আর সি, পি, আই ১৯৬৭ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন ১৯৬৯ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন ১৯৭১ সালে ৭ জন প্রার্থী দিয়ে ৩টি আসন এবং ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পেয়েছে।

এস ইউ সি দল বরাবরই খুব বেশী প্রার্থী দেয়নি। বেছাই করা কয়েকটি কেন্দ্রে তারা যথার্থভাবে লড়ে আসন লাভ করেছে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেছে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে। ১৯৬৭ সালে ৬ জন প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন লাভ করে, ১৯৬৯ সালে ৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭টি আসন লাভ ১৯৭১ সালে ২০ জন প্রার্থী দিয়ে ৭টি আসন আর ১৯৭২ সালে ২০ জন প্রার্থী দিয়ে মাত্র ১টি আসন লাভ করে।

দুটো বামপন্থী দল ওয়ার্কার্স পার্টি ও বলশেভিক দল অবলুপ্তির পথে এগিয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টি ১৯৬৭ সালে প্রার্থী দেয় ২ জন আসন পায় ২টি, ১৯৬৯ সালে ২ জন প্রার্থী দিয়ে ২টি আসন ১৯৭১ সালে ২ জন প্রার্থীর ২টি আসন লাভ ১৯৭২ সালে ৩ জন প্রার্থী দিয়ে ১টি আসন লাভ করে। বলশেভিক দল ১৯৬৭ সালে ১ জন প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে একজন করে প্রার্থী দিয়ে একটি আসনও লাভ করতে সমর্থ হয়নি।

বরাবর দেখা যাচ্ছে যে জোট শক্তিশালী সেই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছোট-বড় দলকে ভোটদাতারা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করে। যখন জোট দুর্বল হয় বা জনপ্রিয়তা হারায় তখন তার ছাউনির ছোট দলগুলো সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাজনীতি সনাতন নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তার ব্যতিক্রম নেই। পাঁচ বছর আগে যে ধরনের রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল এখন তা নেই। নেই বলেই ছোটখাটো দলগুলো বদলাচ্ছে। তাই কিছু কিছু দল এগিয়ে চলেছে অবলুপ্তির পথে। কিছু দল যাবে। হয়ত ভবিষ্যতে আরও নতুন ছোটখাটো দলের আবির্ভাব হবে। গণতান্ত্রিক দেশে তার সম্ভাবনাই বেশী।

সম্প্রসারণ ও সামাজিক পরিবর্তন কার ভাগে কত

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতির বয়স দু'শ' বছরও নয়। রামায়ণ-মহাভারত প্লেটো-আরিস্টটল থেকে শুরু করে দেশবিদেশের প্রাচীন লেখকদের রচনায় অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা তত্ত্ব ও তথ্য ছড়ানো থাকলেও অর্থনীতির ওপর প্রথম প্রামাণ্য বা আদর্শ-রূপে গ্রন্থ রচিত হয় মাত্র ১৭৭৬ সালে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ঠিক অর্থনীতির ওপর রচনা নয়—প্রশাসন বা রাজধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ।) সকলেই জানেন, এই প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা হ'লেন অর্থনীতির জনক নামে অভিহিত অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৭৮) এবং গ্রন্থখানির নাম হল এ্যান ইনকোয়ারি ইনটু দি নেচার অ্যান্ড কজেস অফ দি ওয়েলথ অফ নেশানস্'—অর্থাৎ জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও কারণানুসন্ধানের প্রয়াস। জাতির সম্পদের উদ্দেশ্য হল সামগ্রিকভাবে জাতির এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের অভাব মোচন করা। বস্তুতঃ অভাবমোচনের সমস্যাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

সম্প্রসারণ সংক্রান্ত অর্থনীতি :

এ্যাডাম স্মিথ 'সম্পদ' শব্দটি আয়ের অর্থে ব্যবহার করেছিলেন কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও, এ-বিষয়ে আধুনিক লেখকগণ একমত যে ব্যক্তির মত পরিবারের মত জাতিরও অভাবমোচনের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের ওপর—সম্পদের ওপর নয়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে কোন দেশ বা জাতি অভাব-মোচনের পথে কতটা অগ্রসর হতে সমর্থ তা তার সম্পদ বা মজুত মালপত্রের ওপর ততটা নির্ভর করে না যতটা নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্যাদির প্রবাহের ওপর—অর্থাৎ কি পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে তার ওপর। জাতির ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যাদির এই প্রবাহ-কেই বলা হয় জাতির আয় বা জাতীয় আয়। এই কারণে আধুনিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তারই আলোচনা বিশেষভাবে করা হয়ে থাকে। আধুনিক অর্থনীতির এই দিকটা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত অর্থনীতি বা গ্রোথ ইকনমিকস্ নামে অভিহিত।

গ্রোথ বা সম্প্রসারণের ফলে—অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকের গড় বা মাথাপিছু আয়ও বাড়ে যদি না অবশ্য জনসংখ্যা আনুপাতিকের চেয়ে বেশী হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন আমাদের দেশে অনেক বছরই এমন হয়েছে যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় বাড়েনি, কারণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্ধিত জাতীয় আয়কে গড় বা মাথাপিছু আয়ে প্রতিফলিত হতে দেয়নি। দারিদ্র্য পরিবারে সামান্য আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি একটি নতুন অতিথির আগমন ঘটে তাহ'লে ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়ায় সেইরকম আর কি। কিন্তু মাথাপিছু আয়বৃদ্ধিই হল গ্রোথ ইকনমিকসের লক্ষ্য, (এবং বলা যায় গ্রোথের লক্ষণ) মোট জাতীয় আয়বৃদ্ধি নয়। কারণ, মাথাপিছু আয় বাড়লে তবেই বেশী অভাব মোচন সম্ভব হবে—সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন :

সম্প্রসারণের ফলে নানারকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। এই পরিবর্তন যদি কাম্য গতি-প্রকৃতির হয়, তবে তাকে ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়ন আখ্যা দেওয়া হয় তার পরিবর্তন অকাম্য হলে তা হল পশ্চাদগতিরই সামিল। যেমন অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ অর্থাৎ জাতীয় বা মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির ফলে দেশের নগরাঞ্চলের উন্নতি ঘটতে কিন্তু গ্রামাঞ্চল সম্পূর্ণ অবহেলিত হতে পারে ধনবৈষম্য বৃদ্ধির ফলে বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন বাড়তে এবং জীবনধারণোপযোগী অপরিহার্য দ্রব্যাদির উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে ইত্যাদি। এইরকম ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের পরিমাণ—অর্থাৎ কি পরিমাণ রাস্তাঘাট বাড়ীঘর নির্মিত এবং জিনিসপত্র উৎপন্ন হল—দিয়ে বিষয়টির বিচার করলে ভুল হবে দেখাতে হবে ঐ উৎপাদন বৃদ্ধি কাদের জন্য—প্রচলিত অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে কে কতটা পাচ্ছে?

উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার :

সুতরাং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং তথাকথিত উন্নয়নই যথেষ্ট নয় এদের সঙ্গে জড়িত আছে আরও একটি বিশেষ প্রশ্ন—সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন এবং এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বলা যায় সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার যখন দুই গোলার্ধে বৃহত্তর অংশে অন্যতম স্বীকৃত রাজনৈতিক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে বৈপ্লবিক বিপ্লবের পক্ষপাতী যখন অধিকাংশই নন তখন সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে পরিহার করা কষ্টকর শাসকের ন্যায় কঠিন ন্যায়ের শৃঙ্খলে উপেক্ষা করার অর্থ সর্বনাশকে ডেকে আনা। এই উপলব্ধি থেকে বিভিন্ন বিশেষ ধারার যুগে চিত আনা সংবিধানের নীতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে যেমন আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে : ভারতের সকল নাগরিকই যাতে অন্যায়ের বাধা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার পেতে পারে তার জন্যই এই সংবিধান গ্রহণ করা হল। (সংবিধানের প্রস্তাবনা)।

ন্যায়বিচার ও আর্থিক বৈষম্য :

সংবিধানে ঘোষিত ন্যায়বিচার-ব্যবস্থা কার্যকর করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার, কারণ এর জন্যে প্রাথমিক করণীয় হল আর্থিক বৈষম্য বা ধনী দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস, বর্তমানে যে আদর্শ শ্রীমতী গান্ধীর 'গরীবী হটাও' শ্লোগানের রূপ নিয়েছে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে- যেখানে মাথাপিছু আয় অকিঞ্চিৎকর সেখানে গরীবী হটাতে হলে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণকেই প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে হয় নচেৎ দারিদ্র্যকে বণ্টন করে সবাইকে টেনে এক পর্যায়ে নামিয়ে আনা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। অথচ আমাদের দেশের মত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্প্রসারণের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সামাজিক ন্যায়-বিচারের আদর্শ কার্যকর করা ঠিক সম্ভব হচ্ছে না। এই উভয় সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ কি তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে আর্থিক বৈষম্য কি বৃদ্ধিও পেতে পারে, না আমাদের সম্প্রসারণ পদ্ধতিতেই বড় কোন গলদ আছে?—এই হল আজকের দিনের বিশেষ প্রশ্ন।

গুন্নার মিরডালের (এবং আরো অনেকের) মতে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও বৈষম্যের গতি একই দিকে—অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে দেশ যত অনগ্রসর সেই দেশে বৈষম্য তত প্রকট। কারণ খুবই সহজবোধ্য।

এই সব অনগ্রসর দেশকে বর্তমানে মোলায়েম করে বলা হয় স্বল্পোন্নত দেশ বা আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রি। লক্ষণ-বিচারে স্বল্পোন্নত দেশ হল সেই দেশ যার বর্তমান মাথাপিছু আয় অতি সামান্য, কিন্তু যার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জনবহুলতা ও জনবিস্ফোরণ। এর সুযোগ নিয়ে বদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থায় কতিপয় ব্যক্তি ও শ্রেণী সহজেই সমাজের অপরাংশকে শোষণ করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। যেমন, যারা জমির মালিক তারা জমির বর্তমান চাহিদার দরুন সহজেই বেশী খাজনা, ফসলের ভাগ ইত্যাদি আদায় করতে সমর্থ হয়। (অর্থনীতিশাস্ত্রের শৈশব অবস্থাতেই ডেভিড রিকার্ডো এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।) অনুরূপভাবে যাদের নগদ টাকা আছে তাদের পক্ষে বিত্তহীন খাতকদের কাছ থেকে বেশী সুদ আদায় করা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় সামান্য যে কটি শিল্প গড়ে ওঠে তাদের মালিকরা শ্রমের প্রয়োজনাতিরিক্ত যোগানের ফলে মজুরির স্বল্পতা এবং মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাবের দরুন মুনাফার অঙ্কও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এইভাবে বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয়ে খাজনা, সুদ ও মুনাফার অঙ্ক বাড়তে থাকলে মজুরির অংশ কমতে বাধ্য। ফলে খাজনা সুদ ও মুনাফা ভোগকারী এবং মজুরিজীবী শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দিন দিন সম্প্রসারিত হতে থাকে—অর্থাৎ বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাই বলা হয়, আর্থিক বৈষম্যহ্রাসের জন্য প্রথম করণীয় হ'ল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করা।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন সত্ত্বেও বৈষম্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, অথবা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তবে কি করা যেতে পারে? এই প্রশ্নটাই আজকের দিনে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক।

ভারতে বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ:

আর্থিক বৈষম্যের মোটামুটি তিনটি দিক আছে: ধনবৈষম্য, আয়বৈষম্য এবং আর্থিক মর্যাদার বৈষম্য এবং যেহেতু আর্থিক মর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা পরস্পরের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে সম্পর্কিত সেই হেতু আর্থিক মর্যাদার বৈষম্যের ফলে সামাজিক মর্যাদাতেও বৈষম্য দেখা দিতে বাধ্য। যেমন, গ্রামীণ পরিবেশে সামান্য জমির মালিকের যে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক তা কল্পনাও করতে পারে না। ঐ জমি থেকে আয় যাই হোক না কেন, জমির মালিক গ্রামীণ সমাজের ওপরের তলার লোক। এই দিক দিয়ে আয়বৈষম্য অনেকটা তাৎপর্যহীন। তবে আয়বৈষম্যের ফলে যে ভোগবৈষম্য দেখা যায় তা আমাদের মত জনবহুল দেশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে আলোচনা পরে করব। এখন সংক্ষেপে আয়-বৈষম্যের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাক।

ভারতের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিশেষ কম নয়— প্রাথমিক হিসেব অনুসারে ১৯৭০-৭১ সালে তা ছিল ৩৪,০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। মোটের মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের বিচারে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দশের মধ্যে। আবার মোট দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ ধরলে—অর্থাৎ যেসব জিনিসপত্র হাটে-বাজারে বিক্রির জন্যে আসে না এবং জাতীয় আয় গণনায় যার হিসেব পাওয়া যায় না তাদের ধরে বিচার করলে ভারতের স্থান বা র‍্যাংকিং হল চতুর্থ বা পঞ্চম। ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ডের জাতীয় আয়ের সমষ্টির চেয়ে বেশী দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় আয়ের পাঁচগুণ অস্ট্রেলিয়ার তিনগুণ এবং ইংলন্ডের জাতীয় আয়ের অর্ধেক। মোট পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের স্থান জাপান ও কানাডার সঙ্গে একই পর্যায়ে। অথচ এইসব দেশ হল অত্যুন্নত বা উন্নত আর ভারত হল অনগ্রসর দেশ—যদিও খাতির করে বলা হয় স্বল্পোন্নত।

জাতীয় আয়ের পরিমাণ যেমন বিশেষ কম নয়, অপরদিকে জনসংখ্যাও তেমনি বিপুল—১৯৭১ সালের জনগণনার হিসেব অনুসারে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ। ফলে গড় বা মাথাপিছু আয় মাত্র ছশ টাকা— অর্থাৎ মাসিক ৫০ টাকা। এই হিসেব আবার বর্তমান বা ১৯৭০-৭১ সালের দামের ভিত্তিতে—যে সালে কুড়ি বছর আগের তুলনায় টাকার দাম অর্ধেকেরও বেশী কমে গেছে। সুতরাং আজকের মাসিক ৫০ টাকা হল ১৯৫০-৫১ সালে ২৫ টাকারও কম। ১৯৫০-৫১ সালে মাসিক ২৫ টাকায় বা তারও কমে, অথবা আজকে মাসিক ৫০ টাকায় খেয়েপরে বেঁচে থাকা যায় কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কি?

তবুও যদি জাতীয় আয় বণ্টন মোটামুটি বৈষম্যহীন হত, তাহলে এই বিপুল জনসংখ্যার দরুন সামান্য মাথাপিছু আয়েও দারিদ্র্য বা গরীবীর প্রশ্ন আমাদের ততটা প্রপীড়িত করত না। কিন্তু তা হয়নি।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছিল যে (জানুয়ারী, ১৯৬৩) ওপরের দিকে ১০ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এবং নীচের দিকের ২০ শতাংশ জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৫—৩ শতাংশ পেয়ে থাকে। এবং নীচের এই ১০ শতাংশের মাসিক আয় ৭ টাকারও কম। এর কিছুদিন পরে (১৯৬৪) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশের নেতৃত্বে 'জাতীয় আয় ও সম্পদ বণ্টনের ওপর কমিটি' পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত অভিমতকেই সমর্থন করে। কমিটি ঘোষণা করে: পরিকল্পনাধীন প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১) জাতীয় আয়ের বণ্টনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি।

আজকেও—অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশ বছর পরেও যে এই বণ্টন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং দেখা যায়, বৈষম্য বৃদ্ধিই পেয়েছে। মোটামুটি হিসেব অনুসারে বর্তমানে ওপরের দিকে ৫ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ পেয়ে থাকে, আর নীচের দিকে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোকের ভাগ্যে জোটে জাতীয় মোট আয়ের ২০ শতাংশেরও কম। এই হিসেব মেনে নিলে ওপরের পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাবে যে বিগত দশকের শুরুতে আয়-বৈষম্য এত প্রকট ছিল না।

জাতীয় সম্পদের বণ্টনে কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটছে তার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভূমিহীন কৃষিজীবীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এই বৃদ্ধির হার বিগত ২০ বছরে ছিল ৮-১০ শতাংশ। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটছে—সমাজের নীচের স্তরের সম্পদ ক্রমাগতই হস্তান্তরিত হচ্ছে ওপরের স্তরের দিকে। এর ফলে যে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

বৈষম্যের আরও দুটি দিক:

ভারতে আর্থিক বৈষম্যের আরও দুটি দিক নির্দেশ করা যায়: নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য। নগরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে যে গরীবীর পরিমাণ বেশী তা সকলেরই অনুভূত সত্য।

প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর হয়ে থাকে, কিন্তু সকল সভ্য দেশেই গ্রামাঞ্চলে একটা ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান—যাকে 'ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান' বলে অভিহিত করা হয়—লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে এই মান প্রবর্তন করা এখনও যে সম্ভব হয়নি তা শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তাঘাট পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যুৎসরবরাহ, এমনকি পানীয় জল সরবরাহের দিক দিয়ে বিচার করলে সহজে বোঝা যায়।

অনুরূপভাবে আঞ্চলিক বৈষম্য আমাদের দেশে বিশেষ প্রকট। ধরা হয় যে ভারতের জনসংখ্যার মোট অর্ধেক দারিদ্র্য-রেখার নীচে বা কাছাকাছি বাস করে কিন্তু উড়িষ্যায় এই পরিমাণ হল ৭০ শতাংশের মত।

উড়িষ্যার চেয়েও দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল আছে।

বিশ্বজনীন গতি ঃ

এইভাবে আর্থিক বৈষম্যের অস্তিত্ব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সকল সম্প্রসারণশীল দেশের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। বেঞ্জামিন হিগিনস দেখিয়েছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ফিলিপাইনেও (যে দেশের ৫১ তম অংগরাজ্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা শোনা যাচ্ছে) আপাতদৃষ্টিতে মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে কোন পরিবর্তনই ঘটেনি, কারণ যুদ্ধোত্তর যুগের সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি ওপরের তলাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে'। এই ব্যাপারে বোধহয় শ্রীলংকাই (সিংহল) একমাত্র ব্যতিক্রম—একমাত্র ঐ দেশেই জাতীয় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে এবং পাচ্ছে। সুতরাং সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচার ব্রতী রাষ্ট্র হিসেবে শ্রীলঙ্কা সকল স্বল্পোন্নত দেশের ঊর্ধ্বে। অতএব ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়...।'

বৈষম্যের প্রতিফলিত রূপ ঃ

আর্থিক বৈষম্য যে সরাসরি ভোগবৈষম্যে প্রতিফলিত হয় তার উল্লেখ শুরুতেই করা হয়েছে। নমুনাজরিপ বা স্যাম্পেল সার্ভের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ওপরের দিকে ১০ শতাংশ লোকের ভোগের পরিমাণ মোট জাতীয় ভোগের ৩০ শতাংশ, অপরদিকে নীচের দিকে ৪০ শতাংশ মোটের ২০ শতাংশ ভোগ করতে সমর্থ হয় না। খাদ্যদৃষ্টির দিক দিয়ে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশকে অতি দরিদ্র বলেই ধরতে হয়। বাসস্থানের ব্যবস্থাও শোচনীয়। সেন্সাস বিভাগের হিসেবে এই শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গেও ৬৫ শতাংশ পরিবার মাত্র একটি করে ঘরে বাস করে এবং অপরদিকে ৬ শতাংশ পরিবারের ঘরের সংখ্যা ৩ বা ততোধিক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্য-রেখার নীচে বা কাছাকাছি থেকে কোনরকমে দিন গুজরান করে।

বৈষম্যের মৌল কারণ ঃ

সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে পশ্চিম ইয়োরোপে শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে আয়-বন্টন উত্তরোত্তর বৈষম্যমূলকই হচ্ছিল, এবং মাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ে 'স্প্রেড এফেক্ট' বা বিস্তার প্রচেষ্টার (প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়া) কার্যকারিতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পর সমাজকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের ফলে আয় বন্টনের গতি বিপরীতমুখী হতে থাকে। একটা উদাহরণ নিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি কলাকৌশল ও শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় কম ছিল বলে জাতীয় আয়ে ঐ সব ব্যক্তির ভাগও ছিল বেশী। তারপর, ধরা যাক, এই ধরণের লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাদের প্রাপ্যও কমে গেল এবং ন্যূনতম মজুরি আইন ইত্যাদির ফলে মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে বৈষম্যও হ্রাস পেল। (আমাদের দেশে অবশ্য তা ঘটেনি)।

এইদিক দিয়ে দেখলে আর্থিক বৈষম্যবৃদ্ধি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও গতিশীলতারই দ্যোতক। ভারতে কিন্তু সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন কোনটাই চমকপ্রদ নয়। অতএব ভারতে বর্তমান আর্থিক বৈষম্যের বৃদ্ধিবিচারে পশ্চিম ইউরোপের মত অতীত উদাহরণের সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন। বলা যায় নগরীকরণের ক্ষেত্রের মতই বর্ধমান আর্থিক বৈষম্য সম্প্রসারণের হাত ধরাধরি করে চলেনি—নগরীকরণের মতই আর্থিক বৈষম্যের বৃদ্ধির কারণ হল পর্যাপ্ত উন্নয়নের অভাব।

ভারতের উন্নয়নপদ্ধতিও পশ্চিম ইয়োরোপের সংগে তুলনীয় নয়। গোড়া থেকেই ভারত উন্নয়নের জন্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, এবং অন্তত দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬—৬১) থেকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে থাকে যে বৈষম্য অপসারণ উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। ঘোষণাটির অনুমান ছিল মোটামুটি এইরকম অনুমানভিত্তিক ঃ যতই আমরা বৈষম্য হ্রাস করতে সমর্থ হব, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও তত দ্রুততর হবে।

এখানেই রয়েছে আমাদের উন্নয়নপদ্ধতিতে লক্ষ্যের সংঘর্ষ ঃ আগে সম্প্রসারণ, না আগে বৈষম্য অপসারণের ব্যবস্থা। অনেকের মতে, আগে সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হলেই বোধ হয় পদ্ধতিতে যৌক্তিকতা থাকত, কারণ অনগ্রসর অর্থব্যবস্থাই বৈষম্যপ্রসূত দারিদ্র্যের জন্মভূমি। অপরদিকে অবশ্য বলা যায় যে বৈষম্যহ্রাস ছাড়া সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি সম্ভব নয়, এবং আমাদের দেশের মত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সফলতা এই সামাজিক উৎসাহের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু দেখা যায় যে, বৈষম্যহ্রাসের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ বিশেষ কার্যকর হয়নি, তাই সামাজিক উৎসাহসৃষ্টির অপারগতা পরোক্ষভাবে বৈষম্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করে ঐ বৃদ্ধির অন্যতম গৌণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গৌণ কারণ ঃ

বৈষম্যহ্রাসের জন্যে প্রস্তাবিত ও অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের পর্যালোচনা করলেই বৈষম্যবৃদ্ধির অন্যান্য গৌণ কারণের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৩১ সালের করাচী অধিবেশন থেকেই কংগ্রেস ঘোষণা করে আসছে যে আয়ের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। মোটামুটি এর সপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন, কর অনুসন্ধান কমিশন অভিমত প্রকাশ করলেও এ বিষয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব হয়নি, কারণ ভয় ছিল যে, এর ফলে উদ্যোগ ব্যাহত হবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে জমির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণেরও বিরোধিতা করে আসা হয়েছে। এই যুক্তিতে যে, যখন অন্যান্য আয় ও সম্পত্তির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি তখন শুধু জমির ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থা কি ন্যায়বিচারের দ্যোতক হবে?

করব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে বৈষম্য অপসারণের বেশ কিছুটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশাসনিক ত্রুটির জন্যে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি—কর প্রবর্তনের আধিক্যের দরুন বরং ফল বিপরীতই হয়েছে।

অপরদিকে কিন্তু অকল্পিত মুদ্রাস্ফীতি অনেককে দারিদ্র্যরেখার নীচে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে এবং পরিকল্পনার বিপুল ব্যয় ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পদ ও আয়কে কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করেছে।

এই পরিস্থিতিতে কয়েক ধরণের আশু উপশমকারী ব্যবস্থার সাহায্যে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটানোর যে চেষ্টা করা হয়েছে তার সুফল ভোগ জনসাধারণ করেনি, করেছে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যেমন ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র কৃষিজীবীর পরিবর্তে উপকৃত হয়েছে মধ্যবিত্ত কৃষক। আবার সমষ্টি-উন্নয়ন প্রচেষ্টা, কৃষিসম্প্রসারণব্যবস্থা প্রভৃতি প্রশাসনিক ত্রুটির জন্যে দরিদ্র কৃষিজীবীদের ততটা [illegible] করেনি যতটা লাভবান করেছে সংগতিপন্ন কৃষককে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ প্রভৃতির প্রেরণায় ভারতে বিভিন্ন শ্রমকল্যাণ ও মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত আইন পাশ করা হয়েছে সত্যি এবং এর ফলে সংগঠিত বৃহদায়তন শিল্প-ব্যবস্থার শ্রমিকদের অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে এই শ্রমিকরা একরকম বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী—'এ প্রিভিলেজড' ক্লাস। সংখ্যাতেও তারা বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসীর কাছে কিছু নয়। এই শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামবাসীর জন্যে এইরকম কোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মতই ভারতে সেই সেই ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ প্রবণতা দেখা যায় যা ওপরের দিকের জনসংখ্যাকেই সাহায্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকারী কর্মচারীদের জন্যে গৃহনির্মাণের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাজ আপাত চমকপ্রদ হলেও সত্যিই কি অধিক প্রয়োজনীয়? অন্যভাবে বলতে গেলে, গৃহহীনদের জন্যে গৃহের ব্যবস্থা করার চেয়ে সরকারী কর্মচারীদের জন্যে বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা বেশী দরকার? এই ধরনের চমকপ্রদ নির্মাণকার্যকে 'সাধারণের বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ ভোগ' বলে অভিহিত করা হয়।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা বৈষম্য দূরীকরণে সহায়তা করে। এক্ষেত্রেও সরকারী ব্যয়ের অতি সামান্য অংশ জনসংখ্যার নীচের দিকের ভাগে এসেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা পর্যালোচনা করলেই

বোঝা যায় যে উক্ত মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী লোকেরাই বেশী ভোগ করেছে।

অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থা :

আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের জন্যে প্রথম করণীয় হল যাকে বলা হয় অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থা বলতে বোঝায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার পাশাপাশি অস্তিত্ব। বর্তমান অবস্থায় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোই উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা, পরিবহণব্যবস্থা প্রভৃতির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের আয়তন দিন দিন বৃহত্তরই হতে থাকে আর ক্ষুদ্রায়ত প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে সংকটের দিকে। আমাদের দেশে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার প্রতি [illegible] মোহ এই অবস্থাকে আরও ঘনীভূত [illegible] সংকটীভূত করে তুলেছে। আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির এও একটা প্রধান কারণ।

'গরীবী হটাও'-এর [illegible]

বৈষম্যের উক্ত মোল ও [illegible] পরিপ্রেক্ষিতেই 'গরীবী হটাও'-[illegible] বিশ্লেষণ করতে হবে। আগেই [illegible] শ্লোগানের রূপ নিলেও 'গরীবী হটাও' আসলে হল বৈষম্যহ্রাসের [illegible] এবং বর্তমান অবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র-দর্শন। অনুমান করা যেতে পারে যে এই রাষ্ট্রদর্শন নিম্নলিখিতভাবে ভবিষ্যৎ সরকারী অর্থনৈতিক নীতিতে প্রতিফলিত হবে :

(১) দারিদ্র্য দূরীকরণ বা গরীবী হটান সম্ভব হলে মোট (গ্রোস) জাতীয় আয় আপনা থেকেই বৃদ্ধি পাবে, এই পূর্বোক্ত অনুমানের ভিত্তিতে প্রকট দারিদ্র্যের কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আক্রমণ চালান হবে।

(২) উৎপাদন-পরিকল্পনার চেয়ে ভোগ-পরিকল্পনার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বস্তুত, উৎপাদন-পরিকল্পনা হবে ভোগ-পরিকল্পনার সহায়ক।

(৩) ভোগ-পরিকল্পনা টাকার অঙ্কে না করে জীবনযাত্রার মানের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হবে—অর্থাৎ দেখা হবে যে সাধারণের জন্যে ন্যূনতম দ্রব্য ও সেবা যোগান দেওয়া যেন সম্ভব হয়। এক কথায়, বণ্টনের ওপরই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হবে।

(৪) অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে, কারণ উৎপাদন-বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমাদের মত দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ কোন মতেই সম্ভব নয়।

(৫) নিয়োগ হবে পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য, আগের মত গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য নয়।

(৬) যারাই আয়ের স্তর, একটা ন্যূনতমের নীচে তাদের জন্য রাষ্ট্র থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যদান পরিপূরক ব্যবস্থা করা হবে।

(৭) দেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর উন্নয়নের দিক আগে দৃষ্টি [illegible] যাতে এই সব অঞ্চল শিক্ষা [illegible] জল ইত্যাদি ব্যাপারে ন্যূনতম [illegible] পর্যায়ে অন্যতম হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সমাজসেবামূলক কার্যাদির রূপান্তর ঘটাতে হবে।

বলা যায় গরীবী হটাও কার্যক্রমের শ্লোগান সম্প্রসারণমুখী অর্থনীতিতে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রভূত সম্ভাবনার সূচনা করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই কার্যক্রম কতটা সফল হবে তা নির্ভর করবে অন্যান্য ব্যবস্থার ওপর।

[illegible] ব্যবস্থা :

এই [illegible] মধ্যে আছে অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থার পুনর্গঠন, কর-পদ্ধতির কাম্য সংস্কার, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাম্য ভূমিসংস্কার, একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকারের অপসারণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে বিরতিহীন সংগ্রাম।

অর্থনৈতিক দ্বৈত-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্যে প্রথমেই 'আধুনিক' শিল্প-ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষণ বেশ কিছুটা কমাতে হবে। এখানে 'আধুনিক' শিল্পব্যবস্থা বলতে বৃহদায়তন শিল্প-ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করা হচ্ছে, আধুনিক পদ্ধতির শিল্প-ব্যবস্থাকে নয়। জাপানে ক্ষুদ্রশিল্প-ব্যবস্থাকে এমন-ভাবে সংগঠিত করা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্রশিল্প-গুলো বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সার্থক-ভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে, এমনকি ওভারহেড [illegible] ব্যয় কম বলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলো [illegible] চেয়ে কম দামে বাজারে মাল [illegible] পারে। ঋণ-সংগ্রহ, বিক্রি-ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলোর [illegible] দূর করে আমাদের দেশেও তা করা সম্ভব নয় কি? এর জন্যে প্রয়োজন যন্ত্রশিল্প [illegible] শিল্পনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। যেমন, সাধারণের ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যউৎপাদনকারী শিল্প-গুলোকে কর, ঋণ, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখান যেতে পারে, এবং অপরদিকে যেসব যন্ত্রশিল্প, বিলাসদ্রব্য [illegible] জন্যে উৎপাদনে নিয়োজিত তাদের ক্ষেত্রে প্রভেদাত্মক ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

এর জন্যে প্রয়োজন কর-ব্যবস্থার সংস্কারের। কালো টাকার উদ্ধার ও অপসারণ, আয়কর ব্যবস্থায় রদ-বদল ছাড়াও 'অতিরিক্ত মুনাফা কর'র কথা ভাবা যেতে পারে। অবশ্য বিলাস-দ্রব্যের ওপর যে উচ্চহারে কর ধার্য করতে হবে সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এইভাবে কর-সংস্কারের ফলে সম্প্রসারণ ব্যাহত হবে কিনা। এর উত্তরে বলা যায় যে পরিসংখ্যানপ্রসূত মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি সম্প্রসারণের লক্ষ্য নয়, আসলে লক্ষ্য হল স্বল্পোন্নত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করে অর্থনৈতিক কল্যাণকে সম্প্রসারিত করা। আরও বলা যায় যে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও নগরগুলোর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পেলে আভ্যন্তরীণ বাজারও সম্প্রসারিত হবে এবং এই সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা হল ভূমিস্বত্ব ব্যাপারে কৃষিজীবীকে নিশ্চয়তা দান করবার জন্যে। এই সংস্কারসাধনে সরকার ও কৃষিজীবীর মধ্যে সমস্ত মধ্য-বর্তী স্বার্থদের অপসারণ করতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়। এর জন্যে দরকার এই মধ্যবর্তী স্বার্থসমূহের প্রতিযোগীর সৃষ্টি করা। সমবায়ী সংস্থা বা সমবায় সমিতিই এই প্রতিযোগীর অবতীর্ণ হতে পারে।

এটা এখন বাদিস্বীকৃত সত্য যে ভারতীয় শিল্পব্যবস্থার ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়েছে। এর মূলে আছে দুটি কারণ : [illegible] সঙ্কীর্ণতা এবং শিল্প-উদ্যোগের দুষ্প্রাপ্যতা। এর দরুণই ঘটেছে আর্থিক [illegible] কেন্দ্রীভবন এবং অধিকতর আর্থিক [illegible] সুতরাং এর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

উপসংহার :

ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে এবং 'গরীবী হটাও'-এর সঙ্গে এই সব ব্যবস্থাও যে সংযুক্ত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবই নির্ভর করবে কিভাবে গৃহীত নীতি কার্যকর করা হবে তার ওপর।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমাদের সমাজ বিশেষ-ভাবে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগের দিকে ঝুঁকেছে। সরকারের ক্ষেত্রেও বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ ও চমকপ্রদ ব্যয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই গতিকে বিপরীতমুখী না করতে পারলে বৈষম্যজনিত ঈর্ষার প্রশমন করা সম্ভব হবে না। ফলে সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রপীড়িত করবে ব্যাহত ন্যায়-বিচারের অভিযোগ। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে অ্যারিস্টটল সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবের কারণ হল ব্যাহত ন্যায় বিচার। এই দিক দিয়েই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন : বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা যদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন না করতে পারি তবে বিপ্লবকে ঠেকাতে পারব না, কারণ পরিবর্তন ঘটবেই।

সবক্ষেত্রে অনুভূত না হলেও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে, এবং দাংগা দাঙ্গাম। আঞ্চলিকতা, অপরাধ-প্রবণতার বৃদ্ধি ইত্যাদি হল এই পরিবর্তন-আকাঙ্খারই লক্ষণ। পুলিশ - জেল - আদালত-সৈন্য সামন্তের মাধ্যমে এই গতিকে রুদ্ধ সম্ভব হবে না। দেখা যায়, এ ব্যাপারে ধনীশ্রেষ্ঠ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তা একই ধারাতে প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এক অভিমত-গণনায় প্রকাশ পেয়েছে যে অভিমতপ্রদানকারীদের ৮৮ শতাংশ অপরাধ-প্রবণতা হ্রাসের জন্যে দশ আর্থিক বৈষম্যহ্রাসেরই পক্ষপাতী পুলিশী ব্যবস্থার নয়। বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ বা ব্যয় দৃশ্যত আর্থিক বৈষম্যের দ্যোতক। তাই বৈষম্যহ্রাসের পরিকল্পনায় এই কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্টেশনে ঢোকার মুখেই দেখা যায় ট্রেন থেকে। হলুদ রঙের দেয়াল ঘেরা বাড়ি। উমা সেই কুমারী কালের অভ্যেস মতই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকায়। কলেজে পড়ার সময় ও ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করত। কতদিন মনে মনে গুনেছে এক দুই তিন করে। ওদের বাড়ির সীমানা থেকে স্টেশনে এসে ট্রেন থামতে বরাবর ওর চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ গোনা শেষ হত। আজকে আর গুনল না। ট্রেন যাত্রার ধকলে শরীর ক্লান্ত। দেখতে দেখতে গাড়ি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। লটবহর হাতের কাছে নিয়ে সুব্রত তৈরীই ছিল। বেতের ঝোড়া, পাখা, ফ্লাস্ক এসব টুকিটাকি জিনিসগুলো উমাই নিল। কুলীর পেছনে যেতে যেতে সুব্রত হাত বাড়িয়ে বলল 'কয়েকটা জিনিস আমাকে দাও না?'

—আমিই নিতে পারবো। সুব্রত এবার চাপাস্বরে বলল—

—তাহলে আমাকেও নাও না।

—এ্যাই! উমা সলজ্জ হাসল।

রিকসায় যেতে যেতে সুব্রত বলল—ট্রেন থেকে কী দেখলে? অল কোয়ায়েট—

তাই তো মনে হল। ফটিককে দেখলাম ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বাগানে দৌড়চ্ছে। আর। নতুন রং করিয়েছেন বাড়িটা। বাইরের গেটের অপরাজিতা গাছটায় ফুল ফুটেছে। দরজা জানালায় নতুন পর্দা লাগানো হয়েছে।

তাহলে এখানে আসার জন্য এত মরিয়া হয়ে—

বাঃ বিপদ আপদ না ঘটলে বুঝি আসতে নেই।

—তা কেন ঘয়ে-সয়ে -

- এক বছরেরও বেশী তোমার ঐ হিঙ্গলগাঞ্জের জঙ্গলে পড়েছিলাম—মানুষের মুখ তো দেখতে ইচ্ছে করে

—অ।

রিকসাটা বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়াতেই ফটিক, অণু ছুটে এল। মাও দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। বাবা বোধহয় বাড়ি নেই। মালপত্র নামানো হল। ঘরে আসতেই সুব্রতকে মার কিছু অনুযোগ শুনতে হল। সেই যে দ্বিরাগমনে এসেছিল উমা তারপর আর ওকে এখানে আনাই হল না। সুব্রত সুবোধ বালকের মত মাথা নীচু করে বার বার ঘুরে ফিরে একটা কথাই বলতে লাগল—ছুটিছাটা নেই মানে।

সুব্রতর অসহায় চেহারাটা দেখে উমা হাসি চাপতে পারল না। মাও হয়তো কিছু একটা আন্দাজ করে থাকবে। হাত মুখ ধুয়ে চা টা খাও— বলে বাঁদিকে [illegible] দিতে গেল। বাবা বাড়ি ফিরেই আবার ছুটলেন বাজারে। বাড়িতে বেশ একটা শোরগোল পড়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর উমা পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকে দেখল সুব্রত চোখ বুজে সিগারেট টানছে। পোড়া ছাইটা নির্ঘাৎ বিছানায় পড়বে। উমা তড়িঘড়ি ছাইদানিটা এগিয়ে দিল কোনদিন বিছানাটা পোড়াবে।

তা সুব্রত চোখ খুলে ছাইদানিটা বুকের ওপর রেখে ছাই ঝাড়ল। বলল পান [illegible]

হুঁ, মা বলল—তাই। উমা ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ড্রেসিং টেবিল খাট কোট আলনা [illegible] কিছুই সরানো হয় নি। সেই একই জায়গাতেই আছে সব।

—জানো—এই ঘরটা আমার ছিল।

—আমার একার।
—একা একা ভালো লাগত?
—ভেবে দেখি নি।

উমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সেই পরিচিত দৃশ্য। পুকুর ঘাটে পদ্মের নকসা-আঁকা ঘাটের চাতাল। শুধু আজকাল প্রতিবিম্বিত ঘাটটা আজ আর শূন্য নয়। সুব্রত শুয়ে আছে। একার [illegible] আর একার নেই।

উমার যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল। ঘুমিয়ে শরীরটা এখন অনেক ঝরঝরে লাগছে। সুব্রত ঘরে নেই। ভেতরের ঘরে ওর গলা শোনা যাচ্ছে। বাবা আর মার সঙ্গে কথা বলছে। বিষয়—চাকরীর উন্নতি, বদলী, মেন অফিসের কলকাঠি ইত্যাদি। গা ধুয়ে উমা ড্রেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। সুব্রত ঘরে ঢুকল। বলল—চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।

—দূর—কোথায় যাবো?
—নদীটা তো কাছেই নাকি।
—ও তো ছোটবেলা থেকেই দেখছি।
—এবার দেখ—অন্য রকম লাগবে।
—তাই বুঝি।
—কেন এখানে এসে এবার কিছু কিছু অন্য রকম দেখছো না?

উমা হাসল। সুব্রত হতাশার ভঙ্গী করল—যাই অনু ফটিক ওদের নিয়ে আমিই ঘুরে আসি। বন-জঙ্গল না দেখলে আমার আবার ভালো হজম হয় না।' সুব্রত চলে গেল।

সত্যি অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে—যতটা না বাইরে তার চেয়ে বেশী উমার নিজের মধ্যে। মুখে স্নো ঘষতে-ঘষতে জানালা দিয়ে তাকাল উমা। চারপাশের ঝুঁকে-পড়া গাছগাছালির ঘন ছায়া পড়েছে পুকুরের জলে। বাঁধানো ঘাটলার চত্বরটা। মাঝখানে সেই পদ্মফুলের বড় নকসাটা। উমা মুহূর্তের জন্য বর্তমান বিস্মৃত হল। ওর মনে হল—সেই কালের মতই ও যেন কোথাও বেড়াতে যাবে অথবা সিনেমা দেখতে যাবে। সাজ-গোজ হয়ে গেলেই টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সিঁড়িতে চটির আওয়াজ তুলে ও বেরিয়ে যাবে। অথবা বেড়াতে নয়, সিনেমা দেখতেও নয়। পুকুরের চাতালে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসবে। বরুণও বসতো ওখানে। উমা যতক্ষণ না আসতো ততক্ষণ বরুণ দাঁড়িয়ে থাকতো নয়তো পদ্মের নকসাটার [illegible] ওপর পায়চারি করত। অপেক্ষা করত কখন উমা আসবে। উমা ইচ্ছে করে দেরী করত। বরুণের [illegible] পায়চারি করা দেখত আর আপন মনেই হাসত। সেই দিনের কথাগুলো মনে পড়ল উমার। বরুণ [illegible] যাত্রার দলে ঢুকে পড়েছিল। উত্তর বাংলার দিকে, গ্রামে গ্রামে, [illegible] এলাকায় কত জায়গায় ঘুরে বেড়াত দলের সঙ্গে। বরুণ বলতে গেলে পাড়ারই ছেলে। অবাধ গতি ছিল এ বাড়িতে। [illegible] গান গাইত বরুণ। আবার যখন যাত্রায় [illegible] ঢুকেছিল তখন অ্যাক্টিং নিয়ে পাগলামি শুরু হয়েছিল। সিরাজ-দ্দৌলা, ঔরংজেবের পার্ট বলত। পুকুরের চাতাল ছিল ওর স্টেজ, দর্শক উমা; অনু, ফটিক [illegible] কখনও যাও এসে বসত। এই পাগলামির জন্যেই বরুণকে উমার ভাল লাগত। উমা তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। বেশ কিছু দিন পরে বরুণ ওর সফরের ফাঁকে কয়েকদিনের জন্যে এসেছিল। উমাকে দেখে ও কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। উমার চোখমুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ও মাথা নীচু করে বসেছিল। মনে মনে একটা বিচিত্র আনন্দের শিহরণকে অনুভব করছিল। বরুণ কিন্তু সেদিন আলাপে [illegible] উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে নি। উমাও [illegible] মাঝে মাঝেই বরুণ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। কেমন এক বেদনা-বিদ্ধ দৃষ্টিতে উমার দিকে তাকিয়ে থাকছিল। এক সময় খুব আস্তে যেন আপন মনে বলেছিল—'জানো উমা—যেখানেই যাই এই জায়গাটার কথা বড্ড মনে পড়ে—এই পুকুরটা—পদ্মের নকসাটা। আর—তোমার কথা।' উমা নতমুখে বসে-ছিল। কোন কথা বলে নি। সেদিন থেকে ওদের সম্পর্কটা যেন আর আগের মত রইল না। দুজনেই ক্ষণে ক্ষণে গম্ভীর হয়ে যেত। সেই আগের মত গল্প হাসি ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করত কিন্তু পারত না। দুজনেই যেন কাছাকাছি হতে ভয় পেত। তখনই একদিন বরুণ কী একটা কথা বলতে গিয়ে উমার হাতটা ধরেছিল। উমার শরীরের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। বরুণ তখনও কথা বলে যাচ্ছিল—এত দ্রুত বলে যাচ্ছিল যেন কেউ ওকে এক্ষুনি থামিয়ে দেবে। বরুণ কী বলছিল উমার কিছুই কানে যাচ্ছিল না। বরুণ যখন চলে গেল তখনই সোনার থালার মত চাঁদটা আকাশে উঠেছিল। চারদিকের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছিল। মৃদু হাওয়ায় পুকুরের জলে শির শির ঢেউ উঠেছিল। উমা সমস্ত দেহমন দিয়ে এক বিচিত্র সুখকে, আনন্দকে অনেকক্ষণ ধরে আস্বাদন করেছিল।

ব্যাপারটা বোধহয় মার নজর এড়ায় নি। তারপর থেকে বরুণ আর ওদের বাড়ি আসে নি। মা-ই বোধহয় উমার [illegible] বরুণকে কিছু বলে থাকবেন। পরের [illegible] কিছু দিন উমার খুব খারাপ লেগেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোন কোন দিন [illegible] [illegible]বশেই জানালা দিয়ে পুকুরের চাতালের দিকে তাকিয়েছে। যদি বরুণ এসে থাকে। কিন্তু বরুণ আসে নি [illegible]। তারপর কলেজের নতুন পরিবেশ—নতুন নতুন বান্ধবী, সিনেমা জলসা—[illegible] স্মৃতি ম্লান হয়ে গেল। বিয়ের পর আরো পরিবর্তন। নতুন একটা মানুষ—তার স্বপ্ন, তার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, তার অজস্র সব কিছুর মধ্যে বরুণ কোথায় হারিয়ে গেল। আজকেও হয়তো বরুণকে মনে পড়ত না। কিন্তু মনে পড়িয়ে দিল এই [illegible] ড্রেসিং টেবিলের আয়না, জানালা-[illegible]-পড়া পুকুর, পদ্মের [illegible]।

অনু এসে ঘরে ঢুকল—ফুলদি—চুলটা [illegible] চুল বাঁধতে বাঁধতে উমা [illegible] বরুণদা আর আসে না?

—সে কি তুমি জানো না?
—কী?
—বরুণদা তো মারা গেছে।

চুল বাঁধতে থাকা উমার হাত দুটো থেমে গেল।

—[illegible] না—দেশী হলে [illegible] না নিয়েই বেড়াতে চলে যাবে।

—কই আমাকে তো তোরা কিছুই জানাস নি।

মা বারণ করেছিল।' একটু থেকে অনু বলল—জানো ফুলদি—বরুণদা যাত্রার দল ছেড়ে দিয়েছিল। শুধু গান গাইত। এখানে ওখানে সব ফাংশানেই [illegible] গাইতো। খুব নাম হয়েছিল। বরুণদা [illegible] রেডিওতেও চান্স পেয়েছিল।

—ও।

—টিটেনাস না কী [illegible] অসুখ করেছিল। ফুল মালায় এসব দিয়ে সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই প্রসেশনটা গিয়েছিল। বেশ লোকজন হয়েছিল। — কী হচ্ছে—তাড়াতাড়ি কর।'

পুকুরের চাতালটায় উমা যখন এসে দাঁড়াল তখন ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—পুকুরের জল, সিঁড়ি, পদ্মের নকসা। উমা চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ যেন মনে হল বরুণ ওর পাশেই বসে আছে যেমন বরাবর বসত। এক্ষুনি হয়তো উঠে গিয়ে চাতালটায় দাঁড়িয়ে একটু কুঁজো হয়ে ঔরংজেবের পার্ট বলতে শুরু করবে নয়তো গান গেয়ে উঠবে—'আমায় কী দিয়ে সাজাবি মা আমি হব না [illegible] গৃহবাসিনী।' কিন্তু বরুণ তো বেঁচে নেই। উমা স্পষ্ট ভীত হল। চারদিক জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে

যাচ্ছে [illegible] কোনদিকে তাকাতে পারছে না।' বরুণ যেন পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এক্ষুনি ডাকবে—'কী হল বাউলদের মাচ দেখবে না?' অথবা 'আসামের বিহু গান শুনবে?' উমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে এল। ও নড়তে পারছে না। বরুণ হয়তো হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর হাত ধরবে—সেদিন যেমন ধরেছিল। হঠাৎ উমার মনে হল—কে যেন ওকে পেছন থেকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। দুটো শক্ত হাত কাঁধের দিকে উঠে আসছে। বরুণ? ঘাড়ে উষ্ণ নিশ্বাস। এ কী করে সম্ভব? উমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। একটা অব্যক্ত চীৎকার করে ও উঠে দাঁড়াল—কে?

—কী হল? সুব্রতর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় —ভূত দেখলে নাকি?

উমা দুই হাতে সুব্রতকে জড়িয়ে ধরল। সুব্রতর বুকে মুখ লুকোল। ওর চোখ দুটো জলে ভিজে উঠল। তখনও ওর শরীরটা কাঁপছে। এবার ভয়ে নয়—স্বস্তিতে, সুখে।

সোনার থালার মত চাঁদটা তখন মাঝ-আকাশের দিকে উঠে এসেছে। মৃদু হাওয়ায় পুকুরের জলে শির শির ঢেউ উঠছে। পদ্মের নকশা-আঁকা চাতালটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রবণ বেলগোলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাণী শান্তলার নাম অনুসারে এই নাম হয়েছে। শান্তলেশ্বরকে প্রণাম করে নাড়া দিলাম বিশাল ঘণ্টা, গম্ভীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল মন্দিরের সমস্ত বিশাল অভ্যন্তর ভাগ।

মন্দির মধ্যে ঢুকতে দুই পাশে দুই বিরাট কৃষ্ণমূর্তি। পূবে সূর্য নারায়ণের মন্দির।

সপ্ত অশ্বের ওপর সারথি অরুণ।

মূল মন্দিরের পাশে চাঁদোয়া তলে মস্ত বড় নন্দী মূর্তি রয়েছে, আর রয়েছে অনেক স্তম্ভ। তারও অদূরে অনতিপ্রশস্ত স্রোতস্বিনী প্রবহমানা। দূর-সমুদ্রম্ নাম।

কবে কোন বাস্টকূটবংশীয়রা কোন সুদূর নবম শতাব্দীতে হ্রদ তৈরি করেছিল। দূর-সমুদ্রম্। মন্দিরের উত্তর দিকে প্রান্তরে কিছু ঘর বাড়ি, লাল টালির ছাদ, সাদা দেয়াল, সব মিলিয়ে অপূর্ব চিত্র।

এই মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য হল এর বাইরের প্রাচীর যার প্রতিটি অংশ সীমাহীন বৈচিত্র্যময় মূর্তিতে পূর্ণ।

হস্তীযূথ, সৈন্যদল, নানা জন্তু-জানোয়ার, নানারকম পাখি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির নানা উপাখ্যান, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি অতুলনীয় সুষমা নিয়ে প্রস্তরগাত্রে শিল্পীর নিপুণ হাতের সূক্ষ্ম কারুকাজে ফুটে উঠেছে। চতুর্দশ ভুবনের সর্ব চিত্র এঁকেও শিল্পীর তৃপ্তি হয়নি, রামায়ণ মহাভারতের সর্ব উপাখ্যান খোদিত করে রেখেছেন।

প্রবেশ দ্বারের ওপরে প্রভাবলীতে নটরাজের মূর্তিটি বড় চমৎকার।

এর সিলিঙের স্তম্ভের ওপর যে অপূর্ব ব্রাকেট মূর্তি ছিল সে সব ইংরেজরা এদেশের অন্য অনেক বস্তুর মত নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে। এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

বেলুড় মন্দিরের মতই প্রাচীর চিত্র অষ্ট সারিতে গ্রথিত।

সমস্ত দক্ষিণভারতীয় মন্দিরের এই এক বিশেষত্ব।

প্রাচীর চিত্র আটটি সারিতে গ্রথিত থাকে।

এখানকার ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। কোথাও হংসমিথুন, কোথাও শার্দুল, অশ্বারোহী মূর্তি কোথাও। মা শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছে, একজন একজনকে জল ঢেলে দিচ্ছে, সে জল খাচ্ছে। শৃঙ্গাররত নরনারীও রয়েছে।

বাঁদর নারীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করছে, নারী যষ্ঠি উদ্যত করছে বাঁদরের প্রতি, এই দৃশ্য দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলাম।

পুরাণের অসংখ্য কাহিনী।

দশ অবতার, প্রহ্লাদ চরিত্র। হর-পার্বতীর বিবাহ। রাম রাবণের যুদ্ধ। অশোকবনে বিষণ্ণবদনা সীতা। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা।

কর্ণার্জুনের যুদ্ধ।

অর্জুনের হংসধ্বজা, কর্ণের কাক ধ্বজা, এত স্পষ্ট যে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি।

হতভাগ্য কর্ণের রথের চাকা কাদায় বসে গেছে, পর্যুদস্ত অশ্বর হাঁটু ভেঙে পড়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের এই মহা করুণ দৃশ্য কি যে চমৎকার ফুটে উঠেছে পাথরের গায়ে। দেখে চোখ ফেরান যায় না, এত জীবন্ত, মন বেদনায় ভরে ওঠে।

কানাড়া ভাষায় শিল্পীর নাম লেখা রয়েছে 'মাচা'। কে এই শিল্পী এই দুটি মাত্র অক্ষরে নিজের পরিচয় লিখে রেখে গেছেন?

এই শিল্পী হয়ত তৎকালীন পরিচিতির ওপর নির্ভর করেই এই দুটি অক্ষর লিখে রেখেছেন, ভবিষ্যতের অন্তহীন কালের কথা চিন্তা করেন নি।

সবিতা সেনগুপ্ত

অপেক্ষাকৃত বড় বড় মূর্তির মধ্যে বীণা হাতে সরস্বতী মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

মদনিকা মূর্তি নয়নমনোহর।

বেণু হাতে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে কদম্ব গাছের নীচে দণ্ডায়মান। গোপ ও গোপিনীগণ উন্মুখ দৃষ্টিতে তাঁর মোহন মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গরুগুলি এমনভাবে মাথা তুলে গলা উঁচু করে তাকিয়ে আছে, মনে হল যেন জীবন্ত। সেই দূর বৃন্দাবনের এই মধুর দৃশ্য প্রস্তর রেখায় শিল্পী শাশ্বতকালের জন্য বিধৃত করে রেখেছে। আমরা বিভোর হয়ে দেখতে লাগলাম, শিশু দুটি পর্যন্ত চঞ্চলতা ভুলে তাকিয়ে দেখতে লাগল। চোখ সত্যিই ফেরান যায় না। সেই বৈষ্ণব কবির পদ, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' সত্যিই দেখে দেখে নয়নের আশ মেটে না। দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত জনশূন্য প্রান্তরে কি অপরূপ মন্দির কত কাল ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথায় গেছে পরাক্রান্ত সেই রাজবংশ, কোথায় হারিয়ে গেছে সেদিনকার জমজমাট রাজ্যপাট আর জনপদ। কিন্তু কালজয়ী হয়ে রয়েছে অপূর্ব সেই ভাস্কর্য। যার তুলনা মেলা সত্যিই কঠিন।

হালেবিডের মন্দির দেখে শিল্প-সমালোচক ফার্গুসন বলেছেন হালেবিডের মূর্তিগুলির গড়নে ও বিন্যাসে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবের প্রতিফলন রয়েছে যা কেবল ফোটোচিত্রেই দেখা যায়। প্রস্তর রেখায় খুঁটিনাটি ফুটিয়ে তোলার অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও আবার হালেবিডের শিল্পীরা বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন।

ফার্গুসনের মতে জ্যামিতিক জ্ঞানেরও চরম পরিচয় হালেবিডের শিল্পীরা দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্যে মধ্যযুগীয় গথিক-শিল্প যেখানে পরম নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে সেখানেও তারা হালেবিডের শিল্পীদের মত এমন সৌন্দর্য ও জ্যামিতিক পরিমিতিবোধের পরিচয় দিতে পারেননি।

মূর্তিগুলির বহিরেখা ও আলোছায়ার পরিকল্পনাতেও গথিক শিল্পীদের চেয়ে হালেবিডের শিল্পীরা উচ্চস্তরের জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীর চিত্রে বেলুড়ের মন্দিরের মতই ভূমির সমান্তরালবর্তী পর পর আট সারি খোদাই মূর্তি।

ওপরের চার সারিতে মনুষ্য মূর্তি, নীচের চার সারিতে পশু মূর্তি ও লতা-পাতা। নিম্নতম সারিতে রয়েছে ছ'শো চুয়াল্লিশটি হাতী। কোন দুটিই যার এক রকম নয়।

তার ওপরের সারিতে কীর্তিমুখ বা সিংহমুখ। তৃতীয় সারিটি মণ্ডনশিল্পের একটি সুন্দর উদাহরণ। মাঝে মাঝে ছড়ান রয়েছে মন্দিরবহির্ভূত সমাজ-জীবনের চিত্র। নগ্ন মিথুনও বাদ যায়নি।

তার ওপরের সারিতে ফুলের মালা।

ষষ্ঠ সারিতে সমস্ত নৃত্যরতা নারী।

আলারিপ্পু, জাতিস্বরম, বর্ণম্, তিল্লানা, ভারতনাট্যমের এই চারটি মুখ্য নৃত্যাংশের বিভিন্ন মুদ্রা তথা হস্ত-লক্ষণ ও অঙ্গভঙ্গী প্রস্তর-রেখায় অপরূপ লীলাময় হয়ে উঠেছে।

অষ্টম সারিতে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এই সারিগুলির ব্যাখ্যাটা বোধহয় এইরকম—

গোড়াতে পশুজীবন নিয়ে শুরু। প্রথম শ্রেণীতে শুধু হস্তীযূথ।

তৃতীয় সারিতে ভোগী মানুষের জীবনালেখ্য। বৌদ্ধদর্শনে বলে কামলোক যেখানে শেষ হয়, সেখানে রূপলোকের আরম্ভ।

এখানেও তাই।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে মানুষের মালা এবং নৃত্যছন্দে রূপলোকের আভাস। রূপলোকের পর দেবলোক। সবচেয়ে ওপরের সারিতে দেবোপম মানুষের কাহিনী।

এবার কেদার পালা। এত অল্প সময়ে দেখে আশ মেটে না। কিন্তু হাতে সময় বেশি নেই। গাড়ি আমাদের নিয়ে এল ট্রাভেলার্স বাংলোয়।

হালেবিড থেকে ফিরে আমরা আর একবার গেলাম বেলুড়ের মন্দিরে।

বেলুড়ের প্রাচীর-চিত্র দিনের আলোয় ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম।

পাথরের খোদাই করা কৃষ্ণলীলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছি। আরো কত বিচিত্র রকমের ছবি প্রস্তর-রেখায় ছন্দময় করে ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পী। শুধু দেবতার লীলাখেলা নয়, সাধারণ মানব-মানবীর জীবনচিত্রও রয়েছে।

ব্র্যাকেট-চিত্র অনবদ্য।

কোথাও রুদ্রবীণাধারিণী নারী। কোথাও পদ্মহস্তে দর্পণবিধৃতা নারী দর্পণে আপন মুখপদ্মের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করছে, কোথাও তীরধনু হাতে নারী পলায়মান শিকারের পশ্চাতে ধাবমানা। কোথাও শিকার করে নারী হরিণ নিয়ে ফিরছে। কোন প্রমদার পায়ে বিঁধেছে কাঁটা, অপরা তা অতি সন্তর্পণে বের করে দিচ্ছে। এমনি কত সুখচিত্র।

নারী যাচ্ছে মৃগয়াতে। এই চিত্র দেখে মনে হয় ওই সময়ে দক্ষিণাপথে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না।

বস্তুত খৃষ্টজন্মের পর প্রথম সহস্র বছরের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মধ্যে মেয়েদের মুখের ওপর কোন আবরণ দেখা যায় না।

সাচীর ভাস্কর্যে দেখা যায় অলিন্দ থেকে কামিনীরা শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করছে।

মুখ তাদের অনবগুণ্ঠিতাই।

সাচীর ভাস্কর্যও খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের।

অজন্তার কয়েকটি চিত্র থেকেও বোঝা যায় খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে দাক্ষিণাত্যে মেয়েরা অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকত না।

কিন্তু তবু মনে হল শিকাররতা নারীর সাক্ষ্য কি কেবল নঞর্থক, শুধুই কি বলে যে পর্দা প্রথা তখন অজানা ছিল?

আর যা ছিল—নারীর নির্বাধ বাস্তব স্বাধীনতার নিঃসংশয় প্রমাণও কি বহন করছে না? আধুনিক পাশ্চাত্য নারীর মত শিকারে পুরুষের সঙ্গে যাওয়া নয়। সহচরী সঙ্গে নিজের হাতে শিকার করতে যেতেন প্রাক-মুসলমান যুগের হিন্দুনারী।

মূল মন্দিরের অদূরে একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। তার নিকটেই চব্বিশজন তীর্থঙ্করের ছোট ছোট মূর্তি দৃষ্টিগোচর হল।

হিন্দু মন্দির প্রাঙ্গণে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি লক্ষ্য করবার মত। বস্তুত এই দুই মন্দিরেই পরধর্মসহিষ্ণুতার কেবল নয়, পরধর্মের প্রতি কার্যকর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আরো দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়েছি।

এখানে বিষ্ণু-মন্দিরে গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের পাশেই হরপার্বতীর মূর্তি।

হালেবিডে শিবমন্দিরের দুই পাশে দুইটি বিরাট কৃষ্ণমূর্তি।

জৈনধর্ম এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রভূত পরিমাণে বিস্তারলাভ করেছিল।

জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক হলেও তাঁর পূর্বজ। তিনি বিদেহের কোন এক রাজবংশের ছেলে ছিলেন।

জৈনমতে মহাবীরের কাল খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক। তিনিও ভগবান বুদ্ধের মত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দীর্ঘ বার বছর সাধনার পর তিনি কৈবল্য লাভ করেন। তারপর ত্রিশ বৎসর ধর্ম প্রচারের পর বাহাত্তর বছর বয়সে পাটনার অন্তর্গত পাভাতে দেহরক্ষা করেন।

জৈনরা মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করে না। জৈন প্রবাদমতে মহাবীরের আগে এই ধর্মের আরো তেইশ জন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর।

বৌদ্ধ নির্বাণ আর জৈন কৈবল্য একই বস্তু। জৈনদের মতে যোগই হচ্ছে কৈবল্যলাভের একমাত্র পথ।

জৈনধর্মের অনুশাসনগুলির মধ্যে অহিংসা প্রধান কথা।

কঠোরভাবে অহিংসা পালন এবং কৃচ্ছ্র-সাধন এই দুইটি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈন-ধর্মের প্রধান তফাৎ। কৃষি কাজে জীবহত্যা করতে হয় বলে জৈনরা এই কাজটি কখনো করে না।

তবে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে এঁরা অত্যন্ত অগ্রসর।

মহাবীর বুদ্ধদেবের মত গৃহত্যাগে জোর দেন এবং সন্ন্যাসী সংঘ গড়ে তোলেন।

মনে হয়, ভগবান তথাগতের মত মহাবীর তাঁর ধর্মমত আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেননি।

যদিও এই ধর্ম প্রেমের ধর্ম, তবু বৃহত্তর জনতার কাছে তাঁর ধর্মের অনুশাসন পৌঁছায়নি।

রাজা-রাজড়া এবং কতক বুদ্ধিজীবির মধ্যে এই ধর্মের আবেদন পৌঁছেছিল এবং দ্রুতগতিতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। অবশ্য গৌড় বাংলার উপরও জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় তাঁর গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে আসেন এবং সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন।

এবার আমাদের যাত্রা জৈনদের পরম-তীর্থ শ্রবণবেলগোলাতেই।

জৈন ধর্ম-পুস্তককে সিদ্ধান্ত বা আগম বলা হয়। মূল জৈনমত চৌদ্দ পূর্বে (পূর্বে—প্রাচীন গ্রন্থে) সন্নিবেশিত ছিল।

মহাবীরের প্রধান শিষ্যদের নাকি এই সব পূর্বের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে ছিল।

মহাবীরের মৃত্যুর পর দুশ বছর কেটে গেছে। মগধে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল। এই সময়ে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হল। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল এই দুর্ভিক্ষ দেশের বুক জুড়ে ছিল।

দুর্ভিক্ষের সূচনাতে জৈন সংঘের প্রধান অধ্যক্ষ ভদ্রবাহু দেশত্যাগ করতে সংকল্প করলেন। বিপুল সংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও গুরুর অনুগমন করেন।

হালেবিড মন্দিরের গায়ে অপূর্ব শিল্পরীতি

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর মতে এই ভদ্রবাহু বাঙালী ছিলেন আর তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। শ্রুতকেবলী।

বহুদূর পথ। যেন অন্তহীন। পথে যেতে যেতে শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বুঝলেন তাঁর অন্তকাল আসন্ন। তিনি শ্রবণবেলগোলায় থেকে গেলেন। বিশাখাচার্যকে সংঘের ভার দিয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

বিশাখাচার্য ভিক্ষুদের নিয়ে অগ্রসর হলেন। আর যে সম্রাট সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে গুরুর পদানুসরণ করে এসেছেন, দূর দুর্গম পথে তিনি কি করলেন? তিনি যে সার জেনেছেন গুরোর্বাঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিম ততঃ কিম।

তিনি শ্রবণবেলগোলাতেই থেকে গেলেন গুরুর সেবার জন্য।

শ্রবণবেলগোলায় ভদ্রবাহুর সমাধি আজও বর্তমান।

মহাজ্ঞানী ভদ্রবাহু ত দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে জৈনশাস্ত্রের জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল।

জৈনসংঘের অধ্যক্ষ স্থূলভদ্র তখন পাটলিপুত্রে জৈনদের সভা আহ্বান করলেন এবং জৈনধর্মের চতুর্দশ পূর্ব দ্বাদশ অঙ্গে লিপিবদ্ধ হল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যেসব ভিক্ষু গিয়েছিলেন, তাঁরা যখন ফিরে এলেন স্থূলভদ্রের অনুরক্ত শিষ্যদের সঙ্গে তাঁদের বনল না।

কারণ এঁরা বস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছেন আর ভদ্রবাহুর শিষ্যরা উলঙ্গ থাকাই জৈনধর্মের প্রধান অঙ্গ মনে করে নগ্ন থাকতেন। শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন বলে একদল শ্বেতাম্বর আর বিবস্ত্র থাকতেন বলে অপর দল দিগম্বর নামে পরিচিত হলেন।

এই বিচ্ছেদটি সুরু হয় খৃঃ পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে আর খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জৈনরা একেবারে ভালমত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান।

এঁদের মতবাদেও প্রভেদ প্রচুর ছিল।

আমরা যখন হালেবিডে গিয়েছিলাম, আমাদের সঙ্গে ছিলেন ব্যাঙ্গালোর আকাশবাণীর কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার। স্থানীয় লোকসঙ্গীত রেকর্ড করে আনতে ওঁরা গিয়েছিলেন।

শিল্পীদের গানের ভাষা কিছু বুঝলাম না, কিন্তু তাঁদের হতশ্রী রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন চেহারায় ওদিককার গ্রামীণ অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থাই প্রত্যক্ষ হল যেন।

লোকসঙ্গীতের আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্রও যেন ছিল না তাঁদের কণ্ঠে।

শিল্পীদের বেশির ভাগই নারী।

দু-তিনখানা গানের পরে কয়েকটি মেয়ে সমবেত কণ্ঠে একটি গান গাইল। বেশ সুরেলা গলা এবার মনে হল।

আবার লোকসঙ্গীত শুনেছিলাম বেলুড়ে গিয়ে। সেখানেও ইঞ্জিনীয়াররা কিছু লোকসঙ্গীত রেকর্ড করে নিয়েছিলেন।

বেলুড়ের শিল্পীরা বেশির ভাগই হল ছেলে। মেয়ে শুধু অল্পবয়স্ক কয়েকজন। তাদের চেহারা হালেবিডের মেয়েদের মত অমন তারুণ্যবর্জিত নয়। গাইলও ভাল।

যদিও ভাষার জন্য আমরা তেমন উপভোগ করতে পারলাম না।

বিকেল চারটের সময় শ্রবণবেলগোলায় বাসে উঠলাম। আবার মালভূমির উঁচু-নীচু পথ পার হতে হতে বাস থামল এসে এক সময় হাসান শহরে। জেলা শহর।

ফুলেতে গাছেতে মসৃণ সুন্দর রাজপথ দেখতে বড় সুন্দর।

কলাগাছের ঝাড়। নারকেলবীথি।

—কি সুন্দর দেখতে শহরটা!

আকাশবাণীর মিঃ ভাস্কর বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর। এটাকে বলে পুওর-ম্যানস উটি। অর্থাৎ দরিদ্রের উটকামণ্ড।

এখানকার আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য ভাল, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

এই জেলার দক্ষিণদিকেই উত্তর-পশ্চিম কুর্গ। পশ্চিম ভারতের পর্বতশ্রেণী উত্তর-পশ্চিম [illegible] ধার, [illegible] এই [illegible] শ্রেণী [illegible] পূর্ব [illegible] উর্বরা [illegible] [illegible] পেয়েছে। পাহাড়-প্রান্তরে [illegible] [illegible] শস্য-প্রাচুর্যের সৃষ্টি করেছে এ-অঞ্চলে।

কাজেই যারা উটকামণ্ডের শৈলনিবাসে যেতে পারে না, তারা এই সুন্দর হাসান শহরে এসে খুশি হয়, সন্দেহ নেই।

বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে পুলিশ স্টেশন। তার উল্টোদিকে দোতলায় লেখা পিকচার প্যালেস বোধহয় সিনেমাগৃহ।

ড্রাইভার যখন স্ট্যাণ্ডে এসে বাস থামালে, জিজ্ঞেস করলাম, কোন খাবার জায়গা সস্তা বলো ত। লোকটা হেসে বলল, সব সস্তা। এ তো আর ব্যাঙ্গালোর বা মাদ্রাস নয়। এ হল হাসান। বাস-স্ট্যাণ্ডের প্রাঙ্গণেই দোকান রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল রেল দাম—কলগুলো সবাকছুরই।

এদিকে মিঃ ভাস্কর এসে বললেন, তাঁর আত্মীয় একজন জুটে গেছেন। রাতের মত উনি হাসানে থেকে যাবেন। কাল ভোরে আমাদের সঙ্গে এসে শ্রবণবেলগোলায় যোগ দেবেন।

এই সদাহাস্যময় মানুষটি সঙ্গে থাকবেন না জেনে মনটা ভাল লাগল না।

চা খাওয়া হল। কফি কিনে নেওয়া হল। হাসান পেরিয়ে আবার নির্জন স্তব্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলল।

আকাশ এখন মেঘমেদুর। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি সামনে ডাইনে বাঁয়ে সর্বত্র প্রসারিত যতদূর দৃষ্টি যায়।

কোথাও ধান ক্ষেত, কোথাও জলাশয়। মাঝে মাঝে গ্রাম আসছে।

নাম কি? শান্তিনগর।

দু'একজন যাত্রী উঠল, দু'একজন নেমে মেঠো পথ ধরে কোথায় চলে গেল।

বাস এগিয়ে চলছে।

বেলা শেষে বিষণ্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একে আলো নিভেই আসছিল, এবার মেঘ-বরণ আকাশ সেই মন্দিত আলোর কোমল পর্দাটিকে নিজের আঁধার পর্দপুটে একেবারে ঢেকে ফেলল।

বৃষ্টি নামল। আঁধার নিবিড় হয়ে রাতও নামল। অসমতল সঙ্কীর্ণ আঁধার পথে হেডলাইট জেলে গাড়ি সামনে এগিয়ে যেতে লাগল।

কয়েকটা স্টেশন এল গেল।

ড্রাইভার এক সময় দেখাল ওই দূরে আলো দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে, ওই পাহাড়েরই সন্নিকটে আমাদের গন্তব্য-স্থল।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া হু হু করে বইছে, বৃষ্টির ছাট আসছে। গাড়ির ছাদ চুঁইয়ে দু এক ফোঁটা পড়ছে। খোকাকে চাদর জড়িয়ে নেওয়া গেল।

গাড়ি এল চিকমগপেটে।

আকাশবাণীর সুখযাত্রীরা লোক-সঙ্গীতের শিল্পীদের খোঁজে ব্যস্ত। গাড়ির প্রোপ্রাইটার মাঞ্জাপ্পার তত্ত্বাবধানে লোক গেল শিল্পীদের খোঁজে।

গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল।

বর্ষণমুখর রাত্রিকালে পাওয়া গেল না কাউকে। আবার গাড়ি ছাড়ল।

এক সময়ে মাঞ্জাপ্পা [illegible] এল।

নিবিড় অন্ধকারে [illegible] বর্ষণের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে হাতের ছাতি খুলে মাঞ্জাপ্পা যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন ভাবলে আজও আমার বিস্ময় বোধ হয়।

সংকীর্ণ বন্ধুর পথ। ঝকর-ঝকর শব্দ করতে করতে বর্ষার রাস্তায় জমা জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে গাড়ি চলতে লাগল।

প্রায় এসে গেল শ্রবণবেলগোলা।

চড়াই পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওপরে ওঠার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেখা যাচ্ছে, চূড়ায় আলোকিত গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্তি।

শ্রবণবেলগোলা।

যেখানে গুরু শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সঙ্গে গৃহীত শিষ্যরূপে চন্দ্রগুপ্ত এসেছিলেন। তাঁর নাম তখন প্রভাচন্দ্র।

এক সময় পাহাড়ের পাদদেশে এসে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, ট্রাভেলার্স বাংলো।

রাত্রি তখন সাড়ে দশটা।

এই বাংলোর ছোট ছোট খান কয়েক ঘরের ব্যবস্থা ভালই। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা ভালো বলা চলে না। এই নির্জন প্রদেশে আবহমানকাল থেকেই বোধহয় খাদ্যদ্রব্য বিরল।

ভদ্রবাহু যখন এদেশে এলেন, আপন অন্তিমকাল আসন্ন জেনে রয়ে গেলেন এখানেই, চন্দ্রগুপ্ত রইলেন গুরুর সেবা করার জন্য।

বিশাখাচার্য গুরুর আদেশে গমন করলেন মহীশূরে। দেশে প্রত্যাগমন করার কালে পুনরায় এলেন শ্রবণবেলগোলায়।

চন্দ্রগুপ্ত সাধামত আতিথি সেবা করলেন। কিন্তু বিশাখাচার্যের মনে সন্দেহ হয়েছিল এই নির্জন প্রদেশে গৃহস্থ ত একজনও নেই। তবে এমন আতিথ্য সম্ভব হল কি ভাবে?

তিনি নাকি প্রথমে চন্দ্রগুপ্তকে বন্দনাও করেন নি। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভেঙেছিল। চন্দ্রগুপ্ত কত পবিত্রচিত্ত তা বুঝতে পেরেছিলেন।

আমাদের অবশ্য সেদিন ট্রাভেলার্স বাংলোতে অতি কদন্ন খেয়েই থাকতে হয়েছিল। ঘরজামাই পণ্ডিতকাকাকে কদন্ন খাইয়ে গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, আমরা পালালাম না। পাহাড়ের ওপর আলোকিত গোমতেশ্বরের পাদদেশে পৌঁছনের জন্য রাত্রিবাস করতেই হল।

রাত্রি তিনটের সময় আমরা জেগে গেলাম। পাহাড়ে এখনই যাব, হাতে ত সময় বেশি নেই। আয়া যে ভাবে ঘুমুচ্ছে তাতে যে সে সহজে জাগবে এবং আমাদের সহ-যাত্রিনী হবে তা মনে হল না।

শিশুরাও ঘুমোচ্ছে।

ও থাক তাহলে ওদের নিয়ে।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখি নিশান্তের আঁধারে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে ওঠার আলোগুলো। চূড়ায় আলোকিত গোমতেশ্বরের মূর্তি সারারাত অতন্দ্র প্রহরী রয়েছেন তারাখচিত বিশাল আকাশের নীচে।

পার্বত্য প্রকৃতির বিরাট আরণ্যক পটভূমিকায় এক অপূর্ব মহান দৃশ্য।

আমরা রওনা দিলাম, যাতে প্রত্যুষের আগেই গোমতেশ্বরের পায়ের নীচে গিয়ে পৌঁছাতে পারি।

আঁধার জনহীন পথ তারার আলোয় স্বচ্ছ দেখাচ্ছে, আমরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। চন্দ্রগিরি আর ইন্দ্রগিরি।

দুই পাহাড়ের মধ্যে শ্রবণবেলগোলার তীর্থ। পাহাড়ের পাদমূলে এসে প্রশস্ত সিঁড়ি ভেঙে আমরা ওপরে উঠতে আরম্ভ করলাম।

পাঁচশো পঞ্চাশটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে প্রথম চত্বরে আসা গেল। প্রথম দরজা পেরিয়ে।

চারদিক ঘেরা পাথরের খাড়া দেয়াল, দুর্গ প্রাকারের মত।

বিরাট প্রাঙ্গণ পাথরে বাঁধানো, মাঝখানে প্রধান মন্দির।

ভেতরে তিনটি প্রধান তীর্থঙ্কর রয়েছেন উত্তর-পশ্চিম আর পূর্বমুখী তিনটি পৃথক মন্দিরাংশে।

প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ, চতুর্দশ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ আর দ্বাবিংশতিতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ। কিংবদন্তী এই যে আদিনাথের ছিল একশত তিনজন সন্তান।

এঁদের ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। বাইরের প্রাঙ্গণে উঠে এলাম আরো কটা সিঁড়ি বেয়ে।

এই বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রাচীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে তৈরী।

প্রাঙ্গণ প্রাচীরে নানা চিত্র খোদিত রয়েছে। তার মধ্যে রামলক্ষ্মণ সীতা ও হনুমানের চিত্র, বালগোপাল কালীয় দমন ইত্যাদির চিত্র দেখে বিস্মিত হলাম।

সন্দেহ নেই এগুলি জৈনতীর্থে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি সহিষ্ণু শ্রদ্ধারই পরিচয় দিচ্ছে।

গল্প শুনলাম সুপ্রাচীন যুগে রাম-লক্ষ্মণ এসেছিলেন লঙ্কা যাবার পথে।

এখন যেখানে গোমতেশ্বরের মূর্তি দণ্ডায়মান রয়েছেন, তখন সেখানে ছিল অখণ্ড পাহাড়। শ্রীরামচন্দ্র এই ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের গায়ে গোমতেশ্বরের মূর্তির একটি স্কেচ তীরফলকে দিয়ে এঁকে রেখে যান।

তারপর নিরবধি কাল বইতেই লাগল। একদা মহীশূরের চামুণ্ডরাজের দৃষ্টি-গোচর হল সেই তীরফলকাঙ্কিত রেখাচিত্রটি।

চামুণ্ডরাজা মহীশূরের বিখ্যাত গঙ্গা বংশের রাজা রাচমাল্লার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এক হাজার খৃষ্টাব্দে এই গঙ্গা বংশের আনুকূল্যে মহীশূরে জৈন ধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। চামুণ্ডরাজ পাশের

পাহাড় চন্দ্রগিরিতে শিবির সংস্থাপন করেছিলেন।

রাত্রে নরপতি স্বপ্নে আদেশ পেলেন, পশ্চিম দিক মুখ করে তীর নিক্ষেপ করো। সেই তীর যেখানে পড়বে সেখানে গিয়ে দেখবে শ্রীরামচন্দ্র এক মূর্তির বহিরেখা এঁকে গেছেন। এই মূর্তিকে তুমি রূপ দাও। ইনিই গোমতেশ্বর।

চামুণ্ডরাজ তীর ছুঁড়লেন।

পবনবেগে তীর অদৃশ্য হয়ে গেল পলকে হাওয়ায় ঝলক তুলে।

তারপর বেরিয়ে পড়লেন তিনি নিজেরই নিক্ষিপ্ত শরের সন্ধানে।

বন পর্বত জটিল অরণ্যের দুর্গম পথে বিপথে অনেক ঘুরলেন, অনেক খুঁজলেন। যে শর তিনি নিজেই নিক্ষেপ করেছেন সে শর কোথায় আত্মগোপন করল?

শেষে খুঁজে খুঁজে এসে দেখেন ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের চূড়ায় সেই শায়ক শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্কিত বহিরেখার কাছে নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে।

চামুণ্ডরাজ তখন পাথর কেটে কেটে এই বিশাল মূর্তি গড়লেন।

মনে হয় সারা বিশ্বে এর চেয়ে বৃহত্তর মূর্তি আর নেই।

এই বিপুল মূর্তি পা থেকে মাথা পর্যন্ত ৫৬½ ফিট উঁচু।

৯৮৩ খৃস্টাব্দে এই বিরাট নগ্ন মূর্তির নির্মাণকার্য সমাধা হয়।

আসলে এ হল বাহুবলীর মূর্তি।

বাহুবলী আর গোমতেশ্বর এক।

বাহুবলী প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের পুত্র। আদিনাথের দুই স্ত্রী। যশস্বতী ও সুনন্দা। যশস্বতী একশত এক পুত্র, সুনন্দার একটি পুত্র ও একটি কন্যা।

পুত্রের নাম বাহুবলী।

যশস্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত দিগ্বিজয় করে ফিরে আসছিলেন। আগে আগে আসছিল তার চক্র, যেমন আসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব। হঠাৎ সেই চক্রের গতি স্তব্ধ হল। কেন? কার এমন দুঃসাহস হল যে দিগ্বিজয়ীর চক্রের গতি রোধ করতে চায়?

ভরত এগিয়ে এলেন।

ভাই বাহুবলী তার অধীনতা মানতে রাজি নয়।

ভাইয়ে ভাইয়ে ঘোর যুদ্ধ সুরু হল।

কিন্তু সে যুদ্ধ অহিংসার।

সে আবার কেমন?

দৃষ্টি যুদ্ধ, জলযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ।

জলযুদ্ধ হল পরস্পরের গায়ে পাখা দিয়ে জল ছেটানো।

তিনটিতেই বাহুবলী জয়ী হলেন।

অপমানিত বড় ভাই অহিংসা ভুলে চক্র ছুঁড়ে মারলেন ছোট ভাইয়ের দিকে।

চক্র কিছুই করতে পারল না বাহুবলীর।

বাহুবলী চক্র লুফে নিয়ে ভরতের দিকে ছুঁড়ে মারতে পারতেন।

কিন্তু তাঁর তখন বৈরাগ্য এসেছে।

করুণ উদাস বৈরাগ্য। এসেছে সুদুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি।

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে মিথ্যে মনে হল সব কিছু।

তিনি অরণ্যে প্রবেশ করলেন তপস্যার জন্য।

অনেক অনেক বছর তপস্যা করলেন। দেহের চারদিকে জমল বল্মীক, দেহ ঘিরে দেহের চারদিকে গজালো নানা লতাপাতা। সেই লতা খোদিত রয়েছে গোমতেশ্বরের বিশাল উন্নত দণ্ডায়মান মূর্তিকে ঘিরে।

হাঁটুর নীচ থেকে দুদিক বেয়ে দুটি লতা বাহুমূল পর্যন্ত উঠে গেছে।

উদাস করুণ ভাব ফুটে উঠেছে মুখে চোখে সর্ব অবয়বে।

অবিস্মরণীয় এই মূর্তি।

দুরকম আসন তপস্যার।

এক, পরিমকঙ্ক আসন, ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে; দুই কায়োৎসর্গ আসন, উন্নতদেহে দণ্ডায়মান হয়ে। নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ। দেহের প্রতি পরিপূর্ণ বীতরাগ পরিস্ফুট।

কায়োৎসর্গ আসনেই বাহুবলী তপস্যা করেছিলেন।

গোমতেশ্বরের মূর্তির পাদদেশে লেখা আছে, চামুণ্ডরাজকৃত ইত্যাদি।

মিঃ ভাস্কর বললেন, ভাষাটা মালয়ালম ভাষার সঙ্গে মারাঠি ভাষার সংমিশ্রণ।

নীচে ছোট একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে। মূল বিম্বের প্রতিবিম্ব পূজার্চনার জন্য।

তৈরি হবার পর সুরু হল মূর্তির অভিষেক।

কলসি কলসি দুগ্ধ, ঘৃত, থরে থরে আরো নানা পূজা উপচার নিয়ে এসেছেন ভক্তজন। কিন্তু সবই সামান্য হল। মূর্তিকে বিধৌত করা গেল না।

ম্লান মুখে বসে রইলেন সবাই মূর্তির পায়ের কাছে—কি করা যায়, কি করা যায়? একি হল?

এমনি সময়ে এলেন এক বৃদ্ধা। নাম পদ্মাবতী। ন্যুব্জ দেহ, কিন্তু তপস্যায় করুণ তাঁর প্রশান্ত মুখশ্রী।

পদ্মাবতী এনেছিলেন বিলিগুল্লা অর্থাৎ শাদা গোল বেগুনের মত দেখতে ছোট একটি বাটিতে করে পঞ্চগব্য।

কানাড়া ভাষায় বিলি মানে শাদা, গুল্লা মানে বেগুন, একরকম শাদা গোল বেগুন ওদিকে হয়। সবাই ভাবল, এত দুধে-ঘিতে কিছুই হল না, হবে পদ্মাবতীর এই তুচ্ছ উপচারে?

কিন্তু তাই হল।

এ যেন অনেকটা সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রভুর জন্য ভিক্ষা আহরণের কাহিনীর মতই।

নগরীর শ্রেষ্ঠী বণিক সব হার মেনে গেল, ধনরত্ন মণিমানিক্য মহার্ঘ্য বস্ত্রভূষণ কত কিছু পথের ধূলির উপর জমা হয়ে গেল, কিন্তু সন্ন্যাসীর ঝুলি শূন্যই রইল, ভিক্ষু শ্রেষ্ঠের যোগ্য ভিক্ষা মিললই না।

রাজা আর শ্রেষ্ঠী ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে গেলেন সব। বিশাল নগরী লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল, সন্ন্যাসী নগর সীমা ছাড়িয়ে প্রবেশ করলেন কাননে।

সেখানে এক দীনা নারী অরণ্য আড়ালে কোনমতে আত্মগোপন করে নিজের একটি মাত্র ছিন্ন বসন শরীর থেকে টেনে নিয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে ফেলে দিল আর তাতেই খুশি হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠলেন সন্ন্যাসী।

সামান্য অথচ সাংঘাতিক এই ত্যাগে মুহূর্তে পূর্ণ হল মহাভিক্ষুকের সাধ।

এখানেও দরিদ্রা, নগণ্যা, কিন্তু ভক্তিমতী নারী পদ্মাবতীর এই অতি সামান্য নিবেদন অসামান্য হল গোমতেশ্বরের অসীম করুণায়।

সবাই দেখল ভক্তির কাছে সব তুচ্ছ।

পদ্মাবতীর ওই একটুখানি পরিমাণ পঞ্চগব্য অশেষ হয়ে লাগল মূর্তির মাথায়, গায়ে, সারা শরীরে। তিনি প্লাবিত হয়ে গেলেন ভক্তির অর্ঘ্য ধারায়।

বিলিগুল্লা থেকে জায়গাটার নাম শ্রবণ বেলগোলা।

ফেরার পথে আবার আমরা একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম।

—শেষ—

পণ্ডিতের নামের সঙ্গেও 'বাবু' নামের সংযোগ হইল। কখন কখনও লেখিকার কর্ণ তাহার শ্রবণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আবার কলিকাতায় ঝি মহলে কোন -কোন বড় ঘরের মেয়েরাও 'দিদিবাবু' বলিয়া পরিচিত হইলেন! আমি কিন্তু ব্যাকরণের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া, কোন বৈয়াকরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ প্রয়োগ হইবে, মহাশয়?' [illegible] বলিলেন, 'বাবু শব্দ যখন [illegible] আকারন্ত নয়, তখন 'বাব্বী'. [illegible] তোমার সংশয় হইবার কারণ [illegible] বুঝিলাম, শিক্ষিতা ভগিনীগণ [illegible] হিড়িকে পড়িয়া ইংরেজি চালচলনের অনু-করণে 'ঘোষা' না হইয়া 'ঘোষ' হইয়াছেন, 'সেনা' না হইয়া 'সেন' হইয়াছেন, 'উপাধ্যায়ী' না হইয়া 'উপাধ্যায়' হইয়াছেন। এখানেও সেইরূপ দেশী ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণদিগকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছেন।

পুরুষদিগের ধৃষ্টতা যেমন সহ্য হয় না, স্ত্রীদিগের একান্ত পৌরুষভাবে কেমন পুরুষভাব আসিয়া দুঃখিত করে। এইটি প্রচলন হইবার সম্বন্ধে আর একটি কারণ আছে। ব্রাহ্মণভিন্ন জাতির স্ত্রীলোকের উপাধি ছিল 'দাসী'। এই অসম্মানের উপাধি ধারণে ভগিনীদিগের একান্ত আপত্তি; কিন্তু উৎকল ব্রাহ্মণদিগের ভিতরে অনেকের 'দাস' উপাধি আছে, তাঁহারা আভিজাত্য ও স্বশ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোন কোন সন্ন্যাসীর 'দাস'—কোন কোন শ্রমণার 'দাসী' উপাধি ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে অধিকাংশ পুরুষের দাস, অধিকাংশ মহিলার দাসী উপাধি অতীত যুগ হইতে রহিয়াছে। যখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দাস বলা যায় না, তখন বলিতে হইবে এ দাস-দাসী জগতের। জগতের দাস-দাসী হইবার সৌভাগ্য ক'জনের আছে! জগতের দাস-দাসী হইলেই ত' জগন্নাথের দাস-দাসী হওয়া যায়। দাস ও সেবকের অর্থে কোন প্রভেদ নাই। এখন ত' [illegible]শিক্ষিত যুবকরা সেবক ([illegible]সেবক) সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তাহার [illegible] হইতে-[illegible] তাহাতে লজ্জিত না হইলে, দাস [illegible] হইবার [illegible] কি?

[illegible] বৈশ্য, শূদ্র [illegible], বর্ম্মা, গুপ্ত, দাস [illegible] উপাধির সৃষ্টি করিয়া স্ত্রী সাধারণ[illegible] 'দেবী' উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রী জাতির মধ্যে আর জাতিগত পার্থক্য [illegible] নাই। আমার বোধহয়, পূর্ব্বে [illegible] মহিলারা অবলীলাক্রমে এই দেবী উপাধি গ্রহণ সমর্থা ছিলেন। এখনও কোচবিহার ও পাঙ্গার * রাণীরা 'দেবী' উপাধিতে অলঙ্কৃতা রহিয়া-ছেন। মধ্যযুগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের একটি ভুলে শূদ্রা-মহিলাদিগের 'দাসী' উপাধি হইয়াছে। আমি সাহস করিযা বলিতে পারি, রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা স্থির করিতে যাইযা অনেক টানাহেচড়া করিয়াও সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। আমি শিক্ষিতা ভগিনীদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সকলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্ব্বিশেষে ঋষিকল্পিত এই 'দেবী' উপাধি গ্রহণ করিয়া জাতীয়তা রক্ষা করুন, ঋষিদিগের উপরে সম্মান প্রদর্শন করুন ও এবিষয়ে ইংরেজি অনুকরণের বর্জ্জন করুন।.. এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথা অনেক বলিয়া ফেলিলাম। সকলের নিকট সে জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা।

সে সময়ের বিলাত-ফেরতরা যেমন বাঙ্গালা ভাষা, দেশীয় আচার ও দেশীয় পরিচ্ছদের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, সেইরূপ 'বাবু' উপাধির উপরেও তাঁহা-দিগের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তাঁহারা ছিলেন 'মিস্টার', আর পত্নীকে গাউন পরাইয়া 'মেম সাহেব' না বলাইয়া ছাড়িতেন না। এক্ষণে সে হাওয়া বদলিয়াছে। এক্ষণে বিলাত-প্রত্যাগতদের ভিতরে আর সে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই হিড়িক না পড়িত তবে এতদিনে বিলাত-প্রত্যাগতদিগের ভিতরে আর সে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই হিড়িক না পড়িত তবে বিলাত-প্রত্যাগতরাও 'বাবু' উপাধি গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমানে কিসের জন্য যে 'বাবু' উপাধিটি উবিয়া গেল, ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালী বাবুরা ফস্ করিয়া বেচারা 'বাবু'টিকে বয়কট করিলেন। আসামের সহিত পূর্ব্ব-বঙ্গকে গভর্ণমেন্ট এক করিয়াছেন (স্বাধীনতা পূর্ব্বের কথা) বলিযা বাঙ্গালীরা ত' ঘোর নারাজ; অথচ তাঁহারা আসামীয় উপাধি 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীমান' সাদরে গ্রহণ করিয়া নামের সঙ্গে যে 'বাবু'র একটুকু সম্বন্ধ ছিল তাহাও ঘুচাইয়া দিতেছেন। 'বাবু' বেচারা এমন কি দোষ করিযাছেন যে, তাহাকে এমনভাবে একঘরে করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, 'বাবু' শব্দের কোন মূল পাওয়া যায় না; ও শব্দটি সাহেবদিগের সৃষ্টি, তাঁহারা আমাদিগকে তাচ্ছল্যার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। আমার বিশ্বাস ইউরোপীয়ান দিগের ভিতরে যাঁহারা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এদেশবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি 'আর্য্য' নামে পরিচিত জানিযা ভারতবাসী সকলকেই আর্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সাহেবেরা এ দেশী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকেরা 'আর্য্যা', সুতরাং 'আয়া'; এই 'আযা' হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকৃষ্ট জাতীয়া পরিচারিকাকে 'আয়া' বলিতে আরম্ভ করেন। সাহেবরা সেইরূপ নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন বলিযা কি আমরা আর্য্য জাতীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব না? না, আর্য্যা, হইব না? সাহেবেরা আজও সেরূপ নিকৃষ্ট অর্থে 'বাবু' শব্দের ব্যবহার করে না।

'বাবু' শব্দটি আজগবি সৃষ্টি হয় নাই। সংস্কৃতে 'ভাব' শব্দের অর্থ পণ্ডিত; 'ভাবুক' শব্দের অর্থ কল্যাণ। ইহার কোন একটি শব্দ হইতে 'বাবু' শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে, মাননীয় ব্যক্তির সম্বোধনে অনেক স্থলেই 'বাব' শব্দের * ব্যবহার আছে। এই 'বাব' শব্দের সহিত 'বাবু' শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।'

—ক্ষপণক

* রঙ্গপুরের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত পরগণা।

* বৃহদারণ্যক, ৬ অধ্যায়

(২)

রাংতা ডবল পয়সা কুড়নোর দিন ক্র। ঝাপসা হয়ে আসছিল।

হয়তো পাড়ে থাকতে দেখলে কুড়ি র রাখতাম, কিন্তু তেমন নিধি পাওয় আগ্রহে নয়। এক সময় যে ওদের জন্যে আগ্রহ ছিল, এবং মমতায়।

আজও কি তেমন হয় না কখনো কখনো?

বর্তমানের শিশুদের বস্তুর প্রতি অনাসক্তি, তুচ্ছের প্রতি ঔদাসীন্য দেখে কি মনটা কেমন একটা মনকেমনের বিষন্নতায় ভরে যায় না? যে জিনিসটা আমার নাতনীর কুড়িয়ে তুলে দেখবার কথা, সেটা তাকে মাড়িয়ে যেতে দেখে ব্যথায় মনটা টনটন করে ওঠে নিজেই ধুলো ঝেড়ে তুলে রাখি। সেদিন একটা পারা ভেঙে যাওয়া থার্মোমিটার তুলে রাখলাম চুপি চুপি, নাতনীর চোখের আড়ালে।

ব্যাপারটা হাস্যকর, তবু ওটার সঙ্গে যেন আমাদের সেই প্রাচুর্যহীন স্বল্প সম্বল শৈশবটা যেন কোথা থেকে কুণ্ঠিত হাসি-মুখে উঁকি মারলো। মেজদার সংগ্রহশালায় এই বস্তু ছিল একটা, মেজদা সেটাকে ছোট ছোট লাইন টানবার 'রুল কাঠ' হিসেবে ব্যবহার করতো; আমরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখতাম। আমাদের পতুলের সংসারে কারো প্রবল জ্বর এসে গেলে, কতো বাস্তবভাবে ডাক্তার সাজা যেতো ওরকম একটা পেলে।

ভগবানের কাছে রীতিমত প্রার্থনাই করেছি বাড়িতে কারুর জ্বর হোক, আর থার্মোমিটারটা ঝাড়তে গিয়ে ধাক্কা লাগুক। কিন্তু ভগবান আর কোন কথাটাই বা কান পেতে শোনেন? জ্বর যদিও বা কারো হয়ে থাকে 'জ্বরকাঠি' অক্ষতই থেকেছে।

কিন্তু এখনকার শিশুরা অমন নিজেদের তৈরী করা 'ঝমঝুমের' দিকে ফিরে তাকাবে কেন? তাদের জন্যে তো নিখুঁৎ 'ডাক্তার সেট' বাজারে মিলছে। প্লাস্টিকের দোলাতে [illegible] এসে পড়ছে সংসার যাত্রার যাবতীয় সরঞ্জাম। ওদের ঘরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে—ড্রইংরুম সেট বেডরুম সেট স্টোর-রুম সেট কীচেন সেট ডাইনিং টেবল সেট। গড়াগড়ি খাচ্ছে টেলিফোন গ্রামোফোন রেডিও, সেলাই কল, —— —— কিছু। গাড়ী পালকী তো থাকবেই।

এই সব ছদে ছদে অবিকল সত্যি-কার মত খেলনাগুলো দেখলে হঠাৎ হঠাৎ মার জন্যে মন কেমন করে যায়। কে জানে মার সেই প্রাণতুল্য কাঁচের আলমারিটার কী গতি হয়েছে এখন। হয়তো কাকা-জেঠাদার ছেলেমেয়েরা সেই অকিঞ্চিৎকর জিনিস-গুলো আছড়ে ভেঙে পায়ে মাড়িয়ে শেষ করেছে আর আলমারিটা নেহাৎ সেকেলে বলে ভাঁড়ার ঘরে স্থান পেয়েছে। অথবা স্থানই জোটেনি কোথাও, ছাতের কোণে নির্বাসিত হয়ে পড়ে থেকে [illegible] গতের নশ্বরতার [illegible] ব্যঙ্গমিশ্রকের হাসি হাসছে। [illegible]

যেদিন আমরা [illegible] ডাক্তার রোডের সেই মস্ত ছাতওয়ালা সুন্দর বাড়িটায় গেলাম, সেদিন ওই বাড়ি-ঝাড়া ফেলে দেওয়া ধুলো-জঞ্জালের মধ্য থেকে একটা আশ্চর্য জিনিস পেয়েছিলাম। আশ্চর্য, আর [illegible]।

সেবারের [illegible] একেবারে যেন কটোর মতো মনের দেয়ালে বসেছে। তখন বোধহয় [illegible] ছিলেন বারো আমার দশ। মানে আমরা বড় হয়ে গেছি [illegible] আমার আকৃতি-প্রকৃতি সবই প্রায় বছর [illegible] গোনো [illegible] তাই দিদিকে আর আমাকে [illegible] দায়িত্বভার ওজন করা চলতো।

[illegible] তোড়জোড় চলছে, প্রায় সব জিনিস [illegible] তুলে 'ওবাড়িতে' পাঠানো হয়ে [illegible] সব পাদারা গেছে, রান্না-খাওয়ার মতো জিনিস [illegible] তাই থালার বদলে কলাপাতায় আর বাটিগেলাসের বদলে মাটির [illegible] রান্না হয়েছে। শুধু [illegible] মেজে দেওয়ার জন্যে বাসনমাজা ঝি খুদুর মাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। চলে যাবেন বলে মা খুদুর মাকে দুটো পুরনো শাড়ি দিয়েছেন আর কিছু কিছু ঘুঁটে কয়লা দিয়ে দিয়েছেন। কারণ মা ওই জিনিস-গুলোকে 'অযাত্রা'র কোঠায় ফেলেন। অবশ্য বাবা ইতিমধ্যেই মহোৎসাহে নতুন বাড়িতে কয়লাটয়লা আনিয়ে রেখে দিয়েছেন, অসুবিধের প্রশ্ন নেই।

এতোটা প্রাপ্তিযোগ সত্ত্বেও খুদুর মা চোখ মুছছিল বলছিল, 'এমন মনিব আর পাবো না মা।' মাও মলিন গলায় বলছিলেন, কী করবো মা তোর বাবুর এই একবাতিক। কী মন্দ ছিল বল এ বাড়িটা?'

বাসা বদলের মধ্যে সেই প্রথম একটা বিষন্নতার সুর অনুভব করলাম। আগে এসব তাকিয়ে দেখিনি। জানতাম না কোনো জায়গা থেকে ছেড়ে চলে গেলে কোথাও না কোথাও টান পড়ে ব্যথা লাগে।

খুদুর মার দুঃখটা যেন আমার মনেও [illegible] হলো। আহা বেচারী! নগদ সাত টাকা মাইনের চাকরী চট করে ও এখন কোথায় পাবে? মা নিজে বেশী খাটতে [illegible] না বলে, অনেক কাজই করতো খুদুর মা তাই মাইনে বেশী পেতো। অন্য বাড়িতে শুধু বাসন মাজা, মশলা বাটা, আড়াই টাকা তিন টাকা মাইনে। বড়জোর চার টাকা তাহলে হয়তো আবার ঘর মোছার শর্ত থাকতো।

নীচের তলা থেকে দোতলায় চলে এলাম, সব ঘর খাঁ খাঁ করছে, দেয়ালে ছবি টাঙানোর দাগগুলো ফুটে রয়েছে। ময়লা হয়ে যাওয়া দেয়ালে সেই খানিকটা খানিকটা চৌকো লম্বা শাদা অংশ কেমন যেন দুঃখিত চোখের মতো তাকিয়ে রয়েছে। মনটা হু হু করে উঠলো।

মনে হলো, সত্যি এ বাড়িতে কী এমন মন্দ ছিলাম। এই প্রথম বাবার বিপক্ষে রায় [illegible] আমাদের। সত্যি বাবার যে কী [illegible] বাতিক!

[illegible] অবিশ্যি অবিনাশ ডাক্তার রোডের সেই বাড়িটা আমরা দেখিনি। এবারে আর বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাননি বাবা। হয়তো ভেবেছিলেন ও বাড়ির আর পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন কী।

এঘর ওঘর দেখতে দেখতে দাদাদের পড়ার ঘরে দেখি একটা ক্ষয়ে যাওয়া ছোট্ট নীল লাল পেন্সিল। তুলে নিয়ে হঠাৎ কী খেয়াল হলো, নীলদিকটা দিয়ে দেয়ালে নাম লিখে বসলাম। দেয়ালে পেন্সিলের দাগটাগ করা বাবার কাছে প্রায় চুরি ডাকাতির মত অপরাধ কিন্তু মনে হলো, আমরা তো এবাড়ি থেকে চলেই যাচ্ছি, আর এবাড়ির দেয়ালের শোভা সৌন্দর্যে কী দরকার আমাদের ? বাবাতো আর দেখছেনও না।

সেই সময় দিদিও ওপরে উঠে এলো, চমকে উঠে বললো ও কী করছিস ?'

অপ্রতিভ হেসে বললাম 'আমরা তো চলেই যাচ্ছি।'

দিদি চারিদিক একটু তাকিয়ে বললো তা বটে। পরে যারা আসবে তারা জানতেও পারবে না এতোদিন যারা এখানে ছিল এবাড়িতেই খেয়েছিল ঘুমিয়েছিল কথা কথা কয়েছিল তারা কে কী বা নাম তাদের। তবু একজনের নাম জানতে পারবে।'

তারপর হঠাৎ পেন্সিলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললো। তবে আমিও লিখে রাখি।'

আমার নামের নীচে একবার পেন্সিলটা ঠেকিয়েই চট করে তার ওপরে তুলে গোটা গোটা করে লিখলো 'কুমারী শান্তিলতা দেবী।'

আমি শ্রীমতী লিখে ফেলেছিলাম, . . একটু ধিক্কার দিয়ে বললো, শ্রীমতী লিখেছিস যে ? তোর কী বিয়ে হয়েছে

বিয়ে না হলে শ্রীমতী লিখতে নেই এ আইনটা জানা ছিল না। আমি অতএব শুধু 'ধোৎ' ছাড়া আর কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না।

দিদি বললো, মনটা কেমন করছে রে তোর করছে না ?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

দিদি হঠাৎ বলে উঠলো 'একেই বুঝি বিরহ বেদনা বলে।'

আমি অবাক হয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ এমন একটা ঘোরানো কথা কোথা থেকে পেলো দিদি।

যাই ছাতটা দেখে আসি।

বলে দিদি চলে গেল আমি দুঃখাহত ভব করে দেয়ালে আরো অজস্র ছাপালাম 'আজ আমরা এবাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি আর কোনোদিন আসবো না।

তার আমিও মন [illegible] কারে পেল বিরহ বেদনা।

হঠাৎ দিদি সিঁড়ি [illegible]

কাগজ [illegible] পুরানো পাঁচিলে [illegible]

[illegible] দেখালো [illegible]

[illegible] এবাড়ির [illegible]

[illegible] কোনো কথা নয় [illegible] হবে।'

দিদির সব থেকে গোপনীয় জায়গা, পুতুলের বাক্স ভরে নিল তাদের বিছানা-পত্রের নীচে চাপা দিয়ে।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা নতুন বাড়িতে এলাম। তখনও বেশ দুপুর দুপুর।

বাড়ি দেখে আমাদের সব বিরহ-বেদনা আকাশে উড়ে গেল। এতো সুন্দর বাড়িতে আমরা এর আগে কখনো থাকিনি। দিদি চুপিচুপি বললো, 'বাবার বোধহয় মাইনে বেড়েছে—'

এবাড়ির একতলাটা বাড়িওলার নিজের দখলে, আমাদের শুধু দোতলাটা। অবশ্য চিলে কোঠার ঘর আর ছাত সমেত।

মস্ত বাড়ি।

দোতলাতেই চারখানা বড় বড় আর দুখানা ছোট ছোট ঘর তা ছাড়া প্রকাণ্ড একটা দালান, দিব্যি চওড়া। ওই দালানটারই কোণ ঘিরে বাড়িওয়ালা আমাদের জন্যে রান্নাঘর বানিয়ে দিয়েছে সেই রান্নাঘরে জলের কল দেয়ালে দেয়ালে বাড়িওলার দাক্ষিণ্যের আর বিবেচনার চিহ্ন স্বরূপ অনেক তাক আর একটা কাঁচ দেওয়া দেওয়াল আলমারি।

ইতিপূর্বে রান্নাঘরে এ ঐশ্বর্য কখনো জোটেনি মার।

। মার মুখ দেখেও মনে হলো খুব মার [illegible] বেদনা লোপাট হয়ে গেছে মার, তবু চিরাচরিত অভ্যাসে বলতে ছাড়লেন না 'এই অতো অতো বড় ঘর দালান শার্সি খড়খড়ি দেওয়া জানলা দরজা, এতো দেখছি বড় লোকের বাড়ির মতন। এতো কী দরকার ছিল ? ভাড়া যেন তোমায় কামড়ায়।'

বাবা একটু হেসে বললেন, টাকা শুধু ভোগের জন্যেই, তুলে রাখলে টাকাও যা খোলামকুচিও তা। ধরো আমি টাকা জমিয়ে জমিয়ে রেখে দিলাম, আর হঠাৎ তুমি মরে গেলে। তখন ? কে ভোগ করতে আসবে ? যদি বলো তোমার তখনই টাকা কামড়াবে।

মা মাথা দুলিয়ে হেসে বললেন 'হ্যাঁ। আমার তাই ভাগ্যি যে হঠাৎ মরে যাবো।

বাবা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন হঠাৎ মরে যাওয়াটা এমন কিছু ভাগ্যের কথা নয় মেজবৌ! তা যদি না হয় আমিই ভাগ্যবান পুরুষ, হঠাৎ মরে গেলাম। তখনই কি তোমার মনে হবে না, আহা লোকটা এতো খেটেখুটে রোজগার করে টাকাগুলো জমিয়ে রেখে গেল, আমি তাকে ইচ্ছে মতন ভোগ করতে দিইনি।'

মা রেগে উঠে বললেন, 'থাক এই শুভদিনে অমন অলক্ষুণে কথা বলার না দরকার।'

বাবা হেসে ফেলে বললেন, 'শুভদিনটা কিসে ?'

মা মুখ টিপে বললেন, 'তা শুভদিন নয় ? জন্মে কখনো ভেবেছি এমন বাড়িতে বাস করবো।'

ও তালেই বোঝো। ভালভাবে থাকা ভালবাড়িতে থাকা এটাই হবে শুভ। এটাই টাকার সদ্ব্যয় বুঝলে মেজবৌ। এই যে তোমার দাদারা থাকে ওর কি আর মানুষের মতন থাকা বলে ?'

মার দাদাদের উল্লেখে মা অপমানিত হলেন বললেন, 'আহা। তোমার নিজের ভাইয়েরাই বা কী এমন মানুষের মতন থাকেন ?'

বাবা বললেন, 'তাদের সংস্থান নেই তাই ওভাবে থাকে, তোমার দাদারা যে টাকার আণ্ডিল নিয়ে দৈন্য দশায় থাকে।'

'আর দাদারা তোমায় বলে ফোতো নবাব। ছেলেদের জন্যে কিছু রাখবে না।'

'বলুক। ছেলেমেয়েদের যার যা ভাগ্য তার তাই হবে তুমি রদ করতে পারবে না। হয়তো ভবিষ্যতে কখনো ভাববে 'বাবার আমলে কী সুখেই ছিলাম।'

মা মার দাদাদের ভাগ্য বললেন অর এওতো বলতে পারে 'বাবা ব্যাটা যা রোজগার করেছে নিজে রাজভোগ করে গেছে, আমাদের জন্যে কিছু রেখে যায়নি।'

বাবা গম্ভীর হেসে বলেন 'আমার বাবাও এও বলতে পারত এতো ছিলো বাবার অথচ আমাদের চিরকাল দুঃখীর মতন মানুষ করেছে। শৈশবকালে আমরা কখনো ভাল খাইনি ভাল পরিনি কষ্ট করে খেয়েছি। আসল কথা সমালোচনার হাত থেকে তুমি কখনোই রেহাই পাবে না [illegible]।'

মা বাবার দুজন এর [illegible] কথা [illegible] দুজনে মন একরকম একমত হতে নেই। তাই দেখে আসছি বরাবর। সেজদা বলে মা বাবার বিয়ের সময় বোধ হয় ওই ঠিকুজি কুষ্ঠি না কী বলে সেটা মেলানো হয়নি।

আজ কিন্তু এর মধ্যে তর্ক ঝগড়ার মাঝখানে দিদির সঙ্গে আমার একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। হয়তো বা চোখের কোণে একটু হাসিও ফুটে উঠলো।

দিদি বললো চল আমরা ছাতটা দেখে আসি।

মা শুনতে পেয়ে হেঁকে বললেন 'এই পড়ন্ত রোদ্দুরে ছাতে কেন রোদ পড়লে যাস।'

বেশী রোদ নেই—' বলে আমরা ছুটে ছুটে পলায়ন দিলাম। দাঁড়ালে হয়তো নিষেধটা জোরদার হবে।

ছাতে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

এই অলৌকিক দৃশ্য অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে ?

মুহুর্তের মস্তিষ্কে সেটা তো আহ্লাদের হলেও স্বাভাবিক কিন্তু এদিকে ও কী ? সুদূর বিস্তৃত একটা খোলা জমি, সামনে দিয়ে বাঁধানো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেখানে রোদে মেলে শুকোতে দিয়েছে সেদ্ধ করা ধান। ধানকলের এলাকা এটা। 'আতপ চাল সেদ্ধচাল' কথাটা শুনেছি সেদ্ধচাল বানাতে তলায় যে এতো সব আয়োজন হয় তা জানতাম না। মোহিত হয়ে সেই বিশাল চত্বরের শোভা দেখতে থাকি।

মোটা মজুররা ঝাঁটা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ওই ধানগুলো পাল্টে দিচ্ছে আরো কালো কোলো ছেলে আমাদের ছাত থেকে ওদের

বাবা প্রস্তায় আনতেন, আমরাও ফিনিশ করে ফেলতাম। অবশ্য প্রধান যোদ্ধা হচ্ছেন বাবা। ভাতটাত বেশী খেতে পারতেন না বাবা, কিন্তু খাবার? তা বেশ চালাতেন।

প্লেট রেকাবির প্রশ্ন নেই, কেউতো আর কুটুম নয়?

মা সেই ঠোঙার শালপাতাগুলোই ছড়িয়ে মেলে ধরে, ছটা ভাগ করে ফেলে (যথাযথ মাপে অবশ্য) এগিয়ে এগিয়ে দিলেন, আর নিজেরটা নিয়ে একটু সরে পিছন ফিরে বসলেন।

স্বামীর সামনে খাওয়া নাকি অসভ্যতা।

বাবা হাসতেন।

বলতেন, 'তা নয়, স্বামীকে বোঝানো যে আমি শুধু বাতাস খেয়ে তোমার সংসার ঠেলছি।'

'নিয়মটা বুঝি আমি করেছি?'

'তুমি করবে কেন? যাঁরা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যের কথাই বলছি। এ নিয়ম পালনের কোনো মানে হয় না।'

বললে কি হবে?

মা সেই হাস্যকর ভাবেই ওই অর্থহীন নিয়মটা পালন করে চলতেন।

ঠিক হয়েছিল, পরদিন সকাল থেকে বাড়িওলাদের ঝি আমাদেরও কাজ করবে। কিন্তু সে তো কাল সকালে।

মা বললেন, 'আজ কে কয়লা ভেঙে উনুন ধরিয়ে দেবে তাই ভাবছি।'

বাবা উদার গলায় বললেন, 'আজকে আর তোমার রাঁধতে হবে না। আমি খাবার-ওলাকে বলে এসেছি কিছু পুরী ভেজে দেবে, আর সেরটাক রাবড়ি দিয়ে যাবে। পুরীর সঙ্গে ভাজি আর চাটনী দিয়ে দেবে।...এই তো রাস্তায় নেমেই দোকান। লোকটা খুব ভাল। আগে কোথায় ছিলাম, এবাড়িতেই এখন পাকাপাকি থাকবো কিনা, এই সব জিজ্ঞেসা করলো। বললো, আমার দোকানের ছোকরাটা দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না।'

'তা আর দেবে না কেন।'

মা নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন, 'বুঝেছে এক তালেবর বাবু এলেন পাড়ায়। এতো বড়ো ঠোঙার খাবার আর কটা বাবু কেনে বল? এতো কিনলে, আবার রাত্তিরের বায়না—'

উনুন ধরিয়ে রাঁধতে হবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তবু বজ্যাটি চাই।

এখন দুদিন তোলা উনুনে রাঁধতে হবে। উনুন পাতবার জন্যে নাকি দিনক্ষণ দেখতে হয়। পঞ্জিকার [illegible] তো আছেই, আবার মেয়েদের অম্বুবাচীতেও নাকি উনুন পাতা নিষেধ।

এক যদি ঝি পেতে দেয়।

'ওবাড়ির অমন খাসা উনুন দুটো ভেঙে দিয়ে আসতে হলো!'

মা আক্ষেপ করে বললেন, 'এখন ঝি কেমন করে দেবে কে জানে!'

বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় নাকি উনুন ভেঙে দিয়ে আসতে হয়। কেনই যে এমন অদ্ভুত নিয়ম। নিজের হাতে গড়া জিনিস নিজে হাতে ভাঙতে ভাল লাগে?

তা ভাল না লাগলেই বা কী?

নিয়ম যখন।

মা বলতেন, 'ভগবানও নিজের হাতে গড়া জিনিস নিজে ভাঙেন। এখন আমি ভগবান হলাম।'

তবে বুদ্ধি করে মা উনুনের ভিতরের লোহার শিকগুলো নিয়ে আসেন বাড়ি বদলের সময়।

না আনলেই তো আবার তিন চার পয়সা খরচ করে নতুন শিক কিনতে হবে।

এবেলা ঝি না আসায় আমরা খুব আহ্লাদ অনুভব করলাম। এলেই তো উনুন ধরাতো, আর এই সব আবিলির মধ্যে মাকে রাঁধতে হতো।

অতএব কোন না একশোবার শুনতে হতো আমাদের, 'আমার যেমন কপাল। ধাড়ি ধাড়ি মেয়েরা একটাবেলা চালিয়ে দিতে পারে না। বাপ অমনি হাঁহাঁ করে পড়বেন, 'আগুনের ধারে তোরা কেন?' আমি কেন আর বারো বছরে হেঁসেলে ঢুকিনি।'

আমাদের তখন ভয়ে আড়ষ্ট অবস্থা হতো।

তবে বাবা শুনতে পেলেই বলে উঠতেন, 'তা তোমার বাবা যদি তেমন হন, আমি নাচার।'

'আমার বাবা?'

মা অবশ্যই ছিটকে উঠবেন, 'বাপের বাড়িতে আমায় কখনো এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে হয়েছে?'

বাবা এমনিতে জোরে হাসতেন না, কিন্তু এরকম কথায় ঠিক হাহা করে হেসে উঠবেন, 'তবেই দেখো! ওদেরও এটা বাপের বাড়ি। তবু তো কত কী করছে।'

কতো কী মানে বাবার অফিস যাবার আগে একডিবে পান সেজে দেওয়া, আর বাড়ির যতো কাপড়চোপড় শুকোয়, সেগুলো তুলে গুছিয়ে রাখা।

এই আমাদের দুই বোনের কাজ!

অবশ্য দাদাদের ফাই-ফরমাশ খাটাটা ছিল।

পরদিন সেই মহৎ কর্তব্যগুলো সমাধা করে, যাকে বলে দুরুদুরু বক্ষে দুপুরের অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর দাদারা যখন স্কুলে কলেজে, মা দিবা-নিদ্রায়, তখন সেই জিনিসটা নিয়ে দিদি আর আমি ছাতের ঘরে উঠলাম।

এখানে আমাদের খেলাঘর. অতএব সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

হুজুকে কলকাতার আজগুবি কাণ্ড

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা মানেই হুজুক। আর হুজুক মানেই আজগুবি ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ।

কলকাতার ধুলোভরা রাস্তায় তখন পালকি চলে। বেহারার দল রাস্তা কাঁপিয়ে সুর করে বয়ে নিয়ে চলে পালকি। এদিকে ঘোড়ার গাড়িও এসে গেছে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটছে নানা ধরনের গাড়ি নিয়ে। আপিসে কাছারিতে তখন টানাপাখা।

মাঝে মাঝে পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি। সেসব বাড়িতে রাজা-রাজড়ার মত কলকাতার বড়-লোকেরা থাকেন। তাঁদের কাছাকাছি ঘোরেন মো-সাহেব, উমেদার আর তোষামোদকারী প্রার্থীর দল। এঁদের ঘোড়াশালায় ঘোড়া, দেউড়ীতে দারোয়ান। নায়েব গোমস্তারা কাছারী সরগরম করে রেখেছেন।

হাটখোলা, শোভাবাজার, ঠনঠনিয়া, চিৎপুর, কুমারটুলি থেকে শ্যামবাজার, পাইকপাড়া সবই জমজমাট। তবে মাঝে মাঝে কোনো জমিও পড়ে আছে। আছে এঁদো-পুকুর ও ঝোপজঙ্গল। সন্ধ্যা হলেই সেখানে শিয়াল ডাকে। ছেলেপুলেরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে শিয়ালের ডাক শোনে। দেয়ালগিরির আলো-ছায়ায় কিসের যেন ছবি ফুটে ওঠে। কলকাতার ছেলেমেয়েরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানারকম রহস্যময় গল্প শোনে। শোনে অলৌকিক কাহিনী।

দেওয়ালে যখন কেঁপে কেঁপে বেড়াচ্ছে কালো ছায়া, শেয়াল ডাকছে থেকে থেকে, দমকা বাতাসে দেওয়ালের বাতি যখন নিবু নিবু হয়ে আসছে, এইরকম এক সন্ধ্যায় ঠাকুরমার আঁচলের তলায় শুয়ে শুয়ে সিঙ্গি-বাড়ির ছেলে একটি অলৌকিক মহাপুরুষের গল্প শুনেছিল। মহাপুরুষ মানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক আশ্চর্য মানুষ। তাঁকে মুনি-ঋষিও বলা যায়, আবার এক ম্যাজিশিয়ানও বলা চলে। এই অভিনব অত্যাশ্চর্য মানুষটিকে যিনি স্বচক্ষে চাক্ষুষ করেছিলেন, তিনি সিঙ্গিবাড়িরই আত্মীয় এবং পুরনো কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তি বারাণসী ঘোষ।

সেবার কাশী যাচ্ছিলেন বারাণসী ঘোষ। তখন রেললাইন হয়নি। আর হাঁটাপথে পালকি করে বা হাতি ঘোড়ায় যাবার তেমন চল ছিল না। তাই বারাণসী তাঁর অভিপ্সিত তীর্থ বারাণসীতে চলেছিলেন নৌকো করে। অর্থাৎ জলপথে। নৌকো করে পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক জঙ্গলের ভেতর এসে হাজির হলেন তীর্থযাত্রীর দল। আর সেই জঙ্গলের ভেতরেই ঐ অত্যাশ্চর্য মানুষটির দেখা মিলল। মহাপুরুষ তখন ধ্যানে মগ্ন। ইয়া বড়ো বড়ো দাড়ি গোঁফ। গায়ে যেন শেওলা জমে গেছে। কত দিন ধরে তিনি যে তপস্যা করছেন, তা কে জানে—বারাণসী তাঁর ধ্যান ভাঙ্গানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধ্যান ভাঙ্গল না। শেষপর্যন্ত মাঝিদের সাহায্য নিয়ে ঐ অচৈতন্য মহাপুরুষকে নৌকোয় তুলে নিলেন ঘোষমশাই।

তারপর? তারপর আর কী! দিনের পর দিন কেটে যায়, রাতের পর রাত। নৌকো পেরিয়ে চলে গ্রামের পর গ্রাম। জনপদের পর জনপদ। ছাপঘাটীর মোহনায় জল ছিল না বলে বারাণসীকে ঢুকতে হল সেবার বাদা-বনের ভেতর। তখন ভাঁটা। জোয়ার আসতে দেরী। ঠিক হল গুণ টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে নৌকোকে। কেননা, জোয়ারের আশায় নৌকো দাঁড় করিয়ে রাখা এই জঙ্গলের ভেতর ঠিক নয়। নৌকোর গলুয়ের কাছে বসে আছেন মহাপুরুষ। গভীর ধ্যান-নিমগ্ন। আর সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। অন্যমনস্ক। এ সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল। জলের ধারে নদীর পাড়ে হঠাৎ এক-মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। ঠিক একরকম দেখতে। অবিকল এক। এদিকে ডাঙ্গার ঐ মহাপুরুষ এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন নৌকোর দিকে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে। এসে তিনি নৌকোর মহা-পুরুষকে হাত ধরে তুললেন এবং তারপর দুজনেই জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা ঢুকে গেলেন জঙ্গলের ভেতর।

এতদ্রুত ব্যাপারটি ঘটে গেল যে কেউ কিছু বলবারই ফুরসৎ পেলেন না। কী ব্যাপারটি যে ঘটে গেল তাও অনেকে ঠাহর করতে পারলেন না। পরে একসঙ্গে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল। মাঝি মাল্লারা সকলে হৈ-হৈ করে খুঁজতে বেরোলেন। কিন্তু কোথায় কী। ওনারা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তা কেউই ঠাহর করতে পারলেন না।

বারাণসী ঘোষ হায় হায় করে উঠলেন। বার বার তিনি কপাল চাপড়ালেন। অমন মহাপুরুষকে হাতে পেয়েও তিনি ধরে রাখতে পারলেন না! সারা জীবন তিনি এই আক্ষেপই করে গেলেন।

ঠিক এইরকম এবং অনুরূপ এক মহা-পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ঝিলি-পুরের দত্তরা। সোঁদরবনে জমিদারী ছিল ঐ দত্তদের। অনেক চাষের জমিও ছিল। একবার কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে তিরিশ হাত গর্ত করতে হয়েছিল তাঁদের। সেই হাত তিরিশেক গর্তের নীচে ঝিলিপুরের দত্তবাবু এক ধ্যানস্থ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেলেন। এনার শরীর শুকনো চ্যালাকাঠের মতন। গায়ে বড়ো বড়ো অশ্বত্থ গাছের শেকড় গেছে জমে।

দত্তবাবু মহাপুরুষকে ছাড়লেন না। বারাণসী ঘোষ মহাপুরুষকে বাড়ি আনতে পারেন নি, ইনি কিন্তু আনলেন ঝিলিপুরে। হৈ-হৈ পড়ে গেল চারদিকে। পুরো এক মাস ঘরে রাখলেন। তারপর? তারপর হঠাৎ এক-দিন অঘটন ঘটে গেল। এক অন্ধকার রাত্তিরে সবাই যখন অন্যমনস্ক, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরমার আঁচলের তলায় শুয়ে শুয়ে নানারকম অলৌকিক গল্প শুনছে দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে থিরথির করে, হ্যাঁ ঠিক সেই সময় মহাপুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সারা ঝিলিপুরে আর তাঁকে কখনো দেখা যায় নি। কখনো না।

শহর কলকাতায় এইরকম মহাপুরুষদের নানান আখ্যান শুনতে শুনতে এককালের ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত। ঘুমের ঘোরে তারা এই মহা-পুরুষেরই স্বপ্ন দেখত। আর যত বড়ো হত, ততই তাদের মনে এ ধারণা দৃঢ় হত যে তারা নির্ঘাত একদিন ঐরকম এক অলৌকিক মহা-পুরুষের দেখা পাবে। আর নিশ্চয় সেদিন মহাপুরুষকে তারা বাড়িতে ধরে নিয়ে আসবে। বারাণসী ঘোষের মত জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে না বা ঝিলিপুরের দত্তদের মত আলগা করে ধরে রাখবে না।

ঠাকুরমার কোল ছেড়ে ছেলেরা যখন স্কুল যাতায়াত আরম্ভ করল, তখন রহস্য-ময় আরো বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকল। কলকাতায় তখন পাড়ায় পাড়ায় আজব লোকের দেখা পাওয়া যেত। এই আজব লোকগুলির কথাবার্তা যেমন অদ্ভুত, আচার-আচরণ ছিল তার থেকেও রহস্যময়। হরিভঞ্জর খুড়ো সেই-রকম এক আশ্চর্য মানুষ। জাতিতে ইনি ছিলেন কায়স্থ, তাতে মুখ্যী কুলীন। বেজায় গাঁজাখোর। দেড়শ ছিলিম গাঁজা খেয়ে ইনি প্রত্যহ জলযোগ করতেন। মাথা গোঁজবার কোনো নির্দিষ্ট ঠাঁই ছিল না। আর ভোজন?—যত্রতত্র। এই হরিভঞ্জর খুড়োর অগম্য জায়গা কোথাও ছিল না, ইনি নানান জায়গা ঘুরে নানারকম আজ-গুবি খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। ঠাকুরমার মুখে শোনা অলৌকিক গল্পের থেকেও তা রহস্যঘন এবং জীবন্ত। কে মন্ত্রগুণে সোনা তৈরী করতে পারেন, লোকের মনের কথা গুণে বলবার অধি-কারী কে এবং পারাভস্ম খাইয়ে গঙ্গাতীরে পচা মরা বাঁচিয়ে দেবার আজগুবি কাহিনী বলে হরিভঞ্জর খুড়ো অনায়াসেই আসর জমিয়ে দিতে পারতেন। তবে শেষকালে মাথা ঝাড়া দিয়ে বলতেন, 'সব বুজরুকি—সব মিথ্যে—'

কিন্তু ছেলেদের কাছে সব বুজরুকি হয় কী করে! সবকিছু অবিশ্বাস্য বলে ছোট ছেলেরা কী উড়িয়ে দিতে পারে? কেননা, চোখের সামনেই একদিন শহর কলকাতাকে উত্তেজনায় উদ্বেলিত করে হাজির হয় সাতপেয়ে গোরু এবং দরিয়াই ঘোড়া। একটি গোরুর চারটি পা, না হয় বাড়িয়ে পাঁচ করা গেল, কিন্তু সাত পা দিয়ে গোরু দেখা দেবে, সেও কী সম্ভব? আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প না হয় শোনা গেছে—আকাশ দিয়ে উড়ে চলে, কিন্তু সে যে আবার নদীর বুকে টগবগিয়ে সাঁতার কাটে, তাকে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য কল-কাতার লোক ছাড়া আর কার হবে?

এই কলকাতার বুকেই একদিন রটনা শোনা গেল যে দশ বছরের ভেতর যাঁরা মারা গেছেন, সেই মহাত্মা [illegible]

রবিবার সকলে ফিরে আসবেন। উঃ সে কী হুজুগ! নিমতলা আর কাশী মিত্তিরের ঘাটে সে কী ভিড়! লোক উপচিয়ে পড়ছে শ্মশানে। মৃত আত্মীয়স্বজনকে স্বাগত জানাবে বলে রাত দশটা পর্যন্ত সকলে বসে রইলো অধীর প্রতীক্ষায়। কিন্তু না, কিছুই হল না। মরারা ফিরলেন না।

তবু লোকে দমে না। নতুন হুজুগে মেতে উঠতে দেরী হয় না। একটা ব্যাপারে না হয় ঠকা গেল, আরেকটা ব্যাপারে যে সত্যি সত্যিই সফলতা পাওয়া যাবে না, একথা হলফ করে কে বলতে পারে?

আরো অন্যবারের মত এবারেও হরিভন্দর খুড়ো এক জমকালো খবর নিয়ে এলেন। ঝিলিপুরের দত্তবাড়ি নয়, হাটখোলা-ঠনঠনিয়াও নয়, অতি কাছে সিমলেতে 'নাক-কাটা বঙ্ক'র বাড়িতে নাকি সত্যি সত্যি এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

'নাক-কাটা বঙ্ক' নামটি শুনলে অনেকে হয়ত একটু চমকে উঠবেন। না, ওটা চমকাবার মতন কিছু নয়। বঙ্কবেহারিবাবু এমনিতে নিখুঁত লোক। ছেলেবেলায় একবার মামার বাড়িতে পাতকোর ভেতর পড়ে গিয়ে নাক কেটে ফেলেছিলেন, এই মাত্র। বন্ধু-বান্ধবেরা আদর করে সেই থেকে 'নাক-কাটা বঙ্ক' বলে ডাকত। আর বন্ধু-বান্ধবদের নামেই বেচারি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বঙ্কবাবু খুব ধুরন্ধর লোক ছিলেন। বেশ চৌকশ। উকিলবাবুর হেড কেরানী হয়েছিলেন। তাঁর মতন তুখোড় আইনবাজ লোক খুব কমই ছিল। জাল-জালিয়াতির তালিম, ইকুটির খোঁচ, সমন ল'য়ের প্যাঁচে বঙ্ক ছিলেন দ্বিতীয় শুভঙ্কর। যাঁরা ভালোমানুষ ভদ্রলোক, তাঁরা এঁর নাম শুনলে আঁতকে উঠতেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, ইনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পারেন। সকলে আড়ালে বলাবলি করত, বঙ্ক কী আমাদের যে সে লোক!

সেই বঙ্কর বাড়িতে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

যাই হোক, চারদিকে হৈ-চৈ করে খুব খবর রটে গেল। ছড়িয়ে পড়ল নানা রকম অলৌকিক ঘটনার বিবরণ। কেউ বলল, উনি মন্ত্রবলে লোহাকে সোনা বানাতে পারেন, করতে পারেন অসাধ্যসাধন। আবার কেউ বলল, উনি মদকে দুধের মতন সাদা করে দেন। মোট কথা, চারদিকে খুব সোরগোল পড়ে গেল। দলে দলে লোক চলল বঙ্কর বাড়ি।

বারাণসী ঘোষ বা ঝিলিপুরের দত্তদের দেখা অলৌকিক মহাপুরুষের কাহিনী শোনা ছিল যে সিঙ্গিবাড়ির ছেলেটির, সে ব্যাকুল হয়ে উঠল তার মনে-আঁকা মহাপুরুষের সঙ্গে এই সিদ্ধপুরুষের ছবিটি মিলিয়ে নিতে। সুতরাং সেও চলল।

নাক-কাটা বঙ্কর বাড়িতে সেদিন বেজায় ভিড়। কেউ এসেছেন পালকিতে, কেউবা ঘোড়ার গাড়ি করে। মহাপ্রভুর করুণার যদি এক ফোঁটা পাওয়া যায়, এই আশায় ভক্ত মামলাবাজ আর মতলববাজেরা সব সেজেছেন। বঙ্কর বৈঠকখানা ঘরের লাগাও একটি ছোট্ট ঘরে মহাপুরুষ বসে ছিলেন। চৌকোনা ঘর। ঘরের মাঝে বাঘছাল বিছিয়ে মহাপুরুষ সমাসীন। সামনে একটি ত্রিশূল পোঁতা। ত্রিশূলের কোলে পেতলের একটি শিবমূর্তি। বাঘের ওপর চড়ে আছেন মহাদেব। আর তারই পাশে পাথরের বাণলিঙ্গ শিব।

এদিকে মহাপুরুষের পাশে গাঁজার হুঁকো, সিদ্ধির ঝুলি এবং আগুনের মালসা। পিছনে মহাপুরুষের দুই চ্যালা বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। আর তাদের পাশে একটি হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি এবং হামানদিস্তে। কে যেন ফিস ফিস করে বলল, 'এখানে সোনা তৈরী হয়।'

মহাপ্রভুর করুণায় যাঁরা আগ্রহী ছিলেন, লোভে তাদের চোখ চকচক করে উঠল। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন কেউ কেউ প্রভুর পায়ের তলায়।

নাক-কাটা বঙ্কবাবুর এদিকে বেজায় সাজের ঘটা। কাটা নাকের জন্য তখন আর তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না। মাথায় তাঁর একটি জরীর কাবুলী তাজ। গায়ে লাল গাজের পিরাণ, চওড়া কালো পাড়ের শান্তিপুরী ধুতি। ডুরে উড়ুনি। হাতে লাল রঙের রুমাল। রুমালের ডগায় চাবির রিং বাঁধা। বঙ্কবাবুর বাড়িতে যেন উৎসব চলেছে, অতিথি-অভ্যাগতরা আসছেন তাই তাঁর মুখে একটি মিষ্টি হাসি-হাসি ভাব। সকলের সঙ্গে বঙ্কবাবুও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন মহাপ্রভুকে।

অতিথিদের ভেতর কেউ কেউ বঙ্কবাবুর কানে ফিস ফিস করে কী যেন বললেন। বঙ্কবাবু সে-কথা শুনে প্রভুকে কিছু অলৌকিক খেলা দেখাতে অনুরোধ করলেন।

মহাপ্রভু কিছুতেই রাজি হলেন না। তবে—

শেষকালে অনেক কাকুতি-মিনতিতে রাজি না হয়েও পারলেন না।

বঙ্কবাবুই এগিয়ে এসে ঠিক করে দিলেন কী অলৌকিক বিভূতি প্রভু দেখাবেন। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন। সকলের মনের ভেতরেই থির থির করে কাঁপতে থাকল কৌতূহল। কী হয়-কী হয় ভাব!

এদিকে অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

প্রভুর হাত-দুয়েক দূরেই ছিল পুজোর ঘট। সেই ঘটের ওপর ছিল একটি পঞ্চমুখী জবা। লাল টকটকে তার রং। তাজা জবা।

সেই জবা ফুলটি হঠাৎ ব্যাঙের মত থপ করে লাফিয়ে উঠে সামনে থপ করে পড়ল। ঘরসুদ্ধ লোক থ। প্রভুর মুখে রাজ্যজয়ের গৌরব।

এর পরে প্রভুর এক চ্যালা এক বোতল মদ এনে হাজির করল। পাছে সেটি অন্য কোনো জিনিস বলে ভ্রম হয় তাই মহাপুরুষ সেই মদ সমেত বোতলটি একটি সরার ওপর উবুর করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে ঘর ম ম করে উঠল। নাঃ, আর কারো সন্দেহ থাকল না যে সেটি মদ। সরা জুড়ে সেটি টলটল করতে থাকল।

প্রভু এবার একটি হুহুঙ্কার ছাড়লেন। আকস্মিক এ-হুঙ্কারে সকলে চমকে উঠল। ছোটছেলেরা প্রায় কঁকিয়ে ওঠার দাখিল। একজন চ্যালা ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'গুরু, এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?'

প্রভু হা-হা করে অট্টহাসি হেসে বললেন: 'এ কোটেরেমে দুধ হো যোটা।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মদের সরায় এক কুশি জল ঢেলে দিলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সরার মদ দুধের মত সাদা হয়ে গেল।

সকলে আবার থ। এইভাবে রাত এগারোটা পর্যন্ত নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম চলল। এই ছাগল কেটে ফেললেন, আবার সেই ছাগলই ডাকামাত্র পাশের ঘর থেকে ভ্যা ভ্যা করে বেরিয়ে এলো।

মোট কথা, প্রভু মহাপুরুষ না ম্যাজিশিয়ান ঠিক চেনা গেল না। মহাপুরুষের আদলে যে জ্যোতির্ময় ছবিটি মনের ভেতর আঁকা ছিল, তার সঙ্গে একদমই মিলল না। তাই ক্ষুব্ধ মনেই সিঙ্গিবাড়ির ছেলেটি বাড়ি ফিরে এলো।

কিন্তু কে জানত আরো বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল মহাপুরুষকে ঘিরে। কে জানত স্বপ্ন আর বাস্তব এক নয়। ঝিলিপুরের দত্তবাড়ির থেকে মাসখানেক বাদে মহাপুরুষ যেমন অদৃশ্য হয়েছিলেন, ইনিও প্রায় সেরকম হলেন। পালাবার পথ খুঁজে পেলেন না। কেননা, যেসব বিভূতির খেলা তিনি দেখাচ্ছিলেন, কয়েকটি নাস্তিক অর্বাচীন ছোকরা তার রহস্য উন্মোচন করে দিল। প্রভু যখন জবা ফুল নিয়ে লাফানোর খেলা দেখাচ্ছিলেন, মেডিকেল কলেজের বাংলা ক্লাসের এক বাঙাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে প্রভুর হাত চেপে ধরল। এবং দেখা গেল জবা ফুলটি বড়শি দিয়ে প্রভুর নখের সঙ্গে বাঁধা। প্রভু হাত নাড়লেই জবা ফুল লাফায়।

মদ কী করে দুধ হয়, সে রহস্যও উন্মোচন করে দিলেন এক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। তিনি দেখালেন অ্যামেরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামে যে মদ রয়েছে, তাতে জল দিলে সঙ্গে সঙ্গে সাদা হয়ে যায়।

প্রভুকে ঘিরে জোর খানাতল্লাসি চলল। ঘরের কোনের থেকে কাটা ছাগল বের হল। চালান করতে না পেরে ঘরের মেঝেতেই পোঁতা হয়েছিল সেটি। অবশ্য মেঝেটি মাটির ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। এবং দেখতে দেখতে বেরোল আরো কত কী। সুতরাং চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল। সেই গণ্ডগোলের ভেতর হরিভন্দর খুড়ো গিয়ে প্রভুর ব্যাঘ্রবাহন পেতলের শিবটি কেড়ে নিয়ে এলেন।

আঁধারে, গভীরে ॥ বটকৃষ্ণ দে

দেবদারু বনে সন্ধ্যা নেমে এলে সব একাকার...
চিন্তার নীরব, প্রেম, অনুভব, শান্তি ও সংগ্রাম,
নিত্যের নিষ্ঠুর স্বপ্ন, দর্শনের বিনাশ বিচার,—
সব এক হয়ে গিয়ে জন্ম নেয় সহজিয়া নাম :
'তুমি'।

তুমি ছিলে মন যতদূরে যেতে পারে তার
সীমানায়, দিগন্তের স্মৃতি-চারু সৌর-তারকার
দ্যুতি নিয়ে।

তুমি আছ এই আমি জীবনের বাঁকে
যেখানে পা' ফেলি'। স্মৃতি যেথায় উতল সংসারের
একাকীত্বে নির্জন নিবিড়ে, ঘুমে। মগ্ন অস্তিত্বের
স্তরে স্তরে।

সন্ধ্যা এলে দেবদারু বনে অন্ধকার
দূরের পাহাড়, আর অরণ্য-আদিম কাছে ডাকে :
সৃষ্টির বিচিত্রে তুমি উন্মোচিত, খোলা বন্ধ দ্বার।

হাতখানি ॥ বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

ঠাণ্ডা ও কঠিন এক অচেনা শহর ভিড়েব কুয়াশা
এসে গেলো; এইবার তোমার টমটমে তুমি কোচে নিশ্চয়
জেগে উঠে, হয়তো শুনছো, আজ গঙ্গোপসাগরে এক চাষা
ডুবে গেছে, সূর্যকে ডুবতে দেখে সেও ডুবে গেলো অসময়
এবং দেখছো কি ঠিক নজর চলে না তবু হঠাৎ স্বেবে
ঘোলাটে আলোর ভূম, ধূসর লোকজন আব তারই মধ্যে তুমি
বাড়িয়ে দিয়েছো হাত নামবে যদি নামো ঐ হাতখানি ধরে।
তুমি নাও তোমার সস্নেহ হাত, হাতগুলি বুকে নেবে—
কেমন ঝুমঝুমি।

নেমে এসে হয়তো ডাকছো ডেকে পালটে নিয়েছো ফের নাম।
কেননা তুমিই বহু প্রতিলিপি করেছো উদ্ধার, আর স্মৃতি—
খইয়ের মতন লুপ্ত ন্যাসপাতির ফুলেব মতন কবে ওড়াউড়ি।
উড়তে শিখবে কি? তবে এসো তুমি জেনে রাখো কেমন বিশ্রাম
কোচে রয়েছে যদি ডালা খুলে নিরন্তর গর্তের প্রকৃতি
ফুটে ওঠে, তবেই না জীবন! —আজ তোমারই হাতখানি করো চুরি।

এই তো সময় ॥ মঙ্গল সেন

এখন হাত বাড়িয়ে
হাতে হাতে
উৎসব বাঁধবার সময়
প্রত্যেক ঘরে
ঘর সাজাবার এই তো সময়!

ভালবাসা ছাড়া পৃথিবীতে কোন
ঈশ্বর থাকতে পারে?

দেয়ালে কার ছায়া? হাতকের নয়,
আমাদের ঈশ্বর।
এখন সকল কলঙ্কিত পাপ, অন্ধকার ধুয়ে
ঈশ্বরের কাছে নতজানু হওয়ার লগ্ন।

এবং

জননী যেমন সন্তান কোলে তুলে নেয়
ঠিক তেমনি
সমস্ত হাত হাতে নিয়ে
সকল হৃদয় হাতে নিয়ে
স্বর্গ গড়ার এই তো সময়।

।।১।।

দিনের শেষ গাড়ি মরা বিকেলের হলুদ অন্ধকারে একটু আগে চলে গেছে।

এখন প্লাটফর্মটা ফাঁকা।

এখানে ওখানে দু একজন ওঁরাও মেয়ে-পুরুষ ছড়িয়ে আছে। কার্নি মেমসাহেবের চায়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যার অস্তমিত আলোয় প্লাটফর্মের ওপারের শালবনকে এক অদ্ভুত রহস্যময় রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে মেলাশেষের গান শোনা যাচ্ছে।

স্টেশানের মাস্টারমশায় বললেন, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমি বললাম, কি দরকার?

আরে তাতে কি? আপনি এখানের বাসিন্দা ত' নন, এখানে নতুন এসেছেন—জঙ্গলের পথঘাট ভাল জানা নেই। চলুন, চলুন, আমার কোনো কষ্ট হবে না, তাছাড়া আমি ত হাঁটতে বেরোতামই,—এ বয়সে একটু হাঁটা দরকার।

বললাম, বেশ, চলুন তাহলে।

স্টেশান থেকে বেরিয়ে, শেঠ মুংগা-রামের দোকান পেরিয়ে হাসুইকবের দোকানের সামনে দিয়ে এসে পোস্টাফিসের গা ঘেঁষে পেছনের মাঠটায় এসে পড়লাম আমরা।

মাঠের ওপারে দীপচাঁদের দোকানের আলো জ্বলে উঠেছে—।

বেশ অনেকখানি হাঁটতে হবে।

মাস্টারমশাই বললেন, শরীর কেমন বোধ করছেন আজকাল? এইসব পাকদণ্ডী পথ দিয়ে যাওয়া আসা করা কি আপনার উচিত হচ্ছে?

আমি হাসলাম, বললাম, মান্দারের হাসপাতালের সাহেব ডাক্তারই ত বললেন, যতখানি পারি হেঁটে বেড়াতে, শরীর যে খারাপ হয়েছিল, কখনো বড় অসুখে পড়েছিলাম, একথা একেবারে ভুলে যেতে।

—ওঃ—। তাই বুঝি। তাহলে ভাল। তারপর আবার বললেন, এখানে সব উঁচু নীচু পাহাড়ি রাস্তা ত, তাই-ই বলছিলাম।

দেখতে দেখতে আমরা দীপচাঁদের দোকানের সামনে এসে পড়লাম, তারপর একটা ছোট বস্তী পেরিয়ে মোড়ের পোড়ো বাড়ির পাশ কাটিয়ে গ্রামের পাক-দণ্ডীতে এলাম।

সামনে একটা বড় ঝাঁকড়া মহুয়া গাছ। মাঝে মাঝে পিটিস্ এবং ঝাটি জঙ্গল।

পশ্চিমের পাহাড়ের কাঁধ বরাবর সন্ধ্যা-তারাটা উঠেছে। সমস্ত আকাশ সেই একটি তারার আলোয় উজ্জ্বল।

হাতের লাঠি ঠকঠক করতে করতে আগে আগে চলতে চলতে মাস্টারমশাই বললেন, আপনি তখন নিশ্চয়ই কিছু মনে করলেন ঃ না? কি বলেন?

আমি অবাক হয়ে বলাম, কই? কখন?

ঐ যখন ঘোষকে ধমক লাগাইলাম আমি।

আমি বললাম, ঘোষ মানে? শৈলেন ঘোষ?

উনি বললেন, হাঁ, হাঁ।

আমি বললাম, না, না মনে করব কেন? তাছাড়া আপনাদের নিজেদের মধ্যের কথায় আমার মনে করার কি আছে?

মাস্টারমশাই উত্তপ্ত গলায় বললেন, নাঃ এ ছাওয়াল পাওয়ালগুলোকে শুধরানো যাইব না—যা মাইনা পাইতাছে তা এই জাগায় খাইয়া পইড়া থাকার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ এই চেঞ্জারদের দেইখ্যা দেইখ্যা ওদেরও কম্পিটিশনে নামন লাগব। জুতার, জুতার জামা-কাপড, লটর-পটর জুতা, কান ঝালাপালা ট্রানজিস্টর, সবই ওদেরও চাই। কিছুই না অইলে নয়। নাই, নাই কইরাই পরানডা গেল।

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলাম। মাস্টারমশাই ফরিদপুরের লোক। কালীভক্ত, হোমিওপ্যাথী করেন, ব্যাচেলার। চেঞ্জারদের উপর ওঁর খুব রাগ। এখানের এই নির্লিপ্ত খুশী জীবনে, চেঞ্জাররা এসে চাহিদার জ্বালা জাগিয়ে যায়। একথা উনি প্রায়ই বলেন।

এবার সামনে সেই নালাটা এসে গেল। নালাটা পেরিয়ে অনেকখানি খাড়া উঠতে হয়। ও জায়গাটাতে এসে এখনও বুকে বেশ হাঁপ ধরে। এখানে এলে বুঝতে পাই যে, এখনো পুরোপুরি ভাল হইনি আমি, এখনও বাজরোগের রেশ ছাড়েনি আমাকে।

চড়াইটা উঠে এসেই সেই সাদা পোড়ো বাড়িটা। সন্ধ্যার অন্ধকারে দারুণ দেখায়। এখানের অনেকে বলেন যে, এটা ভূতের বাড়ি। মাস্টারমশাই হাতের লাঠিটা উঁচু করে ওদিকে দেখিয়ে বললেন, এই যে সেই বাড়ি।

মাস্টারমশাইকে শুধোলাম, এখান দিয়ে রাতে একা যেতে আপনার ভয় করে না মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই সায়ন্ধকারে কাঁচা-পাকা চুলেভরা প্রকাণ্ড মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে জোরে হেসে উঠলেন, বললেন, বুঝলেন কিনা ভাই, আমি হইলাম গিয়া কালীভক্ত লোক—মায়ের পূজা করি—ভূত-পেত্নী লইয়াই আমাগো কারবার।

সাদা পোড়োবাড়ি পেরুনোর পর পথটা সোজা চলে গেছে খোয়াই-ভরা টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে। বাঁদিকে অনেকগুলো বড় বড় মহুয়া গাছ। সামনেতে এখন সর্ষে বুনেছে ওঁরাওরা। এখন অন্ধকারে সব সমান মাঠ বলে মনে হচ্ছে।

পথের ডানদিকে চার-পাঁচ ঘর লোকের বাস। এরাও সকলে ওঁরাও। ওদের পোষা শুয়োর বাড়ির সামনের গোবর-লেপা উঠোনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফাগিয়া কুকুরের বাচ্চা হয়েছে, বারান্দার খড়ের মধ্যে শুয়ে বাচ্চাগুলো কুঁই কুঁই করে ডাকছে। অন্ধকারে সর্ষে ক্ষেতের গন্ধ আর এই টুকরো টুকরো শব্দসমষ্টি বেশ লাগছে।

সর্ষে ক্ষেত পেরিয়ে, অন্ধ জারু ওঁরাও-এর ঘরের পাশ দিয়ে আবার ঝাঁটি জঙ্গল ভেদ করে বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে এসে উঠলাম। মাস্টারমশাই চা না খেয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি জোর করে ধরে আনলাম, বললাম, চা না খেয়ে যাওয়া চলবে না। তারপর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে মাস্টার-মশাই উঠে পড়লেন।

লাঠি ঠকঠকিয়ে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে গেলেন। চলতে চলতে, মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, জয় মা, তোর জয়।

এখানে সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর কিছুই করার নেই। আমার প্রতিবেশী যাঁরা তাঁরা সকলেই বেশী বয়সী। মানে নিকট প্রতিবেশীরা। তাঁরা প্রায় সকলেই হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, নয় বিদেশী। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সাপার খেয়ে শুয়ে পড়েন তাঁরা।

মালি রেঁধেবেড়ে দেয়। আমিও সকাল সকাল খেয়েদেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি। বই-পত্র এখানে পাওয়ার উপায় নেই। কর্ণেল ম্যাকক্লাসকিনের লাইব্রেরী আছে, খুবই ভাল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ এমন ঘনিষ্ঠ হয়নি যে বই চেয়ে পড়ি। কলকাতা থেকে যেগুলো এনেছিলাম সেগুলো বহুবার পড়া হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যে হলেই নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে হয়। যার শরীর অসুস্থ, অসুস্থ মানে বহু দিন ধরে অসুস্থ, যার মনে কোনো আনন্দের আভাস মাত্র অবশিষ্ট নেই, তার পক্ষে এরকম নির্জন জায়গায় একা একা সন্ধ্যে কাটানো শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাঝে মাঝে ভাবি, ভাল হয়ে গিয়েই বা কি করব। ভাল হয়ে কোলকাতায় ফিরে আবার ত সেই জীবনেই প্রবেশ করব। যাদের সঙ্গে আমার কোনো আত্মিক যোগ নেই, কোনো সত্যিকারের সখ্যতা নেই তাদের মধ্যে থেকে, তাদের জন্যে আবার সেই চাকরী করব, করব রোজগার, রোজকার দস্তুরের দাগা বুলোব। সেও ত আরেক মৃত্যু। আমার সামনে বোধ হয় শুধু বহু মৃত্যুর দ্বারই খোলা আছে। আমার শুধু এখন বেছে নিতে হবে কোন্ মৃত্যু আমার পক্ষে সহনীয় এবং বরণীয়।

॥ ২ ॥

এ জায়গাটায় সকাল হয় না, সকাল আসে। অনেক শিশির-ঝরানো ঘাসে ভেজা পাহাড়ি পথ মাড়িয়ে অনেক শাখনদী নদী পেরিয়ে সোনা-গলানো পোশাক পরে সকাল আসে এখানে।

কম্বলের নীচে শুয়ে আমার ঘরের টালির ছাদের ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভাব দেখা যায়। চতুর্দিক থেকে পাখি ডেকে ওঠে। বাড়ির পেছনের পিটিস্ ঝোপে ভরা টাঁড়ে তিতিরের আড্ডা। ঝগড়াটি তিতিরগুলোর গলা সবচে আগে শোনা যায়। তারপর টিয়া, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, মৌটুসী, আরো কত নাম-না-জানা পাখি এসে পেয়ারাগাছে, আতাগাছে, ফলসা গাছে, চেরী গাছে এমন কি বাবুর্চিখানার পাশের কাবিশগাছে বসেও ঝাঁপাঝাঁপি করে।

সেই প্রচণ্ড সুন্দর ও আনন্দিত প্রাণতরঙ্গের মধ্যে, দিগ্বিদিকে শিহরিত ও আলোকিত শব্দলহরীর মধ্যে এই অসুস্থ আমি চোখ মেলি। শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে রোদে দাঁড়াই।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জের প্রতিটি সকাল আমার জন্যে যেন কি এক আনন্দের পসরা সাজিয়ে আনে। প্রতিদিন এই ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে পুবের ও পশ্চিমের পাহাড়ের রোঁয়া-রোঁয়া সবুজের দিকে তাকিয়ে আমি বারে বারে নিজেকে ভুলে যাই।

রোজ প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে পেয়ারাতলায় বেতের চেয়ারে বসি। মালি এখানেই চা এনে দেয়। রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকি। রোদটা একটু চড়লে, গ্রীবায় রোদ পড়লে আরামে চোখ বুজে আসে —তখন ইচ্ছে করে আরেকবার ঘুমোই।

মালু মালির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাছগাছালির তদারকি করি। বাড়ির সবুজ হাতার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হয় পৃথিবীতে এই একমাত্র জায়গা—। এই গাছগুলি এই পুরানো, ধসে-পড়া টালির ছাদের ভাঙা বাড়ি, এই পাখিদের জমিদারী এইটুকুই একান্ত করে আমার। আমার ক্ষণকালের একার। এছাড়া আমার জীবনে নিজের বলতে কিছুই নেই; না কোনো জিনিস, না কোনো জন।

আমগাছগুলোর তলায় একটা দোলনা টাঙানো আছে। কখনো সখনো সেখানে গিয়ে বসি একা একা। এই দোলনায় যে যা যারা এসে বসলে আমি ভীষণ খুশি হতাম তারা কেউ আসে নি এখানে। হয়ত আসবেও না। তাদের ভাল লাগে না, জঙ্গল। ভালো লাগে না এই জংলী পরিবেশ, আরো বেশী করে ভালো লাগে না হয়ত আমার সঙ্গ।

দোলনায় বসে হল্যাণ্ড সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে-আনা বাসি খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় কুয়োতলার দিক থেকে কাদের যেন একটা গরু ঢুকলো হাতার মধ্যে।

ওদিকে মালু বেগুন আর টোম্যাটো লাগিয়েছিল। মালুকে ডাকতেই, মালু দৌড়ে গিয়ে তাড়িয়ে দিল গরুটাকে।

গরুটা কাঁটাতারের বেড়া পেরুনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারের পাশে একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়াল।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চিরুনি ও তেল পড়েনি বহু বছর প্রায়। পরনে ছেঁড়া জামা—কোনো প্রমাণ সাইজের ফুলপ্যাণ্ট গুটিয়ে পরেছে। সমস্ত চেহারার মধ্যে এমন একটা রুক্ষতা যে কি বলব।

মালুকে শুধোলাম এ ছেলেটি কে?

মালু বলল, লাবু বাবু।

– লাবু বাবু কে?

লাবু বাবু ডাবু বাবুর ভাই।

মালুর উত্তরে কিছুই পরিষ্কার হলো না, বললাম, ডাকো তো লাবুবাবুকে।

প্রথমে লাবুবাবু আসতে চাইল না, শেষকালে যখন এসে আমার সামনে দাঁড়াল তখন দেখলাম তার দু চোখে ভয়ের ছায়া।

বয়স দশ-এগারো হবে, হাতে গরু তাড়াবার ছোট একটি লাঠি। নীচের ঠোঁটটি কেটে দু-ফাঁক হয়ে গেছে। রক্তাক্ত দেখাচ্ছে ঠোঁটটা। চোখ দুটো কটা কটা। সমস্ত শরীর এখানের প্রচণ্ড শীতে শীতার্ত।

শুধোলাম, তোমার নাম কি?

লাবু।

কোথায় থাক?

ঐখানে। কর্ণেল সাহেবের বাড়ির পাশে।

বাড়িতে কে কে আছেন?

মা, আর দাদা।

বাবা নেই?

না। বাবা অনেক দিন আগে মারা গেছেন।

লাবু ভাঙা ভাঙা বাংলা বলছিল। বাংলা শুনে মনে হয় না যে বাঙালি। লাবু বলল, ওর ভার গরু চরানো, গরুদের সময় মতো খুঁজেও কুড়োয়। ওদের অনেক জমি আছে। নিজেরা লাঙল দেয়, নিজেরাই গরু দোয়ায়, চাষ করে। লাবুর দাদা ডাবু খিলারির স্কুলে পড়ে। লাবু চুরি করে একদিন আচার খেয়েছিল তাই তার দাদা তাকে শানবাঁধানো বারান্দায় আছাড় দেওয়াতে তার ঠোঁট কেটে যায়। ঠাণ্ডায় তাই ঠোঁটখানির অমন বীভৎস অবস্থা।

লাবুকে শুধোলাম, তুমি আসছিলে না কেন? তোমাকে যখন ডাকছিলাম?

লাব স্বীকারোক্তি করল, গরু ঢুকেছে বলে আমি যদি মারধোর করি সেই ভয়ে ও আসতে চাইছিল না। গরুগুলো ধরে খোঁয়াড়ে দিলেও বিপদ হত।

লাবুকে বিস্কিট খাওয়ালাম। বললাম, তুমি কি কি খেতে ভালবাস?

ও বলল কিছু না। তারপর অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বলল, ছোলার ডাল আর রসগোল্লা।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা তোমাকে আমি ছোলার ডাল আর রসগোল্লা খাওয়াব। লাবুকে বললাম, আমি তোমার দাদার মত। যখনি ইচ্ছে করে চলে এসো, তোমার সঙ্গে গল্প করব, আমাকে ভয় পেও না বুঝলে?

লাবুর কথাটা বিশ্বাস হলো না। দুই ছেঁড়া পকেটে দু হাত গলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, আসি, কেমন?

লাবু চলে যাওয়ার পর দুখন মাহাতো কক্কো বস্তী থেকে মাটির হাঁড়িতে দুধ নিয়ে এল। কার্নি মেমসাহেবের লোক কালো টিনের বাক্স মাথায় করে পাউরুটি আর খাস্তা বিস্কুট দিয়ে গেল। কসাই হানিফ; সব্জীওয়ালা রহমান এল। রহমান পাকদণ্ডী পথে এগারো মাইল পায়ে হেঁটে প্রতি সোমবার সসের হাটে যায়, সেখান থেকে সব্জি কিনে বাঁকে করে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের বাড়ি বাড়ি সব্জী বিক্রী করে। ম্যাকলাস্কিতেও হাট বসে—শুক্রবারে, হেসালঙে।

হেসালঙ, লাপরা এবং কুন্ডা এই তিনটি বস্তী নিয়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ। আমি যে অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, সে অঞ্চলের নাম কুন্ডা।

স্টেশান, বেশীর ভাগ দোকানপাট যেখানে সেদিকটার নাম লাপরা। আর খিলাড়ির দিকের রাস্তার গাঁয়ের নাম হেসালঙ।

হেসালঙের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা—জঙ্গল ওদিকে গভীর নয়। লাপরার দিকে ত জঙ্গল নেই বললেই চলে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লালমাটি ও পাথর ভরা যে অসমান পথটা চামার দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু-পাশে লাল টালির ছাদওয়ালা সব বাংলো। এ বাড়িতে আসতে সেই কাঁচা রাস্তা ছেড়ে আরো ভিতরে ঢুকতে হয়।

চতুর্দিকে শাল সেগনের জঙ্গল। আর পিটিস এবং নানারকম জংলী ফুল। এখানে এখন একরকম জংলী হলুদ ফুল হয়, সানফ্লাওয়ারের মত। বাড়ির পেছন-দিকটা সেই ফুলে ছেয়ে গেছে এখন। হাজার হাজার ফুল পাকদন্ডী পথটার দু' পাশে ভরে আছে। চোখ চাইলে চোখে হলুদ নেশা ধরে।

পৃথিবীতে এখনো যে এমন জায়গা আছে, যেখানে স্টেশানে নেমে, নিজের মাল হাতে করে যার যার বাড়ি হেঁটে আসতে হয়—সে ছ' মাইলই হোক কি চার মাইলই হোক, তা ভাবা যায় না। এখানে ভাড়ার জন্যে কোনো ট্যাক্সি, রিক্সা, গরুগাড়ি অথবা ঘোড়া গাড়িও নেই।

মালি পেয়ারাতলায় বেতের চেয়ার-টেবল পেতে নাস্তা লাগিয়ে দিয়েছিল। নাস্তা শেষ করে বাড়ির পিছনটা ঘুরে দেখছি—ধনেপাতা আর কাঁচা লংকা লাগানো হয়েছে এদিকে—আদাও আছে—কুয়োতলার পাশে পাশে পুদিনার ঝাড় লেগেছে। ধান লাগাতে দেরী হয়ে গেছিল নীচু জমিতে—তাই ধান ভাল হয়নি এবার। বৃষ্টিও এবারে খুব কম হয়েছে। ধান কাটার সময়ও হয়ে এল।

কুয়োতলার পাশ দিয়ে পাহাড়ি নালাটা গেছে এঁকেবেঁকে। বাড়ির এই-ই সীমানা। বাড়ির তিন পাশ দিয়ে নালাটা ঘুরে গেছে। আজ থেকে দশ বছর আগে এ নালা দিয়ে প্রতিরাতে বড় বাঘ যাওয়া-আসা করত।

এখনো হায়না যায়, গরমের দিনে মহুয়া-লোভী একলা ভালুক। আর চুপি চুপি আসে লুমরীরা। পা টিপে টিপে আসে, পা টিপে টিপে শুকনো পাতা মচমচিয়ে পালিয়ে যায়। রাতে শুয়ে শুয়ে তাদের আসা-যাওয়ার শব্দ শুনি। কখনো কখনো নেকড়ে বাঘ আসে মুরগী ও ছাগল ধরতে। দেহাতীরা বলে রাতের বেলা এই নালা দিয়ে ভূতেরাও যাওয়া-আসা করে। নানারকম ভূত।

আগে মালির অসুখ করেছিল; একটি ছেলেকে পেয়েছিলাম রান্না করার জন্যে। শীতের রাতে উনুনের গরমে আরামে শোবে বলে।

প্রথম দিন কাজ করল, তারপর প্রথম রাত পোয়ালে দেখি সে আর ওঠে না। সকাল আটটা বাজল, চা দেওয়ার নাম নেই। দরজা ধাক্কিয়ে তাকে জাগাতেই, সে কাঁদতে আরম্ভ করল, বলল, আমাকে এক্ষুনি ছুটি দিন বাবু, আমি এখানে এই জঙ্গলে কাজ করতে পারব না।

কি হয়েছে শুধোতে, সে বলল, সারা রাত ভূতেরা এই নালায় ধমর-ধামর করে শুকনো পাতায় নেচেছে, নানা রকম আওয়াজ করেছে, একশ টাকা মাইনে দিলেও সে এখানে চাকরী করবে না।

অতএব তাকে তক্ষুনি ছুটি দিতে হয়েছিল।

কুয়োর পাশে পাশে অনেকগুলো জংলী জাম এবং আমলকি গাছ গজিয়েছে। এক দল টিয়া এসে তাতে ঝাঁপাঝাপি করছে। আমলকির ডালে-বসা টিয়ার ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মালু বলল, বাবু খত আয়া।

মালু পোস্টাফিসে গেছিল খত আনতে। এখানে ডাক পিওন নেই। সকাল এগারোটায় যখন গাড়ি আসে আপ-ডাউনের, তখন প্রত্যেককে যেতে হয় পোস্টাফিসে।

পোস্টমাস্টার একে একে নাম পড়েন—যে যার চিঠি নিয়ে বাড়ি ফেরে। এখানের হাট এবং পোস্টাফিস হচ্ছে ক্লাবের মত—সকলের দেখা-হওয়ার জায়গা।

খামের চিঠি, হাতের লেখাটা দেখেই অবাক হলাম। অবাক নয়, বলা উচিত, উত্তেজিত হলাম। এ চিঠি এমন একজন লিখেছে যার কাছ থেকে চিঠি এলে আমার স্বাভাবিক কারণেই উত্তেজিত হবার কথা।

চেয়ারে বসে চিঠিটা খুললাম।

ছুটি লিখেছে। রাঁচী থেকে।

কাঁকে রোড, রাঁচী
১০।১১।৭২

সুকুদা,

আপনি নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু অবাক হওয়ার মত কিছু আছে বলে আমি ত জানি না।

বহু দিন হল আপনার কোনো চিঠি পাই না।

কিছু দিন আগে কোলকাতায় গেছিলাম।

অনেকদিন আপনাকে দেখিনি—তাই খুব দেখতে ইচ্ছে হওয়ায় সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই আপনাদের কেয়াতলার বাড়িতে গেছিলাম। বৌদি ছিলেন না।

অবশ্য না-দেখা হয়ে ভালই হয়েছে, দেখা হলে আমি খুবই এমবারাসড ফিল করতাম। যে দোষে আমি দোষী নই, দোষী ছিলাম না কোনো দিনও সেই দোষের জন্যে মনে মনে উনি আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন। অবশ্য একথাও জানি, যে সেই শাস্তির বোঝা বইতে হয়েছে আপনাকে, কখনো প্রতিবাদের সংগে, কখনো বিনা প্রতিবাদে।

এমন অসুখ কি করে বাধিয়েছিলেন জানি না।

ভগবানের দয়ায় আপনার কোনো কিছুরই অভাব ছিলো না, নিজেকে সুখী করার সমস্ত রকম উপাদান আপনার মধ্যে ছিল, একজন পুরুষ মানুষ জীবনে যা চাইতে পারে তার সব কিছুই আপনি পেয়ে-ছিলেন, অথচ তবু সব জেনে-শুনে আপনি এমন নিজেকে নির্দয়ভাবে নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন।

কার উপর অভিমানে আপনি এমন করে নিজের প্রতি অযত্ন করে এই অসুখ বাধালেন?

আপনার সংগে দেখা হলে খুব ঝগড়া করব, বলে দিলাম।

আপনাদের বাড়িতে শুনলাম আপনি আরো মাস ছয়েক ওখানে থাকবেন।

আপনার উপর কতখানি রাগ করে আছি তা আমার সংগে দেখা হলে বুঝবেন।

আপনি রাঁচী হয়ে গেলেন, অথচ আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না। ওখানে প্রায় কুড়ি দিন হল আছেন, রাঁচী থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল পথ, অথচ আমাকে ওখান থেকেও জানালেন না যাতে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি।

আপনি নিজেকে কি ভাবেন জানি না। আপনি আমাকে কি ভাবেন তাও জানি না। আপনাকে কি আজ মনে করিয়ে দিতে হবে যে আপনার অশান্তি যাতে না বাড়ে, আপনি যাতে বেশী করে দুঃখ না পান শুধু সেই জন্যেই কোলকাতার বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে একজন সদ্য এম-এ পাশ-করা অল্পবয়সী অবিবাহিতা মেয়ে একা এখানের কলেজের চাকরী নিয়ে চলে এসেছিলো?

এক সময় আপনি আমাকে একদিন না দেখতে পেলে পাগলের মত করতেন, অথচ আমাকে শুধু একবার চোখের-দেখা দেখার জন্যে আপনাকে যে কষ্ট ও অনেক সময় অপমানও সহ্য করতে হত তা আর কেউই না জানুক, আমি জানতাম। সে কষ্ট আমার পক্ষে অসহ্য ছিল।

আমার প্রতি আপনার এক অদ্ভুত, আজন্ম আবেগময় এবং মাঝে মাঝে এখন মনে হয় হয়ত অন্তঃসারশূন্য ভালোবাসার দাম দিতে গিয়ে আমার সমস্ত সুখের জীবনটাই প্রায় দিতে বসেছি—অথচ আপনি এমন নিষ্ঠুর যে আমার এত কাছে থেকেও আজ আমাকে একবার দেখতেও ইচ্ছে করল না আপনার। একবার দেখা দিতেও না।

আপনি বলতেন মেয়েরা ভালোবাসার কিছু বোঝে না এমন ভাব করতেন, যেন পৃথিবীতে কাউকে ভালোবাসার মানে কি তা একমাত্র আপনিই বুঝতেন।

অন্য ছেলেদের কথা জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখে যদি ছেলেদের ভালোবাসার সংজ্ঞা স্থির করতে হয় তবে তা সমস্ত পুরুষ জাতির পক্ষে বড় কলঙ্কের হবে।

রাঁচীর রাত বাস স্ট্যাণ্ড আমি খোঁজ নিয়েছি—বিকেলে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের বাস ছাড়ে এখান থেকে। সন্ধ্যার পর সেখানে পৌঁছয়। আপনার বাড়ি আমি চিনি না, শুনেছি, খুবই জংলী জায়গা—।

এ পর্যন্ত অনেক কিছুই একা একা খুঁজে নিয়েছি, চিনে নিয়েছি তাই চিনে নিতে পারব না এমন ভয় নেই। একদিন অনেক লোকের মাঝ থেকে আপনাকে চিনতে প্রথম ভুল হয় নি আজ অন্ধকার জঙ্গলে আপনার বাড়ি চিনতেও কষ্ট হবে না আশা করি।

আপনি কেমন আছেন? এখনো কতখানি অসুস্থ আছেন জানতে ভীষণ ইচ্ছা করছে। এখনো কি সত্যিই অসুস্থ আছেন?

আমি আগামী শনিবার আপনার ওখানে যাচ্ছি। শনিবার রাত ও রবিবার আপনার ওখানে থেকে সোমবার ভোরের বাসে রাঁচী ফিরে আসব।

আমাকে আটকে রাখার চেষ্টা করবেন না, সময়ের আগে যেন তাড়িয়েও দেবেন না।

আপনাকে বহু দিন বলেছি, যা দিতে পারি, সেটুকু দেওয়ার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে, যা দিতে পারি না তা না দেওয়ার বেদনাকে আরো তীব্র করবেন না। আশা করি, আপনি আমাকে বুঝবেন।

আপনার চোখে আমি কি এবং কতখানি শুধু এ কথাই আপনি বারবার জানিয়েছেন, আপনি কোনোদিন সত্যিকারের আমার চোখে আপনি কি এবং কতখানি তা বোঝেন নি এবং বুঝতে চানও নি।

আপনার হয়ত অনেক আছে, অনেকে আছে, কিন্তু আমার আপনি ছাড়া আর কেউ নেই এত বড় পৃথিবীতে। আপনার মত করে এই অল্পবয়সের জীবনে আমাকে কেউ ভালবাসেনি, অমন করে কেউ ভালবাসতে জানে না।

আমার জীবন থেকে আপনি কিছু দিনের জন্যে হারিয়ে গেছিলেন, স্বল্পদিনের জন্যে। যার সামান্যই থাকে, সেই অসামান্য সামান্যটুকু হারানোর দুঃখ যে কি তা আমার মত করে আর কেউই জানে নি।

কলিগদের বলে আমার সোমবারের ক্লাস আফটারনুনে করে নিয়েছি। রাঁচী ফিরে চান-খাওয়া করে ক্লাস নেব। সোমবারে।

আমি আসছি এ খবর শুনে আপনার শরীর নিশ্চয়ই বেশী অসুস্থ হবে না। অসুস্থ হলেও আমার কিছু করার নেই। আপনি বরাবরই স্বার্থপর। নিজের সুখের জন্যে চিরদিন আপনি অন্যকে দুঃখী করেছেন অথচ কোনোদিন অন্য কারো দুঃখের খোঁজ রাখেন নি।

আমি জানি, আপনি নিশ্চয়ই এখন ভাল আছেন। আপনাকে ভাল থাকতেই হবে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব যতদিন আমার নিঃশ্বাস পড়বে, ততদিন আপনার কোনো রকম ক্ষতি হতে দেব না। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আপনার ক্ষতি করে।

ইতি—আপনার অনাদরের ভুলে-যাওয়া ছুটি।

চিঠিটা পড়া শেষ করে ভাঁজ করে রাখলাম। পরক্ষণেই চিঠিটা খুলে আবার পড়লাম, বার বার পড়লাম। চোখের কোণ দুটো কেন যেন ভিজে এল। বোধহয় অসুস্থ শরীরের জন্যে। এ শরীর, এই আবেগ সহ্য করার শক্তি রাখে না।

এ রকমই কি হয়? যেদিন আমি একজনকে ভীষণভাবে চেয়েছিলাম, তার শরীর তার মন, তার সর্বকিছু, তার সমস্ত ঃ সেদিন সে লজ্জাভয়ে নুইয়ে ছিল, ভালোলাগায় লজ্জাবতী লতার মত কেঁপেছিল শুধু, আমার বেহিসাবী পৌরুষের কোনো দানই গ্রহণ করার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না।

সব সময় সে ভয়ে মরত, এই বুঝি অন্যায় করে ফেলল নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে নিজের পরিবারের মর্যাদার কাছে, প্রথার কাছে।

পাছে সে কাউকে ঠকায়, অনুক্ষণ সেই আশঙ্কায় সে চুপ করে থাকত। মুখে বলত, 'না, না, না', চোখে বলত 'না, না, না', আমার সমস্ত উদ্দাম অবুঝ আবেগের উত্তরে তখন সব সময় সে নিজেকে, নিজের সংস্কারের মধ্যে লুকিয়ে রাখত, সামাজিক অনুশাসনের বোরখা পরে দূরে থেকে সে চোখের ঘুলঘুলি দিয়ে আমাকে দেখত, আমার সত্যিকারের রূপ জানতে চাইত। আমার সমস্ত চাওয়া শুধু তার শরীরকে পাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত না তার চেয়েও বড় কোনো চাওয়া এ পৃথিবীতে আছে, যে চাওয়ায় শুকিয়ে-যাওয়া মনও পুষ্পিত হয়ে ওঠে তা ও সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে চাইত।

এতদিন পরে, এত বছর পরে আজ বুঝি আমার ছুটি, আমার অনেক দিনের ছুটি আমার মত করেই বুঝেছে সে, জীবনে কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না। যা পাবার, যা দেবার তা একমাত্র নিজেকেই পেয়ে ও দিয়ে ধন্য বা অধন্য হতে হয়। সে আনন্দ বা দুঃখ শুধু তারই। তার একার। সেই ন্যায় বা অন্যায়ের পাওনা এবং প্রায়শ্চিত্ত তার নিজেরই একার। তা যদি নাই-ই হবে তবে আজ ছুটি কেন এমন করে চিঠি লেখে?

যে মুহূর্তে আমার সমস্ত মন নিজেকে নিঃশেষে এ পৃথিবী থেকে ছুটি দিতে চায় সে মুহূর্তে বেঁচে থাকার মত কোনো রকম অনুপ্রেরণাই আর আমার অবশিষ্ট নেই ঠিক সেই মুহূর্তে কেন সে এমন করে আগল খুলে চিঠি লেখে?

কোনো আশ্চর্য শক্তিতে ও কি বুঝতে পেরেছে এখন আমার মনে কি হয়? আমার মন যে চিরদিনের মত আজ ছুটি চায় সকলের কাছ থেকে, এমন কি ছুটির কাছ থেকেও তা কি ও বুঝতে পেরেছে?

॥ ৩ ॥

কাল রাতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল।

রাত কত তা মনে পড়ে না, বোধহয় বারোটা-টারোটা হবে—শীতের রাতে এই জঙ্গলে তা অনেক রাত—হঠাৎ আমার ঘরের পাশে কার পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া করে শুনলাম—শিশিরে-ভেজা পাতার উপরে কোনো লোকের অসাবধানী পায়ের শব্দ।

বিছানা ছেড়ে উঠে যথাসম্ভব কম শব্দ করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে টর্চ ফেললাম শব্দ লক্ষ্য করে—দেখলাম একজন অসম্ভব লম্বা কালো কুচকুচে লোক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে বুট জুতো, খাকি হাফ-প্যান্ট গায়ে গরম কালো কোট।

লোকটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু হাত বুকের উপর আড়াআড়ি [illegible]।

লোকটার কাছে গিয়ে মুখে টর্চ ফেলে শুধোলাম, তু কওন হো?

সে বলল, ফরেস্টের লোক।

—এত রাতে এখানে কি করছ?

—মালুকে ডাকতে এসেছিলাম।

—এত রাতে?

—দরকার ছিল।

লোকটার কাছে যেতেই বুঝতে পেলাম লোকটা নেশা করেছে। মুখ দিয়ে মহুয়ার উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে।

আমার রাগ হয়ে গেল, বললাম, এ বাড়ির হাতার মধ্যে রাতে আর কোনোদিন তোমাকে ঢুকতে দেখলে গুলী করে মাথার খুপরি উড়িয়ে দেব, মনে থাকে যেন।

লোকটি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, জী হুজৌর। বলে পেছনের গেটের দিকে যেতে লাগল।

একটু পরই, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে চুড়ি ঝমঝমিয়ে কে যেন আমার জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল বাইরে। তাড়াতাড়িতে জানালা খুলে টর্চ জ্বেলে বুধাই-এর লাল ফুল ফুল শাড়ির পেছনটা দেখতে পেলাম। বুধাই মালুদের ঘরের দিক থেকে দৌড়ে যাচ্ছিল, বাইরের দিকে।

দেখতে পাচ্ছি এতদিন অনেকের কানা-ঘুষায় যা শুনেছি তা সত্যি। লালির এই মেয়ে বুধাইকে তার বর নেয় না। ও এখানেই থাকে।

মেয়েটার বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। সারা গায়ে যৌবন উপচে পড়ছে—তবে চোখ মুখ থ্যাবড়া থ্যাবড়া।—খুব ভাল স্বাস্থ্য। মেয়েটা এমনিতে খুব হাসিখুশী— যখনি রেজার কাজ করে অথবা যখন হাটের দিনে হাটে যায়—দেখি রঙিন চুড়ি পরে, রুপোর গয়নায় সাজে, মুখে চুলে তেল চুঁইয়ে পড়ে।

মেয়েটা ধীরে ধীরে কিছু করতে পারে না—হাঁটতে বললে দৌড়ে যায়, দৌড়তে বললে ওড়ে। প্রাণ উপচে পড়ে সব সময় ওর শরীর থেকে।

সেই মেয়েটার নাকি স্বভাব ভাল নয়। এখানের সাহেব প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, চোখ রাখতে। আমার নিজের চোখ নিজের যা একান্ত সব জিনিস বা জন ছিল তাদেরই পাহারা না চোখে চোখে রাখতে তাই এত দূরের ও পরের জিনিসে চোখ রাখার প্রয়োজন মনে করি নি। এখন দেখছি, নিজের বাড়ির হাতায় আসর বসিয়েছে এরা।

ঘুম চটে গেল। ভাবতে লাগলাম মা বাবাই বা কেমন? চোখের সামনে মেয়েটাকে যা খুশী তাই করতে দিচ্ছে? মা-বাবার মত ছাড়া এমন হয়?

মালুটা বোকা—ওকে লালিই চালায়। লালির বয়স পঁয়তাল্লিশ মত—মুখ মিষ্টি—ধূর্ত মেয়ে। যৌবনে নিজেও কি করেছে [illegible]

দোষের মধ্যে হাটের দিনে একটু নেশা করে ফেলে। এ ছাড়া মালুর কোনো দোষ নেই। মালু একজন খাঁটি, সৎ ও সরল ওঁরাও। সংসারের মারপ্যাঁচ ঘোঁৎঘাঁত ও বোঝে না। ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায় ও অনেক মার খেয়েছে এতাবৎ সংসারের কাছে।

আজ এত রাতে আর কিছু করার নেই। কাল সকালে এ ব্যাপারের একটা ফয়সালা করতে হবে।

কোনো আদিমতম জানোয়ারের কামড় খেয়ে এই শীতের রাতে ফরেস্ট অফিসের বেয়াবা মৌসুমী কুকুরের মত পাকদণ্ডী বেয়ে মহুয়া খেয়ে অন্ধকার সাঁতরে চলে আসে কেন তা বুঝতে পারি। কিন্তু এ অঞ্চলে শুনতে পাই অনেক চেঞ্জার বাবু-রাও নাকি এমনিভাবে মৌসুমী কুকুরের মত ঘোরেন-ফেরেন।

জানি না তারা কী পান? একটা অচেনা, অজানা মনহীন শরীর ঘেঁটে ঘেঁটে ওঁরা কি খোঁজেন?

এপাশ-ওপাশ করি, কিছুতেই আর ঘুম আসতে চায় না।

কক্কা বস্তীতে কারা যেন মাদল বাজিয়ে একটানা দোলানী সুরের ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে চলেছে।

মাঝে মাঝে অনেক দূরের রেললাইন থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শীতের রাতের ডিজেল ইঞ্জিন একটানা ভারী আওয়াজ তুলে সে আওয়াজ অন্ধকার পাহাড়ে-বনে প্রতিধ্বনিত করে চলে যাচ্ছে।

আবার সব আওয়াজ থেমে গেলে চারিদিক থেকে শুধু ঝিঁঝির একটানা ঝিঁ ঝিঁ এবং পাতা থেকে শিশির পড়ার ফিস-ফিসানিতে সমস্ত রাত ভরে যাচ্ছে।

ফাদার মার্টিনের বাড়ির জোড়া-এ্যাল-সেসিয়ান ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। দূর থেকে সে ডাক ভেসে আসে।

নালার দিক থেকে একটা খাপু পাখি হঠাৎ ডাকতে শুরু করল, খাপু-খাপু-খাপু-খাপু। খাপু পাখির ডাক শেষ হলে মিসেস ডাগানের বাড়ির দিক থেকে (যেখানে প্যাট প্লাসকিন থাকে) একটা টিটি পাখি, টিটির টি-টিট্টি-টি টি করতে করতে এ বাড়ির দিকে উড়ে আসতে লাগল।

টিটি পাখিটা কি কিছু দেখেছে? কোনো জানোয়ার? কোনো লোককে এই রাতের পথে চলা-ফেরা করতে? নাকি সেই লোকটিকে দেখেছে, যাকে এখানের অনেক লোকই দেখেছেন। লোকটির পরণে কালো ট্রাউজার এবং কালো শার্ট—দূর থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে লোকটিকে আসতে দেখা যায় তারপর কাছে এলেই সে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। মিস্টার পটার দেখেছেন তাকে, একদিন মিস্টার এণ্ড মিসেস এ্যালেনও দেখেছেন।

এই পরিবেশে, এই নির্জনতায়, এখানে [illegible]

চামার মোড়ে কিছুদিন আগে কারা যেন অত্যাচারী সুদখোর ব্যবসায়ীকে খুন করে তার মৃতদেহ গাছ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল—সেই বীভৎস মৃতদেহের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, গভীর রাতে একলা-চলা ডুলি রেঞ্জের বড় বাঘের কথা। সে পথে এখন গেলে তাকে দেখা যেতে পারে। শিশিরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে হয়ত পথের উপর নরম ধুলোয় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। অথবা সেই হাতীর দলের কথা—যারা পালামৌর সাংচুয়ারী থেকে মাঝে মাঝে চলে এসে এই চামার রাস্তায় শুঁড় উঁচিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়ায়।

মনে পড়ে যায় টি-বি হসপিটালে আমার পাশের বেডের সতেরো বছরের ছেলেটির জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার কথা। পুরো হাসপাতালের কেউ জানলো না কেন অমন ফুটফুটে ছেলেটা আত্মহত্যা করলো। অথচ সে নিজেকে এমন হঠাৎ করে নিবিয়ে দিল অসময়ে ফুঁ দিয়ে তার কারণ একটা নিশ্চয়ই ছিল। অথচ কারণটা কেউই জানলো না। জানতে চাইলোও না পর্যন্ত।

এমন এমন সব হঠাৎ ঘুম-ভাংগা রাতে পিস্তলের নলটা কপালের কাছে লাগিয়ে আমিও ভাবি—যখন অমনি করে হঠাৎ হাওয়ার মত কোনো সুন্দর চাঁদনী রাতে, ফুলের গন্ধের মধ্যে রাতচরা পাখির ডাকের মধ্যে রূপোলী রাতের ঝমঝমিয়ে বেজে-ওঠা সমস্ত শব্দ তরঙ্গের মধ্যে এখানে একদিন নিজেকে নিবিয়ে দেব—সেদিন এবং তারপর একজনও কি জানবে জানতে চাইবে, কেন হঠাৎ নিবে গেলাম আমি?

আসলে কেউই জানবে না কেউই কাঁদবে না কেউই ভাববে না—।

হাসপাতালের সেই অখ্যাত তরুণের জন্যে রোজ সকালে গোলাপের পাপড়ি থেকে ঝরে পড়া শান্ত শীতল শবনমের জন্যে কেহ বা কোনদিন কেঁদেছে?

তবুও যেতে হবে চলে যেতে হবে, আজ কিম্বা কাল নিজের হাতে নিজেকে খেয়া-পার করাতে হবে।

যে-হাতে পিস্তল ধরা থাকবে সেই হাতেই একজনের নরম হাত ধরার স্বপ্ন নিয়ে দুটি চোখ বুজে আসবে।

এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জে পাখি ডাকবে, ফুল ঝরে পড়বে শুকনো পাতা উড়বে চৈত্রী হাওয়ায়, মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধে ভারী হয়ে থাকবে সমস্ত প্রকৃতি—আর এই সুন্দর ও নিঃশ্বাস ফেলা নাগরিক ও নাগরিক হৃদয়ের একজন চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকবে।

ঘুমিয়েই কি থাকবে? না আমাকেও সেই কালো ট্রাউজার ও কালো শার্ট পরা অশরীরী লোকটির মত দেখা যাবে এই জঙ্গলের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে?

॥ ৪ ॥

কাল এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরের দিকে। [illegible]

পড়েছে। আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবার পরই ঠান্ডার প্রকোপ বেড়েছে। কনকনে একটা হাওয়া বইছে উত্তর থেকে।

মান্দারের সাহেব ডাক্তার সকাল-বিকেল দুবেলা নিয়ম করে হাঁটতে বলেছেন। এখনো ওষুধ খাওয়ার বিরাম নেই। ঘড়ি ধরে এখনো নানা রকম ক্যাপসুল খেতে হচ্ছে। তার সঙ্গে একাধিক টনিক।

লোকে বলে, আজকাল যক্ষ্মা হলে কেউ মরে না। কথাটা হয়ত সত্যি, সময় মত ধরা পড়লে কেউ মরে না। কিন্তু প্রাণে না মরলেও যে প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে রোগীতে পড়তে হয় তা এ রোগের রোগী মাত্রই জানেন।

একটা লাংস আমার চিরদিনের মত অকেজো হয়ে গেছে। অন্যটা নিয়ে যতদিন বাঁচি ততদিন সাবধানে বাঁচতে হবে। এ ভাবে বাঁচার কোনো মানে নেই। আমি এমন কোনো লোক নই যে আমার বেঁচে থাকার জন্যে যে কোনো মূল্য দিয়ে বাঁচতে হবে। এমন কিছু মহৎ কর্ম আমাব করণীয় নেই, আমি মরলে কোলকাতার ময়দানে আমার স্ট্যাচু হবে না, কেউই আমাকে মিস করবে না—তাই যেমনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম তেমনভাবে বাঁচতে না পারলে আমার কাছে বেঁচে থাকাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বিকেলে ফুলস্লিভস সোয়েটার চাপিয়ে মাথায় গরম টুপী দিয়ে হাঁটতে বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখি দূর থেকে প্যাট আসছে।

প্যাটের একটা পা নেই। থাইয়ের কাছ থেকে কাটা ডান পাটা। ও যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সিংগাপুরে ছিল তখন বোমার টুকরোয় ওর পা জখম হয়েছিল।

প্যাটের বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ। আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু দেখলে পঁয়ত্রিশ বলে মনে হয়। কাচে ভর করে ও সারা ম্যাকলাস্কি ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত সময় মুখে হাসি লেগে আছে। প্যাট বিয়ে-থা করেনি। মিসেস ডাগানের বাড়ি ও দেখা-শোনা করে মাসে একশ টাকার বিনিময়ে।

ছোট শোবার ঘরটার দেওয়ালময় পিন-আপ ছবিতে মুড়ে রেখেছে। ও হেসে বলে, 'ইউ সী, আই ফিল ভেরী লোনলি ইন উইনটার নাইটস, দ্যাটস হোয়াই দে কীপ মি কোম্পানী' দে গিভ মি আ লিটল ওয়ার্মথ।'

প্যাট দূর থেকে বলল, গুড আফটার-নুন মিঃ বোস।

আমি হেসে বললাম, গুড আফটার-নুন।

ও আবার আসতে আসতে বলল, গোয়িং ফর আ স্ট্রল

আমি বললাম, ইয়া।

ও বললু, 'কাম, আই উইল এ্যাকম্পানি ইউ।'

লাঞ্চি এসে শুধোলো এখন দুধ খাব কিনা, না ল্যাংড়া লাসকিনের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে খাব।

আমি বললাম, বেড়িয়ে এসে খাব।

এখানের দেহাতীরা লোকের নাম-করণে বড় পটু কিন্তু বড় রুড। প্যাট লাসকিনের যেহেতু একটি পা নেই ওকে এখানের সকলে বলে ল্যাংড়া লাসকিন। হল্যান্ড সাহেব এদের উচ্চারণে হলাণ্ডুয়া।

এখানে যে সব বাঙালী আছেন স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁদের মধ্যে একজন এক সময় মুরগী পোষার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর নাম মুরগী চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জি এখানে অনেক। তাই বোধ হয় চ্যাটার্জিদের সনাক্তকরণের সুবিধার জন্যে এরা মুর্গী চ্যাটার্জি, আণ্ডা চ্যাটার্জি (অপরাধ উনি ওঁর পোলাট্রির ডিম বিক্রী করেন), শুয়োর চ্যাটার্জি (এঁর অপরাধ এঁর পিগারি ছিল) এবং ছাগল চ্যাটার্জি (এককালে নাতিকে দুধ খাওয়াবার জন্যে এক জোড়া ছাগল পুষেছিলেন তিনি) নামে এঁদের অভিহিত করে।

মুর্গীর খাঁচা বহু দিন শূন্য হয়ে গেছে, ছাগল নিয়ে গেছে হায়নাতে, শুয়োরের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল, তবু ওঁদের এই বিকৃত নামগুলো থেকেই গেছে।

পথে কোনো দেহাতীকে শুধোলে কারো পুরো নাম বললে তার বাড়ি কেউ খুঁজে পাবেন না। যে নামে ওরা এঁদের প্রত্যেককে ডাকে সেই নামে না বললে ওরা বুঝতেই পারবে না কাকে আপনি খুঁজছেন।

জানি না, বেশী দিন থাকলে আমাকে ওরা কি বলবে।

এখানের লোকজন, অদ্ভুত প্রাগৈতি-হাসিক সব প্রথা, মধ্যযুগীয় আবহাওয়া এবং নীরব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সব মিলিয়ে বড় ভালোবেসে ফেলেছি এ জায়গাটা। এখানের সব কিছু আমার মনোমত। এই শান্ত ঢিলে-ঢালা জীবন, যেখানে একশ টাকা মাইনে-পাওয়া লোককে সবাই মিলিয়নীয়র ভাবে, যেখানে জীবন ধারণের জন্যে প্রতি মুহূর্তে দৌড়াদৌড়ি নেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই, কনফারেন্স নেই, যেখানে পথ চলতে ডিজেলের ধোঁয়া বুকের মধ্যে অবধি নিষ্পাপ শিশুদের বিষাক্ত করে না, সেখানে চাওয়া অল্প, প্রাপ্তির আনন্দ অনেক এমনি জায়গায় কার না ভালো লাগে?

দুঃখের বিষয় এই যে এখানে চিরদিন থাকা যায় না। যে পরিবেশে, যেভাবে আমরা মানুষ, খ্যাতি, টাকা-পয়সা, প্রতিপত্তির ম্যারাথন দৌড়ে যাদের ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাদের উচ্চগ্রামে বাঁধা মন ও শরীরের তার এখানে এলে ঢিলে হয়ে পড়ে। ভয় হয়, মরচে ধরে যাবে। কোলকাতায় ফিরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আর জয় করতে পারব না। তারা শিরস্ত্রাণ ছাড়াই তাদের তরোয়ালের এক এক কোপে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে শেষ করে দেবে। তাই সুপ্রাচীন সভ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত আমি আবার এক সময় ফিরে যাব সেই ধূলিমলিন নোংরা আবহাওয়ায়, চোগা-চাপকান পরে কোর্টে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সওয়াল করব, মোটা অঙ্কের চেক পুরবো পকেটে এবং সলিসিটার এবং মক্কেলদের সঙ্গে বাধ্য বেড়ালের মত হেসে হেসে কথা বলব।

ইচ্ছে করুক কি না করুক।

আমার বাড়ির গেট ছাড়িয়ে পাদ্রী মুখার্জির বাড়ি ছাড়িয়ে হল্যান্ড সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে এসে নালা পেরোলাম—তারপর মিস্টার রোজারিওর বাড়ি। সে বাড়ি পেরুতেই চামার দিকের লাল মাটির অসমান, পাথর-ছড়ানো ধূলি-ধূসরিত রাস্তা।

একটু এগিয়ে যেতেই বাড়ি-ঘর সব পেছনে পড়ে রইল। বাঁদিকে শেষ বাড়ি মিঃ এ্যালেনের। ডানদিকে শেষ বাড়ি মিস্টার কিং-এর। তারপর কোনো বাড়ি-ঘর নেই। সোজা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উঁচু-নীচু পথটা চলে গেছে ডুলির দিকে। সেখানে একটি ফরেস্ট বাংলো আছে। ডুলির পরে আরো মাইল দুয়েক গিয়ে রামদাগা গ্রাম। এই কাঁচা রাস্তাটা চামা অবধি প্রায় আট মাইল মত—রাস্তা খুবই খারাপ—পায়ে হেঁটে যেতেও কষ্ট—এত পাথর ছড়ানো ও অসমান।

দু দিক থেকে তিতির ডাকছিলো ক্রমাগত চিঁহা চিঁহা চিঁহা করে। নাকটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। লাল বিধুর আভা ছড়িয়ে ছিল আকাশময়, একটা শুকনো ঠান্ডা ভাব উঠছিল চার-দিক থেকে। পিটিস ঝোপ থেকে ভেজা উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মাঝে মাঝে চষা জমি। কিতারি লাগিয়েছে, মকাই লাগিয়েছে কোথাও বা মিষ্টি আলু। ঢালে ঢালে শর্ষে লেগেছে। হলুদ আঁচলে শেষ বেলার লাল লেগেছে।

তিতিরের চিৎকার ও দূরের কদাচিৎ ঘরে-ফেরা পাখির ক্ষীণ স্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। প্যাটের ক্রাচের শব্দ হচ্ছে শুধু পাথুরে পাটিতে। দূরের ঝোপে একদল ছাতারে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেছে। একটু এগিয়ে যেতেই সে আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

মনে হচ্ছে ঘাড়ের কাছে কার দুখানি ঠান্ডা হাত এসে চেপে বসেছে। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাটা ঝুপ করে নেমে আসে, যেন মন্ত্রবলে। একটা পাহাড়ি বাজ উঁচু শিশুগাছের মগডালে বসে ডানা ঝাপটিয়ে

প্যাট আস্তে আস্তে বলল, সেদিন রিডারস ডাইজেস্ট পড়ছিলাম একটা লেখা।

আমি বললাম, কি লেখা?

—সন্ধ্যে কেমন করে আসে। আমাদের সকলের সামনেই সন্ধ্যে হয় রোজ কিন্তু আমরা ক'জন সেদিকে চোখ তুলে তাকাই। দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর মধ্যে এই যে গোধূলি লগন এই লগনকে আমরা ক'জন উপলব্ধি করি?

প্যাটের কথায় একটা চমক লাগল মনে। আর কেউ করুক আর না করুক ভগবানের দিব্যি আমি করি। জঙ্গল পাহাড়ের পরিবেশে সন্ধ্যালগ্নে দাঁড়িয়ে নাক ভরে আসন্ন হিমের রাতের গন্ধ নিতে নিতে পশ্চিমাকাশের শেষ ফিকে গোলাপি রঙের আভার দিকে চোখ মেলে আমার বারে বারে মনে হয় যে আমি যেন এখানেই জন্মেছিলাম কোনো কালে। মনে হয় প্রকৃতিই আমার আসল মা আমার আসল প্রথম এবং সর্বশেষ প্রেমিকা। হয়ত অনেক নারী এসেছে চলে গেছে অথবা আছে এখনো আমার জীবনে কিন্তু তারা সকলেই ক্ষণিকের হলুদ সানফ্লাওয়ারের মত কোনো রঙা প্রজাপতির মত ঘুরঘুর করেছে বা করবে। কিন্তু তারা এবং প্রকৃতিই টিকবে। তারা খণ্ড এবং প্রকৃতি তাদের সমষ্টি।

প্যাট আগে আগে হাঁটছিল।

প্রথম প্রথম প্যাটের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ওর জন্যে সহানুভূতি হত অনুকম্পা হত কিন্তু আলাপ ঘনিষ্ঠ হবার পর দেখছি ও কারো সহানুভূতির অপেক্ষা করে না। ইংরিজী চরিত্রের এই পুরুষালি দৃঢ়তা ও [illegible] কাছ থেকে বড় সহজেই পেয়েছে। ও শুঁড়িখানা থেকে কটকা বোতলের পচানি মদ কেনে। [illegible] করে নেয়। একটি টিনের কৌটোয় এক চামচ চিনি ও দু দানা লবঙ্গ নিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে চিনিটুকু তারপর বোতলে ঢেলে মিশিয়ে নিয়ে ঝাঁকিয়ে নেয় — তখন সেই সাদা কোহলের রঙ বদলে গিয়ে লাল লালচে হয়ে যায়। দেখতে রামের মত মনে হয়। সেই নিজে বানানো রাম খায় মাঝে মধ্যে হয়ত কখনো সখনো একা একা গান শোনে কোনো দেহাতী মেয়ের।

ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল।

শীতকালে জোনাকি জ্বলে না সন্ধ্যা তারাটা দপদপ করে দিগন্তে কোনো সুন্দরী মেয়ের কপালের নীল টিপের মত।

এখন আমরা কেউ কথা বলছি না।

অন্ধকারে প্যাটের ক্লাচের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। চারিদিকে শিশিরের ফিসফিসে শব্দ আর [illegible] ঝিঁঝিঁদের ডাক [illegible]।

ফেরার সময় প্যাট ওর বাড়িতে একটু বসে যেতে বলল। বাড়ি ওর নয়, মিসেস ডাগানের, কিন্তু এমন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে ও বাড়িটা, যে বোঝা যায় না এটা ওর বাড়ি নয়।

বাইরে এখন বসা যায় না ভীষণ ঠাণ্ডা। আমরা ভিতরের ড্রইংরুমে এসে বসলাম।

প্যাট কফি খাওয়ার কথা বলল আমি মানা করলাম। কারণ বাড়ি ফিরে আমায় দুধ খেতে হবে।

প্যাট নিজের জন্যে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এল। কফি খেতে খেতে নানা রকম গল্প হতে লাগল।

হঠাৎ প্যাট বলল আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন মিস্টার বোস?

আমি বললাম না। তুমি কর

ও বলল হ্যাঁ আমি করি।

আমি বললাম তুমি কি এখানের ভূতের কথা বলছ?

প্যাট বলল এখানের ভূত আমি দেখি নি তবে অন্য অনেকে দেখেছেন যাঁদের অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই আমার। তবে আমি নিজেও ভূত দেখেছি নিজের জ্ঞানে তাই বিশ্বাস করি।

আমি বললাম কোথায় দেখেছ বলো তো শুনি সে গল্প?

প্যাট একটু চুপ করে থাকল তারপর যেন চোখের সামনে সেই ঘটনা দেখতে পাচ্ছে এমনভাবে বলতে আরম্ভ করল।

আমি তখন মেজর স্টালিং-এর পার্সোনাল ড্রাইভার। সিঙ্গাপুর শহরের কাছেই একটা মিশনের বাড়ি রিকুইজিশান করে আমরা আছি। অফিসারদের কোয়ার্টার দোতলায় আমরা আফিসারদের পার্সোনাল স্টাফ নীচে থাকি।

মনে আছে গরমের দিন। আমি মেজর সাহেবের অর্ডারলি এবং আরো তিন-চারজন বসে আমাদের ঘরে তাস খেলছি।

রাত আটটা হবে। সারা দিন গরমে তাপ চলেছে তাই চানটান করে বেশ আরাম লাগছে। আমি বসেছিলাম আমার ঘরের দেওয়ালের দিকে মুখ করে। কিন্তু মেজর সাহেবের অর্ডারলি আমার মুখোমুখি বসেছিল। ওর মুখ খোলা বারান্দার দিকে।

বড় বড় থামওয়ালা খোলা বারান্দা। বারান্দার পর সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মস্ত কম্পাউণ্ড গোলাপের ঝাড় নানা রকম ফুলের ঝাড়।

খেলতে খেলতে হঠাৎ দেখলাম আমার সঙ্গী তাসের দিকে চোখ না দিয়ে বারান্দায় চেয়ে কি যেন দেখছে। প্রথমে নজর করি নি। পরক্ষণেই আবার দেখলাম, ও বাইরে কি দেখছে।

আমি ওকে ধমক দিলাম বললাম, খেলার ইচ্ছা না থাকলে খেলো না এরকম করে খেলার কোনো মানে হয় না।

দেখলাম ওর মুখে রাজ্যের চিন্তা। একটু পর তাস নামিয়ে রেখে ও বলল, এখানে কোনো নান আছে?

আমি ওকে একটা ফৌজী গালাগালি দিয়ে বললাম তুমি কি খোয়াব দেখছ?

ও বলল সত্যি বলছি আমি দু-দুবার দেখলাম সাদা পোশাক পরা একজন নান বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি খুব হো হো করে হেসে উঠলাম বললাম চলো তোমার চাকরী খাচ্ছি। আর্মিতে কাজ করে ভূত দেখছ?

দেখলাম রসিকতা করায় ও আরো ঘাবড়ে গেলো। ও বলল আমি আর খেলব না যদি না আমাকে তোমার জায়গায় বসতে দাও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বদল করলাম।

আবার খেলা শুরু হল। বেশ খেলছি। এক সিগারেটের প্যাকেট বাজি জমিয়ে তাস পড়ছে হঠাৎ আমার কেমন গা ছম ছম করে উঠল। আমার মনে হল কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাসের কোণা থেকে চোখ উঠিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখি থামের আড়ালে সাদা পোশাক-পরা একজন নান আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

খুব চেষ্টা করে আমি তাসে চোখ নামালাম। যেন কিছুই দেখি নি।

একটুক্ষণ পর আবার আমার ওরকম গা ছমছম করতে লাগল।

আবার চোখ তুলতেই দেখি সেই নান এবারে সামনের থামের কাছে, আমাদের বেশ কাছে।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

আমরা দুজনে পাড়ি কি-মরি করে মেজর সাহেবের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম।

মেজর সাহেব পাইপ মুখে দিয়ে চিঠি পড়ছিলেন বিরক্ত হয়ে আসতেই আমরা দুজনে একসঙ্গে যা দেখেছি তা বললাম।

উনি কথা না বলে ঘরে ঢুকে শুধু বিশ্রীভাবে নিস্বন করে আমাদের দেখলেন। বললেন [illegible] এরকম কথা বল তো [illegible] আমি গালাগালি করব। তাস যদি কখনো এমন বাজে কথা বল, [illegible] কোর্টমার্শাল করা হবে। এই বলে সার্জেন্ট মেজরকে ডেকে

বললেন আমরা ড্রিংক করেছি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে।

মেজর সাহেব খাঁটিই বললেন, আমরা সমস্ত ড্রাইভার ও অর্ডারলি মিলে সেদিন এক ঘরে শুলাম।

তারপর তিন-চার দিন কোনো ঘটনা ঘটেনি না।

একদিন রাতে সার্জেন্ট মেজর এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিং-এ যাচ্ছেন, উনি হঠাৎ সেই সাদা পোশাকের নানকে দেখতে পেলেন। বাকী পথটা দৌড়ে এসে উনি আমার ঘরে ঢুকে হাঁপাতে লাগলেন। নানকে কেমন দেখতে, কি পোশাকে আমি দেখেছিলাম জিগগেস করলেন। জিগগেস করলেন আমি যাকে দেখেছি সে লম্বা না বেঁটে। আমি বললাম খুব লম্বা, আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, তার মুখ চোখ সব স্পষ্ট দেখেছি—চমৎকার চোখ মুখ।

সার্জেন্ট মেজর অনেকক্ষণ আমার বিছানায় বসে রইলেন। তার পর বললেন, তোমার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

এ ঘটনার কিছু দিন পর, এক শনিবার সিংগাপুরের কয়েকজন চাইনীজ মেয়েকে অফিসাররা নাচে নেমন্তন্ন করলেন। অনেক রাত অবধি নাচ, গান, হুইস্কি খাওয়া হল। তারপর মেয়েরা ঠিক করল তারা ভাগাভাগি করে অফিসারদের সঙ্গে রাত কাটাবে। ঐ রাতে আর যাবে না।

আমার মেজর সাহেবের ভাগে দুজন মেয়ে পড়লো।

খেয়ে-দেয়ে আমরা সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার উপর ভার পড়লো শেষ রাতে ঐ দুজন মেয়েকে নিয়ে জীপে করে সিংগাপুরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

চারটের সময় উঠে আমি মেজর সাহেবের ঘরে ধাক্কা দিলাম। ঐ ঘরে যারা ছিল তারা এবং অন্যান্যরা সকলে বেরিয়ে এল। আমি সকলকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে সিংগাপুরের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। তখনো প্রায় এক ঘণ্টা রাত ছিল।

আমি যাওয়ার পর মেজর সাহেব আবার শুয়েছেন এমন সময় তাঁর মনে হল তাঁর খাট ধরে কে যেন নাড়া দিল। তাঁর ঘরের মধ্যে। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। উনি ধড়মড়িয়ে উঠে দেখেন তাঁর বিছানার পাশে একজন নান দাঁড়িয়ে।

মেজর সাহেব তাড়াতাড়ি তাঁর রিভলভার এবং টর্চের দিকে হাত বাড়ালেন। রিভলভারের ট্রিগারে হাত রেখে উনি শুধালেন, তুমি কে, তুমি কি চাও?

নান কোনো কথা না বলে দরজার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

মেজর সাহেব দরজার ছিটকিনি

ঘরের বাইরে এসে নান ইসারায় মেজর সাহেবকে তার পেছনে আসতে বললেন। মেজর সাহেব টর্চ জ্বালিয়ে তাঁর পেছন পেছন বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নামলেন। বাগানের এক কোণায় এসে নান দাঁড়িয়ে পড়লেন, পড়ে একটা কাঁটা ঝোপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

মেজর সাহেব শুধোলেন কি আছে? ওখানে কি আছে?

নান উত্তর না দিয়ে আবার ঐ দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হঠাৎ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আমি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে দেখি ক্যাম্পে হুলস্থুল ব্যাপার। চার ট্রাক বোঝাই করে সোলজার নিয়ে মেজর সাহেব সিংগাপুর শহরের অন্য সীমানায় চলেছেন মিশনের নতুন বাড়িতে, যেখানে এই রিকুইজিশান করা বাড়ির সব নানরা এখন থাকেন।

মেজর সাহেবের গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। নানের চেহারার বর্ণনা আমার এবং মেজর সাহেবের দেখা নানের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। সেই নানের বাঁ গালে একটা বড় বিউটি স্পট ছিল।

ঐ বাড়িতে পৌঁছে সমস্ত বাড়ি সোলজাররা ঘিরে ফেলল।

মেজর সাহেব মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করে জিগগেস করলেন এই মিশনের কোনো নান কাল রাতে বাইরে গেছিলেন কিনা?

মাদার সুপিরিয়র ভুরু কুঁচকে বললেন, হাউ ডু ইউ মীন?

তারপর মেজর সাহেব বললেন, এখানের সমস্ত নানকে ডেকে লাইন করে দাঁড় করান, আমরা সকলকে দেখতে চাই, কেউ যেন বাকী না থাকে।

সমস্ত নান জড়ো হতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল, কেউ বাথরুমে ছিলেন, কেউ অন্য কাজ করছিলেন।

সকলে জড়ো হলে মেজর সাহেব, সার্জেন্ট মেজর, কর্ণেল সাহেবের অর্ডারলি এবং আমি প্রত্যেকের কাছ থেকে ভাল করে দেখলাম। কারো চেহারার সঙ্গেই আমরা যাকে দেখেছি, তার চেহারা মিলল না।

তারপর মেজর সাহেব বললেন, আমরা বাড়ি সার্চ করব।

মাদার বিরক্ত হয়ে রাজী হলেন।

বারান্দা পেরিয়ে আমরা যেই বড় হলঘরে ঢুকেছি অমনি আমরা সকলে একসঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেওয়ালের মাঝখানে টাঙানো ছিল একজন নানের বড় ফোটো—যাঁকে আমরা সকলেই

[illegible]

মেজর সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে মাদার সুপিরিয়রকে শুধোলেন, ইনি কোথায়, এঁকেত দেখলাম না।

মাদার সুপিরিয়র বললেন যে, এ মিশনের বাড়িতে, আমরা এখন আছি সেই বাড়ির মাদার সুপিরিয়র ছিলেন উনি। আজ তিন বছর হল মারা গেছেন।

আমরা সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করবার পর মেজর সাহেব মাদার সুপিরিয়রকে সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে উনি বললেন, যে-কাঁটা-ঝোপের দিকে উনি আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন সেখানে আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। ওখানে মাটি খুঁড়লে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে।

ওঁকে নিয়ে মেজর সাহেব এবং অন্যান্য সকলে তখুনি ফিরে গেলাম আমাদের ক্যাম্পে। পৌঁছন মাত্রই জায়গাটা সাবধানে খোঁড়া আরম্ভ হল। অনেকখানি খোঁড়ার পর দেখা গেল মাদার মেরীর একটি পাথরের মূর্তি উল্টো করে মাটিতে পোঁতা আছে। মুখ নীচের দিকে, পা উপরে।

মেজর সাহেব তক্ষুনি সেই মূর্তিটি মাদারের হাতে দিয়ে দিলেন।

সেদিন থেকে আমাদের ঐ বাড়িতে আর কখনো সেই নানকে দেখা যায়নি যতদিন আমরা সিঙ্গাপুরে ছিলাম।

এই অবধি বলে, একটি সিগারেট ধরিয়ে প্যাট বলল, আপনি কি এর পরেও বলবেন যে আমি ভূত দেখিনি।

আমি কিছু বললাম না।

প্যাটকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

একটু পরে উঠে বললাম, চলি প্যাট, আমার অনেক ওষুধপত্র খেতে হবে।

প্যাটের বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাইরে কতখানি অন্ধকার তা ঠাহর হল।

পঞ্চমীর বেঁকা চাঁদ উঠেছে। চতুর্দিকের অন্ধকার বন-পাহাড়ে ঝিঁঝিরা ঝুমঝুম করে বাজছে।

প্যাট বলল, তোমাকে কি টর্চ দিয়ে এগিয়ে দেব মিস্টার বোস?

আমি বললাম, না। ঠিক আছে। তোমাকে আবার একা ফিরে আসতে হবে।

প্যাটের বাড়ি থেকে রাস্তায় নামলাম। অন্ধকার হলেও কাঁচা মাটির পথটা দেখা যায়।

ঠাণ্ডায় হাত জমে যাচ্ছে। প্যান্টের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে আমার বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম অন্ধকারে। কাছেই কোনো পিপুল গাছের মগডাল থেকে একটা হুতুম প্যাঁচা ডেকে উঠল দুরগুম, দুরগুম, দুরগুম—।

বুকের মাঝটা কেমন কিনা কাঁপিয়ে ছমছম করে উঠল।

জার্মান মনীষা

বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত কার্ল মার্কসের একখানি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অথচ একালের শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই কার্ল মার্কসের সঙ্গে কোনো না কোনো সূত্রে পরিচিত।

সম্প্রতি জার্মান লেখক হাইনরিখ গেমকোভ মূল জার্মান ভাষায় 'কার্ল মার্কস—আইনে বিওগ্রাফী' নামে কার্ল মার্কসের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা রচনা করেন। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন জার্মান সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ - লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ থেকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেছেন অমল দাশগুপ্ত।

হাইনরিখ গেমকোভ এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথমেই মন্তব্য করেছেন 'কার্ল মার্কস অবিভাজ্য।" জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করলেও কার্ল মার্কসের দর্শনের সুমহান উত্তরাধিকারে আজ সমগ্র বিশ্ব সমৃদ্ধ। মার্কসের জন্মভূমির মানুষের কাছে তিনি যেমন গর্বের বস্তু, তেমনই বিস্ময়ের বস্তু তিনি পৃথিবীর জনগণের কাছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আজো শেষ হয়নি।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের এই তত্ত্ব রচনায় যে ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন এই গ্রন্থলেখকের মতে 'তা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ অনুসন্ধান'। অবশ্য এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ অনুসন্ধান বলে কোনোরকম চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞান নিত্যনূতন উদ্ভাবনী দ্বারা চমক সৃষ্টি করে, তবে একথা সত্য যে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রভাবে যে ধ্যান-ধারণার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন আজো তা অপরিবর্তিত। নতুন সূত্র সংযোজিত হয়নি, নতুন কোনো চিন্তায় তাকে অতিক্রম করার মত তত্ত্ব আজো রচিত হয়নি। অবশ্য মার্কসবাদের বিশ্লেষণসূত্রে কোনো কোনো তাত্ত্বিক নতুন কথা বলেছেন বা নতুন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

গেমকোভ ভূমিকায় বলেছেন : 'মার্কসবাদ বিশ্বজনীন—কেননা মার্কসবাদই প্রথম স্বীকার করেছিল যে উন্নত দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ও উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একই [illegible]

মার্কসবাদ বিশ্বজনীন, কারণ পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে ও সমাজতন্ত্রকে কায়েম করতে হবে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে এবং তাদের সেই দায়িত্বপালনে সহায়ক হল মার্কসীয় দর্শনের সূত্রগুলি। পৃথিবীর সর্বত্র বুভুক্ষার আকৃতি একই রকমের তাই লক্ষ্যভেদ করতে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতির। গেমকোভ আরও বলেছেন :

'মার্কস তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি তুলে ধরেছিলেন যে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম পরস্পরবিরোধী নয় বরং একই মুদ্রার দুই বিপরীত দিক—'

মার্কসের জীবন তাই একটি ইতিহাস। তাঁর 'টিচিংস' বা উপদেশাবলী বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক যেমন বিশ্বজনীন তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড। এইসব কারণে মার্কসের জীবনকথা এক অবিস্মরণীয় দলিল।

মার্কস ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস যে তত্ত্ব রচনা করেছেন তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেছেন ভ্লাদিমির লেনিন। পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়েছে মার্কসীয় দর্শন। তাই মার্কস এ কালের এক মহান মনীষী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করছে। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে মার্কসের জীবন ও কর্ম বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে এবং হয়ত একথা বলা অন্যায় হবে না যে মার্কসবাদ বিচারে এই গ্রন্থ সহায়ক হবে।

এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে মার্কসের শৈশবের আলয় থেকে। তারপর ছাত্রজীবন, চব্বিশ বছর বয়সেই বিতর্কের মুখে পড়ে শেষপর্যন্ত পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক পদলাভ। প্যারিসে বিপ্লবের কেন্দ্র নতুন বন্ধু লাভ এবং কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনাবহুল কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মার্কসের জন্মকাল থেকে চব্বিশ বছর বয়সের বৃত্তান্ত নিয়ে প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে প্যারিস আর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উদ্ভব এবং সেই অধ্যায় শেষ হয়েছে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় অধ্যায় ও চতুর্থ অধ্যায় মার্কসের ঘটনাবহুল জীবনের স্মরণীয় পরিক্রমা।

ব্যক্তিগত জীবনে মার্কস অনেক দুঃখ [illegible] মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর দেহাবসানের প্রায় দুই মাস আগে তাঁর প্রিয়কন্যার মৃত্যু হয়। ইংলন্ডে প্রায় নির্বাসিতের মত অতিকষ্টে তাঁকে দিনযাপন করতে হয়েছে তথাপি তিনি তাঁর দর্শনীয় মতবাদ বিষয়ে কাজ করেছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী শ্রমিক পার্টির তত্ত্বগত ভূমিকার সূত্র রচনা করেছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বিভিন্ন দেশে পর্যটন করেছেন নিজের মতবাদের প্রচারের প্রয়োজনে।

এই গ্রন্থটির স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ করেছেন অমল দাশগুপ্ত অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে। এই জাতীয় গ্রন্থ অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রচুর পরিশ্রম ও পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন অমল দাশগুপ্ত এই অনুবাদকর্মে।

পরিশেষে প্রদত্ত ঘটনাপঞ্জী ও উল্লিখিত রচনাবলী নামক দুটি অধ্যায় মূল্যবান।

গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। চিত্রগুলি সুমুদ্রিত।

জার্মান মনীষার সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় দীর্ঘদিনের। জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠক সমাজের পরিচয় অল্পবিস্তর আছে কিন্তু 'জার্মান সাহিত্যের দ্বিরারত্ন পাঠ' নামক গ্রন্থে যেভাবে মধ্যযুগে জার্মান সাহিত্যের গোড়া থেকে শুরু করে একেবারে বর্তমান কাল অর্থাৎ বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে খুব সামান্য বাঙালী পাঠকের পরিচয় আছে। 'ক্যাসিক্যাল রিডিংস ফ্রম জার্মান লিটারেচার' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন ডঃ সুনীল রায়। এই গ্রন্থটির মূল সংস্করণের সংকলক—ভলফগ্যাং লাঙেনবুখার।

এই গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করেছেন ফ্রাংক আউয়ারবাখ। তিনি পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

গত দেড় হাজার বছর ধরে জার্মান চিন্তাধারায় ও সৃজনশীল রচনায় যে প্রসার ঘটেছে এই গ্রন্থে তার পরিপূর্ণভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বই সাহিত্যের তথ্যগত ইতিহাস নয়। পাঠকরা যাতে মূল রচনার [illegible] কিংবা উপলব্ধি [illegible] জার্মান সাহিত্যের [illegible] পারেন সেই [illegible] করা হয়েছে।'

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে ৭০০ থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের জার্মান সাহিত্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে সংস্কারযুগের বিষয়ক সাহিত্যের আলোচনা আছে। এই জাতীয় সাহিত্য চিরায়ত সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তৃতীয় ভাগ গ্যয়টের যুগ, এইভাগে ক্ল্যাসিসিজম ও রোম্যান্টিসিজম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে আছে উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্যালোচনা। এই উভয় দশকের কালের গতিপ্রকৃতির পার্থক্য ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক যুগের কথা শুরু করার পূর্বে সেই বিশেষ যুগটির বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য উপক্রমণিকায় সমগ্র বিষয়টি বিস্তারিত করে বলা হয়েছে। লেখক এবং তাঁদের রচনা বিষয়ে বিশ্লেষণী বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটিতে জার্মান সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যাবে।

৭০০—১৭০০ খৃষ্টাব্দের অধ্যায়টিতে মার্টিন লুথার হানস যেকব ক্রিস্টোফেল ফন গ্রিমেলসহাউসেন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ১৭০০—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গটথোলড ইফ্রাইম লেসিং, জর্জ ক্রিসটফ লিসটেনবের্গ, ফ্রিডরিখ, ক্রিডরিখ, এ্যাডলফ ক্লেইহের হন ক্লিঙ্গ, জোহান গটফ্রায়েড হারডার ও ইমানুয়েল কান্ট বিষয়ে আলোচনা আছে। ১৭৭০-১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রিডরিখ ম্যাক-মিলিয়ান ক্লিংগার, হাইনরিখ লিওপোল্ড ভাগনার, জোহান ভলফগ্যাং ফন গ্যয়টে, শীলার, জর্জ ফরস্টার, জোহান পাউল, নোভালিস, হাইনরিখ ফন ক্লাইসট, মারিটৎস জোসেফ ফন আইকেন ডরফ ও লুডভিগ উলান্ড বিষয়ে আলোচনা আছে। উনবিংশ শতক ও বিংশ শতক দুটি জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসের দুটি গৌরবময় অধ্যায়। এই কালে জার্মান সাহিত্যের বহু মনীষী লেখকের উদ্ভব হয়েছে এবং জার্মান সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সেই পর্বের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

এই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতিটি লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনার নমুনা দেওয়া হয়েছে। এই নমুনা অংশে বাংলায় অনুবাদ করা সহজ কর্ম নয়, মূলের ভাব অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদক ডঃ সুশীল রায় সে দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। কবিতাংশ গুলির বঙ্গানুবাদ রসোত্তীর্ণ। পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং চিত্রশোভিত। —অভয়ঙ্কর

(১) কার্ল মার্কস (জীবনী) রচনা : হাইনরিখ গেমকোভ। অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত। প্রকাশক : লেখাপড়া। কলকাতা-১২। দাম : বারো টাকা মাত্র।

(২) জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পর্ব— রচনা : ভলফগ্যাঙলাঙে নিবুচাদ। অনুবাদ : ডঃ সুশীল রায়। প্রকাশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম : বারো টাকা মাত্র।

এবার সাংবাদিকের ভূমিকা

মাত্র একটি নাম। আর তা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে প্রজ্ঞার আকাশ ভাবের গভীরতা। নানা চিন্তাভাবনার সোনালি ফসল। হ্যাঁ, মাত্র একটি নাম। বিতর্কিত, অথচ এড়িয়ে যাবার নয়। এ নাম এক দার্শনিকের, সাহিত্যিকের। এক নিঃসঙ্গ বিবেকের, রাজনীতিকের। আর সে নাম হল জাঁ পল সার্ত্রে।

এবার তাঁকে দেখা যাবে এক নূতন ভূমিকায়। পাদপ্রদীপের আলোয় আসছেন এবার সাংবাদিক হিসেবে। বের করছেন একটি দৈনিক পত্রিকা। বাংলায় তর্জমা করলে নাম দাঁড়ায় 'স্বাধীনতা'। প্রথম সংখ্যাটি বেরুচ্ছে ৫ ফেব্রুয়ারী।

এবং এ উপলক্ষ প্যারিসে বসেছিল সাংবাদিক সম্মেলন। সেখানেই জানালেন কেমন হবে তাঁর পত্রিকার চরিত্রটি। বললেন, পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকছেন শুধু বামপন্থীরাই। তবে বামমার্গী কোন গোষ্ঠী-চক্রের মুখপত্র হচ্ছে না 'স্বাধীনতা'। বললেন তিনি 'আমি থাকবো একজন সাধারণ কর্মী হিসেবেই। সংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুনভাবে কিছু দেওয়ার জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা।' তাঁর মতে সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে চলছে এখন দারুণ সংকট। নিঃসন্দেহেই দুর্দিন।

এক প্রশ্নের উত্তরে এই বিতর্কিত সাহিত্যিক - দার্শনিক জানান, স্বাধীনতা? হ্যাঁ ঐ শব্দটার মানে বলতে শুধু সাংবাদিক-দের অধিকারই বোঝায় না, পাঠকদের স্বাধীনতাই হলো প্রচার-মাধ্যমের আসল স্বাধীনতা। জনগণের সাহায্যেই সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দিতে হবে।' অন্য এক জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন যে জনগণের সাহায্যেই পরিচালিত হবে তাঁর পত্রিকা। তাঁর মতে জনগণ তাদের টাকা-পয়সা দেবেন, খবর সরবরাহ করবেন, এবং তদারক করবেন তাঁদের কাজকর্মও।

নিঃসঙ্গ বিদায়

মানুষটি মারা গেলেন। ভোরবেলার নিঃসঙ্গ শিশির ঝরার মতোই চলে গেলেন তিনি। নব্বুই বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক এক মাস আগেই নিলেন বিদায়। পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানালেন সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যের এক স্মরণীয় কণ্ঠস্বর। স্যার কম্পটন ম্যাকেঞ্জির মৃত্যু ঘটেছে সম্প্রতি।

না, শুধু ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া ছিল না। এযাবৎ প্রকাশিত যাঁর প্রায় একশো বইয়ের মধ্যে রয়েছে উপন্যাস ছাড়াও কবিতা নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, ইতিহাসবিষয়ক আলোচনা, বেতার ও টেলি-ভিশন থেকে প্রচারিত কথিকা। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের একজন দক্ষ সমালোচক।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ম্যাকেঞ্জির আবির্ভাব প্রথম নাট্যকার হিসাবে। সেটা ১৯০৬ সাল। বেরুলো 'দ্য জেন্টলম্যান ইন গ্রে'। এর ঠিক এক বছরের মাথায় বেরুলো একটি কাব্য-গ্রন্থ। কিন্তু কারো নজরে পড়লেন না তিনি। কোন সমালোচকই তাঁকে তেমনভাবে তুলে ধরলেন না লোকচক্ষুর সামনে। শেষপর্যন্ত কিছুটা ক্ষোভ, কিছুটা বেদনায় ভাবলেন তিনি পথ বদলাবেন। পরিবর্তনও করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই বেরুলো 'দ্য প্যাশোনেট ইলোপমেন্ট'। এবার নজর কাড়লেন বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্য-সমালোচকদের। কিন্তু এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটিও চোদ্দটি প্রকাশকের টেবিল থেকে এসেছিল ঘুরে। তবে ব্রিটেনের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি পান দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। বেরুলো 'কার্নিভ্যাল'। সাধু, সাধু রব পড়ে গেল। বিক্রি হল লক্ষ লক্ষ কপি। এরপরই বেরুলো 'সিনিস্টার স্ট্রিট'। অনেকটা আত্মচরিতমূলক উপন্যাস। হেনরী জেমসই হলেন সেই খ্যাতিমান পুরুষ যাঁর সাহায্যে এই উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরের মুখ দেখে। বলাই বাহুল্য, এই রচনাটি সেকালে পাঠকমহলে তোলে দারুণ ঝড়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই যুদ্ধের হাওয়া লাগল ইউরোপে। স্যার কম্পটন ম্যাকেঞ্জি রাজকীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিলেন। ১৯১৫-তে পেলেন কমিশন। এই সময়কার অভিজ্ঞতার ফসল 'গ্যালিপোলি মেমোরিজ'। তাঁর 'দ্য ফোর উইন্ডস অব লাভ' হলো উঁচুদরের আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যসৃষ্টি। অবশ্য স্যর কম্পটন ম্যাকেঞ্জির সত্যিকারের আত্মচরিত 'মাই লাইফ অ্যান্ড টাইমস'-এর প্রথম খণ্ড বেরোয় এই তো সেদিন, ১৯৬৩-তে। আর সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এ। ম্যাকেঞ্জির অন্যান্য বিখ্যাত রচনার মধ্যে 'রকেটস গ্যালোর', 'অন ময়্যাল কারেজ', 'হুইস্কি গ্যালোর' উল্লেখযোগ্য। শেষ রচনাটি রূপালি পর্দায় একসময় চিত্রায়িত হয়। খ্যাতকীর্তি এই মানুষটির মৃত্যুসংবাদ ছাপাতে গিয়ে দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ লেখেন, আমাদের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল, বহুমুখী ও সুদূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।'

দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি। ছ'টাকা।

১৯৩৭-৩৮ সালে শ্রীযুক্ত দিনেশ দাস বাংলা কবিতার আসরে কখনো প্রকৃতির সৌন্দর্যচেতনা, কখনো বা নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণাবোধ পরিবেশন শুরু করেন। 'সবুজ দ্বীপ', 'প্রথম চুম্বন', 'মৌমাছি', 'কপোতাক্ষ' প্রভৃতি সেই পর্বের রচনা। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ভাষারূপ সৃষ্টিতে তাঁর কবিমনের উৎসাহ ছিল সেই সূচনাপর্বেই,—সে উৎসাহ তাঁর কবি-জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে আরো বিচিত্র বিষয়বস্তুতে স্পন্দিত হয়েছে। পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতাগুণে তিনি কবিমনের অন্তর্দৃষ্টির প্রসঙ্গ তাঁর 'কবি-মনীষী', 'অদৃশ্য কবিতার পাখি' ইত্যাদি কবিতায় যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন তাতে প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা এবং জীবনের অমেয় যন্ত্রণা সম্বন্ধে বিষণ্ণতা দুইই বিদ্যমান। একটি 'ভূমিকায়' তিনি এই সংকলনে তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী দিয়েছেন এবং তারই মধ্যে তাঁর উপলব্ধির একটি সূত্র স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে—'পৃথিবীর অর্থ নেই, মূল্য নেই, আত্মা নেই। সমাজের শরীর অতৃপ্ত, হৃদয় অশান্ত, বিবেক সন্দিগ্ধ, মনে হয় এই বেদনা ও কান্না আকাশে-বাতাসে সর্বত্র ছড়ানো।'

এই অশান্তি সত্ত্বেও,—জীবনের বহু-বিচিত্র-অসুখে ভুগতে-ভুগতেও, তাঁর কবি-মন জীবনানন্দের মতন ভাষায় এক জায়গায় ('অসুখে') বলেছে—

তবু একদিন শুনি ভোরের পাখির ডাক ঃ
সবুজ তারায় গুঁড়ো ঝুরঝুর ঝরে পড়ে
বিস্ময়ে অবাক,
দেখি দূরে, উষার পায়ের গোছ টকটকে
লাল—
জীবন্ত ফুলের মত টলটলে আশ্চর্য
সকাল।

অদৃশ্য জলের শাখা হতে জল ঝরে
জীবনের সোনার নির্ঝরে,
মানুষ জীবন্মৃত বিবর্ণ মৃন্ময় ঃ
আকাশের উপরে আকাশ, সময়ের উপরে
সময়।

'কাস্তে' কবিতাটি যখন প্রথম বেরোয়, তিরিশের দশকের সেই শেষ প্রহর থেকেই দিনেশ দাসের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্ব বোধ কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বা আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। তিনি জীবন-খুঁজেছেন—যা ছড়িয়ে আছে নানা শব্দে, নানা ঘটনায়, জীবনব্যাপী অনুভূতির স্তরে স্তরে। 'কাব্যচিন্তা'র অন্তর্ভুক্ত 'জীবনের মানে' নামে চার ছত্রের একটি উক্তিতে তিনি জানিয়েছেন—

জীবনের নীতি খোঁজে শিক্ষকেরা ঠিক,
তত্ত্ব খুঁজে বের করে প্রৌঢ় দার্শনিক।
জীবনের মানে কিছু আছে কি না আছে
কবি, শিল্পী খোঁজ করে দিশা
পায় না যে।

তিনি মূলতঃ বিষাদের পথিক, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং মাঝে মাঝে কবি দিনেশ দাসের এই আত্মকথা বেশ আবেদনময় হয়ে ওঠে, যেমন 'কাঁচের মানুষ', 'মেয়েটি' ইত্যাদিতে, আরো নির্দ্বন্দ্ব আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় কোথাও কোথাও যেমন 'ঘুঘু ডাকে' কবিতায়,—আবার উপমা রূপক ইত্যাদি অলঙ্কারের অভিনবত্ব ঘটাবার সপ্রয়াস দৃষ্টান্তও তিনি দেখিয়েছেন, যেমন 'নব-বর্ষ' কবিতায়—'চৈত্রের চিনি-বৃষ্টিতে বাতাস মধুময়',—চিনিবৃষ্টি কথাটা তাঁর নিজের ভাল লেগেছে ভাবতে অবাক লাগে 'তবু' কবিতায় মিলের ঝোঁক কেমন যেন তরল মনে হয়, বিশেষতঃ এইসব ছত্রে—

শেষ করে দিচ্ছে ছন্দমিলের গরমিল
চলো যাই চলো সাগর যেখানে ঊর্মিল,
গুঁড়োনো গিনির মতই যেখানে গুঁড়ো
গুঁড়ো বালি উড়ছে
সোনা বালুচর পড়ে আছে কাঁচা রোদের
হলদে মুছে'..

'মুছে' কথাটা দুর্বল নয় কি?—নিতান্তই মিলের খাতিরে ওটিকে আনতে হয়েছে বলে মনে হয় না কি? অর্থাৎ এই শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে এমন অনেক লক্ষণ থেকে গেছে যেগুলিতে তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশের মধ্যে গৌণ অংশের অনু-প্রবেশ ঘটেছে—এবং বোধহয় বাংলা কবিতার বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ সংগ্রহেরই এ এক সাধারণ অপ্রতিরোধ্য নিয়তি। তবে তিনি কবি হিসেবে যতোরকম মানসিকতার মানুষ, এ-সংগ্রহে তার সামগ্রিক পরিচয়ই স্বীকৃত। 'বোম্বাই', 'কলকাতা', 'পনেরই আগস্ট ১৯৪৭' 'কোরিয়া ১৯৫০,' 'সরস্বতীর একটি উপ-নদী', 'শিক্ষক আন্দোলন ১৯৫৩,' 'জোয়ার, রক্ত, আগুন (১৯৬৪)' ইত্যাদিও তাঁর সেই সামগ্রিক মনোভূমির অন্তর্ভুক্ত। আবার নিগূঢ় ব্যক্তি অনুভূতির ইশারা ধ্বনিত হয় 'সেই ছায়াটা', 'চোর কাঁটা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম কবিতায়। শ্রেষ্ঠতারও 'তর'-'তম' আছে,—এই তারতম্যবোধ অনপনেয়। এই বিভিন্নতাই কবিমন,—দিনেশ দাস আমাদের অভিমতে প্রিয় কবিদের অন্যতম।

হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতা কল্পনালতা (প্রবন্ধ) ঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এসেম পাবলিকেশনস, ৬৭।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর'-এর মত একটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত গ্রন্থ রচনা করে সহৃদয় বুদ্ধিজীবী পাঠকমহলে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছেন। বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আকর্ষণ সরোজবাবুর সদ্য প্রকাশিত 'কবিতা কল্পনা-লতা' হাতে পেয়ে আমরা যথার্থ অর্থে উপকৃত বোধ করছি, 'উপকৃত' কারণ, বাংলা কবিতার 'আঙ্গিকের ওপর স্বতন্ত্র, বিস্তৃত বাংলা আলোচনা-গ্রন্থ খুবই কম। সরোজ-বাবুর গ্রন্থ সেই অভাব পূরণের পথে অন্যতম এক সংযোজন।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট বারোটি ছোট-বড় প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সরোজবাবু বিগত বারো বছর ধরে বাংলা কবিতা বিষয়ে যে সমস্ত ভাবনায় দীপিত হয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বর্তমান প্রবন্ধ-গুলি তারই লেখারূপ। প্রবন্ধগুলি আমরা কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকায় পত্রস্থ হতে দেখেছি ইতিপূর্বে এবং তখনি এগুলি যথেষ্ট নিঃশব্দে আলোড়ন তুলেছিল পাঠকমহলে। গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় কবিতার পাঠক ও সমা-লোচক সরোজবাবুকে সামগ্রিকভাবে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল।

প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগ আলোচনা আধুনিক কবিতার চিত্রকল্প বিষয়ক। রবীন্দ্র-কবিতার ফর্ম ও বিষয় নিয়ে দুটি দীর্ঘ

।।, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পাঁচ'প্রধান কাব্যভাবনা, জীবনানন্দ, অমিয় ?, বিষ্ণু দে এবং সম্প্রতি গঠিত বাংলাদেশের বাংলার কবি আল মাহমুদ ও শামসের আনোয়ার—এ'দের সম্পর্কে সরোজবাবুর চিন্তা-ভাবনা প্রবন্ধগুলিকে উজ্জ্বল করেছে।

সেসিল ডে লুই ওদেশের কবিতার চিত্র ও চিত্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি নিজে ছিলেন একাধারে কবি অন্যদিকে সমালোচক। মার্জোরি বুল্টিন বলেছেন, কবির হাতে একটি 'ইমেজ' জন্মায় মূলত কবির একান্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনার আধার হিসেবেই। এই 'ইমেজ'-এর সঙ্গে কবির যোগ,, পাঠকের সম্পর্ক, কাব্যের পরিণামী লক্ষ্য কি—এসব বিষয় নিয়ে বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে, সরোজবাবু বাংলা সাহিত্যে সে সবের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে।

কিন্তু আলোচনাগুলি একান্তভাবে মন্ময়। কবিতার বিষয় আর বিষয়ী—এই দুয়ের খুব ঘনিষ্ঠ না হতে পারলে, আমার মনে হয়, কাব্যসমালোচকের সাবজেকটিভিটি পরিপূর্ণ সত্যের ভিত্তি পায় না, আর সেই সঙ্গে কবিতার ভিকশন, চিত্রকল্পের সুষমা, ছন্দের মনোরম হৃদমানুগ প্রবাহ প্রভৃতি দিক কাব্যরসপিপাসুদের বোঝানো সহজসাধ্য হয় না। সরোজবাবুর আলোচনা নিশ্চয়ই আন্তরিক এবং মন্ময় হয়েও পাঠকের সঙ্গে কবিতার, তাঁর আলোচনার রক্তসম্বন্ধ নির্ণয়ে অবধারিত।

এক কথায়, সরোজবাবু সমগ্র গ্রন্থে তাঁর কাব্য-ভাবনার মৌলিকতার আশ্চর্য দিকগুলি স্পষ্ট করেছেন। 'কবিতার ভাষা', 'কবিতায় প্রাণকল্প ও তার অনুষঙ্গ', 'দীর্ঘ কবিতা ও চিত্রকল্পের সংলগ্নতা' ইত্যাদি আলোচিত অংশগুলি কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা বা সমালোচনা নয়, এক ধরণের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। কবিতার শব্দ, ভাষা, প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদির আলোচনা এমন উপলব্ধি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ও মৌলিক সিদ্ধান্ত ঘোষণায় ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে মনে পড়ে না।

বুদ্ধদেব বসু একবার কোথায় যেন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন কবিতার চিরন্তন মন্তব্য দিয়ে তাঁর সেই বিশেষ কবিতার বিচার বা আলোচনার স্থির সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। অর্থাৎ কথাটা হল এই—কবিরা সব সময়ে তাঁদের কবিতার যথার্থ সমালোচক হতে পারেন না। অন্যদিকে বিদেশী এজরা পাউণ্ডের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে আমাদের দেশের কবি জীবনানন্দ দাশের কথা—যিনি প্রকারান্তরে অভিমত দিয়েছেন—কবিই কবিতার যোগ্য সমালোচক। কিন্তু কবি বা অ-কবি, সহৃদয় পাঠক যেই হোন না কেন, যদি তিনি কবিতার আলোচনা বা সমালোচনায় সূক্ষ্ম হৃদয়ের স্পর্শ সমালোচকের কাজে পারদর্শী। আলোচ্য গ্রন্থের সমালোচক নিজেকে একই সঙ্গে কবি ও কবিতা-সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, কারণ তাঁর সমালোচনার দৃষ্টি সমালোচনার শাসনদণ্ডে শানিত নয়, রসগ্রাহী ও বোদ্ধা অনুভূতিপ্রবণ পাঠক-হৃদয় সংবাদে প্রাণিত।

এই সব কারণেই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক এবং প্রেমভাবনা নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, সরোজবাবুর আলোচনা নিশ্চয়ই নতুনত্বে ও নিষ্ঠার আন্তরিকতায় বিশিষ্টতার দাবী রাখে। জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে সম্পর্কিত আলোচনাগুলি সমালোচকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। আল মাহমুদ ও শামসের আনোয়ার সংক্রান্ত আলোচনা সময়োপযোগী।

সরোজবাবু নিজস্ব যুক্তি থেকে কখনো সরে যাননি, বা উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করার কথাও বিস্মৃত হননি। তবে যেহেতু প্রবন্ধকারের ভাষায় 'গবেষণা-গ্রন্থ নয়, রসভোক্তারাই আমার লক্ষ্য' তাই গভীরতম উপলব্ধির কথা প্রবন্ধগুলির অন্তস্তলে থাকায় এ গ্রন্থের পাঠকল সর্বকালের সহৃদয়।

কি ফল লভিনু (উপন্যাস)। সরোজ বসাক। সান্যাল এণ্ড কোং, ১-১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২, সাত টাকা।

শ্রীসরোজ বসাক রচিত 'কি ফল লভিনু' উপন্যাসটি বিষাদান্তক। দুই ভাই প্রভাকর ও দিবাকর। দিবাকরকে মানুষ করে বিয়ে দেয় বড় ভাই প্রভাকর, সরযূ নামে একটি স্বভাব-সরল মেয়ের সঙ্গে। সরযূ সংসারের সকলকে মানিয়ে নিতে পেরেছে, পারেনি স্বামী দিবাকরকে। দিবাকর পদ্য লেখে, অল্প মাইনের চাকরী করে। এই অবস্থায় দিবাকরের শ্বশুর-শাশুড়ীর চক্রান্তে ওদের সংসারে ভাঙ্গন ধরে, দুই ভাই আলাদা হয়ে যায়। সরযূর অভিমানে অকাল মৃত্যু ঘটে। পুত্র-কন্যা মামার বাড়ি মানুষ হতে থাকে, দিবাকর পথে পথে ঘোরে, ছদ্মনামে পদ্য লেখে। শেষে সেও পিতার কর্তব্য পালন করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। সরযূ-দিবাকরের মৃত্যু চরিত্র-ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রভাকর, দিবাকর, সরযূ, সরযূর মা-বাবা—প্রতিটি চরিত্র সুঅংকিত। যাঁরা গল্প পড়তে ভালবাসেন, দুঃখময় জীবনের কথা পড়ে দুঃখে অশ্রুসিক্ত হন, তাঁদের কাছে এ গ্রন্থ ভাল লাগবে। ভাষা সুখপাঠ্য।

জ্যোৎস্নার ভিতরে গর্জন (কাব্যসঙ্কলন)—গৌতম গুহ। অনির্বাণ প্রকাশনী, ৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকাতা—১২। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবি গৌতম গুহের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল—'হাত ভরে ফুল দেবে যারা/তারাই এসেছে দেখি করাতের কাব্যগ্রন্থের অন্য একটি কবিতায় কবির অভিজ্ঞতার আর এক রূপ—'ছেঁড়া পকেট থেকে, নিঃশব্দে/বাড়ি ফেরার পয়সা পড়ে যায়।' 'জ্যোৎস্না' সম্পর্কে কবির বক্তব্য প্রচলিত অনুভূতি থেকে ভিন্নস্বাদী। কবির 'জ্যোৎস্নার ভিতরে বেড়ে ওঠা ভয়' এবং এই ভয় অমূলক নয়। নাম কবিতায় কবির স্পষ্ট ঘোষণা—'শান্ত বাধ্য পেটের ছেলেকে/উঠোনের মিষ্টি ছড়া ভুলিয়ে রেখেছে/জ্যোৎস্নার ভিতরে তাই উদ্ভ্রান্ত গর্জন, রাবণের দাউ দাউ চিতা।' বস্তুত তরুণ আধুনিক কবি গৌতম গুহ জীবন, জগত ও অভিজ্ঞতাকে এনেছেন প্রত্যক্ষ সত্যের আলোয় যাচাই করতে। তাই কবিকণ্ঠ কোথাও শ্লেষ-ব্যঙ্গে-তীক্ষ্ণ, কোথাও বা অসহায়তা, হতাশায় দুঃখিত, বিষণ্ণ। কিন্তু কবি আশা, বাঁচার বাণীকে অস্বীকার না করে বরং সাধারণ লোককণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন, 'সুরেলা গান শুনি জীবনের মুখে নিশিশেষে/আজ ন-বছর ধরে।' কবির ছন্দ শব্দ, অভিজ্ঞতাদীপ্ত চিত্রকল্প যথেষ্ট কাব্যিক, আন্তরিক।

সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ : নগেন দত্ত। পরিবেশক : শিক্ষাভারতী। ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। আট টাকা।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—'বিশ তিরিশ দশকের সাহিত্য-আন্দোলনের মাঝে সমাজবাস্তবতা ইন্ধন যেখানে খুঁজে পেয়েছি তারই খানিকটা অংশমাত্র আলোচনা করেছি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এই দুটি ধারার এখানে আলোচনা করা সম্ভব হল না।' পূর্ণাঙ্গ না হলেও এ আলোচনার একরকম বিশেষ আবেদন আছে। তিনি লিখেছেন—'সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা মত থাকতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি সমাজ-বিপ্লব বর্তমানে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।'

এই চিন্তা ধরে 'চতুষ্কোণ' মাসিকপত্রে তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে,—সেই সঙ্গে আরো কিছু সংযোজিত হয়ে বর্তমান বইখানি দাঁড়িয়েছে। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' পত্রিকাগুলির লেখকরা সেকালের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফসল;—সে পর্বের বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী' গল্পের মূলে দেশের সেই বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য। তার আগে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'য় জমিদারদের প্রতি মমতা বর্জন না করে প্রজার প্রতি কিঞ্চিৎ ঔদার্য প্রদর্শনের নজীর পাওয়া গেছে। শিক্ষিত সমাজে, বিপ্লবের উগ্র চিন্তার প্রতি অনীহা ছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন ঘটেছে,—এবং তাতেই জাতীয় অর্থনীতির

তারপর তাঁর নিজের কথায়—'বাঙলা দেশে জমিদারীর এক রোখা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পর যে এক নতুন ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজে ফুটে ওঠে তার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে বোধ কারবারের মধ্য দিয়ে।' স্বল্পবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্পে। গ্রাম থেকে শহরে সরে এসেছে আমাদের কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা। 'দেশী বণিকদের স্বাদেশিকতার আন্দোলনের ফলে সমাজ - বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সমাজ-বিচ্ছিন্নতা-বাদ থেকেই সাহিত্যে 'আমি' তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।'—এইভাবে শ্রীযুক্ত দত্ত অনেক ভাববার কথা লিখেছেন, যা আর একটু গুছিয়ে লিখলে পাঠকের সুবিধা হোতো। অনেক গল্প-উপন্যাসের ও সমালোচনার প্রসঙ্গ এই আলোচনায় জায়গা পেয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণে ও বিন্যাসে,—সেই সঙ্গে ভাষাগত বন্ধুরতার ফলে বক্তব্য সম্বন্ধে লেখকের আন্তরিক প্রযত্ন অনুভব করা গেলেও কেমন যেন অগোছালো মনে হয়। এই অগোছালো ভাবটিই এই চিন্তাকুণ্ঠিত রচনার সর্বাধিক বাধা। 'উন্নয়' শব্দটি তিনি অনেকবার ব্যবহার করেছেন,—বোধ হয় উন্নয়ন-অর্থে। অনেক ছাপার ভুল আছে। সাহিত্যের আলোচনায় সমাজবাস্তববাদ নামক তত্ত্বচিন্তার গুরুভার ঘটেছে বলে মনে হয়। বইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠায় তাঁর মূল সূত্রটি পুনরায় দেখানো হয়েছে—যার মূল-কথা হোলো—'সমাজের একটি বিশেষ বিকাশশীল উন্নত স্তরে—বস্তু উৎপাদনের অন্তর্নিহিত যে সৃষ্টিশীলতা রয়েছে সেটা আত্মমণ্ডিত হয়ে এক সময়ে বিরোধের ভূমিকা গ্রহণ করে। দুইয়ের দ্বন্দ্ব থেকে এক-একটি নোতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।'

—স্বপ্রসা মিত্র

এরিস্টটলের পোয়েটিকস ঃ অনুবাদ। শীতল ঘোষ। মূল্য চার টাকা।

ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক ঃ শীতল ঘোষ। জে এন ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২।

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত এরিস্টটল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর 'পোয়ে-টিকস' গ্রন্থে ট্রাজেডী ও মহাকাব্যের যে রূপপ্রকৃতি নির্দিষ্ট করেছেন নাট্যশাস্ত্রের বিচারে আজও তা সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সমালোচনার আদর্শমানরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নাট্য-শাস্ত্রের অগণিত পণ্ডিত তার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন, কিন্তু এরিস্টটলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই কাব্যশাস্ত্রের পাঠকদের কাছে এরিস্টটলের পোয়েটিকস অপরিহার্য এবং শ্রীযুক্ত ঘোষ যথেষ্ট দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ গ্রন্থটির যথাযথ অনু-বাদ করে বাংলায় ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহী পাঠকদের একটি বড় অভাব পূরণ করেছেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলো বিভাগের প্রধান ডঃ অজিতকুমার ঘোষের একটি তথ্যসমৃদ্ধ সুন্দর ভূমিকায় গ্রন্থটির মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

'ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক' প্রকৃতপক্ষে প্রথম গ্রন্থটিরই পরিপূরক। কারণ এই গ্রন্থটিতে পোয়েটিকস-এর ভিত্তিতে গ্রন্থ-কার নাট্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তবে পোয়েটিকস গ্রন্থে কাব্যের প্রকৃতি ভাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা থাকলেও উল্লেখিত গ্রন্থে লেখক শুধু ট্রাজেডীতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন।

মানবপ্রেমিক কবি ও সাহিত্যিক দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন। শিশির দাস। প্রকাশক —সমীর ভট্টশালী, ৩৫, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। পাঁচ টাকা।

শ্রীশিশির দাস ইতিপূর্বে 'মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থ রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' সংক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থটি তাঁর প্রবন্ধকার হিসেবে আর এক-দিকের ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মূলত দেশপ্রেমিক, রাজনীতি-বিদ, দাতা হিসেবেই সর্বসাধারণে পরি-চিত। কিন্তু তিনি যে এই সমস্ত দুরূহ কর্মপ্রয়াসের মধ্যে নিরলস সূক্ষ্ম সাহিত্য-চর্চাও করে গেছেন এবং সেক্ষেত্রে যে যথেষ্ট মৌলিক কবিক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তার পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। শ্রীদাস কবি ও সনেট রচয়িতা চিত্তরঞ্জনের কাব্য-বিচারক সম্পাদক ও দেশদরদী চিত্তরঞ্জনের সম্যক পরিচয় স্পষ্ট করার জন্য 'মালঞ্চ' 'মালা', 'সাগর-সঙ্গীত', 'অন্তর্যামী', 'কিশোর-কিশোরী' —এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলির বিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা বেশী হয়নি। বর্তমান গ্রন্থটি সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

নহবৎ—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। অরুণ ইন্দু। ২নং হরিহরপুর। বারাসাত। ২৪ পরগণা। দাম দু'টাকা।

সমকালীন যুগভাবনার স্বাক্ষরবহ সাহিত্য পত্রিকা নহবৎ। রচনা নির্বাচনে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রগতিশীল মানসিকতা এবং সুস্থ জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। গল্প লিখেছেন কালীকুমার চক্রবর্তী সুজিত মুখোপাধ্যায়, তাপস আঢ্য, সুবোধ ভট্টাচার্য, সমীরকান্তি বিশ্বাস, তুষারকান্ত রায় ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং অরুন্ধতী [illegible]। জগন্নাথ ঘোষ এবং শীতেন্দু [illegible] প্রবন্ধ দুটি যুক্তিনিষ্ঠ। কবিতা লিখেছেন —তারাপদ রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, [illegible] হাজরা, নবীন সুর, তুলসী মুখোপাধ্যায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর দে, তপন গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল [illegible], অর্ধেন্দুশেখর দেব, [illegible], [illegible] ভট্টাচার্য, সত্য গুহ এবং আরো অনেকে।

শঙ্খ (আশ্বিন-কার্তিক)—প্রধান সম্পাদক বিমল সেন। ৪ বিলপাড় রোড। নবব্যারাকপুর। ২৪ পরগণা। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটি পরিচ্ছন্ন। [illegible] বিশ্বাসী। বেরুচ্ছে শতি [illegible] সাহিত্য সংস্থার নবীন প্রতিভার সঙ্গে প্রবীণের সংযোগ-সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ সংখ্যায় লিখেছেন 'ভবানী মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, কানাই-লাল দত্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ শামসুর রহমান এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগবে।

সংলাপ ঃ সম্পাদক অরুণ রায় সরস্বতী। ৭৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। কলকাতা—৯। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ত্রিপুরার জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক রচনাটি আকর্ষণীয়। তাছাড়া, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক ফণিভূষণ আচার্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণ ধর। পত্রিকাটি সমকালীন সমাজের উত্তাপ-উত্তেজনা সম্পর্কে উদাসীন নয়। অনেকের কাছে সংগ্রহযোগ্য মনে হবে।

ইতিহাসের সাক্ষী ।।২

আনন্দভবন ।। এলাহাবাদ

শ্যামল পাঠক

(২)

ট্রেন ছুটে চলেছে, সেই সঙ্গে আমরাও এগিয়ে চললাম মোগলসরাইএর পথে। আমাদের কামরার অধিকাংশ যাত্রীই অবাঙালী। শঙ্কর তাদের সঙ্গে গল্প সুরু করল। ইতিমধ্যে পাটনা ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে ট্রেন একটি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। জানালার পাশ দিয়ে একজন চা-ওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল, আমি ডেকে চা নিলাম। সেই সময় কামরার মধ্যে এক ফেরিওয়ালা উঠল। তার হাতে ও ঝোলানো কতগুলি কলম, ছোট টর্চ, ছুরি ও চিরুনি। অবশ্য একটু পরেই বুঝলাম সে ফেরিওয়ালা নয়, নিলামওয়ালা। লোকটি বলল কলমগুলি খুব দামী। নিলামের ডাকে যিনি প্রথম হবেন তাঁকে সেই দামে কলমটি ও সঙ্গে একটি ছোট টর্চ উপহার দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবেন যাঁরা তাদের বিনামূল্যে একটি করে ছুরি ও চিরুনি দেওয়া হবে। তখন বেশ কয়েকজন মহাউৎসাহে নিলাম ডাকতে সুরু করলেন। দু'টাকা থেকে ছ'টাকা পর্যন্ত দাম উঠল। যিনি প্রথম হলেন তিনি সেই দামে কলমটা কিনে নিয়ে সঙ্গে একটি টর্চ পেলেন। অন্য দুজন একটা করে ছুরি ও চিরুনি পেলেন। এইভাবে কয়েক দফা ডাক হয়ে নিলাম শেষ হল। তখন নিলামওয়ালা ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন নামলেন যারা নিলামে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন এক ভদ্রলোক বললেন এরা সকলেই নিলামওয়ালার লোক। যাত্রী সেজে ট্রেনে উঠে নিলামে ডাক দিয়ে সাধারণ যাত্রীদের কাছে বেশী দামে ও উপহারের নামে সস্তা দামের কলম ও টর্চ বিক্রি করে। জিনিস বিক্রির এই নতুন কৌশল দেখে অবাক হলাম।

ট্রেন আবার এগিয়ে চলল। [illegible] থেকেই আকাশে মেঘ জমেছিল এবার সুরু হল বৃষ্টি। প্রথমে দূরে ঘর ও জোয়ার ক্ষেতের ভিতর কুয়াশার ঝাপসা আবরণের মতো মনে হচ্ছিল, এবার কাছে এল বৃষ্টির ধারা হয়ে। জানালা বন্ধ করে দিলাম। কাচের গা বেয়ে বৃষ্টির জল তখন গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সেদিন রবিবার। দুপুর পৌনে দুটোয় আমরা মোগলসরাই স্টেশনের প্লাটফরমে পা রাখলাম। তখনো বৃষ্টি থামে নি, থামবার সম্ভাবনাও নেই। সমস্ত আকাশ-টাই মেঘে ঢেকে আছে। সুতরাং স্টেশনে অপেক্ষা করা অর্থহীন। শঙ্কর ও আমি আমাদের ব্যাগগুলি কাঁধে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে স্টেশনের বাইরে এলাম। পাটনা থেকে এখানে শীত অনেক বেশী। তার উপর বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা যেন কাঁটার মত বিঁধছে। এখান থেকে একটা রিকসা নিয়ে শঙ্করদের অফিসের দিকে চললাম। স্টেশন থেকে কিছুদূরে গোল্লামুণ্ডিতে ওদের অফিস। একটু পরেই বড় একটা দোতলা বাড়ীর সামনে শঙ্কর রিকসা থামাতে বলল। রিকসা থেকে নেমে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম। শঙ্কর এখানেই থাকে। পাশাপাশি দুটি ঘরই ওর ব্যবহারের জন্য। ওপাশের ঘর দুটিতে থাকেন ওখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রফুল্ল চক্রবর্তী। নীচের তলায় শঙ্করদের অফিস। আমরা যেতেই হাসিমুখে প্রফুল্ল-বাবু বেরিয়ে এলেন। ওঁর সঙ্গে পরিচয় হল। বেশ সাদাসিধে মানুষ। বাড়ী বর্ধমান এখানে অনেকদিন হল চাকরী করছেন।

পরের দিন সকালে কাছাকাছি কিছুটা জায়গা ঘুরে এলাম। চায়ের দোকানে আলাপ হল মহম্মদ সৈইম ও মহম্মদ ইজরাইলের সঙ্গে। সৈইম এলাহা-বাদের লোক এখানে চাকরী করেন ইজরাইলের বাড়ী বিহারে। ওর বাবা রেলে চাকরী করতেন, তাই ছোটবেলা থেকেই এখানে বসবাস। ইজরাইল চাকরী করেন না ব্যবসার দিকেই ওঁর ঝোঁক। দু'জনেই বেশ খোশমেজাজী। সকালে আমরা এক-সঙ্গেই গল্প করতে করতে চা ও জলখাবার খেলাম। ওঁদের মধ্যে এতটুকু গোঁড়ামী দেখলাম না। খুব কাছের মানুষের মতোই ওরা আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এরপর দেখা হল সন্তোষ চ্যাটার্জির সঙ্গে, চমৎকার হিন্দীতে কথা বলেন। প্রথমে আমি বুঝতেই পারি নি উনি বাঙালী। বহু বছর ধরে ওঁরা উত্তরপ্রদেশে বসবাস করছেন। সন্তোষবাবু একটি প্রেক্ষাগৃহে অপারেটারের কাজ করতেন বর্তমানে বেকার। ভদ্রলোক এখানকার বহু লোকের সঙ্গেই পরিচিত।

সেদিন আমাদের বেনারস ও সারনাথ যাওয়ার কথা। শঙ্কর সন্তোষবাবুকে বলল তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তোমার তো ওখানে বেশ জানা শোনা আছে। উনি আপত্তি করলেন না। ক্যামেরা সঙ্গেই ছিল, তিনজনে উঠে বসলাম বেনারসের বাসে। মোগলসরাই থেকে বেনারস বেশী দূরের পথ নয়। বোধহয় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই এসে গেলাম।

খুবই প্রাচীন এই বেনারস। খৃস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে ষোলটি রাজ্য ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে বোধহয় কাশী ছিল সবাপেক্ষা শক্তিশালী। কাশীর রাজধানী ছিল বারাণসীতে। সে যুগে বারাণসী এমন সমৃদ্ধ ছিল যে তাকে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের ঈর্ষার কারণ হতে হয়েছিল। সেই সঙ্গে বারাণসীর উপর তাদের লোলুপ দৃষ্টিও পড়েছিল। কাশীর সেই সমৃদ্ধি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ক্রমশঃ কোশলরাজ্য প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। পরবর্তীকালে মগধরাজ অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করে উপঢৌকন স্বরূপ কাশী গ্রাম লাভ করেন। প্রাচীনকাল থেকে বহু পৌরাণিক কাহিনীও সৃষ্টি হয়েছে এই বারাণসীকে কেন্দ্র করে।
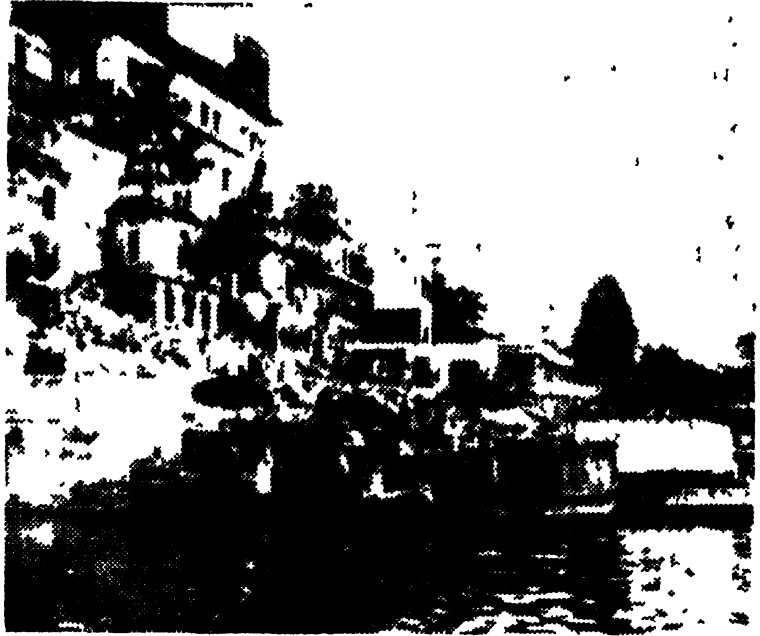
বাজঘাটের আশেপাশে দেখলাম ছড়িয়ে গছে প্রাচীনকালের অনেক চিহ্ন। এখান কে টাঙ্গায় চড়ে শহর দেখতে বেরিয়ে লাম। বেশ বড় শহর, বহু দোকানপাট তার দু'পাশে। দোকানগুলিতে নানা লোকের আনাগোনা। ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে গেলাম মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে। পায়ে হেঁটে সরু গলি দিয়ে এগিয়ে চললাম। বড় বড় পাথর বিছানো রাস্তা পাশে নানা দেবতার মূর্তি। গলিগুলি প্রায় সব। পথ জানা না থাকলে রাস্তা হারিয়ে ফেলার খুবই সম্ভাবনা। ধীরে ধীরে রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেল সামনেই গঙ্গা। গঙ্গার তীরে মণিকর্ণিকার ঘাট এলাম। এখানেই শ্মশান। জনশ্রুতি এই শ্মশানের আগুন কখনো নেভে না। এই শ্মশানকে কেন্দ্র করে লোকমুখে বত কাহিনীই শোনা যায়। দেখলাম গঙ্গার তীরে অনেকগুলি শব দাহ করা হচ্ছে। সৎকারের জন্য আরো দুটি মৃতদেহ নিয়ে আসা হল। দেখলাম কেন এখানে আগুন নেভে না। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ শেষ বয়সে বৈতরণী পার হবার আশায় এখানে শেষ জীবন কাটিয়ে যান।

এখান থেকে দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলাম। এখানে পুরোহিত ও পান্ডাদের বেশ আনাগোনা। ঘাটের বড় বড় চাতালগুলিতে তালপাতার তৈরী বিরাট বিরাট ছাতা। তার তলায় ঠাকুরমশাইরা শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনায় রত। সামনে বসে ভক্তবৃন্দ পাঠ শুনছেন। ঘাটে স্নানার্থীদেরও বেশ ভীড়। একটা নৌকা ভাড়া করে আমরা রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে গেলাম। এখানেও শ্মশান। এখানেই নাকি রাজ্য ত্যাগ করে হরিশ্চন্দ্র রাজা চণ্ডালের জীবিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘাটেই পরে মৃত পুত্র ও স্ত্রী শৈব্যার সঙ্গে রাজার মিলন হয়েছিল। ধর্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুত্রের জীবন ও রাজ্য আবার তিনি ফিরে পেলেন।

কাশী ওপারের নাম ব্যাসকাশী। ব্যাসদেব নাকি এখানে দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবীর অভিশাপে তাঁর আশা তার পূর্ণ হল না। লোকের বিশ্বাস এখানে মরলে পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মাতে হবে। তাই ওখানে কোন বসতি গড়ে ওঠে নি। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির অন্নপূর্ণা মন্দির ও কাশীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বহু পৌরাণিক কাহিনী। সেকথা থাক। দূরে রামনগরে মহারাজের রাজার কেল্লা দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় দুর্গ। দূর থেকেও বেশ সুন্দর দেখায়। গঙ্গা থেকে কাশীর ঘাটগুলির দৃশ্যও খুব মনোহর। যেকোন মানুষকেই মুগ্ধ করে। নৌকা বিহার শেষ করে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম।

কাশীতে এসে মনেই হচ্ছিল না যে বাংলাদেশের বাইরে আছি। অসংখ্য বাঙালীর ভীড়। অনেকেই বেড়াতে এসেছেন আবার সেই সঙ্গে পুণ্যার্জনের

দশাশ্বমেধ ঘাট : কাশী

আশা নিয়েও এসেছেন অনেকে। বহু সাধু সন্ন্যাসীদের দেখা পেলাম এখানে এসে। পথে বিদেশী হিপিদের আনাগোনাও কম নয়।

গঙ্গা থেকে ফিরে এসে বিশ্বনাথ মন্দির ও অন্নপূর্ণা মন্দির দর্শন করলাম। মন্দিরের পথ সরু হলেও ভক্তের ভীড় কিন্তু অসম্ভব। সেই সঙ্গে দু'পাশের দোকানগুলিতে বেচাকেনার ব্যস্ততা। কোন প্রকারে মন্দিরে প্রবেশ করলাম, প্রণাম করে ফিরে এলাম একটি হোটেলে। খাওয়া শেষ হলে টাঙ্গায় চড়ে গেলাম বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিরাট এলাকা নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বাড়ীগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তৈরী করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটিও বেশ মনোরম। কিছুক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এখান থেকে উপস্থিত হলাম সারনাথে।

সারনাথ বৌদ্ধদের পরম তীর্থস্থান। বেনারসের কাছেই এই পবিত্র ভূমি। সারনাথের প্রাচীন নাম ঋষিপত্তন। বুদ্ধদেব সম্যক বোধিলাভ করার পরে এখানেই প্রথম ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রথম উপদেশবাণী প্রচারের এই ঘটনাকে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলা হয়। সারনাথের বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দিরটি বেশ সুন্দর। এখানে একটি মিউজিয়ামও দেখলাম। মিউজিয়ামের মধ্যে এখানে উদ্ধারপ্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিস ও একটি অশোক স্তম্ভ রাখা হয়েছে। সারনাথে কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট আছে।

এখান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। মোগলসরাইগামী একটা বাসে আমরা উঠলাম। সন্তোষবাবু বললেন, আপনারা চলে যান। আমার ফিরতে দেরী হবে। এখানে একটা কাজ সেরে পরে ফিরব। তিনি চলে গেলেন। ... তিনি

আমাদের জন্য ব্যস্ত করলেন এমন মানুষ বড় একটা দেখা যায় না।

বাসে প্রচন্ড ভীড়। দেখলাম বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালীও বাসে উঠেছেন। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের সামনের আসনে এক বাঙালী ভদ্রমহিলা। সঙ্গে দুটি মেয়ে। আমি আর শংকর গল্প করছিলাম। আমাদের কথা শুনে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কলকাতা থেকে এসেছি কিনা? বললাম আমি কলকাতা থেকে ঘুরতে বেরিয়েছি আর শংকরকে দেখিয়ে বললাম ও মোগলসরাইতে থাকে ওর ওখানেই উঠেছি। উনি বললেন, আমরাও মোগলসরাই রেল কলোনীতে থাকি। এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। ওঁর পাশে বসা বড় মেয়েটি ধীরে ধীরে বলল কতদিন আমরা কলকাতা যাই না। আমি হেসে বললাম, গেলেই তো পারেন এখন ওর মা উত্তর দিলেন মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় খুবই কিন্তু হয়ে ওঠে না। ভদ্রমহিলার বড় মেয়েটি বেশ ঠান্ডা আর ধীরস্থির কিন্তু ছোট বোনটি ঠিক উল্টো সারাক্ষণ ছটফট করছে।

রাজঘাটের কাছে ট্রাফিক জ্যাম হল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শুনলাম গঙ্গার ব্রীজের ওপার থেকেই জ্যাম শুরু হয়েছে। বাস আর এগোয় না, মাঝে মাঝে একটু হাটি হাটি পা পা করেই থেমে যাচ্ছে। যে যেখান দিয়ে পারছে বাস, লরী ঢুকিয়ে দেওয়ায় পুরো রাস্তাটাই বন্ধ হল। কলকাতায় ট্রাফিক জ্যাম হয় কিন্তু এমন অবস্থায় কোনদিন পড়তে হয় নি। প্রায় আড়াই ঘন্টার মত দাঁড়িয়ে থেকে বাস আবার চলল। ততক্ষণে আমাদের পা টন টন করছে দেখলাম ভদ্রমহিলার চঞ্চল মেয়েটির চোখে প্রায় জল এসে গেছে ওর দিদিও

দুর্ভোগ! ওর মায়ের মুখেও উদ্বেগের ছায়া। বিরক্তি সবারই।

মোগলসরাইএ ফিরতে অহেতুক রাত হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে ভদ্রমহিলা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব? শঙ্কর বলল, বেশতো বলুন না। উনি অতি বিনীতভাবে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেল। আমাদের রাস্তাটাও বড্ড ফাঁকা। আপনারা একটু এগিয়ে দিলে খুব ভাল হয়। একা যেতে সাহস হচ্ছে না। আমরা বললাম, চলুন এগিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে বাসের সামনের দিক থেকে আরো কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নামলেন। ও'রাও ঐদিকেই যাবেন। তখন ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, যাক্ আপনাদের আর কষ্ট দিতে হল না। মেয়ে দুটিও হাসল।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই অমলবাবু এসে হাজির হন। বললেন, আজ যদি চুনার যান তবে একসঙ্গে যেতে পারেন। ওখানে একটা কাজে আমাকে যেতে হবে। বললাম, তবে তো খুবই ভাল হল। শঙ্করও আমাদের সঙ্গে যাবে বলল। দুপুরবেলা আহার পর্ব শেষ করে ট্রেনে চেপে বসলাম। ঘণ্টা দেড়েক পরেই ট্রেন চুনারে এসে থামল। ট্রেন থেকেই পাহাড়ের উপর চুনার দুর্গটি দেখা যাচ্ছিল। স্টেশনের বাইরে এসে একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। টাঙ্গাওয়ালা প্রথমে বেশী ভাড়া চেয়েছিল, অমলবাবুর ধমকে চুপ করল। আমাদের টাঙ্গায় এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী উঠলেন। ও'রা কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে হাওয়া পরিবর্তন করতে এখানে এসেছেন। একটু পরেই আর একজন ভদ্রমহিলাও এলেন। টাঙ্গায় বসে নিজেই আমাদের সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। ও'র স্বামী রেলে চাকরী করেন, এখানেই বাড়ী করেছেন। উনি বললেন, কুড়ি বাইশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এখন তো প্রায় এখানকারই লোক হয়ে গিয়েছি। অপর ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা কিন্তু এখানে এসে জিনিসের দাম অনেক বাড়িয়ে দেন। বাজারে আপনাদের কাছ থেকে যা খুশী দাম নেয় শেষে ওদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া করতে হয়। কথা বলতে বলতে আমরা এসে গেলাম। বিদায় নিয়ে যে যার পথে পা বাড়ালাম।

সামনেই পাহাড়ের উপর বিরাট প্রাকারে ঘেরা চুনার দুর্গ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটা ঘুরে দেখলাম। সেখানে বহু পুরানো বাড়ী ঘর দেখলাম। একজন স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোক অমলবাবুর পরিচিত। ও'র সঙ্গেই অমলবাবুর কাজ ছিল; অনেকক্ষণ গল্প করলাম, উনি আমাদের চা ও জলখাবার খাওয়ালেন। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে চললাম, প্রথমে দুটি ছবি তুললাম। তারপর দুর্গের ফটকের কাছে এলাম। এখানে খাতায় নাম, ঠিকানা ও সময় লিখতে হল। প্রহরী ক্যামেরা নিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে

তোরণটি খুবই সুন্দর। উপরে উঠে গেছে। চমৎকার স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন এই দুর্গটি।

খৃঃ পূঃ ছাপান্ন বছর পূর্বে চুনার দুর্গটি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর অন্যান্য সম্রাট এবং বৃটিশ শক্তি দুর্গটির অধিপতি ছিলেন। শেরশাহের জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে এই চুনার দুর্গে। ইতিপূর্বে চুনার দুর্গের অধিপতি ছিলেন তাজ খাঁ। তাজ খাঁর মৃত্যুর পরে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করে শের খাঁ চুনার দুর্গটি অধিকার করে নেন। পরের বছর সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে এই দুর্গটি অবরোধ করেন। সুচতুর শের খাঁ মৌখিকভাবে হুমায়ুনের প্রভুত্ব স্বীকার করে সেবার আত্মরক্ষা করেন।

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শের খাঁ যখন গৌড় অবরোধে ব্যস্ত সেই সময় হুমায়ুন শের খাঁর কর্মকেন্দ্র চুনার আক্রমণ করলেন। তবুও দীর্ঘ ছয় মাসের আগে হুমায়ুনের পক্ষে চুনার দুর্গ জয় করা সম্ভব হয় নি। এরপর হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হলে শের খাঁ তাঁর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হন নি। বর্ষা নামার ফলে হুমায়ুনকে বাধ্য হয়ে ছয় মাস বাংলাদেশে অবস্থান করতে হয়। এই সময়ে শের খাঁ চুনার দুর্গটি পুনরায় অধিকার করেন। এরপরে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বক্সারের কাছে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন শের খাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর শের খাঁ শের শাহ উপাধি ধারণ করলেন। কত কথাই মনে এল, দুর্গের প্রতিটি পাথরে সেই সব প্রাচীন ইতিহাস গাঁথা আছে।

দুর্গের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বিশাল প্রাকারের গায়ে রয়েছে অসংখ্য বাকানো ছিদ্র। দুর্গ রক্ষার জন্য এখান থেকে গুলি চালানো হত। অন্যদিকে আর একটি তোরণ আছে গঙ্গার ধারে। গঙ্গার দিকে দুর্গের ভিতর একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখলাম, নীচের দিকে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গ পথে কিছুটা নেমেছিলাম, কিন্তু ভিতরে জমাট অন্ধকার আর দুর্গন্ধ। ক্রমাগত চামচিকের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনে এই গুপ্ত পথটি ব্যবহৃত হত। দুর্গের পাশ দিয়েই গঙ্গা বয়ে গেছে। উপর থেকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম গঙ্গার দিকে। এখান থেকে গঙ্গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মতো।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ক্যামেরা ফিরিয়ে নিয়ে গঙ্গার ধারে গাছের তলায় ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে বসলাম। গঙ্গা তীরে গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গটি। কতগুলি গাছপালার ডাল নদীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গঙ্গার সঙ্গে ওদের পরিচয়ের পালা যেন এখনও শেষ

দূরে গাছের মাথার উপর আকাশ নেমে এসেছে, সবুজ ফসলে ক্ষেত ভরে গেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি কুঁড়ে ঘর, আর ওদের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। গঙ্গার মাঝখান দিয়ে মাঝি নৌকা বেয়ে চলেছে। হাওয়ায় নদীর বুকে ঢেউয়ের দোলা লাগছে, সেই সঙ্গে নৌকাও দুলছে। ওপারের আকাশে তখন সূর্যদেব ঢলে পড়ছেন ক্লান্তিতে। চোখে তাঁর ঘুমের ছায়া নেমে এসেছে। বিদায় নেবার আগে তাঁর রক্তিম চোখের আলো যেন আকাশে আবির ছড়িয়ে দিল। সেই আলোর ছোঁয়ায় গঙ্গার জলও লজ্জায় রাঙা হয়ে

গঙ্গার তীরে বেঞ্চে ও ঘাসের উপরে অনেক বাঙালীকে হাওয়া খেতে দেখলাম। মনে হল চুনারে বাঙালীরা একটা সাময়িক উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। বেশীর ভাগ লোকই সপরিবারে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় এসেছেন। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। ও'দের দুর্গ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম, দেখলাম কেউই কোন খবর রাখেন না।

চা পান করে আমরা ফিরে এলাম বাজারের দিকে। ওখান থেকে একটা টাঙ্গায় উঠলাম। ঠিক হল বাসেই ফিরব। এর মধ্যে একজন বাঙালী ভদ্রলোকও টাঙ্গায় উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কোথায় যাব? মনে হল মোগলসরাই ফিরব শুনে আশ্বস্ত হলেন। কথায় কথায় বললেন, হুজুগে বাঙালী বাবুদের কথা আর বলবেন না। ও'দের জন্য এই সময়ে আমাদের মাছ মাংস খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিতে হয়। দোকানদার যা চাইবে সেই দামেই জিনিস কিনবেন, আর পয়সা ফুরোলেই বাড়ী চললেন। শেষে ভুগে মরি আমরা। আমি বললাম, দেখুন, এ'রা এখানে বেড়াতে আসেন, নিশ্চয়ই এখানকার জিনিসের দাম জানেন না। তাই হয়তো দোকানদার ঠকিয়ে দেয়। উত্তরে বললেন, দর দাম করে কিনলে কিন্তু এমন হয় না। বাসস্ট্যান্ডে নেমে ভদ্রলোক চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন, কাছেই আমার বাসা। বহু বছর ধরে এখানেই আছি। আপনাদের সঙ্গে অনেক অবান্তর কথা বললাম, কিছু মনে করবেন না।

বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অমলবাবু ও শঙ্করের সঙ্গে গল্প করছিলাম। অমলবাবু বললেন, জানেন চুনারে আমাকে প্রায়ই কাজে আসতে হয়, কিন্তু এই প্রথম দুর্গের ভিতরটা ভাল করে দেখলাম। এতদিন কোন উৎসাহই বোধ করিনি। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম, শেষে একটা বাস এল। তাড়াতাড়ি উঠে একটা জায়গায় বসলাম তিনজনে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ঝড়ের বেগে বাস ছুটল। পাড়াও থেকে আবার বাস পাল্টাতে হল। শেষে রাত দশটায় আমরা ফিরে এলাম।

পরের দিন পয়লা নভেম্বর বেশ সকালেই ঘুম ভাঙল। সেদিন আমার রাম-

ইজরাইলকে যাওয়ার জন্য বলেছিলাম। শংকরের কাজ ছিল, ও যেতে পারবে না। ইজরাইল এককথাতেই রাজি হয়েছেন। সকাল আটটার মধ্যেই উনি চলে এলেন। আমি তৈরী হয়েই বসে ছিলাম। উনি আসতেই বেরিয়ে পড়লাম। মোগলসরাই থেকে পাড়াও বসে গেলাম। পথের দুপাশে গম, যব ও জোয়ারের ক্ষেত। ফসলে ভরে গেছে। হাওয়ার দোলায় তাদের বুকে জেগে উঠছে শিহরণ। নতুন নতুন অনেক কারখানাও গড়ে উঠছে দেখলাম। পাড়াও থেকে অন্য একটি বাসে উঠতে হল। রামনগরে বাস আসতেই আমরা নেমে পড়লাম।

সামনেই রামনগর কেল্লার বাইরের তোরণটি দেখা যাচ্ছে। আমরা এগিয়ে গেলাম, একটু পরেই দুর্গের ফটকে প্রবেশ করলাম। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য এক টাকা করে টিকিট কাটতে হল। ভিতরে রাজার কয়েকজন শিপাইকে কুচকাওয়াজ করতে দেখলাম। দুর্গের প্রহরীদের ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম, খুবই অমায়িক ওরা। কেল্লার ভিতরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখাল। গঙ্গার তীরে বেশ বড় গড়টি। ভিতরে রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের বিভিন্ন মহলগুলি দেখলাম। বড় বড় হল ঘরে পূর্ববর্তী রাজাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

এই কেল্লাটির অধীশ্বর বেনারসের রাজা। বেনারসের রাজারা রামনগরেই দুর্গের অভ্যন্তরে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের রাজা মানসুরম সিং প্রথম সনদ লাভ করেন। তারপর উত্তরসূরী রাজারা সিংহাসনে আরোহণ করেন বিভিন্ন সময়ে। বর্তমান রাজ্যহীন রাজার নাম ভবতী নারায়ণ সিং। প্রথমেই একটি হল ঘরে প্রবেশ করলাম। এখানে রাজাদের ব্যবহৃত নানা রকমের পোষাক, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, রুপোর পালঙ্ক প্রভৃতি দেখলাম। পাশের ঘরে বিভিন্ন উৎসবের সময় রাজারা হাতীর পিঠে যে সমস্ত হাওদায় বসতেন, সেইগুলি রাখা হয়েছে। হাওদাগুলিতে সোনা ও রুপোর পাতের উপর সুন্দর কারুকার্য দেখলাম। পাশেই রয়েছে রৌপ্যমণ্ডিত একটি পালকি। কাশীরাজ উদিত নারায়ণ সিংকে বাদশা আকবর এই পালকিটি উপহার দিয়েছিলেন। এখান থেকে অস্ত্রাগারটি দেখতে গেলাম। প্রাচীন কালের গাদাবন্দুক থেকে আধুনিক বিভিন্ন অস্ত্রপাতিতে কাশীরাজের অস্ত্রাগার সুসজ্জিত। নানা প্রকার ঢাল, তলোয়ার, বর্শা বন্দুক রাইফেল পিস্তল চারিদিকে সাজান রয়েছে। এইগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাজার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া অস্ত্রও আছে। দোতলায় একটি ঘরে হাতীর দাঁতে তৈরী সিংহাসন, বিভিন্ন মূর্তি ও শিল্প নিদর্শনগুলি রক্ষিত আছে। নিপুণ শিল্পীর হাতে তৈরী শিল্প নিদর্শনগুলি যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে। এইগুলি সমস্তই রামনগরের শিল্পীদের সৃষ্টি।

এলাহাবাদে ভরদ্বাজ মুনির মন্দির
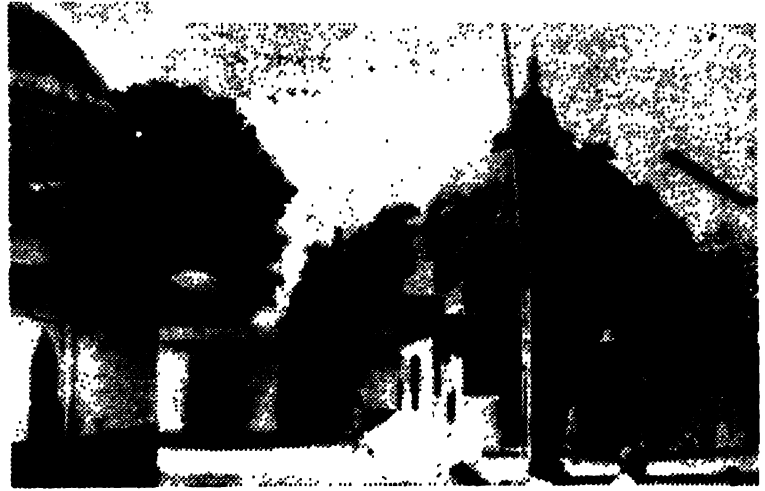
একটু এগিয়েই অলিন্দের সামনে একটি বিশাল ঘড়ি দেখলাম। ঘড়িটির নাম ধর্ম ঘড়ি। বি, মূলচাঁদ নামে রামনগরেরই একজন নাগরিক এই ঘড়িটি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তৈরী করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র একবার বি, মণিলাল এই ঘড়িটি মেরামত করেন। ঘড়িটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ডের সঙ্গে বার, তারিখ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, চন্দ্রের অবস্থান, গ্রহণ, প্রতিদিনের রাশি পরিবর্তন সমস্ত কিছুই জানা যায়। অর্থাৎ ঘড়ির সঙ্গে এটিকে একটি চলন্ত পাঁজিকাও বলা যেতে পারে।

এর পর রাজদরবারে প্রবেশ করলাম। কার্পেট বিছানো বিরাট হল ঘর। মাঝখানে সিংহাসন। উপরে দেওয়ালে সাজানো বিভিন্ন রাজার তৈলচিত্র। সমস্ত ঘরটিতে অদ্ভুত স্তব্ধতা। বাইরের ঘরে টেবিল চেয়ার সাজানো। সেখানে এক ভদ্রমহিলাকে বসা দেখলাম। শুনলাম উনি রাজপুত্রের শিক্ষয়িত্রী। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই কর্মচারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, রাজা ভবতী নারায়ণ সিং প্রবেশ করলেন। কিন্তু রাজবেশে নয়, ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে। রাজার মুখে গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। রাজদর্শন লাভ করে ফিরে এলাম বাইরে। এখান থেকে গঙ্গার দিকে গেলাম। গঙ্গার তীর থেকে দুর্গটি খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তারপর একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম। দেখি কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক দোকানে বসে আছেন। ও'দের সঙ্গে আলাপ করলাম। শুনলাম ও'রা নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলেন, পথে কাশী ও রামনগর দেখে আজই কলকাতায় যাত্রা করবেন। একটু পরেই ও'রা চলে গেলেন, আমরাও বাস রাস্তার দিকে হাঁটতে সুরু করলাম। ইজরাইল বললেন, নারায়ণপুরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একটু দেখা করার দরকার ছিল। কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেল, অন্যদিন যাওয়া যাবে। আমি বললাম, তা কেন? বেশীদূর কখন নয়, চলুন ঘুরেই আসি। আমারও জায়গাটা দেখা হয়ে যাবে। দেখলাম ও'র মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আপনার অসুবিধা না হলে যাওয়া যায়।

রামনগর থেকে বাসে চড়ে নারায়ণপুর চললাম, আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে গেলাম। বাস রাস্তা থেকে নেমে কতগুলো পোড়ো বাড়ী ও পুকুর ঘাট ছাড়িয়ে একটা বাড়ীতে এলাম। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পর ইজরাইল বললেন চলুন যাওয়া যাক। ওখান থেকে বাসস্টাণ্ডে ফিরে এলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও বাস পেলাম না। এদিকে পেটের মধ্যে জ্বালা ধরেছে। শেষে ইজরাইলের জানাশোনা একটা লরী পাওয়া গেল, সেই লরীতেই মোগলসরাই ফিরলাম। তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। অবসন্ন শরীরে, ক্ষিধেয় অস্থির হয়ে একটা হোটেলে ঢুকলাম। ইজরাইলকেও অনুরোধ করলাম। উনি বললেন, এখানে খেলে বাড়ীর খাবার নষ্ট হবে। তারপর চলে গেলেন। এত বেলায় ভাত খাওয়া ঠিক হবে না, রুটি ও মাংস নিলাম। খাওয়া শেষ হলে সোজা আস্তানায় এসে জুতোটা খুলেই শুয়ে পড়লাম খাটিয়ায়।

পরদিন যথাসময়ে এলার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল। উঠেই আমি তৈরী হতে থাকলাম। পাঁচটার মধ্যেই অমলবাবু এসে বাইরে থেকেই ডাকতে সুরু করেছেন। বাইরের দরজা খুলে দিয়ে বললাম, চিন্তার কারণ নেই, আমি প্রস্তুত। একটু পরেই আমরা দুজনে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম। স্টেশনে এসে এলাহাবাদের টিকিট কেটে ভিতরে গেলাম। খুব ঠান্ডা পড়েছে। প্ল্যাটফরম-এ একটা স্টলে বসে আমরা কফি পান করলাম। একটু পরেই ট্রেন এল, দুজনে উঠে পড়লাম। যেতে যেতে চুনার দুর্গটি পাহাড়ের উপর দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়শ্রেণী দেখা গেল। কাছে আসতেই চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পেলাম। জঙ্গলে পরিবৃত পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃতিদেবী যেন ধ্যানে মগ্ন। চারিদিকে

নির্জন ও শান্ত পরিবেশ। পাহাড়ের কোলে মুনি-ঋষিদের আশ্রম। সাধনভজনের উপযুক্ত স্থানই বটে।

ট্রেন এগিয়ে চলল। আমরা দুজনে গল্প করছি, একসময় হঠাৎ অমলবাবু লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, উঠুন আমরা এসে গেছি। দেখলাম, সত্যিই ট্রেন এলাহাবাদ স্টেশনে ঢুকছে। ট্রেন থেকে নেমে দেখলাম স্টেশনটি খুবই সুন্দর আর পরিষ্কার।

প্রথমেই গেলাম পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাড়ী আনন্দভবনে। চমৎকার বাড়ী। চারিদিকে সাজান বাগান। বাড়ীটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারত সরকারকে দান করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু স্মৃতি এই বাড়ীটির সংগে বিজড়িত হয়ে আছে। আনন্দভবনের বিভিন্ন ঘরগুলি দেখলাম। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, হাতে লেখা চিঠিপত্র ও বই বিভিন্ন ঘরে সাজান রয়েছে। একটি ঘর দেখলাম, গান্ধীজী আনন্দভবনে গেলে ঐই ঘরে থাকতেন। পাশেই আর একটি ঘরে কংগ্রেসের উচ্চতর পরিষদের গোপন বৈঠক হত। এক তলায় বারান্দার একধারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যে স্থানে বিবাহ হয়েছিল, সেই জায়গাটিও দেখলাম।

আনন্দভবন পরিদর্শন করে একটা টাঙ্গা নিয়ে চললাম প্রয়াগের পথে। এলাহাবাদের রাস্তাগুলি কিন্তু বেশ চওড়া আর পরিষ্কার। প্রয়াগ থেকে মাইলখানেক দূরে কয়েকজন মাঝি আমাদের পেছনে ছুটল। ওদের নৌকায় চড়বার জন্য বলল। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাড়া কত? সে এগারো টাকা চাইল। বললাম থাক, এখন তোমরা এসো। নৌকায় আমাদের কাজ নেই। কয়েকজন পিছিয়ে গেল, কিন্তু একজন কিছুতেই ছাড়বে না। সমানে দৌড়াচ্ছে। আমরাও জিদ ধরলাম নৌকায় উঠব না। মাঝিটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বোধহয় নেশা করেছিল। শেষে পুলিশের ভয় দেখাতে সরে পড়ল।

প্রয়াগে এসে গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থলটি দেখলাম। গঙ্গা ও যমুনা দুদিক থেকে এসে এখানে মিলিত হয়েছে। এই স্থানটি হিন্দুদের কাছে পরম তীর্থস্থান।

এখানে কুম্ভমেলার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কনৌজের ধর্মসভার পরে প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার এই মিলনস্থলে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। মেলায় রাজা হর্ষবর্ধন গরিব-দুঃখী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধার্মিক লোকদের প্রচুর ধনরত্ন দান করতেন।

প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার মিলন স্থলের পাশেই আকবর নির্মিত একটি বিরাট দুর্গ আছে। দুর্গের ভিতরে আমরা প্রবেশ করলাম। দুর্গটির একাংশ সংরক্ষিত। এখানে নাকি কারখানা হয়েছে। এছাড়া সেনাবাহিনীর ক্যাম্পও আছে। এই দুর্গটির ভিতরেও এক জায়গায় কয়েকটি গুপ্ত পথ দেখলাম। সেখানে মোটা মোটা লোহার রডে তৈরী দরজায় তালা লাগানো।

কিছুটা এগিয়ে গিয়েই ভূগর্ভের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ভূগর্ভস্থ ঘরে অনেকগুলি দেবতার মূর্তি দেখলাম। এর নাম আচ্ছবট মন্দির। আর মন্দিরের প্রবেশ পথকে বলা হয় নিকাশমার্গ। হয়তো আকবরের কোনো হিন্দু মহিষীর অনুরোধে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর ভারতীয় ও পারস্য কৃষ্টির সমন্বয়ে যে নতুন ভারতীয় কৃষ্টির বিকাশ সাধন করেছিলেন এই দুর্গটি তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কালের অমোঘ নিয়মে আজ সেই সাম্রাজ্য লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর স্থাপত্য কীর্তি কালজয়ী হয়ে আজও আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করছে। আকবর-নির্মিত দিল্লী ও আগ্রা দুর্গের মতো এলাহাবাদ দুর্গটিও বিখ্যাত হয়ে আছে। এলাহাবাদ দুর্গটির মধ্যেও আকবর ইরানী পারসিক শিল্পরীতিতে সুন্দর সুন্দর সৌধ রচনা করে শিল্পজগতে অমরত্ব লাভ করেছেন।

এলাহাবাদ দুর্গ দেখে ফেরার পথে ভরদ্বাজ মুনির মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি বেশ সুন্দর। প্রাচীনকালে এখানেই নাকি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। তখন আশ্রমের পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যেত। রামচন্দ্র যখন বনবাসে গেলেন তখন সেই আশ্রমে ভরদ্বাজ মুনির সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মন্দির দেখে উপস্থিত হলাম এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব সুন্দর। মন্দির ধরনের বড় বড় বাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর পরিবেশও শান্ত।

ফেরার পথে যমুনা নদী পার হয়ে গেলাম নৈনি বলে একটা জায়গায়। যমুনার নীলজল বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। উঁচু-নীচু পথের দুদিকে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ-পালার জঙ্গল আর ফসলের ক্ষেত। অনেকটা পথ ঘুরলাম তারপর এলাম খসরুবাগে। সুন্দর বাগান, ভিতরে কয়েকটি কবর আছে। এই স্থানটির সংগে বিজড়িত হয়ে আছে মোগলযুগের ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায়।

শেষ জীবনে আকবর, পুত্র সেলিমের (জাহাঙ্গীর) উপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেলিমের পুত্র খসরু ছিলেন তাঁর প্রিয়। রাজা মানসিংহ ও অন্যান্য অভিজাতবর্গও সেলিমের পরিবর্তে খসরুকে সিংহাসনে স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আকবর সেলিমকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সূচনায় খসরু সিংহাসন লাভের জন্য বিদ্রোহী হন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁকে এলাহাবাদের এই স্থানেই নাকি বন্দী করে রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় তিনি ভ্রাতা খুরম (শাহজাহান) কর্তৃক নিহত হন। শিখ-সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জুন খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ওখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

তারপর এখান থেকে গেলাম এলাহাবাদ চকে 'সরাট বাজার'। দোকানগুলিতে খুবই ভীড়। সামনেই দেওয়ালীর উৎসব, তাই সমস্ত জায়গাই আলোর মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উত্তরপ্রদেশে এই দেওয়ালীর উৎসব মহা সমারোহে পালিত হয়। এলাহাবাদ চকে অনেক সময় ঘুরে বেড়িয়ে স্টেশনে ফিরে এলাম। স্টেশনে আলাপ হল এক বাঙালী ভদ্রলোকের সংগে। উনি এই স্টেশনেরই ঘোষক, এলাহাবাদেই জন্ম। বললেন এখানেই বেশ আছি। একটা ছোট্ট বাড়ী করেছি, জীবনটা এইভাবে কেটে গেল। অনেক সময় গল্প করলাম একসংগে কফি পান করার পর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পরদিন ঘুম থেকে অনেক দেরীতে উঠলাম। শংকরকে বললাম, আজ বাড়ী ফিরতে হবে। একটু পরে অমলবাবু ও [illegible] এলেন। ওঁরা বললেন, আজ আপনাকে যেতে দেব না। বললাম, উপায় নেই। দেখলাম ওঁদের মুখ মলিন হল। একদিনে আমাদের মধ্যে কী নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, পরক্ষণে তা উপলব্ধি করলাম। এদিকে এতদিন ঘুরে ঘুরে আমার পকেটে টান পড়েছে, সেই সঙ্গে বাড়ীর টানও।

রাত সাড়ে এগারোটায় আমরা সবাই মিলে স্টেশনে গেলাম। তারপর টিকিট কেটে প্লাটফরমের ভিতরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল, ট্রেনে উঠে বসলাম। তখন ওদের সকলের মুখেই কেমন বিষাদের ছায়া।

(আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়ি তখন খুব জোরে ছুটে চলছিল। দুরন্ত হাওয়া লীলাবতীর চুল, বসন এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কামরায় নীল বাতি জ্বলছে। সেই নীল আলোয় লীলাবতীকে মোমে গড়া পুতুল বলে মনে হচ্ছিল। লীলাবতী আর আমি একই বার্থে বসেছিলাম। রাত গভীর। সহযাত্রী দুজন প্রচণ্ডভাবে ঘুমোচ্ছে। শুধু ওরা ওরাই ঘুমোচ্ছে তাই না। মনে হচ্ছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু আমি আর লীলাবতী জেগে রয়েছি। জেগে পাশাপাশি বসে আছি।

হঠাৎ লীলাবতী কথা বলে উঠল। ওর কথা আমার কানে আসতে লাগল। মনে হল যেন ঢেউ যেন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলেছে, আর মৃদুস্বরে কথা বলছে, 'জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুধু ভাল কথা শুনে এসেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাল কথা মিষ্টি কথা হয়ে কানে আসতে লাগল। সবাই বলতো, খুব সুন্দরী আমি। আরও বয়স বাড়ল। নিজেও বুঝতে শিখলাম আমি সত্যিকারের রূপসী। পুরুষরা আমার দিকে যে দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করল সেই দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝতে শিখলাম। প্রথম প্রথম অস্বস্তি হতো। বিব্রত বোধ করতাম। নিজেকে লুকোতে চাইতাম। তারপর একদিন সে ভাবটা কেটে গেল। খুব স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। আমি যে সবার কামনার বস্তু, সেই কথাটা বুঝতে শিখলাম। আমার গর্ব হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন হল, রাস্তায় যদি কেউ আমার দিকে না তাকাতো, সেই লোকটার ওপর বিরক্ত হতাম। মনে মনে অসভ্য বর্বর বলে তাকে গালাগাল দিতাম।' মনে হল লীলাবতী হাসল। 'তখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। সেবারেই প্রথম পাটনায় এলাম। মা মারা যাবার পর বম্বেতে মাসীর কাছে মানুষ হয়েছি আমি। মাসীরা আমাকে খুব ভালবাসে। আমিও ওদের খুব ভালবাসি। পাটনায় এসেছিলাম বেড়াতে। অনিমেষের সঙ্গে দেখা বাবার অফিসে। সে কথা আপনাকে বলেছি। অনিমেষ আমাকে অপমান করলো। সেদিন সে কথাই মনে হয়েছিলো আমার। ও যে আমার দিকে তাকালো না, আমাকে বিশেষ করে সম্মান দেখালো না, তাকেই আমার অপমান বলে মনে হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করলাম, অনিমেষকে শিক্ষা দেব। কেন যে অনিমেষের ওপর এত রেগে গেলাম জানি না।

ও কিন্তু আমাকে কোন অপমান করতে চায় নি। আমিই একদিন গায়ে পড়ে ওকে অপমান করলাম। অফিসের করিডর দিয়ে অনিমেষ আসছিল। আমি ইচ্ছে করে ওকে ধাক্কা মেরে ওকেই ধমকে উঠলাম, 'দেখে পথ চলতে শেখেন নি।' অনিমেষ কী বললো জানেন। বললো, দেখে পথ চলি বলেই পা পিছলে যায় না। আমি মনে কী যে রেগেছিলাম! মনে হয়েছিল, ওকে মারি, কিম্বা এমন অপমান করি যা ও জীবনে ভুলতে না পারে। শেষ পর্যন্ত এমন হল অনিমেষের কথা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না, ওযে আমাকে দেখেও দেখল না, আমাকে অগ্রাহ্য করলো, হয়ত সেই কারণেই আমি ওর দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলাম। আমি যত ওর দিকে যাবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছি অনিমেষ তত দূরে সরে যাচ্ছে। ঈশ্বর জানেন, অনিমেষ আর কতদূরে সরে যেতে পারে।'

গাড়ি তখন একটা পোলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। গমগম শব্দ লীলাবতীর কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আগেও মনে হয়েছিল, নিস্তব্ধ জগতের মাঝে আমি আর লীলাবতী শুধু জেগে রয়েছি। এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল লীলাবতীও ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র আমিই জেগে রয়েছি। কিন্তু আমারও ঘুমনো দরকার। ঘুম না হোক, এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল, আমি একজন পরিশ্রান্ত মানুষ, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি শুয়ে পড়ুন, রাত শেষ হতে বেশী দেরী নেই। সমস্ত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।'

লীলাবতী উত্তর দিল না। আমি ওপরের বার্থে উঠে গেলাম।

ভেবেছিলাম, মা খুব অবাক হবে। মা একটুও অবাক হল না। শুধু বলল, 'আয়।' বাইরের ঘরে বসে মা মালা জপছিল। বললাম, 'এত বেলায় পুজো করছো।'

মা নীরস গলায় বলল, 'পুজো হয়ে গেছে, মালা জপছি।'

'আগে তো পুজোর আসনে বসেই মালা জপ করতে মা।'

'এখানে জায়গা বাসা ছোট। ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনো করে। ওরা পড়তে বসেছে।'

বললাম, 'তোমার অসুবিধা হচ্ছে, না?'

মা বলল 'অসুবিধা কি। সুখেই তো আছি।' যদিও মা মুখে বলল, সুখে আছি, মাকে দেখে মনে হল মা একটুও সুখে নেই। নিজেকে কীরকম অপরাধী মনে হতে লাগল। মনে হল মার অসুখী হবার কারণ শুধুমাত্র আমিই। মালা কপালে ছুঁইয়ে থলিতে ভরে রাখতে রাখতে মা বলল, 'তোর চা জলখাবার দিতে বলি।'

বললাম 'এখন থাক। তোমাদের খবর বলো সবাই কেমন আছে। বড়মামা মামীমা ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে?'

মা বলল, 'সবাই ভাল আছে। ওষুধ খেয়ে দাদার শরীরটা একটু ভাল হয়েছে। তোকে ওষুধ পাঠাতে লিখেছিলাম। চিঠি পেয়েছিলি?'

'না তো, কবে চিঠি লিখেছিলে?'

'পরশু।'

'চিঠি পেতে মাঝে মাঝে দেরী হয়। সব দিকেই তো বিশৃঙ্খলা।'

'আমরা তো শুনি, এখানেই শুধু গণ্ডগোল। কোলকাতার বাইরে নাকি আবহাওয়া খুব শান্ত।'

তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে বললাম, 'শান্ত হলে কী হবে। মানুষ বড্ড অলস হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। কেউ কাজ করতে চায় না। সবাই ফাঁকি দিতে চায়। কাজে এত অনিচ্ছা থাকলে দেশ চলে কখনও?'

'আরা জুতো নিয়েই শুয়ে পড়লি! নে, ওঠ। হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নে। সমস্ত রাত জেগে জেগে এসেছিস।'

হেসে বললাম, 'রাত জাগবো কেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এলাম। সঙ্গে ম্যানেজারের মেয়ে এল, না হলে থার্ড ক্লাসেই আসতাম। শুধু শুধু গুচ্ছের টাকা খরচা হয়ে গেল।'

মাও হেসে ফেলল, 'তুই এখনও এত হিসেবী আছিস। বড় চাকরি করছিস আজকাল, থার্ড ক্লাশে চড়লে মানায় না। লোকে যা তা বলবে।'

মাকে স্বাভাবিক হতে দেখে ভাল লাগল। বললাম 'এবার ফিরে গিয়ে বাসা ঠিক করবো একটা। তোমাকে নিয়ে যাব। এর মধ্যেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু চাকরির ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা মাইনে বাড়িয়েছে, বলছে এটাই নাকি বিরাট উন্নতি। কিন্তু ক্ষমতা দিচ্ছে না। কী যে হবে বোঝা যাচ্ছে না।'

মা সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল, 'সব হবে। এত অধৈর্য হলে কি চলে। কত বয়স তোর যে এর মধ্যেই কেউকেটা হতে চাস। দাদা তো সেদিন বলছিল, তুই এ বয়সে যা উন্নতি করলি, অনেকের ভাগ্যেই তা ঘটে না।' হঠাৎ মার কী মনে হতেই উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কাল তোর এক বন্ধু এসেছিল, একটা চিঠি রেখে গেছে। দাঁড়া নিয়ে আসি।'

মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মা চলে যেতেই মার কথা ভাবতে বসলাম। মা যেন একটু রোগা হয়েছে। নাকি স্নান করে নি বলে মাকে রুক্ষ দেখাচ্ছে। মা তো আগে সকালে উঠেই স্নান করতো। আজকাল সকালে স্নান করে না কেন? মার কি শরীর খারাপ হয়েছে? একটু ঠাণ্ডা লাগলেই মার জ্বর হতো। মার কি ঠাণ্ডা লাগল আবার?

মা ঘরে ঢুকতেই বললাম 'তোমার কি শরীর খারাপ?'

মা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল 'শরীর খারাপ হতে যাবে কেন?'

'আগে তুমি সকালে উঠে স্নান করতে।'

'ওমা তোর সবদিকে নজর হয়েছে আজকাল। আগে কি করতাম না করতাম সব মনে করে বসে আছিস।' মা এসে আমার পাশে বসল। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল 'তুই অনেক রোগা হয়ে গেছিস।'

'তোমার বাতিক। কই চিঠিটা দাও তো দেখি।'

মা চিঠি দিল। ঘোতনের চিঠি। কতদিন আগেকার ঘোতন। ঘোতন যে হঠাৎ ফিরে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, ভাবতেও পারি নি। ঘোতন লিখেছে, মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে এসেছি। মা মারা গেছে। বড় কষ্ট পেয়েছে জীবনে, মরে গিয়ে বাঁচল মা। দুঃখ সে জন্যে নয়; দুঃখ, মরবার সময় মা নাকি আমার নাম করে খুব কান্নাকাটি করেছিল। যাক, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই, শ্রাদ্ধ চুকে গেছে। চলে যাবার আগে যদি পারিস, দেখা করিস, বলে ঘোতন নীচে একটা ঠিকানা দিয়েছে। মা বলল, 'ওকে তোর ঠিকানা দিতে চেয়েছিলাম বলল, চিঠিটা খামে ভরে আপনারাই পাঠিয়ে দেবেন। ভেবেছিলাম, আজই দুপুরে চিঠি পোস্ট করবো, এর মধ্যে তুই এসে গেলি।' মা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। হঠাৎ ঘোতনের মাকে মনে পড়ে গেল। সেই যে ঘোতনের মা অনেকদিন আগে চীৎকার করে কাঁদছিল, ঘোতন, ঘোতন রে—। এক একজন মানুষ শুধু কাঁদতেই জন্মায়। আমার মাকে বিশেষ কোনদিন কাঁদতে দেখি নি। এমনকি বাবা মারা যাবার পরেও মা কাঁদে নি। যদিও কেঁদে থাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। কান্না দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে এ কথা মা জানে বলেই আমার সামনে কাঁদে না।

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে মা বলল, 'কি লিখেছে রে তোর বন্ধু?'

'ওর মা মারা গেছে। শেষ সময় ঘোতনকে দেখবে দেখবে করে খুব নাকি কান্নাকাটি করেছিল।'

মা যেন শিউরে উঠল, আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল 'হয় তুই আমায় পাটনায় নিয়ে চল, না হয় বদলি হয়ে আবার কোলকাতায় ফিরে আয়। কী হবে এত টাকা পয়সা দিয়ে। তার চেয়ে যেরকম ছিলাম, সে রকমই থাকবো। তবু বাড়িটার দেখাশুনো হবে। তোর বাবার খুব সখের বাড়ি ছিল। কে জানে অযত্নে কী হয়েছে বাড়িটার।'

মাকে অভয় দিয়ে বললাম ক'দিনে কী আবার হবে বাড়ির। তা ছাড়া বলাই ভাল ছেলে ও তো বলেছে, রোজ রাত্রে শোবে, ভালভাবে দেখাশোনা করবে। আমি গিয়ে না হয় দেখে আসবো একদিন। যদি দরকার হয়, বলাইকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আসবো। জঙ্গল টঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে নেবে।'

বড়মামা এসে ঘরে ঢুকলেন। বড়মামার হাতে বাজারের থলি। আমাকে দেখে খুশী হলেন বড়মামা, 'পুজোয় এলি! বেশ বেশ। আমার মন বলছিলো, তুই আসবি। এক এক সময় মনে যা ডাক দেয়, ঠিক ফলে। ওকে চা টা দিয়েছিস বৌদি?'

মা উঠতে উঠতে বলল, 'যত দিতে চাইছি তত না না করছে।'

'না বড়মামা, মা একটুও চা দিতে চায় নি শুধুই গল্প করছে।'

মা রাগের ভান দেখিয়ে বলল, 'দেখছেন দাদা ও কিরকম মিথ্যুক হয়েছে পাটনায় গিয়ে।'

মার কথা বলার ভঙ্গীতে বড়মামা হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লাম। এমন প্রাণখোলা হাসি কতদিন হাসতে পারি নি।

চা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। মা বলল, 'আবার কোথায় চললি?'

'একটু ঘুরে আসি। এক্ষুনি ফিরে আসছি।' বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কোথাও যাবার স্থিরতা নিয়ে বেরোই নি। মনে হচ্ছিল, কতদিন পরে কলকাতায় এলাম, রাস্তায় রাস্তায় একটু ঘুরে আসি। রাস্তায় নেমেই মনে হল, ঘোতনের সঙ্গে দেখা করে আসি। চিঠিটা পকেটেই ছিল, ঠিকানা দেখে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লাম।

ট্যাক্সি থেকে নেমে নম্বর মিলিয়ে কলিং বেল টিপতেই একটি ছেলে বেরিয়ে এল। বললাম, 'ঘোতন আছে?'

'ঘোতন কে?' ছেলেটি পাল্টা প্রশ্ন করল।

মুস্কিলে পড়লাম। ঘোতনের ভাল নাম আমার মনে নেই। ওকে চিরদিন ঘোতন বলেই জানি। বললাম, 'যার মা কিছুদিন হল মারা গেছেন।'

'ও, দেবেশদা। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।' বলে ছেলেটি ভেতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পর ও আবার এসে ঘরে ঢুকল। পেছন পেছন ঘোতন। ঘোতন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ঘোতনকে দেখে আমি তো হতবাক। ঘোতনের পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক; কী সুন্দর হয়েছে ঘোতন। আগেও ফর্সা ছিল। কিন্তু অসম্ভব রোগা থাকায় রং খুলতো না। এখন ঘোতনকে পাক্কা সাহেবের মত দেখাচ্ছিল।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঘোতন হেসে ফেলল। বলল, 'অবাক হয়ে কী দেখছিস। ভাবছিস হিন্দুধর্ম ছেড়ে অন্য কোন ধর্ম নিয়েছি কিনা। না, সেরকম কিছু না। এদেশে এসে পৌঁছতে পৌঁছতেই তেরো দিন কেটে গেল। কালীঘাটে গিয়ে শ্রাদ্ধ করে এলাম। কিন্তু চুলটুল আর কামালাম না। কী হবে শুধু শুধু ন্যাড়া হয়ে। মা বেঁচে থাকতেই তো মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম, আর কী হবে।' বলে ঘোতন হাসতে লাগল।

আমার দৃষ্টির ঘোর তখনও কাটে নি। বললাম, 'বাইরে কোথায় থাকিস?'

ঘোতন খুব কায়দা করে বলল, 'স্টেটস-এ। স্টেটস মানে বুঝিস তো। আমেরিকা। আমি এখন সেখানকার সিটিজেন। সাবধানে কথা বলিস আমার সঙ্গে।' বলে ঘোতন সমানে হাসতে লাগল।

বললাম, 'কি করিস?'

'চাকরি। কিন্তু সে সব দেশে চাকরি মানে চাকর না। বস আর নীচের কর্মচারী সবাই এক। সবাইকে সবাই নাম ধরে ডাকে।'

'কবে ফিরবি?'

'ভেবেছি, একেবারে বিয়ে করেই ফিরবো।'

আঁৎকে উঠলাম, 'সে কী, এক বছর পর্যন্ত তো কাল-অশৌচ।'

ঘোতন হো হো করে হেসে উঠল, 'যে লোক মা মরে যাবার সময় কাছে থাকল

[illegible]

...রল না, মরার পরে এক বছর ধরে একটা ...শাকের চিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াবে। ভয়ানক ...স্যকর, বেজায় গরমিল ব্যাপার।'

ঘোতনকে ভীষণ অস্বাভাবিক বলে ...নে হতে লাগল। বললাম, 'বিয়েটা সেই ...দেশে সেরে ফেললেই পারতিস।'

ঘোতন খুব বুদ্ধিমানের মত মুখ-...ভংগী করে বললে, 'সেটি হচ্ছে না বাবা। ...দেশটা ভালো হলে কী হবে, মানুষগুলো,

[illegible]

ফার্নেস। দাউ দাউ করে জ্বলছে; যা পাচ্ছে জ্বলন্ত জঠরে নিয়ে পড়ছে। বউ হিসেবে বাঙালী মেয়েরাই আইডিয়াল। ঘর সংসারও সামলাবে, খরচাও কম। ওসব দেশে ঝি চাকর রাখা অসম্ভব। অথচ কাজ করতেও আমার ভীষণ আলস্য। ভাবছি লেখাপড়া জানা কোন মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাব। একটা জুৎসই চাকরি জুটিয়ে নিতে

[illegible] হাজার জুটে যাবে।'

আমার চোখ কপালে [illegible] বললাম, 'পাঁচ সাত হাজার টাকা?'

'ইয়েস মাই বয়, ইয়েস। পাঁচ সাত হাজার টাকা ওখানে কিচ্ছু না। চলে আয় না। তোফা থাকবি।'

'ধুর!'

'ধুর কি, আর না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। তুই শুধু গোটা [illegible]

ভাই করে দিল। একদিন কথা দিতে হবে না। ভেবে দ্যাখ। আমি আরও কিছুদিন আছি।'

'তুই কি কোথাও বেরোবি ঘোতন?'

'ইচ্ছে ছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা আসার কথা আছে। মার নামে কোন আশ্রম টাশ্রমে দান করে দিয়ে যাব।' কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘোতন আবার বলল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর কী।'

বললাম, 'বিকেলের দিকে যাস না আমাদের বাড়ি। চাটা খাবি। তারপর ন'টার শোতে সিনেমায় নিয়ে যাব। বাংলা বই তো দেখিস না অনেকদিন। কতদিন ওখানে আছিস রে?'

ঘোতন হিসেব করে বলল, 'বছর ।'

কোথায় থাকিস।'

'পিট্সবার্গ। ভাবছি নিউঅর্কে চলে আসবো। তুই এলে কিন্তু ভারী মজা হবে' আমার সংসারে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবি। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তুইও একদিন বাঙালী একটা মেয়েকে বউ করে নিয়ে যাবি। দিব্যি আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে খাবি। এখানকার মত ঝুটঝামেলা পোয়াতে হবে না।' বলে ঘোতন বিকট শব্দ করে হাসতে লাগল।

ওকে থামিয়ে দেবার জন্যে বললাম, 'এখানে আমারও কোন ঝুটঝামেলা নেই। হাত পা ছড়িয়ে দিব্যি আরামে থাকি। হুকুম করবার আগেই কাজ হয়ে যায়।'

ঘোতন আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, ঠিক বলেছিস। দেশটা কিন্তু ছিল মন্দ না। যত সব হুজুকে দলগুলো সব নষ্ট করে দিলে মাইরি।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'এই এক্সপ্লয়টেশন তো আর চিরদিন চলতে পারে না। ধীরে ধীরে লোকের চোখ খুলছে।'

ঘোতন খুব হাল্কাভাবে বলল, 'তোরা লোকের চোখ ফোটা বসে বসে। আমার ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আমি এখন আর এখানকার নেটিভ না. দস্তুরমত একজন ইয়াংকি। তোদের প্রবলেমকে আর নিজের প্রবলেম বলে ভাবি না।' খুব কায়দা করে ঘোতন কথাগুলো বলল।

বললাম, 'তুই অনেক পাল্টে গেছিস।'

'দশচক্রে ভগবান ভূত হল মাইরি' ভিক্ষান্ন বন্ন, ঘোতন কোন ছাড়। একদিন বেকার ছিলাম, পরে সন্ন্যেসী হলাম, এখন সাহেব বনেছি, একদিন হয়তো দেখবি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পুনঃ মূষিক ভব। হয় বেকার, না হয় ভবঘুরে সন্ন্যেসী। আসল কথাটা কি জানিস ভোল পাল্টে পাল্টে মাঝে মাঝে নিজেকে দেখতে ভাল লাগে। শুধু যে নিজেকে তা না সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের সবাইকে। এই দ্যাখ না, এ বাড়িটা আমার এক জাঠতুতো বোনের শ্বশুর-বাড়ি। আমার যে কোন বোন ছিল, আগে জানতামই না। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে বোন গজিয়ে উঠল। কী তোয়াজ মাইরি। যেন রাজা ভাই এসেছে। ফাঁকতালে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়ে গেল।' বলে ঘোতন আবার সেই বিকট হাসি শুরু করতে যাচ্ছিল।

ওকে ধমক দিয়ে বললাম, 'তুই এখনও আউট অ্যান্ড আউট কুচুটে বাঙালী রয়ে গেছিস ঘোতন, যেখানে হাত পাতছিস, সেখানেই থুথু ফেলছিস।'

ঘোতন একটুও দমল না। গলা ছেড়ে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'বাঙালী বলে না, সব জাতের দস্তুরই তাই। ওখানে আমার বাড়ির ঠিক পাশেই একটা মাতাল থাকে। লোকটা রোজ আমার কাছ থেকে মদ চেয়ে নেবে, আর নেশা চড়লে আমাকেই ডার্টি নিগার বলে গালাগাল দেবে। একদিন ব্যাটাকে অ্যায়সা ধোলাই দিলাম, যে নাক ফেটে গল গল করে সে কী রক্ত! ওদেশের লোকেদের রক্ত কী লাল মাইরি! আমাদের মত ফিকে ফিকে রং না।'

ঘড়ির দিকে নজর যেতেই লাফিয়ে উঠলাম। বারোটা বাজতে চলল, অথচ নাওয়া খাওয়া হয় নি। ঘোতন বলল, 'কী হলো, তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছিস কেন?'

বললাম, 'নাওয়া খাওয়া হয় নি এখনও।'

'খাই খাই করেই মরলি তোরা।'

বললাম, 'বিকেলে কিন্তু ঠিক যাস। তোর জন্যে অপেক্ষা করবো।'

যাব।' বলে ঘোতন আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, চিৎকার করে ডাকল, ট্যাক্সিতে উঠে বসে ঘোতন আমাকেও ডেকে তুলল, তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'ডালহাউসী। জলদি।'

আমি আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম, হাতের ইসারায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে ঘোতন বলল, 'চেঁচাস নি গাঁক গাঁক করে, আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুই বাড়ি চলে যা।'

ঘোতনের কথা শুনে আমি থ। বললাম, 'বাড়ি মানে?'

ঘোতন গম্ভীর মুখে বলল, 'মানেটা খুব সহজ ভায়া। আমাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ছেড়ে দিয়ে তুই সোজা বাড়ি চলে যা। তোদের ঠিকানাটা দিয়ে যা, বিকেলে যাব। নে, তাড়াতাড়ি কর। এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস, যেন শিশু এইমাত্র ভূমিষ্ঠ হল যে।' বলে ঘোতন আমার চিবুক নেড়ে দিতে দিতে হঠাৎ অট্ট-হাসিতে নুয়ে পড়ল।

আমার বিস্ময় সাপ ধরে গেল, 'তুই আগের মতই ফাজিল আছিস।'

হাসতে হাসতে ঘোতনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনমতে এক ফাঁকে বলল, 'আর তুই ঠিক আগের মত, গাধা—' ঘোতনের হাসি আরও জোরে শুরু হল। ড্রাইভার পর্যন্ত একবার পেছন ফিরে তাকাল। ঘোতনের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানেই হাসতে লাগল। ঘোতনকে দেখতে দেখতে এক সময় আমারও দারুণ হাসি পেয়ে গেল। আমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে হাসতে লাগলাম। রাজভবনের পাশ দিয়ে গাড়ি তখন ডাল-হৌসীর দিকে চলেছে। আর একটু পরেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পৌঁছে যাব। আমার মনে হচ্ছে লাগল, এই মুহূর্তে যদি গাড়ির টায়ার ফেটে যায়, কিম্বা হঠাৎ কোন কারণে গাড়িটা বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। আর এই অবসরে আমিও ঘোতনের সঙ্গে প্রাণভরে হেসে নিতে পারবো। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন কত বছর হাসতে পারি নি। না হেসে হেসে আমার বুকটা কী অসম্ভব ভারী হয়ে গিয়েছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ঘোতন নেমে পড়ল। ঘোতন তখনও একটু একটু হাসছিল। ঘোতন বেশ ফর্সা। হাসতে হাসতে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘোতন আমাকে হাত নেড়ে বলল, 'এখন যাও, গুনে গুনে ভুলের মাশুল দাও গে। আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে ওঠাই তোর ভুল হয়েছিল।' বলে ঘোতন আবার নতুন করে হাসতে লাগল।

বাড়ি ফিরেও হাসির রেশটা রয়ে গেল। মা বলল, 'কী রে, কোথায় গিয়েছিলি? তোদের ম্যানেজারের মেয়েটি বসে থেকে থেকে চলে গেল। কী চমৎকার দেখতে যে মেয়েটি। সুপ্রিয়ার চেয়েও সুন্দরী। তবে সুপ্রিয়ার মত অত অমায়িক না, একটু দেমাকী বলে মনে হল।'

কী রকম সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলাম, 'সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া করছো কেন? ও কি ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করে নাকি?

মা যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আসবে না! মানুষের বাড়ি মানুষ আসে না! মাঝে মাঝে দাদার ছোট ছেলেটার জন্যে এটা-ওটা নিয়েও আসে।'

মার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'তোমরা তা-ই হাত পেতে নাও?'

মা ভীষণ অবাক হয়ে বলল, 'নেবো না? কেউ ভালবেসে কিছু দিলে ফিরিয়ে দেব! তুই কী হয়ে যাচ্ছিস যে দিনকে-দিন!' মা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন সত্যি সত্যি আমি কী হয়ে গেছি।

আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, 'ম্যানেজারের মেয়ে কী বলে গেল।'

মা বিরস মুখে বলল, 'বলল বিকেলে নাকি আবার আসবে, এত করে বসতে বললাম, কিছুতেই বসলো না। অথচ সুপ্রিয়া যেখানে-সেখানে বসে পড়ে। রান্না-ঘরে বউদি রাঁধছে কি তরকারি কুটছে, গিয়ে বসে পড়ল। সেদিন তো জোর করে পাঁচ তরকারি দিয়ে একটা ঘণ্ট রাঁধলো, খেয়ে দাদা কী মুগ্ধ! দাদাও মেয়েটিকে খুব ভালবাসে কিনা।'

বিস্মিত হয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সুপ্রিয়া যে এত ধুরন্ধর জানা ছিল না। ও যে এই পরিবারের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে বিস্তার করে নিয়েছে, এর মধ্যে একটা চাপা স্বার্থের গন্ধ ছাড়া আমি অন্য কোন গন্ধই পেলাম না। আমি যাতে ওর কথার অবাধ্য হতে না পারি, ভৃত্যের মত আজীবন ওর সাথে সাথে চলি, সুপ্রিয়া সেটা পাকাপাকি করে নিতে চায়। আমি চুপ করে আছি দেখে মা মুচকি হেসে বলল, 'বয়স কম হয় নি আমার। চুলও অমনি অমনি পাকে নি। মানুষ

চিনতে [illegible] হয় না আমার। [illegible] আমার [illegible] না। দাদার চোখ তো আর কম পাকা না। খুব ভালো মেয়ে সুপ্রিয়া।'

মনে মনে গর্জে উঠলাম, ছাই ভাল। ওষুধ খেয়ে খেয়ে বড়মামাকে বিলকুল একেবারে শুকিয়ে গেছে, না হলে সুপ্রিয়ার মত মেয়ের গুণেও মুগ্ধ হয় মানুষ।'

মা বলল, 'তুই যে কী নজরে দেখলি মেয়েটাকে! কথায় কথায় ও তো বলেই ফেললো সেদিন, তুই নাকি ওর কথা শুনলেই রেগে যাস, তোর কিছু ভাল করতে গেলেই নাকি তার মধ্যে ওর স্বার্থ খুঁজে বেড়াস। অথচ আমরা তো জানি এ সবের মধ্যে সুপ্রিয়ার কোন স্বার্থ নেই।'

'তোমরা বলতে?' খুব শান্তভাবে মাকে প্রশ্ন করলাম।

মা অবলীলাক্রমে বলল, 'এই আমি দাদা, বৌদি—সবাই।'

মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। মা বলল, 'নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ঢং করতে হবে না। চল, খেতে চল। ভাল কথা, সুপ্রিয়াকে জানিয়েছিস যে, তুই এসেছিস—'

ঘাড় নাড়তেই মা ফেটে পড়ল, 'কী হচ্ছিস যে দিনকে-দিন। ওকে তোর ভাল না লাগে, না লাগুক। কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। এই যে তোর জন্যে এত করছে, মুঠো মুঠো টাকা হাতে পাচ্ছিস কার জন্যে? বল্, কার জন্যে এত সব হচ্ছে? অথচ সামান্য দুটো মিষ্টি কথা তা-ও বলবি না! একটা খবরা-খবর দিবি না! তুই তো আগে এরকম ছিলি না রে'

বলতে বলতে মা আমার একটা হাত চেপে ধরল। শরীরটা কী রকম শির শির করে উঠল। মাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ভীষণ খিদে পেয়েছে মা। চলো, খেতে দেবে।'

বড়মামীমা খেতে দিচ্ছিলেন। মা সামনে বসে ছিল। চুপচাপ করে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ বড়মামীমা প্রশ্ন করলেন 'সকালে যে মেয়েটি এসেছিল, সে কী করে?'

বললাম, 'এম-এ পড়ে।'

বড়মামীমা আর কথা বললেন না।

প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

বড়মামীমা ভাত দিতে দিতে বললেন, 'একটু দেমাকী বলে মনে হল। একটু কেন, বেশ দেমাকী।'

খেতে খেতে বললাম, 'মাও বলছিল।'

বড়মামীমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'মা কেন, সবাই বলবে।'

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বলে ফেললাম, 'ওর বিয়ের ঠিক হয়েছে, তাই কোলকাতায় এল। মার্কেটিং করতে। ওর বাবা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। ম্যানেজার, মুখের ওপর তো না বলতে পারি না।'

মা বলল 'না বলে ভালই করেছিস। ওপরওয়ালার অবাধ্য হলে চাকরির ক্ষতি হয়।'

হেসে ফেললাম। 'তোমার তো চাকরি-বাকরি সম্বন্ধে আজকাল বেশ জ্ঞান হয়েছে।'

বড়মামীমা মার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'শুধু ওর হবে কেন, আমরা সবাই অনেক কিছু শিখে গেছি আজকাল।'

'সুপ্রিয়াই শিখিয়েছে বোধ হয়।' আমার কথার সুরে শ্লেষ ছিল। মা বুঝতে পেরে বলল, হ্যাঁ, ও-ই শিখিয়েছে। শুধু যে শিখিয়েছে, তাই না। কত উপকার করছে আমাদের। দাদাকে কতগুলো অষুধ এনে দিয়ে গেল। দাদা অবিশ্যি নিতে চায় নি। ও কী বললো জানিস। বললো, আপনার যদি একটি মেয়ে থাকতো, এভাবে না করতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত দাদাকে নিতেই হল। গায়ে পড়ে নিজেই বলেছে, ভাপস বি-এ পাশ করলেই তোদের অফিসে ঢুকিয়ে দেবে। আজকাল নিজের আত্মীয়-রাই ফিরে তাকায় না, আর এ তো পরস্য পর।'

মাত্র এক দেড় মাস কোলকাতা ছেড়ে রয়েছি, এর মধ্যেই এ কী বিরাট পরিবর্তন! মাকে লোভী মানুষ বলে কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। হঠাৎ মাকে অন্য রকম ভাবতে হল বলে নিজের ওপরই প্রথমে রাগ ধরল। শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল সুপ্রিয়ার ওপর। সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হলে সুদে আসলে রাগের ঝাল মিটিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু সে সুযোগ আসবে না। কারণ ওকে কোনমতেই ফোন করে জানাতে পারবো না যে আমি কোল-কাতায় এসেছি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সামনের ঘরে এসে শুলাম। মাও এসে আমার পাশে শুল। একথা-সেকথার পর মা আমার বিয়ের কথা পাড়ল। 'দাদা বলছিলো, নিতু আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। সুষমার বয়স হয়েছে,

[illegible] যদি [illegible] বিয়ে না হয়, বিয়ে দিতে বেশ [illegible] অথচ একদিন [illegible] [illegible] কোন মাত্রা হয় না। কী যে [illegible] ভেবে কূল কিনারা পাই না।' [illegible] বলতে এক সময় মা ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে [illegible] লাগলাম, এই কদিনের মধ্যে মা [illegible] বদলে গেছে। মা যে একটা [illegible] মধ্যে রয়েছে, বুঝতে পারলাম। কিন্তু সংশয়টা কী নিয়ে? আমার [illegible] বিয়ে নিয়ে, না শুধুমাত্র আমার [illegible] ব্যাপারেই সংশয়। আমার মনে হতে লাগল, আমি যদি সুষমাকে বিয়ে না-ও করি, তার খুব একটা আপত্তি নেই। যদি সুপ্রিয়া আমার বউ হয়, যদিও জানি সেটা কিছুতেই সম্ভব না; একটা [illegible] ছাড়া যার কোন মূল্যই নেই, [illegible] ধরনের চিন্তা মানুষের মাথায় [illegible] তখনই, যখন সে অতিরিক্ত বেশী [illegible] খেয়ে বিছানায় গড়াতে থাকে। আমার [illegible] হতে লাগল, মা কিম্বা বড়মামা, কিম্বা [illegible] গামী কেউ-ই এই বিয়েতে আপত্তি [illegible] না। বরং সকলেই খুশী হবেন। শুধু খুশী হবেন না, খুব-খুব খুশী হবেন। এবং এই খুশী হওয়ার মূলে [illegible] সুপ্রিয়ার দুরভিসন্ধি এবং কূ-[illegible] রয়েছে, যদিও ভাবতে ভাল লাগছিল না, তবু পারিপার্শ্বিক সংসার [illegible] এই বিষয়ে গভীর সচেতন করে তুলছিল, আর রয়েছে, মধ্যবিত্ত পরিবারের হতাশা, ক্ষোভ, গ্লানি, অনীহা এবং লাভ। দেখতে দেখতে সমস্ত মনে একটা তিক্ত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ঘুমের [illegible]

আমার দিকে পাশ ফিরে শুল। মার একটা হাত এসে আমার বুকে পড়েছে। মার হাতটা অসম্ভব ভারী বলে মনে হতে লাগল। মনে হল, মাকে জাগিয়ে তুলি। বলি, তোমার হাতটা সরাও মা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু সেকথা বলা খুব অন্যায় হবে। মা ভয় পাবে। ভয় পেয়ে নানা কথা ভাববে। ভাববে, বাইরে থেকে থেকে আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। না হলে আমার বুকে হাত রেখে শোয়া মার পক্ষে নতুন না। আগে আমার দম বন্ধ হয় নি কোনদিন।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। আজ দুপুরে ঘুমোতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না, নাক মুখ চোখ গরম হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল নিজের ওপর। আমি যদি দুর্বল না হতাম, অন্তত মাকে একটা বিরাট পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম। সুপ্রিয়ার ব্যাপারে মার দুর্বলতাকে আমি একটা বিরাট পতন বলে মনে করি।

শুয়ে শুয়ে ঠিক সময়ের আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছিল না। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকায় একটা অন্ধকার অন্ধকার মতন ভাব। অথচ উঠে যে ঘড়ি দেখবো, তাও ইচ্ছে করছিল না। মার ঘুম ভেঙে যাবে। হঠাৎ মা ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল ইস্, একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঐ মেয়েটি তো বলে গেছে বিকেলে আসবে। বসাবার মত ঘর তো এই একটিই। কখন না কখন এসে পড়বে। তুই-ও ওঠ ঘরটা পরিষ্কার করে ফেল।'

'ঘর পরিষ্কার করতে হবে না। ওরা জানে যে আমরা গরীব গেরস্থ মানুষ। ঘোতনও আসবে। ও যদিও বাইরে খুব সাহেব-সাহেব ভাব দেখাতে চেষ্টা করছে, ওতো জানে না, আমি ওকে কত ভাল করে চিনি। ও ঠিক আগের মতই আছে। অনর্থক এত হাসতে পারে মনে হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মা ঘোতনের কথা খুব অন্যমনস্কভাবে শুনছিল। মার এটা একটা প্রকান্ড দোষ। নিজেদের মানুষ ছাড়া অপরের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। মা উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। একঝলক রোদ এসে ঘরে ঢুকল। মা বলল, 'রোদটা বেঁকে গেল, এবারে ওঠ, ওরা হয়তো এসে পড়বে।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আসে আসুক। আমি শুয়ে থাকবো।'

মা আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আজকাল সব কথায় এত রাগ করিস কেন রে। আগে তোর মেজাজ কত ভাল ছিল। আজকাল একটুকুতেই বিরক্ত হোস, ধৈর্য হারিয়ে ফেলিস। কী হয়েছে তোর?'

উল্টোদিকে পাশ ফিরে শুতে শুতে বললাম, 'কিছুই হয় নি। শুধু রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বলে ঘুম পাচ্ছে।'

মা কথা বলল না। যেমন মাথায় হাত বুলোচ্ছিল, সে ভাবেই হাত বুলোতে লাগল। মা ই যে শুধু আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে তা না, আমি নিজেও একটা বিরাট পরিবর্তন অনুভব করছিলাম। প্রচন্ড বিদ্রোহ যেন আমার মধ্যে মাথা উঁচু করতে শুরু করেছে। কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানি না। হয়ত জগৎশুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে। কিম্বা বাইরের কারও বিরুদ্ধে না, শুধুমাত্র নিজেরই বিরুদ্ধে। মানুষ যখন পরাজিত হতে থাকে, তখন সে সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হয় নিজের ওপর। কতগুলো গুপ্ত নখ আর হিংস্র দাঁত দিয়ে সে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করতে চায়। আর যত ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হতে থাকে, তত বেশী হিংস্র হয়ে ওঠে সে। তখন সব কিছু ভুলে গিয়ে মরণ খেলায় মেতে ওঠে সেই বিক্ষুব্ধ মানুষ। ধ্বংসের মন্ত্র তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। আমি নিজের মধ্যে সেই বিক্ষুব্ধ মানুষকে আবিষ্কার করলাম। করে শিউরে উঠলাম। নিজেকে এভাবে কোনদিন দেখিনি। দেখবো বলে ভাবি নি।

আমি নিজেকে একজন পরাজিত মানুষ বলে ভাবতে লাগলাম।

কতক্ষণ এভাবে শুয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজায় শব্দ উঠল। মা উঠতে উঠতে বলল 'সেই কখন থেকে বলছি ওঠ, ওরা এসে পড়ল। এখন কী করবি।'

শান্ত গলায় বললাম, 'দরজা খুলে দাও, আমি আর একটু শুয়ে থাকবো।

তোদের ম্যানেজারের মেয়েও তো হতে পারে।'

'হোক তুমি দরজা খুলে দাও।'

দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল ঘোতন। ঘোতনের স্বভাব চীৎকার করে কথা বলা। ও সে ভাবেই বলল 'ইস, ঘরটাকে যে একেবারে অন্ধকূপ করে রেখেছিস রে। আলো থেকে এসে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' মা আলো জ্বালতেই ঘোতন মাকে দেখতে পেল। মাকে প্রণাম করতে গেল ঘোতন। মা সরে গিয়ে বলল, 'থাক সুখে থাকো।' আমি জানি, মা যদি মনে মনে কারও ওপর বিরক্ত হয়, তার প্রণাম নেয় না। মার বিরক্তির কারণ বুঝতে পারলাম। ঘোতন ওর মাকে অবহেলা করছে মা মারা যাবার সময় একমাত্র ছেলে হয়েও কাছে ছিল না, এটা মার কাছে বিরাট একটা অপরাধ।

ঘোতন খাটের এক কোণায় বসে পড়ে বলল, 'তোরা যে কী ঘুমোতে পারিস। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা জাত সাবাড় হয়ে গেল, আর ও দেশের মানুষ না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত এগিয়ে গেল।'

মা নীরস গলায় বলল, 'গরমের দেশের মানুষেরা একটু বেশী ঘুমোয়।'

ঘোতন মার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল, 'আমেরিকার একটা দিক বেশ গরম মাসীমা। সেখানকার লোকেরাও খুব কম ঘুমোয়। দিনের বেলায় ঘুমের কথা ওরা ভাবতেই পারে না।'

'রাত্রে ট্রেনে করে না ঘুমিয়ে এলে, ওদেশ দেশের মানুষও দিনের বেলায় ঘুমোয়।' মা এমনভাবে বলল, যেন ওখানকার মানুষ সম্বন্ধে মার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু কম না।

ঘোতন হঠাৎ খুব শান্ত ছেলের মত হার স্বীকার করে নিল। বলল, 'রাত্রে না ঘুমোলে অবিশ্যি দিনে ঘুমোনোটা অন্যায় না। তুই কি এখন ঘুমোবি? আমি তাহলে আর একদিন আসবো।' বলে ঘোতন উঠতে যাচ্ছিল ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার ওপর। আমার সঙ্গে সঙ্গে মা আর ঘোতনও সেইদিকে তাকাল।

দরজার ওপিঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করছে লীলাবতী।

উঠে দাঁড়িয়ে লীলাবতীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে এনে বসালাম। মা আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুই হাত মুখ ধুয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলি। তা ছাড়া, ঘোতনও রয়েছে।' মা লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল 'ও আমার ছেলের বন্ধু। অনেকদিন ধরে আমেরিকায় রয়েছে। দিন কয়েক হল এসেছে, আবার চলে যাবে।' মা যেন হাতের সামনে ঘোতনকে পেয়ে বেঁচে গল। অথচ কিছুক্ষণ আগে মা ঘোতনের সঙ্গে কীরকম বিশ্রী ব্যবহার করছিল। মনে মনে সংকল্প করে ফেললাম, এবারে পাটনায় গিয়ে আর দেরী না। যত তাড়াতাড়ি হয় বাড়ি ঠিক করে মাকে নিয়ে যাব। এখানে থাকলে মার যে কী দশা হবে কে জানে। যার তার কাছে নিজেকে বড় করতে গিয়ে যে কী ছোট হয়ে যাচ্ছে মা! মার বিচারবুদ্ধি কী করে যে লোপ পেয়ে গেল!

আমি উঠছি না দেখে মা আবার বলল, 'যা তোর মামীকে খবরটা দিয়ে আয়।'

মার দিকে তাকিয়ে বললাম 'মামীমা ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে জাগিয়ে কী হবে। তারচেয়ে আমরা সবাই গল্প করি। তুমি বোস।'

মা শেষ পর্যন্ত আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। হাত দিয়ে এলোমেলো চুল পিছনে সরাতে সরাতে লীলাবতীকে বললাম, 'দুপুরে ঘুমিয়েছিলেন তো?'

লীলাবতী হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'দিনে আমার ঘুম হয় না। বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম, কতক্ষণে রোদ একটু পড়ে আসবে।' লীলাবতী আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

লীলাবতী আজ খুব সেজেছে। [illegible] ওকে এভাবে সাজতে দেখি নি। ঠিক কোনো রাজরাজড়ার ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল। লক্ষ্য করে দেখছিলাম মা আর ঘোতনও খুব ঘন ঘন লীলাবতীর দিকে তাকাচ্ছে। ঘোতন এমনিতে অসম্ভব কথা বলে। ও যেন কথা ভুলে গিয়ে লীলাবতীকেই দেখতে লাগল। বড়মামীমা ঘুম থেকে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে বসলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। বড়মামীমা প্রথমেই অনুযোগ করলেন, তাঁকে ঘুম থেকে না জাগানোর জন্যে। লীলাবতী হাত তুলে নমস্কার করল। ঘোতন প্রণাম করতে যাচ্ছিল বড়মামীমা বাধা দিয়ে বললেন, 'বসো তোমরা। প্রণাম করতে হবে না বাবা, সুখে থাকো। কি নাম তোমার মা?' লীলাবতী নাম বলতে বড়মামীমা বললেন, 'খুব সুন্দর নাম। আমার ছেলেবেলার নাম ছিল লীলা। দাদু এ নামে ডাকতেন। তারপর অবিশ্যি নাম হলো কুসুম। কুসুমকুমারী দেবী।' বলে বড়মামীমা ছেলেমানুষের মত খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বড়মামীমার হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভারী হাওয়াটা হালকা হয়ে গেল।

ঘোতন হঠাৎ বেজায় শব্দ করে হেসে উঠল। ওর হাসিটা বেমানান হলেও ও আবার স্বাভাবিক হতে পেরেছে ভেবে আমার ভাল লাগল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল মাকে নিয়ে। মার চোখে তখনও সন্ত্রাস লুকিয়ে ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পাখিদের চোখে যে আতঙ্ক জেগে ওঠে, মার চোখের মধ্যে আমি তার ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু মার পক্ষে এই ভয় সম্পূর্ণ [illegible]। লীলাবতী বড়লোকের মেয়ে ওর বাবা ম্যানেজার বলে ও তো আর ম্যানেজার না। তা ছাড়া ম্যানেজার মানে তো মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে না। সে সব দিন যে কবে চলে গিয়েছে, মা তার খবর রাখে না। প্রচণ্ড রাগ করলেও ধীরে ধীরে মার ওপর মায়া হতে লাগল। একটা অভাবগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে মা বড় অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী বাস্তববাদী হয়ে উঠেছে। কত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে। অথচ মা কিছুদিন আগেও কত সাহসী ছিল। দমদমের নির্জন বাড়িতে দিনের বেশীর ভাগ সময় শুধু দিন কেন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও, একা একা আসত। এ নিয়ে কোন অভিযোগ তো করেনি মা। যদিও করেছে, আমার দেরী করে ফেরা নিয়ে করেছে। একা একা ভয় লাগে বলে করে নি।

আমি যতক্ষণ এসব কথা ভাবছিলাম, বড়মামীমা ঘোতন আর লীলাবতীর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন। সমস্ত পরিবারের মধ্যে এই মানুষটিকেই আমার খুব স্বাভাবিক আর সবল প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়। মানুষ পারিপার্শ্বিকতার দাস, একথা হয়তো সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকতাই জীবনের সবটা যে না, বড়মামীমা তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দারিদ্র্য নিয়ে হা-হুতাশ কিম্বা অর্থ থাকাটাই যে খুব এক গর্বের বস্তু, এ নিয়ে কথা বলতে বড়মামীকে কোনদিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হাসিমুখে একভাবে সংসার চালিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। কোন অভাব অভিযোগ আজ পর্যন্ত শুনি নি। সেই তুলনায় মাকে খুব অসহায় বলে মনে হতে লাগল। মা যে লীলাবতীর সামনে এইভাবে মুষড়ে পড়ল, আমাকে অযথা হাত মুখ ধুয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করল, এ তো নিজের মনেরই জটিলতার এক নিদর্শন। অবিশ্যি শুধু মা কেন, অনেকেই এ জটিলতার আবর্তে বন্দী। আমি নিজেও হয়ত। নিজের সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম। মা বলা সত্ত্বেও এই যে বসে রইলাম, হাত মুখ ধুয়ে এলাম না, এটাও তো এক ধরনের মনোবিকার। জোর করে মানুষকে অগ্রাহ্য করার এই যে স্পৃহা, এটা তো স্বাভাবিক মানুষের কাজ না। মনে হতেই উঠে দাঁড়ালাম। মা বলল, 'কি রে, উঠলি যে?'

বললাম, 'হাত মুখ ধুয়ে আসি। জামা কাপড়ও ছেড়ে আসবো। ঘোতনের সঙ্গে বেরুবো একটু।'

লীলাবতী উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। 'আমি উঠি আজ।'

বড়মামীমা বললেন, 'তা কি হয় মা। তুমি এলে, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও। আমাদের এটাই রীতি। মানুষ—বিশেষ করে নতুন মানুষ এলে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিতে হয়, যাতে সে মিষ্টি ছাড়া কোনদিন কটু কথা বলতে না পারে। তুমিও বসো বাবা, আমি আসছি।'

বড়মামীমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মামীমার পিছন পিছন আমিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তার আগেই বড়মামার গলা শোনা গেল। বড়মামা খুব খুশী মনে গলা ছেড়ে চীৎকার করছেন, 'খুকী, দেখে যা, কাকে নিয়ে এসেছি।'

মা ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার আগেই ঘরে ঢুকলেন, বড়মামা। পেছনে সুপ্রিয়া। হঠাৎ নিজেকে নিয়ে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লাম। আমার পরনে একটা লুঙ্গি, আর তাও ময়লা। গেঞ্জি। নিজেকে [illegible] মনে হতে লাগল। মা বারবার আমাকে হাত মুখ ধুয়ে আসতে বলেছিল। হাত মুখ ধুতে গেলে [illegible] একটা সার্ট কিম্বা পাঞ্জাবি পরতাম আর ময়লা কাপড়টাও বদলে আসতাম। বড়মামা ঘরে ঢুকেই শব্দ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। উনি যেন বিরাট একটা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরেছেন। ওঁর মুখের ভাব, বসার ভঙ্গি, সেই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। বড়মামার পাশে আর একটা খালি চেয়ার ছিল। সেটাকে নিজের কাছে আরও সরিয়ে এনে বললেন, 'বসো'। সুপ্রিয়া এসে চেয়ারে বসল।

আমি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বড়মামা বললেন, 'কী রে, তুই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন।' ভয় ছিল বড়মামার কথায় ঘোতনটা না আবার ঘর-ফাটানো হাসিতে ভেঙে পড়ে। ঘোতন সে রকম কিছু করল না। ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, ওর চোখে কৌতুক নাচছিল।

ঘরের ভেতর যেতে যেতে বললাম, 'শুয়েছিলাম। হাত মুখ ধুতে যাচ্ছি।'

হঠাৎ বড়মামার লীলাবতী আর ঘোতনের দিকে নজর পড়তেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'এদের তো চিনতে পারছি না।'

'এ ঘোতন আমার বাল্যবন্ধু। আর ইনি লীলাবতী, মিস্টার দেশপাণ্ডের মেয়ে।' বড়মামা এখনও সংশয় নিয়ে তাকিয়ে আছেন দেখে আবার বলতে হল, 'পাটন' রঙের ম্যানেজার।'

লীলাবতী আর ঘোতন একসঙ্গে হাত তুলে নমস্কার করল। উচিত ছিল সুপ্রিয়ার সঙ্গেও ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, কিন্তু যখন কোন সময় মানুষ উচিত কাজ করতে ভুলে যায়। সুপ্রিয়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেয়েও আমার পক্ষে ভেতরে যাওয়ার তাগিদ বেশী ছিল। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে খুব করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ চোখ না ধুলে আমার অস্বস্তি বাড়তে থাকবে। তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আমার মনে হচ্ছিল একটা শান্ত দৃষ্টি আমার পিঠের সঙ্গে লেগে লেগে ভেতর পর্যন্ত চলে এল। একরকম দৌড়েই বাথরুমে ঢুকে গেলাম। কলের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আয়না দেখে হঠাৎ নিজেকে দেখার একটা বাসনা খুব তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু এইসব বাথরুমে আয়না থাকে না। থাকার কথাও না। ক্রমশঃ

আর্ট কলেজ প্রদর্শনী

সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বর্তমান সমালোচক বরাবরই সাম্প্রতিক কালের পশ্চিমবাংলার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের দৈন্যদশার জন্য কলাশিক্ষা পদ্ধতিকে দায়ী না করে থাকতে পারেন নি। কলকাতার গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্টের ছাত্রদের ১৯৭২ সালের বাৎসরিক প্রদর্শনী দেখে আবার মনে হল, আমাদের কলাশিক্ষা ব্যবস্থায় গোড়ায় গলদ রয়েছে।

পুরোন ধরনের কলাশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিল্পী তৈরী করা। কিন্তু বহুকালের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে যে শিল্পী তৈরী করা যায় না, শিল্পী হয়। এই জ্ঞান থেকে জার্মানীর বাউহাউস আন্দোলনের প্রবক্তারা বললেন, কলা শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য হবে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে কারুকুশলী তৈরী করা: যে কারিগররা কারুকৌশল আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শিখবে তাদের মনকে সক্রিয় করতে এবং জ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তৃত করতে। হাতে কলমে শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের এবং মননের ফলকে যিনি মেলাতে পারবেন তিনি শিল্পী হয়ে শিল্পসৃষ্টি করবেন। আর যে অধিকাংশ সংখ্যক শিক্ষার্থী সাযুজ্য সাধনে সক্ষম হবেন না তাঁরা অন্তত ভাল কারিগর হয়ে সমাজকে নিত্য নূতন রুচিসম্মত ভোগ্যপণ্য দিয়ে তৃপ্ত করবেন। কারো শিক্ষা ব্যর্থ হবে না, কোন ব্যয়ই অহেতুক হবে না। পুরোন ধরনের শিল্পীসৃষ্টি মূলক কলাশিক্ষায় সামাজিক ধনের অপচয় ঘটে। শতে একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী হয় কিনা সন্দেহ, অথচ নিরানব্বই জনের শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধন ব্যবহৃত হয়। আর শিক্ষান্তে নব্বই জনের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে লব্ধ শিক্ষার কোন প্রয়োগ ঘটেনা। এমন শিক্ষার প্রয়োজন কি?

যে কলাশিক্ষায় কারিগরির জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্ত করার উপর জোর নেই, যে কলাশিক্ষায় মননের গভীরতা ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর ব্যবস্থা নেই, যে কলাশিক্ষা শুধুমাত্র 'কেমন করে করতে হয়' শেখায়—'কেন করা হয়' শেখায়না, যে কলাশিক্ষা গুরুমুখী ভাষায় অনুকরণ করতে শেখায় সেই কলাশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সত্যকারের মননশীল উদ্ভাবক শিল্পী হওয়া শক্ত। বাউ হাউস প্রবর্তিত নতুন ধরনের কারিগরি শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তা পুরোন ধরনের কারিগরি শিক্ষার মতন শুধু 'কেমন করে করতে হয়' শেখায় না, 'কেন করা হয়'-ও শেখায়। এই 'কেন করা হয়'-এর জ্ঞান থেকেই শিল্পী জন্মায়।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ কলাশিক্ষায়তনেই ঐ পুরোন পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান ঘটে থাকে; ঐ পুরোন পদ্ধতিতেই ছাত্ররা গুরুমুখী ভাষায় "মডার্ণ আর্ট" করে থাকেন। সম্প্রতিকালে বরোদার মহারাজ সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এবং বিশ্বভারতীর কলাভবনে এ পুরোন পদ্ধতির কলাশিক্ষা পরিত্যাগ করে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন কলাবিদ্যা শিক্ষায়তন—কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এখনও কিন্তু রক্ষণশীলের মতন পুরোন শিক্ষা পদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে। তারই প্রকাশ দেখা যায় ঐ কলেজের ছাত্রদের সংবাৎসরিক প্রদর্শনীগুলিতে।

চারু ও কারুকলার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কেউ পরিণত শিল্পকর্ম প্রত্যাশা করেন না। যা করেন তা হল মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা এবং খানিকটা কারিগরী দক্ষতা ও শিল্পের ভাষায় স্বকীয় বক্তব্য পেশ করার প্রচেষ্টা এবং খানিকটা সতেজ সজীবতা। এর কোনটি সম্পর্কে অবহিতি সাধারণ ভাবে এই প্রদর্শনীর প্রদর্শিত কাজগুলিতে দেখা গেল না। তার দায়ভাগ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নয়।

তেলরঙের ছবির বিভাগটি আমাদের হতাশ করেছে। শুধু যে ভাল প্রতিকৃতি বা ভাল নিসর্গচিত্রের অভাবেই বিভাগটি হতাশা-ব্যঞ্জক, তা নয়। বর্ণপ্রলেপন, বর্ণবিন্যাস, রূপাংশ বিন্যাস, বহিরঙ্গগত দৃশ্যবস্তু শৈলীকরণ, উদ্দেশ্যমূলক শৈলীকরণ ইত্যাদি যেসব গুণাগুণের সমাহারে ছবি ছবি হয়ে ওঠে, ভাস্কর্য শিল্প হয়, তার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং দক্ষতা অধিকাংশ কাজে অনুপস্থিত। এর উপর আছে শিক্ষকদের কাজের অযৌক্তিক প্রভাব। অনেক সময় মনে হয় শিক্ষক মশাইরা তাঁদের নিজস্ব রীতিপদ্ধতি ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এরই মধ্যে নীলকমল সিংহ বর্ণপ্রলেপন ও রূপাংশ বিন্যাস, রামলাল ধরের আলো-ছায়ার ব্যবহার ও নকশাসৃজন ক্ষমতা এবং রীতা খামার বিন্যাস জ্ঞান আমাদের আকৃষ্ট করে। জলরঙের কাজ বিভাগটি দুর্বলতর। এ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ দাশের রঙের ব্যবহার, সুচরিত বসুর বিন্যাসক্ষমতা এবং দেবাশীষ বসুর আলোছায়ার ব্যবহার কথঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য।

তুলনায় তথাকথিত ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত কাজের বিভাগটি সমৃদ্ধ। এ বিভাগে বেশ কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন কাজের দেখা পাওয়া গেল। এ বিভাগে তুষারকান্তি দাশ, পার্থসারথী ঘোষ এবং ধর্মপাল তাঁদের কাজে বহিরঙ্গ দৃশ্যবস্তুর শৈলীকরণ, বর্ণপ্রলেপন, বর্ণান্তর সংঘটন এবং বিন্যাসে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বলা বাহুল্য, সব কয়টি কাজই জলরঙে বা জলরঙ টেম্পেরায় করা। এ বিভাগে সবাই দশমহাবিদ্যা দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী কোন একটি শাক্ত-তান্ত্রিক শাস্ত্রের বর্ণনাকে ভিত্তি করে কাজ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, কোন একটি ভাবনার ভিত্তিতে যদি কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা বা ধ্যান থাকে তা'হলে তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের কাজ সহজে স্ফূর্তি পায়।

ভাস্কর্য বিভাগটি দুর্বলতম এবং এ বিভাগে কাজের সংখ্যাও বেশ কম। এ বিভাগে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ দেখা গেল। সেটি বিপন জৈন নির্মিত একটি প্লাণ্টারের প্রতিকৃতি।

ভিত্তিচিত্র বা মুরাল বিভাগটি প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এ বিভাগে বিভিন্ন মাধ্যমে রচিত বেশ কয়েকটি কাজে মাধ্যম মনস্কতা, শৈলীকরণ, বর্ণপ্রলেপন সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতার প্রকাশ ও খানিকটা দক্ষতা দেখা গেল। তবে মোজাইক টাইল সহযোগে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের টালি সংস্থাপনের সঙ্গে রূপাংশের সম্বন্ধ, টালির বিন্যাসের সঙ্গে সমগ্র রচনার ছন্দের সম্পর্কে আরও অনেক বেশী সজাগ হওয়া প্রয়োজন। এই বিভাগের তথা প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ নিখিলেশ দাশগুপ্তের টেম্পেরায় রচিত ভিত্তিচিত্রটি রঙের বিন্যাসে, বর্ণপুঞ্জের ছন্দে স্মরণীয়। তা ছাড়া সিমেণ্ট প্লাণ্টার দিয়ে ভাল কাজ করেছেন সুহৃদ তরফদার, মোজাইক দিয়ে দেবাশীষ ভট্টাচার্য ও জ্যোৎস্না অরোরা এবং টেম্পেরায় সজল দে।

কলকাতার সরকারী কারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক শিল্প বিভাগটি একদা সর্বভারতীয় খ্যাতির শীর্ষে ছিল। আর বুঝি সে পুরাতন খ্যাতিকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সেই লুপ্ত গৌরবকে ফিরে পেতে হলে প্রেসের কাজ, বিশেষ করে বর্ণলিখনের কাজ, আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিস্ফুটনের কাজ ও কোলাজের কাজ শেখানোর দিকে নজর দিতেই হবে। ত্রি-মাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক জ্যামিতি ও নকশা সংগঠনের নিয়মাবলী আয়ত্ত করতে হবে, নতুবা উপায় নাই। কারুকলা বিভাগটির কাজগুলিতে নতুনত্ব কিছুই পরিলক্ষিত হলনা: সবই গতানুগতিক।

—প্রণবরঞ্জন রায়

সাঁকো পার হয়ে গেলে ওপারে সেই মাঠ। মাঠের মাঝে এক মেষপালক জেগে আছে। সঙ্গে তার ভেড়ার পাল। ওরা যেন কেমন ক'রে জানতে পারে! বুঝি ঘাসের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সেই গন্ধ ওরা ঘ্রাণে টের পেয়ে গেলে বাতাস ভাঙতে ভাঙতে ক্রমশ মাঠের পর মাঠ পরিক্রমা ক'রে যায়। পালের গোদা যে-ভেড়া সে থাকে দলের আগে আগে। মাটির ওপর থেকে ঘাস ছিঁড়ে নিতে নিতে এগিয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে আকাশের ওপর মুখ তুলে খোলাবাতাস ঘ্রাণের মধ্যে পেড়ে নেয়। তখন তার গতি লক্ষ্য ক'রে মেষপালক ডাক ছাড়ে

হররর কর   হউউউ   হররর র র

সেই অবলাজীবগুলো এই ডাক কেমন ক'রে যেন চিনে ফেলেছে। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সেদিকে। মালু দিনের বেলায় যখন গাছে-পালায় রোদ খেলাচ্ছিল, মাঠে ঘাটে মানুষজন ছিল সেই আলোয় আলোয় এসব দেখে এসেছে।

কিন্তু এই রাত্তিরবেলা পথে বেরুতে কেমন যেন গা ছম ছম করছে তার। দিনের বেলা মাথার ওপর সূর্যিমামা সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ওদের কোনো ভয়ডর করে না তখন। মামা-গো মামা রাঙামামা-গো—মালু আর আঙুর খেয়াল হলে ছড়া কাটতে কাটতে বলে তোমায় আমি লালশাড়ি কিনে দেবো-গো—। সেই সূর্যিঠাকুর এই রাত্তির-বেলা এখন আর মাথার ওপর নেই। কেমন একটা চাপা ভয় যেন সেই কারণেই চার দিক ছড়িয়ে বসেছে।

মালু ডাকে, আঙুর?

উঁ।

তোর ভয় করছে?

না।

তা হোক। চল্। লোকে বলে তুই রাত্তিরবেলা লোক এমন করে যেতে নেই। তোর ঘাড়ে অপদেবতা কামড়ে দিই। তারপর [illegible] ফিসফিস করে বললো জানিস [illegible]। মেয়ে রাত্তিরবেলা মা-কালী হয়ে যাচ্ছে। তাই।

আঙুর বললো হ্যাঁ জানিস তুই। মা আমায় শিখিয়ে দিয়েছে। মেয়ে [illegible] এলোচুলে [illegible] নেই। দেখ, চুলে আমি গিঁট দিয়েছি।

তবুও মালুর আঙুরের জন্যেই ভারী দুঃখু মনে। আঙুরকে কাছে ডেকে নিয়ে বলে আয় আমার হাত ধরে চ দিকিনি তুই। আঙুর ওর হাতটা ধরে পিছু পিছু হাঁটে।

কেমন অন্ধকার। না?

হুঁ।

ওরা সরু একটা আলের মাথায় উঠে এসেছে। পায়ের তলায় দলে যাচ্ছে কিছু ঘাস।

রাত গভীর হলে কে যে বাঁশী বাজায়? গভীর রাতে অন্ধকার যেন কাউ-কাউ করে। ঘরের বাইরে, পুকুর পাড়ে বনে-মাঠে-আকাশে সর্বত্র সেই সুর ছড়িয়ে থাকে। সেই সুর বড় চেনা মনে হচ্ছিল। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে সেই সুর। বহুদূর। সে যে কতদূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে! মালুর হঠাৎ মনে হলো যেন সেই মেষপালক তেমনি করে ডাক দিয়ে যাচ্ছে—হুরর-র-র-র হুউ-উ-উ-উ—

মালু তার কানের মধ্যে থেকে মেষপালকের সেই ডাকটা পেড়ে এই আলের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা মিলিয়ে নিচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ঠিকই তো। সেই ডাক। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

আঙুরের তখন হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে।

ওমা! কি ভুলো মনরে আমার। তুই গরুড় পেন্নাম করিচিস?

গরুড় গো ঠাকুর—লতাপাতা বা এ আঁধার— গরুড় গো ঠাকুর পেন্নাম পেন্নাম পেন্নাম।—এই বীজমন্ত্রটা ওরা তিন বার উচ্চারণ করল। এসব কাজে আঙুরের ভারি নিষ্ঠা। এতে কোনো ফাঁক নেই তার। তবু মালু যেন আঙুরের নিষ্ঠাকেও টেক্কা দিয়ে গেল।

বললে থাম আঙুর। তোর বুকে একটু আর লাগিয়ে দিই। আঙুর দাঁড়ালে মালু তখন নিজের মুখের লালা আঙুলে করে ওর কপালে বুকে ছুঁইয়ে দিল। আঙুরের এই সময় মনে পড়ছিল মণিপিসীর কথা। মালুটার বুদ্ধি আছে। বড় মানুষের মতন তার মাথা খেলে। ঠিক এমনি করে মুখের লাল লাগিয়ে মণিপিসী সন্ধে রাত্তিরে গা মুছে যায়। আঙুর ভারি অবাক হয়ে গেছিল প্রথমটা। কেন যে অমন করে পিসী? মুখের লাল লাগালে কি হয় মণিপিসী? মণিপিসী বলেছিল রাত্তিরবেলায় বাতাসে ঠাকুর দেবতার নিশ্বাস থাকে। মানুষের গায়ে ঐ বাতাস লাগলে সে বেড়াল হয়ে যায়। সারাক্ষণ মাও মাও করে মরে। মুখের আর লালাতে ঐ খারাপ বাতাস আর গায়ে লাগতে পারে না। তখন বেড়াল হয়েও মরতে হয় না। বুঝলি হতভাগী। মণিপিসী তার নরম গালে আলগোছে ঠোকর দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল দাঁড়া তোর বুকে একটু ছুঁইয়ে দিই।

মালু ঠিক মণিপিসীর মতো করে তার কপালে বুকে আর পরিয়ে দিলে।

আঙুরের কি যে ভাল লাগে এই মালুকে।

এই ছেলের সঙ্গে খেলায় কতো যে মজা! কতো যে কাণ্ড করতে পারে মালু। ওর তো ভয়ডর নেই। আঙুর ওর ভারি ভক্ত বলে, সে ভাবে, মালুর সঙ্গে ও সারাজীবন এমনি করে খেলে-খেলে কাটিয়ে দেবে। বড় হয়ে একসঙ্গে শহরে পড়তে যাবে। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজবে—ওঃ! কি যে মজা হবে! মালুর যদি একটা ঘোড়া থাকত— বেশ হতো। সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে মালু ঠিক ঝড়ের মতন মাঠ-ঘাট ভেঙে ছুটে বেড়াত। সেই ঘোড়ার পাছায় চাপড় মারলেই সে পক্ষিরাজ হয়ে যেত। তখন ভয়ে সিঁটিয়ে মালুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে বসে থাকত সেই পক্ষিরাজের পিঠে।—কেন যে মালুর তেমন একটা ঘোড়া নেই!

আলপথ ছেড়ে ওরা আমবাগানের আরও অন্ধকারে উঠে এলো। আঙুর দেখল আকাশে এবং তার চারপাশে অন্ধকারটা কেমন কাঁপছে। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাক জ্বলছে। নিভছে। যেন এক কালকুট্টি গাছে থোকা থোকা হলুদ হলুদ ফুল ফুটছে। আর সেই ফুল ফুটছে বলেই অন্ধকারটা যেন টিপ-টিপ করে কাঁপছে। বাগানের গাছ থেকে দু একটা পাতা খসে পড়ছে অন্ধকারে। ঝিঁঝি আর কটকটে ব্যাঙ কচি ছেলের মতন কাঁদছে। পায়ের তলায় খসমশ ভাঙছে শুকনো পাতা। আঙুর সেই গাছ আগাছায় ভরা আমবাগানের সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অন্ধকারে কেমন যেন একটা থমথমানি টের পেল। মালুর একটা হাত হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আঙুর বললে আমার ভয় করছে মালু। যদি ধরা পড়ে যাই। যদি ধরে ফেলে আমাদের?

উঁ! ধরলেই হলো কিনা? ধরা দিলে তো।

না ভাই। আমার ভয় করছে।—মালু—?

উঁ।

চ। ঘরে ফিরে যাই।

না। তুই যা। মালু হাতের ওপর থেকে আঙুরের হাতখানা এক ঝটকায় খসিয়ে দিয়ে বলল মরতে তবে এয়েচিস কেন আমার সঙ্গে। কচি খুকী মায়ের কোলে শুয়ে থাকতিস। যেতে হয় তুই একা ফিরে যা।

কথার ধরন শুনে আঙুরের রাগ হলো। আমি বুঝি কচি খুকী মায়ের আঁচল ধরে পড়ে থাকবো। মালুটা এমন গোঁয়ার! সে শুধুমুধু তাকে কষ্ট দেয়। যেমন মুখ চলে মালুর, তেমনি হাতও চলে ওর। রেগে গেলে চণ্ডাল হয়ে যায়। মালু ওর পিঠে কিল মেরে-মেরে এখনি ওকে তক্তা বানাবে বলে আঙুর আর বেশি কিছু বলতে সাহস পেল না। শুধু তার বুজে-আসা ভারি গলায় বললে, আমি বুঝি তাই বলনু?

মালু কিছু উত্তর করল না। সে আম বাগানের আগাছা-মোড়া সরুপথে অন্ধকার কাটতে কাটতে হাঁটছিল। তার দু-চোখে ভাসছে এক মেষপালক। বিরাট একটা ভেড়ার পাল নিয়ে এই মাঠের মধ্যে সর্বদা জেগে আছে যে মেষপালক। যার আজব এক ডাক শুনে মালুর মনে হয়েছে এই রাতের আঁধারে, এই আমবাগানের থমথমে হাওয়ায় কালো কালো গাছে জোনাকির টিপটিপে আলোয় এবং মাটিতে—সর্বত্র সেই মেষপালকের ডাক সারাক্ষণ জেগে রয়েছে। মালুরও বুকের মধ্যেটা কেমন টিপটিপ করছিল। ভেড়ার পালের মধ্যে দুটো কালো কুকুর রয়েছে। কি মন্দ চেহারা তাদের। পালের চারপাশে ঘুরে ঘুরে তারা পাহারা দেয়। মালু দিনের বেলা দেখে এসেছে সেই কুকুরদুটোর লাল টকটকে জিভ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। হাঁ-করা মুখে তাদের বড় বড় দাঁত। কান দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চনমনে চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে। আর সেই দাঁতের ফাঁক দিয়ে মস্ত একখানা লাল-জিভ বার করে হ্যাঁক হ্যাঁক করছে ঠায়।

এসব কথা আঙুরকে এখনো বলেনি মালু। আঙুরটা যা ভীতু!

অবশ্য কুকুরদুটোর জন্য ভয় মালুরও কম নয়। তবে কুকুর বশ করবার মন্ত্র সে শিখে ফেলেছে। সেই মন্ত্র মালু আজ প্যান্টের দু পকেট ভরে নিয়ে এসেছে। মালু জানে। হাজার পা টিপে পা-টিপে গেলেও, সেই ভেড়ার পালের মধ্যে ঢুকতে গেলেই কালো দৈত্যের মতো সেই কুকুর দুটো তাদের দিকে তেড়ে আসবে। আসবেই। তখন মালুও চট করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই মন্ত্র বার করে কুকুর দুটোর সামনে ছড়িয়ে দেবে। কিটু-কাকাদের বাড়ি যে-টাইগার আছে মালু তার ওপর ইতিমধ্যে মন্ত্রটা পরখ করে দেখে নিয়েছে। সে দেখেছে তখন টাইগার সেই মন্ত্রের টুকরোগুলো নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে মুখে তুলছে।

মালু পকেটের ওপর হাত রেখে সেই মন্ত্রের মালুম নিল। দু-পকেট ঠাসা আছে মন্ত্রে। সুতরাং মালুর আর তেমন ভয় করছে না। আর ভয়ই বা কিসের? মালু

তাবে, মেষপালক তো আর ছেলেধরা না। কিন্তু লোকটা যেন কি রকম! মালু দেখেছে, দিনের বেলা সেই গরমের মধ্যেও লোকটা গায়ের ওপর একটা ভুটকম্বল চাপিয়ে রেখেছিল। মুখময় দাড়ি। মাথার ওপর কাপড়ের মস্ত এক পাগড়ি বাঁধা। হাতে পাকা বাঁশের একটা লাঠি। আর লোকটার পায়ে কেমন এক ধরনের হাড়-মড়মড়ে-চিমসে—সে এক ধরনের জুতো। তেমন জুতো মালু কখনও চোখে দেখেনি। আঙুরের বাবার সঙ্গে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে তখন কথা বলছিল লোকটা। মালু সেই লোকটার কথা কিছু বুঝতে পারেনি। কি যে ভাষা লোকটার! সে যে কোন্ উর্দু-ভাষায় কথা বলছে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে! মালু লোকটার মুখের ওপর নজর আটকে রেখেও একবর্ণ বুঝতে পারেনি। সে কেবল দেখেছে, কথা বলবার সময় লোকটার কষ বেয়ে দু-পাশে ফেনা গড়িয়ে নাবছে। কি যে নোংরা লোকটা! যেন সাতজন্মো জল ছোঁয়নি কখনো। মালুর কেমন গা-গুলিয়ে তখন ওক উঠে আসছিল।

মালু সেই সময় আরও তাজ্জব হয়ে দেখেছে, কি আজব কাণ্ড, কাকীমার বয়সী একটা মেয়েমানুষ সে আলের ওপর বসে বসে তামাক টানছে।

মেয়েমানুষ আবার তামাক খায় নাকি! ভারি মজা পেয়েছিল মালু।

সে তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল।

পরে জ্যাঠামশাইকে জিগেস করে মালু জেনেছে, মেয়েমানুষটা মেষপালকের বউ। মালু এই কথাটা বলবার জন্যে চাপা গলায় ডাকলে—আঙুর?

আঙুর ভাবছিল অন্য কথা। সে নতুন নাক বিঁধিয়েছে। নাকের ওপর একটা হলুদ-ছোপানো-সুতো বাঁধা। আর সেই কারণে ছোট্ট একটা গ্যাঁজ বেরিয়েছে নাকে। ভেতর থেকে ঘা-এর রসটা মরে আসছিল বলে জায়গাটা কেমন সুড়সুড় করছিল। আঙুর তাই নাকের ওপরকার সেই হলুদ সুতোটা মাঝে মাঝেই নাড়াচাড়া করছিল। আর ভাবছিল তার মার কথা। সে বড় হয়ে গেছে। মা তাকে কতো গালমন্দ করে। ধিঙ্গি মেয়েমানুষ তোর খেয়াল নেই লা, এখনো আঘে-বাঘে ঘুরে বেড়ানো! ঘরের কুটোটা ভাঙলেও যে আমার উপগার হয়—সেসব চিন্তা আছে মাগীর! করবি—মরবি, আর দুদিন বাদে যখন পরের ঘরে যাবি তখন বুঝবি। ধাঙড়ি হয়ে এই ঘুরে বেড়ানো তখন বেরিয়ে যাবে।

আঙুরের ভারি বয়েই গেছে পরের ঘরে যেতে। তার যেন বড় দায় পড়ে গেছে। পরের ঘরে কোন দুঃখে সে মরতে যাবে! বয়ে গেছে তার। আঙুর মার মুখের ওপর কল্লা দেখিয়ে খিলখিল করে পালিয়ে যায়।

মা বঁটি পেড়ে বসে আনাজ কুটতে কুটতে তখনও সমানে কতো কি যে বলে যায় তাকে! সেসব খবর কি রাখে মালু?

আঙুর, পিসীর ডুরে শাড়িখানা একদিন পরেছিল। শাড়ি পরলে তাকে যে কতো বড় দেখায়! সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে সে বুঝি দেখেনি সেদিন? কতক্ষণ ধরে দেখেছে। অথচ মালুটা যেন কি!

মালু হাত বাড়িয়ে আঙুরের একটা হাত টেনে নেয়,—আঙুর কথা ক?

কি কথা কইবে আঙুর, সে মালুর মুখের ওপর অন্ধকারে শুধু চোখ ভাসিয়ে রাখে।

মালু আর আঙুর তখন খালের বাঁধে উঠে এসেছে। দক্ষিণ থেকে একটা নরম বাতাস টানছে ফুরফুর করে। খালের জলে তারা ফুটে আছে। আর বাঁধের ওপরে সারি সারি খেজুরের বনে, বাবলার ঝোপের ভেতরে অন্ধকার চেপে রয়েছে। এই অন্ধকারটা চোখ সইয়ে নিয়েছে বলে চারপাশটা নজরে আসছে মালুর। মালু বুঝতে পেরেছে আঙুরের এখন কষ্ট রয়েছে বুকের মধ্যে। এসময় গলা কেমন ভারি হয়ে যায়। আঙুর কথা বলতে পারে না। আর খানিক পর আঙুর কেঁদে ফেলবে।

আঙুরটা বড় ভীতু।

মালু বলে এখানে একটু বোস আঙুর।

বাঁধের ওপর ঘাসের চটের মধ্যে ওরা বসে পড়ে।

সামনেই সাঁকো। সাঁকোটা পার হলেই সেই মাঠ। মালু সেই মাঠের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, ঐ যে দেখচিস তেলের একটা কুপি জ্বলছে মাঠে, ঐখানে মেষপালক তাঁবু ফেলেছে। আর বেশি দূর নেই।

মালু আরও একটু সরে আসে আঙুরের কাছে।

জানিস আঙুর, জ্যাঠামশাই যখন মেষপালকের সঙ্গে কথা বলছিল সেইসময় ওকে আমি কোলে তুলে নিয়েছিনু। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কি যে কচি-কচি-গা! এমন নরম! তুই দেখিস আমি ঠিক ওকে খুঁজে বার করব। ঠিক তোকে এনে দেব আমি। ওকে কোলে করলে তোর সব কষ্ট তখন ভাল হয়ে যাবে আঙুর! দেখিস।

আঙুর তবুও কিছুই বলছিল না।

মাঠের মাঝ থেকে আংরার মতো যে কুপির আলোটা তার দিকে তেড়ে আসছিল আঙুর দুহাত দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখছিল। তার ভয় করছিল। খালের জলে ছড়িয়ে রয়েছে ঠাণ্ডা অগণিত তারা। দখনো বাতাসে হালকা হাওয়ার ছোঁয়া। সেই অন্ধকার খেজুরগাছে আর বাবলার ঝোপঝাড়ে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে দেখা যায় না। পায়ে শব্দ হয় না। তারা বাতাসে বাতাসে হাঁটে। ঘুরে বেড়ায়। আঙুরের মনে হলো, তার চারপাশে তেমনি এক বাতাস ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই [illegible] তাকে ঘিরে রয়েছে।

[illegible]

[illegible]

তার সামনেকার ঝোপের অন্ধকারে কালো কালো খেজুরের সারির মধ্যে কারা যেন কামড়াকামড়ি করছে। আঙুর যেন দেখতে পেল ওরা দুজন। ওদের কালো কালো শরীর। মণিপিসীকে সেদিন যেমন দেখেছিল আঙুর সন্ধের আঁধারে। তেমনি কি?

আঙুরকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারে গা ধতে এসেছিল মণিপিসী। বাঁশবনের তলায় অন্ধকারে তাকে চুপ কোরে বসিয়ে রেখে মণিপিসী ঘাটে বসতে যাচ্ছিল। আঙুর বসে বসে দেখেছিল, তাকে একলাটি বসিয়ে রেখে বাঁশবনের জমাট অন্ধকারের ভেতর তার মণিপিসী চলে যাচ্ছে।

সেই বাঁশতলায় আঙুরকে তখন একা পেয়ে অন্ধকার ঝেঁপে এসেছিল। ঝাড়ে ঝাড়ে কটকট করে বাঁতাস ভাঙ্গছিল। হঠাৎ হঠাৎ ঝটপট শব্দ উঠছিল বাঁশবনে। আর কারা যেন শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে শব্দ তুলছিল ক্রমাগত। আঙুরের বুকের মধ্যেটা কেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছিল তখন। মণিপিসী ঘাটে বসবার নাম করে কেন যে অমন অন্ধকারে চলে গেল!

আঙুর আর বসে থাকতে পারছিল না। মণিপিসী যে-পথে গেছে সেই পথে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সেও যাচ্ছিল। আঙুরের মনে হচ্ছিল কে যেন তার গলার স্বর ভেতর থেকে টেনে রেখেছে। সে মণিপিসীকে ডাকতে পারছিল না, মণিপিসী মণিপিসী-গো—। সে কাঁদতে পারছিল না ডাক ছেড়ে। কি যে অবস্থা আঙুরের!

আঙুর সেই অন্ধকারে খানিকটা এগিয়ে গেলে সে দেখেছিল দুটো মানুষকে। কালো কালো শরীর তাদের। বাঁশবনের তলায় মাটির ওপর কামড়াকামড়ি করছে। সেই অন্ধকারের ভেতর সে যেন তার মণিপিসীকে চিনতে পেরেছিল। তবু তার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোয়নি। আঙুর দু-হাতে চোখ চাপা দিয়ে সেইখানে বসে পড়েছিল মাটিতে।

তার কতক্ষণ পরে মণিপিসী বেরিয়ে এসেছিল। আঙুরের মনে নেই। মণিপিসীকে ফিরে পেয়ে যেন বেঁচে গেছিল আঙুর।

কি করছিলে মণিপিসী? আমার কেমন ভয় করছিল। তোমাকে যদি মেরে ফেলতো ও!

আঙুর কেঁদে ফেলেছিল।

পিসী তখন ভাইঝিকে আদরে-চুমোয় ভুলিয়ে দিচ্ছিল। দূর বোকা মেয়ে কাঁদতে নেই। পিসীকে তোর ভূতে ধরেছিল। এ ভূত পোষা ভূত রে। এ ভূত সবাইকে ধরে। তুই যখন বড় হবি—তোকেও ধরবে। তখন তোরও পোষা হয়ে যাবে, দেখিস।

এই খালের বাঁধের ওপর বসে অন্ধকারে খেজুর বনের দিকে তাকিয়ে আঙুরের এখন মনে হচ্ছিল তাকে সেই ভূতে ধরেছে। আঙুর ফিসফিস করে বললে, মালু, দেখ—ঐ যে ঐখানে।

ভাল করে দেখে নিয়ে মালু বললে, ধ্যাট! ওতো গাছের গুঁড়ি রে। মুড়ো খেজুরগাছ দুটো দাঁড়িয়ে আছে।

তবুও চারপাশে সেই ভয়। জোনাক পিটপিট করছে। ঝিঁঝি ডাকছে। আর সব মিলিয়ে রাত গভীরের সেই ডাক—অবিকল সেই মেষপালকের ডাক সর্বত্র যেন জেগে রয়েছে। মালু আঙুরকে বললে, আমরা কালীপুজো করি নে, মা-কালী আমাদের শক্তি দেবে।

কথাটা আঙুরেরও মনে ধরেছে। এই মুহূর্তে সেও যেন ঠিক এই কথাটাকেই খুঁজছিল। আহা! মালু, মালু যে কি ভাল।

অথবা, আঙুরকে তখন সত্যিই ভূতে পেয়েছে।

সে যেন নিজের মধ্যে নিজে আর নেই। চারদিক থমথম করছে—এমন এই রাত্তিরবেলা আঙুর বুঝি অবিকল এক দেবতা হয়ে গেছে। ঠিক শ্মশান-কালীকে যেমন দেখায়। হাত তার ঊর্ধ্বে তোলা। জিভ কাটা। আর বাঁ-পা সামনে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আঙুর।

হে মা-কালী—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো মালুর।

আঙুরের অঙ্গে কোনো বসন নেই!

মালু ভয়ে ভয়ে আঙুরের পায়ের ওপর দৃষ্টি জড়ো করে রাখছিল। আঙুরের সাদা পায়ে কি যে এক-আলো ফুটে রয়েছে। নরম নীলচে সেই আলোয় মালু যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে মা-কালীর গলায়, তার বুকের দু-পাশে ওকি দুই মুণ্ডুমালা গাঁথা রয়েছে!

এতো নরম আলো তবু মালু সেখানে চোখ রাখতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, ওখানে চোখ পড়লে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। তার ভিতর থেকে মা-কালীর মুখের পাশাপাশি আরও কিছু যেন একটা উঠে আসতে চাইছিল। মনে পড়ছিল, সেই যাত্রা-তলার কথা। বিল্টুকাকার বন্ধু পান্তুকাকা সেই যাত্রায় একবার মেয়ে সেজেছিল। তার বুকে কেমন বল বাঁধছিল বিল্টুকাকা। আর—আর—তখন বিল্টুকাকা সেই বলের ওপর মুখ ঘসছিল—

মালুর এখন মনের ইচ্ছে—খুব ইচ্ছে—সে একবার একবারটি এখন বিল্টুকাকা হয়ে যায়। কিন্তু আঙুর! আঙুর যে মা-কালী হয়ে গেছে! তার গায়ের ওপর নীলচে আলো! সেই আলো সে সহ্য করতে পারছে না।

মালুর কেমন অস্বাভাবিক এক নজর। সে যেন সেই সাঁকোর ওপর উঠে এসেছে। এই সাঁকোর ওপর যারা উঠে আসে, তারা যদি মানুষ হয় তাদের সবার দৃষ্টি তখন মালুর মতন হয়ে যায়। মালু সাঁকোয়-ওঠা দৃষ্টি নিয়ে তেমনি পিটপিট করে তাকিয়ে ছিল আঙুরের পায়ের দিকে।

এই সময় মালু একটা কাণ্ড করে ফেলল।

পাশেই পড়েছিল আঙুরের জামা। এলোখাবলায় তুলে নিয়ে জামাটা আঙুরের গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরেছে সে।

আর তখন—ঠিক তখনই পেছন থেকে বাঘের মতন গর্জে উঠেছে এক কুকুর। আচমকা ভয়ে আঙুর তখন সমস্ত শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মালুকে। আর মালু শরীরের মুখোমুখি দেবতার মতন আর এক শরীর শরীরে নিয়ে সেও হঠাৎ কখন যে সেই সাঁকোটা পার হয়ে গেছে। সাঁকোটা পার হলেই মাঠ।

সুতরাং মালু দেখল, সেই মাঠের মধ্যে মেষপালকের বউ। কোমরে কলস। জল ভরতে এসেছিল। সেই মেয়েমানুষটা এক অদ্ভুত চুকচুক শব্দে তার কুকুরটাকে কাছে ডেকে নিচ্ছে।

সেই মাঠের মধ্যে মালু আর আঙুর আর এক অন্ধকারে পথ হাঁটছে তখন। তেলের কুপিটাও কখন নিভে গেছে।

কাকীমার বইসী যে মেয়েমানুষ—কোমরে তার জল-ভরা কলস। সঙ্গে রয়েছে এক ভয়ংকর কালো কুকুর। এই মাঠের মধ্যে দিয়ে এমন অন্ধকারে তারা যে কোথায় চলেছে!

এই মাঠের জগতে নক্ষত্রের মতো ফিনফিনে এক মায়াবী আলো। সোনালী অন্ধকার। সেই আলোয় এবং অন্ধকারে কোনো কিছুই ঠিক চেনা যায় না। কেমন যেন অচেনা লাগে এখানকার সমস্ত শরীর। ভেঁড়া আর ঘোড়া এ রাজ্যে মন-যাই-মতো হয়ে যায়। হয়ে যায় পক্ষিরাজ। এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে মালু আর আঙুর কিসের পিছন পিছন যেন দৌড়চ্ছে। ওরা তাকে ধরবেই।

শুধু এক মেষপালক সেই অন্ধকারে দুটি মানবসন্তানের দৌড় লক্ষ্য করে—আমি নিশ্চিত জানি—সে হাসছে। কিন্তু কিসের হাসি সে। অভিনন্দনের?

না আর কিছুর?

মেষপালকের সেই রহস্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এখনও তা বুঝতে পারিনি।

গৃহিণীর পার্টটাইম কাজ

ইদানিং সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের পাতা ওল্টালেই একটি বিজ্ঞাপন বিশেষ-ভাবে নজর কাড়ে। বিজ্ঞাপনটির হেড লাইন হলো, মহিলাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ। এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, সুযোগটি চাকরি-সংক্রান্ত এবং আর্থিক সমস্যা সমাধানের ইংগিত বহন করছে। আর বাস্তবেও তাই। অনুমানের সংগে বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রায় মিলে যায়। বিজ্ঞাপনটির সারার্থ হলো, জাতীয় সঞ্চয় কমিশনার সম্প্রতি মহিলা নেতৃত্বে আঞ্চলিক সঞ্চয় প্রকল্পের এক নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এবং মহিলাদেরই জন্য। এলাকার গৃহিণীদের সংগে যোগাযোগ করে নিয়মিত এবং সাধ্যমত টাকা জমানোয় তাঁদের উৎসাহিত করাই হবে সঞ্চয় নেত্রীর কাজ। এর ফলে এ কাজে নিযুক্ত প্রতিটি মহিলা নানাদিক থেকে লাভবান হবেন। অবসর সময় কাজে লাগানো যাবে। পাড়াপড়শীর সংগে যোগাযোগ বাড়বে। এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারলে সংসারে আয় যে বাড়বে সে কথা তো বলাই বাহুল্য। আর আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই তো কাজ করতে যাওয়া। তবে উপরি লাভও খুব একটা ফেলনার নয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত বছরের প্রথম দিকে এই পরিকল্পনার উদ্বোধন করেন। আশা করা যায় এটি জনপ্রিয় হবে।

আমাদের দেশে কাজের বড়ো অভাব। মেয়েদের কাজের অভাব আরো বেশি। সেক্ষেত্রে পার্ট টাইম কাজের তো কোন প্রশ্নই আসে না। বিদেশে অবিশ্যি এরকম ব্যবস্থা আছে। তবে সেসব দেশে কাজের কোন অভাব নেই। ইচ্ছেমতো যে কেউ চাকরি ছাড়তে বা ধরতে পারেন। এবং যখন খুশি। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন সুযোগ নেই। চাকরি একবার ছাড়লে আবার পাওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই। নেহাত বরাতজোর না হলে তা সম্ভব নয়। আর যাঁরা চাকরির জন্য হা-পিত্যেশ করছেন তাঁরাই চাকরি পাচ্ছেন না যেখানে সেখানে স্বল্প সময়ের চাকরির কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবাও সম্ভব নয়।

আমরা যে সামাজিক কাঠামোয় বাস করি সেখানে বিয়ের পর অধিকাংশ মেয়েই ঘর-সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। চাকরি করার সুযোগ তাঁরা পান না। আর যাঁরা পেয়েও করেন না তাঁদের সংখ্যা খুবই অল্প। কারণ, আমাদের দেশে এখনো অনেকেই চান যে মেয়েরা ঘর-সংসার নিয়ে থাকুক আর লেখাপড়া শিখলে তা ছেলেপুলে মানুষ করায় সাহায্য করবে। এই সনাতন পদ্ধতি হাজার পরিবর্তনের মধ্যেও নিজেকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। আমাদের মেয়েদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও ঘরকেই টানে। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে চাকরি করছেন বটে তবে তাঁদের অনেকেরই হয়তো এতে অন্তরের সায় নেই। কিন্তু এক একটা সময়ে অলস মুহূর্ত খুব ভারি হয়ে ওঠে। সময় আর কাটতে চায় না। সে সময় টুকটাক একটা কাজ পেলে সময়ও কাটে আর দু' পয়সা সংসারেও আসে। এ কারণেই আমাদের দেশে গৃহিণীদের জন্য পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা থাকা বড়ো দরকার।

সংসারে নানারকম টানাপোড়েন চলে। আর্থিক টানাপোড়েন তার অন্যতম এবং প্রধানতমও বটে। খরচের সংগে পাল্লা দিয়ে আয়ের সামঞ্জস্যবিধান করা যাচ্ছে না। এজন্যও গৃহিণীদের একটা আয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এবং তা সংসার বাঁচিয়ে। সংসারের কাজকর্ম করে যে অবসরটুকু পাওয়া যাবে তা ব্যয় করে স্বচ্ছলতার সুবন্দোবস্ত করতে পারলে সবদিক থেকেই সুবিধা। এই আয় থেকে হয়তো ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচটা উঠে আসবে অথবা বাচ্চার দুধের খরচ। যাই আসুক সেটাই সংসারের পক্ষে এক মস্তো সহায়ক।

নিশ্চুপ গিন্নিপনা করার দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। সংসার চালানোর চিন্তাও করতে হয়। গৃহিণীদের জন্য পার্ট টাইম কাজের বন্দোবস্ত না থাকলেও অনেকে নিজের চেষ্টায় তা করে নিয়েছেন। এবং এজন্য অবসর সময়টুকু হাতে নিয়ে তাঁরা অনেক দূরে যাতায়াত করেন। একাধিক হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার অনেক মেয়েকে অবসর মুহূর্তে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ রেডিমেড জামাকাপড়ের অর্ডার বাড়িতে এনে সেলাই করেন। মোদ্দা কথা, চেষ্টা একটা রাখতে হচ্ছে। সংসারের দু' পয়সা আয় বাড়াতেই হবে। নাহলে আর্থিক টানাপোড়েনে জীবন বিষময় হয়ে যাবে। অধিকাংশ পরিবারেই আজ এই চিন্তা।

মেয়েদের জন্য স্বল্প সময়ের কাজ যে একেবারে নেই তা নয়। কলেজের পড়ুয়া মেয়েদের জন্য একটি কাজ অবশ্য আছে। দুধের ডিপোতে পরিবেশিকার কাজ। প্রতি ডিপোতে এ কাজে মেয়েরা নিযুক্ত আছেন। প্রয়োজনের তুলনায় সুযোগ খুব কম। তাছাড়া এখানে কাজের অসুবিধাও অনেক। ছুটিছাটার বিশেষ সুবিধা নেই। অসুখ-বিসুখে ছুটি নিলে এক ডিপো থেকে আর এক ডিপোতে ডিউটির বদল হয়। তবু এখানে যাঁরা কাজ করার সুযোগ পান

তাঁরা নিজেদের পড়াশোনার খরচ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। প্রাইমারী স্কুলের মর্নিং সেকশনে শিক্ষকতাও এরকমই একটি সুযোগ। তবে প্রয়োজনের তুলনায় সুযোগ তেমন নয়। এই চাকরিতে গৃহিণীদের সুযোগও কিছুটা আছে। অর্থাৎ এই চাকরি করে ঘরসংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন খুব একটা ব্যাহত হয় না। আর যাঁরা সকাল সন্ধ্যা অফিস করেন সংসার করার সাধ তাঁদের অনেকখানি অপূর্ণ থেকে যায়। আর্থিক ভাবনা তাঁদের জীবনের রস শুষে নেয়।

এই আর্থিক ভাবনাই আজকের বড়ো ভাবনা। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এর ফলে প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই ঘরসংসারের কথা আর ছেলেপুলে মানুষ করার দায়দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে এখন চাকরি করতে বেরুতে হচ্ছে। কিন্তু চাকরি করতে হলেও নির্দিষ্ট মানের লেখাপড়া জানা দরকার। স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার সত্ত্বেও গৃহিণীদের লেখাপড়ার মান যে খুব বেশি তা নয়। তা বলে আলাপ-সালাপে মেয়েরা খাটো এমন কথা বলা যায় না। বরং সে ব্যাপারে তাঁরা পুরুষের তুলনায় বেশি দক্ষ। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে, পাশাপাশি দুই বাড়ির কর্তার মধ্যে তেমন জানাশোনা নেই অথচ দুই গিন্নির মধ্যে রীতিমত অন্তরঙ্গতা। এটি মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ। আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে চাকরি করার সম্ভাবনা যে কখনো কখনো আসে হাতে-নাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নতুন পরিকল্পনায়। অবসর মুহূর্তে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আর গাল-গল্পের মাধ্যমে চাকরি করা। ট্রামে-বাসে ছুটোছুটি নেই। বড়োবাবুর চোখ রাঙানি নেই। নিজের ইচ্ছেমতো শুধু গল্প করা এবং প্রতিবেশীদের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা।

এরকম পরিকল্পনা আমাদের দেশে আরো বেশি চালু করা দরকার যাতে গৃহিণীরা সুযোগ পাবেন। একাজের আরো সুবিধা যে, খুব একটা নিজের গণ্ডির বাইরে যেতে হবে না। এলাকা-ভিত্তিক দায়িত্ব। পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে পরিচয় আরো নিবিড় হবে। এখন দিনকাল যা পড়ছে তাতে খুব একটা বেশি লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। দূরের তো নয় বটেই, কাছেরও নয়। এরকম চাকরির দৌলতে অপরিচয়ের বন্ধন যেমন কাটবে তেমনি যোগাযোগ আরো নিবিড় হবে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি পরিকল্পনায় তো আর সকলের সংস্থান সম্ভব নয়। তাই আমরা আশা করবো, এ ধরনের আরো প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হবে।
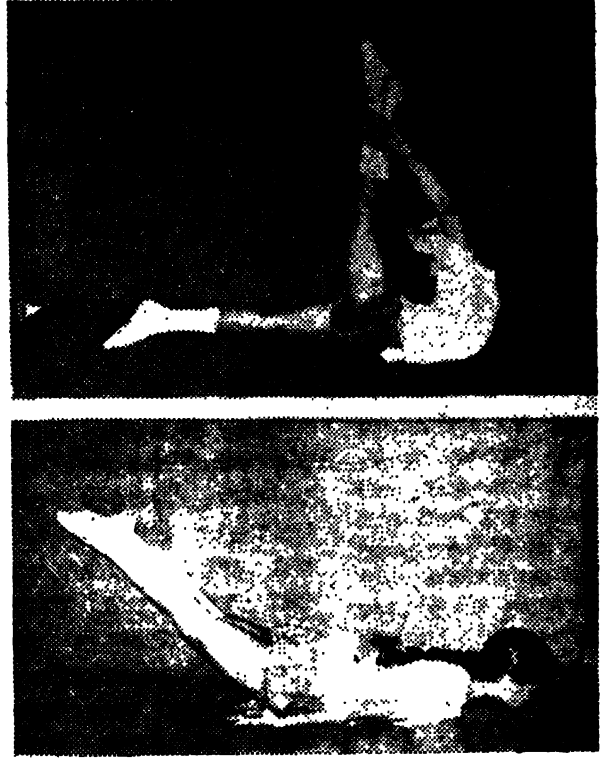
মেয়েদের শরীর গঠনের পক্ষে যোগ-ব্যায়ামের ভূমিকা অসামান্য। অল্প বয়স থেকে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থায় নিরোগ স্বাস্থ্যলাভ সম্ভব।

গৃহিণীদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের সার্বিক কর্মসংস্থানের কথাও মনে রাখতে হবে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী লোক-সভায় জানান যে, চাকরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সব বৈষম্য দূর করা হবে। মেয়েদের পক্ষে এটি পরম আশার কথা। তবে সেই সঙ্গে চাকরির ব্যবস্থাও চাই। এ ব্যাপারেও কিছু কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে মেয়েদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর উদ্বোধন হলো। নদীয়া মহিলা সংঘ এর উদ্যোক্তা। তবে পরবর্তী যে তথ্যটি এখান থেকে জানা গেল তা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সেই তথ্যটি হলো যে, এ ধরনের কর্মসূচীর উদ্বোধন শুধু নদীয়া নয়, পশ্চিমবাংলায় প্রথম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এতোদিন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবু ত্রুটি যে সংশোধন করা হচ্ছে সেটা সুখের কথা।

সংসার মেয়েদের প্রথম কামনা। আর্থিক প্রয়োজনে চাকরিও তাঁরা চান। অধিকাংশ মেয়ের চাকরি হলো সংসারের ন্যূনতম স্বচ্ছলতা বিধান। তার বেশি কিছু নয়। আসল কথা হলো, সংসারের প্রতি যথাকর্তব্য পালন করে চাকরি করা—যাতে কোনদিকেই অবহেলা না প্রকাশ পায়। এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই কর্ম-সংস্থান প্রকল্পে এঁদের আকাঙ্ক্ষা যথোপযুক্ত মর্যাদা পাবে এটাই স্বাভাবিক। নতুন পরিকল্পনায় যেমন তাঁরা সুযোগ পাবেন তেমনি হ্যাণ্ডিক্রাফট সেন্টারগুলিও তাঁদের সেই সুযোগ দিচ্ছে। তবু সুযোগের আরো প্রসার দরকার। আরো বেশি গৃহিণীর কাছে আয়ের এই পথ খুলে দিতে হবে। সংসারের স্বচ্ছলতা বিধানে তাঁদের ভূমিকায় যাতে কোন ত্রুটি না থাকে এবং আর্থিক দুশ্চিন্তায় ডুবে তাঁরা যেন জীবনের মাধুর্যমণ্ডিত দিক বিস্মৃত না হন সেজন্যই এই ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। কারণ, গৃহিণীরা প্রায়ই আক্ষেপ করেন যে, তাঁরা কোন কাজেই এলেন না একমাত্র ঘরকন্না ছাড়া। আজকের আর্থিক টানা-পোড়েনের দিনে এরকম খেদোক্তি খুবই স্বাভাবিক। প্রচণ্ড টানাটানিতেও তাঁরা কোন আর্থিক জোগান দিতে পারছেন না। তারপর কেউ কেউ আরো দুঃখ করেন, লেখাপড়া জানলে চাকরি করে এই অভাবের অবসান করতেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, লেখাপড়া জানলেই আর এখন চাকরি পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের চাকরির সুযোগ অর্থাৎ সংসারের আয় বাড়াবার আরো ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। যা হবে কিনা অবসর সময়ের কাজ। সংসার নির্বিঘ্ন হবে অথচ আয় বাড়বে।

মায়ের কাছে লেখাপড়া

বাসে বসে জনতিনেক মহিলা। তিনজনই নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। স্কুল থেকে বাড়ীর দূরত্ব হয়তো গোটা চারেক স্টপেজ। কিন্তু সেই চারটি স্টপেজ পার হয়ে ছোটদের স্কুলে পৌঁছে দিতে তাঁরা নাজেহাল। তাঁদের বিব্রত ও চিন্তিত আলোচনা থেকে বাস্তব জীবনের বিরাট এক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া গেল। যে সমস্যা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মায়েরাও কমবেশী সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাস যাত্রিনীত্রয়ের একজন পাংশু মুখে বললেন, 'কি যে করি ছেলেটাকে নিয়ে, মোটেই স্কুলে আসতে চায় না।' অন্যজন তৎপর হয়ে বললেন, 'বড় একগুঁয়ে আমার ছেলেটা। স্কুলে আসতে অবশ্য কোন বিরক্তি প্রকাশ করে না, কিন্তু স্নান করাতে, খাওয়াতে আমি হিমশিম।' দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। ওদের কথা শুনে নিজের অসহায়তার কথাটা মুখ ফুটে বলে ফেললেন। 'আমার ছেলে যেমন ডানপিটে, তেমনি গোঁয়ার। ওকে নিয়ে অস্থির হয়ে যাই। সকালে ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আমাকে রান্নার কাজটা কোন রকমে সমাপ্ত করে ঠিক দশটায় অফিসের বাস ধরতে হয়। অথচ ছেলেটা এত জেদি যে কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারছি না। ঘরবার দুটোই করতে হয়, কিন্তু ছেলেটার পেছনে এত সময় দিয়ে চোখে মুখে আমি সরষে ফুল দেখছি।'

বলা বাহুল্য মহিলাত্রয় নিজেদের ছোট ছোট ছেলেদের সামলাতে নাজেহাল তার ওপর রয়েছে ব্যক্তিগত হাজার রকমের কাজ। সুতরাং তাঁদের সমস্যা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। কারণ এক সময় এই দুরন্ত, জেদি সন্তানেরাই জাতির পিতা হয়ে সমাজে বাস করবে।

ওদের নানারকম বিব্রত উক্তি শুনে আমার সেই প্রবাদটা মনে হল 'মাদার ইজ দা বেস্ট টিচার এন্ড হোম ইজ দা বেস্ট স্কুল।' মায়েরাই যদি সন্তান পালনে গলদঘর্ম হন তবে সেই সন্তানদের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া কতটা সম্ভব? প্রবাদটাকে সত্যে রূপায়িত করতে কোন শিশু স্কুল বাদ দিয়ে বাড়ীতেই পড়াশুনা করবে একথা মোটেই বলছি না। জন্ম হতেই কয়েকটা বছর শিশুরা পুরোপুরি বাড়ীর পরিবেশেই বড় হয়। বাড়ীর আনন্দোজ্জল সুন্দর পরিবেশ এবং মায়ের সহৃদয় শিক্ষা শিশুদের মনে যে রেখাপাত করে তা কি কোন শিক্ষক বা স্কুল দিতে পারে? হয়তো সম্ভব নয়, কারণ শিশুরা একটি দিনের অতি অল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু শিশু মাত্রই মায়ের ও বাড়ীর সকলের স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ। সুতরাং—শিশুদের ওপর মায়ের প্রভাব যতটা অন্য কারুর প্রভাব ততটা হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

শিশুদের বাল্যকাল সুন্দর এবং সুষ্ঠু পরিবেশে সুকৌশলে পরিচালনায় অতিবাহিত হলে ভবিষ্যতে সেই শিশু বড় হয়ে একজন আদর্শ মানুষে রূপায়িত হতে পারবে এটাই আমরা আশা করবো। সুতরাং শিশুকে লালন-পালন করার সঙ্গে মায়ের এবং আরও সকলের দায়িত্ব থাকবে শিশু কি করে তাঁদের কথা এবং চিন্তা মত কাজ করে কোন রকম ভুল পথে অগ্রসর না হয়।

পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি নানা কারণে আমরা দিনকে দিন বেশী জটিলতায় পাক খাচ্ছি। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের প্রতি যথাযথ কর্তব্য সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। এরই পরিণতিতে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে। জন্ম হতেই কোন শিশু অত্যধিক একগুঁয়ে বা জেদি হয় না। সে ক্ষেত্রে শিশুটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে সে জেদি হয়ে উঠছে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। শিশুটির কোন অভিযোগ থাকলে দরদের সঙ্গে তা শুনতে হবে এবং পরে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাকে ভালমন্দ বুঝিয়ে বলতে হবে।

উদাসীন পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। শিশুরা কখনই তার পিতা-মাতাকে আপনার বলে ভাবতে পারে না। সেহেতু তারা ঘ্যানঘেনে, অত্যধিক জেদি ও অবাধ্য হয়ে ওঠে। শিশুদের সঙ্গে পিতা-মাতার এমনভাবে মিশতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে যেন তাঁরা শিশুর পক্ষেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা-মাতা নানান কাজে অত্যধিক ব্যস্ত থাকেন। ফলে সন্তানদের দিকে ভাল করে নজর দেবারও ফুরসৎ পান না। অনেক সময় তাঁরা সে সময় তাঁদের সন্তানেরা ঘরের চেয়ে বাইরে কাটাতে বেশী ভালবাসে। বাইরে কাটাবার অভ্যাসটাই কালক্রমে নেশায় পরিণত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই সংসর্গদোষে নানা রকম কুঅভ্যাসের শিকার হয়।

এছাড়া পিতা-মাতারা অনেক সময়ই সন্তানদের আনন্দ বা গোমরা মুখের চেহারার দিকে নজর দিতেই ভুলে যান। কেন সন্তান এত উচ্ছল বা গোমরা মুখো, কেন খুশীতে জামা-কাপড় ধুলোবালি মেখে ময়লা করে রেখেছে অথবা গভীর মনোকষ্টে ক্লাসে পড়া বলতে পারে নি তার কোন কারণ জিজ্ঞাসাবাদ না করে দুমদাম পিঠে, গালে খানকতক হয়তো বসিয়ে দিলেন বাপ-মা। কিন্তু অভিভাবকদের এই অসহিষ্ণুতার পরিণাম হয় বড় ভয়ংকর। শিশুদের ফুর্তি বা মনোবেদনা যাই থাক সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো তার একটা সদুত্তর মিলতো, কিন্তু মারধোর করেই সন্তানদের মুখের রা কেড়ে নিলেন। তারা অতি সাবধানে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা গোপন করতে শিখলো।

সপ্তাহের একটি ছুটির দিন বাবা মায়েরা অনেক সময়েই উপভোগ করতে তৎপর। খেয়াল খুশী মতো সন্তানটিকে কাজের লোক কিংবা আশেপাশের কারুর কাছে রেখে বেরিয়ে পড়েন বেড়াবার উদ্দেশে। এর ফলে শিশুটি মনে মনে অসহায় বোধ করে ও পিতা-মাতার ওপর অসন্তুষ্ট হয়।

চাকুরিজীবী মায়েদের ক্ষেত্রেও অগুন্তি সমস্যা। সব ক্ষেত্রেই প্রায় একটা অভিযোগ শোনা যায় 'ছেলেটা দুষ্ট, একগুঁয়ে, পড়াশুনা করে না ইত্যাদি ইত্যাদি।' চাকুরিজীবী মায়েরা নিজেদের বেরুবার প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করতে এত ব্যস্ত থাকেন যে এরই ফাঁকে কোনও রকমে ছেলেমেয়েদের স্নান, খাওয়া, খুব সম্ভবত স্কুলে পৌঁছে দেবার কাজটাও সেরে নেন। তাঁদের সেই স্বল্প সময়ে সন্তানের দিকে নজর দেবার ফুরসৎ কোথায়?

কিন্তু ছুটির সোনালী দিনটির প্রতিটি মুহূর্ত যদি সন্তানদের আদর ভালবাসার সঙ্গে সকল অভাব অভিযোগ জেনে নিয়ে তা সুবিবেচনার সঙ্গে দূর করতে পারেন তবে বোধহয় একগুঁয়ে আর দুষ্টু ছেলেরা বাড়ীর সকলের একান্ত অনুগত আর প্রিয়পাত্র হতে পারে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

চিত্র-সমালোচনা

রবি ঘোষ ও মিঠু মুখোপাধ্যায় আবদালা মর্জিনা পরিচালনা: দীনেন গুপ্ত।
ফটো: অমৃত

নকল সোনা—

'যা-কিছু চকচক করে, তাই সোনা নয়, এই ইংরিজী প্রবচনটির সত্যতা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্প সম্পর্কে ষোলোর জায়গায় আঠারো আনা খাটে। এবং এই পরম দুঃখদায়ক তথ্যটিকে অত্যন্ত নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত করেছে নবজাত প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'নকল সোনা'। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথমে সহকারী পরিচালক ও পরে পরিচালক রূপে এই শিল্পটির সঙ্গে অন্যূন কুড়ি বছর ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি হৃদয়বানের দৃষ্টি দিয়ে এই শিল্পের প্রতিটি স্তরের কলাকুশলী, কর্মী, অভিনেতা, অভিনেত্রীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরালে যে বেদনাদায়ক, রোদনভরা অন্ধকার রাজ্যটি বিরাজ করছে, তারই কথা তাঁর মরমী কলমের মুখে ব্যক্ত করেছেন 'নকল সোনা'র কাহিনীর মাধ্যমে। নামকরা সৌখীন অভিনেতা ভ্যাবলা ওরফে মদন চট্টোপাধ্যায় স্টুডিওর সুপার বা একস্ট্রার, (খুচরো, চুটকী অভিনেতা) খাতায় নিজের নাম লিখিয়েছিল অরূপ চ্যাটার্জি হিসেবে। তার স্বপ্ন ছিল, সে একদিন হয়ত উত্তমকুমারকে টেক্কা দিয়ে দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। কিন্তু ছবির নায়ক চম্পককুমারের হয়ে দ্বিতীয় থেকে ঝম্পপ্রদান করতে গিয়ে তার বাম হাতটি কনুই থেকে কাটা গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল তার চলচ্চিত্র নায়ক হবার স্বপ্ন। অথচ ভ্যাবলারই সুপারিশে ঢুকে তারই প্রতিবেশিনী লতা শেষ পর্যন্ত প্লেব্যাকআর্টিস্ট হিসেবে বেশ ভালোই নাম করল এবং পেল পয়সা ও প্রতিপত্তি। একেই বলে কপাল! ভ্যাবলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও তার সেই চিরঈপ্সিত রাজ্য—স্টুডিও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিস্ময়-পুলকিত দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে স্টুডিওর চত্বর, ফ্লোর (আভ্যন্তরীণ কৃত্রিম দৃশ্য গ্রহণের স্থান), ক্যামেরাম্যানের নির্দেশে ইলেকট্রিক আলোর সঠিক সংস্থাপন, মেক-আপ বা রূপসজ্জার কক্ষ, রসায়নাগার, সম্পাদনার কক্ষ ও যন্ত্রাদি, দেখে ছবির শ্যুটিং, গানের রেকর্ডিং (নচিকেতা ঘোষ, পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি সঙ্গীত পরিচালকের পরিচালনাধীনে) এবং ওরই ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পায় উত্তমকুমার, সৌমিত্র, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, চিন্ময় রায়, জহর রায়, অপর্ণা সেন প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীকে বিভিন্ন পরিবেশে। এই সঙ্গে দর্শকের সামনে নিউ থিয়েটার্সের অতীত জমজমাট দিনের কিছু স্মৃতিও রোমন্থন করা হয়; শোনানো হয়, বিখ্যাত গোলঘরের ঐতিহ্য, যেখানে সরকার সাহেব (বীরেন্দ্রনাথ সরকার) ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী রূপায়ণ করতেন, যেখানে ও'র সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী। দর্শককে দেখানো হয়, 'মুক্তি' চিত্রের শিল্পীরূপে বড়ুয়া সাহেবকে ও পঙ্কজ মল্লিককে এবং শোনানো হয়, পঙ্কজ মল্লিকের মুখনিঃসৃত গান: 'দিনের শেষে, ঘুমের দেশে, ঘোমটাপরা ঐ ছায়া'। কিন্তু এত গেল চিত্ররাজ্যের উজ্জ্বল দিক। এর অন্ধকারময় বিষণ্ণ দিকটি?—হ্যাঁ, তাও দর্শকের সামনে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে এবং মনে হয়, অত্যন্ত কঠিন রূঢ়ভাবে। চীফ ইলেকট্রিসিয়ান সতীশ মাস্টার (হালদার) বলেছেন, 'এমন দিন গেছে, যখন পয়সার অভাবে সামান্য কেরোসিন তেলের লম্প জ্বালানোও সম্ভব হয়নি।' দেখা যায়, পরিচালক নবীন সেনের আকস্মিক মৃত্যুর পরে তার ছেলেকে ছুটে আসতে হয়েছে স্টুডিওতে—বাপের দাহ-খরচার জন্যে অর্থভিক্ষা করবার জন্য-প্রায়ে। ছোটোখাটো 'এক দু-লাইন' কথা বলার ভূমিকা পাবার আশায় দলে দলে নারী-পুরুষের উমেদারী; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা পরিচালক কলাকুশলীর দল। দেখে দেখে মনে হয়,

আজ যারা হাসছে বেপরোয়া হয়ে, কাল তাদেরই হয়ত কান্নায় ভেঙে পড়তে হবে।" এছাড়া এও মনে হয়, বাংলা চলচ্চিত্র-জগতের অন্ধকারের দিকটা পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত কঠিন বাস্তবভাবে তুলে ধরবার প্রয়াসে তাঁর কাহিনীর চাহিদাকে উপেক্ষা করে তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছেন, অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এই অংশটি দ্বারা তাঁর ছবিকে অযথা ভারাক্রান্ত করেছেন এবং দর্শককে আনন্দ দেবার পরিবর্তে অর মনকে করেছেন পীড়িত। আমাদের ধারণা, তিনি যদি তাঁর কাহিনীর রূপা-য়ণে 'চ্যাপলিয়ান' পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য ঢের ভালোভাবে সিদ্ধ হত।

ছবির নায়ক 'ভ্যাবলা'র ভূমিকায় পিনাকী সেনগুপ্ত ('অপরাজিত'র অপু) বাস্তবধর্মী অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করেছেন। লতার ভূমিকায় কল্যাণী মণ্ডলের অভিনয় খুবই সাব-লীল। সুনীল দাশগুপ্ত (কাহিনীকার জগাই রায়), পারিজাত বসু (অতীন), রথীন বসু (নবীন সেন), সর্বেন্দ্র (চম্পককুমার), কৃষ্ণা বসু (চম্পা), কাজল মজুমদার (সম্বু), অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় (বিক্রম), জগদীশ মণ্ডল (জগন), রূপা চৌধুরী (মিনতি), জহর রায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং স্ব স্ব নামে উত্তমকুমার প্রভৃতি শিল্পী, শ্যামসুন্দর ঘোষ প্রভৃতি কলাকুশলী ছবির সৌষ্ঠব বর্ধনে যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। ছবিতে চারটি গান আছে। তাদের মধ্যে চলচ্চিত্রজগতের চমৎকারিত্বকে বিশ্লেষণ করে 'বাঃ, চমৎকার এই দুনিয়াটা' গানটি গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। ছবির গোড়ার দিকেই হেমন্তকুমার শুনিয়েছেন 'এক-দিনেতেই হইনি আমি তোমাদের এই হেমন্ত'। এবং একটি শ্যুটিংয়ের দৃশ্যে একজোড়া নায়ক-নায়িকা গেয়েছেন : 'উত্তম হিরো হলে সুচিত্রা হিরোইন........ আবার জন্ম লবো—সুচিত্রা সেন হবো, উত্তমকুমার হবো।' বাকী সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়ের কণ্ঠের গানখানি 'কতদূরে—এই পথ আমায় নিয়ে যাবে জানি না' সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে চিত্তস্পর্শী। আবহ-সঙ্গীত রচনায় নচিকেতা ঘোষ অভি-নবত্বের পরিচয় দিয়েছেন নিম্নকণ্ঠে সম-বেত 'আ - আ - আ' সুরগানকে ছবির মর্মকথা রূপে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করে।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরি-চালিত এবং নবজাত প্রোডাকসন্স নিবে-দিত 'নকল সোনা' পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনা জগতের একটি বাস্তব চিত্র-রূপে অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

শাওলী মিত্র/বন্তি ভরা গপ্প। পরিচালনা : ঋত্বিক ঘটক। ফটো : অমৃত

স্টুডিও সংবাদ

ভারত বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হচ্ছে 'পালঙ্ক' রাজেন তরফদারের পরি-চালনায় ও দয়াশঙ্কর সুলতানিয়ার প্রযো-জনায়। নরেন্দ্র মিত্র রচিত একটি কাহিনী অবলম্বনে গঠিত এই ছবিতে থাকছেন সন্ধ্যা রায়, উৎপল দত্ত, আনওয়ার হোসেন, সুপ্রিয়া গুপ্ত, সোফিয়া জামান, ফরিদা আহমেদ অমল দত্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের শিল্পী। আলোকচিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে শৈলজা চট্টো-পাধ্যায়, অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও ফারুক আহ-মেদ (বাংলা দেশ)। ছবির সঙ্গীত পরি-চালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বাংলা-দেশের এফ-ডি-সি স্টুডিও এবং কলকাতা উভয় স্থানেই ছবির শ্যুটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তার ওপর আছে বাংলাদেশের খাল, বিল, [illegible]।

অগ্রদূত পরিচালিত 'সেদিন দুজনে'—চলচ্চিত্র ভারতীর পরবর্তী প্রচেষ্টা অগ্রদূত পরিচালিত 'সেদিন দুজনে' ছবির চিত্রগ্রহণ স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ইতিপূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ছবির তিনদিনের বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুধীন দাশগুপ্তের সুরারোপে ছবির দুখানি গান রেকর্ড করা হয়ে গেছে—গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। সিদ্ধার্থ দত্ত রচিত ও চিত্রনাট্যায়িত ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন—সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও দেবরাজ রায়।

হারানো খুঁজি—পূরবী ফিল্মস-এর প্রথম প্রচেষ্টা সুভাষ চক্রবর্তীর 'অনেক দিনের চেনা' অবলম্বনে 'হারিয়ে খুঁজি'র শুভ সূচনা সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরারোপে ...পাধ্যায় কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, [illegible], [illegible] সেনগুপ্ত, [illegible]।

কুণাল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন—স্বদেশ সরকার।

বিভিন্ন চরিত্রে এপর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাধবী চক্রবর্তী, সোমা দে, অসিতবরণ, শিপ্রা মিত্র, মৃণাল মুখোপাধ্যায় শিবানী বসু এবং নায়ক চরিত্রে নবাগত দীপংকর দের নাম উল্লেখযোগ্য।

'রাতের রজনীগন্ধা'—অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ-আর-সি প্রোডাকসন্সের ছবি 'রাতের রজনীগন্ধা'র চিত্র গ্রহণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। জানা গেল ছবিখানি সম্প্রতি সম্পাদকের টেবিলে গেছে। কাহিনী ঃ ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। চিত্রনাট্য ঃ প্রশান্ত দেব। সুর ঃ সুধীন দাশগুপ্ত। পরিচালনা ঃ অজিত গাঙ্গুলী। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন, আজকের সেরা জুটি উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন, পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার শ্যামল ঘোষাল বঙ্কিম ঘোষ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিতা মুখোপাধ্যায়, অনিতা গুপ্ত, নিভাননী প্রভৃতি।

চিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী। পরিবেশনায় এন-এ ফিল্মস।

শরৎচন্দ্রের 'আলো ও ছায়া' দ্রুত প্রস্তুতি পথে ঃ অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'আলো ও ছায়া' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন এইচ এম ফিল্মস। ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে এই ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে

অনন্ত বিজ্ঞাপ/চিত্রে রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায়।

এগিয়ে চলেছে এবং আশা করা যায় আসচে মাসেই ছবিটি প্রদর্শনের জন্য তৈরী হয়ে যাবে।

ছবিটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হলেন গুরু বাগচী। প্রধান তিনটি চরিত্রে দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী বসু, আশা দেবী, পদ্মা দেবী ও অমরজিৎকে দেখা যাবে।

বিজন পাল ছবিটির সুরকার। মোট ছয়খানি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় মানবেন্দ্র ও মীনা মুখোপাধ্যায়।

'রাণুর প্রথমভাগ' মুক্তি প্রতীক্ষায় ঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর চিত্ররূপ এখন সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তির দিন গুনছে। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বরচিত চিত্রনাট্যের উপর এই ছবিটির পরিচালনা করেছেন। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, রবি ঘোষ, অসীম চক্রবর্তী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। রাণুর ভূমিকায় কুমারী নীরা মল্লিক। ছবিটির সংগীত পরিচালক—নিখিল চট্টোপাধ্যায়। ইপ্সী ফিল্মস পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সলিল চৌধুরীর—'এই ক্ষতুর একদিন'

প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী নিজস্ব পরিচালনাধীনে প্রথম বাঙলা ছবি স্ব-রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বন 'এই ঋতুর একদিন'-এর চিত্রগ্রহণ গত ১৭ জানুয়ারী থেকে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে শুরু করেছেন এবং এ পর্যায়ের শ্যুটিং চলেছে একটানা পাঁচদিন।

শ্রীমতী অঞ্জু গোস্বামী প্রযোজিত অঞ্জু পিকচার্স এন্টারপ্রাইজের পতাকাতলে নির্মিত এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

তাছাড়া গেল ১৬ জানুয়ারী ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর স্কোরিং থিয়েটারে ছবির তিনটি গান শ্রীচৌধুরীর সুরারোপে রেকর্ড করা হয়েছে—গেয়েছেন—মান্না দে ও অনুপ ঘোষাল।

বিবিধ সংবাদ

বার্ষিক উৎসব

আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র সুরগুরু পূজা ও

৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সৌখিন সংগীত-সংস্থা 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র সভ্য-সভ্যারা চট্টগ্রামের অগ্নি-সন্তান বিপ্লবী ও সুর-পাগল সংগীতাচার্য 'সুরেন্দ্রলাল দাসের ঊনবিংশ বার্ষিক স্মৃতি-পূজা ও সংস্থার চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে উপস্থিত দর্শকসাধারণের চিত্ত সংগীতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন বিরল সার্থকতায়।

ঠিক ছটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় সুরগুরুর অভিনব স্মৃতিপূজা দিয়ে। সুরেন্দ্রলাল পরিকল্পিত ও রচিত 'মেজ দশকম' রাগ-বিচিত্রা সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেন সংস্থার চল্লিশজন সদস্য-সদস্যা। সেদিনের অন্যতম আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য অনুষ্ঠান হল 'বাংলার গান'। বাংলার কয়েকটি সংগীত বিশুদ্ধ প্রাচীন ধারাতে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেন সর্বশ্রী বাণী দাশগুপ্ত শ্রীলেখা চক্রবর্তী, রথীন ভট্টাচার্য, বীথি দাশ, সুস্মিতা বসু ও অরুন্ধা মজুমদার। এছাড়া একক কণ্ঠে বাণু মণ্ডল ও শ্যামল দাশগুপ্তের গজল গান, শুভ্রা দত্তের মালকোশ রাগে সেতার,

পাশ্চাত্য সুরে শ্যামল গুপ্ত ও সৌরেন দের গীটার শ্রোতাদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয়। সবশেষে হাসির হিল্লোল বহিয়ে দিলেন সুখ্যাত চিকিৎসক ও হাসির গানের স্বনামধন্য গায়ক ডাঃ সারদা গুপ্ত।

সুরসভার সংগীত সম্মেলন: সুরসভার তিনদিনব্যাপী এক সংগীত সম্মেলন গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সম্পন্ন হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে গৌর বসাক মালকোষ রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি গেয়ে শোনান। অপর শিল্পী কান্তি মৈত্র 'বাগেশ্রী' রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। অমৃতলাল রায় বাঁশিতে ধুন বাজিয়ে শোনান। এঁদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়েছিল। রবীন্দ্র ও অন্যান্য লঘু সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সমরেশ রায় পূর্বা দাস, অনুপ ঘোষাল, রবীন মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত সিংহ বীথি দাস শ্যামলী বসু, স্নিগ্ধা গুহ দীপিত রায়, মণিদীপা শ্যাম, অসীমা ভট্টাচার্য লক্ষ্মী গুপ্ত সর্বাণী শ্যাম, মঞ্জুশ্রী গাঙ্গুলী, সুষমা ঘোষ, সুজাতা সেন শান্তা বসুরায় ও শকুন্তলা বসুরায়। যন্ত্রসংগীতে ও সংগতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, অমৃতলাল রায় চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভোলানাথ সাহা, দুলাল ভট্টাচার্য ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী।

প্রথম কোরীয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে 'সেন্ট্রাল ক্যালকাটা'র উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম কোরীয়ান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জনতা প্রেক্ষাগৃহে। এই উৎসবে উত্তর কোরিয়ার সাতটি কাহিনী-চিত্র 'মেরী স্টেজ' 'ইন অ্যান এনিমি অকুপায়েড টাউন' 'উই হ্যাভ নাথিং টু এনভি ইন দি ওয়ার্ল্ড' 'অ্যামঙ দি ভিলেজার্স', 'এ ওয়াইফস ওয়ার্কিং প্লেস', 'এ মেডেন অফ মাউন্ট কুমগান সান' ও 'এ ফ্লাওয়ার গার্ল' দেখানো হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংগীত: ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ হলে তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসবে উদীচী শিল্প গোষ্ঠী 'রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সংগীত' শীর্ষক গীতি আলেখ্য সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন।
পরিবেশন করেন।

রবীন্দ্রনাথের আগে লোকসংগীত ছিল অবহেলিত। তথাকথিত ভদ্র সমাজে এর প্রচলন ছিল না। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের সঙ্গেই ছিল তার প্রাণের টান। বাউল ভাটিয়ালি, কীর্তন, কথকথা, রামপ্রসাদী সুর গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ছিল আদৃত। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই গানকে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজেও বহু গান রচনা করেন এই সুরে। তারই কয়েকটি গান, বিভিন্ন লোকসংগীতের সুরে রচিত, পরিবেশিত হয় শৈলেশ তড়ের পরিচালনায়। সংগীতাংশে ছিলেন গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা পাল, অনিমা ভড়, ভারতী মৈত্র, তপন সিংহ, তপন ভট্টাচার্য বাদল চট্টোপাধ্যায় সুভাষ দাস ও জ্যোতিব্রত চট্টোপাধ্যায়। গীটারে সহযোগিতা করেন রবীন রায় ও স্বপ্না মাইতি।

ধ্রুপদ সংগীত: গত ১৩ জানুয়ারী সংগীত সম্মিলনীর (৩৬ এ বি প্রতাপাদিত্য রোড) মাসিক অধিবেশনে, কালিশঙ্কর মিত্র, মৃদঙ্গে চৌতাল, লহরা বাজান। পরে বিপ্রদাস নন্দী, সংগীত-তত্ত্ব-বিশারদ, দরবারী রাগে, আলাপ, রাসতালে ধ্রুপদ ধামার ও সুরফাক্তা তালে তারানা পরিবেশন করেন এঁর সঙ্গে মৃদঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংগত করেন প্রতাপনারায়ণ মিত্র। শ্রোতারা গীত ও বাদ্যে যথেষ্ট আনন্দ পায়।

বিচিত্রানুষ্ঠান: অ্যালকরেন স্পোর্টস অ্যাণ্ড কালচারাল ইউনিটের তৃতীয় বার্ষিকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২৭ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫টায় শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। সুনীল মুখার্জির পরিচালনায় ক্লাব সভ্যরা 'অভিনয়' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। তাছাড়া পি অর্ণব পাপিয়া সরকার ও স্নিগ্ধা চৌধুরীর সংগীত এবং যাদুকর এ সি সরকারের ম্যাজিক অন্যতম আকর্ষণ।

সুভাষ সঙ্ঘের পুরস্কার বিতরণী উৎসব

গত সপ্তাহে ব্যারাকপুরের নানা জাফরপুরের বিধান সংগ্রহ শালার সুভাষ

বনগাঁ মহকুমা এস ডি ও অফিসকর্মীদের অভিনীত সম্রাট নাটকের একটি দৃশ্য।
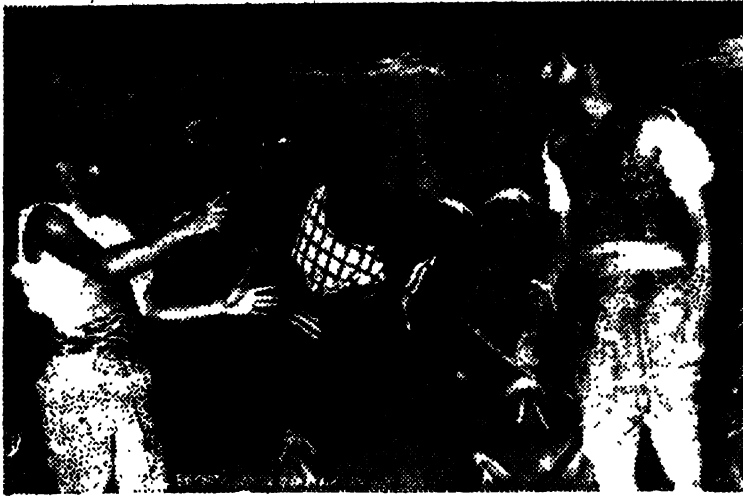
মঞ্চে'র ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শিশিরকুমার একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার গত বছরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন নাট্য-সম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী ও প্রধান অতিথি ডঃ চারু দত্ত। পুরস্কার বিতরণ করেন চিত্র ও মঞ্চ শিল্পী শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য। স্থানীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান শ্রীনাট্যম কর্তৃক গিরিশচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয় শ্রীচিত্ত দত্তের সুষ্ঠু পরিচালনায়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন তরুণ কর্মী শ্রীঅমিতাভ মুখার্জি।

মঞ্চাভিনয়

বনগাঁয় মঞ্চাভিনয় : বনগাঁ মহকুমা শাসক শ্রীশচীন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এবং শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বনগাঁ এস ডি ও অফিসের কর্মীরা নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'জীবন্ত স্ট্যাচু' এবং রতনকুমার ঘোষের 'সম্রাট' নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

নাট্য নির্দেশকের বিচক্ষণতা ও উপস্থাপনার কৌশল এবং দলগত অভিনয় নৈপুণ্য নাটক দুটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। রূপসজ্জা, আলোক সম্পাত ও আবহসংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ নাটক দুটিকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

পরিতোষ ও সুরপ্রিয়ের ভূমিকায় পরিচালক শ্রীচট্টোপাধ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তাছাড়া মিঃ চৌধুরী, বিপিনবাবু, হরিহর, রঘুরাম ডাকু ও পুলকের ভূমিকায় যথাক্রমে শচীন সেন, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী, জীবন মজুমদার, সনৎ মণ্ডল, ও আর্য চ্যাটার্জির প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের মনে গভীর ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। নাটক দুটির অন্যান্য চরিত্র রূপায়ণে রেবতীরমণ দাস, জয়গোপাল পালিত ও তারাপদ ভট্টাচার্য-এর সংযত ও সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। স্ত্রী চরিত্রে মায়া মৈত্র ও গীতা দে প্রশংসার দাবী রাখেন। ব্যবস্থাপনায় সংস্থার সভাপতি শ্রীঅমল গুপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

আদর্শ হিন্দু হোটেল : আজকাল অফিস স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যপ্রযোজনার মধ্যেও যে প্রাণবন্ত অভিনয়ের নজীর মেলে তার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল সম্প্রতি রবি স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' প্রযোজনায়। রঙমহলে অনুষ্ঠিত এই নাট্যাভিনয় দর্শকদের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই মুগ্ধ করেছে। প্রতিটি শিল্পীই অভিনয়ে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে 'হাজারি ঠাকুর' ও 'মতি' ও 'পদ্ম ঝি'র ভূমিকায় ভবতারণ মুখার্জি, সুশীল রায় তৃপ্তি দাসের অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন হালদার, শিবচন্দ্র রায় সমীর সান্যাল, কমলেন্দু মুখার্জি, চঞ্চল মিত্র, প্রবোধ চৌধুরী, পার্বতী ব্যানার্জি শেলী মজুমদার, মিহির মুখার্জি।

বাঁশের কেল্লা : কলকাতার বিশিষ্ট সৌখীন নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ ৩১ ডিসেম্বর চুচুঁড়ার পিপুল পাটিতে স্থানীয় বিচিত্রা সংস্থার রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বাঁশের কেল্লা নাটকটি অভিনয় করে সহস্রাধিক দর্শককে মুগ্ধ করেন। নাট্য পরিবেশনায় সংসদের যে স্বকীয়তা ও বিশেষ দক্ষতা রয়েছে এই অভিনয় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছে।

প্রথম থেকে শেষ অবধি সংঘাতময় এই নাটক শিল্পীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ও নিষ্ঠায় দর্শক চিত্তে সাড়া জাগিয়েছে। ইতিঃপূর্বে এ নাটকটি কলকাতা ও মফঃস্বলের বহু আসরে যেমন প্রশংসা পেয়েছে এবারও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি, বরং একথা বলা যায় যে, নতুন একটা বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীরের বৈচিত্র্যময় জীবন ও ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম এ নাটকের মূল বিষয়।

অভিনয়ে সকলেরই চরিত্র সম্বন্ধে সচেতনতা ও তাকে সঠিকরূপে দেওয়ার ঐকান্তিকতা বিশেষ লক্ষণীয়। ধীরেন চক্রবর্তী, পুবেন পাল, সমীর ব্যানার্জি শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, কেষ্ট সিংহ, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র পাল, গৌরহরি অধিকারী, প্রদীপ ব্যানার্জি, সুরেশ ঘোষ ইতু মুখার্জি, সুলেখা ব্যানার্জি, রঞ্জনা চ্যাটার্জি, ঝর্ণা ঘোষ, সুধা সরকার, নিমাই দে শিল্পীরা যথাক্রমে বিশু মোড়ল, অনাদি তিতুমীর, বংশীধর, কালীপ্রসন্ন, হীরালাল, দীনবন্ধু, মিস্কিন, খাজা খাঁ, রুস্তম, সুবেদার, বাদশা, পিয়ারা, ডলি, সীমা, ফুলজান ও সদানন্দ চরিত্রে সার্থক রূপায়ণ করে এ নাটকের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ করেছেন।

টাকার রং কালো : কৃষ্ণনগরের কুশীলব নাট্যসংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে সাফল্যের সঙ্গে সুনীল চক্রবর্তীর 'টাকার রং কালো' নাটকটি অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন দিলীপ হাজরা, পার্থ পাণ্ডা, নির্মলশ্যাম রায় চৌধুরী, অসীম সরকার, মানিক দাস চন্দ্রকান্ত সরকার, জ্যোতির্ময় অধিকারী, তপন নন্দী, সমর সাধুখাঁ, মাধবী বোস, শম্পা সিংহ, কল্পনা সাহা, উত্তম মুখার্জি।

ফাঁস : উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মজার'এর শিল্পীরা বিশ্বরূপায় মঞ্চে পরিবেশন করেন শৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই প্রযোজনাটি মোটামুটি সার্থক হয়েছে বলতে হয়। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন প্রতিমা কর, স্বপন মিত্র, অনিত তালুকদার, তপন মিত্র, সোমনাথ দাস, সুব্রত সেন, স্বপন দেব, গৌতম চক্রবর্তী, দীপক গুপ্ত, নীলিমা দাস, দিলীপ ঘোষ, নিতাই দাস, মোহন মিত্র, ব্রজকিশোর পাল।

নাট্য প্রতিযোগিতা

চুঁচুড়া কল্লোল আয়োজিত নবমবর্ষ একাংক নাট্যপ্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, কল্লোল, পালপাড়া (বণ্ডেশ্বরতলা), চুঁচুড়া, হুগলী।

৩নং কয়লাঘাট স্ট্রীট কলকাতা-১-স্থিত ইস্টার্ণ রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় ৪র্থ বার্ষিক আন্তঃ রেল বাংলা একাংক নাট্যপ্রতিযোগিতা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে। যোগাযোগের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারী।

নিকটেই ফাঁদ : অগ্নিমিত্রের 'নিকটেই ফাঁদ' নাটকটি সম্প্রতি রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে পারবেশিত হয়। প্রযোজনা করলেন ইউ-নাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার (ঢাকুরিয়া শাখা) কর্মচারী সমিতির শিল্পীরা। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন তরুণ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন প্রবীর বর্ধন রায়, সুশান্ত বসু, দিলীপ পাল, স্বপন দাস, সুধাংশু দাশগুপ্ত, মানিক দে, পাপিয়া চ্যাটার্জি, শ্রীমতী পাইন, সুবিমল সিনহা, হারাধন দেবনাথ, বিপ্লব চন্দ, চিন্ময় নন্দী, প্রশান্ত ভৌমিক, ননীগোপাল দাস, অমল কর।

কেদার রায় : সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটকটি অভিনয় করেন সান্ধ্য মজলিস গোষ্ঠী।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই যাদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন হরি মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষাল, নন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী পাইন ও মঞ্জু ভৌমিক। এ ছাড়া ভাস্কর মিত্র, সুশীল নাথ, বরুণ বসু, অনিল ঘোষ, জীবন ঘটক প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন।

বোম্বাই-এ বাঙলা নাটকের অভিনয় : বোম্বাইর প্রখ্যাত সংস্থা ইণ্ডিয়া কালচার লীগ 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী পূর্তি' উৎসব সমিতির আহ্বানে ২৮ জানুয়ারী '৭৩ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সোমেন্দ্র নন্দী লিখিত 'পিরানদেল্লোর মতো' একাঙ্কটি মঞ্চস্থ করছেন। তাছাড়া ইউ টি সি আয়োজিত সারা ভারত বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায়ও অংশ গ্রহণ করছেন।

নিখিল বঙ্গ একাঙ্ক নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি এবং রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা :

বড়িষা আসর পরিচালিত নিখিল বঙ্গ একাঙ্ক নাটক, অভিনয় আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারী। বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র বড়িষা আসর ৩০নং বন্দ্যপাড়া বড়িষা, কলিকাতা-৮ এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

অভিনেতৃ সংঘ-এর 'বিদেহী'

দক্ষিণ কলিকাতার নব-নাট্যগৃহ শিশির মঞ্চ প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৌভানিক ট্রাস্ট রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি যে পাঁচদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তার সমাপ্তি দিবসে (১২ জানুয়ারী) অভিনেতৃ সংঘ মঞ্চস্থ করেছিলেন হেনরিক ইবসেন-এর 'গোস্টস' অবলম্বনে রচিত 'বিদেহী' নাটকটি।

'গোস্টস' অবলম্বনে লিখিত বাঙলা নাটকের অন্তত একটি অভিনয় আমরা কয়েক বছর আগে এই কলকাতা শহরে দেখেছিলুম এবং মনে পড়ে অভিনয়ের দিক দিয়ে সেটি মনে রেখাপাত করতেও সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু অভিনেতৃ সংঘ-এর 'বিদেহী' মূল নাটকের মর্মকথাকে যে আশ্চর্য প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করেছে, আগে-দেখা নাটকটি সে-পরিমাণ স্পষ্ট প্রাঞ্জলতা দাবি করতে পারেনা। জানি না, 'বিদেহী' নাটকটি কার লেখনীপ্রসূত ; কিন্তু তিনি যিনিই হোন, তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এমন একটি রচনা উপহার দেওয়ার জন্যে। পরিস্থিতি ও চরিত্র অনুযায়ী সাবলীল সংলাপ এই রচনাটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। নাটকের প্রধান চরিত্র মিসেস হেলেন আলভিংয়ের জীবনযন্ত্রণা ও জীবন-জিজ্ঞাসাকে সম্পূর্ণভাবে মূর্ত করে তুলেছে এই সংলাপ। মাত্র মধ্যান্তর বা বিরাম নির্দেশক যবনিকার আগে মিসেস আলভিংয়ের মুখে 'ভূত! ভূত!' না দিয়ে 'বিদেহী আত্মা, সেই বিদেহী আত্মার আবির্ভাব!' গোছের দিলে অধিকতর শোভন হত।

নাটকের ঘটনাস্থল করা হয়েছে মিসেস আলভিংয়ের বসবার ঘর। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এই কক্ষটিতে উপযোগী আসবাবপত্র সুবিন্যস্ত। মৃত ক্যাপ্টেন আলভিংয়ের রঙিন ছবিটি পর্যন্ত সেখানে স্থান পেয়েছে। চরিত্রোচিত রূপসজ্জা এই নাট্যাভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে সহায়তা করেছে। শব্দ-প্রক্ষেপণে কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে। ডান-দিকের খাবার-ঘর থেকে ওসওয়াল্ড (না, অসওয়াল্ড?) ও রেজিনার ভেসে-আসা কণ্ঠস্বর শোনা গেছে প্রেক্ষাগৃহের বাঁ দিকের লাউডস্পীকারের মাধ্যমে। এবং তাপস সেনের আলো অত বেশী চোখ-ধাঁধানো না হয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হলে খুব বেশী ক্ষতি হ'ত কি?

'বিদেহী' অভিনয়ের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর সামগ্রিক অভিনয় পারিপাট্য। প্রতিটি চরিত্রই আশ্চর্য নৈপুণ্যের সংগে চিত্রিত হয়েছে। বিবেকের সংগে সামাজিক আদর্শের যে সংঘাত দ্বারা মিসেস হেলেন-আলভিং প্রতিনিয়ত জর্জরিত, তাকে জীবন্ত ভাবে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন নীলিমা দাস তাঁর দীপ্ত অভিনয়ের মাধ্যমে। তাঁর সহঃ স্মরণীয় চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে এই মিসেস আলভিংয়ের ভূমিকাটি প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। পিতার উচ্ছৃংখল চরিত্রের উত্তরাধিকারী ওসওয়াল্ড অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। আপাত উচ্ছলতার মাঝে দুঃসাধ্য দুরন্ত রোগ যে তার নিজেরই অবিমৃষ্যকারিতার ফল, এই চিন্তা যে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, এই অবস্থাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান,

ধূর্ত, [illegible] ক্ষমতা লোভের চক্ষুবাহী আত্মতুষ্টি সহ তার প্রলাপোক্তি 'আমার সুর্যটা এনে দাও, আমার সুর্যটা এনে দাও' দর্শকচিত্তে অবর্ণনীয় বিষন্নতার সৃষ্টি করেছিল। সেই মাতাল, খোঁড়া সুবিধাবাদী, 'ছোটো' মানুষ ইংস্ট্রাণ্ডারের ভূমিকাটি বাস্তব রূপে পরিগ্রহ করেছিল নির্মল ঘোষের অভি-নয়ের মাঝে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কণ্টক পথে কোনোক্রমে খুঁড়িয়ে চলতে পারলেই হ'ল—এই চিন্তাধারার মানুষ ইংস্ট্রাণ্ড নাটকের অন্য সব চরিত্র থেকে আলাদা পথের পথিক, এ-সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তার বাস্তবধর্মী অভিনয় মারফত। ধর্মভীরু, সমাজের শৃংখলাবোধ দ্বারা আকৃষ্ট বন্ধনে বন্ধ পাদ্রী ম্যাণ্ডার্স-এর ভূমিকাটি পরম নিষ্ঠার সংগে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত করেছেন অশোক মিত্র। আবার যেখানে তাঁরই অসতর্কতার ফলে অনাথ-আশ্রমটি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ব'লে ইংস্ট্রাণ্ড ম্যাণ্ডার্সের ওপর দোষারোপ করছে, সেখানে সেই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার ছুট ছটানি ম্যাণ্ডার্সের চরিত্রকে কিছুটা ভণ্ড হ'লেও চিহ্নিত করে। এবং এখানেও অশোক মিত্র সার্থক নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। পরিচারিকারূপে মিসেস আলভিং দ্বারা স্নেহের সংগে পালিতা রেজিনার চরিত্রটি পরিচ্ছন্নভাবে রূপায়িত করেছেন আরতি ভট্টাচার্য। ওসওয়াল্ডের আগমনে তার ভাবান্তর এবং শেষ পর্যন্ত তার জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণে সমস্ত সংসারের প্রতি তার বিরক্তি—[illegible] অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে।

অভিনেতৃ সংঘের [illegible] একটি স্মরণীয় নাট্যাভিনয়।

অনামিকার 'হয়-বদন'

বর্তমানে ভারতীয় নাট্যজগতে গিরীশ কারনাড একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। এই মালয়ালি নাট্যকারের 'তুঘলক', 'সংস্কারা' প্রভৃতি রচনা নাট্যক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভংগীর সূচনা করেছে। শ্রীকারনাডের রচিত নাটক 'হয়-বদন'-এর বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ সর্বদাই পূর্ণতার জন্যে ব্যগ্র এবং এই পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের জীবনে আনে অস্থিরতা। এই সংগে আর একটি বক্তব্যকেও শ্রীকারনাড উপস্থাপিত করেছেন : মানুষের মস্তিষ্কই

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ফটো : অমৃত

তার প্রকৃত সত্তা, মস্তিষ্কই তাকে দেয় ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব। তাই দেবদত্ত ও কপিলের মধ্যে যখন মস্তকের পরিবর্তন ঘটল দৈব ইচ্ছায়, তখন ধীরে ধীরে ওদের পরিবর্তন দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত কপিল হয়ে উঠল দেবদত্ত ও দেবদত্ত হয়ে পড়ল কপিল। এবং যে হয়-বদনের মস্তক সমেত সম্মুখভাগ ছিল হয় বা অশ্ব এবং পশ্চাদ্ভাগ ছিল মানুষ, সেও হয়ে উঠল পুরোপুরি হয় বা ঘোড়া। শ্রীকর্ণাডের মতে নারীরা বরাবরই বীর্যের ও দেহশক্তির উপাসক। তাই দেখি, নারী স্বয়ংবরা হয়ে অশ্বের কণ্ঠে দেয় বরমাল্য, নায়িকা পদ্মিনী কপিলের শরীর বিশিষ্ট দেবদত্তকে (দেবদত্তের মুখমণ্ডলকে) পেয়ে খুশীতে নেচে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত যখন দেবদত্তের মুখমণ্ডল তার দেহকেও আগের মতো দেবদত্তরূপ ক'রে নেয়, তখন সে বিষন্ন হয়ে পড়ে এবং কপিলের ঘরণী হতে এগিয়ে যায়। অবশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুজনেই যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে সে তার কামনার আগুনকে পুড়িয়ে মারে।

এই রূপক নাটকটি—যার মধ্যে কালী মূর্তি জীবন্তভাবে আবির্ভূত হয়ে অভি-শাপ দেয় এবং একের ধড়ের সংগে অন্যের মুণ্ড যোজনা হতে দেখে মজা উপভোগ করে, পুতুলের সজীব হয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মনোজগতের বিশ্লেষণে মেতে ওঠে—সাধারণ দর্শনের চক্ষে একটি পরম উপ-ভোগ্য রূপকথারই সামিল হলেও আসলে যে একটি মনস্তত্ত্বঘটিত নাটক, তা প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারছেন। এবং রসিক দর্শক অভিনয় যতই অগ্রসর হবে, ততই উপলব্ধি করতে পারবেন।

পৌত্তলিক থিয়েটার উদ্যোগে সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে যে পাঁচ দিনব্যাপী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল, তারই চতুর্থ দিনে (১১ জানুয়ারী) অনামিকা নাট্যগোষ্ঠী গিরীশ কার্ণাড রচিত এবং ইউ ও কারন্ত দ্বারা হিন্দীতে অনূদিত 'হয়-বদন' নাটকটির মঞ্চস্থ করেন। নির্দেশক রাজেন্দ্রনাথ নাটকটিকে ব্রেখ্‌টীয় ঢংয়ে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ ও বসবার জন্যে একটি কাঠের বেঞ্চিকে দৃশ্য-সজ্জা হিসেবে এখানে - ওখানে স্থাপিত করে এক-একটি দৃশ্য গঠন করা হয়েছে। মঞ্চের দক্ষিণ-সম্মুখ ভাগের একটি ছোটো ঘেরা জায়গায় আসন গ্রহণ করেন ভাগবত, যিনি সূত্রধারের কাজ করেন নাট্যক্রিয়ার ভূমিকা ভাষণ ও বিভিন্ন নাট্যাংশের মাঝে ব্যাখ্যামূলক সংযোগসাধন করে। আর বাম-সম্মুখ ভাগের ঘেরা অংশে বসেন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যকারবৃন্দ। এঁরা নাট্যক্রিয়ার মাঝেই বিভিন্ন চরিত্রের ভাবনাচিন্তাকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে দর্শকদের জানিয়ে দেয় যে, তাঁরা আসল কোনো ঘটনা দেখছেন না, মাত্র অভিনয় দেখছেন। অনেকটা বিগত যুগে আমাদের যাত্রায় অনুসৃত রীতির সামিল।

সুন্দর বাচনভঙ্গী সূত্রধাররূপী ভাগবতের ভূমিকায় আদিত্য বিক্রমের। অভিনয় ব্যাপারে তিনি যে সুদক্ষ, তার প্রকাশ তাঁর প্রতিটি ভঙ্গীতে, চলনে, বলনে। দেবদত্ত যে একজন কবি ও শিল্পী তার প্রত্যয়িত স্বাক্ষর রেখেছেন শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা। দেহ বলে বলীয়ান, সরল প্রাণ, বন্ধুর একান্ত অনুগত কপিলের ভূমিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন শরৎ শেঠ। কপিলের মুখ যখন দেবদত্তের দেহের সঙ্গে মিলিত হল, তখন তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল পদ্মিনীকে পাবার বাসনা, যে-বাসনা এতদিন সুপ্তভাবে বাসা বেঁধেছিল তার অন্তরের অন্তরতম স্থলে। এই ভাবান্তরকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন শ্রীশেঠ। স্বেচ্ছা নির্বাসনের পরে কপিল আবার যখন পুরোপুরি কপিল, তখন তার পদ্মিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয়টুকু আরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। নায়িকা পদ্মিনী বেশে বীণা দীক্ষিত চরিত্রটিকে সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত করেছেন। এ-ছাড়া রবি ওয়াংচু (হয়-বদন), সুশীল মিশ্র (মহাকালী), রামগোপাল বগলা (১ম নট), মোতিশঙ্কর পাণ্ডোলী (২য় নট) প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন।

অনামিকা প্রযোজিত 'হয়-বদন' একটি সর্বাংশে উপভোগ্য নাট্যাভিনয়।

ঢাকার ছায়াছবি

কবরী চৌধুরী

ফ্লোরের চারপাশে অন্ধকারের ভেতর ডুবে রয়েছে। সোফার ওপর যেমন খুশি হয়ে ছড়িয়ে বসে আছেন অনেকে। সকলেরই অন্ধকার অন্ধকার মুখ। এই মুখের ছায়ার ভেতরই পরিচালক সুভাষ দত্ত। সুভাষবাবুও সোফায় বসে। ওঁর চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। অন্যমনস্ক হয়ে এক সময় তিনি বলছেন।

—ওরা কি কাজ শুরু করবে না?

—ওদেরকে ত নিষেধ করছে কাজ করতে। সেটের পারমিশন এখন দেয় নাই।

সোফায় বসে-থাকা সুভাষবাবুর দিকে কয়েকজন লোক এগিয়ে এলেন। অমনি চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

—এই লাইট অন। লাইট অন।

দু নম্বর ফ্লোরের সমস্ত আলো জ্বলতে শুরু করল। একজন বলে উঠলেন।

—আরে, ওইগুলা জ্বালাইয়া লাভ নাই! লাস্টে যেটা নিভাইলা, ওইটাই জ্বালাইয়া রাখ।

জনৈক ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বললেন।

—কালকেও শট নেয়া হল না।

—ওই সেটের ত প্রস্তুতি ছিল না কালকা।

বেশ বোঝা যাচ্ছে পরিচালক সুভাষ দত্ত তাঁর ছবি বলাকা মন নিয়ে দারুণ চিন্তিত এবং ব্যস্ত। বলাকা মন সুদর্শনা নায়িকা কবরী চৌধুরীই প্রযোজনা করেছেন।

এক টাকা—কনট্রাকট্‌

এফ ডি সি-র রেকর্ডিং ফ্লোরের দরজা ছুঁয়ে একান্তে গল্প করছিলেন ওঁরা দুজনে। এক টাকার একখানা নোট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে প্রখ্যাত সংগীত-পরিচালক সত্য সাহা বলে ফেললেন।

—এই যে বছরের প্রথম দিনের আয়। তার মানে এক টাকায় কনট্রাক্‌ট্‌ হল কুণ্ডুবাবু। বাকিটা পরে।

যিনি এ-টাকা দিলেন সত্যবাবুর হাতে, তিনি হচ্ছেন প্রযোজক-পরিচালক মহম্মদ ইয়াসিন। ইয়াসিন সাহেব অবশ্য ছবির নাম এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি।

সত্য সাহা সুরারোপিত ছবিগুলোর নাম হল—দাতা হরিশ্চন্দ্র, যাহা বলিব সত্য

খলিব, মধুমিতা, অশান্ত পৃথিবী, অপরাধ, জনতার আদালত, নয়নমণি, অন্ধ অতীত, অভাগিনী, বলাকা মন, অশ্রুরাজ। তাছাড়া আরো অনেক।

রাজ্জাক

রাজ্জাক যে ওপার বাংলার সেরা নায়কদের একজন, সেকথা নতুন করে জানিয়ে লাভ নেই। স্টুডিওর এক নির্জনে কজন ভদ্রলোক কথা বলাবলি করছেন। তা থেকে বুঝলাম, রাজ্জাক চিত্র-পরিবেশক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছেন। ও'র নিজস্ব চিত্র-পরিবেশন সংস্থার নাম হল রাজলক্ষ্মী প্রডাকশনস। রংবাজ এই প্রডাকশনেরই ছবি।

রংবাজ ছবিতে রাজ্জাক-কবরীকে জুটি হিসেবে দেখা যাবে অনেকদিন পর। ও'রা নাকি এ-ছবিতে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। রংবাজ পরিচালনা করছেন জাহিরুল হক। হক সাহেব পরিচালকরূপে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। সংগীতের দায়িত্ব আনোয়ার পারভেজের। রাণী সরকার শিউলী, রোজী, নারায়ণ চক্রবর্তী, সুমিতা, আনোয়ার হোসেন প্রভৃতিরা রয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে।

স্টুডিও পরিসংখ্যান

ঢাকার স্টুডিও সংখ্যা হল তিন। সে-কথা এখানকার চলচ্চিত্রকুশলীরা জানালেন। এই তিনের ভেতর এফ ডি সি-ই আয়তনে নাকি সবচেয়ে বড়। সব ঘুরে ঘুরে মনে হল এতে ফ্লোর রয়েছে চারটে। অনেক সময় অবশ্য এক-একটা দেয়াল দাঁড় করিয়ে এসব ফ্লোরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হয় প্রয়োজনে।

অন্য দুটো স্টুডিওর নাম হচ্ছে বেঙ্গল স্টুডিও, পপুলার স্টুডিও।

গেল যুদ্ধের পর স্বাধীনভাবে ছায়াছবি পরিচালনা করার কাজে নতুনরা এগিয়ে এসেছেন অনেক সংখ্যায়। এতেই নাকি স্টুডিওতে ভিড়, মানে 'গ্যাঞ্জাম' সৃষ্টি হয়েছে বেশি। ফলে ছবি তৈরির কাঁচামালের বাজারে আগুন ভাব।

জীবনতৃষ্ণা

জীবনতৃষ্ণা ছবির কথা আগে একবার (গত সংখ্যায়) সামান্য বলেছি। এবার ওই ছবির কিছু নেপথ্য কাহিনী আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক টেকিং-এর জোর মহড়া শুরু হয়ে গেছে রেকর্ডিং ফ্লোরে।

ওয়ান-টু-থ্রী-ফোর।

সা—সারে—গা—

বেহালার করুণ স্বর, তারপর সরোদ, সেতার, বাঁশির টানা সুর, অর্গান, খানিক দূরে দূরে বিরাট দুটো পিয়ানো বাজছে। সব মিলিয়ে সুরের ধ্বনি ছিটকে পড়ছে ফ্লোরের চারপাশে। জীবনতৃষ্ণা ছবির খানিক অংশ প্রদর্শন-ঘরের পর্দার গায়ে ভাসতে দেখা গেল। অমনি ফাইন্যাল মিউজিক টেকিংও শুরু হল।

'অনেক দুঃখের মধ্যে কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয় মানুষকে', এ-ছবিতে এই ব্যথাকেই পরিচালক এইচ আকবর ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই মিউজিক গ্রহণে করুণ ভাবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হল।

জীবনতৃষ্ণায় ববিতা সুচন্দা দুজনেই কাজ করছেন। ববিতা হচ্ছে রোমান্টিক নায়িকার চরিত্রে। আর সুচন্দা ট্র্যাজিডি রোলে। নায়ক হলেন রাজ্জাক। প্রবীর মিত্রও রয়েছেন।

'প্রবীর মিত্র দারুণ অভিনয় করেছে।'—ছবি দেখতে দেখতে একথা বলে ফেললেন পরিচালক এইচ আকবর নিজেই।

আরও বললেন তিনি।

—'এ-ছবির সুটিং যখন চলছিল, তখন কলকাতা থেকে ঋত্বিক ঘটক মহাশয় এসেছিলেন ঢাকার এই স্টুডিওতে। প্রবীরের অভিনয় দেখে ঋত্বিকবাবু এতে খুশি হয়েছিলেন যে, তিতাস একটি নদীর নাম-এর নায়ক হিসাবে ঠিক করে ফেললেন ওকেই।

প্রবীর মিত্র প্রমিনেন্ট আর্টিস্ট হবেন, এ-ধারণা আমিও করতে পারি।

ভাঙানি প্রসঙ্গ

জনৈক চলচ্চিত্রকুশলী একশ' টাকার একখানা নোট বয়-গোছের ছেলের হাতে দিয়ে বললেন—

—ভাঙাইয়া আন ত।

টাকা হাতে নিয়ে ছেলেটা তবু বিস্ময়-বোধক চিহ্নের মত দাঁড়িয়েই রইল। বলল,

—এক টাকার ভাঙানিই পাওয়া যায় না ঢাকায়। আর আপনি স্টুডিওর ভেতর একশ' টাকা ভাঙাইতে দিতাছেন। খুজরা পয়সা শুদ্ধ ভারতে চইলা যাইতাছে। ভারতীয়রা নাকি আমগ খুজরা লইয়া ওখানে নিব তৈরি করতাছে।

ভদ্রলোক ছেলেটাকে ধমকের সুরে বললেন।

—কিছু না পাওয়া গেলেই তোমরা কও ভারতীয়রা লইয়া গেল, তাঁরা যে কি করল আমগ জন্য, সেই কথা ত একবারও কওনা মিঞা।

শুভেচ্ছা ভারতের চলচ্চিত্রের জন্য

স্টুডিওর গেট ঘেঁষে বেরিয়ে আসছি এমন সময় নায়িকা শাবানা সাদা রঙের গাড়ি থামিয়ে মুখখানা সামান্য বার করে বললেন।

—নতুন বছরের শুভেচ্ছা আপনাদের ওখানকার সমস্ত চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের জানিয়ে দেবেন।

শাবানার বাবা ফয়েজ চৌধুরীও বলে উঠলেন একই সংগে।

—শুভেচ্ছার কথা মনে রাখবেন কিন্তু।

—গিরিধারী কুণ্ডু

গত ৩৭ সংখ্যা অমৃততে প্রকাশিত ঢাকার ছায়াছবি নিবন্ধটি গিরিধারী কুণ্ডু-র লেখা। ভুলক্রমে ওই সংখ্যায় লেখকের নাম বাদ পড়ে গেছে। —সম্পাদক, অমৃত

কিথ ফ্লেচার মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের ৪র্থ দিনের খেলায় বেদীর বলে ক্যাচ তুলে তাঁর ২১ রানের মাথায় চৌহানের হাতে ধরা পড়েছেন।

খেলাধূলা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট খেলা

মাদ্রাজে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারত ৪ উইকেটে জয়ী হয়ে বর্তমানে ২—১ খেলায় এগিয়ে আছে। মাদ্রাজে এই নিয়ে ভারত-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে ৫টা টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : ভারতের জয় ৩, ইংল্যাণ্ডের জয় ১ এবং ড্র ১। মাদ্রাজে ভারতের জয় ১৯৫১-৫২ সালে এক ইনিংস ও ৮ রানে, ১৯৬১-৬২ সালে ১২৮ রানে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ৪ উইকেটে। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের জয় ১৯৩৩-৩৪ সালে ২০২ রানে। ১৯৬৩-৬৪ সালের খেলাটি ড্র যায়।

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টের মত মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টেও ভারত শেষ পর্যন্ত তার বোলারদের কাঁধে চড়ে বিজয়-মঞ্চে উঠেছিল। ভারতের জয়লাভের ব্যাপারে শেষ দিকে বোলারদের ভূমিকা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানে শেষ হলে ভারতের জয়লাভের জন্য মাত্র ৮৬ রানের দরকার হয়। হাতে তখন পর্যাপ্ত সময়—চতুর্থ দিনের ৫২ মিনিট এবং পঞ্চম দিনের পুরো খেলার সময়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় প্রসন্ন ১৬ রানে ৪টে এবং বেদী ৩৮ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে ভারতের জয়-লাভের পথ সহজ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টসে জিতে ব্যাটিংয়ের দান প্রথম নিয়ে বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারেননি। প্রথম দিনেই ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৪২ রানের মাথায় শেষ হয়। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ৭৫ রান উঠেছিল। চা পানের আগে ১১০ রানের মাথায় তাদের ৭ম উইকেট পড়ে গেলে অনেকেই ভেবে-ছিলেন চা-পানের আগেই ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবে। কিন্তু তা ঘটতে দেননি ফ্লেচার, আরনল্ড এবং গিফোর্ড। চা-পানের সময় দেখা গেল রান বেশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৩ (৮ উইকেটে)। ৯ম উইকেট জুটিতে গিফোর্ড (১৭ রান) এবং ফ্লেচার ৮৪ মিনিটে অতি মূল্যবান ৮৩ রান তুলে দলের কাহিল অবস্থার অনেক উন্নতি করেন। ফ্লেচার শেষ পর্যন্ত ৯৭ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তাঁর খুবই দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তিন রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর এই নট-আউট ৯৭ রানই টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান। ফ্লেচার ২৩০ মিনিট খেলে তাঁর নট-আউট ৯৭ রানে ১০টা বাউণ্ডারী এবং ৪টে ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। চন্দ্রশেখর ৯০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

প্রথম দিনের বাকি ৬ মিনিটের খেলায় ভারত তাদের ১০টা উইকেট হাতে জমা রেখে ৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৭৫ (৪ উই-কেটে)। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৫২ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৩৪ (৩ উইকেটে)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দুরানী (৩৮ রান) এবং মনসুর আলি ৬৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন মনসুর আলি (৫৩ রান) এবং বিশ্বনাথ (৯ রান)।

তৃতীয় দিনে চা-পানের আগে ভারতের প্রথম ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ২৪২ রানের থেকে ৭৪ রানে এগিয়ে যায়। তৃতীয় দিনে ভারত প্রথম ইনিংসের বাকি ৬টা উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতই এক ইনিংসের খেলায় ৩০০ রান প্রথম সংগ্রহ করেছে। ৫ম উই-কেটের জুটিতে মনসুর আলি এবং বিশ্ব-নাথ ৬৫ রান তুলেছিলেন। মনসুর আলি ২৩২ মিনিট খেলে তাঁর ৭৩ রানে ১৪টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। দীর্ঘদিন পর মনসুর আলি ভারতীয় টেস্ট দলে নির্বাচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের সম্মান অক্ষুন্ন রাখেন।

তৃতীয় দিনের চা-পানের ৩২ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে এবং বাকি সময়ের খেলায় ৩টে উইকেট খুইয়ে [illegible] ৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। অ্যামিস এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় চন্দ্রশেখরের বলে ক্যাচ তুলে ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ধরা পড়লে চন্দ্র-শেখর তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে

...টি উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, চন্দ্রশেখরকে নিয়ে এপর্যন্ত ৫ জন ভারতীয় খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ১০০ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন। চন্দ্রশেখর বাদে অপর চারজন হলেন ভিনু মানকাদ (১৬২ উইকেট), সুভাষ গুপ্তে (১৪৯ উইকেট), এরাপল্লী প্রসন্ন (১৩৩ উইকেট) এবং বিষেণসিং বেদী (১১৪ উইকেট)। চন্দ্রশেখর তাঁর ২২তম টেস্ট খেলার মাথায় তাঁর ১০০তম উইকেটটি পান। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট খেলায় চন্দ্রশেখরের প্রথম শিকার ছিলেন ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক মাইক স্মিথ (বোম্বাইয়ের ২য় টেস্ট, ১৯৬৪)।'

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার গতি সম্পূর্ণভাবে ভারতের অনুকূলে চলে যায়। মাদ্রাজের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের এই ১৫৯ রান এক ইনিংসের খেলায় তাদের পক্ষে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে ১১৫ (ডেনেশ নট-আউট ৫৫) এবং চা-পানের সময় ১৫৪ (৮ উইকেটে)। ইংল্যাণ্ডের ১৫৯ রানের মাথায় ৯ম উইকেট (ডেনেশ) এবং ১০ম উইকেট পড়ে। দলের সহ-অধিনায়ক মাইক ডেনেশ ৭৬ রান করেন। এই ৭৬ রানই তাঁর টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রসন্ন ১৬ রানে ৪টে এবং বেদী ৩৮ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে ভারতের জয়লাভের পথ সুগম করেছিলেন। খেলায় এক সময় প্রসন্নর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ১০ রানে ৪টে উইকেট। তিনি তাঁর শেষ ওভারে ইংল্যাণ্ডের ১৫৯ রানের মাথায় ডেনেশ এবং পোককের উইকেট পান।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৬ রান তুলতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে

বিষেণ সিং বেদী

এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৩২ রান সংগ্রহ করে। ক্রিস ওল্ড ভারতের ১১ রানের মাথায় ইঞ্জিনীয়ার এবং ওয়াদেকারের উইকেট নিয়ে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। চতুর্থ দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন চৌহান (৭ রান) এবং দুরানী (১৩ রান)।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষ যখন অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তখন জয়লাভের জন্যে মাত্র ৫৪ রানের প্রয়োজন ছিল। অপর দিকে হাতে জমা ছিল ৮টা উইকেট এবং পুরো একদিনের খেলা। এই দিন জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকী ৫৪ রান তুলতে ভারতের আরও ৪টে উইকেট হারাতে হয়েছিল। লাঞ্চের আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। দলের ৮৫ রানের মাথায় গাভাস্কারের উইকেট লক্ষ্য করে গিফোর্ড যে বলটি

এরাপল্লী প্রসন্ন

ছাড়েন তা 'নো-বল' ঘোষিত হয় এবং এই 'নো-বল' থেকেই জয়লাভের প্রয়োজনীয় এক রান হাতে এসে যায়। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় 'নো-বল' থেকে জয়সূচক রান পাওয়ার নজির টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ২৪২ রান (ফ্লেচার নট-আউট ৯৭ রান। চন্দ্রশেখর ৯০ রানে ৬, বেদী ৬৬ রানে ২ এবং প্রসন্ন ৪০ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৫৯ রান (ডেনেস ৭৬ রান। বেদী ৩৮ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ১৬ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৩১৬ রান (মনসুর আলি ৭৩, ওয়াদেকার ৪৪, দুরানী ৩৮, কৃষ্ণনাথ ৩৭, প্রসন্ন ৩৭ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৩১ রান। আরনল্ড ৩৪ রানে ৩, গিফোর্ড ৬৪ রানে ৩ এবং পোকক ১১৪ রানে ৪ উইকেট)।

ও ৮৬ রান (৬ উইকেটে। দুরানী ৩৮ রান। পোকক ২৮ রানে ৪ এবং ওল্ড ১৯ রানে ২ উইকেট)।

রোহিনটন বারিয়া ট্রফি

১৯৭২-৭৩ সালের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসে ২৭ রান বেশী করার সুবাদে দিল্লীকে পরাজিত করে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রোহিনটন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রথম জয়ী হয় ১৯৭০-৭১ সালের ফাইনালে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মাদ্রাজ : ১৮০ রান ও ৩৫০ রান (৯ উইকেটে। বিজয়কুমার ৫৮)

দিল্লী : ১৫৩ ও ১৮৭ রান (৫ উইকেটে। হরি গিদোয়ানি ৬৫ এবং এস দেশাই নট আউট ৪২ রান)

... পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ ও ... ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০৪
ষাণ্মাষিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৯ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 2nd February, 1973 শুক্রবার, ১৯ মাঘ,১৩৭৯ .52 Paise

শহীদ স্মৃতি-বাসরে উপেক্ষিত প্রফুল্লচন্দ্র

৭ই পৌষ '৭৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় শ্রীপুলকেশ দে সরকারের 'শহীদ স্মৃতি-বাসরে উপেক্ষিত—প্রফুল্লচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। লেখক একটু সতর্ক এবং যত্নবান হলে মারাত্মক ত্রুটিগুলি হয়তো এড়াতে পারতেন। তিনি মজঃফরপুরে দুইটি বোমা বিস্ফোরণের খবর কোথা থেকে পেলেন? ৪ঠা মে, ১৯০৮, সোমবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

"....they had in their possession three revolvers and one bomb."

কাজেই একটি বোমাই ফেটেছিল এবং বোমাটি যে ক্ষুদিরাম ছুঁড়েছিলেন তা তাঁর প্রথম বিবৃতিতেই পাওয়া গিয়েছিল। পুলকেশবাবু প্রফুল্লচন্দ্রের 'গঙ্গা-স্নানও নির্বিঘ্নে হল' কোথা থেকে জানলেন? এ খবরতো কেউ পরিবেশন করেন নি। বারীন্দ্রকুমার প্রমুখের স্বীকারোক্তির আগেই প্রফুল্ল চাকীর (দীনেশ রায় নয়) নাম আমরা জানতে পারি ১৯০৮ এর ১৪ই মে 'সন্ধ্যা' সাময়িক পত্রিকায়। কাজেই পুলকেশবাবুর 'বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ স্বীকারোক্তিতে নামোল্লেখ না করলে মিথ্যা নামই সত্য হয়ে থাকত' এই উক্তি অযৌক্তিক। প্রফুল্ল চাকীর মাথা ধড় থেকে ছিন্ন করে যে লোকটি লালবাজার নিয়ে এসেছিলো তার কথা পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা বিপ্লবী জি, পি, স্বামীর চিঠিতে জানা যায়। '......বর্তমানে লালবাজারে পুলিশের দারোগা পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর ভাই হেমচন্দ্র লাহিড়ী এই কাজটি করেছিলেন। বাবু হেমচন্দ্র লাহিড়ী এন্টালী অঞ্চলে বাস করেন। কলিকাতার সর্বজনপরিচিত পেন্সনভোগী পুলিশ। এই সেই পুলিশ। কিন্তু স্বাধীন ভারতের নাগরিক কি এদের চিহ্নিত করে রাখতে পেরেছে? পুলকেশবাবু যে অভিযোগ তুলে ধরেছেন 'প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি নেই, মূর্তি নেই, তাঁর নামাঙ্কিত সেতু নেই, রাস্তা নেই', তা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অবশ্য লেখক প্রফুল্লচন্দ্রকে বড় করে দেখাতে গিয়ে ক্ষুদিরামকে 'কাজের পুতুল' করে ছেড়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্র সিনিয়র কর্মীর মত রিভালবারটি ত্যাগ করে আত্মদান করেছিলেন। ক্ষুদিরামও তা করতেন, কিন্তু তিনি পিস্তল চালাতে জানতেন না। এ সম্পর্কে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন—'ক্ষুদিরাম আমাদের বলেছিল......সে নিজে পিস্তল চালাতে জানিত না, যদিও সঙ্গে বেশ বড় একটি পিস্তল ছিল।' (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫৪, পৃঃ—৫২৩)। অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিতীয় শহীদ প্রফুল্ল চাকী ও তৃতীয় ক্ষুদিরাম। ফাঁসীর মঞ্চে উৎসর্গকারী প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম। আধুনিক বাংলার প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চাকী লেখকের এই যুক্তিও ভিত্তিহীন।

স্বপনকুমার ঘোষ,
বারুইপুর পুরাতনবাজার, বারুইপুর,
২৪ পরগণা।

নতুন উৎপাত

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে এবং নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে বহু বেকারকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দু-এক মাস থেকে বাসে, ট্রেনে চুরি, ডাকাতি, পকেটমার ইত্যাদি ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে আর আজকাল অনেক সময় বাসে মেয়েদের হাত কেটে রক্ত বের করে দেওয়া হয়। এর জন্য সরকারের উচিত পুলিশ ও ভলেন্টিয়ারের সাহায্যে দোষী লোকদের ধরে শাস্তি দেওয়া। জনসাধারণেরও কর্তব্য যে এই সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। শুধু একা পুলিশের পক্ষে এইসব জঘন্য অপরাধ আটকানো সম্ভব নয়।

এই বাংলা নেতাজী ও আশুতোষের মত বীরের। বাঙ্গালীদের এইসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে হামলা থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা যথেষ্টই আছে।

আমি আশা করি সরকার ও জনগণ এইসব অপরাধ আটকাতে পারবেন।

গৌতম ভট্টাচার্য
রুড়কী (ইউ পি)

'যাত্রাদলের যাত্রা বদল' প্রসঙ্গে

অমৃত, ১২ বর্ষ, ৩ খণ্ড, ৩৬ সংখ্যা পড়লাম 'যাত্রাদলের যাত্রাবদল'। লেখক শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের এই লেখাটিতে প্রবন্ধের তথ্য সম্পদ তেমন নেই। লেখার অন্যান্য দোষ-ত্রুটি বাদ দিয়ে আমি একটি বহুজন জ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যের ভুল পরিবেশনার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লেখক ৮৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'১৮৭১-এ ন্যাশানাল থিয়েটারের পত্তন হলেও...' গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হল—তা হলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কি করে ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন হয়? আজ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতবান যে কোন বাঙ্গালীই আশা করি জানেন যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ের দ্বারা 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' দ্বার উন্মোচিত হয়।

এই প্রথম অভিনয়ের স্থান ছিল চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ী' নামে খ্যাত মধুসূদন সান্যালের বাড়ী। এর দালানটি চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে প্রথম রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। এই ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে যদি কারও সন্দেহ হয় তবে তিনি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' অথবা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' কিংবা এই ধরনের বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস সম্বলিত যে কোন একখানি বই খুললেই তার নিরসন করতে পারবেন।

১৯৭২ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় স্বয়ংই বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন করবার জন্য পূর্বকথিত মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন বলেও আমরা জানি।

জীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
কলকাতা—২০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কত লোক মারা যান?

অমৃতের ৩৬ সংখ্যায় পারমিতা সেন মজুমদারের চিঠিটি পড়লুম। তাতে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের যে-পরিসংখ্যান দিয়েছেন, সেই পরিসংখ্যানের সূত্র যদিও তিনি গোপন করেন নি, তবুও সংশয় জাগে, এই রকম গোনাগুনতি হিসেবে, রাউণ্ড-ফিগার মিলিয়ে কি মানুষগুলি মরেছিল?

আমার তা মনে হয় না। তাহলে, ঐ যুদ্ধে নিহত প্রথম এবং শেষতম ব্যক্তিটির নামোল্লেখে বাধা কোথায়?

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। যুদ্ধের সময়, সব মানুষই যে কেবল কামান-বন্দুকের মুখে মরে, তা কিন্তু নয়। কেউ মরে দুর্ভিক্ষে, কেউ-বা মরে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়ায়। পত্রলেখিকা কি সেই মৃত্যুর সংখ্যাটা জানেন? আমার কিন্তু তা জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখেছি। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে কত মানুষ যে মরেছে না খেতে পেয়ে, কিংবা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মহামারীতে, তার ইয়ত্তা নেই!

তাদের সংখ্যা কত?

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সময়, এই তো সেদিন, সংবাদপত্রের পাতায় খবর বেরিয়েছিল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুর হারকে নাকি বাঙ্গালী মৃত্যুর সংখ্যা লজ্জা দিয়েছে। বুঝতে পারছি, আবেগের মুহূর্তে ঐ রকম অতিশয়োক্তিও প্রশ্রয় পায়। কিন্তু ইতিহাস তো আবেগের পথে চলে না, যুক্তির পথে এগিয়ে থাকে, তথ্যনির্ভর হয়!

আমি সঠিক সংখ্যাটি জানতে চাই। আপনারা যদি, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ-সহযোগে তা জানান, তাহলে বাধিত হব।

মোজাম্মেল হক কলকাতা—১৭

এবার শান্তি আসুক

কত দিন আর মানুষ প্রতীক্ষা করবে, শান্তি তার চাই। বুকের রক্ত দিয়ে ভিয়েতনামের মানুষ গত পঁচিশ বছর ধরে এই শান্তির জন্যই অপেক্ষমাণ। শেষ পর্যন্ত মহাশক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন ঘোষণা করেছেন, ভিয়েতনাম থেকে তিনি সৈন্য ফিরিয়ে আনছেন। ইন্দোচীনে স্থায়ী শান্তি আসুক, এই তিনি চান। ভিয়েতনাম নিজেরা তাদের মধ্যে আলোচনা করে বাকী বিরোধ সব নিষ্পত্তি করুক, এই তাঁর কাম্য। প্যারিসে স্বাক্ষরিত হয়েছে শান্তিচুক্তি। আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধি সবাই এই যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে জানিয়েছে সম্মতি। ২৮ জানুয়ারী থেকে ভিয়েতনামে হয়েছে অস্ত্রসংবরণ এবং গোলাগুলি বর্ষণের বিরতি। আমরা আশা করব, এই চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে সকল পক্ষ। শুধু ভিয়েতনামে নয় গোটা ইন্দোচীনে, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড সর্বত্রই শান্তি রক্ষিত হবে। কোথাও শক্তির সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা হবে না।

চুক্তি কার্যকর হবার দু' মাসের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে অবশিষ্ট আমেরিকান সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাবেন নিকসন। উত্তর ভিয়েতনাম মুক্তি দেবে সমস্ত আমেরিকান যুদ্ধবন্দী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ সরকারকেই একমাত্র বৈধ সরকার বলে আমেরিকা স্বীকার করে, কিন্তু জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের হাতে যে-সমস্ত এলাকা রয়েছে তা অস্ত্রের সাহায্যে দখল করার কোনো চেষ্টা হবে না, একথাও বলা হয়েছে চুক্তিতে। কী ভাবে সমঝোতা হবে তা সায়গন সরকার ও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট পরস্পরের মধ্যে আলোচনা দ্বারা নিষ্পত্তি করবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যে সীমারেখা আছে সপ্তদশ সমান্তরাল রেখা বরাবর তা কোনো স্থায়ী রাষ্ট্রীয় সীমান্ত নয়। অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে জেনিভা চুক্তির সময়ে একে যেমন যুদ্ধবিরতি সীমারেখা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাই থাকল। তবে উত্তর বা দক্ষিণ কোনো ভিয়েতনামই জোর করে এই সীমারেখা বদলের চেষ্টা করবে না।

উভয় পক্ষই যদি এই চুক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে তাহলে ইন্দোচীনে শান্তির নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। যুদ্ধবিরতি তদারকীর জন্য নতুন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীকে নিয়ে। এর সঙ্গে সামরিক কমিশন থাকবে আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ভিয়েতকং প্রতিনিধিদের নিয়ে। তারা সবাই কড়া ও নিরপেক্ষ নজর রাখবে যাতে চুক্তির কোনো শর্ত লঙ্ঘিত না হয়। উভয় পক্ষই অনেক মূল্য দিয়ে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সামরিক ক্ষেত্রে জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে পারে নি সায়গন সরকারকে। আমেরিকা তার বোমারু বিমান দিয়ে নতজানু করতে পারেনি হানয়কে। তাই রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই আজ সকল পক্ষ এগিয়ে এসেছে।

আমেরিকা অবশ্য বলেছে যে, সায়গন সরকারকে তারা সাহায্য দিয়ে যাবে। যদি তারা রণসম্ভার দিয়ে সাহায্য করে তাহলে শান্তিচুক্তির আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কারণ, তাহলে চীন ও রাশিয়া চুপ করে থাকবে না। শান্তিচুক্তির আড়ালে চলবে প্রহরণ সজ্জা। এর পরিণাম কি হতে পারে তা আমেরিকার চেয়ে ভাল আর কে জানে। সুতরাং আমরা আশা করব আমেরিকা সেই ভুল আর করবে না। সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পপতি এবং পেন্টাগনের প্ররোচনায় আর কানে পা দেবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকা বলেছে, উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষত নিরাময় করার জন্য তারা সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এই সাহায্য কী ভাবে দেওয়া হবে এবং উত্তর ভিয়েতনাম কখন কী শর্তে তা গ্রহণ করবে তা পৃথিবীর মানুষ সাগ্রহে লক্ষ্য করবে। কিন্তু তা হবে স্থায়ী শান্তির একটি উজ্জ্বল সোপান।

হো চি মিন বলতেন, আমেরিকার মানুষের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। আমেরিকা যদি ভিয়েতনাম থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যায় আমরা পুষ্পস্তবক নিয়ে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাব। হো চি মিন আজ নেই। দুই ভিয়েতনামের সংযুক্তি এবং যুদ্ধাবসান তিনি দেখে যেতে পারেন নি। আজ যদি তা সার্থক হয় তাহলে তার স্বপ্ন সার্থক হবে। কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে দুই ভিয়েতনামের একীকরণের সম্ভাবনা এখন নেই। কার্যত ভিয়েতনামে এখন তিনটি সরকার—উত্তর ভিয়েতনাম, সায়গন এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। কিছুদিন আগে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই একজন জাপানী নেতার কাছে বলেছিলেন, ভিয়েতনামে তিনটি সরকারই স্থায়ী হতে চলেছে। তিনি কেন এই কথা বলেছিলেন, শান্তিচুক্তির ধরন দেখে তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক দেশই বিভক্ত হয়েছে। কোনো দেশই জোড়া লাগেনি। ভিয়েতনামীরা ভাবতেই পারে না এক দেশ, এক জাতি এইভাবে বিভক্ত থাকবে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করলে দেশ ঐক্যবদ্ধ হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের ঐক্যের জন্য এমন দীর্ঘসংগ্রাম, এত আত্মত্যাগ, এত সহিষ্ণুতা আর কোনো দেশ বা জাতি দেখায় নি। জার্মান জাতি বিভাগ মেনে নিয়েছে, কোরিয়ানরাও। ভিয়েতনাম ব্যতিক্রম, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। জানি না তাদের স্বপ্ন সফল হবে কিনা। তবু এই যুদ্ধবিরতি তাদের ক্ষতবিক্ষত দেশে শান্তি আনুক, এই আশাই আমরা করি।

অবশেষে সেই ঘোষণা শোনা গেল, যে ঘোষণা শোনার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন।

"আজ ১৯৭৩ সালের ২৩ জানুয়ারি প্যারিস সময়ের বেলা সাড়ে বারটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ডক্টর হেনরি কিসিঙ্গার ও ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিশেষ উপদেষ্টা লে ডুক থো ভিয়েতনামে যুদ্ধাবসান ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্র এই আশা প্রকাশ করছে যে, এই চুক্তি ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করবে এবং ইন্দোচীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে।"

যুগপৎ ওয়াশিংটন ও হ্যানয় থেকে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা একটি নতুন

লে ডাকথো

কিসিংগার

হে যুদ্ধ বিদায়!

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্যারিস শান্তি আলোচনায় প্রতিনিধি দলের নেত্রী নগুয়েন থি বিন (বামে) ভিয়েৎনাম থেকে ওরলি বিমানবন্দরে পৌঁছে জনতার প্রতি হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হ্যানয় শান্তি প্রতিনিধিদলের নেতা জুয়ান থুই (ডাইনে) তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

চিহ্ন রেখে গেল। বলতে গেলে ২৮ বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছে, প্যারিসে চার বছর [illegible] সত্ত্বেও যে যুদ্ধ থেকে [illegible] পাওয়া যায় নি, [illegible] পরামর্শদাতা অদ্ভুতকর্মা [illegible] কিসিঞ্জারের সঙ্গে উত্তর [illegible] প্রতিনিধি লে ডুক থোর [illegible] বছরব্যাপী গোপন আলোচনার পর যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্ভব হল, সেই যুদ্ধ ও যে শান্তির মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে দশ লাখ মানুষের শব, [illegible] ধ্বংসে পরিকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র দেশের মাটি সেই যুদ্ধ ও সেই শান্তি [illegible] অনিবার্যভাবেই বহু জটিলতা, বহু সংশয়ে [illegible] সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্যারিসে স্বাক্ষরিত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি কি অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলোকের নিশানা দেখাল অথবা এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে অন্য সুড়ঙ্গে নিয়ে গেল? এই সংশয়িত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া [illegible] এখনও বাকি আছে। আপাতত শুধু এই সামান্য স্বস্তি যে, যে নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও [illegible] ধ্বংস সারা পৃথিবীর বিবেকের উপর একটা দুঃসহ বোঝা হয়ে চেপে ছিল তার অবসান হল।

দুই প্রস্থ মূল চুক্তি (এক প্রস্থ আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক, আর এক প্রস্থ আমেরিকা, উত্তর ভিয়েতনাম, সায়গন সরকার ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের মধ্যে চার পাক্ষিক) চারটি প্রোটোকল (তাদের মধ্যে তিনটি দুই প্রস্থ করে), সব মিলে মোট ৮২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই যুদ্ধবিরতির দলিল একটি বৃহৎ নথি। সংক্ষেপে বলতে গেলে চুক্তির মূল শর্তগুলি হচ্ছেঃ—

(১) ভিয়েতনাম সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সব দেশ মর্যাদা দেয়।

(২) ২৭ জানুয়ারি গ্রীনউইচ মীন টাইমের রাত্রি [illegible] সময় থেকে যুদ্ধ-বিরতি পালিত হবে। ঐ সময় থেকে ভিয়েতনাম গণ প্রজাতন্ত্রে আমেরিকার সর্বপ্রকার তৎপরতা বন্ধ করা হবে এবং উত্তর ভিয়েতনামের সমুদ্রপথে ও জলপথে পাতা সমস্ত মার্কিন মাইন নষ্ট করে ফেলা হবে।

(৩) সৈন্যাপসারণ সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সৈন্য যে যার জায়গায় থাকবে।

(৪) দক্ষিণ ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তিকে জড়াবে না এবং সেদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

গুয়াম—এখানে মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের [illegible] এখানে ৫কটি ৫০০ পাউন্ডের বোমা [illegible] দৃশ্য।

(৫) চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ষাট দিনের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং সায়গন সরকারের মিত্রস্থানীয় অন্যান্য সব দেশের সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (লক্ষণীয় এই যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে এই ধরনের কোন শর্ত নেই। অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামে উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে।)

(৬) এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর থেকে নির্বাচনের দ্বারা নতুন সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ (সায়গন সরকার ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার) দক্ষিণ ভিয়েতনামে বাইরে থেকে নতুন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রবেশ করতে দেবেন না।

(৭) যেসব সামরিক ও বিদেশী অসামরিক ব্যক্তি দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষের হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদের ৬০ দিনের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হবে।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনাম সরকার মেনে নিচ্ছেন যে, (ক) দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পবিত্র, অবিচ্ছেদ্য ও সকল দেশের স্বীকার্য; (খ) আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে যথার্থ অবাধ ও গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ তাদের দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্থির করবে।

(৯) দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি মেনে চলবেন, শান্তিরক্ষা করবেন এবং সর্বপ্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষ বর্জন করে যাবতীয় বিরোধের বিষয় আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তি করবেন।

(১০) যুদ্ধবিরতির পর দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় আপোষ-

রাজধানী সায়গন থেকে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে চুচুতের মধ্যে মুক্তিবাহিনী ১নং সড়ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর যানবাহন ও লোকজন আটকে পড়ে।

মীমাংসা গড়ে তুলবেন, বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান ঘটাবেন, যাঁরা এ পক্ষ বা ও পক্ষের সংগে সহযোগিতা করেছেন এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও বৈষম্য নিষিদ্ধ করবেন। উভয় পক্ষ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করবেন।

(১১) যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় আপোষমীমাংসা সংক্রান্ত একটি জাতীয় পরিষদ স্থাপন করবেন। এই জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ যাতে চুক্তি কার্যকর করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা, জাতীয় আপোষ-মীমাংসা গড়ে তোলা ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করা হবে। অবাধ ও গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও এই জাতীয় পরিষদের থাকবে।

(১২) দক্ষিণ ভিয়েতনামে অবস্থিত ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস ও তাদের নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ জাতীয় আপোষ-মীমাংসার ভিত্তিতে নির্ণয় করবেন।

(১৩) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে আলোচনা ও চুক্তির ভিত্তিতে ধাপে ধাপে ভিয়েতনামের একীকরণ সম্পন্ন হবে। সপ্তদশ অক্ষরেখার দ্বারা চিহ্নিত সামরিক সীমান্ত রেখাটি সাময়িক এবং এটা কোন রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক সীমানা নয়। (ঐ শর্তের দ্বারা দুই ভিয়েতনামকে কার্যত একই দেশের দুই অংশ বলে স্বীকার করে নেওয়া হল।)

(১৪) প্যারি সম্মেলনে যোগদানকারী চার পক্ষের প্রতিনিধিরা একটি চারপক্ষীয় যুক্ত সামরিক কমিশন গঠন করবেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি চুক্তি যাতে কার্যকর হয়, মার্কিন ও অন্য সৈন্যবাহিনী যাতে চুক্তি মত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, মার্কিন ও তার সংগে যুক্ত অন্যান্য দেশের সামরিক ঘাঁটিগুলি যাতে ভেঙে দেওয়া হয় ও বন্দীদের যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় সেদিকে এই কমিশন নজর রাখবেন। সৈন্যাপসারণ ও যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যার্পণের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে এই চারপক্ষীয় যুক্ত সামরিক কমিশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

(১৫) এছাড়া দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ একটি দ্বিপাক্ষিক সামরিক কমিশন গঠন করবেন। চারপক্ষীয় সামরিক কমিশনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এই দ্বিপাক্ষিক কমিশন চালু থাকবে।

(১৬) কানাডা, হাঙ্গারি, ইন্দোনেশিয়া ও পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে একটি আন্তর্জাতিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন। এই কমিশন চুক্তি কার্যকর করা হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখবেন।

(১৭) এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চুক্তিটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, যুদ্ধাবসান সুনিশ্চিত করার জন্য, ভিয়েতনামে শান্তিরক্ষার জন্য, ভিয়েতনামের জনগণের মৌলিক অধিকার ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হবে। এই সম্মেলনে থাকবেন ভিয়েতনাম প্রশ্নের সংগে জড়িত চার পক্ষ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই সরকার), চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, কানাডা, হাঙ্গারি, ইন্দোনেশিয়া ও

বিশেষ ফিচার

কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে, কিম্বা ঘটার কথা ছিল অথচ ঘটেনি, অথবা অনেক দিন আগে ঘটেছিল যা কাল মনে পড়েছে, হয়তো কাউকে দেখে অথবা কারো পুরনো কোনো চিঠি বা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে—তারই ওপর এক পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম হলেও প্রবীণ ও নবীন লেখকদের কলমে এই ফিচার বুদ্ধির দীপ্তিতে আর হৃদয়বৃত্তির গভীরতায় লক্ষ্যভেদ করবে তাতে সন্দেহ নেই। শুরু হচ্ছে পরের সংখ্যা থেকে।

মার্কিন বোমাবর্ষণের ফলে বিধ্বস্ত বাক মাই হাসপাতাল

প্রতিনিধিবৃন্দ এবং রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল।

(১৮) কাম্বোডিয়া ও লাওস থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসা হবে এবং বাইরে থেকে ঐ দুই দেশে সৈন্য, সামরিক উপদেষ্টা, অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ পাঠান হবে না। কাম্বোডিয়া ও লাওসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মীমাংসা বিদেশের হস্তক্ষেপ বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের জনসাধারণ নিজেরাই করবেন।

এইসব শর্তের মূল কথা হল, ইন্দোচীনের দেশগুলিকে ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির পরবর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মূলত ভিয়েতনামের ভিতরকার যে দুই প্রতিপক্ষ শক্তি সেখানকার সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়েছিল সেই দুই শক্তিকে রণাঙ্গন ছেড়ে এখন রাজনৈতিক মোকাবেলার পথে আসতে বাধ্য করা হল। কারণ, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ভিয়েতনামের প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। এমন ধ্বংসকর নিষ্ঠুর যুদ্ধ যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হয় নি তেমনি এমন অ-ফলপ্রসূ যুদ্ধও আর কখনও হয় নি। এই একটি যুদ্ধ আমেরিকার ঘরের রাজনীতিকে বিদীর্ণ করেছে; প্রবলতম শক্তির বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় অপরাজেয় প্রতিরোধক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে, ক্ষুদ্র শক্তিগুলির বকলমে বৃহৎ শক্তিগুলির লড়াইয়ের প্রবণতা তুলে ধরেছে, কিন্তু যা হয় নি তাহল চূড়ান্ত জয়পরাজয়ের মীমাংসা। আমেরিকার মানুষ এখন তাদের মনের শান্তি ফিরে পাবে, বিশ্বের বিবেক পাবে স্বস্তি। কিন্তু দুই ভিয়েতনামের যে প্রায় চার কোটি মানুষ তাঁদের বর্তমান প্রজন্মে শুধু যুদ্ধ, ধ্বংস, অনাচার ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি তাঁদের জন্য নতুন সুদিন ফিরে এল কিনা কে বলবে?

কারণ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই পক্ষ যখন আর কোন বান্ধব পাশে না নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াবেন তখন মহান ভিয়েতনামী একজাতীয়তা বোধের উচ্ছ্বাস অতীতের সব বিরোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, একথার প্রমাণ হতে এখনও বাকি আছে। আর যদি বাস্তবে তার বিপরীতটাই প্রমাণিত হয় তাহলে ভিয়েতনামের যুদ্ধ অধিকতর যথার্থভাবেই গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে চলেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

২৮-১-৭৩ পুণ্ডরীক

ভ্রম সংশোধন

গত ৩৭ সংখ্যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে আলোচিত শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গ্রন্থটির নাম পড়তে হবে 'নন্যা কন্যা'।

যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি

বার বর্ষব্যাপী ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক মিলিয়ে দশ লক্ষেরও বেশী প্রাণবলি হয়েছে। মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক সাব-কমিটির হিসাব মত কেবল দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই বেসামরিক জীবনহানির সংখ্যা (১৯৬৫ থেকে ১৯৭২-এর ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত) ১৩,০,০০০।

অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ—১৯৬১-র ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৩-এর ১৩ই জানুয়ারী প্রতিরক্ষা দপ্তরের হিসাবমত—মার্কিন সেনা যুদ্ধে নিহত ৪৫,৯৩১; অন্যান্য কারণে নিহত ১০,২৯৮; মোট হতের সংখ্যা ৫৬,২২৯ (কোরীয় যুদ্ধে মোট ৩৩,৬২৯ মার্কিন সেনা নিহত)। আহত ৩০৩,৬০৫; যুদ্ধে নিখোঁজ ১২৭৬: বন্দী ৫৮৯। দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সেনা বাহিনীর (১৯৬০ থেকে) ক্ষয়-ক্ষতি—নিহত ১৮৮,০০০, আহত—৪০০,০০০ এবং মিত্র বাহিনীর (দঃ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড সেনা হতাহত—৩০ ডিসেম্বর ১৯৭২ অবধি নিহত ৫,২১১; মার্কিন হিসাবমত উত্তর ভিয়েৎনাম ও এন এল এফ-এর হতাহতের পরিমাণ ৯২৮,০০০ নিহত।

এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩,৫০০ কোটি ডলার (৯৮,৫৫০ কোটি টাকা)।

১৯৬৬ সাল থেকে ইন্দোচীনে মার্কিন বিমান ৭০ লক্ষ টন বোমা ফেলেছে।

ইন্দিরা যুগের সাত বছর

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান ভারতকে আমরা ইন্দিরা যুগ বা প্রগতির যুগ বলে বর্ণনা করতে পারি। কারণ, গত সাত বছরে দল-নেত্রী হিসাবে বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছেন ভারতবাসীর অন্তরে। এই বিশ্বাস হোল বেঁচে থাকার বিশ্বাস, নতুন সমাজ ও জীবন প্রতিষ্ঠার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হোল দেশ গঠনের বিশ্বাস। এবং সামাজিক নাম প্রতিষ্ঠার আশা। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাইরের চাপ সব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শ্রীমতী ইন্দিরা প্রথম দিন থেকে বিপদ বা বাধার সম্মুখীন হয়ে চলায় যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার বিস্ময়কর সাফল্য এনেছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে, সাত বছরে প্রধান কাজগুলি আমরা সর্বাগ্রে স্মরণ করতে পারি ঃ

(১) ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ,

(২) কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ;

(৩) নতুন কংগ্রেসের অধিকাংশ রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিরাট নির্বাচনী সাফল্য এনে '৬৭ সালের গ্লানি দূর ;

(৪) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য দান. পাকিস্থানী কবল থেকে উদ্ধার. বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সেবার দ্বারা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি ;

(৫) পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের সাফল্য ও বাংলাদেশে পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণ ;

(৬) ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি ;

(৭) ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি :

(৮) ভারত-পাকিস্থান শান্তি চুক্তি ও দখলীকৃত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ, সীমান্তের সীমানার পুনর্বিন্যাস ;

(৯) রাজন্যভাতার বিলোপ ও সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সমাজবাদী অর্থনৈতিক কার্যক্রম রূপায়ণের সূচনা ;

(১০) দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা ভারতে উন্নয়নসূচী রূপায়ণ, অর্থ বরাদ্দ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতিষ্ঠা।

ইন্দিরাজী একক এক উজ্জ্বল ইতিহাস। নতুন কংগ্রেসের দলনেত্রী হিসাবে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তিনি আদর্শ সংগঠক। তেমনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে ভারতের উন্নয়ন-মুখী নতুন জয়যাত্রার সূচনা করেছেন। তাঁর বিস্ময়কর নেতৃত্ব ও অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, বাস্তবধর্মী অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ভারতকে পদে পদে সাফল্যের পথে নিয়ে চলেছে। তিনি দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। গত ৭ বছর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে শ্রীমতী গান্ধী যে কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, বাস্তবধর্মী চিন্তা ও সৃজনধর্মী বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ঐতিহাসিক। তিনি যা ভাবেন তাই করেন। কথায় ও কাজে তাঁর অপূর্ব মিল। তাঁর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি তাঁকে নতুন দায়িত্ব পালনে সর্বদাই বিজয়িনী করেছে।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল—এই সাতটি বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস, উন্নয়নশীল কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাবো নিজের প্রতি, দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি তাঁর কি গভীর বিশ্বাস। যে বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে তিনি একের পর এক সাফল্য এনেছেন। এখন তাঁর সংগ্রাম হোল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে, একমাত্র চিন্তা হোল কোটি কোটি দুঃস্থ গরীব মানুষের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।

শ্রীমতী গান্ধী দেশে ও বিদেশে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের জন্য আজ বন্দিত। তিনি বাংলাদেশের মুক্তি, শরণার্থীর সেবার মধ্য দিয়ে যে নতুন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের তিনি যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশজোড়া বিক্ষোভ, অশান্তি, খাদ্যাভাব, বিবিধ অশুভ প্রতিক্রিয়ার ঘটনায় তিনি হিমসিম খাচ্ছিলেন। আজও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বিবিধ বিক্ষোভের মোকাবিলা তাঁকে করতে হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। নানা সঙ্কটে জর্জরিত ভারতের কতগুলো রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা হারালো। কিন্তু তাঁর কর্মনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও বিস্ময়কর নেতৃত্বে নতুন কংগ্রেস গড়ে উঠেছে। একটি রাজ্য বাদে প্রায় সকল রাজ্যেই কংগ্রেস ৭১ ও ৭২ সালের নির্বাচনে বিরাট সাফল্য এনেছে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যেমন অপূর্ব নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তেমনি ভারতকে উন্নতির পথে পরিচালনায় বিরাট ব্যক্তিত্ব ও কর্ম-ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে এই ঘটনাবহুল জীবনের কিছু তথ্য নীচে উল্লেখ করা হোল।

১৯৬৬

২৪ জানুয়ারী—ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শপথ গ্রহণ করেন। ১৯শে জানুয়ারী তিনি শ্রীমোরারজী দেশাইকে পরাজিত করে সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হন।

২৩ অকটোবর—দিল্লীতে টিটো, নাসের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ত্রিশীর্ষ সম্মেলন।

১৯৬৭

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার অভিযান।

১২ মার্চ—পুনরায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত।

১৩ মার্চ—দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ।

১৯৬৮

১৪ অকটোবর—রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ।

১৯৬৯

১৯ জুলাই—ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সিদ্ধান্ত কার্যকর।

২০ আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে নির্দল প্রার্থী শ্রীভি ভি গিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নির্বাচনে শ্রীগিরির জয় শ্রীমতী গান্ধীরই জয় হলো। গান্ধি নীতির জয়যাত্রা সূচিত হোল।

১২ নভেম্বর—দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনলেন। সংসদীয় দলের নতুন নেতা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলেন। অপরদিকে ওয়ার্কিং কমিটির ১০ জন সদস্য ঐ সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। সংসদীয় দলের ২৮২জন সদস্যের মধ্যে ২২০ জন প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করলেন এবং নতুন করে আস্থা ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলো।

২২ নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকগণ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির

এক বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন। এই বৈঠকে তাঁরা দাবী করলেন ৭০৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ৪৩২ জন ঐ অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন।

২৭—২৯ ডিসেম্বর—নতুন কংগ্রেসের জন্ম ও জয়যাত্রা। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন শাসক কংগ্রেসের সম্মেলন হোল—শ্রীজগজীবন রাম ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও দলনেত্রী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধী এক বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে নতুন ভারত গড়ার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

১৯৭০

২৭ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা বাতিলের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ মাস আগে কেন লোকসভার নির্বাচন চান তাঁর কারণ উল্লেখ করে জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ দেন।

১৯৭১

৫ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী অভিযানের শেষ পর্ব সমাপ্ত করেন। ৪৩ দিনব্যাপী নির্বাচনী অভিযানে শ্রীমতী গান্ধী ৩৬ হাজার মাইল সফর করেন, তিন শতাধিক সভায় ভাষণ দেন। তাঁর এই সভাগুলোতে মোট প্রায় দুই কোটি শ্রোতা যোগ দিয়েছিলো।

১১ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারী দল কংগ্রেস নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। মোট ৫১৫টি আসনের মধ্যে ৩৫০টিই তাঁর দল দখল করে। নির্বাচনী ফল ঘোষিত হওয়ার পর তিনি তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেন যে, এখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাঁর মুখ্য লক্ষ্য।

১৭ মার্চ—নবনির্বাচিত কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় শ্রীমতী গান্ধী পুনরায় নেত্রী পদে নির্বাচিত হন। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীজগজীবন রাম ও সমর্থন করেন শ্রীওয়াই বি চবন।

১৮ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

৩১ মার্চ—বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে সংসদে শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

২৪ এপ্রিল—পরিকল্পনা কমিশন নতুন করে গঠন করেন এবং শ্রীসুব্রহ্মনিয়মকে পরিকল্পনা দপ্তরের ভার দেন।

২ মে—প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করেন।

২৪ মে—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। বিশ্ববাসী ও রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশে তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে সক্রিয় মীমাংসার জন্য তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

১ জুন—ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুর আগমন বন্ধের ব্যাপারে সকলের উদ্দেশ্যে দাবী জানান।

১৮ জুন—পূর্ব বাংলার সমস্যা ভারতের সমস্যা বলে তিনি বর্ণনা করেন। এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন—যেকোন আক্রমণকে প্রতিহত করতে ভারত প্রস্তুত।

২৮ জুলাই—প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় সংবিধানের ২৪ ও ২৫ সংশোধন বিল পেশ করেন এবং মৌলিক অধিকারের আংশিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

৯ আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ২০ বছরব্যাপী 'শান্তি ও মৈত্রী' চুক্তি সম্পাদন করেন।

১০ আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের গোপন বিচার সম্পর্কে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন।

২৫ আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ-এন-লাইর কাছে একটি পত্র পাঠান।

২৭ সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী মস্কো সফরে যান।

২৮ অকটোবর—বিশ্ব সফরের প্রাক্‌কালে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। বিশদিন সফরে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। এই সফরের সময় বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বাস্তব অবস্থা, ভারতীয় উপমহাদেশে আশঙ্কার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ৪ঠা নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশের প্রতি সুবিবেচনার জন্য আহ্বান জানান।

২৪ নভেম্বর—সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সংসদে ভাষণ দেন।

২৭ নভেম্বর—বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান ও মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

৩০ নভেম্বর—প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্থানকে সৈন্য অপসারণের আহ্বান জানান।

২ ডিসেম্বর—সংবিধানের ২৬ সংশোধন বিলের ওপর লোকসভায় ভাষণ প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী রাজন্যভাতা ও সুযোগ সুবিধা লোপ বিলের আবশ্যকতা উল্লেখ করেন। বিলটি গৃহীত হয়।

৩ ডিসেম্বর—কলকাতা বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। ঠিক সেইদিনেই ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্থান সশস্ত্র আক্রমণ সুরু করে। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তিনি পাকিস্থানী আক্রমণের মোকাবিলার নির্দেশ দেন। ঐ রাত্রেই জাতির উদ্দেশে বেতারে তিনি পাকিস্থানের এই আক্রমণের মোকাবিলার সর্বাত্মক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন।

৪ ডিসেম্বর—সংসদে তিনি জানান : পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের খবরও তিনি জানান। ভারতের নৌ ও বিমানবাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার কথাও বলেন।

৬ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্থান ভারতের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে।

১৬ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করেন বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে। পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করায় বেতারে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।

৩১ ডিসেম্বর—সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা : তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ব্যতীতই পাক-ভারত সমস্যার মীমাংসা সম্ভব।

১৯৭২

২ জানুয়ারী—দিল্লীতে নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা।

১০ জানুয়ারী—দিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে সদ্যমুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎকার ও সংবর্ধনা।

২০ জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রীর মেঘালয় ও অরুণাচল নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা উদ্বোধন।

২১ জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুনর্গঠিত মণিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের উদ্বোধন।

৬—৮ ফেব্রুয়ারী—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের কলকাতা সফর ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধীর যোগদান।

১৫ মার্চ—রাজ্যে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট সাফল্য।

১৭ মার্চ—শ্রীমতী গান্ধীর বাংলাদেশ সফর ও বিপুল সংবর্ধনা লাভ।

১৯ মার্চ—ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত।

২৮ জুন—২ জুলাই—সিমলায় ভারত-পাকিস্থান চুক্তি সম্পাদিত হোল। আলোচনার মারফত উভয়ের সমস্যা সহজ হোল। দখলীকৃত এলাকা বিনিময়ের সূত্র রচিত হোল। বলপ্রয়োগের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মারফত উভয়ের সমস্যা সমাধানের আগ্রহ বিশেষ ব্যক্ত হোল। ইন্দিরার শান্তিনীতির জয়যাত্রা আবার সূচিত হোল।

চিলের ডাক

গোপাল সামন্ত

রবিবারের দুপুর। ছুঁই-ছুঁই বেলা। বিনয়বাবুর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল এক বন্ধুর বাড়িতে বসে। একথা সে কথায় ঘুরতে ঘুরতে শেষে শব্দ আর স্মৃতির প্রসঙ্গ চলে আসে। কথাটা উঠতেই আমি বলে উঠি—আচ্ছা, বলুন তো, হঠাৎ দুপুরে একটা চিলের ডাকই কী মানুষকে কতোকাল আগেকার একটা সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় না?

ঠিকই বলেছেন—তিনি বলে উঠলেন, একটা চিলের ডাক শুনেই আমি হয়তো তিরিশ বছর আগেকার এক হোস্টেলের ঘরের মধ্যে ফিরে যাবো।

যেমন আচমকা আমি চিলের কথা বলেছি, তেমনি দ্রুত এক স্মৃতি-জাগানো উত্তর।

আরও কিছু কথার পরে আমি উঠে পড়লাম। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এবারে বাড়ি ফিরতে হবে, ওকেও যেতে হবে অনেক দূরে সেই মানিকতলায়। কিন্তু, চিলের কথাটা কেন আমি বললাম—ভাবছিলাম বাড়ি ফেরার সময়— চিলের ডাক তো আমি কতোকাল শুনিনি।

তারপরে বাড়ি ফিরেছি। খাওয়ার পাট চুকিয়ে জানালার কাছে বসেছি, তখনই মনে পড়ল আবার সেই কথাটা। এখানে বসেই তো আগে আমি চিলের ডাক শুনতে পেতাম! কিংবা বিছানায় শুয়ে কোন কোন ছুটির দুপুরে। আমার সামনে যে আকাশটা আজ ভাদ্রের রোদে জ্বলজ্বল করছে ওখানে আগে সামনের বাড়ির একটা নারকেল গাছ পাতা নাড়িয়ে দুলতো, দীর্ঘ সেই গাছটার মাথায় দুটো চিল বাসা বেঁধে অনেকদিন ছিলো—এই গলিগঞ্জে, কলকাতায় অতীব বেমানান. নিতান্ত অসভ্য—কাঁটাহাড় কাঠকুটো ফেলে তারা এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদ-উঠোন নোংরা করে নিতো; আর মাঝে মাঝে দুপুরে তাদের তীক্ষ্ম শব্দ ভেদ করে চলে যেতো এ-পাড়ার শান্ত আমেজ।

কিন্তু আমার ভালো লাগতো। ডাকটা আমাকে অনেক দূরের ছেলেবেলা আর একটা দুপুরের মধ্যে নিয়ে যেতো।

সেই শব্দটা কী এখনও হচ্ছে কোথাও—কতো দূরের এক অতীতের মধ্যে থেকে—সেই দুপুর—আকাশ—চিলের ডাক...আমি কলকাতা থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গিয়েছি। বাড়ির সামনে আমাদেরই জমিতে সাঁওতাল-পাড়া। সেখানে আমাদের জন-চাষী বীরুন-সাঁওতাল আ[illegible] বাঁশের ছিলা-লাগানো একটা [illegible] তৈরি করে দিয়েছে। তীর করে[illegible]টে—একটার মাথায় লোহার ফলা লাগানো, বাকি দুটোতে শিংয়ের তৈরি মাথা। পিছনের দিকে তিন সারি চেরা-পালক সুতো আর আঠা দিয়ে সুন্দরভাবে লাগানো, তবু আমার পছন্দ নয়—ওগুলো বড্ড শহুরে জিনিস। তৈরি—মোটা, সোজা, হাল্কাও; কিন্তু বড্ড নরম। একটু জোর লাগলে নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে।

বীরেন আমাকে বোঝায়—ই অনেক দিন চলবেক, তুরা তো শোহোরকে থাকিস, তীর ধনেক আর কতো ছুঁড়বি।

না, না আমি অনেক ছুঁড়বো। তুমি জানো না, আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড়ো মাঠ আছে, সেখানেই ছুঁড়বো, কোনো একটা শক্ত জিনিস দিয়ে করে দাও।

বীরেন ভাবতে থাকে।

আচ্ছা, কঞ্চি দিয়ে করলে কী হয়?

সী কী ই গাঁয়ের কঞ্চিতে হবেক। কিন্তুক আরেক রকম বাঁশ ছিলো—সীটা ই দেশে তো মিলবেক নাই।

আমাদের কথায় কাছাকাছি আরও দু-জন সাঁওতালপাড়ার পুরুষ। মেয়েরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। বীরেনের বৌ একটু দূরে খেজুরপাতার তৈরি চাটাইয়ে সিদ্ধ ধান শুকোতে দিচ্ছে, তার কিশোরী মেয়েটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার ধনুকে তীর লাগিয়ে ছিলে টানা দেখছে; আমাদের কথাও সে শুনছিল নিশ্চয়—এগিয়ে এসে বীরেনকে কী যেন বলল। সাঁওতালী ভাষা আমার জানা নেই, তবু কথার ভাবে মনে হল সে যেন এই তীরের বিষয়েই কিছু বলছে।

ও কী বলছে রে? —আমি প্রশ্ন করি বীরেনকে।

বলছে যী আছেক একটা, উ দেখেই এসেছেক, কিন্তু সী তো ই গাঁয়ে লয়, অনেক দূর, কে আনবেক?

ঠিক তখনই কী, তীর কেমন হয়েছে দেখি—বলতে বলতে আর একজন মানুষ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সে আমারই এক-রকম কাকা-পানুকাকা। আমারই বয়সী বলে আমাদের মধ্যে তুমি ডাকের সম্পর্ক, গ্রামেই সে বরাবর থাকে; কাল আমি এখানে পেঁছোনোর পর থেকে সারাদিন প্রায় তারই সঙ্গে কেটেছে—বলতে গেলে আমার এ-গাঁয়ের গাইডই এখন সে।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে সে বীরেনকে বলে—তা তোরা কেউ গিয়ে কেটে এনে দে না!

কিন্তুক ই গাঁয়ে তো লয়। আর ঝাড় সী যদি—

ভিন্-গাঁয়ে অচেনা লোকের ঝাড়ে কঞ্চি সত্যিই ওরা কাটতে পারে না। সেকথা বুঝে পানুকাকা একটু চুপ করে যায়, তারপর আমার দিকে ফিরে বলে—চলো, আমরাই গিয়ে কেটে নিয়ে আসবো, কিন্তু দুপুরের খাওয়া হলেই বেরিয়ে পড়তে হবে, দূর তো কম নয়—যেতে আসতে চারক্রোশ—পারবে তো অতোটা হাঁটতে।

পারবো না মানে? —আমি প্রতিবাদ করে উঠি।

কথা আর না বাড়িয়ে সে ঘুরে বীরেনের মেয়েকে প্রশ্ন করে—ঠিক কোন্ জায়গায় বল্‌তো ঝাড়টা?

বাঁকা পার হয়ে পশ্চিমে গাংপুরের কাছাকাছি একটা গ্রামের দক্ষিণে এক জঙ্গলের মতো জায়গায় একটা বড়ো আম-গাছের কাছাকাছি সেই ঝাড়টা—সে নিশানা দেয়। পানুকাকার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু আমি একটু অবাক হয়ে ভাবি—এতে সে কী করে খুঁজে বের করবে? তবে ওটা আমার চিন্তার বিষয় নয়। আমার শুধু একটু তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছানো দরকার। বলে উঠি—দুপুর তো প্রায় হয়েই এল, এখনই খেয়ে বেরুলে হয় না?

ও একটু হাসে—আমরা কি তোমাদের মতো শহরের লোক যে সকাল দশটায় সব খাওয়া দাওয়া শেষ? তবে দেখি, আজ বৌদিকে তোমার নাম করে বললে কী হয়!

তাড়াতাড়ি রান্নার কথাটা বলতেই হয়তো সে বাড়ি চলে যায়, আমি তীর-ধনুক নিয়ে হাঁটা দিই বড়ো-পুকুরের দিকে। আমাদেরই বংশের কোন এক বড়বাবুর কাটানো—তাঁরই নামের ওই বিশাল পুকুরটা যেন দীঘির মতো বড়ো। পাড়গুলোও তেমনি চওড়া। আর অনেক কালের পতিত হওয়ায় ওদিকে মানুষের আসা-যাওয়া খুবই কম। তীর ছোঁড়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা ওটাই এ গাঁয়ের মধ্যে।

পাড়ের ওপরে সারি সারি বাবলাগাছের মধ্যে কোন একটাকে বেছে নিয়ে তার গুঁড়ির এক জায়গায় ওপরে নিচে দুটো কাল্পনিক রেখার মাঝখানে লক্ষ্য করে আমি তীরগুলোকে ছুঁড়তে থাকি। সবগুলো তীরই ছোঁড়ার পরে সেদিকে হেঁটে গিয়ে তীর কুড়িয়ে আবার অন্যদিকে ছুঁড়ে দিই—, এমনিই চলতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। তার-পর এক সময় খাওয়ার ডাক এল।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে দু-জনে দুটো কাটারি নিয়ে আমরা সেই তলতা-বাঁশের ঝাড়ের জন্য চলেছি। আমাদের খামারবাড়ির পিছন-দরজা দিয়ে বের হলেই আর একটা পুকুর—তালবনা। তার নিচে গ্রামের দক্ষিণ মাঠ। মাঠের ওপারে মাইল-খানেক দূরে বাঁকা-নদী। সেটা পার হয়ে কোথায় যেন সেই অজানা জায়গা যেখানে আমাদের অভিযান।

তালবনা একটা সুন্দর ছোট্ট পুকুরটার চারদিকে সীমানার ধারে সারি সারি তাল-গাছ—সেজন্যই হয়তো এই নামকরণ; কিন্তু এটার পাড়ের ওপর বাবলাগাছও কিছু কম নেই। তার কাঁটাগুলোও সব জায়গায় এমন ছড়িয়ে আছে যে খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়—কাল বিকেলেই তো এখানে আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটে গেছে। সেই কথা মনে পড়ায় মাটির দিকে তাকিয়ে আমি হাঁটছি, তখনই দুপুরটা যেন চমকে উঠল হঠাৎ—

তীক্ষ্ম এক কান্নার মতো শব্দ আকাশ থেকে নামছে, মাঠের ওপর দিয়ে, আকাশের মধ্যে দিয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে দুপুরের মর্মভেদ করে চলেছে দূরে—চলেছেই।

আমি থমকে দাঁড়াই—ওটা কিসের ডাক?

—ও একটা চিল—পানুকাকা বলে।

আমি অবাক হয়ে যাই। চিল, চিলের ডাক! সেই যে কলকাতার আকাশে কাকের মতো, কিন্তু অনেক বড়ো একরকম পাখিকে আমি কতো উড়তে দেখেছি এইরকম তার ডাক? ডাকটা থামলো কেন? আবার ডেকে উঠুক চিলটা, আমি আর একবার শুনবো।

পানুকাকা কথা শেষ করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। কিছুটা দূরে গিয়ে সে বুঝল যে আমি তার সঙ্গে চলছি না, থেমে দাঁড়িয়ে বলল—কী, কাঁটা ফুটলো নাকি?

কাঁটা নয়। এ অন্য কিছু। ডাকটার রেশ আমার মনের মধ্যে চলেছে—যে কোনো স্বপ্নের দেশ থেকে ভেসে ভেসে আসছে—খুব করুণ সুরে কে যেন তাকেই কেঁদে কেঁদে ডাকছে যে দূর থেকে শোনে, কাছে আসতে চায়, তবু পারে না কিছুতেই—

কিন্তু এমনি একটা কথা ওকে বলা যায় না। বলে উঠি—এই পুকুরটা একটু দেখছি।

ওটায় তোমাদের দু-আনা ভাগ আছে। এখন চলে এসো তো; কতো দূরে যেতে হবে জানো?

সত্যি, তীরের বিষয়টা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম—সেটাও কম জরুরী নয়। চিলটাও আর ডাকছে না। দ্রুত পা চালিয়ে আমি ওর কাছে চলে যাই যেখানে পাড়ের সীমানায় সেই তালগাছের সারি। দুটো গাছের মাঝখানে আমরা হাঁটছি, তখনই আবার সেই চিলটা ডেকে উঠেছে, তেমনি আগেকার মতো সুর—শুধু আরও একটু করুণ—যেন যাকে ডেকেছিল সে সাড়া দেয় নি, দিতে পারে নি। পারবে না তাও যেন জানা—তাই আরও করুণ সুরে শুধু ডেকে ডেকে যাওয়া—

আমি মুখ তুলে খুঁজছি কোন্ গাছটা থেকে সে ডাকছে, কোন্ পাতার মধ্যে বসে আছে, কিন্তু দেখা যায় না—শুধু সবুজ পাতাগুলো এক রোদ-জ্বলজ্বলে আকাশের নিচে অল্প অল্প কাঁপছে, তালগাছের কালো গুঁড়িগুলো যেন মোটা মোটা গোল থামের

মতো আকাশ পর্যন্ত উঠে তাদের মস্ত হাতগুলো দিয়ে আকাশটাকে তুলে ধরে রেখেছে—এগুলো যদি না থাকতো তাহলেই ওটা যেন মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তো।

চমকে উঠি পনুকাকার গলার শব্দে —আবার তুমি থামছো? এখানে এতো দেরি করলে দেখো শেষে হয়তো কপি না নিয়েই ফিরে আসতে হবে।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে দিই ওর দিকে। মাঠের মাঝখানে খোপাকুপি ও হেঁটে চলেছে; কিন্তু আমার শহুরে পায়ে এই ফাটা ফাটা গরম মাটিটা যেন কাঁকরের মতো ফুটছে: তার কাটা ধানের শক্ত গোড়ায় পা লাগলে যেন শিরিষ কাগজেই আঙুলগুলো ঘষে ঘষে যাচ্ছে। সামনের আলের উপর উঠতেই আমি বলে উঠি—এবারে আলের ওপর দিয়ে চলো, উঃ মাটিটা যা শক্ত!

হুঁ, বাব্বা! এ হলো এ'টেলমাটি—খাঁটি এ'টেল! শুকোলে পাথরের চেয়ে একটুও কম নয়!

খুবই খারাপ মাটি তো?

বলো কী? এ'টেলের মতো ধান আর কোন্ মাটিতে হয় বলতে পারো?

আমার কাছে নিশ্চয়ই সে কোন উত্তর চায়নি। ও যখন বলছে মেনেই নিই আমি—তবু মাটির দিকে তাকিয়ে দেখি—এখন সাতাই পাথরের মতো—তেমনিই কালচে হলদে রং শুধু তফাৎ ইকড়ি বিকড়ি ফাটলগুলো। সমস্ত মাঠটা যেন টুকরো টুকরো কেটে গিয়েছে—তার মধ্যে ওই কাটা ধানের গোড়াগুলো একদিনের সবুজের স্মৃতি নিয়ে এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু ওইসব ফাটল আবার একদিন বৃষ্টিতে ভিজে বন্ধ হয়ে যাবে, এই মাঠ সবুজ হয়ে উঠবে, অনেক ধান ফলাবে—আজ দেখে তা যেন বিশ্বাসও করা যায় না। এবারে একবার বর্ষাকালে আসব গ্রামে মনে মনে ভাবি।

পনুকাকা আমার কথায় এখন আলের ওপর দিয়ে হাঁটছে। সে এবারে এই মাঠের সব জমি আমাকে চেনাতে সুরু করেছে—এইটে তোমাদের জমি, তিন বিঘে দু ছটাক—খুব ভালো জমি, বৃষ্টি ঠিক হলে বিঘেয় ষোল মণের বেশি ধান হয়। আর, এইটে হলো কোঙারদের—দু বিঘে নছটাক। ওটাও খুব ভালো কিন্তু তোমাদেরটার মতো নয়।

কথা বলতে বলতে আলের ওপর দিয়ে শুকনো ঘাস মাড়িয়ে, ধুলো ছিটিয়ে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে পনুকাকার পিছনে ঘুরে ঘুরে আমি চলেছি। দূরে কোন্ একটি জমির দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে—ওই যে দেখছো, একটা উঁচুমতো আল, তার দক্ষিণের জমিটাও তোমাদের—আড়াই বিঘে—একটু নাবাল, কম বৃষ্টিতে খুব ভালো ধান হয়—

আমি অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাই ভাবছি—এই বিশাল প্রান্তরের মতো মাঠের অগুনতি ওইসব আলে ঘেরা ছোট ছোট জমি যা আমার কাছে সব একই রকম লাগছে—তারই মধ্যে ও কি করে সব জমি চিনে নিতে পারছে? আর এগুলোর কতো খবরই ওর জানা! আমি তো সারা জীবন এখানে থাকলেও একরকম পারতাম না।

পনুকাকা আরও কী যেন বলছে, কিন্তু আমার সামনে এই মস্ত মাঠের ওপারে অনেকক্ষণ আগেকার নদীর চিহ্নে সেই দীর্ঘ সবুজ রেখাটা ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠে এবারে তার মধ্যে থেকে গাছ বেরিয়ে এসেছে। আরও কাছে নদীটা। খুব কাছে নদীর বন। এখনই আমি একটা নদী দেখতে পাবো—সত্যিকারের নদীর মতন। বাঁকা-নদীর যে দিকটা আমি গ্রামের পথে আসার সময় পুলের ওপর থেকে দেখেছি সেখানে শুধু ধানের আড়ৎ, ধানকল—তার বাইরে জমাকরা পাহাড়ের মতো ছাইয়ের গাদা, আর শুধু মানুষের বাড়ি-ঘর। অমনি এক ঘিঞ্জি জায়গায় মধ্যে নদীটাকে কিছুতেই নদীর মতো লাগে না।

—দ্যাখো, এখানে কিন্তু আর এ'টেল নেই, সবই শুনো জমি—আলু আখ কলাই এইসব হয়। তোমরা কিন্তু শুনোয় ফসল কিছুই পাও না বলতে গেলে। অতো যে শুনো জমি তোমাদের—

বলে একটু থামে সে, তারপর বলে—ভাগে কী আর শুনোর চাষ হয়!

শুনো নামটা কেমন যেন সুন্দর লাগছে, কিন্তু আমি জানি যে দোঁয়াশ মাটিকেই ও শুনো বলছে, ভাবলাম সে কথা ওকে বলি, কিন্তু নদীর দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ ওকে অবাক করে একটা ছুট দিয়ে আমি তার পাড়ের ওপর গিয়ে উঠি।

এক মুহূর্তে একটা বনই আমার চোখের সামনে—কতো রকমের গাছ গুল্ম লতা। সব এক জায়গায় ভিড় করে নিচে ওপরে এখানকার সমস্ত জায়গা সবটা মাটি ওরা এখানকার সমস্ত জায়গা সবটা মাটি ওরা দখল করে নিয়েছে—ওদের মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি দিকে যারা এগিয়ে গিয়েছিল তাদের খোলা ডালপালাগুলোকে বেড়া বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নদীর দিকে আলগাভাবে—এখানে সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—তারা বাড়িয়ে নদীটার জলই যেন ছুঁতে চাইছে তারা। ঘন গাছের পাতায় পাতায় ওখানটা ছায়া ছায়া অন্ধকার—তার আড়ালে জলটা চোখে পড়ে না ওখান থেকে—গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে আমি জলটা দেখতে চাইছি, তখনই চোখ পড়ে—আরে! এ কী! ওখানে বনের মধ্যে সেই আশ্চর্য লতায় ফুলটা একটা গাছের মাথায় কতো জায়গা জুড়ে আছে!—সেই যে নীল ময়ূরকণ্ঠী পাপড়ির মাঝে ছোট একটু হলদে ছিট-এর ফুল—যে লতাটা আমি কলকাতায় আমাদের পাড়ার একটা বাড়ির গেট-এর মাথায় কতো যত্ন করে তুলতে দেখেছি, শুনেছি অনেক দাম, কী-যেন একটা গালভারি নাম, কিন্তু এখানে এই বনের মধ্যে যে নামহীন সে নিজেই একটা গাছের মাথায় ছড়িয়ে এ-রকম ফুল ফুটিয়ে রেখেছে!

ওই লতাটার কোন চারাও হয়তো ওর কাছাকাছি আছে। আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। এক ডাল সরিয়ে জায়গা করে আর একটু ভিতরে গিয়ে আরও একটা ডাল সরাতে যাচ্ছি, চমকে উঠলাম—সাপ!
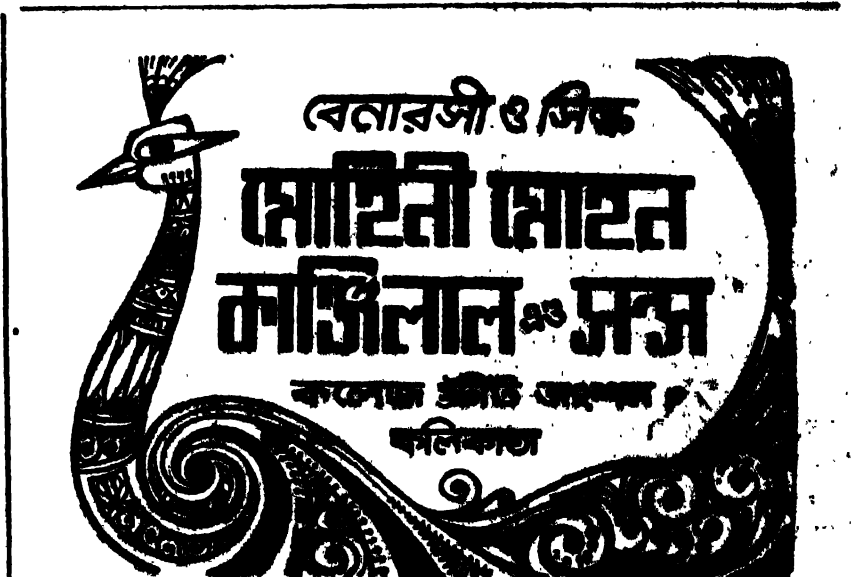
পনুকাকা সাবধান করছে—আরে সাপ! যাচ্ছো কোথায়? ওখানে দারুণ সাপ!

আমি থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সাপ দেখা যায় না, শুধু পায়ের নিচে মাটি—আড়াল করা ঝোপ আর শুকনো ডালপালা। ওখানেই কী সাপ যা পনুকাকা বলছে?

পনুকাকা বলে উঠে—চলে এসো, এত নদীর ধার তায় আবার গ্রীষ্মকাল, বনের মধ্যে ও-রকম কখনও ঢুকবে না।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তবু মনটা খারাপ হয়ে গেছে— সাপের কথায় ভয় পেয়ে লতাটার একটা চারা খুঁজে দেখা হলো না।

—চলো এবারে, নদীটা পার হতে হবে— বলে ও বাঁ-দিকে ঘোরে। একটু এগিয়ে

দু-পাশে ছোট ছোট গাছের মধ্যে দিয়ে মানুষের হাঁটা-পথ দিয়ে এগিয়ে চলে। এখানে গাছ অন্যরকম—আমি দেখি। মানুষের চলার পথটা সব সময়ই অন্যরকম হয়।

সামান্য একটু হাঁটার পরেই আমরা এক আশ্চর্য সাঁকোর সামনে চলে এসেছি। আমি অবাক হয়ে দেখছি, শুধুই বাঁশ দিয়ে তৈরি এই অদ্ভুত সাঁকোটাকে—নদীর এপারে ওপারে বাঁশের খুঁটি মাঝখানেও কীভাবে যেন বাঁশ পুঁতে, তার গায়ে বাঁশ বেঁধে এক সেতু তৈরি হয়েছে যার ওপরে ধরে চলায় জন্য বাঁশের একটা হাতলও করা আছে।

পনুকাকা সাঁকো দিকে এগিয়ে যায়। আমিও ওর পিছন পিছন তার ওপরে উঠছি, ও বলে ওঠে—না, দুজনে একসঙ্গে নয় আগে আমি পার হই, তারপর তুমি উঠবে। না হলে দুলে উঠে একেবারে নিচে ছিটকে পড়তে হবে।

সাঁকোটা পার হয়ে গিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে সে বলছে—দেখো, খুব সাবধানে কিন্তু, না দুলে যায়, দেখো—

আমি আস্তে আস্তে সাঁকোর ওপরে উঠে সাবধানে পা ফেলি। বাঁশগুলো সবশুদ্ধ দুলতে শুরু করেছে, আমার একটু ভয় ভয় লাগছে, কিন্তু সাঁকোটা আমি পারও হয়ে গেলাম। ওপারে পৌঁছোতেই পনুকাকা বলে ওঠে—বেশ তো পেরিয়ে এলে; তুমি ঠিক শহরের ছেলের মতো নও!

—কেন; শহরের ছেলে কী রকম?

উদাহরণের গল্পটা সুরু করেছে সে—আমাদের গ্রামেরই এক বাড়ির আত্মীয় এক-জন কলেজে পড়া ছেলে সাঁকো পার হতে গিয়ে কি-রকম জলে ছিটকে পড়েছিল তারই কাহিনী।

গল্প শুনতে শুনতে চলেছি, এ-কথা সে-কথা বলছি আমিও। গল্প বদল হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা স্তব্ধতায় শুধু পথ পেরিয়ে যাওয়া মাঠের মধ্যে দিয়ে, কাশবনের ফাঁকে ফাঁকে হাঁটা-পথ দিয়ে, রেল-লাইনের ওপর উঠে স্লীপার পায়ে পায়ে, কিছুটা পরে নেমে আবার মাঠের ওপর, দক্ষিণ-পশ্চিমে আমার অচেনার মধ্যে দিয়ে অনেক পথ: একটু সন্ধান শেষটায়, তার পরেই হঠাৎ এক বিস্ময়ের বাঁশ-ঝাড় একটু বনের মতো জায়গায়।

দ্যাখো, দ্যাখো, এই যে!—আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

এ একেবারে অন্যরকম বাঁশ। একেবারে সোজা লম্বা-লম্বা গাঁট। কঞ্চি নিচের দিকে প্রায় নেই বললেই হয়। পাতাও খুব কম। ঠাসা ঘন ঝাড়টা যেন বিশাল এক আখের বোঝার মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

ঝাড়ের দিকে কাটারি নিয়ে এগোতে গিয়ে হঠাৎ থেমে আমি বলি—একটু দেখলে হয় না কাদের ঝাড় তাদের না বলে—

আরে, কে কী বলবে! এ তো গাঁয়ের বাইরে। আর শুধু কঞ্চিই তো কাটতে এসেছি আমরা—বাঁশ হলে না হয় কথা ছিলো।

কিন্তু যদি—ধরো—

কেউ কিছু বলবে না, আর তোমার বাবার নাম শুনলে তো—

বাবার নাম! বাবাকে ওরা কী করে চিনবে?

বাঃ চেনে না! এখানে সবাই সবাইকে চেনে—অমুক গাঁয়ের অমুক, অমুকের ছেলে অমুক—তা সে এখানে থাকুক বা শহরেই চলে যাক—

আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই। পনুকাকা এসব বিষয়ে ভুল কিছু বলবে না। কঞ্চি কাটতে এগিয়ে যাই—একটু অস্বস্তি তবুও মনের মধ্যে, তারপর ভুলে যাই। নিচের দিকের সব কঞ্চি শেষও হয়ে গেছে।

এতো অনেক কঞ্চি হলো— পনুকাকা বলে ওঠে।

তখন আমি বাঁশ বেয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি। বলে উঠি—দেখেছো, ওপরের দিকে কতো ভালো ভালো কঞ্চি।

আরে, আরে, করছো কী? পড়ে যাবে; এই নরম বাঁশে কখনও ওঠা যায়?

সত্যিই বাঁশগুলো নরম। একসঙ্গে দু-তিনটে বাঁশের ওপর-ভর দিয়ে তবেই উঠতে পারা যায়। আমি উঠে যাই কোনমতে। ঘন ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি বাইরের বাঁশ ঠেলে সরিয়ে। তারপরে কঞ্চি। এ-বাঁশ ও-বাঁশ টেনে, ফাঁকে ফাঁকে গলে, এদিকে ওদিকে ঘুরে নাগালের মধ্যে সমস্ত কঞ্চি এক সময় কাটাও হয়ে গেল। আমি নিচে নেমে এলাম।

পনুকাকা তখন সেগুলোকে জড়ো করছে এক জায়গায়। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি একটা গেছো বটে! কিন্তু এতো কঞ্চি এখন নিয়ে যেতে পারলে হয়।

কঞ্চিগুলোর দিকে তাকাই। সত্যি, মন্দ হয়নি। ওগুলো কাটার উত্তেজনা কমেও এসেছে, হাত পা জ্বালা করছে এবারে: তাকিয়ে দেখি—ওই ঝাড়ের মধ্যে কিসে কখন লেগে হাত পা সবই ছড়ে আঁচড়ে গিয়েছে অনেক জায়গায়, শুধু ডান হাতের কব্জির ওপরে কিছুটা রক্ত ফুটে বেরিয়েছে। সার্টের কোনাটা তুলে নিয়ে আমি সেটাকে মুছে নিচ্ছি, তখনই চোখ পড়ে গিয়েছে ওর।

দেখি, দেখি কতোটা কাটলো? —বলে এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরতে যায়—তখনই বললাম যে উঠো না!

শার্টটা ছেড়ে দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে বলি—ও কিছু নয়, একটু ছড়ে গিয়েছে।

আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে তাকিয়ে সে আবার কঞ্চির কাছে ফিরে যায়। সেগুলো গোছাতে গোছাতে বলে ওঠে—তোমার আর কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই তুমি থেকে যাও।

কঞ্চিগুলোকে গুছিয়ে দুটো সমান ভাগ করে বাঁধার জন্য সে লতা খুঁজতে চলে যায়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের জায়গাটা দেখছি, একটা প্রশ্নও মনের মধ্যে এসে গেছে—আচ্ছা, এই রকম একটা জায়গায়, আমাদের গ্রাম থেকে এতো দূরে এই বাঁশ-ঝাড়টার কথা বাঁরুনের মেয়েটা কী করে জানল?

পনুকাকা ফিরে আসতেই তাকে প্রশ্নটা করি। ও উত্তর দেয়—কে জানে! হয়তো জ্বালানি-টালানি কাটতেই এদিকে এসেছিল, কিংবা অন্য কিছুও হতে পারে! ওরা তো সাঁওতাল, গ্রামে এসে চাষ করলেও বন-জঙ্গল কোনদিন ভোলে না।

জ্বালানি কাটতে? এতো দূরে?

আমার প্রশ্নের সুরটা হয়তো ওকে অবাক করেছে, আমার মুখের দিকে সে আবার তাকিয়ে আছে, তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে—কী করবে, যাদের কয়লা কেনার পয়সা নেই, নিজেদের গাছ নেই, তাদেরও তো রাঁধতে হয়।

আমি চুপ করে যাই। মনটা কেমন যেন লাগে।

লতা দিয়ে বেঁধে সত্যিই দুটো চমৎকার বোঝা তৈরি হয়েছে। দুজনে সে-দুটোকে তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে বলতে পৌঁছে যাই বাঁকা নদীর সেই সাঁকোটার কাছে। এবারে আমি প্রথমেই ওতে উঠেছি, ভয় করছে না, হিসাবটা জানা হয়ে গেছে—হাঁটলে সাঁকো দুলবেই, শুধু সেই দোলানির তালে তালে পা ফেলে চলতে হয়।

তালবনায় পাড়ের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়াই। এখানেই সেই চিলটা ডেকে উঠেছিল, অনেকক্ষণ থেকে আবার সেটা শুনতে চেয়েছি, কিন্তু এখনও ডাকেনি। পনুকাকার দিকে ফিরে বলি—এখানে একটু বসে গেলে হয় না?

খুব এলিয়ে গিয়েছো, না? উঃ যা রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গেল।

বলতে বলতে সে বোঝাটা পাড়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলেছে। আমিও আমার বোঝা নামিয়ে দিই। কঞ্চির ওপরে আমরা দুজনেই বসে পড়ি। কোঁচার খুঁটটা আলগা করে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে সে বলে—বলো তো আজ তাতটা কী রকম? তোমাদের কলকাতায় শুনেছি এতো গরম পড়ে না—

কথাটা ও হয়তো ঠিকই বলেছে, কিন্তু আমি চিলের কথাই ভাবছিলাম। বলে উঠি—আচ্ছা, চিলটা আর ডাকছে না কেন বলতে পারো?

চিলটা? কোন্ চিলটা?

সেই যে যাবার সময় এখানেই ডাকছিল যেটা? কেন তুমি শোনোনি?

ও তো রোজই ডাকে দুপুরে। আজ কিন্তু আর ডাকবে না।

কেন?

চিল দুপুর ছাড়া ডাকে না—বলে আমার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রশ্নটা করে—চিলের কথা নিয়ে এতো ভাবছো কেন বলো তো?

এমনিই—আমি বলি ওর মুখের দিকে চেয়ে। আমারও মনে একটি প্রশ্ন—রোজ শুনলেই কি চিলের ডাকের সেই করুণ সুরটা মানুষের কাছে হারিয়ে যায়? না কি আর কিছু?

কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার যখন সাঁওতালপাড়ায় এসে ঢুকলাম, তখন রোদ চলে গিয়েছে, তবু দুপুরের রোদে-তাড়ানো মানুষগুলো তখনও ঘরের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসেনি। শুধু বীরুনের সেই মেয়েটা একটা মুরগীর পিছন ছুটে একটা ঘরের আড়ালে চলে যাচ্ছে দেখলাম।

পনুকাকা ডাক দিল—বীরুন আছিস্।

সে উত্তর দিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। আমাদের দুজনের হাতে কণ্ডির বোঝার দিকে একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—ই যে অনেক কাণ্ড এনেছিস্।

বলতে বলতে সে এগিয়ে আসছিল, তারপরে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে—দাঁড়া, তুদের বসার উটা নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি সে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটা বাঁশের খাটিয়া নিয়ে—পায়া, ঘেরা সবই বাঁশ দিয়ে তৈরি, তাতে কী এক রকম ঘাস বা ঘাসের মতো দেখতে কিছু একটা দিয়ে পাকানো দড়িতে সুন্দরভাবে বোনা—এটাতেই সে আমাকে কাল এবং আজ সকালেও বসতে দিয়েছিল।

বসা আমার দরকারও ছিল। সারাটা দুপুর রোদ মাথার ওপর দিয়ে গেছে, পথও কম হাঁটিনি আমরা। বসে পড়ে পনুকাকাকেও বসতে বলি। কিন্তু ও এখন বসবে না। চায়ের কথা বলতে বাড়িতে যাবে।

সে বাড়ি চলে গেছে। কণ্ডির দুটো বোঝাই খুলে ফেলা হয়েছে। খাটিয়ায় বসে বসেই আমি কণ্ডি বাছাই করছি, বীরুনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার হিসাবটা—এটাতে দুটো তীর হবে। আর, এইটায় মোটা দিকটা কেটে ফেলে শুধু একটা তীরের মতো রাখবে—এমনিই সব হিসাব।

এতক্ষণে আমাদের আশেপাশে সাঁওতালপাড়ার আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে—সবারই চোখেমুখে একটু কৌতূহল—যেন এরকম একটা ব্যাপার তারা আগে কখনো দ্যাখেনি। বীরুন আমার হিসাবটা বুঝেছে, কণ্ডিগুলো ভাগ ভাগ করে রাখছে, তার পিছনে কয়েকজন পুরুষ, বাঁদিকে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন নারী—বীরুনের মেয়েটাও তাদের মধ্যে আছে। ওরা সবাই আমাদের কণ্ডির দিকে দেখছে আর নিজেদের ভাষায় কী যেন বলাবলি করছে। ভাষাটা না জেনেও বেশ বোঝা যায় যে, এই কণ্ডি অথবা তীরের বিষয়েই কিছু বলছে ওরা।

কণ্ডি ভাগ হচ্ছে, গোনা চলছে, আরেকজন সাঁওতাল বীরুনের পাশে এসে আমাদের কাজে হাত লাগিয়েছে, মেয়েদের কথার গুঞ্জন আসছে, সেতারের মতো টুং-টাং সাঁওতালী ভাষায়—তারই মধ্যে হঠাৎ একটা হাসির শব্দ উঠেছে। কী নিয়ে হাসছে দেখতে আমি তাদের দিকে তাকাই।

আর, ঠিক তখনই যেন কথা বলতে বলতে থেমে গেছে বীরুনের মেয়েটাই। সে হাসছিল—হাসিটা মুখে লেগে রয়েছে এখনও। কিন্তু কেন? কী বলছিল ও? ওর চোখে চোখ রেখে বলি—কী বলছিলি রে?

হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গিয়েছে সে—চোখেমুখে এক লজ্জা-মাখা অন্যায়ের ভাব। আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে একটু পিছিয়ে যায়। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তো! কী বলছিল যে—আরেকটু জোরে আমি বলে উঠি—বল্ না, কী বলছিলি?

তবু ও উত্তর দেবে না। মুখের চেহারাটা যেন অনেক বদলে গেছে। শুধু ওরই নয়, সবাইকার। আর স্তব্ধতা।

আমার বিস্ময় বেড়ে বেড়ে উঠছে—কী এমন কথা ও বলছিল যে হঠাৎ এরকম—অন্য মেয়েদের দিকে চোখ ফিরিয়ে আমি বলি—এই, তোরা বল্ না, ও কী বলছিল রে?

একটু সময় তারাও চুপ করে আছে। শেষে উত্তর দেয় একটি বয়স্কা মেয়ে—শম্ভু সাঁওতালের বৌ—উ বুলছিল যী মুনিবটা যেন ঠিক সাম্তাল!

একটা কালো মেঘ সরে গিয়ে যেন হঠাৎ থলবল করে রোদ বেরিয়ে এসেছে—আমি হেসে উঠে বলি—তাহলেই তো সবচেয়ে ভাল হতো!

বলে বীরুনের মেয়ের দিকে তাকাই। কিশোরী। পুঁইডগার মতো শ্যামলা—সতেজ। কালো চকচকে চামড়া। গলায় রঙিন পুঁতির মালা, খোঁপায় কী একরকম নাম-না-জানা ফুল। মুখ ঘুরিয়ে সে এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

উদিত সূর্যের দেশে

কমলা মুখোপাধ্যায়

বর্তমানের 'অরুণাচল'—যাকে কিছুকাল আগেও নেফা বলা হোত, সেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল হয়তো আমাদের কাছে অপরিচিতই থেকে যেত যদি না ১৯৬২ খৃঃ ঐ অঞ্চলে ভারত-চীন সংঘর্ষ ঘটত। আজ থেকে ৭০০—৮০০ বছর কাল ধরে এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে গিরিকন্দরে, গুহাতে, নদী উপত্যকায় যে সব পার্বত্য উপজাতি ও গোষ্ঠী বাস করছে, তাদের বিষয় আমরা কতটুকুই বা খবর রাখি? অথচ এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমারেখার ও প্রতিরক্ষার গুরুত্ব বিচার করলে বলা যায় এই সব পার্বত্য উপজাতিগুলিই এক হিসাবে আমাদের সীমান্ত প্রহরীর কাজ করছে!

ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে এর অবস্থিতি একখানি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কোনমতেই একে উপেক্ষা করতে পারি না। ভুটান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশের সঙ্গে তিনদিক দিয়ে এ অঞ্চল ভারতের সীমা নির্দেশ করছে। উচ্চ হিমালয় গিরিশ্রেণী ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ঢালু হয়ে লোহিত জেলায় শেষ হয়েছে তারপর সুরু হয়েছে দক্ষিণ পূর্বাভিমুখী পাতকোই পর্বত শ্রেণী— যার অপর দিকে ব্রহ্মদেশ। ভুটান সীমান্ত থেকে সুবনসিরির লংজু অবধি পর্বতের উচ্চতা ১৮০০০—২১০০০ ফুট তারপর গেলিং সীমান্তে কারবোর কাছে, যেখানে সানপো নদী ভারতে প্রবেশ করেছে, সেখানে এর উচ্চতা ১৬০০০—১৭০০০ ফিট। তিহাং ও লোহিত নদীর মাঝে গিরিশৃঙ্গগুলির উচ্চতা ৯০০০ থেকে ১৯০০০ ফুট। এর লোহিত জেলায় প্রকৃতির রূপ ভয়ঙ্কর, কোথাও গভীর গিরিখাদ, কোথাও সুউচ্চ পর্বত খাড়াভাবে উঠে উঠেছে। এক পর্বত শ্রেণী থেকে অন্য পর্বত শ্রেণী বা উপত্যকায় যাবার কোনও সোজা রাস্তা নেই তাছাড়া মাঝে মাঝে রয়েছে অসংখ্য পার্বত্য নদী—যেজন্য বিভিন্ন উপজাতিগুলির মধ্যে মেলামেশা ও সৌহার্দ্য কম। তিরাপ জেলায় এই উচ্চতা এসে ৬০০০ ফুটে নেমেছে। এই অঞ্চলের পার্বত্য প্রাচীর, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে অশ্বখুরাকৃতি আকারে বেষ্টন করে রেখেছে। এই উত্তুঙ্গ পর্বত শ্রেণী, গভীর গিরিখাত, ঘন অরণ্যাবৃত পর্বত কন্দর - এসবের পটভূমিকায় জীবনযাত্রা কঠোর ও রুক্ষ হলেও বিভিন্ন সময়ে, পার্বত্য নদী ও তার শাখাগুলি ধরে মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বহুদিন ধরে, বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়ে এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি, ঘন বৃষ্টিপাত, (২০০ গড় ইঞ্চি) গভীর জংগল, বন্য পশুর উপস্থিতি এদের পরস্পরের সংগে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধার সৃষ্টি তো করেছেই, উপরন্তু সমতলবাসীদের সঙ্গেও এদের বেশী সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনি। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তরে ও পূর্ব থেকে আগত অধিবাসীদের আরও দক্ষিণে আসাম প্রদেশে যাবার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে, ফলে এসব তিব্বতী-ব্রহ্ম গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এখানকার অধিবাসীদের চেহারায় বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে—এদের দেহের গঠন মজবুত ও মোটামুটি সুশ্রী নাক চ্যাপটা, গালের হাড় উঁচু, চক্ষু তির্যক ভাবে চেরা, মুখ ও দেহ রোমহীন, গায়ের রং বাদামী। এদের মধ্যে দাফলা, আপাতানী, মিগার, মিশমীদের মেয়েরা তো রীতিমত সুশ্রী। প্রধান গোষ্ঠী হল ২০টি, শাখা প্রশাখা সমেত উপগোষ্ঠীদের সংখ্যা ৭০টি। ৮১ লক্ষ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করে মাত্র ৪ লক্ষ লোক, যাদের মধ্যে কম পক্ষে ৩০ ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত—সব তিব্বত-বর্মা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোনও উপজাতি ব্রহ্মপুত্র নদী পার না হতে পারলেও পশ্চিমে সিকিম ভুটান, কোচবিহার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল—কোচ, মেচ, মুন্ডা এই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব উপজাতি গোষ্ঠী সীমান্তের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা

বাণিজ্যের মাধ্যমে সমতলের অহমদের ও সমতলবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেও ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—সেই দিক থেকে আসামের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

এই অঞ্চলের কয়েক শত বৎসরের ইতিহাস অনেকটাই কিম্বদন্তী—প্রাচীনকালের ইতিহাসের মধ্যে মহাভারতে এদের 'কিরাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য জনগোষ্ঠী ও রাজবংশের সঙ্গে এখানকার দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বহুদিন ধরেই হয়েছে তার বহু প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া গেছে। পূর্বাঞ্চলের রাজন্যবৃন্দ, এমনকি দিল্লীর সম্রাটরাও যে এখানে তাদের সভ্যতা বিস্তার বা রাজ্য জয় করতে এসেছিলেন তার নিদর্শন বহু পাওয়া গেছে। যে সব প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাতে সমতলবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য গোষ্ঠীগুলির সংঘর্ষ ও সম্পর্কের বেশ কিছুটা ধারণা করা যায়—বিশেষ করে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে এখানকার কাহিনী, নগরগুলির নাম ও তাদের রাজবংশের নাম জড়িত। কামেঙ জেলার ভারেলী বা কামেঙ নদীর দক্ষিণ তীরে ভালুকপঙে যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, এখানকার আকা উপজাতিরা দাবী করে যে ঐ দুর্গ তাদের পূর্বপুরুষ ভালুক (মহাভারতের জাম্ববান—যার সঙ্গে সামন্তক মণি ও জাম্ববতীর কাহিনী জড়িত) এর দুর্গ। এই ভালুক বা জাম্ববান ছিলেন বাণরাজার নাতি। বাণরাজা রাজত্ব করতেন শোণিতপুরে (বর্তমান তেজপুর) তিনি ছিলেন বলিরাজার বংশধর। লোহিত জেলায় সদিয়ার কিছুটা উত্তর-পূর্বে কুণ্ডিল নদীর তীরে যে সব প্রাসাদ ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে এর নাম ছিল ভীষ্মকনগর বা কুণ্ডিলনগর। রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে হরণ করতে আসেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি রুক্মিণীকে হরণ করে এখান থেকে দ্বারকায় নিয়ে যান। কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে পথে যেখানে তাঁরা বিশ্রাম করেন তাকে এখন বলা হয় মালিনীথান—এখানে পার্বতী মালিনী বেশে তাঁদের নাকি অভ্যর্থনা করেন। এখানকার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, পোড়ামাটির মূর্তি ও বাসনপত্র এখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়। ভীষ্মকনগরের কয়েক মাইলের মধ্যে বিখ্যাত তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে—যার কিছু দূরে শিবলিঙ্গ ও গৌরীর প্রতীক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে—বর্তমানে লোহিতের প্রধান শহর তেজুতে শিব মন্দির গড়ে এই সব দেবতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সুবনসিরি জেলার দইমুখের নিকট মায়াপুরে (বর্তমানের ইটা) জিতারী বংশের পলাতক রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে দাফলা উপজাতিদের এলাকায়। আর লোহিতের তীরে ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরামকুণ্ড তো আজও ভারতীয় জনগণের তথা স্থানীয় মিশমীদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলে পরিগণিত। এখানে নাকি পরশুরাম কুঠার

বৌদ্ধদের ধর্মীয় রথ

দিয়ে আঘাত করে লোহিত নদীর গতিকে উন্মুক্ত করে দেন। এই সব চিহ্ন ও প্রমাণাদি দেখলে বোঝা যায় সুবনসিরির দাফলা, লোহিতের মিশমী, সিয়াং-এর আদি প্রভৃতি উপজাতি, বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত রাজবংশদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে, না হলে বিদেশীদের পক্ষে বহুকাল ধরে ঐ সব অঞ্চলে টিকে থাকা সম্ভব হোত না—। এই সব সময়েই তারা আর্য ও ভারতের অন্যান্য রাজবংশের সান্নিধ্যে এসে তাদের কাহিনী ও সংস্কৃতি কিছুটা গ্রহণ করেছে। লোহিত জেলার মিশমীদের একটি শাখাকে 'চুলিকাটা' বলা হয়, এদেরকে 'ইদু মিশমী'ও বলা হয়। তারা বলে রুক্মিণী হরণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর ভাই রুক্মীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন কিন্তু প্রাণে না মেরে চুল কেটে তাঁকে অপমানিত করেন। মিশমীরা সেই রুক্মীর বংশধর। তা সত্ত্বেও বলা যায় আর্য বা অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদের খুব বেশী প্রভাবিত করে না।

আসাম বুরঞ্জী ছাড়াও পরবর্তী কালে মীরজুমলার সঙ্গে আগত ঐতিহাসিক সাহাবুদ্দিনের লেখায়ও এ অঞ্চলের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১২২৮ সালে অহম রাজা সুকাফা পাতকোই পর্বতের পথ দিয়ে ভারতের এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তাঁর আগেও বোরো, কাছাড়ী, বরাহী, চুতিয়া, মোলক প্রভৃতি গোষ্ঠী এখানে প্রবেশ করে রাজত্ব করেছেন—তাদের সময়েও এই সব পার্বত্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছে। তবে অহম রাজারা একটানা ৭০০ বছর রাজত্ব করেন। সুতরাং বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে একটা নীতি তাঁদের নিতে হয়েছিল প্রয়োজনের খাতিরেই তবে সমসময়েই যে সমতলবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য উপজাতিদের মারামারি লেগে থাকতো তা নয়। এটা ঠিক, এরা সমতলে এসে হানা দিয়ে, বলিদানের জন্য মানুষ চুরি করেছে, বিক্রী করেছে। জিনিসপত্র গরু লুণ্ঠন করেছে, তেমনি আবার সমতলবাসীদের সঙ্গে ব্যবসাও করেছে। অহম রাজবংশের অনেকের সঙ্গেই এদের মেয়েদের বিবাহ হয়েছে। পরবর্তী যুগে সুদূর পূর্বাঞ্চলে আরবদের বা খামটিদের যখন শাসনকার্যের বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে অহমরাজারা নিজেদের মেয়েদেরও বিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে তাঁদের মোট নীতি ছিল এই সব উপজাতিকে

সরাসরি প্রত্যক্ষ শাসনের আওতায় না আনা, তবে এদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সদ্ভাব বজায় রাখা ও এদের নিজেদের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখা। তার জন্য প্রয়োজনমত জমি, অর্থ বা জিনিসপত্র উপঢৌকন দেওয়া হত যাতে এরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে বাইরে সমতলবাসীদের উপর উৎপাত না করে। সমতল ও পার্বত্য ভূমির কোন সাধারণ স্থানে যেখানে সকলেই আসতে পারে সেই সমস্ত স্থানে—যথা সদিয়া, দইমারা, উদলাগিরি প্রভৃতি স্থানে শীতকালে বর্ষার শেষে এই মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হত যেখানে বহুবিধ জিনিসপত্র তো কেনাবেচা হোতই, উপরন্তু পরস্পরকে জানা-শোনার সুবিধা হোত। কিন্তু এদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করে শাসন ব্যবস্থায় আনা অহমদেরও ইচ্ছা ছিল না। পরবর্তীকালে ইংরাজদেরও ছিল না। দীর্ঘদিন অহম জাতি গোষ্ঠীদের পাশাপাশি থাকার ফলে সংঘর্ষ ও অন্যান্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আহমদের সঙ্গে বেশ খানিকটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নিজেদের ভাষা ছাড়া একমাত্র অহমদের ভাষাই এরা প্রায় বুঝতে পারে। যখন ১৮৩৮ সালে শেষ অহম রাজা পুরন্দর সিংহের কাছ থেকে ইংরাজরা আসামের শাসন অধিকার গ্রহণ করেন—তখন তারা অরাজক অবস্থার জন্য কিছুদিন পর্যন্ত উপজাতিদের উৎপাত ও উপদ্রব খুবই বৃদ্ধি পায়—তখন ইংরাজ শাসকরা এদের সম্পর্কে একটা 'ইতিবাচক' নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তবে মোটামুটি তাঁরাও অহম রাজাদের নীতিই বজায় রাখেন। এই অনুর্বর, পার্বত্য, রুক্ষ ও কঠিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত দুর্ধর্ষ জাতিদের নিজেদের শাসনাধীনে আনবার বিশেষ চেষ্টা করেননি তাঁরা—তাদের নিজেদের অঞ্চলেই গতিবিধি সীমিত করার নীতি গ্রহণ করেন। সেইকালে আন্তর্জাতিক সীমান্তের এই অংশে বৃটিশদের বিদেশী আক্রমণের তেমন কিছু আশংকা ছিল না। বরঞ্চ প্রাকৃতিক কঠোর ও কঠিন পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিরা যদি সীমান্তের অপরদিকের দেশ তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে 'বাফার' রাজ্য হিসাবে থাকে, তাহলে সেটাই বেশী সুবিধাজনক হবে বলে ইংরাজ শাসকদের মনে হয়েছিল। এঁরাও অহম রাজাদের মত উপহার বা 'পোসা' দিতে এবং শীতকালে যখন বর্ষার প্রচণ্ড দাপট কম থাকতো সেই সময়ে সদিয়ার প্রায় আন্তর্জাতিক মেলাতে আসতে এদের উৎসাহিত করতেন। ১৮৭৬, ১৮৮২ ও ১৯০১ সালে সদিয়াতে যে মেলাগুলি বসে, তার বিবরণ পাওয়া যায় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ও বিভিন্ন গেজেটে। এই সব মেলাগুলিতে আসতো মিরি, মিশমী, খামটি ও সিংফো উপজাতি, আবর বা আদিরা প্রথম দিকে আসেনি কারণ তখনও তারা ইংরাজ শাসকদের শত্রু বলেই গণ্য হতো। পাশীঘাটে আবর বিদ্রোহ দমনের পর এরা এদের শত্রুভাব ছেড়ে দেয় ও এই সব মেলাগুলিতে যোগ দিতে সুরু করে। এই সব মেলাগুলিতে খুব ধূমধাম হোত, মিছিল করে নৌকা সাজিয়ে ইংরাজ রাজপুরুষরা আসতেন, বাজী পোড়ানো হোত, বিভিন্ন উপজাতিদের নৃত্য-গীতও হোত। ১৮৭৬ সালে প্রায় ৩৬০০ উপজাতীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিল—। বহু ধরণের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হোত—টাটু ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, লবণ, কম্বল, ইয়াকের লেজ, মৃগনাভি, লংকা, মোম, বিষ হাতীর দাঁত, কমলালেবু, সোনা, দা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। পার্বত্য গোষ্ঠীরা প্রধানতঃ কিনতো আসামের ও বিলাতী সুতির কাপড়, সুতা, চাল পান, তামাক, পিতল-কাঁসার বাসনপত্র, ঘণ্টা, লোহার যন্ত্রাদি, লাঙ্গল প্রভৃতি। দিগারু মিশমীরা কিনতো পুঁতির মালা, খামটি ও সিংফোরা তাদের তাঁতের জন্য কিনতো সুতো, সিংফোরা কিনতো, চা, চিনি, গুড় তেল। মিশমীরা বেশ কয়েক মণ মিশমী তিতা বা কপিশ তিতা (একরকম মূল যা থেকে অসুধ তৈরী হয়) গার্থন বা গন্ধদ্রব্য শিকড়, মোম ও মৃগনাভি বিক্রী করতো। তিব্বত থেকে ব্যবসায়ীরা এসব কিনতো। দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেই অবশ্য বেচাকেনা চলতো। এই সব মেলায় নালিশ, অভিযোগগুলিও শোনা হত ও তার ফয়সালা হোত। ১৮৮২ সালে ৩০০০ মত উপজাতি উপস্থিত ছিল ও ৫০,০০০ টাকার দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

এইভাবে বিভিন্ন উপজাতিদের নিজেদেরকে জানাশোনার সুযোগ চলছিল ও তাদের শাসক তথা আশেপাশের সমতলবাসীদের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছিল কিন্তু ১৯১১ সালে দুজন রাজকর্মচারী উইলিয়ামসন ও গ্রীয়ারসনকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ ও হত্যা করার পর আবর ও সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান হয়। এই সঙ্গে ভৌগোলিক সমীক্ষাও সুরু হয়।

ঊনিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই নৃতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভূতাত্ত্বিক, রাজকর্মচারী, বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ ও অন্যান্যরা এসব অঞ্চলে যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেগুলি এ অঞ্চল জানতে হলে পড়া একান্ত আবশ্যক।

এই সব সশস্ত্র বিদ্রোহের পর শাসন ব্যবস্থা আরও বেশী সুসংগঠিত করা হয়। শাসনের সুবিধার জন্য বালিপাড়া ও সদিয়া—দুটি ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী গঠিত হয়—সে সময় নাগা পার্বত্য অঞ্চল সদিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চলকে সেলা ও সুবনসিরি অঞ্চলে ও সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে আবর ও মিশমী অঞ্চলে ভাগ করা হয়। ১৯৪২ সালে তিরাপ স্বতন্ত্র জেলার স্বীকৃতি পায়। নাগাল্যাণ্ড থেকে আলাদা করা হয়। ইংরাজদের সময়ে ঢিলাঢালা শাসন ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ও নমনীয় করার চেষ্টা সুরু হয় ১৯৪৭ খৃঃ পর থেকে। ইংরাজ আমলে এ অঞ্চলকে ভারতবাসীর চোখের আড়ালে রাখার চেষ্টা ছিল। ১৯৪৭ খৃঃ পর থেকেই শাসন কার্য সুষ্ঠু নীতি অনুসারে চালান হয়। ১৯৫৪ খৃঃ জেলাগুলির সদর শহরগুলি স্থাপিত হয়, সাবডিভিশন ও সার্কেল অফিস সংগঠিত হয়। ১৯৬৫ খৃঃ ভারত সরকারের বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের দপ্তর থেকে এর শাসনভার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হাতে আসে। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে আসামের রাজ্যপাল এই অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকতেন। আসল শাসক ছিলেন রাজ্যপালের পরামর্শদাতা, তাঁকে সাহায্য করতেন কয়েকজন আই সি এস অফিসার পর্যায়ভুক্ত কর্মচারীরা। ১৯৭১ খৃঃ অবধি আসামের শাসন ব্যবস্থাভুক্ত ছিল এ অঞ্চল। ১৯৭২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে এ অঞ্চলকে অরুণাচল রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়—যদিও প্রধান অফিস অস্থায়ীভাবে শিলং-এই থাকে। খুব সম্প্রতি এই অঞ্চলের প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়েছে ও তার প্রথম অধিবেশনও হয়েছে। তাতে স্থির হয়েছে শীঘ্রই প্রধান কেন্দ্রটি শিলং থেকে সুবনসিরির জিরো বা তার কাছাকাছি কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এর শাসন প্রাপ্ত অফিসারকে কমিশনার বলা হয়। পাঁচটি জেলা কামেঙ, সুবনসিরি, সিয়াং লোহিত ও তিরাপের শাসনভার ডেপুটি কমিশনারদের হাতে, ১১টি সাব ডিভিসনের ভার সহকারী বা অতিরিক্ত কমিশনারদের হাতে। বর্তমানে ১৬টি সাব ডিভিশন ও ৭৯ সার্কেল অফিস আছে বিভিন্ন শাসকদের অধীনে।
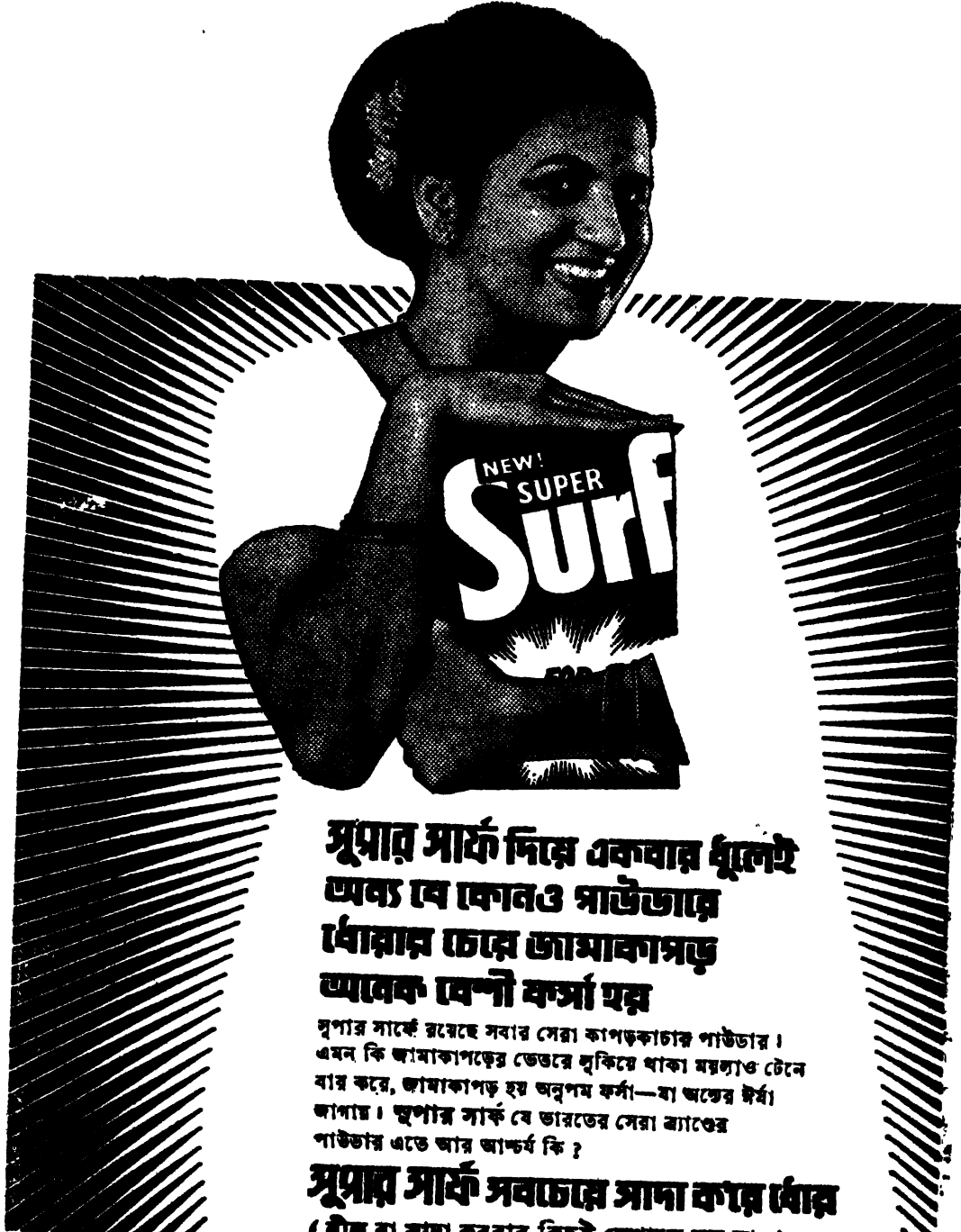
প্রতি জেলায় ১টি করে উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কয়েক করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। পাশীঘাটে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং উচ্চ শিক্ষা পাবার জন্য আর গৌহাটি পর্যন্ত যেতে হয় না। অসমীয়া ছিল এতদিনকার শিক্ষার বাহন কিন্তু নাগা প্রভৃতি অন্যান্য উপজাতির মত বর্তমানে এরাও অসমীয়া-ভাষার প্রতি বিরূপ ও বেশ কিছু আন্দোলন হবার পর বর্তমানে ইংরাজীই এদের শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ২০০—৩০০ ছাত্রছাত্রী পড়ে—বমডিলা (কামেঙ) ও সিয়াং এই ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেশী। আদি উপজাতি যেমন মিশমীরা বা টাগিনরা খুব লেখাপড়ায় আগ্রহী বলে মনে হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে পড়ুয়াদের সংখ্যা আঞ্চলিক অবস্থা ভেদে বিভিন্ন। বৌদ্ধ উপজাতিগুলি বেশী শিক্ষিত।

বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও প্রতি জেলায় একটি লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম আছে। প্রতি জেলার একজন রিসার্চ অফিসার আছেন, তিনিই এর ভারপ্রাপ্ত—তাছাড়া স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকরা এঁদের সহকারী হিসাবে কাজ করছেন। এই সব মিউজিয়ামে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ অস্ত্র বর্শা ও বন্দুক ও জীবনযাত্রার নানাবিধ উপকরণ হাতে লেখা পুঁথি, পিতলের মূর্তি, গহনা প্রভৃতি সংগৃহীত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অনেক জেলায় এগুলি এখন অতীতের বিষয়—কিন্তু বহু স্থানেই এগুলির সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। এই রিসার্চ অফিসাররা তো এসব উপকরণ সংগ্রহ করেনই, তাছাড়া আঞ্চলিক অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে তাদের বিষয় তথ্য সংগ্রহ

করে লিখেছেন প্রচুর। এই অঞ্চলের আধুনিক পরিচয় জানতে হলে এইগুলির মূল্য কম নয়। বইগুলি শিলং বা দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সব জেলাতেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পাশাঘাটে হাসপাতাল আছে। কঠোর জীবনে অভ্যস্ত এই উপজাতিরা, ভিরিয়েরে এলুইনের ভাষায় বলতে গেলে পরিবেশ এদের প্রভু। এখানে প্রকৃতি কৃপণ, কিছুই প্রায় দেননি এদের—কিন্তু কত সব ক্ষুদ্র আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে এরা নিজেদের জীবনধারণের উপাদান সৃষ্টি করে নিয়েছে, এই দ্রব্যাদিগুলি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বেত ও বাঁশ দিয়ে দুরন্ত পার্বত্য নদীগুলির উপর শুধু পুলই বানায়নি, বেতের কোমরবন্ধ ও পরিধেয়ও তৈরী করেছে। বেতের তৈরী জামা ও অন্তর্বাস প্রস্তুত করেছে অন্যান্য উপকরণের অভাবে। পার্বত্য অঞ্চলে পোকা-মাকড় বিষাক্ত কীটের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বস্ত্রাবরণ তৈরী করেছে কি সব বিচিত্র উপাদানগুলি দিয়ে যে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। যেখানে তুলাগাছ আছে, সেখানে তো বেশী সমস্যা নেই, কিন্তু যেখানে তা নেই সেখানে বিভিন্ন গাছের তন্তু দিয়ে গাত্রাবরণ বানিয়েছে, তাছাড়া প্রতি জানোয়ারের চামড়াগুলি তো বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছেই। ঘাসের বীজ ও বৃক্ষাদি ও লোম থেকে শক্ত ও মজবুত শিরস্ত্রাণ, ঘাসের স্কার্ট, প্রকৃতির দেওয়া যা কিছু উপকরণ, তা সবই কাজে

লাগিয়েছে। বিভিন্ন গছ-গাছড়া থেকে রং তৈরী করে ব্যবহার করেছে। সবচাইতে আশ্চর্য হতে হয় এদের বিভিন্ন নমুনা বা নক্সাগুলি দেখলে। বেশীর ভাগই জ্যামিতিক রেখায় অঙ্কিত, বিভিন্ন রকম রং-এর ব্যবহারে এরা অতুলনীয়। বস্ত্রগুলিতে ধর্মীয় প্রতীকও আছে যেমন ড্রাগন, হাঁস, কীট-পতঙ্গ। প্রত্যেক জেলায় আছে কারু-শিল্প কেন্দ্র, তাতে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাঁত, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ও অলঙ্করণ শেখান হচ্ছে। স্থানীয় লোকরাই কর্মী। এই রকম একটি কেন্দ্রে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী সত্যেন বরদলই মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি বিভিন্ন নক্সা সংগ্রহ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছেন। সামান্য একটা ডিজাইন বা রং বদল করে, নিত্য নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করাচ্ছেন। তবে এখানে এগুলির চাহিদা এত বেশী যে আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভবই হল না। না হলে মিশমী কোটগুলির কারুকার্য এত সুন্দর ও এত প্রচলিত যে না কিনতে পেরে দুঃখ হোল। মিশমীরা কোমরে স্বল্পবাস ব্যবহার করে ও উপরে এই কোট ব্যবহার করে। তবে ঠাণ্ডাতেও এদের খালি গায়ে থাকতে দেখা যায়। যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি, পাল-পার্বণে তারা এই কোট ব্যবহার করে—ফলে এগুলি সহজে নষ্ট হয় না বা ছেঁড়ে না—একটি দুটি কোটেই জীবন কেটে যায়।

পশ্চিম থেকে পূর্বে ৫টি জেলার নাম কামেঙ, সুবনসিরি, সিয়াঙ, লোহিত, ও তিরাপ। কামেঙ জেলা ভুটানের পাশে। কামেঙ বা ভরেলী নদী তিব্বত থেকে এসে ব্রহ্মপুত্রতে মিশেছে—তার নামেই এ জেলা। রাজধানী বমডিলা—এখান থেকে ১২২ মাইল উত্তরে তাওয়াঙ মঠ যে রাস্তা দিয়ে দালাই লামা ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। সামরিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেজপুর থেকে যেতে হয়। এখানকার গড় উচ্চতা বেশী—স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে উত্তরে মনপা উপত্যকায় শেরদুকপেন ও আরও দক্ষিণে আকো গোষ্ঠীর বাস। মনপা ও শেরদুকপেনরা বৌদ্ধ—ওখানে থাকার সময়ে গ্রন্থপূজা বলে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল—ভুটানের পুরোহিতরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এরা তাওয়াঙ মঠের নিয়ন্ত্রণে আছে। মনপাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে ভুটানের সঙ্গে। সমভূমির সঙ্গে বেশী সম্বন্ধ শেরদুকপেন ও আকাদের। আকারা সম্ভবতঃ সমভূমি থেকেই এসেছে। অহম রাজাদের পূর্বে তেজপুরের কাছে প্রতাপগড়ের কাছ থেকে উত্তর-পশ্চিম অবধি এদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। অহম রাজাদের সময় এদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়, তখন মাঝে মাঝে সমতলে এসে লুটপাট করে উত্তরে পালিয়ে যেত। কিছুটা বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, মিসামারীতে কিরণ দেবালয় দর্শনে মাঝে মাঝে যায়। অহম রাজারা এদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাস করার জন্য মোলানপুকুরী গ্রামে ১৪৪ বিঘা জমি দান করেন।

এখানকার অন্যতম উপজাতি মিজি—তারা সংখ্যায় কম, তার পরের জেলা সুবনসিরি, ঐ নদীর নামের জেলা। রাজধানী জিরো। সমস্ত অরুণাচলের কেন্দ্রীয় রাজধানী এখানে উঠিয়ে আনবার কথা এরই কাছাকাছি কোনও জায়গায়। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী সংগঠিত ও উন্নত গোষ্ঠী হোল আপাতানী। এরা কৃষিকার্য করে জীবন যাপন করে। শান্ত, সুসংগঠিত, পর্বতঘেরা উপত্যকাগুলিতে চাষ করে। বেশ সমৃদ্ধ, নিজেদের সম্পত্তি বিষয়ে বেশ সচেতন। যার যত বেশী জমি—সে তত ধনী। এরা মিলে মিশে থাকতেই ভালবাসে—এবং এদের গোষ্ঠী-জীবন খুবই সুসংগঠিত। জিরোর কাছাকাছি থাকাতে, আধুনিক সভ্য জগতের সংস্পর্শে সব চাইতে বেশী এসেছে। উপজাতিদের মধ্যে এদের ধনতান্ত্রিক সমাজ বলা যেতে পারে। এদের ঠিক বিপরীত হোল দাফলা—এরা হিংস্র ও দুর্ধর্ষ—গোষ্ঠী-জীবন একেবারেই সংগঠিত নয়, পরিবারই এদের সমাজ-জীবনের কেন্দ্র। একটি লম্বা ধরনের বিস্তৃত গৃহতে ৪০।৫০জন পরিবার থাকে, প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগে থাকে। আপাতানীদের এরা ঠেলে নীচে পাঠিয়েছে—তাদের নীচের অঞ্চল থেকে বেরোতে দেয় না। কারণ এদের অঞ্চল দিয়েই আপাতানীদের বার হতে হয় বহু স্থানে।

কমলা ও খ্রু নদীর সঙ্গমস্থলের পূর্ব দিকে থাকে মিরি উপজাতি। পর্বতের ঢালে থাকে বলে সেচ চাষ করে না—জুম চাষ করে। এদের গ্রামগুলি ছোট। শীতকালে সমতলে নেমে আসে চামড়া, রং ও রবারের বিনিময়ে লবণ কাপড়, ছোরা, দা প্রভৃতি কিনতে। এ-ছাড়া সুলুং, গেলঙ ও তাগিনরা থাকে কিছু উত্তরে। এদের মধ্যে তাগিনরা খুবই অশান্ত উপজাতি। এখনও সম্পূর্ণভাবে শাসনের আওতায় আসেনি। ১৯৫৩-৫৪ সাল অবধি এরা বিদ্রোহ করেছে। ঐ সময়ে আসাম রাইফেল্স দলের বিশ্রামরত এক সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। থাকেও এরা বন্য, রুক্ষ, অনুর্বর মৃত্তিকাযুক্ত পর্বত অঞ্চলে। বাসুদেব বসুর 'নেফা সুন্দরী নেফা' বইটিতে এদের সুন্দর বর্ণনা আছে। এদের জীবনযাত্রা কঠোর, চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব, পুষ্টিকর খাদ্য নেই, রাস্তাঘাট নেই, তাই প্রকৃতি মানুষ সকলের বিরুদ্ধেই এদের সংগ্রাম। তবু এদের অঞ্চলে এখন ডাক্তার ও কৃষি-বিশেষজ্ঞরা গেছেন এবং এদের কাছাকাছি থাকার জন্য উত্তরে ডাপোরিজোকে সাবডিভিশনের শাসন কেন্দ্র করা হয়েছে।

তৃতীয় জেলা হোল সিয়াঙ। রাজধানী আলঙ এইখানে সানপো নদী ভারত সীমান্ত গেলিং-এর নিকট দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে ডিহাং নাম নিয়ে। সদিয়ার কাছ থেকে নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র। বৃটিশ আমল থেকে এখানে শাসনকার্যের কেন্দ্র পাশীঘাট যা বেশ উন্নত ও যাতায়াতের দিক দিয়ে সুবিধাজনক। কলেজ, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য শহরের সুবিধাগুলি এখানে আছে। উত্তরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী খাম্বা ও গরীব মেম্বা উপজাতি বাস করে। মধ্যভাগে বাস করে আবর বা আদি। সমতলবাসীদের দেওয়া নাম আবর (মানে অবাধ্য) এরা পছন্দ করে না। এখন তাই এদের বলা হয় আদি। এরা বেশ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন গর্বিত ও যোদ্ধাজাত। এদের চেহারা ও গঠন বেশ শক্ত ও মজবুত, খুবই স্বাধীনতাপ্রিয়—উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে বশ্যতা স্বীকার করেছে। এদের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে পদম, মিনিয়ঙ শীমেঙ গিলিয়াং গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। একমাত্র এই শেষোক্ত উপজাতিদের মধ্যেই সম্ভবতঃ তিব্বত সীমান্তে বসবাস করার জন্য বহুপতি প্রথা চালু আছে। লোহিত জেলাতেও এদের দেখা যায় সাধারণতঃ এরা সদিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আবররা পুলিশের কাজও করে—এবং দোভাষীর কাজে বেশ দক্ষ। আবর বা আদিদের বেশ ঐতিহাসিক বোধও আছে, ভবিষ্যতের ধারণাও আছে। দাস প্রথা এ অঞ্চলে কমবেশী সর্বত্র প্রচলিত ছিল—তবে এদের মধ্যেই বেশী ছিল—এ কারণেই ইংরাজ শাসকদের সঙ্গে শেষ অবধি লড়াই চলেছিল এদের এই অধিকারে হাত দেওয়াতে। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যেও বেশ দক্ষ ও দরাদরি করতে বেশ ওস্তাদ। এরা তামাকুসেবী ও আফিং প্রিয়।

এর পরে আসে লোহিত জেলা।—উত্তর-পূর্ব দিক থেকে লোহিত নদী এসে সদিয়ার কাছে ব্রহ্মপুত্রতে মিশেছে, এই নদীর নাম। নুসারেই জেলার নাম। সমস্ত জেলার মধ্যে এই জেলাই মনকে নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণ করে। সব চাইতে পূর্ব সীমান্তের এই অঞ্চলটি, প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক, উদ্ভিদ প্রভৃতির দিক দিয়ে বিজ্ঞানীদের কাছে খুব প্রয়োজনীয়। অসংখ্য গিরিশিরা উত্তুঙ্গ পর্বত গিরিখাদ, পার্বত্য নদী, প্রবল বর্ষা এখানকার অধিবাসী মিশমীদের কখনই সুস্থির হয়ে বসতে দেয়নি। এইসব প্রাকৃতিক কারণে এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রা কম। আর্য বা উন্নততর সভ্যতার বেশীর ভাগ নিদর্শন—যথা পরশুরাম কুণ্ড, ভীষ্মনগর, তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা মূর্তি ও শিবলিঙ্গ সবই এই জেলায় পাওয়া গেছে—এগুলি নিয়ে এখন গবেষণা চলছে। লোহিত নদীকে মিশমীরা বলতো টি-লাও (টি মানে জল) যার থেকে খুব সম্ভব লোহিত নামটি হয়েছে—পরবর্তী কালে সংস্কৃতীকরণ করে লৌহিত্য নাম দেবার চেষ্টা হয়েছে। এ-নদী ধরেই মিশমীরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে তিনটি প্রধান গোষ্ঠী আছে ১। ইদু বা চুলিকাটা মিশমী, এরাই সবচাইতে বেশী উল্লেখনীয়। এরা জুম চাষ করতো, আবার সদিয়াতে এসে কেনা-বেচা করতেও খুব উৎসাহী ছিল। ১৮৪০ খৃঃ ও ১৯৫০ খৃ:-র ভূমিকম্পে পাহাড়ের উপর দিকে গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—তখন এদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরা আগে লোহিতের পশ্চিমে দিবং নদীর উপত্যকায় বসবাস

করতো। এদের চুলকাটা মিশমীও বলা হয়। (কারণ আগেই বলা হয়েছে) এদের এখানকার কয়েকটি ১৬০০০—১৭০০০' গিরিশৃঙ্গের নামগুলিও খুব মজার—তাতুখেয়া, টিয়ো খেয়া, ত্রিগর্তখেয়া ইত্যাদি। ইদু মিশমীদের চেহারা সম্পূর্ণ মঙ্গোলীয় নয়—এরা বেশ সশ্রী। ২। দিগারু বা তারাওন মিশমী—ছোট পার্বত্য নদী দিগারুর তীরে বসবাস করে ও তৃতীয় ভাগ হোল মিজি মিশমী বা কামান—পূর্ব দিক ঘেঁষে বাস করে—এসেছে কাচীন দেশ থেকে। শেষোক্ত দুই গোষ্ঠী লম্বা চুল রাখে ও ঝুঁটি করে চুল বেঁধে একটা গোঁজ দিয়ে দেয় মাঝখান দিয়ে। মেয়েরা মাথায় রূপোর গয়না পরে। এদের ভগবান ইত্যাদি সম্পর্কে খুব বেশী কল্পনা নাই—ধর্ম মানে হোল কতকগুলি আচার ব্যবহার, কিভাবে অমঙ্গলকে, ব্যাধিকে নানা প্রক্রিয়া দ্বারা দূরে রাখা যায়। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো, তাছাড়া আবর, সিঙফো, খামটি এদের সঙ্গেও অনবরত সংঘর্ষ লাগতো। আবররা এদের চোর, ঠগ প্রভৃতি নামে ভূষিত করেছে। এরা পরশুরাম কুণ্ডেও মাঘমেলার সময় স্নান করে—মাছগুলিকে মনে করে মৃতদের আত্মা।

এর পর উল্লেখযোগ্য হোল খামটি উপজাতি—সমগ্র অঞ্চলে বোধহয় এরাই অতীতকাল থেকেই সব চাইতে বেশী উন্নত। এরা ব্রহ্মদেশের সান প্রদেশ থেকে এসেছে—লোহিত নদীর দক্ষিণে বাস করে। আসামের ইতিহাসে এদের বেশ কিছু ভূমিকা আছে। ধর্মে বৌদ্ধ, 'তাই' 'থাই' হোল এদের ভাষা। এদের পূর্বপুরুষরা এক সময়ে মণিপুর ত্রিপুরা, ইয়েনান, ও শ্যাম দেশের বিরাট ভূখণ্ডে রাজত্ব করতো। অহমদের আক্রমণে ১২২৮ সাল থেকে এদের প্রভাব ও রাজত্ব কমতে থাকে। ইরাবতীর উৎসমুখ থেকে এরা প্রায় ৩০০ বছর আগে বিভিন্ন সময়ে আকে ও তেঙগাপানী নদীর ধারে বসবাস সুরু করে। অহম (অর্থ তুলনাহীন-অসম)দের রাজত্বগুলি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এরা সদিয়ার কাছে নেমে আসে ও সদিয়ার শাসনকর্তা 'খোয়া গোহাইনকে' সরিয়ে নিজেদের শাসক বসায়—পরবর্তীকালে এদের প্রভাব অহম রাজারা ও বৃটিশরা মেনে নেন। এই অঞ্চলে এদের রাজা বলা হয়। এদের বংশের চৌখামন বড় গোহাই বহুদিন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন—এখন এ'র ছোট ভাই সদস্য। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও জমির মালিক এ'রা কাঠের ও অন্যান্য নানাবিধ ব্যবসা আছে—এ অঞ্চলে এরাই প্রধানতঃ শাসনকার্যকে প্রভাবিত করেছেন। চৌখাম প্রদেশেই এ'দের প্রভাব এখন সীমাবদ্ধ। ডাঃ মহেশ্বর নেওগ (গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া ভাষার প্রধান, এর 'লোহিতের প্রাচীন কাহিনী প্রবন্ধে ও 'সীমান্তের শিখা' বইটিতে এদের বিষয় নিয়ে বিস্তৃত কাহিনী লেখা হয়েছে। এরা বেশ শিক্ষিত, ধাতু ও তাঁতের কার্যে নিপুণ, কাঠের ও অন্যান্য কারুশিল্পের কাজও সুন্দর। খামটি 'দা' অতীতকাল থেকেই বিখ্যাত। চেহারা তত সুন্দর নয়—রং শ্যামবর্ণ—। অহম সরকারের রাজ-কর্মচারী হিসাবে কাজ করার সময়ে এরা অসমীয়া মেয়েদের বিয়ে করেছে। বরু-খামটিরা এখন তাদের পুরাকালের ধরনেই গৃহনির্মাণ করে। ভাল ব্যবসা বোঝে পরিশ্রমী। এরাই উৎকৃষ্ট চাল ও আলু চাষের প্রবর্তন করেছে। শ্রেণী-বিভাগ থাকলেও সমবায়িক ভিত্তিতে চাষ করে। অল্পদিন পূর্বেও দাসপ্রথার খুব প্রচলন ছিল।

এর পর আছে সিঙফো—এরা এসেছে উত্তর ব্রহ্মদেশ থেকে—কাচিন বংশ থেকে উদ্ভূত এরা। বর্তমানে নোয়া ডিহং নদী থেকে আরও দক্ষিণ অঞ্চলে এদের বাস। (অহম রাজ ছুকুপার আমলেই অসম নাম চালু হয় ও এ'রা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন) অহমদের শেষ স্বাধীন রাজা গৌরীনাথ সিংহের রাজত্বকালে মোয়া মারীয়া বিদ্রোহের সময়ে এরা আসামে প্রবেশ করে ও খামটিদের তাড়িয়ে তেঙগাপানী নদী ও বুড়ী ডিহং-এর কাছে নামরূপে বসবাস সুরু করে। ইংরাজ-ব্রহ্ম যুদ্ধে এরা বর্মীদের পক্ষে যোগ দেয়। পরে ইংরাজরা খামটি ও আবরদের সাহায্যে অগ্রসর হলে আত্মসমর্পণ করে। দাস প্রথা এদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল চাষবাসের কাজ প্রধানতঃ দাসরাই করতো। এদের যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা নেই, এক-একজন প্রধানের অধীনে কয়েকটি গ্রাম থাকে। বর্মা-যুদ্ধের সময় এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথগুলির নিকট থাকতো বলে এদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা হয়। কিন্তু ঐ দাসপ্রথা নিয়েই কোনও মীমাংসায় আসতে বেশ দেরী হয়েছে। এদের আচার-ব্যবহার বিবাহ-পদ্ধতি সবই ভিন্ন। এদের ভাষা কারেনদের মত। মণিপুরী, কুকি, নাগা ও আবরদের সঙ্গেও কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধধর্মের কিছুটা প্রভাব থাকলেও এরা বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে পূজো করে। খামটিদের মত অত নিপুণ না হলেও ধাতু গলাবার কাজ জানে—নিজেদের কাপড় বোনে, গাছ-গাছড়া থেকে রং তৈরী করে। বৃটিশ অভিযাত্রীদের এরা চা-এর বীজ ও চা উপহার দিত, তাতে মনে হয় এ অঞ্চলে চায়ের চাষ প্রচলিত ছিল। আফিঙে আসক্তি এদের কর্মোদ্যমের পক্ষে প্রধান বাধা।

এর পর সর্বদক্ষিণ-পূর্বের জেলা তিরাপ—যার প্রধান শহর খোনসা। এই অঞ্চলটি ৫০০ থেকে ১৫০০০ ফিট উঁচু। তিরাপ নদী দঃ-পূর্ব থেকে প্রবাহিত হয়ে সদিয়ার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। লোহিতের রাজধানী তেজুতে যেতে হলে ও তিরাপে আসতে হলে তিনসুকিয়া দিয়ে আসাই সুবিধাজনক। এখানে বাস করে তাঙ্সা, ওয়াঙ-চু ও নকটে উপজাতি। তাংসাদের লুঙচুঙ, মকচুঙ, হাবী প্রভৃতি কয়েকটা উপজাতি ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের কাছে বাস করে। বর্মীদের মত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে লুঙি পরে। ছেলেরা সার্ট ও পাগড়ী, মেয়েরা ব্লাউস ব্যবহার করে। প্রবল অহিফেনসেবী। এরা ভারত-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ওয়াঙচুরা বেশ চটপটে ও বুদ্ধিমান জাত। বৈষ্ণব ধর্মের কিছুটা প্রভাব থাকলেও প্রকৃতি পুজোই প্রধান। ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী বিভাগ আছে। কিন্তু দাস-প্রথা নেই। গ্রাম-প্রধানরাই গ্রামের হর্তাকর্তা। এদের বাড়ীগুলি খুব বড় বড় হয়। পাথরের বড় খণ্ড ও কাঠের বিরাট অংশ নিয়ে ভয়াবহ মূর্তি তৈরী করতো। অতীতে অন্যান্য অনেক গোষ্ঠীর মতই এরা ছিল নৃমুণ্ড শিকারী। এখন নৃমুণ্ডের পরিবর্তে কাঠের নৃমুণ্ড গলায় পরে ও বিভিন্ন কাঠের দ্রব্য ব্যবহার করে (যথা—কাঠের পাইপে)। নৃমুণ্ডের নানাবিধ নিদর্শন এদের গৃহে পাওয়া যাবে। কাপড়-চোপড়ের চাইতে হাতীর দাঁতের, শিঙ-এর ও শঙ্খের গয়না পরতে বেশী ভালবাসে। ফুলের গয়না ও পাখীর পালকও এদের অলঙ্কৃত করে। অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের জন্য মোরাঙ বা যৌথ শয়নগৃহ আছে। শিকারই প্রধান জীবিকা। এরা নাগাদের প্রতিবেশী।

তৃতীয় উপজাতি নকটে—বেশ খানিকটা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আছে এদের ওপর। সম্ভবতঃ সমভূমির কাছ থেকেই তা এসেছে। বোরহাট ও নামসাঙের মাঝে ২১টি লবণের কুয়া আছে, তাছাড়া শীতকালে নদীর জল থেকে লবণ তৈরী করে। অতীতকাল থেকেই শিবসাগর ও এইসব অঞ্চলে যৌথ প্রথায় লবণ তৈরী ও বিক্রী হয়।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে এইসব উপজাতিদের তিন ভাগ করা যায়—উত্তর সীমান্তের ও পূর্ব সীমান্তের অধিবাসীরা মনপা, খামটি, সিঙফো—প্রধানতঃ বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত। এদের কাছাকাছি যেসব গোষ্ঠী থাকে যথা—শেরদুকপন, তারাও এদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। এরা সামাজিক দিক থেকে বেশ উন্নত, চাষবাস ও কুটিরশিল্পে দক্ষ, পশু-পালন করে ও ব্যবসা-বাণিজ্যও করে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী যারা মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুর্গম পার্বত্য ও অরণ্যময় অঞ্চলে থাকে, যেমন দাফলা, তাগিন, গেলঙ, হিলমিরি, আপাতানী, মিশমী-আবর—এরা প্রকৃতির সঙ্গে তথা মানুষের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তবে সিয়াঙ জেলায় উপজাতিরাই পথঘাট ভাল

মিশমী বালিকা

থাকার জন্যই বোধহয় সবচাইতে বেশী উন্নত। প্রধানতঃ প্রকৃতির ও অমঙ্গল শক্তির উপাসক এরা। তৃতীয় গোষ্ঠী দক্ষিণাঞ্চলে থাকে, যেখানে সমভূমির জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ ঘটেছে। এদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে।

খুটিনাটিতে অনেক প্রভেদ থাকলেও এদের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য আছে। ধনী-দরিদ্র শ্রেণী-বিভাগ থাকলেও কিন্তু জাতিভেদ নেই। বিবাহ করে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু স্ববংশে নয়। সমাজ পিতৃপ্রধান, ছেলেদের বহু-বিবাহ প্রচলিত বিবাহ-পূর্ব মেলামেশার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু বিবাহের পর বিশ্বস্ত ও সতীত্ব রক্ষা করতে হয়। বহুপতি প্রথা খুবই কম। বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজে অনুমোদিত। কমবেশী সব উপজাতিদের মধ্যে দাস প্রথা প্রচলিত। তবে খামটি সিঙফো ও আপাতানীদের মধ্যেই বেশী। দাসদের সঙ্গে বিবাহ ও সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করা ভিন্ন তাদের সঙ্গে পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের মত ব্যবহার করা হয়। মৃতদেহগুলিকে হয় কবর দেওয়া হয় অথবা পাখী ও পশুদের খাবার জন্য দেওয়া হয়। শোক প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেসব উপগোষ্ঠী বেশী উন্নত, তাদের মধ্যে যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা মোরাঙ প্রভৃতির চল আছে—অনেক ক্ষেত্রে যৌথ কৃষি ও উৎপাদন পদ্ধতিও আছে—কিন্তু যেখানে জীবন-সংগ্রাম তীব্র সেখানে পরিবারই প্রধান (দাফলা, তাগিন, মিশমী)। যেখানে যৌথ সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল সেগুলিকে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অ.না অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলি এখনও পশ্চাৎপদ। প্রাকৃতিক শক্তির বা দুষ্টশক্তিগুলিকেই যারা প্রধানতঃ পূজো করে তাদের মধ্যে বলিদান প্রথাও প্রচলিত। পূর্বে নরবলিও হোত। সমস্ত উপজাতিগুলি তামাকসেবী ও পাইপধারী।

ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশকে গ্রহণ করছে এরা। কিন্তু অতীতে বিশ্বাস ও প্রথাগুলি এদের মজ্জায় মজ্জায় জড়িত—সেগুলি সহসা যাবে না। কয়েকটি উপজাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার পর মনে হয়েছে এরা বেশ আত্মসচেতন—সুতরাং দ্রুত পরিবর্তনে খুব লাভ হবে না। তাছাড়া এই অঞ্চলগুলি অনুর্বর ও পার্বত্যময় খাদ্যদ্রব্য প্রায় কিছুই হয় না—যদিও বেশ কিছু মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। এখানকার রাজ-কর্মচারীরা এ-বিষয়ে বেশ সচেতন। তবে এ-দেশের ভিতরে প্রবেশ করা দুরূহ—একে তো প্রাকৃতিক বাধা, আসামের ডিব্রুগড় থেকে পাশীঘাট, লখিমপুর থেকে জিরো, তেজপুর থেকে বমডিলা যেতে হয়, তাছাড়া এসব অঞ্চলে যেতে হলে অনুমতি দরকার। হঠাৎ বেশী লোক গেলে খাদ্য-বাসস্থানের অভাব হবে। খাদ্যদ্রব্য সবই বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়—স্থানীয়ভাবে বার্লি, যব, আলু, আপেল, ওষধিবৃক্ষ প্রভৃতি উৎপাদন করার চেষ্টা হচ্ছে। মিশনারী প্রভাব এখানে একেবারেই ছিল না—সেটা কতকটা সুবিধার ব্যাপার হয়েছে—তবে বাইরে থেকে নানাবিধ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাও চলে। তবে অনেক ছেলেমেয়ে এখন দার্জিলিং, গৌহাটি, পুরুলিয়া, দেরাদুন অবধি পড়তে যাচ্ছে। ভারতবাসীদের সঙ্গে পরিচয়ের পরিধিও বেড়ে চলেছে—অনেকে এত সব বাধানিষেধ রাখার বিরোধী।

যাই হোক—যে কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কঠোরতার মধ্যে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, হার মেনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি—তাছাড়া প্রকৃতির কৃপণ হস্তের দান থেকে পাওয়া সবকিছুকেই জীবনযাত্রার কাজে নিপুণভাবে লাগিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টিও করেছে, তা বিশ্লেষণ করলে মুগ্ধ হতে হয়। গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে এরা ছিল, পারস্পরিক ও বিদেশীদের প্রতি অবিশ্বাস, যৌথ সামাজিক জীবন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সবগুলিরই হঠাৎ পরিবর্তন করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে ভারতীয় জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হোক, এটাই আমাদের আশা ও ইচ্ছা—জাতীয় সংহতির দিক থেকে এদের সঙ্গে ব্যবহার ও আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে রুক্ষ ও কঠিন প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে যেভাবে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, সেই অদম্য প্রাণশক্তি যা অতীতে উদ্দামতা, চঞ্চলতা ও অস্থির জীবনযাত্রার প্রকাশ পেয়েছে, একবার নিজেদের শ্রেয় কি তা ঠিকভাবে বুঝলে ঐ শক্তিই তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার অংশীদার করে তুলবে আশা করি।

(৩)

মার গানের খাতা!

দিদি আমার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'বিশ্বাস হয় তোর বুদ্ধি?'

—তা বিশ্বাস করা শক্তই বটে।

অহরহ মার যা মূর্তি দেখছি, তার সঙ্গে 'গানের খাতা' বস্তুটার হিসেব মেলাতে পারি না।

তাছাড়া শুধুই তো যেমন তেমন একটা খাতা নয়, খাতাটার চেহারায় রীতিমত আভিজাত্যের ছাপ। স্যাকরার দোকানের গহনার বাক্সের মত গাঢ় বেগুনী রঙের মখমলে মোড়া মলাট, তার উপর সোনার জলে অভিষিক্ত অক্ষরে লেখা—'গানের খাতা'।

—অর্থাৎ বাজারে কেনা চার-ছ' আনার খাতা নয়, কারো উপহারের সামগ্রী।

অবশ্য মলাট খুলেই বোঝা গেল কার দেওয়া উপহার। ভয়ে বুকের মধ্যে কেমন দুড়দুড় করে উঠলো আমার, দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, মাটিতে বসে পড়লাম।

'এমা, ওই ধুলোর ওপর বসলি তুই?' দিদি বলে উঠলো, 'একটা মাদুর আনলেই হতো।'

ব্যাকুলভাবে বললাম, 'দিদি থাক, রেখে দে, দেখতে হবে না।'

এমনিতে আমার দিদির থেকে সব বিষয়েই সাহস বেশী। দিদি উঁচু টুলে উঠতে পারে না, দিদি আরশোলা মারতে পারে না, দিদি দাদাদের অনুপস্থিতিতে ওদের ড্রয়ার খুলে পেন্সিল রবার বার করে নিয়ে 'একটু ব্যবহার' করে নিতে পারে না, দিদি রাত্তিরে ছাতে একা উঠতে পারে না, দিদি মা'র চোখের সামনে বসে গল্পের বই পড়তে পারে না, দিদি মার বেঁধে দেওয়া টান-টান করা চুলের বেণী খুলে ফেলে আলগা করে আঁচড়ে নিতে পারে না, দিদি মার সামনে 'আর খেতে পারছি না' বলে থালায় ভাত ফেলে উঠে যেতে পারে না, এমন অনেক কিছুই দিদি পারে না যা আমি পারি, কিন্তু এদিন আমার দিদির থেকে সাহস কমে গিয়েছিল। কেমন ভয়-ভয় করছিল। কেমন যেন কান্না পেয়ে যায়।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ দিদির মধ্যে একটা জোরালো সাহসের জেদ দেখতে পেয়েছিলাম। দিদি বললো, 'কেন, এতো ঘাবড়াবার কী আছে? একটু দেখলে তো আর ক্ষয়ে যাবে না?'

খুব স্পষ্ট করে না ভাবতে পারলেও দিদির কথায় কিন্তু আমার মনে হলো, খাতাটা ক্ষয়ে না গেলেও আর কোথায় যেন কিছু ক্ষয়ে যাবে!

—কী সেটা?

বিশ্বাস? সততা? সভ্যতা? কে জানে।

কিন্তু 'তুই দেখগে যা, আমি দেখবো না' এমন বলার মতো নির্লোভও তো হতে পারলাম না। নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণের কাছে চিরদিনই ভয় পরাস্ত, নীতিবোধ পরাস্ত।

জিনিসটা উপহারেরই।

উপহার প্রাপক এবং উপহার দাতার নাম সোনার জলে না হলেও গাঢ় বেগুনী কালিতে ছাপার অক্ষরের মতো পরিপাটি অক্ষরে লেখা।

নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি সেদিকে—অনেকটা মোহাচ্ছন্নের মতো। অক্ষরগুলো তো জানা জগতেরই, শব্দগুলোর মানেও অজানা নয়, কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত মানেটা? সে কি আমাদের জানা জগতের?

কে এই—

'অশেষ প্রেমময়ী, অনন্তসুখদায়িনী
শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী
প্রাণাধিকাসু'?

কে এই ওই চারুহাসিনীর 'চিরভৃত্য—
শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়'?

দিদির মুখে একটা বিচিত্র বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো। দিদি আমার দিকে না তাকিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললো, 'বাবার চটিতে পা ঠেকলেও মা নমস্কার করেন!'

আমি খুব সাবধানে ভেতরের কান্নামত ভাবটা চেপে বললাম, 'চিরভৃত্য' কেন দিদি? বাবা তো গুরুজন!'

দিদি এবার একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলে উঠলো, 'ভগবান জানে। সেকালে বোধহয় ওইরকমই লেখার ফ্যাসান ছিল।'

বাবা মার আমলটাকে আমরা 'সেকালই' বলতাম। যদিও পরে হিসেব করে দেখেছি আমার যখন দশ বছর আর দিদির বারো, তখন মার বয়েস ছিল ছত্রিশ, আর বাবার চুয়াল্লিশ। দাদা জন্মাবার আগে মার নাকি একটা মেয়ে হয়ে জন্মেই মারা গিয়েছিল, তারপর দাদা। দাদা মার ষোলো বছর বয়সে জন্মেছে।

সেই মেয়েটা পেটে থাকতে মা নাকি মাছকোটা বঁটি ডিঙিয়েছিলেন, তাই মেয়েটা গেল। দাদার বেলায় মাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়েছিল: বঁটি ডিঙানো, পানের বোঁটা ডিঙানো, শনি মঙ্গল বারে ছাতে যাওয়া, আরো কত কী যেন বাছ-বিচার করতে হয়েছে। দাদা জন্মাতে ঠাকুমা খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'যাক বাবা প্রথম সন্তানের ফাঁড়াটা মেয়ের ওপর দিয়ে কেটে গেছে, বাঁচা গেছে।'

মার মুখেই শোনা এসব।

আমরা ভাবতাম, 'কী সেকেলে কুসংস্কার!'

অতএব সেকালের ফ্যাসান নিয়ে দিদি তাচ্ছিল্য করলো।

কিন্তু শুধুই তো ওই উপহার পত্রের লেখাটুকুই এতো বিচলিত করেনি আমায়। পৃষ্ঠাটার ওপিঠে একখানা ফটো আঁটা ছিল না কোণে কোণে আঠা দিয়ে?

একটি তরুণ দম্পতির ফটো।

না, একেবারে সদ্য বিবাহিত নবদম্পতির নয়, সোলার টোপর আর সোলার মুকুট পরা বরকনের সেই ফটো তো আমাদের ঘরের সামনের দেয়ালটাতেই টাঙানো রয়েছে, ঝুলে আর ধুলোয় বিবর্ণ। অতো উঁচু থেকে বোঝাও যায় না, নতুন বর-কনের মুখ চোখ কেমন!

এ ছবি 'একশোজনের সামনে আড়ষ্ট করে বসিয়ে তুলে নেওয়া ফটো নয়, দিব্যি সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বসে থাকা নিজেদের ইচ্ছের তোলা ফটো।

আচ্ছা সেকালে কি ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল? বোধহয় ছিল না। হয়তো কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের তোলা ছবি। যার সামনে বৌকে মুখ খুলে বার করা যায়। ছবিটা এই—নবীনা বধূ একখানি কারুকার্যখচিত চেয়ারে উপবিষ্ট, তার মাথার ঘোমটা খোলা, এলো চুলের রাশি পিঠে কাঁধে সামনে ছড়ানো। গায়ে জমকালো লেশ ঝোলানো একটি থ্রী-কোয়ার্টার হাতা জ্যাকেট, পরণে বোধকরি পার্শী শাড়ি। বরের শ্রীঅঙ্গে অবশ্য ধুতি-পাঞ্জাবিই, তবে কাঁধ থেকে খুব কায়দা করে ঝোলানো রয়েছে একটা কল্কাদার চওড়া-পাড়ের শাল। সেই কারুকার্যময় চেয়ারের হাতার উপর বসে থাকা বরের একটা হাত নিজের হাঁটুর উপর, আর একটা হাত চেয়ারের পিঠ বেষ্টন করে বৌয়ের কাঁধের ওপর আলতো ভাবে রাখা।

এ-যুগে এ ছবির ভঙ্গী দেখলে নিশ্চয়ই নবীন-দম্পতিরা 'কী গাইয়া বাবা,' বলে হেসে উঠবে, কিন্তু সেকালে যে এটা একটা দুঃসাহসিক প্রগতিসুলভ কাজ হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কী!

ছবিটা হাতেই রয়েছে, তাই বর-বধূর মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এতো সুন্দর মুখ-চোখ নাকি চারুহাসিনী দেবীর আর রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের? আর এতো চুল ও'দের মাথায়?

মার যে 'ন-বৌ' ছাড়া আস্ত আর কোনো একটা নাম আছে, খেয়ালই ছিল না। মামার বাড়িতে আমাদের যাওয়াটা ছিল দৈবাতের ঘটনা, সেই দৈবাৎটা ঘটলে, অথবা মামারা কেউ এলে মার একটা ডাক-নাম শুনতে পেতাম, 'হাসি।'

গঙ্গোপাধ্যায় গুষ্ঠিতে শুধুই ন-বৌ।

'বৌদি'ও বলতো না কেউ। কাকাও বলতেন ন-বৌ, পিসিমারাও বলতেন ন-বৌ। জেঠিমারা তো বলবেনই। আর বাবার মুখে ওই 'ন-বৌ' ছাড়া আর কিছু শুনিনি।

ওই ন-বৌয়ের মধ্যে কোথায় ছিল এই নববধূ?

দিদি অনেকক্ষণ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে পাতা ওলটালো।

প্রথম পৃষ্ঠায় মাত্র দুটি ছত্র—

'কী মোহিনী জানো বঁধু

কী মোহিনী জানো—

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।'

চমকে গেলাম!

মার গানের খাতা, এই তো যথেষ্ট, তার ওপর আবার শ্যামাসঙ্গীত নয়, রামপ্রসাদী নয় একেবারে প্রেম-সঙ্গীত! ধারণা-কল্পনার সীমা ছাড়ানো একটা আঘাত যেন।

ওলটাতে ওলটাতে দেখা গেল আগাগোড়াই তাই। শুধুই ভালবাসার গান। খুব ধরে ছাপার অক্ষরের মতো করে লেখা। আর সেই সব গানের তলায় তলায় গীতিকারেরও নাম লেখা। কোনোটার নীচে লেখা গিরিশ ঘোষ, কোনোটার নীচে ক্ষীরোদপ্রসাদ, কোনোটার বা নিধুবাবু, কয়েকটির নীচে রবিঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ বলার অভ্যেসটা তখনো আসেনি, কেউ বলতো রবিবাবু, কেউ বলতো রবিঠাকুর। মা শেষেরটাই পছন্দ করেছিলেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গানের সংগ্রহশালায় গীতিকারের নামটিও লিখে রাখা, এ-তো রীতিমতো রুচি আর নিষ্ঠার ব্যাপার। চারুহাসিনী দেবীর মধ্যে এই রুচি এই নিষ্ঠা তাহলে ছিল একদা!

কিন্তু অবাক হতে তখনো অনেক বাকি।

অনেকগুলো পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখ আটকে গেল। একটি শাদা পৃষ্ঠায় লেখা—'নিজের লেখা গান।'

শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী।

'দিদি!'

আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি।

'মা আবার গান লিখতেনও?'

দিদি স্থির চোখে ওই লেখাটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাই দেখছি।'

তারপর আবেগ-আবেগ গলায় বলে উঠলো, 'মার এখনকার হাতের লেখা দেখিস তো?'

একদা আমরা মা'দের কালকে 'সেকাল' বলেছি ও'দের আচার আচরণকে 'সেকেলে'। এখন মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে দেখি নিজেদেরই নিজেদের 'কাল'কে 'সেকাল' বলে বুঝতে পারি, নিজেদের সেই সেকালের আচার আচরণগুলো হাস্যকর রকমের সেকেলে লাগে। এতো অল্প উদ্বেলিত হতাম আমরা। বিজয়াদশমীর দিন 'দুর্গানাম' লেখার আগে ভুলে সিদ্ধি খেয়ে ফেললে মনে হতো সর্বস্ব হারালাম বুঝি। সরস্বতী পুজোর দিন খুব সকাল সকাল অঞ্জলি হয়ে গেলে, উপোষটা না লাগলে, মনে হতো পুরো পুণ্য হল না।.. আর ওই শ্রীপঞ্চমীর আগে টোপাকুল খেয়ে ফেলা? সে তো ভাবাই যায় না। তাছাড়া—ভাইবোনের মধ্যে সেদিন ভুল করে কেউ বই পড়ে ফেললে তাকে ধিক্কারের শরে বিঁধে প্রায় শুইয়ে দেওয়া হতো! দাদা তো শ্রীপঞ্চমীর আগের রাতে টেবিলের সব বই-খাতার ওপর একটা চাদর চাপা দিয়ে রাখতো আর দেয়ালের ক্যালেন্ডারগুলো উল্টে রেখে দিতো।

তা সত্ত্বেও হয়তো ঘটে যেতো কোনো দুর্ঘটনা। হয়তো চোখে পড়ে যেতো একটা পুরনো চিঠি, বা ওইরকম অন্য কিছু, দুঃখে ভেঙে পড়ে যেতাম। আমারই হয়তো একটু বেশী ছিল এটা, এদিকে 'দস্যি' ডাকাবুকো' 'মেয়ে-ডাকাত' ইত্যাদি সুমধুর বিশেষণে ভূষিত হলেও, ভিতরে এই অল্পে বিচলিত, উত্তেজিত, অল্পে বিগলিত ভাবটা আমারই বেশী ছিল।

না চাইতেই বাবা কোনো খেলনা পুতুল, বা দাদারা একটা পেন্সিল কলম দিলে আমার চোখে জল এসে যেতো। জ্বর অসুখ হলে দৈবাৎ যদি মা কাছে এসে মাথায় একটু হাত রাখতেন, আমার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করতো। ওই হাতটা অবশ্য খুবই দুর্লভ ছিল আমাদের কাছে। জ্বর অসুখ হলে, মা সাবু-বার্লি খাওয়াবার জন্যে তাড়না করতেন, সময় মাফিক ওষুধ নিয়ে (যতো বিতিকিচ্ছিরিই হোক, বিনা ময়ত্নায়) সতেজে গলায় ঢেলে দিতেন, চুলে জট পড়ে গেলে প্রবল আকর্ষণে হিঁচড়ে হিঁচড়ে আঁচড়ে দিয়ে কর্তব্য করতেন, এবং অসুখটা যে, সম্পূর্ণ নিজের দোষে ঘটেছে এবিষয়ে অবহিত করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হবার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু কপালে হাত? যাকে বলে জননীর স্নেহ-করস্পর্শ? সেটা আমাদের কাছে দৈবাতের ঘটনা, দৈবদুর্লভ পাওয়া।

অথচ এতোটুকু অসুখেই 'ডাক্তার আনো ডাক্তার আনো' করে বাবাকে ব্যস্ত করতে ছাড়তেন না মা, এবং একটু বেশীর দিকে গড়ালেই মা কালীর কাছে দুম-দুম করে প্রণত করে বসতেও পটু ছিলেন।

মার এই মূর্তিই দেখতে অভ্যস্ত আমরা। যদিও মার বয়েস মাত্র তখন ত্রিশোর্ধ। মানে আমার স্পষ্ট স্মৃতির জগতে যেটা ধরেছে, হয়তো বা ত্রিশের নীচেই।

কিন্তু এতে তো আমরা দুঃখিতই ছিলাম। মামার বাড়িতে দেখেছি মামার মেয়েদের 'মা' বলে গায়ে পিঠে লেপটে বসতে গলা ধরে ঝুলোতে সে সব কি আমরা কল্পনাই করতে পারতাম?

মনে খেদ হতো, আমাদের মা এমন শুকনো খটখটে কেন? অথচ আজ একটা ভাঙা ফ্রেম দিয়ে মাকে তার বিপরীততা দেখে এমন কণ্ঠ-কণ্ঠ আবেগ উথলে উঠছে কেন?

হয়তো আসল কথা, আমরা যাকে যেমন দেখতে অভ্যস্ত, যার সম্বন্ধে যা ধারণা বদ্ধমূল, তাকে তা থেকে অন্যরকম দেখলেই বিচলিত না হয়ে পারি না। কারণ সেটা ওই ধারণার মূলে নাড়া দেয়।

তাই দিদি যখন বললো, 'মার এখনকার হাতের লেখা দেখিস তো?' আস্তে ঘাড় কাত করলাম। দেখি বৈকি, মাঝে মাঝে মাসিদের চিঠি দেন, পোস্টকার্ডে। এক পয়সা দামের পোস্টকার্ড, তাও মা ধৈর্য ধরে সবটা ভরিয়ে তুলে উঠতে পারেন না দু-চার লাইনে সেরে দেন এবং বাঁকাচোরা অক্ষরে ধরা পড়ে অযত্নের ছাপ।

আর হাতের লেখা দেখা যায়, ধোপার খাতায় বা কদাচ কখনো কোনো বাজার দোকানের ফর্দয়। সে লেখার আখরের কথা না তোলাই ভাল।

চারুহাসিনী দেবীর সেই 'নিজের লেখা' দীর্ঘ দীর্ঘ গানের দু-চার লাইন এখনো মনে আছে,— যেমন—

'কতো ছল জানো, হে-পরাণবঁধু,
আমি অতো বুঝি না যে—
অবলাবালার হৃদয়েতে তাই
সদাই বেদনা বাজে।'

অথবা—

'ভালবেসে মিলিল না, প্রাণের তিয়াষা—
ও তব চরণতলে প্রাণ দিই আশা।'

একটা গান তো প্রায় সবটাই মনে আছে—

'নিশিদিন আমি পথপানে রেখে আঁখি,
তোমারই আসার আশায় হে নাথ,
উতলা হইয়া থাকি।

'... ঊর্ধে প্রেম মঞ্জ ওহে প্রাণনাথ,
উৎকল্প বুক, কাঁপে পদ হাত,
বাসনা হয় যে জানালার পথে—
উড়ে যাই হয়ে পাখী।'

আরো সাংঘাতিক সাংঘাতিক কিছু লাইন আছে, কিন্তু থাক। গুরুজনের প্রসঙ্গে আর বেশী না বলাই সংগত।

বয়েস, মাত্র দশ?

তা হোক, সাহিত্য বিচারে একেবারে অক্ষম ছিলাম না, গানগুলো যে লেখার দিক থেকে বিশেষ উচ্চমানের নয়, তা বুঝে ফেলতে দেরী হয়নি। কিন্তু বিষয়বস্তু? সেটাও বুঝে ফেলেছি যে। তাইনা বুকের মধ্যে অতো আলোড়ন উঠছিল।

তার সংগে অপরাধবোধ।

বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে, মনে হচ্ছে খুব একটা অন্যায় কাজ করছি। তাই বুকটাকে শান্ত করতে সময় লাগলো।

কী অদ্ভুত আশ্চর্য কথা!

চারুহাসিনী দেবীর মধ্যেও এইসব ছিল! প্রেম, ব্যাকুলতা, বিরহবেদনা। আর সেই অনুভূতিগুলি সম্পর্কে বোধ ছিল, এবং সেটা প্রকাশের চেষ্টা ছিল!

এ কী বিশ্বাস করা যায়?

কল্পনাই করা যায় না যে।

তাছাড়া—ওই প্রেমট্রেমগুলো কার উদ্দেশ্যে? সদা সর্বদা যাঁর সংগে খিটিমিটি, যার জন্যে মেজদা আড়ালে বলে ওঠে, 'ওই বেধে গেল সাপে-নেউলে! নারদ! নারদ'—সেই শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্যে?

দিদির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। দেখি দিদি মুখটা নীচু করে বসে আছে, দিদির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

এটা কী?

এতোক্ষণ তো দিদিই সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল।

এখন আবার আমার মতো ভয় খাচ্ছে!

ভয়ে ভয়ে বলি, 'এই. কাঁদছিস কেন?'

দিদি ধরা গলায় বলে, 'মানুষ এতো বদলে যায় কেন রে?'

ওমা! এই জন্যে দিদি কাঁদছে!

আমার তো কান্না পাচ্ছিল একটা দোষ করা দোষ করা ভয়ে। ভিতর থেকে কে যেন বলছিল, 'গুরুজনের জীবন সম্পর্কে বেশী জেনে ফেলা অন্যায়, বুঝিবা পাপ!

কিন্তু দিদি যে অন্য কথা বললো।

অবাক হয়ে বললাম, 'অন্য কেউ বদলে গেলে তোর কী?'

'কী জানি! বড্ড কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে হয়তো আমিও একদিন এই রকম বদলে যাবো। তখন আমাকে আর আমি বলে চেনা যাবে না।'

হঠাৎ মনে হলো, এখন দিদিকে আর ঠিক দিদি বলে চিনতে পারছি না। দিদি যেন আমার নাগালের অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। দিদির দুঃখের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমার দুঃখের অনুভূতিকে মেলাতে পারছি না।...

এতোদিন এবারেও দিদির আর আমার সুখদুঃখ, জিদ এক, দুজনে দুজনের একেবারে কাছাকাছি ছিলাম, এখন কী হতে চলেছে? দিদি দূরে সরে যাবে? দিদি আমার থেকে বড় হয়ে যাবে?

কোথা থেকে একরাশ অভিমান এসে জুটলো। দিদির ওপর রাগ এসে গেল। বললাম, 'চেনে দুঃখ আসছিস তুই। সবাই বুঝি বদলায় — কক্ষনো বদলাব না আমি বলে মনের জোর করে থাকলেই হয়।'

তারপর বয়েসের অনুরূপ বুদ্ধিতে বলে ফেললাম, 'তাছাড়া ভালো তেল মাখলে টাকও পড়ে না, নিয়মিত ব্যায়াম করলে ভুঁড়িও হয় না। আর ফিটফাট সেজে থাকলে বুড়োও দেখায় না।'

দিদি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

জলভরা চোখেই কৌতুকের ছায়া ফুটে উঠলো, বললো, 'দূর বোকা, আমি কি ওই বদলের কথা বলছি?'

আস্তে আস্তে দিন যাচ্ছিল।

অন্যের বদল দেখে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়েছিলো, অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি, দিদি নিজেই আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে।

দিদির খেলাঘরে ধুলো জমছে, দিদির পুতুলের বাকস প্রায়ই বন্ধ পড়ে থাকছে।

আমি প্রলুব্ধ করতে ডাক দিই, 'দিদি, এই সময় মা ঘুমোচ্ছেন, আয় না পুতুল খেলি।'

দিদি বলে, 'এখন ইচ্ছে করছে না রে, পরে খেলবো।'

সেই পরটা আর বড় একটা আসে না।

অথচ দিদিরই পুতুল খেলায় মন ছিল বেশী। আমার অনেক ডানপিটেমি খেলা ছিল। আমি দাদাদের ক্যারমবোর্ড নিয়ে ক্যারম খেলতাম, ছাতে গাব্বু খুড়ে চুপিচুপি দুপুরবেলা দাদাদের ড্রয়ার থেকে মার্বেল সরিয়ে এনে গুলি খেলতাম 'থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ' করে, আমি খালি দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি বানাতাম, উনুন ধরাবার কাঠ থেকে বেছে বেছে পাতলা কাঠ নিয়ে খেলাঘরের উনুনের জন্যে সরু সরু কুচি করে জড়ো করতাম ভাঙা ছুরি দিয়ে; আর মাটি দেখলেই তাতে জল ঢেলে মাটির পুতুল খেলনা বানাতে বসতাম।

দিদির এগুলোয় আর্কো ...
না।

দিদিই তখন আমার ডাকে দিতো ...
রুচি, কী দস্যিবৃত্তি হচ্ছে, আয়-না ...
খেলি। গিন্নীর মেজবো তো আজ ...
নাচতে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেল ...
সঙ্গে, এখন ওর পালার রান্নাটা কে ...
তার ঠিক নেই। মেজবৌ তো ...
এদিকে বড়বৌয়ের ছেলের জন্যে ...
পর্যন্ত কামাই করেছে আজ, যতো ...
গিন্নীর।'

এরকম কথা দিদি অনর্গল ...
হঠাৎ দিদির ওই পুতুলের সংসারের ...
অর্গল পড়ে যাচ্ছে যেন।

অভ্যাসের বশে যদিও মা ...
কোনো দিন খেলে, তার মধ্যে ...
একান্তই অভাব, তা আমি প্রাণে প্রাণে ...
পাই।

আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে ...
'দিদি, তুই তো এখন থেকেই বদলাতে ...
করেছিস।'

কিন্তু দিদি দুঃখ পাবে ভেবে ...

অগত্যাই ছাতে উঠে পাঁচিলে ...
ঝুঁকিয়ে সেই ধানকল দেখি, সেই ...
খানি উন্মুক্ত আকাশের নীচে বিরাট ...
চকচকে সিমেন্ট বাঁধানো, তার উপর ...
ঢেলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, মজুরনীরা ...
দিয়ে দিয়ে ঠেলছে।

এক এক সময় ধানের আড়ালে ...
নিয়ে শুয়ে পড়ে, গায়ে রোদ লাগে ...
করে না।

আমার রোজই নতুন লাগে।

দিদি ঘরে শুয়ে গল্পের বই পড়ে ...

তবে আজকাল প্রায়ই দারুণ বকা ...
করছেন মা দিদিকে।

দিদি নাকি বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে, ...
রাজা হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্মে এ্যালা ...
দিচ্ছে।

'এ্যালাকাড়ি' শব্দটার মূলগত অর্থ ...
আজও জানি না, অর্থগত অর্থ ...
'অবহেলা'।

মার চেঁচামেচি শুনলেই দুদ্দাড় ...
নীচে নেমে আসতাম। তখন মা আ...
একহাত নিতে শুরু করতেন, 'এই ...
এক রাজকন্যে তৈরী হচ্ছেন! ...
অবতার। সমস্তক্ষণ ছাতে তোর ...

...কেবল ধেই ধেই করে ছাতে ওঠা। ...ইনি তো রাতদিন নাটক-নভেল ...পড়ে আছেন। যতো চোরদায়ে ধরা ...এই আমি! বেলা গড়িয়ে গেল, ...শুকনো কাপড়গুলো দড়িতে ...আছে গো। তোলার নাম নেই। ... দিদির ...বয় 'বয়েস হয়েছে', মা-বাপের ঘরে আর ...বসছে না, তুমি, তুমি পারো না বুড়ো ...মেয়ে এটুকু করতে?'

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতাম।

ততক্ষণে দিদিও অবশ্য কর্তব্যকর্মে ...দিয়েছে।

দাদারা বাড়িতে থাকলে কিন্তু মা ঠিক ...ভাবে কথা বলতেন না, বিশেষ করে ...মেজদাকে মা রীতিমত ভয়ই করতেন। আর ...দাকে যেন সমীহ।

মেজদার এরকম কথার একটুও ...কানে গেলে মেজদা মাকেই বকে দিতো।

বলতো, 'আচ্ছা মা, শ্বশুরবাড়ি ...গে তো খেটে মরবেই, আর অন্য কিছু ...পাক না পাক, বকুনিটা ঠিকই খেতে ...। এখানে যে ক'দিন আছে একটু ...শান্তিতে থাকুক না।'

মা তখন কাঁদো কাঁদো হতেন, 'আর ...শ্বশুর-শাশুড়ী আমায় গঞ্জনা দিয়ে ...বে, 'মেয়েকে কিছু শেখাওনি' তখন?

'ওঃ গঞ্জনা? তার হাত এড়াতে পারবে ...? তোমার যখন মেয়ে, তোমায় ওটা ...তেই হবে মা। তত্ত্ব ভাল না হলেও খেতে ...বে, মেয়েকে বাপের বাড়িতে আনতে ...লেও খেতে হবে। কী, হবে না?'

তখনকার মতো মা ব্যাজার মুখে ...তেন, 'বাপ-দাদার আস্কারায় আস্কারায়ই ...যাচ্ছে মেয়েরা। তবে থাক, কিছু ...বো না। আদর করে নাটক-নভেল ...দাও, বোনেরা বিছানায় অঙ্গ ঢেলে ...ক তাই।'

কিন্তু তারপরে আর টুঁ শব্দটি ...তেন না।

মেজদা কিন্তু এঘরে এসে বলতো, ... ওই কাজটাজগুলো সময়ে করে ...স না কেন বাবা! সামান্য নিয়ে যখন ... করেন।'

...আর বাবা?

...বাবার কানে অবশ্য হরদমই যেতো।

বাবা বাড়িতে থাকলে তো মার একমাত্র ... প্রসঙ্গই ছিল। ছেলেমেয়ের নামে ...।

এখন বুঝতে পারি, ওটা আর কিছু ...'আমার সন্তান 'পারফেক্ট' হোক এই ...একটা বাসনা তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধ-...ছিল। কিন্তু সেটা হওয়াবার জন্যে ...পদ্ধতি আবশ্যক সে সম্পর্কে জ্ঞান ...না। তাই অহরহ উপদেশ, বকুনি, আর ...তে নিয়ে গিয়ে ফেলা, এই পথেই ...।

বাবা আবার আর এক কথা বলে মাকে ...দিতেন, 'তা কিই বা এমন কাজ? ... তুমিই করে নিতে পারো। এখন ...তা আর তোমায় রান্না করতে হয় না।'

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।

ওই অবিনাশ ডাক্তার রোডে আমার বছর খানেক পর থেকে আমাদের বাড়িতে এক 'বামুনদির' আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথমে এসেছিল, মার একবার 'পানবসন্ত' হওয়ায়। বড়ো বয়সে কচি ছেলেদের রোগ দেখে সবাই (মানে আমাদের সেই পুরনো বাড়ির জ্যেঠিমা পিসিমারা। মাঝে মাঝেই তো বেড়াতে আসতেন ও'রা।) 'ছি ছি' করে ছিলেন। তবে ও'রাই বিধান দিয়েছিলেন, একুশ দিন ঘরে আটকে থাকতে হবে, রান্না বান্না ছোঁওয়া চলবে না, বাড়িতে মাছ ঢুকবে না, পান খেয়ে মার ঘরে কারো ঢোকা চলবে না। আর লালপাড় শাড়ি পরে তো নয়ই। মা-শীতলার ব্যাপার তো! মাছ পান আর লালপাড় শাড়ী দেখলেই উনি চটে যান।

তা সেই সময় কোথা থেকে যেন ওই বামুনদিকে জুটিয়ে আনা হলো। দু বেলা রান্না করে দিয়ে চলে যেতে, খেতো না। ঠিকে লোক যাকে বলে। তা সেটাই পরম লাভ।

তারপর মা সেরে ওঠার পর বাবা বললেন, 'বেশ তো চলছে, বামুনমেয়ে থেকেই যাক।'

মা যে পুলকিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাস্তি, তবু বলতে ছাড়েন নি, 'মাস মাস করকরে আটটা করে টাকা! শুধু দুটি রেঁধে দিয়ে যাওয়ার জন্যে? টাকা কি খোলামকুচি?'

কিন্তু থেকেও গেল বামুনদি।

বাবার বেশ একটা নিঃশব্দ জেদ ছিল।

বাবা বেশী কথা বললেন না, শুধু বললেন: 'গরীব-গেরস্ত মানুষ, একটা চাকরী পেয়ে গেছে, ওর অমটা মারাটা ঠিক হবে?'

'মনোরমাদির বাড়িতে আড়াই টাকায় বামুনদি আছে।'

'আহা সে নিশ্চয় খাওয়া-পরা।'

মা ঠোঁট উল্টে বললেন, 'একটা মানুষের খেতে পরতে আবার কত লাগে?'

সেকালে অবশ্য তাই বলতো লোকে।

তা সে যাই হোক মাকে আর রান্না করতে হতো না। কিন্তু সেকথার উল্লেখ হলে খুব রেগে যেতেন। বলতেন, 'রোসো কালই ছাড়াচ্ছি ওকে। আমি কেন তোমার সংসারে বসে খাবো। দাসীবাঁদী আছি, তাই থাকবো।'

আর তখনই হঠাৎ হঠাৎ সেই মখমল বাঁধানো খাতাটা মনে পড়ে যেতো আমার।

তবে মা বলতেনই, ছাড়তেন না।

কিন্তু ওই 'বয়েস ধরা' কথাটা মা-বাবার সামনেও বলতেন না এটা লক্ষ্য করেছি। দিদি একা থাকলেই বলতেন চাপা রাগের গলায়। আমার কানে অবিশ্যি যেতো।

একদিন দিদিকে জিগ্যেস করে বসলাম, 'আচ্ছা দিদি, মা ওই কি একটা কথা বলেন, 'বয়েস ধরা' ওর মানে কী রে?'

দিদি কড়া গলায় বললো, 'জানি না। আর কাউকে জিগ্যেস করতে যাবি না, খবরদার।'

না, জিগ্যেস কাউকে করিনি, তবু কেমন করে যেন ওর একটা অর্থ আবিষ্কার করেও ফেললাম।

দিদি যে মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইতো 'দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি, তাই চঞ্চল মন চকিত নয়ন তৃষিত আকুল আঁখি—' অথবা 'বাতাস আসিয়া কহে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে—' এসব যেন শুধু মুখস্থ গানই নয়, যেন গানের ছদ্মবেশে গভীর কোনো অর্থবাহী কথায় আত্মপ্রকাশ। ওর মধ্যেই ওই কথাটার মানে।

যদিও কুমারী মেয়ের মুখে 'প্রিয়তম' শব্দটা উচ্চারিত হওয়া যে খুবই গর্হিত এ জ্ঞান টনটনে ছিল আমার, তবু দিদিকে তখন কেমন অদ্ভুত সুন্দর দেখাতে লাগতো, তাই 'ছি ছি'ক্কার দিতে পারতাম না।

দিদির গলা বেশ মিষ্টিও ছিল।

ওই মিষ্টি গলার সূত্রেই একদিন এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের বাড়িতে। মেজদার বন্ধু দিলীপ, যে এতাবৎ-কাল মেজদার মারফত আমাদের যতো পত্র-পত্রিকা আর বই জুগিয়ে আসছে, সে এক-দিন হঠাৎ নিজেই একগাদা বই হাতে নিয়ে এসে বললো, 'তোদের বাড়িতে কে গান গায় রে অমন? সেদিন শুনতে পেলাম, ঠিক কলের গানের মত'—

মেজদা হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'আমাদের বাড়িতে গান? স্বপ্ন দেখছিস নাকি? তাও আবার কলের গানের মত! বাড়িওলার বাড়ির কলের গানই শুনেছিস বোধহয়।'

দিলীপদা বললো, 'না রে। তোদের বাড়িরই ছাত থেকে সুরটা ভেসে আসছিল।'

এসব কথা অবশ্য দালান থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। ওঘরে ঢুকে নয়। দাদাদের বন্ধুটন্ধুর সামনে বেরোনোর 'পারমিশান' আর ছিল না আমাদের। অনেকদিনই ঘুচে গিয়েছিল।

তবে মেজদার গলা তো চড়াই, দিলীপদাও বেশ খোলা গলায় কথা বলছিল, কারণ সেদিন মা আর বাবা বাড়ি ছিলেন না তখন। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন ঠাকুর্দার বাৎসরিক কাজে, অথবা কারো অসুখ শুনে ঠিক মনে নেই। মোট কথা আমাদের সেখানে যাবার দরকার ছিল না।

তাছাড়া—বামুনদিকে রাখার পর থেকে মার এই একটা কাজে কিছু কিঞ্চিৎ ছুটি হয়েছিল।

মেয়ে আগলানো!

আমার আট, আর দিদির দশ, তখন থেকেই মাকে বলতে শুনেছি, 'যেখানেই যাবো মেয়ে গলায় গেঁথে যেতে হবে। মেয়ে বড় হওয়ার এই জ্বালা। সাধে কি আর মেয়েতে ছেলেতে এতো তফাৎ করেছে লোকে। ছেলে বড়ো হওয়া ভরসা, মেয়ে বড়ো হওয়া ভয়।'

এখন মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেলে মা বামুনদিকে বলেন, 'বামুনমেয়ে, তোমায় বাছা দু-আনা পয়সা

বিশেষ উপহার
স্টক থাকা পর্যন্ত!
আপনার জন্য
মাত্র ৮০ পয়সায়

খেতে দেব, তুমি একটু বসে থেকো। ততোক্ষণ মা আসি দিদিদের দেখো।'

মা চলে গেলে দিদি রাগে দাঁত পিষে বলতো, 'দিদিদের দেখো! রাঁধুনী-বামুনদির কাছে কী মান-সম্মানটাই বাড়লো। দিদিরা যেন ঘর ভেঙে চলে যাবে। ঠিক হন, একদিন সত্যি তাই করলো।'

দিদি আজকাল বড্ড মেজাজী হয়ে উঠছিল সত্যি। মেয়েদের একা বাড়িতে রেখে যেতে নেই। এ তো অবধারিত ব্যাপার, সবাইদের সংসারেই আছে। তবে?

তা যাক সেদিন বামুনদির উপস্থিতিতেও সেই অঘটন ঘটলো।

মেজদা বললো, 'সুরটা ভেসে আসছিল? ছাত থেকে? সন্ধ্যেবেলা বোধহয়?'

'তাই মনে হচ্ছে?'

মেজদা আবার ছাত ফাটিয়ে হেসে ওঠে, তবে আর দেখতে হবে না, ছাতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোনো শাঁখচুন্নীর গান শুনেছিস।'

আমার মনে পড়লো, কদিন আগে মা-বাবা যেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন, দিদি ছাতে উঠে বেশ গলা ছেড়ে গান গাইছিল।

শুনে আমারই ভয় ভয় করছিল। এতো গলা তুলছে কেন বাবা! হতে পারে ওদিকটা জঙ্গল, কিন্তু এদিকটায় তো বাড়িটাড়ি আছে? যদি কেউ বুঝে ফেলে রমেশবাবুর বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে। বলেওছিলাম বোধহয় একবার, কিন্তু দিদি গ্রাহ্য করেনি। হাত নেড়ে আমায় চুপ করতে বলেছিল।

সেদিন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হলো, দিদি কী ইচ্ছে করে গলা তুলেছিল? দিদি কি জানতে পেরেছিল কেউ তার গান কান পেতে শুনছে।

দিলীপদা বললো, 'ধ্যেৎ'

'আচ্ছা তুই ছিলি কোথায়?'

'আরে আমি তো তোর কাছেই আসছিলাম। সিঁড়ির সামনের দরজা খুলে দিয়ে তোদের ওই বামুনদি না কে বললো, 'দাদাবাবুরা বাড়ি নেই, শুনে চলে গেলাম, তখনই শুনলাম—'

আমরা দোতলার বাসিন্দা, সিঁড়ির সামনের দরজাটাই আমাদের সদর দরজা। অতএব এটা অবিশ্বাস্য নয়, ছাতের গান সেখানে ভেসে এসেছে। একইতো সিঁড়ি উঠে গেছে।

মেজদা হঠাৎ হাঁক পাড়লো, 'এই মুচি তোরা ছাতে গান গাস?'

মা-বাবা বাড়ি না থাকায়, মেজদাও যেন স্বরাজ পেয়েছিল। নইলে বন্ধুর সামনে বুড়ো হয়ে যাওয়া বোনকে ডাকে? [illegible] কি তখন [illegible] না কি? [illegible] পায় কার কার না?

আমি এসে দাঁড়াতেই মেজদা বললো, 'দিলীপ বলছিল এবাড়িতে নাকি—কলের গানের মতন গান হয়। গাস বুঝি?'

আমিই বরাবর একটু দুঃসাহসী বলেই বোধহয় মেজদা আমাকেই সন্দেহ করলো, কিন্তু জানে না তো তলে তলে দিদি কতো দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। দিদি নির্ঘাৎ দিলীপদাকে আসতে দেখে গলা তুলে গেয়েছে। তবে গেয়েছিল সত্যিই খুব ভালো।

আমি ফট করে সেটাই বলে বসলাম, 'আহারে! আমি গান গাইলে তো খোপারা ছুটে আসতো। গান দিদি গায়। কতো গান জানে। খুব ভালো গায়।'

মেজদা যেন চমৎকৃত হয়ে বলে উঠলো, 'তাই না কি? কোথা থেকে শিখলো?'

'এমনি। বাড়িওলাদের কলের গান শুনেটুনে।'

রেডিওর নামও শুনিনি তখন আমরা। কাজেই তার প্রশ্ন নেই।

মেজদা ডাকলো, এই নুনী, তুই নাকি একটা ওস্তাদ গায়িকা হয়ে উঠেছিস? কই গা দিকিন শুনি, কেমন কলের গানের মতন!'

দিদি অবশ্য প্রথমটা 'ধ্যেৎ' বলে চলে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাইল। মেজদা অভয় দিয়ে বললো, 'গা না বাবা, শাসনকর্তারা তো বাড়ি নেই। দাদাও নেই।'

দিদি গাইল।

যদিও ঘরের মধ্যে সামনে বসে নয়, দালানের জানালার কাছে বসে।

গাইলো

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।'

বুঝলাম বেশ সাবধানে বেছেগুছেই গেয়েছে। তবু আমার অকালপক্ক মনের মনে হলো, ওর মধ্যেও যেন কিছু অর্থ লুকনো আছে।

দিদির সুরের আবেগেই কি?

দিদির গলা কাঁপছিল।

কাঁপতেই পারে। এতোবড়ো একটা বৈপ্লবিক কান্ড ঘটছে!

মেজদা বললো, 'আরে সত্যিই তো। ঠিক ঠিক সুরেই তো গাইলি মনে হচ্ছে। আহা শিখতে টিখতে পেলে তোর উন্নতি হতো! তা যা আমাদের একখানি বাড়ি! অচলায়তন!...গা, আর একটা গা—।

দিদি আস্তে ধরলো—

...আমায় কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা
আমি পথের ভিখারী নহি গো—

আর ঠিক সেই সময় বজ্রপাতের মত, দরজার শেকল নড়ে উঠলো।

কে জানতো যে মা-বাবা এতো তাড়াতাড়ি ফিরবেন! তারপর?... বজ্রপাতের পর যা হয় তাই।

সেদিন প্রথম বাবাকেও বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম।

দিলীপদা অবিশ্যি তখন চলে গেছে।

বাবা মেজদাকে বললেন, [illegible] যখন হালকা, তখন [illegible] অমর্ম। তোমা[illegible] হবে ভেবে দেখে[illegible]

আর দিদি[illegible] বলেই তুমি এক[illegible] বাইরের [illegible] সামনে গান গাইবে? তোমার [illegible] কোনো [illegible] নেই? কই, আমরা তো [illegible] গাইতে পারো।'

—বাবার মুখে 'তুমি'!

এরপরেও দিদি শতখন্ডে ভেঙে পড়বে না?

বললে তো বলতে পারতো 'তোমরা কবে আমাদের সম্পর্কে এতোটুকু কৌতূহল প্রকাশ করেছো যে শুনবে? আমাদের অনেক খাওয়াতে হয় তাই জানো, ভালো পরাতে হয় তাই জানো। আমাদের মধ্যেও যে একটা মন আছে, জানো সেটা?'

একাল হলে হয়তো বলতো।

আরো কতো কীই বলতো হয়তো।

কিন্তু সেকালে মেয়েরা কে কবে ভাবতে পেরেছে গুরুজনের মুখের ওপর উচিত কথা শুনিয়ে দেওয়া যায়?

বেচারী দিদি। কিছুটি বলেনি, তবু মা তার ওপর বাক্যবাণ বর্ষণ করেই চলেছেন। দিদি যা করেছে তা যে প্রায় 'খারাপ' হয়ে যাওয়ার মত, সেটাই বুঝিয়ে ছাড়ছেন তাকে মা। 'তেরো বছরের ধাড়ি মেয়ে, ভালমন্দবোধ নেই তোমার?'

অনেক বলার পর আবারও যখন নতুন বেগে শুরু করলেন, 'যতো ভাবছি, ততোই নতুন করে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি আমি! আমার মেয়ে হয়ে, এতো শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে তুই কিনা একফোঁটা আমি চোখের আড়াল হতেই পরপুরুষকে গান শোনাতে বসলি? তাহলে তো দুদিনের জন্যে বিশেষ দরকারে কোথাও যেতে হলে তোকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে যেতে হবে। না হলেই হয়তো—'

তখন ওই হয়তোটা আর উচ্চারণ করতে দিল না মেজদা। হঠাৎ এসে হাতজোড় করে বলে উঠলো, 'মা তোমার পায়ে পড়ছি, এবার ওকে রেহাই দাও। বলেছি তো সব দোষ আমার। আশ্চর্য! তোমাদের থিয়েটারে গিয়ে নাচ-গান দেখার দোষ হয় না, অথচ ছেলেমানুষ মেয়েটা একটা গান গেয়েছে বলে একেবারে মহাপাতক হয়ে গেছে।'

কী জানি কী ভেবে মা হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

কিন্তু সত্যিই কি শুধু আমাদের মাই এতো নিষ্ঠুর ছিলেন?

না, তা বলা যায় না।

সেকালে মায়েরা জানতেন এটাই মাতৃকর্তব্য। আমাদের তো তবু শুধু বকেই ক্ষান্ত দিলেন, আমার বড় পিসিমার মত মা হয়তো এতোবড়ো গর্হিত পাপে মেরেই পাট করে ফেলতেন।

(ক্রমশঃ)

আজকের এই সুগম যাতায়াতের যুগে দেশভ্রমণ দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই কি একটা দেশকে কতোটুকু চেনা যায়? চিনতে হলে শুধু ভূগোল নয় জানা দরকার তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই চার দিক থেকে আলোচনা করা হবে— আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব আমরা।

কোচবিহার

প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম জেলা কোচবিহারের কাছে এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঋণ সীমাহীন। বাংলাভাষা যেদিন অন্ত্যজ ও ইতরজনের ভাষা বলে উপেক্ষিত ছিল সেদিন কোচবিহারে সে-ভাষা রাজমর্যাদা লাভ করে। অর্ধ সহস্র বর্ষ আগে, যখন বাংলাভাষা সম্পূর্ণরূপে জড়তামুক্ত হয়নি তখনও কোচবিহারের যাবতীয় রাজকার্য বাংলাভাষায় সম্পন্ন হত। ভুটান, আহোম, এমনকি পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের কাছেও কোচবিহার রাজের সব চিঠি লিখিত হত বাংলা ভাষায়। ১৫৫৫ খৃস্টাব্দে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোম রাজাকে লিখিত যে চিঠিখানির সন্ধান পাওয়া গেছে, এখনও পর্যন্ত সেইটিই বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

অসমিয়া ভাষার উন্নয়নেও কোচবিহার রাজদরবারের অবদান সামান্য নয়। আসামের শ্রেষ্ঠ কবি ও নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রবক্তা শঙ্করদেব সম্ভবত আহোমদের উৎপীড়নে আসাম ত্যাগে বাধ্য হয়ে রাজা নরনারায়ণের শাসনকালে (১৫৫৫—৮৭) কোচবিহারে আসেন। কোচবিহারে অবস্থানকালে শঙ্করদেব 'রামবিজয় নাটক' লেখেন এবং রাজ আনুকূল্যে সে নাটক অভিনয়েরও ব্যবস্থা হয়। মধুপুর গ্রামে ছিল শঙ্করদেবের আশ্রম। সেখানে অবস্থানকালে ভাগবতেরও অনুবাদ করেন এবং মধুপুরেই শঙ্করদেবের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

পরবর্তীকালে শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব সম্ভবত একই কারণে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে (১৫৮৭—১৬২৫) কোচবিহারে আশ্রয় নেন ও রাজসভায় অবস্থানকালে বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কোচবিহার রাজদরবারের পোষকতায় মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়।

স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অফ কুচবিহার' গ্রন্থে হাণ্টার 'কোচবিহার' নামের উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বিহার' শব্দটি বৌদ্ধবিহার থেকে আসে। এ মন্তব্য হয়ত ভুল নয়, কারণ 'বিহার' শব্দের অর্থ মিলনক্ষেত্র, আবাসস্থল। তবে পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার পরেও দীর্ঘ সাড়ে চারশ বছর ঐ রাজ্যটি কামরূপ নামক একটি বৃহৎ রাজ্যের অংশ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় কোচ রাজারা বর্তমান কোচবিহার অঞ্চলে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্যের নাম রাখেন 'কোচবিহার' অর্থাৎ কোচদের বাসস্থান।

স্বতন্ত্র কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবত ১৫১০ খৃঃ। তার প্রতিষ্ঠাতা রাজার নাম চন্দন। তিনি কামরূপ রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঐ রাজ্যের পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তের বছর রাজত্ব করার পর অল্প বয়সেই চন্দনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৫২২ খৃঃ বিশ্বসিংহ রাজা হন ও তাঁর ভাই শিষ্যসিংহ হন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী-রায়কৎ। এই রায়কৎ পদ ক্রমে বংশানুক্রমিক হয় এবং বাসুদেবপুর হয় রায়কৎদের স্থায়ী বাসভূমি ও কর্মকেন্দ্র। ১৫৫৪ খৃঃ বিশ্বসিংহ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নরসিংহ রাজা হন। কিন্তু অল্পকাল পরে তিনিও তাঁর ভ্রাতার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করলে ১৫৫৫ খৃঃ নরনারায়ণ কোচবিহারের রাজা হন।

মহারাজা নরনারায়ণের পরাক্রমে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ভুটান, আসাম, কাছাড়, জয়ন্তিয়া, মণিপুর ও ত্রিপুরা কোচবিহারের বশ্যতা স্বীকার করে। রাজা নরনারায়ণের নামাঙ্কিত যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয় তা নারায়ণী মুদ্রা নামে পরিচিতি লাভ করে এবং একদা সমগ্র পূর্ব ভারতে সে মুদ্রা গ্রাহ্য ছিল। কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত প্রাগজ্যোতিষ শহরের (বর্তমান গৌহাটি) কামাখ্যা মন্দিরটি নরনারায়ণের পোষকতায় পুনর্নির্মিত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম কোচবিহারের নৃপতিদের মধ্যে মহারাজা নরনারায়ণই ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী। আবার রাজ্য শাসনেও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁর উদ্যোগেই বাংলাভাষা কোচবিহারের রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। তাঁর রাজত্বকালে পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ কোচবিহার পরিদর্শন করেন (১৫৮৬) এবং তাঁর ভ্রমণ লিপিতে কোচবিহার রাজ্যের বিশালতা বর্ণনাকালে লেখেন, ঐ রাজ্য তখন প্রায় চীনের সীমা স্পর্শ করে এবং চীনের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অতি ভদ্র এবং সম্পূর্ণ অহিংস। সে সময় কোচবিহার রাজ্যে ভেড়া, গরু, কুকুর, বিড়াল, পাখি প্রভৃতির জন্যও হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল ছিল।

মহারাজা নরনারায়ণের সব অভিযানের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর অনুজ শুক্লধ্বজ, যিনি চিলা রায় নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশাল রাজ্য সুশাসনের জন্য রাজা নরনারায়ণ ও চিলা রায় সংকোষ নদী বরাবর রাজ্য ভাগ করে নেন। চিলা রায় হন পূর্ব অঞ্চলের রাজা, এবং তাঁর রাজধানী হয় বর্তমান কোচবিহারের পূর্ব প্রান্তে তুফানগঞ্জ পরগণায় ফুলবাড়ি তালুক। সেখানে ভগ্ন দুর্গ ও বাঁধ আর চিলা রায়ের নামাঙ্কিত পুষ্করিণী আজও চিলা রায়ের একদা সমৃদ্ধ রাজধানীর সাক্ষ্য ও স্মৃতি বহন করে। শুক্লধ্বজ চিলা রায় নামে খ্যাত হওয়ার কারণ, তাঁর আক্রমণরীতি ছিল চিলের মত তীক্ষ্ণ ও তীব্র।

তেত্রিশ বছর রাজত্বের পর ১৫৮৭ খৃঃ নরনারায়ণ পরলোকগমন করলে তাঁর একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হন। লক্ষ্মীনারায়ণ দুর্বল প্রকৃতির শাসক ছিলেন। মোগল সেনাপতি শের আফগানের আক্রমণে তাঁর রাজ্য বিপন্ন হলে তিনি ১৫৯৬ খৃঃ সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি রাজা মানসিংহের সঙ্গে দেখা করে কোচবিহারকে মোগল সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজ্য স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব দেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ঐ আচরণে কোচবিহারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিক্ষুব্ধ হলে তিনি মোগল দুর্গে আশ্রয় নেন ও আত্মরক্ষার জন্য মোগলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। [illegible] জেহাজ খাঁর নেতৃত্বে মোগল সেনারা কোচবিহারে প্রবেশ করে বিদ্রোহ দমন করে [illegible]
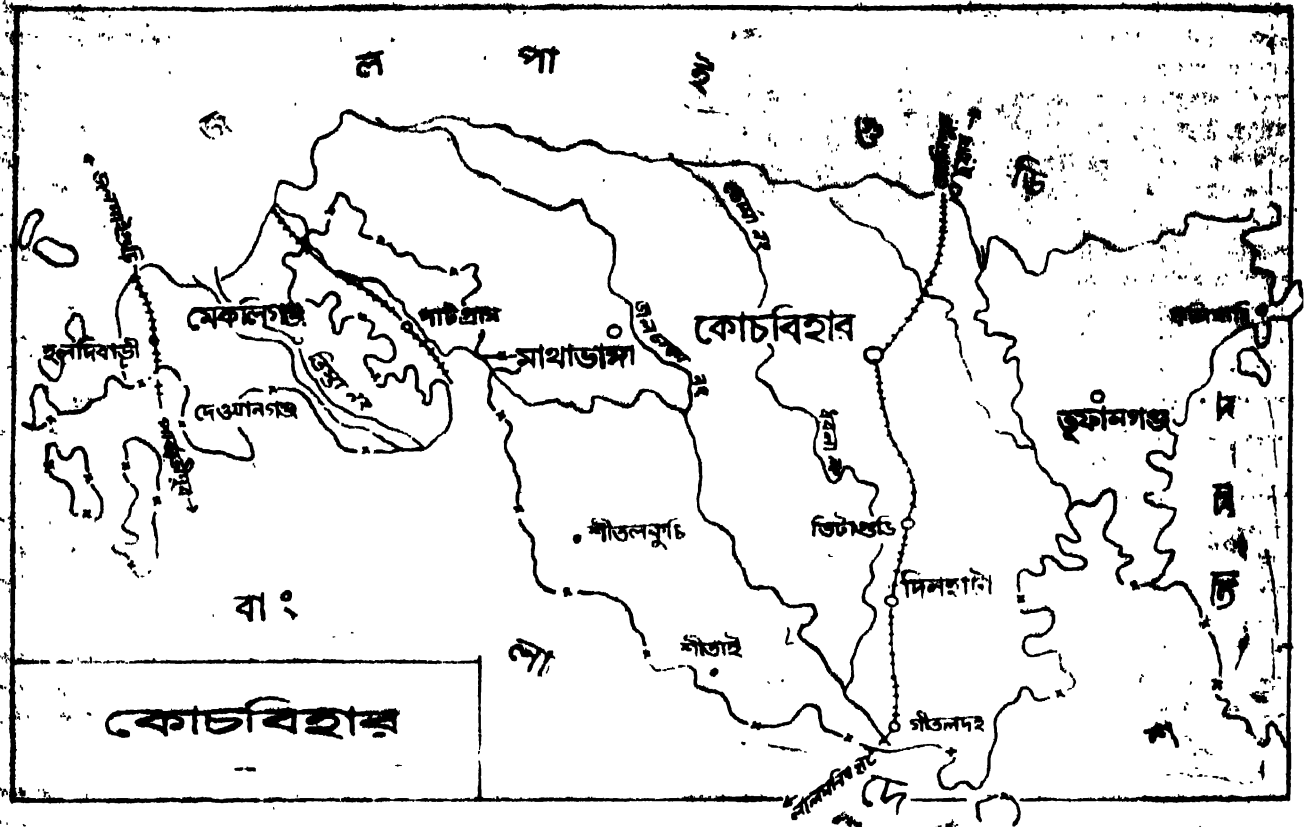
প্রচুর ধনসম্পদ লুঠ করে স্বস্থানে ফিরে আসে। পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন দিল্লীর বাদশাহ, গৌড়ের মোগল শাসক আবার কোচবিহার আক্রমণ করে। তখন রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে একটা আপসে আসেন। স্থির হয় যে, মোগল বাহিনী আর কখনও কোচবিহারে প্রবেশ করবে না আর কোচবিহারও মোগল সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রমণ করবে না। নারায়ণী মুদ্রার প্রচলনও ঐ চুক্তি অনুসারে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে সীমিত হয়। পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্বের পর ১৬২৯ খৃঃ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বীরনারায়ণ রাজা হন।

বীরনারায়ণও দুর্বল রাজা ছিলেন, সেকারণে ভুটান ও আরও কয়েকটি রাজ্য তাঁর শাসনকালে কোচবিহার রাজের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে এবং সেই সঙ্গে কর দেওয়াও বন্ধ করে। তবে বীরনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাঁর শাসনকালে কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী আঠারোকোটায় স্থানান্তরিত হয়। পাঁচ বছর রাজত্বের পর ১৬২৫ খৃঃ তাঁর মৃত্যু হলে প্রাণনারায়ণ রাজা হন ও ১৬৬৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রাণনারায়ণের শাসনকালে প্রথমে, ১৬৩৮ খৃঃ চট্টগ্রামের (তখন নাম ছিল ইসলামাবাদ) শাসক ইসলাম খাঁ কোচবিহার আক্রমণ করেন। তবে সে আক্রমণের পরিণতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তারপর ১৬৬১ খৃঃ বাঙলার শাসক মিরজুমলা কামরূপ অভিযানের পথে কোচবিহারে প্রবেশ করেন ও সব হিন্দু মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেন। রাজা প্রাণনারায়ণ প্রাণরক্ষা করতে বনে গিয়ে আশ্রয় নেন। মিরজুমলা তখন ইসফন্দিয়ার বেগকে কোচবিহারের শাসক নিযুক্ত করে আসাম অভিযানে অগ্রসর হন। কোচবিহার বাংলার শাসককে দশ লক্ষ নারায়ণী মুদ্রা দানে স্বীকৃত হয়। কিন্তু কোচবিহারে অবস্থানরত মিরজুমলার সেনাবাহিনী এমন পীড়ন শুরু করে যে, কোচবিহারের জনগণ শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় ও আত্মগোপনকারী রাজাকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়। প্রাণনারায়ণ সে আহ্বানে সাড়া দেন এবং কোচবিহারের বিদ্রোহী জনগণের আক্রমণে মিরজুমলার সৈনারা গৌহাটিতে পশ্চাদপসরণ করে। এতে ক্রুদ্ধ মিরজুমলা আবার কোচবিহার দখলে অগ্রসর হন। কিন্তু পথেই অসুস্থ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। রাজা প্রাণনারায়ণ সুপণ্ডিত, কবি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পোষকতায় জল্পেশ, বাণেশ্বর ও সন্দেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পরিকল্পনায় রাজ্যে অনেক সড়ক সেতু নির্মিত হয়।

১৬৬৫ খৃঃ রাজা প্রাণনারায়ণের মৃত্যু হলে কোচবিহার রাজ্যে কিছু দিন বিশৃঙ্খলা চলে এবং রাজা প্রাণনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মদননারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের প্রধান নাজির মহীনারায়ণ সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদননারায়ণ নাজির মহীনারায়ণকে রাজ্য ত্যাগে বাধ্য করেন এবং বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থানকালে মহীনারায়ণ নিহত হন। ঐ সময় মহীনারায়ণের পুত্রেরা ভুটানের রাজার সহায়তায় কোচবিহারের সিংহাসন দখলে তৎপর হন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে ১৬৮০ খৃঃ অপুত্রক অবস্থায় মদননারায়ণের মৃত্যু হলে মহীনারায়ণের পুত্রদের আবার তৎপরতা শুরু হয়। আর তাদের রাজ্য দখলে সহায়তার অজুহাতে ভুটানী সৈন্যদল কোচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করে ব্যাপক লুঠতরাজ শুরু করে। বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমে সমগ্র কোচবিহার রাজ্য হতশ্রী হয়। সেই সময় রাজ্যকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোচবিহারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ১৬৮২ খৃঃ প্রাণনারায়ণের পাঁচ বছর বয়স্ক প্রপৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তারপর ১৬৮৫ খৃঃ ইবাদৎ খাঁর নেতৃত্বে এক মোগল বাহিনী ঘোড়াঘাট থেকে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে ও বহু এলাকা দখল করে নেয়। ঐ সময় বালক রাজার পক্ষে ম্যাজির জগনারায়ণ মোগল আক্রমণ প্রতিরোধে তৎপর হন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস বিশেষ সফল হয় না এবং ১৬৯১ খৃঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তার দু বছর পরে, মাত্র ষোল বছর বয়সে মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে রাজ্যে আবার অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয়। মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুতে কোচবিহারে মেচ রাজবংশের শাসনের অবসান হয় এবং রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে

পরলোকগত নাজির জগনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণ ১৬৯৩ খৃঃ কোচবিহারের রাজা হন। রূপনারায়ণের শাসনকালে মুস্‌লিম আক্রমণের ফলে কোচবিহারের বহু অংশ বিচ্ছিন্ন এবং কোচবিহার রাজ্য মোটামুটিভাবে বর্তমান কোচবিহার জেলায় সীমাবদ্ধ হয়। রূপনারায়ণ আঠারোকোটা থেকে রাজ্যের রাজধানী তোর্ষা নদীর পূর্ব পারে গুড়িয়াহাটিতে স্থানান্তরিত করেন; স্থানটি বর্তমান কোচবিহার শহরের সমীপবর্তী অঞ্চল। ১৭১৪ খৃঃ রূপনারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন এবং সে সময় কোচবিহারের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হয়। একদিকে ভুটান, অপরদিকে রংপুরের মুসলমান ফৌজদারের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় উপেন্দ্রনারায়ণকে। তিস্তা নদীর পশ্চিম পারে সিংহেশ্বর ঘাটের যুদ্ধে তিনি মুস্‌লিম আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন। তখন চতুর রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ভুটানীদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং ১৭৩৭-৩৮ খৃঃ ভুটানীদের সাহায্যে মুস্‌লিম আক্রমণ প্রতিহত করেন। উপেন্দ্রনারায়ণ ধুলিয়াবাড়ীতে একটি নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং ৪৯ বছর রাজত্বের শেষে ১৭৬৩ খৃঃ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রথমা মহিষী তাঁর সঙ্গে সহমরণে যান এবং প্রথম মহিষীর ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়া মহিষীর পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করা হয়। দেবেন্দ্রনারায়ণের বয়স তখন মাত্র চার বছর।

শিশু দেবেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালে রাজ্যে আবার একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হলে ভুটানীরা মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিবলে কোচবিহারের শাসন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ করায়ত্তে আনতে তৎপর হয়। রাজধানীতে ভুটানের একজন রেসিডেণ্ট ও ভুটানের এক বাহিনী সৈন্য রাখার ব্যবস্থা হয় এবং ঐ রেসিডেণ্টই কোচবিহারের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ওদিকে রাজগুরু গোঁসাই রামানন্দর প্ররোচনায় রতিশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণের হাতে শিশুরাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ মাত্র ছয় বছর বয়সে নিহত হন। কিন্তু রাজদরবারের কঠোর মনোভাবের জন্য কোন অনধিকারীকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। ভুটানরাজের চেষ্টায় রাজগুরু গোঁসাই রামানন্দ ধৃত ও নিহত হন।

এদিকে কোচবিহারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভুটানের হস্তক্ষেপ দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ১৭৭০ খৃঃ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ বন্দী হন ও তাঁর অনুগত নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করেন। ভুটানের ইচ্ছা অনুসারে ধৈর্যেন্দ্র ছোট ভাই রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে বসেন কিন্তু তিনি দু বছর নামেমাত্র রাজা থাকার পর ১৭৭২ খৃঃ মারা যান। রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে খগেন্দ্রনারায়ণ দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ভুটানের অনুগত দেওয়ান দেও রামনারায়ণ তাতে আপত্তি জানান এবং রামনারায়ণের সমর্থনে ভুটানের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসে। তখন বালক রাজা ও রাজপরিবারের সকলকে নিয়ে খগেন্দ্রনারায়ণ বলরামপুরে আশ্রয় নেন। আর অরক্ষিত কোচবিহারে প্রায় বিশ হাজার ভুটানী সৈন্য প্রবেশ করে রাজধানীসহ প্রায় সমগ্র রাজ্য দখল করে নেয়। ভুটানের আদেশক্রমে দেওয়ান দেও রামনারায়ণের পুত্র বিজেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে খগেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারকে ভুটানের অধিকারমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শরণ নেন। কোম্পানিও তৎক্ষণাৎ সে-ডাকে সাড়া দেয়। বালক রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেন খগেন্দ্রনারায়ণ এবং ১৭৭৩ খৃঃ ৫ এপ্রিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও কোচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার শর্ত অনুসারে শত্রুর বিরুদ্ধে কোচবিহারের রাজা ও রাজ্যকে রক্ষা করতে কোম্পানি ক্যাপ্টেন জোন্সের নেতৃত্বে চার কোম্পানি সৈন্য ও দুটি ফিল্ড-গান রংপুর থেকে কোচবিহারে পাঠায়। আর ঐ বাহিনী ঝড়ের গতিতে কোচবিহারে প্রবেশ করে সমগ্র রাজ্য থেকে ভুটানী সৈন্যদের বিতাড়িত করে। তারপর কোম্পানির সৈন্যরা ভুটানে প্রবেশের উদ্যোগ করলে ভুটান-রাজ নিরুপায় হয়ে তিব্বত সরকারের শরণ নেন। তখন তিব্বতের সার্বভৌম তিসু লামার মধ্যস্থতায় ভুটানের সংগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৭৪ খৃঃ ২৫ এপ্রিল একটি সন্ধি হয়, যে-সন্ধির অন্যতম শর্ত অনুসারে কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ভাই দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণ ভুটানের হেফাজত থেকে মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তিলাভের পর রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ প্রথম যেখানে ভাত খান পশ্চিম ছুয়ারসের সেই স্থানটি ঐ ঘটনার পর থেকে রাজাভাত-খাওয়া নামে পরিচিত হয়।

দীর্ঘকাল বন্দী থাকার জন্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেও রাজার মনের বিষণ্ণ ভাব দূর হয় না। সেকারণে রাজার পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণই রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং রাজ্যের শাসনকার্য চালাতে থাকেন নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ। সে-সময় শাসনকার্য নিয়ে নাজির দেওর সংগে মহারানী ও তাঁর গুরু গোঁসাই সর্বানন্দের প্রায়ই বিবাদ হতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৭৭৫ সালে ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসনারোহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। তারপর ১৭৮০ সালে রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের একটি পুত্রের

কোচবিহারের পূর্বতন রাজকীয় দপ্তর আজকের সরকারী অফিস ভবন।

কোচবিহারের রাস্তায় হাতীর শোভাযাত্রা
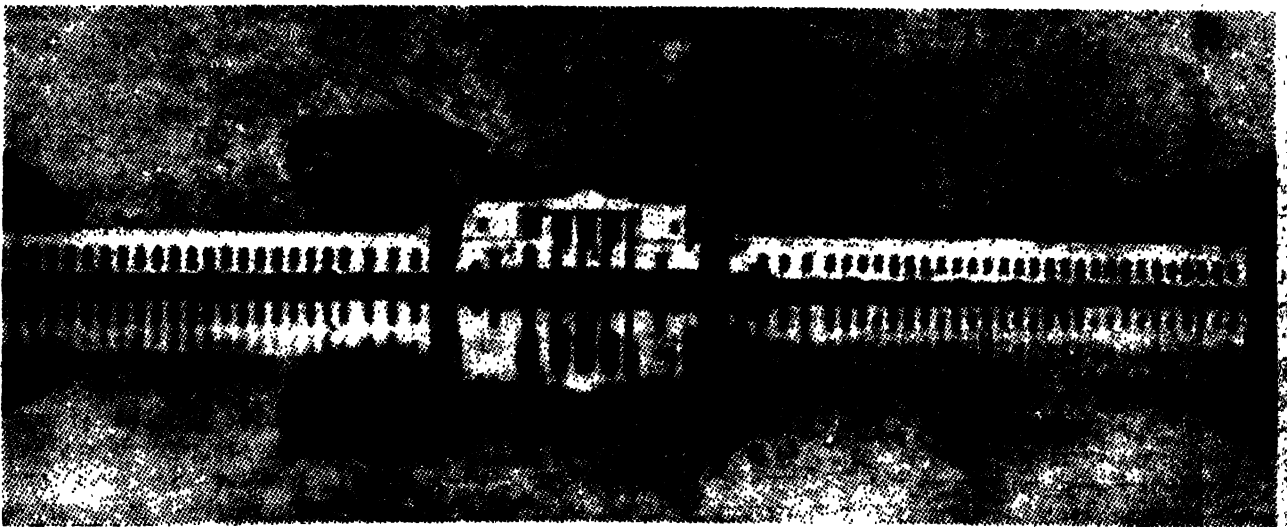
রাজা হয় এবং তার নাম রাখা হয় হরেন্দ্রনারায়ণ। ১৭৮৩ সালে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে মাত্র তিন বছরের শিশুপুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়।

ঐ সময় কোচবিহারের প্রভাবশালী মহল মহারাণী ও নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণের সমর্থনে দ্বিধাবিভক্ত হয়। আর খগেন্দ্রনারায়ণ ইংরেজ অফিসারদের সমর্থনের জোরে মহারাণী, শিশুরাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁদের সমর্থকদের বন্দী করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। মহারাজার অগণিত সমর্থক খগেন্দ্রনারায়ণের হাতে নিহত হন এবং খগেন্দ্রনারায়ণ নিজের নামে নতুন মুদ্রা প্রচলন করেন। ইতিমধ্যে খগেন্দ্রনারায়ণের সমর্থক ইংরেজ অফিসাররা বদলি হলে খগেন্দ্রনারায়ণ দুর্বল হয়ে পড়েন ও মহারাণী সেই সুযোগে ইংরেজের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠান। ইংরেজরা রাণীর সমর্থনে এগিয়ে এসে খগেন্দ্রনারায়ণকে পদচ্যুত করেন এবং খগেন্দ্রনারায়ণ রাজ্য ত্যাগ করে আসামে চলে যান। পরে তাঁর একটি অভ্যুত্থান সাময়িকভাবে সফল হলেও ইংরেজের হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়। হরেন্দ্রনারায়ণ ৫৬ বছর রাজত্ব করার পর ১৮৩৯ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর একে একে রাজা হন শিবেন্দ্রনারায়ণ (১৮৩৯-৪৭), নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৪৭-১৮৬৩), নৃপেন্দ্রনারায়ণ (১৮৬৩-১৯১১), রাজ-রাজেন্দ্রনারায়ণ (১৯১১—১৩), জিতেন্দ্রনারায়ণ (১৯১৩-২২) ও জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কোচবিহার যখন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তখন জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজা ছিলেন।

১৭৭৩ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের মধ্যবর্তী সময়ে কোচবিহার ছিল করদ রাজ্য। ঐ সময় ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় ও হরেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ নৃপতিগণের তৎপরতায় কোচবিহারের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটে। ১৮৫৯ সালে রেভিনিউ সার্ভের জে জে পেমবার্টন কোচবিহারের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তা'ই বর্তমান কোচবিহার জেলার প্রথম সরকারি মানচিত্র। ১৮৬২ সালে (অর্থাৎ সিপাহিবিদ্রোহের পর) ভারত সরকার কোচবিহারের রাজ-সরকারকে যে সনদ দেন তাতে কোচবিহারের রাজার 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধিকে স্বীকৃতি জানানো হয় এবং তাঁদের পুত্রের অভাবে দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রসেনের জামাতা মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালে ১৮৭২ খৃঃ কোচবিহারে প্রথম লোকগণনা হয়। তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক ও জনপ্রিয় নৃপতি। সুপরিকল্পিত সুরম্য কোচবিহার শহরটি তাঁরই নির্দেশনায় নির্মিত হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ২৮ আগস্ট ভারত ও কোচবিহারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রাজ্যটি ভারতের অংগীভূত হয়। ঐ সময় থেকে ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোচবিহার ছিল ভারতের একটি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আইনানুসারে ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়।

(২)

কোচবিহার জেলার আয়তন-সার্ভেয়র জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার হিসাব অনুসারে ১৩৩৪·১ বর্গমাইল, আর পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সার্ভে-এর হিসাবে ১৩২২·৬ বর্গমাইল।

হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অংশ, ত্রিভুজাকৃতির এই জেলাটি সম্পূর্ণ সমতল, তবে দক্ষিণ বরাবর কিছুটা ঢালু। জেলার পরিমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ ১৮০ ফুট ও সর্বনিম্নে ১৫০ ফুট। কোচবিহারের সমস্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম জুড়ে আছে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসাম,

আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশ। পূর্ব-পশ্চিমে জেলার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ৬৪ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে সর্বাধিক প্রস্থ ৩৩ মাইল।

অগণিত নদী, উপনদী, শাখানদী আর ঝিল বিল ও জলায় পূর্ণ হয়ে আছে সমগ্র কোচবিহার জেলা। সারা জেলার মাটির ধরনও একই রকম; ওপরের স্তরে আছে সহজে ভঙ্গুর, ছয় থেকে তিন ইঞ্চি পুরু দো-আঁশ মাটি, আর তার নীচে গভীর বালির স্তর। মাটি নরম বলে অল্প আয়াসে চাষ হয় এবং উর্বরা বলে ফসলও ভাল হয়। কিন্তু বর্ষায় প্রমত্তা নদীগুলি যখন ধেয়ে আসে তখন দুর্বার মৃত্তিকাস্তব কোন বাধাই তাদের দিতে পারে না। আর পারভাঙা দুর্নিবার নদীগুলি প্রতি বছরেই অগণিত নরনারীর অশেষ দুর্দশার কারণ হয়।

কোচবিহারের আর এক দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত তার মাটির নীচে কোন খনিজ পদার্থের সন্ধান মেলে নি।

কোচবিহারে বনভূমি খুব বেশি নেই। সারা জেলায় দুটি বড় ও চারটি ছোট সংরক্ষিত বনভূমি আছে। বড় সংরক্ষিত বনভূমি দুটি হল—পাতলা-খাওয়া ও গারোদহাট বনভূমি। পাতলা-খাওয়া বনভূমির আয়তন প্রায় সাড়ে চার হাজার একর ও গারোদহাট বনভূমির আয়তন প্রায় দশ হাজার একর। ছোট চারটি সংরক্ষিত বনভূমির নাম—কোচবিহার (২০৪ একর), গোসাইরহাট (৫২ একর), মাহুবমুড়ি (৩৬ একর) ও পত্নাতি তেলধার বনভূমি।

কোচবিহার জেলার নদীগুলির বৈশিষ্ট্য প্রায় সব কটি নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে জেলার উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে প্রায় সব নদীই ক্ষীণ ও অগভীর কিন্তু বর্ষায় প্রচণ্ড ও কূলপ্লাবী। পশ্চিম দিক থেকে পর পর উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল—তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রাইডাক অথবা সঙ্কোষ ও গদাধর।

এদের মধ্যে তিস্তা বৃহত্তম ও সর্বাধিক বেগবতী। জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে প্রবেশ করে তিস্তা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জেলার অভ্যন্তরে মাত্র কুড়ি মাইল নদীটি প্রবাহিত এবং তার মধ্যে কোন উপনদী এসে তিস্তায় পড়েনি বা কোন শাখা নদীও তিস্তা থেকে নির্গত হয় নি। তিস্তার তীরে আছে মহকুমা শহর মেকলিগঞ্জ।

জলঢাকা নদী জেলার বিভিন্ন স্থানে মানসাই, সিঙ্গিমারি, ধরলা ইত্যাদি নামে পরিচিত। জেলার অভ্যন্তরে ৬০ মাইল অগ্রগতির পথে জলঢাকার দুধারে অনেকগুলি নদী এসে পড়েছে। তার ডানদিকে এসে পড়েছে সুতুঙ্গা, ধরলা, ধুটামারা বা গিলান্ডি আর বাঁদিকে কুজলাই, ডিমডিমি, দুদুইয়া মুখাই ও দোলং নদী।

তোর্ষা নদীর প্রকৃত নাম হল তোর্যরোষা, অর্থাৎ ক্রুদ্ধ নদী এবং ঐ নামেই নদীটির প্রকৃত পরিচয় মেলে। উত্তর দিক দিয়ে জেলায় প্রবেশ করে প্রায় ষাট মাইল প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এমন খেয়ালি, সর্বনাশা নদী উত্তরবঙ্গে আর একটিও নেই। গত দেড়শ বছরে এই নদী যে কতবার গতি পরিবর্তন করেছে তার কোন হিসাব নেই, আর প্রতিবারই সে ধ্বংস করেছে কত জনপদ, মরুভূমিতে পরিণত করেছে কত শ্যামল প্রান্তর। সারা কোচবিহার ছড়িয়ে আছে মড়া তোর্ষা, বুড়া তোর্ষা অথবা চড়া তোর্ষ নামের বদ্ধ জলা অথবা শুষ্ক নদী খাতে আর সেগুলির ধারে কাছে পড়ে আছে একদা গড়ে ওঠা বাজার গঞ্জ জনপদের জীর্ণ স্মৃতি। কোচবিহারের অভ্যন্তরে তোর্ষা নদীতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুধু ঘরঘরিয়া নদী এসে পড়েছে।

কোচবিহার জেলার মোট মৌজার সংখ্যা ১৩২৯, তার মধ্যে ১৩১টি জনহীন। গ্রামের সংখ্যা ১১৯৮ ও শহর ৬টি। তবে একমাত্র কোচবিহার শহর ছাড়া কোনটিতে মিউনিসিপ্যালিটি নেই। অন্য শহরগুলির পৌর দায়িত্ব টাউন কমিটির উপর ন্যস্ত আছে।

জেলায় মহকুমা পাঁচটি—সদর (২৮৪·৮ বর্গমাইল), তুফানগঞ্জ (২২৪ বর্গমাইল), দিনহাটা (২৭১·৯ বর্গমাইল) মাথাভাঙা (৩৪৩ বর্গমাইল) ও মেকলিগঞ্জ (১৯৮·৯ বর্গমাইল)। প্রতি মহকুমার প্রধান শহর মহকুমার নামেই পরিচিত। শুধু তুফানগঞ্জ মহকুমার সদর শহরের নাম কুলবাড়ি।

জেলার সদর কোচবিহার শহরের আয়তন ২·২৪ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা '৭১ সালের হিসাব অনুসারে ৫৩,৭৩৪। শহরে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার কম। কোচবিহার শহরটি কোচবিহার জেলার বিশেষ সম্পদ। তোর্ষা নদীর তীরবর্তী এই শহর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের নির্দেশনায় একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়। দুধারে তরুশ্রেণীযুক্ত ঋজু প্রশস্ত পথ, পথের দুধারে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল মসৃণ অঙ্গন, ইতস্তত পুষ্পময় উদ্যান ও কুঞ্জবন, স্বচ্ছসুন্দর দীঘি ও সরোবর সারা শহরটিকে মনোরম করে তুলেছে। শহরের অন্যতম আকর্ষণ, সাগরদীঘির পশ্চিম পারে অবস্থিত ৭৯ ফুট মিনারযুক্ত ল্যান্সডাউন হলটি ১৮৯২ সালে নির্মিত হয়। এমন একটি চিত্তাকর্ষক শহর এ রাজ্যে কমই আছে। কোচবিহারের বহিরাগতদের মধ্যে একটি বড় অংশ হল মধ্যবিত্ত বাঙালী, যাঁরা সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধেন কোচবিহার শহরের পরিচ্ছন্নতা ও সেখানকার রাজ পরিবারের বাঙালিয়ানার আকর্ষণে।

অর্ধ বর্গমাইল আয়তনের দিনহাটা শহরটি কোচবিহার শহরের ষোল মাইল দক্ষিণে রংপুর রোডের দুধারে গড়ে উঠেছে। শহরটির লোকসংখ্যা প্রায় বারো হাজার। দিনহাটা শহর কোচবিহার জেলার কৃষিপণ্যের একটি বড় বাজার।

মাথাভাঙা গুরুত্বের দিক দিয়ে কোচবিহার জেলার দ্বিতীয় শহর। জলঢাকা নদীর ডান পারে অবস্থিত, অর্ধ বর্গমাইলেরও কম আয়তনের এই শহরটির লোকসংখ্যা সাত হাজার। তামাকের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র।

তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত মেকলিগঞ্জ খুবই ছোট শহর এবং লোকসংখ্যা হাজার দুয়েকের বেশি নয়। কিন্তু তামাকের বড় বাজার হিসাবে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ। একদা বর্মার তামাক ব্যবসায়ীদের আনাগোনা ছিল এই শহরে। এখান থেকে তামাক কিনে নৌকায় করে রংপুরের কালিগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তারপর সেখান থেকে ঝাড়াই-বাছাই হয়ে তামাক চলে যেত বর্মায়। শরৎবাবুর শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে রংপুর থেকে বর্মায় তামাক কিনে নিয়ে যাওয়ার উল্লেখ আছে। সেই যে বাঙালী ছোকরাটি যখন তার সরলবিশ্বাসী বর্মী স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে দাদার সংগে কলকাতায় পালিয়ে আসছিল তখন সে বলে আসে যে, রংপুর থেকে তামাক কিনে এক মাসের মধ্যে রেংগুনে ফিরে আসবে।

তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রধান শহর কুলবাড়ির লোক সংখ্যা তিন হাজারের বেশি নয়। হলদিবাড়ি মহকুমা শহর না হলেও উল্লেখযোগ্য। অর্ধ বর্গমাইলের কিছু বেশি আয়তনের ঐ শহরটির লোকসংখ্যা চার হাজার। হলদিবাড়ি পাটের বড় বাজার।

(পরবর্তী সংখ্যায় কোচবিহারের মানুষ)

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই,
কিন্তু মন?
মনের অসুখও তো সমানই অক্ষম করে
দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীব্র
তীক্ষ্ম জটিলতার যুগে, অভিজ্ঞ
চিকিৎসক 'মনের খবরে' সেই সব মনোব্যাধি
ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা
করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

আমাদের দেশে মানসিক রোগীদের যে নানাবিধ সমস্যা আজও প্রায় অনড় হয়ে বসে আছে সেই সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করব।

শরীর থাকলেই শরীরের ব্যাধি কম-বেশী হবে বা হতে পারে এই সত্য আমরা যত সহজে নিজেরা স্বীকার করে নিয়েছি মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে আমরা সেইভাবে সেটা স্বীকার করে নিতে আজ পারি নি। মানসিক রোগ যে মনের রোগ এবং তাকে রোগ মনে করেই যে তার চিকিৎসা করান সঙ্গত আজও আমরা তা সহজভাবে মেনে নিতে পারি নি। শরীরের রোগ হলে আমরা প্রথম থেকেই কিছু-না-কিছু ওষুধ-পথ্য ইত্যাদির আশ্রয় নিই। কিন্তু মনের রোগের বেলায় কোন যে সেই রকম ব্যবস্থা করা হয় না তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে রোগের জন্য শাসনও করা হয়। কখনো বা রোগীকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা হয়। আবার কখনো তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এমন কি তাড়না পর্যন্ত করা হয়। কয়েক দিন আগে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের যুবক ছাত্রকে দেখাতে আনা হয়। তার কাছে ও তার সঙ্গীয় আত্মীয়দের কাছে জানা যায় যে ছেলেটি ছয় মাস আগে থেকে হঠাৎ অল্প অল্প তোতলামি শুরু করেছে এবং ক্রমে তা বেড়ে যাচ্ছে। প্রথম অবস্থায় বাড়ীর অভিভাবকগণ তাকে বকাবকি করতে আরম্ভ করেন। তাতে রোগীর উন্নতি না হয়ে বরং তার বিপরীত ফল দেখা দেয়। সে ক্রমে বড়দের এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। যখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হত তখনই তোতলামি বেড়ে যেত। ক্রমে এমনই অবস্থা হয় যে সে বড়দের সঙ্গে প্রায় কথাই বলতে পারত না। অপরিচিতদের সঙ্গে ভয় না পেলে তবু সে মোটামুটি কথা বলতে পারত। স্কুলে শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে বাড়ীতে ও ইস্কুলে যেমন শাসনের মাত্রা বেড়ে চলে অন্য দিকে ইস্কুলের সহপাঠীদের এবং বাড়ীর অন্যদের তরফ থেকে তাকে নকল করে ব্যঙ্গ করার মাত্রাও বেড়ে যায়। ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে ঘরে-বাইরে কোথাও সে শান্তিতে থাকতে পারে না। ক্রমে তার স্বাভাবিক শান্ত মেজাজও উগ্র হতে থাকে। যখন তাকে আমার নিকট আনা হয় তার আগে সে বেশ কয়েকবার ইস্কুলে ও পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে তুলেছে। এই রকম ঘটনা যে কেবল তোতলাদের ভাগ্যেই হয় তা নয়। এই কলকাতা শহরেই রাস্তায় যে সব মানসিক রোগী ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময় পাড়ার ছোট ছেলেরা তাদের নানাভাবে উত্যক্ত করে ক্ষেপিয়ে তোলে। যখন রোগী ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের তাড়া করে, তারা তখন দৌড়ে দূরে সরে যায় বটে কিন্তু অবিলম্বে আবার রোগীর পিছু পিছু চলে নানা মন্তব্য করে এমন কি সময় সময় তাকে ঢিল মেরেও মজা উপভোগ করতে থাকে। আমরা এই সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে ছেলেদের আমরা কিছু না বলে অতি স্বাভাবিকভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কখনও বা বয়স্ক লোকদেরও এই বিষয় মজা উপভোগ করতে দেখেছি। আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এই রকম আচরণের মূলে আমাদের মানসিক রোগ ও ঐ রোগীর মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় না-থাকা এবং রোগকে রোগ বলে না জানার ফলে রোগীর অস্বাভাবিক আচরণকে বহুরূপীর আচরণ-এর মত কৌতুকপ্রদ বলে মনে করা সম্ভব হয়। রোগকে যদি রোগ বলে চেনা-জানা না হয় তবে তা সহজেই বিদ্রূপের বিষয়ও হতে পারে। মানসিক রোগী নানা রকম অঙ্গভঙ্গী বা নানা অস্বাভাবিক কথা বলে যা ঐ একই কারণে অর্থাৎ তাকে রোগের লক্ষণ বলে না চিনতে পারায় কৌতুকপ্রদ বলে মনে হয় এবং আমরা সেই অনুসারেই ঐ রোগীদের প্রতি ব্যবহার করে থাকি। মানসিক ব্যাধিও যে ব্যাধিই এই জ্ঞান আমাদের আজও তেমন নিবিড় হয়ে উঠতে পারে নি। এটা যে কত প্রয়োজন তা আরও বিশদভাবে বোঝানোর প্রয়োজন হয়ত সকলের পক্ষে নেই কিন্তু জনসাধারণের জন্য এ:ও প্রয়োজন আছে। এই বিষয় ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতি নানা উপায়ে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা ও অন্যান্য শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মনের রোগ সম্বন্ধে নানা উপায়ে সচেতনতা আনার চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের প্রকাশিত বাংলা ত্রৈমাসিক 'চিত্ত' পত্রিকায় মন সম্বন্ধে নানা বিষয় সহজবোধ্য আলোচনার মাধ্যমে মানসিক রোগ, তার প্রতিকার, উপযুক্ত শিশুপালন ও শিশুশিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের সঙ্গে জনসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক অবস্থার, বিশেষ করে মানুষের জ্ঞান বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো কঠিন কাজ। তবু সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকলে এই মৃতকল্প সমাজের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা অসাধ্য হবে। সুতরাং যাঁর পক্ষে যতটুকুই হোক এই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর অন্য পথ নেই। উপযুক্ত শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন।

এতক্ষণ কেবল এক রকম সমস্যার কথাই বলেছি। কিন্তু এটাই সবটুকু নয়—অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সমগ্র সমস্যাটি আরও অনেক বিস্তৃত ও জটিল। যেমন, যে পরিবারে কোনও মানসিক রোগী থাকে, যদি সেই রোগ এমন হয় যে পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয় তবে পরিবারের অন্যান্য সকলে খুব বেশী দিন সেই রোগীকে আবশ্যক সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে, তার সঙ্গে রোগীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করতেও আর পারেন না। তখন রোগী রোগের প্রকোপে যে সকল লক্ষণের তাড়নায় অন্যদের বিরক্তিভাজন হয় সেই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না পেয়ে শাসন, অবহেলা, তাচ্ছিল্য ইত্যাদি অন্যায় এবং আরও পীড়াদায়ক অবস্থায় পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। একদিকে রোগের যন্ত্রণা অন্যদিকে প্রিয়জনের নিকট থেকে উপেক্ষা, শাসন ও অবহেলা কুড়িয়ে যন্ত্রণা-বৃদ্ধির ফলে তার জীবনকেও দুঃসহ করে তোলে। আমরা নিজেদের নিকটতরদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থের জালে এমন আবদ্ধ থাকি যে অপরের, বিশেষ করে মানসিক রোগীর দুঃখ কষ্টের দিকে ক্রমে অবহেলা করতে থাকি।

এর ফলে রোগীর অবস্থা ক্রমে অধিকতর খারাপ হতে পারে। কেবলমাত্র ওষুধ দিয়ে বা অন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেই মানসিক রোগীর মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না—রোগীর প্রতি সহানুভূতি থাকা একান্তই প্রয়োজন। আমরা সেই অতি-প্রয়োজনীয় সহানুভূতি থেকেই তাদের বঞ্চিত করি। যে মনের রোগ সারাবার জন্য একদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় অন্য

দিকে এই মনকেই যদি আঘাত করতে থাকা হয় তাহলে চিকিৎসার ফল যে আশাপ্রদ হতে পারে না তা সহজেই বোঝা যাবে। রোগীর কল্যাণের জন্যই যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছু ত্যাগ করতে হবে এও আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা দরকার। শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয় তবু অনেক পরিমাণে সজাগ থাকি। রোগীর রোগ যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্য নানা রকমে প্রয়াসীও হই। শারীরিক রোগগ্রস্তদের সংগে অর্থাৎ তাদের যন্ত্রণা কষ্ট ইত্যাদির সংগে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে একাত্মতা বোধ করি। মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের সেই একাত্মতা তেমন সহজে হয় না। তাই এই দুই শ্রেণীর রোগীর প্রতি আমাদের আচরণের বৈষম্য দেখা দেয়। মানসিক রোগীও যে এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এই সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। মানসিক রোগীর যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতা, (অনেক রোগেই) থাকে আমরা তা জানি না। তাদের সবই খেয়াল খুশীর ব্যাপার বলে মনে করি বলেই অতি সহজে তাদের সুখ-দুঃখের বিবেচনাটা আমাদের মন থেকে বাদ দিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এ ছাড়াও যার মানসিক রোগ হয়েছে আমরা যেন তাকে আমাদের শ্রেণী ও সমাজ থেকে চিরদিনের মতই বাদ দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। মানসিক রোগ সারে না এই রকম এক ভ্রান্ত ধারণা আমরা অনেকেই আজও পোষণ করে চলি। যদিই বা কেহ মানসিক রোগ থেকে সেরে ওঠে তাও তার সম্বন্ধে আস্থাবোধ আমাদের যেন আর ফিরে আসতে চায় না। মনে যেন রেশ থেকেই যায়। ভয় হয়, একবার যার মানসিক রোগ হয়েছে, সুস্থ হয়ে উঠলেও আবার যে কোনও সময় সে গোলমাল সুরু করে দিতে পারে। শরীরের রোগ সম্বন্ধে সহজে আমরা এমন আস্থাহীন হই না। শরীরের রোগ হলে তা কিছু দিনেই সেরে উঠবে অথবা কোনও স্থায়ী ক্ষতি হলেও সে তার সাধ্যমত কাজ চালাতে পারে এই আশা ও বিশ্বাস আমাদের মনে থাকে। কিন্তু মনের রোগের বেলায় আমাদের এই আস্থাটাই ভেঙে যায়। অতীতে যখন চিকিৎসার তেমন উন্নতি হয় নি তখন মানসিক রোগ সারানো কঠিন ছিল এটা সত্য। বর্তমানে এই মানসিক রোগের চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে যার ফলে অনেক রোগ নির্মূল করাও সম্ভব হতে পারে। অবশ্য কি শারীরিক কি মানসিক কোনও ব্যাধিরই সব রোগ সারানো বা সব রোগীকে পূর্ণ সুস্থ করে তোলা আজও সম্ভব হয় না। তবুও মনের রোগ হলে সেই রোগীর সম্বন্ধে ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ সাধারণের মনে থেকে যায়। তার ফলেই তেমন রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেও অনেক সময় সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা দেখা দেয়। এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছে। ৩৫।৩৬ বছর বয়সে তিনি কলকাতার এক বড় ব্যাংকে কাজ করতেন। কলেজের পড়া শেষ করে ব্যাংকের কাজে যোগ দেন। নিষ্ঠার সংগে কাজ করে অল্প দিনেই ভাল পদে উন্নীত হন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল হওয়ায় পরিবারের দায়-দায়িত্ব তাঁকেই পোয়াতে হত। হঠাৎ মানসিক রোগ দেখা দেওয়ায় এবং রোগ তীব্র হয়ে ওঠায় চাকুরী থেকে ছুটি নিতে হয়। চিকিৎসা প্রায় এক বৎসর হওয়ায় পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এতদিন আয় বন্ধ থাকায় ও চিকিৎসা ও পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করতে সঞ্চিত টাকা খরচ হয়ে যায়। যখন রোগ সারল তখন আর্থিক সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যাঙ্কে আবার চাকুরীতে যোগ দিতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর পূর্বপদে কাজে নিতে রাজি না হওয়ায় সেই চাকুরী চলে যায়। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই ব্যাঙ্কে এক অতি-সাধারণ কাজে বহাল করে নিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে ঐ পদে কাজ করা সম্ভব নয় মনে করে সে চাকুরী তিনি গ্রহণ করেন নি। আরও নানা জায়গায় কাজের চেষ্টা করেও সুফল লাভ হয় নি। ক্রমে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। একদিন তীব্র বিষণ্ণতার অবস্থায় আমাকে এসে বললেন—'ডাক্তারবাবু, আপনারা আমাকে ভাল করে তুললেন কেন? পাগল হয়েছিলাম সেই তো ভাল ছিল। এখন ভাল হয়ে উঠে সমাজে, পরিবারে আর ঠাঁই পাই না। আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না। চাকুরী দেয় না। আমি আগের মতই এখন কাজ করতে পারি, কিন্তু ওরা আমাকে কাজ দেয় না। রোগে মরলাম না কিন্তু এখন না-খেয়ে মরবো, পরিবারের আর সকলকেও মরতে বাধ্য করব। কেন আমাকে ভাল করলেন ডাক্তারবাবু, পাগল থাকলে তো এ দুঃখ আমার সইতে হত না। ভাল হতে চেয়েছিলাম ভাল করে বাস করবো মনে করে, কিন্তু এখন?'

এই সামাজিক সমস্যার সমাধান আমরা না করলে আর কে করবে? খুব ঠিক কথা বলেছিলেন সেই ভদ্রলোক। ভাল করে বসবাস করতেই যদি না পারলেন, অতীত রোগের ছাপ সুস্থ হওয়ার পরেও যদি ভবিষ্যৎ জীবনের পথরোধ করে দাঁড়ায়—তবে তেমন সুস্থ জীবন পেয়ে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন কি?

দেশের নেতাদের, সমাজকল্যাণকামীদের, সমাজসেবীদের ও জনসাধারণের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর মানসিক রোগীরাও যেমন দাবী করতে পারেন, আমরাও তেমনি এই প্রশ্ন তাঁদের ও নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে পারি। কোন প্রশ্ন করলেই কাজ শেষ হল না—এর প্রতিকার চাই। আমরা নিজেদের দেশকে জনকল্যাণকামী দেশ বলে মনে করে থাকি। তাই এই কল্যাণটুকু আমরা

দাবী করতে পারি। মনে রাখতে হবে উল্লিখিত ভদ্রলোক একাই মাত্র এই সমস্যায় পড়েন নি, অনেকেরই এই মানসিক রোগ এক সময় হয়েছিল বলে জীবনের নানা সময় নানা পথে অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করে। শরীরের এমন অনেক রোগ আছে যার ফলে আরোগ্য লাভের পরেও রোগী আর রোগপূর্বের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ ফিরে পায় না। তবুও, বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন, তাদের কাজ পেতে এমন কি তার আগের কাজে ফিরে যেতে তেমন কোনও বাধা দেখা দেয় না। কিম্বা তা নিয়ে ভবিষ্যতের সন্দেহও কাউকে বিচলিত করে না। কিন্তু মনের রোগের বেলায় এমন ভিন্ন বিচার-বিবেচনার কারণ আমাদের আস্থার অভাব, মনের রোগ সেরে যাওয়ার পরেও আমরা যেন রোগের সম্পূর্ণ বা কাজ চালাবার মত সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান থেকে যাই। কেবল তাই নয়, ভবিষ্যতে যে কোনও সময় যেন নোটিশ না-দিয়েই কখন আবার সেই মনের রোগ চেপে বসবে এমন একটা বিশ্বাসও যেন সাধারণের মনে থাকে। এক কথায় মনের রোগীর উপর ভরসা যেন আর থাকে না। একবার মনের রোগ হলেই সে যেন সমাজচ্যুত হয়ে অস্পৃশ্য হয়ে যায়। এরকম ধারণার মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা ও দীর্ঘদিনের সংস্কার। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা এই অন্ধ বিশ্বাসের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করতেই হবে। তা না হলে এই সমাজে মানসিক রোগী সম্মানের সংগে বসবাস করতে পারবে না।

একটু ভেবে দেখলে সহজেই ধরা পড়বে আমরা যাদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছি তাদের মধ্যে অনেকেই দৈহিক ও মানসিক বিচারে সম্পূর্ণ সুস্থতার পর্যায়ে পড়েন না। শরীরের কথা নাই বা তুললাম। মনের দিক দিয়ে বিচার করলেও পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অনেকের মধ্যে কি রোগের মাত্রাধিক্য, স্বার্থপরতা, নীচতা, হিংস্রতা, খুঁতখুঁতে স্বভাব, শুচিবায়ু, সন্দেহবাতিকতা, অতিমাত্রায় অযৌক্তিক ভয়, দায়িত্ববোধ-হীনতা ইত্যাদি বহু মানসিক রোগ লক্ষণ দেখতে পাই না? তাদের সম্বন্ধে আমরা কি বিশেষ কোনও বাধা-নিষেধ আরোপ করে চলি? এই লক্ষণগুলির কোনওটা যদি অতি-মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে, তখন বাধ্য হয়ে আমরা সতর্ক হই। মানসিক রোগী যখন সুস্থ হয়ে ওঠে তখন তারা কি এদের চেয়ে বেশি অকর্মণ্য বিবেচিত হবে? অনেক রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে সত্যি। কিন্তু আবার যে আগের মতোই বাড়াবাড়ি রোগ দেখা দেবেই এমন কথা তো বলা যায় না! তাছাড়া যদিই বা পুনরাক্রমণ হয় তবে তখন আবার চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলাও ত সম্ভব। তবে মানসিক রোগীদের বেলায় এই চিরবর্জনের মনোভাব কেন থাকবে?

আমাদের দেশে বড় বড় কয়েকটি শহরে ছাড়া এত বড় দেশের কোনো জায়গা-তেই মানসিক রোগ নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামের ও ছোট শহরের রোগীদের চিকিৎসা আজও বেশীর ভাগই ঝাড়ফুঁক, মানত, মুষ্টি-যোগ, কবচ, পূজার বালা ইত্যাদিতেই আবদ্ধ থাকে। খুব কম রোগীই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সুযোগ পায়। গ্রাম্য কবিরাজ, হাতুড়ে বৈদ্য প্রভৃতিরাও নিজে-দের বিদ্যানুযায়ী কিছু চিকিৎসা করেন। তাতে একেবারেই যে কোনও ফল পাওয়া যায় না এমন নয়। তবে বহু রোগীই অচিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসায় ভুগে পরিবারের ও নিজের বহু কষ্টের কারণ হয়। পরিবারে একজন মানসিক রোগী থাকলে সে-পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয়, আর্থিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সর্বা-পেক্ষা ক্ষতিকর হয় শিশু ও বালক-বালিকাদের মানসিক স্বাস্থ্যের। বাড়িতে মানসিক রোগী থাকলে সেই সব রোগীর বিকারগ্রস্ত অবস্থায় তাদের চলা-বলা ব্যবহারাদির বিশৃঙ্খলতা, অশিষ্টতা, অশালীনতা ইত্যাদি শিশু-মনের উপর বিষ-ক্রিয়ার কার্য করে। মনের সুস্থ গঠনের জন্য যে পরিবেশ দরকার মানসিক রোগী থাকায় তার অভাব ঘটায়, শিশু-মন বিকৃত হতে থাকে। পরবর্তী জীবনে এর ক্ষতি-কর প্রভাব লক্ষিত হয়। সমাজের দিক দিয়ে এটা একটা অতি বড় ক্ষতি। যে-শিশু সমাজের ও দেশের ভবিষ্যৎ, তারা জীবনের সূচনাতেই যদি এইরকম মানস-রোগের অপক্রিয়ার প্রভাব পড়ে তবে বড় হয়ে সে সুস্থ জীবন সহজে যাপন করতে পারে না। সেইজন্য সমাজ-জীবনেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম থেকেই সেই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। কিন্তু আজও আমাদের সেই সচেতনতা দেখা যায় না। আমাদের দেশের প্রায় সব মানুষই গ্রামে বাস করে। শহরবাসীর সংখ্যা তাদের তুলনায় অতি সামান্য। তবু সাধারণ মানুষের জন্য মানসিক রোগ চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। শারীরিক রোগ চিকিৎসার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা তাদের জন্য নেই সত্য, তবু সে-ব্যবস্থা যাওবা কিছু আছে, মানসিক রোগীর জন্য প্রায় কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ নানা সমস্যার বেড়াজালে পড়ে দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। কি পরিমাণ এই রোগ বেড়েছে তাও সঠিক করে বলার উপায় নেই। লোকগণনার সময় মানসিক রোগীর পরিসংখ্যানের ভাল ব্যবস্থা কিছু নেই। অথচ সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে কিছু করতে হলে এই সকল তথ্য একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই সব বিষয়ে কত পিছনে পড়ে আছি তা একটু নজর দিলেই বুঝতে পারা যায়।

মনের রোগ চিকিৎসার বিষয়ে যে সমস্যা ও অবস্থা চলছে, সেই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে এই প্রসংগ শেষ করব। পরে ক্রমে মনের সম্বন্ধে কিছু পরিচয়, মনের রোগ কেন হয়, তার প্রতিকার ও রোগ নিরূপণের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

বলেছি, বড় বড় কয়েকটি শহরে কিছু কিছু চিকিৎসক মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন। সরকার পরিচালিত মানসিক হাসপাতাল ভারতের প্রায় প্রতি রাজ্যেই একটি আছে। কিন্তু তাদের মোট শয্যা-সংখ্যা এতই কম যে প্রয়োজনের এক-শতাংশও তা দিয়ে মেটে না। বে-সরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বড় শহরের আওতায় গড়ে উঠেছে এবং মোটামুটি লাভজনক ব্যবসায় হিসাবেই চলছে। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কিছু রোগী, যেমনই হোক, কিছু চিকিৎসা পাচ্ছে। আমাদের দেশে ১৯১২ সালে যে আইন Indian Lunacy Act নামে প্রচলিত হয়, আজও সেই আইন মানসিক রোগীর চিকিৎসার বিষয়ের আরেক বড় বাধা হয়ে

আছে। সেই যুগে 'পাগল' ছাড়া মানসিক ব্যাধি অবরোধ প্রতিষ্ঠানে রেখে চিকিৎসার বিষয় ভাববার কোনও অবকাশ ছিল না। সেই সময় মানসিক রোগীকে (বাতুল-শ্রেণীদের) কয়েদখানার মত ব্যবস্থায় আটক করে রেখে অন্যদের ক্ষতি নিবারণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পাগলা গারদ বা মানসিক হাসপাতালের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তখন ঐ রোগের চিকিৎসার কোনও ভাল ওষুধ ইত্যাদি জানা ছিল না। কাকেও আটক করে রাখতে হলে জেলা-শাসক বা ভারপ্রাপ্ত কোনও সরকারী মহকুমা-শাসকের আদেশ প্রয়োজন হয়। এই জন্য মানসিক রোগীকে হাসপাতালে আটক করে রাখতে হলেও উক্ত আদেশ-নামার প্রয়োজন হয়। সকলের পক্ষে, বিশেষ করে গ্রামের লোকের পক্ষে বহু মাইল দূরে রোগী নিয়ে গিয়ে আদালতে হাজির করিয়ে বহু টাকা দিয়ে ডাক্তারের সার্টি-ফিকেট নিয়ে আরজি পেশ করে আদেশ-পত্র নিয়ে পরে হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা যে কত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও আদালতের ছাপযুক্ত পাগল আখ্যা পেতে অনেকেরই প্রবল আপত্তি সামাজিক কারণে থাকে। অনেক আলাপ-আলোচনা ও সভা-সমিতি এজন্য হয়েছে। কিন্তু আজও এর প্রতিকার কিছু করা হল না। সরকার অনড়। রোগ হলে চিকিৎসার সুবিধার জন্যও যদি আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় তবে এর চেয়ে আদিম দুরবস্থা আর কি হতে পারে! উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য যদি রোগীকে প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ করে রাখতে হয় তা রাখতে হবে। শরীরের রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি অস্ত্রোপচারের পরে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় না! রোগীর কল্যাণের জন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ব্যবস্থা করার জন্যে আদালতের নির্দেশ দরকার হবে কেন? মানসিক রোগও রোগ। এই রোগের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তা মেনে নিতেই হবে। আপত্তি উঠতে পারে, এমন সহজ ব্যবস্থার সুযোগ করে দিলে স্বার্থপর ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজনকে রোগী সাজিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে নিজের বৈষয়িক বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করে নিতে পারে। এর প্রতিকারের জন্য বহু উপায় উদ্ভাবন সম্ভব। কিন্তু সেই ভয়ে রোগীর চিকিৎসা বন্ধ থাকতে পারে না। যত নিখুঁত আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন মানুষ নিজের স্বার্থের তাগিদে এক সময় তার মধ্যেও ফাঁক খুঁজে বের করে বা আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আবার নতুন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। ইতিহাসে এর প্রমাণ মেলে। সে-যুগে চিকিৎসা তেমন ভাল ছিল না। বর্তমান সময়ে মানসিক রোগের বহু নতুন ওষুধ বাজারে প্রায় প্রতি মাসেই আমদানী হচ্ছে। বহু গবেষণা চলছে—যার ফলে নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে এবং এই রোগের চিকিৎসার সুফলও দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আটকিয়ে রাখার প্রশ্ন আর নেই। আগে বলেছি সব রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব হয় না। সেই রকম রোগীদের জন্য ভিন্ন রকমের আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের চিকিৎসায় উপকার পাবার সম্ভাবনা আছে আইনের কবলে পড়ে তাদের যদি সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারা যায় এবং দেরি হয়ে যাওয়ায় রোগ যদি দুরারোগ্য হয়ে ওঠে তা অতি দুঃখের কারণ হয়। আইন বাঁচাতে গিয়ে যদি একটিও জীবন নষ্ট হয়, তবে সেজন্য দায়ী কে হবে? রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শিত ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। জজ, ম্যাজিস্ট্রেটের এ-বিষয়ে কোনও এক্তিয়ার থাকতে পারে না। বর্তমান আইন ব্যবস্থা এ-বিষয়ে অচল।

শুধু এই নয়। চিকিৎসকের অভাবও এক বড় সমস্যা। উপযুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসক খুব কমই আছেন। অনেক দৈহিক রোগচিকিৎসকও আজকাল ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ে মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতে থাকেন। অর্থলিপ্সার উপরেও চিকিৎসকের বিবেক উন্নত ও প্রবল থাকা দরকার। যে রোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়া সম্ভব সেই রোগীকে যত সত্বর সম্ভব বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোই কর্তব্য। তা সম্ভব না হলে সাধারণ চিকিৎসক যতটুকু চিকিৎসা করতে পারেন তাই করবেন তাছাড়া আর উপায় কি? মনে রাখা উচিত যে, বর্তমানকালে মানসিক চিকিৎসা এক বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে এবং এর জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা-তালিকায় মনের রোগ সম্বন্ধে যতটুকু শেখানো হয়, তা নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের। সুতরাং কলেজ থেকে পাশ করে যাঁরা সাধারণ ডাক্তার হয়ে বের হন, তাঁদের পক্ষে, বিশেষভাবে মানসিক রোগ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা না নিয়ে এই রোগীর চিকিৎসা করা সঙ্গত নয়।

মানসিক রোগীর প্রতি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গত ব্যবহার এবং রোগীর সেবাযত্নের জন্য শুশ্রূষাকারীর বিশেষ শিক্ষা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণকে এ-বিষয় প্রচারের দ্বারা অবহিত করাতে হবে। এই রোগীর শুশ্রূষার জন্যও বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থার দরকার। তা না হলে চিকিৎসার সুফল ব্যাহত হতে পারে। চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ দরকার, অনেক সময় তা বাজারে পাওয়া যায় না। বিদেশী ওষুধের আমদানি নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই সমস্যা কোনো কোনো সময় গুরুতর হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিশেষ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে অর্থ বা নামের নেশায় কিছুসংখ্যক দুর্নীতিক নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে প্রচার করেন। এতে রোগী-দের দুর্ভোগ বাড়ে ও অর্থনাশ হয়।

রোগ হলে তার নিদানের ব্যবস্থা করা যেমন প্রয়োজন, যাতে রোগ না হয়, সেই ব্যবস্থা করা আরও বেশী প্রয়োজন। মানসিক রোগ কি প্রকারে প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলবার ইচ্ছে রইল।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

আপনি কেমন আছেন?
—উত্তর খুবই প্রাঞ্জল—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।'...কিন্তু প্রাণ রাখার চেষ্টায় যে ওষুধপত্র ডাক্তার না দেখিয়ে নিজেরাই কিনে ব্যবহার করি, আর খাদ্যের নামে যেসব অখাদ্য আমরা খাই, তাতেও কম প্রাণান্ত ঘটে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই অসুখবিসুখ, পুষ্টি ও পরিবেশের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবেন এই বিভাগে।

বসন্ত উচ্ছেদ

এক যুগ—হ্যাঁ এক যুগেরও আগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংসদ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় এদেশ থেকে বসন্ত উচ্ছেদের যে বিস্তৃত কর্মসূচী আমরা নিয়েছিলাম, আজ স্বীকার করতে হচ্ছে, পূর্ণ সাফল্য তাতে আসে নি। এ বছর আবার নতুন করে ঘোষণা করতে হচ্ছে, বসন্ত মহামারীর আশঙ্কা প্রবল, শহর কলকাতায় বসন্তে গড়ে মৃত্যু হচ্ছে সপ্তাহে ১০, সবাই টীকা নিন। ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, কুচবিহারও আক্রান্ত।

অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, এমন কি, সোভিয়েট ইউনিয়নের এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলিতেও বসন্ত রোগ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে অনেক আগেই। আরও আশ্চর্যের কথা, আমাদের দেশে সাধারণত যে সব রোগে আমরা বেশী ভুগি এবং অকালমৃত্যু বরণ করি, তার মধ্যে সম্ভবত বসন্তই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ প্রতিরোধ্য। শারীরিক কষ্ট নগণ্য, টেকনিক্যাল ও সাংগঠনিক হাঙ্গামা কম, এমন কি খরচও।

কেন এমনটা হয়? ওরা যা পারে, আমরা তা পারি না কেন! এবার শীত পড়ে নি বলে? কিন্তু প্রকৃতির উপরেই যদি নির্ভর করতে হয়, তাহলে বিজ্ঞানের স্থান কোথায়? জনসংখ্যা কমান যাচ্ছে না তাই? কিন্তু সে সব মনে রেখে, জেনে-শুনেই তো উচ্ছেদের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। কারণ যাই হোক, আলোচনাটা এক্সপার্ট মহলে সীমাবদ্ধ না রেখে খোলাখুলি হওয়াই ভাল। এমন কি মতভেদতা যদি থাকে, তারও। কারণ এত বড় একটা বিশ্বায়োজনবহুল দেশে কোন গণ-কর্মসূচীকে টেবিলতলায় চুপি চুপি সম্পন্ন করা যায় না, একাধিক ক্ষেত্রে তা আমরা জেনেছি উপর দেখিয়ে।

একথা ঠিক যে, অতীতে শিলসাগিনে প্রেমার বসন্তের যে টীকা ব্যবহার করা হত, নিয়ম মত ঠাণ্ডায় (৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) তা রাখা হত না বলে তার পোটেন্সী কমে বা নষ্ট হয়ে যেত, অনেক সময় তা 'উঠত' না—অর্থাৎ রক্তে বসন্ত বিরোধী শক্তি বা অনাক্রম্যতা সঠিকভাবে জাগত না। ফলে হয় টীকা দিয়ে কোন ফল হত না, অথবা একই লোককে বছর বছর টীকা দেওয়ার প্রয়োজন হত। অথচ সে-ধরনের বিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন আমাদের ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নে তৈরী ঠাণ্ডায় শুখানো টীকা (ফ্রীজ ড্রায়েড ভ্যাকসিন) বিনামূল্যে পাওয়ার পর এই টেকনিক্যাল অসুবিধা দূর হয়েছে। এখন আমরা এই উন্নত ধরনের শুকনো টীকা ভারতেও তৈরী করছি। অবশ্য মনে রাখা দরকার, মাদ্রাজে তৈরী এই শুকনো টীকাও চার সপ্তাহের বেশী ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বা এদেশের স্বাভাবিক তাপমাত্রার আবহাওয়ায় রাখা উচিত নয়, রাখলে পোটেন্সী নষ্ট হতে পারে, টীকা বিফল হতে পারে। কাজেই প্রাইমারী বা জীবনে প্রথম টীকা দেওয়ার পর টীকা যদি না 'ওঠে', সন্দেহ করা যেতে পারে যে, হয়ত কোন টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্যে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয় নি। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে শিশুদের বেলায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আর একবার টীকা দেওয়াই উচিত। মনে রাখা দরকার, বসন্তে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশী —কখনো কখনো শতকরা প্রায় ৭০—৮০ পর্যন্ত।

আগে ধারণা ছিল, একবার টীকা নিলে অনাক্রম্যতা বা রক্তে ঐ বিশেষ রোগ বিরোধী শক্তি থাকে সাত বছর। এখন বলা হচ্ছে, না অতদিন, ওটা থাকে বছর তিনেক। তবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে যেসব দেশে বা যে সব অঞ্চলে বসন্ত প্রায়ই দেখা দেয়, সেখানকার অধিবাসীদের বছর বছর টীকা দেওয়াই নিরাপদ। কারণ অনাক্রম্যতা সকলের দেহে সমান পর্যায়ে থাকে না। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, দীর্ঘকাল অপুষ্টিতে ভুগলে, বিশেষ করে যারা প্রোটিন কম খায় তাদের দেহে অনাক্রম্যতা বেশী দিন রোগ-জীবাণুদের প্রতিহত করার মত উঁচু পর্দায় থাকে না, কমে যায়। আমাদের দেশে শাকান্নভোজী দরিদ্রদের ক্ষেত্রে একথাটা মনে রাখা উচিত। নইলে টীকার সুফল বা আত্মনিরাপত্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থেকে যেতে পারে।

অনেক মা মনে করেন, আমি তো আমার শিশুকে বাইরে যেতে বা অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দিই না — আমার শিশুর বসন্ত হবে কেন! কিন্তু আমরা জানি, বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণু বিশেষ বিশেষ ঋতুতে সক্রিয় ও প্রজননশীল হয়ে ওঠে, তাদের সংক্রমণ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। বসন্ত-জীবাণুর দাপট বাড়ে শীতের শেষে শুকনো নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়, মিঠে হলেও মলয় বাতাস তাদের অলক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে, মানুষের শরীরে ওরা ঢোকে শ্বাসপথে। কাজেই ঘরের মধ্যে বা কোলের মধ্যে রেখে পার পাওয়ার উপায় নেই। আগে দেখা যেত, রোগের প্রকোপ বাড়লে কিম্বা প্রচলিত আইনমত সপ্তাহে বিশ-ত্রিশটা রোগীর মৃত্যু ঘটলে তবেই আমাদের টনক নড়ত, বিপদ সংকেত ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া হত তারপর। অফিসার মহলে একটা চেষ্টাও চলত বিপদকে ধামাচাপা দেওয়ার। এবার শীত আসতে দেরী হওয়ায় বসন্তের আগমনী একটু আগেই আশঙ্কা করে কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবেই আগে থাকতে ঢোল সহরৎ দিচ্ছেন। টীকা নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই যে সাবধানতা ও প্রস্তুতি, এর দ্বারা মহামারীকে প্রতিহত করা যাবে তো? বসন্ত উচ্ছেদের কর্মসূচী সাফল্যের পথে এগোবে

তো? এগোলে কতটা এগোবে? বসন্তকে চিরবিদায় দেওয়া যাবে কত দিনে?

প্রশ্নটা কঠিন। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জটিল সব সামাজিক প্রশ্ন—যা নিয়তই প্রতিরোধ করছে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ সাফল্যগুলির সামাজিক প্রয়োগকে। আসলে অশিক্ষা এবং কুসংস্কার আমাদের দেশে এত ব্যাপক এবং এত গভীর যে বসন্তে ভুগে ছেলেমেয়েগুলো অন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিম্বা হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরছে না দেখেও বহু লোক টীকা নিতে চান না বা দিতে দেন না। টীকা নিলে বসন্ত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় জেনেও দেন না। এমনও দেখা গিয়েছে, বহু সাধ্য-সাধনার পর মা শেষ পর্যন্ত নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কোলের শিশুকে টীকা দিতে দেন নি। যখন বলা হয়েছে, শিশুরা দুর্বল, ওদের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ শক্তি কম বলে শিশুদের পক্ষে বসন্ত অতি মারাত্মক, মা প্রচন্ড রেগে গিয়েছেন ওরকম অলক্ষণে কথা উচ্চারণ করার জন্যে। এই বেদনাদায়ক কুসংস্কার বাঙালী মায়েদের মধ্যে যেমন আছে তারচেয়ে বেশী আছে অবাঙালী বস্তীবাসিনীদের মধ্যে।

অবশ্য সঙ্গে কিছু বাস্তব সমস্যাও রয়েছে। প্রাথমিক টীকা দেওয়ার পর যে প্রতিক্রিয়া এবং সাময়িক অসুস্থতা দেখা দেয়, টীকাদাররা তার কোন দায়দায়িত্ব নেন না। ফলে চাকুরীজীবী দরিদ্র মায়েরা সুখে থাকতে ভূতে কিলোন এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসার ব্যয়ভার — কোনটাই পছন্দ করেন না।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, সুস্থ ও সবল মানুষের দেহে খুব কম পরিমাণ রোগ-জীবাণু ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে কখনো কখনো একটা স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা জাগে। সেই কারণে মহামারী পীড়িত এলাকায় বসবাস করেও কেউ কেউ অনাক্রম্য-ভাবে রেহাই পেয়ে যান। এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, বিরল ঘটনা মাত্র। এই ঝুঁকি নিতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক এবং চূড়ান্ত বোকামী।

আবার এও দেখা গিয়েছে, যারা কোন দিন বসন্ত-পীড়িত এলাকায় বাস করে নি বা যাদের শরীরে বসন্ত-জীবাণু কখনো প্রবেশ করে নি, টীকা না নিয়ে মহামারী অঞ্চলে এলে অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধ শক্তির অভাবে তারা রোগের সহজ শিকার হয়ে পড়ে। অপর দিকে বসন্ত-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পর দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে সাধারণত ১৪ দিন। সুতরাং জীবাণুবাহী কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন গ্রামাঞ্চলে বা অন্য কোন রাজ্যে যান সেখানকার অধিবাসীদের টীকা দেওয়া হয়নি, তবে সেই ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার পর সেখানে বসন্ত দেখা দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা থাকে।

পশ্চিম বাংলায় প্রায় প্রতিদিনই বেশ কিছু অবাঙালী আসছেন কর্মসংস্থানের আশায়। আবার এই রাজ্যের গ্রাম থেকে বা অঞ্চলান্তর থেকে শহরে আসা-যাওয়া করছেন অনেকে। কখন এঁরা আসেন, কোথায় ডেরা বাঁধেন, কেউই বা তার খবর রাখে। তাঁদের খুঁজে বের করে টীকা দেওয়া খুবই কঠিন। যেহেতু এই সব আগন্তুকদের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিরক্ষরের সংখ্যা কিছু কম নয়, সুতরাং একাধিক রেডিও মারফত বিভিন্ন ভাষায় নিরন্তর প্রচার এবং সুষ্ঠু ভাবে এক একটি এলাকা [illegible] করে বাধ্যতামূলক টীকা দেওয়া ছাড়া বসন্ত উচ্ছেদের অন্য কোন সহজ পথ দেখা যাচ্ছে না। এবং এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েক বছর ধরে—যত দিন না রোগের প্রকোপ হার (মৃত্যুহার নয়) শূন্যতে এসে পৌঁছায়। বলা বাহুল্য, এত বড় একটা বিশাল জনবহুল দেশের বর্তমান ও আগামী দিনের প্রত্যেকটি মানুষকে বছর বছর টীকা দেওয়া সহজ কাজ নয়। কাজেই সাময়িক সাফল্যে আত্মতুষ্টির নেশাটি ছাড়তেই হবে।

প্রসঙ্গত আইন পাশ করে বসন্তের টীকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা এসে পড়ে। বর্তমান মহামারী-বিরোধী আইনটি সংশোধন করে নতুন আইন যদি করতেই হয়, তবে হাসপাতাল ও নার্সিংহোম থেকে মা ও শিশুকে ছেড়ে দেওয়ার আগে এবং ডাক্তার, নার্স ও ধাত্রীদের পক্ষে শিশুকে টীকা দেওয়া অবশ্যকরণীয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু গণশিক্ষা ও গণউদ্যোগ ছাড়া শুধু আইন পাশ করে বা ভয় দেখিয়ে সমাজ সংস্কার যে সম্ভব নয়, তা আমরা সবাই জানি। সুতরাং অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে এই পূর্বশর্তগুলি যদি পালন করা যায়, তবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে মারী-গুটিকাকে নির্মূল করা নিশ্চয়ই সম্ভব। বসন্ত উচ্ছেদের ব্রত পালনে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভূমিকাটি পালন করলে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই।

—[illegible]
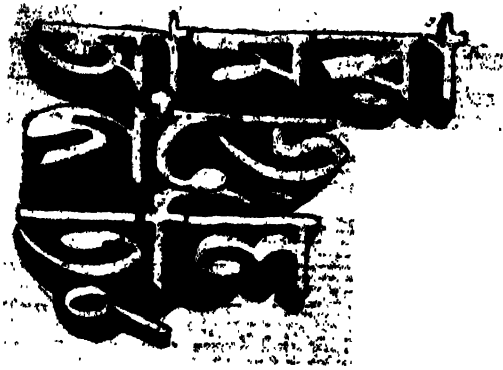
লোকে বলে—অবক্ষয়ের যুগ, ভেঙে পড়ার দিন,
কিন্তু সত্যিই কি তাই?
আমরা কি গড়েও তুলছি না?
অন্তত ক্লাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে
যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অন্য চেহারাই
দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো
ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা
করছি, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।
আমাদের নবযুগের যুবসমাজের সেই
অক্লান্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে তুলে
ধরা হবে এই বিভাগে।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট

"...ধূসর লাল রঙের বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে পুরাতনের জীর্ণতায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। আনাচে-কানাচে, এখানে-ওখানে যেন মন্থর অতীতের নিঃশ্বাস ঝরছে। কিন্তু না। চোখের আবছা আকাশটা সরে গেল মনের অতলে ডুবে গিয়ে। ভিতরে এসে অনুভব করলাম, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেন একটি ধ্যানমৌন সমুদ্রে মুখর হয়ে উঠতে চাইছে। কলতান এখানে ভাষা পেয়েছে যেন এক আশ্চর্য সুন্দর নীরবতায়।...

...কলকাতার বাগবাজারের রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে আসুন। অমৃত পত্রিকার অফিসে ঢুকতে গিয়ে যে ছোট্ট গলিটা, তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীটা। দেখবেন লেখা আছে 'শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট'। মহাত্মা শিশিরকুমারের নামে গড়ে-ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসের গভীরে যেতে পারলে নিশ্চয়ই সেখান থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের দেশের শিল্প, সংস্কৃতি। সাহিত্য, সমাজনীতির কিছু প্রদীপ্ত সংকেত।...

...যে চেহারায়, যে নামে আজকের 'শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট' দাঁড়িয়ে আছে অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, যাত্রা-শুরুর প্রথম কম্পিত মুহূর্তে তা ছিল কিন্তু অন্য রঙে, অন্য ঋতুর কুয়াশায় ঢাকা। আজকের আলপনাকে চোখ ভরে দেখতে গেলে, মন ভরে তার সৌন্দর্য অনুভব করতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে সেই দিনগুলোর দিকে যে সময়ে কিছু উদ্দীপনার মেলবন্ধনে, কিছু আবেগ আর কিছু সম্প্রীতির ছোঁয়ায় গড়ে উঠেছিল একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান।

সময়টা ছিল ১৯২০। জায়গার নাম শ্যামবাজারের কাঁটাপুকুর। 'কিছু বই সংগ্রহ করে একটা লাইব্রেরী করলে মন্দ হয় না', ভাবলো সাত-আটজন স্কুলের উদ্যমী ছেলে। তাদের সে ভাবনা শুধু মনের কোণেই নিঃশেষিত হয়ে গেল না, বাস্তবরূপ নিতে উন্মুখ হয়ে উঠলো। সহযোগিতা এবং সাহায্যও কিছু আসতে শুরু করলো। তাই দিয়ে অথবা অল্প কয়েকটা বই দিয়ে একটি গ্রন্থাগার অর্থাৎ লাইব্রেরী গড়ে উঠলো। এই সব ছেলেদের উৎসাহ, উদ্দীপনা খেলাধুলার মধ্যেও সোচ্চার ছিল বলেই বই পড়াকে আর খেলাধুলোকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নেওয়া হোল। একটি নাম তৈরী হোল 'কাঁটাপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব এবং লাইব্রেরী'। প্রতিষ্ঠিত হোল ৫।১ কাঁটাপুকুর লেনে স্বর্গীয় নীরদবরণ গুহর বাড়ীতে।

ক্লাবটি গড়ে উঠলেই কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাণময়তা অনুভব করা গেল। নতুন নতুন সভ্য এলো কতো উদ্যমের জোয়ার নিয়ে। বইয়ের সংখ্যা যেখানে ছিল প্রথমে ২০, সেটা এসে দাঁড়ালো ২৪০এ। জনপ্রিয়তাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগলো। স্বাভাবিক-ভাবেই দেখা দিল স্থানাভাব। তাই আবার ক্লাব সরে গেল ১৯২৩এ ৪১, ঘোসপাড়া লেনে স্বর্গীয় নরেন নাগচৌধুরী বাড়ীতে। এর পর থেকে ক্লাবের সব শাখার কাজই মোটামুটি পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো। কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেল মাঝখানে। ক্লাবের পরিচিতও হোল সুদূরপ্রসারী।

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এলো ১৯৩১। ২৮শে জুন উত্তর কলকাতার বিশ্বকোষ হলে বসলো ক্লাবের মিটিং। এই মিটিংয়ে বিরাট একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। ক্লাব এবং লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করে মহাত্মা শিশিরকুমারের পুণ্য নামে একটি নতুন নামকরণ করতে হবে। এবং ক্লাবের চলতি শাখার সঙ্গে আনতে হবে শিল্প-চর্চার শাখা, অর্থাৎ সেখানে থাকবে সঙ্গীত, নাটক এবং অন্যান্য শিল্পের অনু-শীলন। নাম পেলো 'শিশিরকুমার ইনস্টি-টিউট'। স্বাভাবিকভাবেই জায়গারও বদল হোল। প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে, নতুন চেহারায় গড়ে উঠলো আজকের জায়গায় অর্থাৎ ৭১।১ বাগবাজার স্ট্রীটে।

লাইব্রেরীতে ততদিনে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪২৩ এবং একটি বিনা পয়সার পড়ার ঘরও তখন তৈরী হয়েছে। ন'টি দৈনিক সংবাদপত্র ও বাইশটি ছোট ছোট ম্যাগাজিনও তখন সংগৃহীত হয়েছে। বছরের ইতিহাস মিলিয়ে দেখতে গেলে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী নানাভাবে বিকশিত হতে শুরু করে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ থেকেই। ১৯৩২-এ লাইব্রেরী কলকাতা কর্পো-রেশনের কাছ থেকে ৩০০ টাকা গ্র্যান্ট পায় এবং ১৯৩৩-এ তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ টাকা। বই এবং সভ্য সংখ্যাও বাড়তে থাকে প্রচুর পরিমাণে। এই সময়ে এই লাইব্রেরী থেকেই কিছু বক্তৃতা এবং রচনা প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময়ে বক্তৃতায় অংশ নেন ডাঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায়, ডাঃ ডি এন মৈত্র, অধ্যাপক রাজা প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। এই সময়তেই 'বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সঙ্গে এই লাইব্রেরীর নাম যুক্ত হোল। ১৯৩৬-এ লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা হোল ৭০৯৫, আর সভ্যসংখ্যা এসে দাঁড়ালো ৩১০এ। এই সময়ে ইনস্টিটিউটের সভ্যরা 'ক্যালকাটা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' গড়ে তোলার ব্যাপারে নেতৃত্ব নেন। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী তার আকার বাড়িয়েছে অনেক, প্রভাব প্রসারিত করেছে অনেক দূর পর্যন্ত। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া সভ্যসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৫০০। গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় জমা হয়েছে ২৫০০০ বই, তার মধ্যে ১৬ হাজার বাংলায় লেখা, ৯ হাজার ভারত-বর্ষের বিভিন্ন ভাষা ও ইউরোপীয় ভাষায় লেখা বই। ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের নামানুসারে যে ফ্রি রিডিং রুম এখানে আছে তাতে প্রায় প্রতিদিন ১২৫ জন পাঠক-পাঠিকা জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকেন। এই রিডিং রুমে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সবকটি সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা টেবিলে সাজানো থাকে।...

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপলাল ঘোষের নামানুসারে এখানে গড়ে উঠেছিল অনেকদিন আগে একটি শিশুবিভাগ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য নানান স্বাদের বই এসে পাড়ি জমিয়েছে এই বিভাগে। বইয়ের সংখ্যা ৩ হাজারের ওপরে। পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও অনেক। কচি কচি ছেলে-মেয়েদের

মুখরতার একটি প্রাণবন্ত আসর যেন জমে ওঠে এই শিশুবিভাগে।

ইনস্টিটিউটের সভ্যরা প্রায় প্রথম থেকেই এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে লোককে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ করে তুলতে গেলে, আরো অন্যান্য বিষয়ের ওপর যথাযোগ্য আলোকসম্পাত করতে হবে। তাই লাইব্রেরীর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে সাহিত্য বিভাগ, খেলাধুলো বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ, এ্যাম্বুলেন্স বিভাগ। এই দিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে ইনস্টিটিউট যেন বৃহত্তর জীবনসাধনার একটি ইতিহাসই মেলে ধরেছে বলে মনে হবে।

মননশীলতার সমৃদ্ধির জন্য ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ যে সাহিত্য বিভাগের প্রবর্তন করেছিলেন অনেক আগে, আজ তা ফলে ফুলে নানাভাবে, নানা উজ্জ্বল সম্ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে এবং এখনো পূর্ণোদ্যমে চলছে। রচনা প্রতিযোগিতাও এই বিভাগের একটি অন্যতম আকর্ষণ। এই ধরনের নানান তথ্য নিয়ে প্রকাশিত হোত 'সংবাদিকা' নামে একটি প্রচার পত্র। আন্তঃস্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও সংগঠিত হয় এই বিভাগের মাধ্যমে। এতে স্থানীয় স্কুলের ছেলে ছাড়াও বাইরের স্কুলের অনেকেই অংশ নিয়ে থাকে।

ইনস্টিটিউটের খেলাধুলো বিভাগ একটি সমৃদ্ধতর বিভাগ। আউটডোর এবং ইনডোর দু-রকমের খেলারই ব্যবস্থা আছে এখানে। খেলার প্রাণচাঞ্চল্য ইনস্টিটিউটের ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। তাস, ক্যারাম, প্রভৃতি চলছে একটি ঘরে এবং তাকে ঘিরেই সোচ্চার হয়ে উঠছে অনেক কণ্ঠ, সে-কণ্ঠে ছড়ানো আছে মুঠো মুঠো উন্মাদনা। বেঙ্গল রোড রেস এসোসিয়েশনের সহায়তায় ইনস্টিটিউট প্রতি বছর দশ মাইল-ব্যাপী দৌড়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। ইনস্টিটিউটের সভ্যরা অনেক বছর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল, ব্রিজ, ক্যারাম এবং ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আসছেন। অতীতেও অনেক সাক্ষ্য আছে এঁরা জয়ের মালা গলায় ধারণ করে এনেছেন। এতে গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে ইনস্টিটিউটের। ১৯৬৭ থেকে সর্বসাধারণের জন্য অকশান ব্রিজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রায় দুশো গোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর অংশ নেয়।

সমাজজীবনে যখনই নেমে এসেছে বিপর্যয়ের কালো ছায়া; নিরাশার ঘন অন্ধকারে যখনই বিপর্যস্ত হয়েছে মানুষের মূল্যবোধ তখনই ইনস্টিটিউটের সভ্যরা সাধ্যমতো এগিয়ে গিয়েছেন সমাজের ধূসরতা দূর করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। সুস্থ, সবল এক নতুন সমাজ কল্যাণ ও শান্তিতে

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট
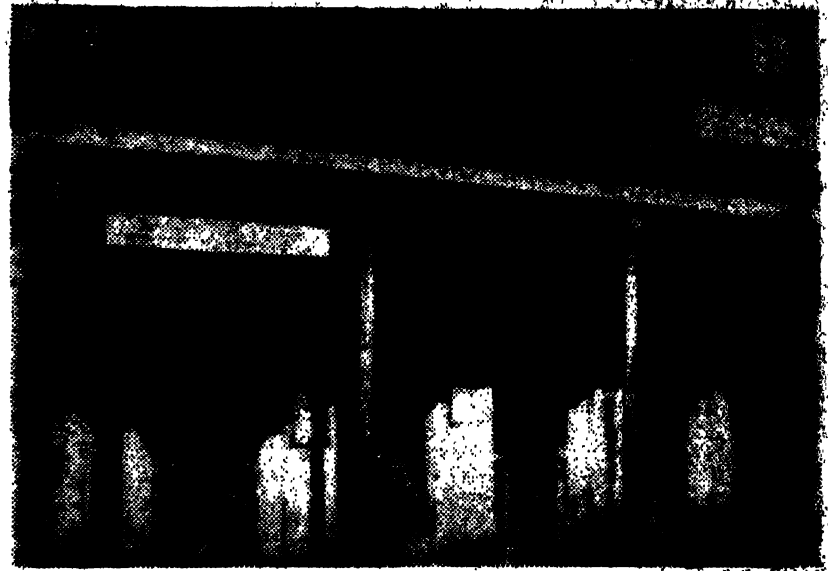
গড়ে উঠুক, এই হোল তাঁদের প্রয়াসের লক্ষ্য। ১৯৩৪ সালে যখন ভূমিকম্পে বিহারের নানা জায়গায় অসাধারণ ক্ষতি হয়, তখন ছিল ইনস্টিটিউট আয়োজিত সরস্বতী পুজোর মুহূর্ত। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে প্রতি বছরই প্রাণময় আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত, কিন্তু সেই সময়ে সভ্যরা আমোদ-প্রমোদের সবরকম আবেগ ত্যাগ করে সরস্বতী পুজোর জন্য সংগৃহীত সব অর্থ বিহারের তখনকার ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণকার্যের জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনকার সব সংবাদপত্রে এ-মহৎ কাজের যথেষ্ট স্বীকৃতি মুখর হয়ে উঠেছিল।

এরকম আরো অনেক কাজের নজীর আছে। সমাজসেবাই এসবের মূল লক্ষ্য। কিছু কিছু লোক যাঁরা সত্যি দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ছেন, তাঁদের নিয়মিত সাহায্য দেওয়া হয় এই বিভাগ থেকে। ভালো কিছু ছাত্র যারা যথার্থ গরীব, তারা তাদের স্কুল-কলেজের বেতনও পায় এখান থেকে। পুজোর সময়ে গরীব-দুঃখীদের নানারকম কাপড়-জামাও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

মনের অতলে যেসব আবেগের আন্দোলন, তার প্রকাশেই তো শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সভ্যরা এই সত্য সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন। তাই ইনস্টিটিউটের প্রায় প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৫ থেকে।

শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক ভালো ভালো উল্লেখযোগ্য নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ রাত্রির ওপর যাত্রার আকারে পরিবেশিত হয়েছে মহাত্মা শিশিরকুমারের ভক্তিমূলক সৃষ্টি 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস'। এছাড়া যে সব উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনীত হয়েছে সেগুলো হোল অনিল ভট্টাচার্যের 'অকল্যাণীয়া', অনিল ভট্টাচার্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত '[illegible] হাওয়া', 'পুনর্মূষিক ভব', 'অতি আধুনিক', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি', 'তবু অতনু' (মাটির ঘর), শরৎচন্দ্রের 'ব্রাহ্মণের মেয়ে', রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা', 'চিরকুমার সভা', 'বশীকরণ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু', 'চুয়া চন্দন', ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক', জরাসন্ধের 'এ বাড়ী ও বাড়ী', শম্ভু মিত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ', রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', এবং আরো অনেক।

অভিনয় ছাড়াও বাৎসরিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন সভ্যরা [illegible] থাকেন। এতে বহু প্রতিযোগীর [illegible] হয়। এবং সেই সময়গুলো প্রাণের গুঞ্জনেই ভরে থাকে।

ইনস্টিটিউটের সভ্যদের সমাজসেবার আর একটি নিদর্শন হোল: অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসন। ১৯৪[illegible]-এ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া চারদিকে মর্মান্তিক করুণ এক অন্ধকার নিয়ে এসেছিল, তখনই সৃষ্টি হয় শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট অ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন। এই ডিভিসনের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রোগীর সেবা করে থাকেন। যখন বসন্ত ও কলেরায় সারা অঞ্চল [illegible] গিয়েছিল তখন এই বিভাগের কর্মীরা দূর বস্তিতে গিয়েও রোগীদের [illegible] শুশ্রূষা করতেন। নিয়মিতভাবে এখানে ইনস্টিটিউটের ঘরে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

গত ১৯৭০-এ শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী [illegible]। [illegible] থেকে ১৯৭৬—এই ৫৬ বছরে ইনস্টিটিউটের সভ্যরা যে নানা বিষয়ে [illegible] বলিষ্ঠ ও ব্যাপক [illegible] দিতে পেরেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শিশুর মোটা হওয়াটা মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়

আমরা সবাই চাই মোটাসোটা গোলগাল নাদুসনুদুস শিশু। আমাদের ধারণা, এমনি হওয়াটাই শিশুর স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শিশু জন্মাবার পরেই মায়েদের তাই প্রাণপণ চেষ্টা থাকে, কী করলে শিশু মোটা হয়। আর খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তো শিশুকে মোটা করবার উপায়ের বিজ্ঞাপন থাকেই—তাতে স্ফীতকায় এক শিশুর ছবি ও নিশ্চিত ফললাভের গ্যারান্টি সহ বিশেষ এক শিশুখাদ্যের ঘোষণা, যেটি খাওয়ালে শিশু মোটা হবেই। এই সমস্ত বিজ্ঞাপন দেখে ব্যগ্র মায়েদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে শিশুকে মোটা করার চেষ্টা সর্বথা করণীয়, মোটা শিশুই প্রতিপালনের সার্থক দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। এখন যদি বলা হয়, শিশুর মোটা হওয়াটা মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়—তাহলে কথাটা এমনকি শিশু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মুখ থেকে শুনেও বিশ্বাস করতে পারবেন এমন লোকের সংখ্যা কম। শিশুখাদ্যের টিনের গায়ে ছাপানো হিসেব থাকে কোন বয়সের শিশুর কতটা ওজন হওয়া উচিত। উচ্চ শিক্ষিতা, প্রগতিশীলা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার অধিকারিণী মহিলাকেও দেখেছি নিজের শিশুটির ওজন এই নির্ধারিত মাপ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি বলে আক্ষেপ পোষণ করেন যে শিশুটি রোগা। ফলে শিশুটিকে মোটা করে তোলার দুরন্ত একটি আয়োজন ভালো রকমেই শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া, এখনকার অপুষ্টির দিনে অতি অল্পসংখ্যক শিশুই পুরোপুরি মায়ের দুধে মানুষ হতে পারে, কৃত্রিম দুধেই নির্ভর। এ অবস্থায় আয়োজনটা যেন আরো জোর পায়। কেননা, এক্ষেত্রে হিসেবটা খুবই সহজ আর উপায়টা নাগালের মধ্যে—শিশুকে মোটা করতে হলে বেশি করে খাওয়ানো চাই, টিনের গুঁড়ো জলে গুললেই শিশুর খাদ্য তৈরী, তার আর বাধা কিসের। কিন্তু এখানেই বিপত্তি, শিশুর স্বাস্থ্যের ভিতটাই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যত মানুষটির স্বাস্থ্যে বিশেষ হানি ঘটবার কারণ তৈরি হচ্ছে। শিশু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা হয়তো নতুন মায়েদের যথানিয়মে অবহিত করে থাকেন শিশুদের কতক্ষণ পরে পরে কতখানি করে খাদ্য খাওয়ানো উচিত, কিন্তু তার চেয়েও ঘন-ঘন বা বেশি-বেশি খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা যে ক্ষতিকর সেই হুঁশিয়ারীর অভাব আছে মনে হয়। উপরন্তু শিশুখাদ্য নিয়ে অবাধ বিজ্ঞাপনের এই দিনে আরও ঘন-ঘন ও আরও বেশি-বেশি খাদ্য খাওয়ানোর দিকেই প্রশ্রয়। কয়েকজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর সাম্প্রতিকতম গবেষণা অনুসরণ করে এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে উপস্থিত করতে চাই।

এই বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন শ্রীমতী শার্লোট অ্যান্ডারসন ও অপর একজন সহযোগী বিজ্ঞানী। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল-এ একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ব্রিটেনে এক বছরের কম বয়স্ক শিশুদের মধ্যে মোটা হয়ে যাওয়ার সমস্যা রীতিমতো ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রায় একই সময়ে একই পত্রিকায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন শেফিল্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক লেকচারার এল এস তাইৎস। তিনি বলছেন, এই বিপত্তি ঘটছে শিশুকে অনেক আগে থেকেই দানাশস্য, মিশ্র বেবিফুড ও অত্যধিক ঘন দুধ খাওয়াবার ফলে। তথ্য-সংগ্রহের জন্য তিনি ২৬১টি শিশুর জন্মের সময়ের ও

ছয় মাস বয়সের ওজন নিয়েছিলেন। এই ২৬১টি শিশুর মধ্যে মাত্র ২১টি পুরো-পুরি মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হচ্ছিল। এই দলে মাত্র ৪টির ওজন ছিল মাত্রাতিরিক্ত। তুলনায় কৃত্রিম দুধ খেয়ে যারা মানুষ হচ্ছিল সেই দলে মাত্রাতিরিক্ত ওজনের শিশু ছিল শতকরা ৫৯-৬ ভাগ।'

৪০টি শিশুর খাদ্যতালিকা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। তা থেকে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা যা জানা গিয়েছিল তা এই যে ৪০টি শিশুকেই খেতে দেওয়া হচ্ছিল কঠিন খাদ্য এবং অধিকাংশকে এক সপ্তাহ বয়স না হতেই চামচে করে খাওয়ানো হচ্ছিল। লেখক বলছেন, এই ফ্যাশনটা হালে শুরু হয়েছে এবং এজন্যে তিনি দায়ী করছেন বেবিফুডের উৎপাদনকারীদের। তিনি বলছেন, শিশুকে কী ও কতখানি খাওয়ানো উচিত সে সম্পর্কে বেবিফুডের উৎপাদনকারীরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং এই সমস্ত পরামর্শ শুনে মায়েরা এমনভাবে চলতে শুরু করেন যার ফলে শিশুকে অত্যধিক খাওয়ানোর ঝোঁক বেড়ে যায়।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কৃত্রিম দুধ সম্পর্কে। সম্প্রতিকালে বিষয়টি নিয়ে তিনি আরো গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা থেকে জানা যায়, মায়েরা শিশুর জন্যে কৃত্রিম দুধ তৈরি করে বড়ো বেশি ঘন করে। তার ফলে সেই কৃত্রিম দুধে ক্যালরি, অ্যামিনো অ্যাসিড ও সোডিয়ামের মাত্রা সম-পরিমাণ গরুর দুধে যতোখানি থাকা উচিত তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত ঘন দুধ খাবার দরুন শিশুর কিডনিতে চাপ পড়ে এবং বেচারা শিশু তৃষ্ণায় চেঁচাতে শুরু করে। শিশুকে যে জল খাওয়ানো দরকার এই বোধ অধিকাংশ মায়ের নেই, এমনকি শিশুকে শুধু জল খাওয়াতে অধিকাংশ মায়েরই আপত্তি। মায়েরা তখন কী করে? শিশু চেঁচাতে শুরু করলেই খাওয়ার সময় না হওয়া সত্ত্বেও সেই অতিরিক্ত ঘন দুধ আরো একবার খাইয়ে দেয়। তাতে বিপত্তি বাড়ে বই কমে না।

মায়েরা যাতে এই ভুল না করেন সেজন্যে আজকাল অনেক ডাক্তার শিশুকে স্বাভাবিক গরুর দুধ খাওয়াবার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রেও একটা সমস্যা এসে পড়ে। হাসপাতালগুলোতে গরুর দুধ বড়ো একটা চলে না, কেননা গরুর দুধের যোগান বজায় রাখা ও মজুত করা—দুই-ই সমস্যা। আর হাসপাতালগুলোতে না চলা পর্যন্ত মায়েদের গরুর দুধের দিকে টানা শক্ত ব্যাপার। মায়েরা কী করেন? প্রসূতি ওয়ার্ডে শিশুকে যে ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধ খাওয়ানো হচ্ছিল সেই ব্র্যান্ডটিই চালিয়ে যান।

মায়ের দুধ খেয়ে যে-সব শিশু বড়ো হয় তাদের ওজন কখনো মাত্রাতিরিক্ত হয় না, এটা সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ করা গিয়েছে। তবে একটা 'যদি' আছে। যদি-না শিশুকে অনেক আগে থেকেই কঠিন খাদ্য খাওয়ানো শুরু হয়। কাজেই এমন দুধ যদি তৈরি করা যায় যা সমস্ত দিক থেকেই মায়ের দুধের মতো তাহলে আর শিশুর ওজন মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংলন্ডের একটি হাসপাতালে এমনি মায়ের দুধ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে: এবং সম্ভবত অচিরেই তৈরি হতে শুরু করবে।

শিশুর খাওয়া যে অতিরিক্ত হতে পারে, এটা গবেষণার বিষয় হয়েছে সম্প্রতিকালে। আগেকার কালে মায়েরা বলতেন, শিশুকে কখনো বেশি খাওয়ানো যায় না। কথাটা ঠিক নয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমনকি আজকের দিনেও কোনো কোনো বেবি-ক্লিনিকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শিশুকে খাওয়াবার ব্যবস্থা। অবশ্য একথা ঠিক, শিশুকে পুরোমাত্রায় মিশ্র খাদ্য খাওয়ানো শুরু করার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর ওজন শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নয়। এখানেও কথা আছে। হালের গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, পরবর্তী জীবনে মোটা হয়ে পড়ার সংগে শিশুজীবনে বাড়তি ওজন হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। এই সূত্র অনুসরণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে আজকের দিনে যে-সব শিশুকে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ানো হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীতে তাদের সবাইকে মেদবহুল বপুর বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।

শিশুস্বাস্থ্যের গবেষক একজন বিজ্ঞানীর একটি আবিষ্কারের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। তাঁর নাম ডঃ চার্লস ব্রুক, তাঁর দুজন সহযোগী হচ্ছেন জুন লয়েড ও ও এইচ উলফ। তাঁরা দেখেছেন, যে-সব শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাদের শরীরে এক বছর বয়স হবার আগেই মেদকোষের (অ্যাডিপোজ সেল) সংখ্যা বেড়ে যায়। তাঁরা বলছেন, 'মনে হয় শরীরের মেদকোষের সংখ্যা মোট কত দাঁড়াবে তা পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় শৈশবকালের মধ্যেই। যে-সব শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাদের নিয়ে আমাদের গবেষণা থেকে জানতে পেরেছি, বেশি খাওয়ার ফলে শরীরে মেদকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে এক বছর বয়সের মধ্যে।' তাঁদের মতে, একজন মানুষের শরীরে মেদকোষের সংখ্যাগত গড়ন কেমন হবে তা ঠিক হয়ে যায় এই এক বছর বয়সের মধ্যেই, যখন শরীরের ওপরে খাদ্য-প্রতিঘাত সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী কালে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিকই থেকে যায়, খাওয়ার ব্যাপারটা যেমনই চলুক না কেন। পরিবর্তন ঘটে শুধু মেদকোষের আকারে।

কী সাঙ্ঘাতিক কথা! জন্মের পর থেকে এক বছর বয়স পর্যন্ত কোনো শিশুকে যদি বেশি-বেশি খাইয়ে মোটা করে তোলা হয় তাহলে সেই শিশুটিকে কিনা তার জের টানতে হবে গোটা জীবন ধরে, হ্যাঁ তাই, একাধিক বিজ্ঞানী নির্দ্বিধায় এই মত প্রকাশ করছেন। হাতে কলমে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখিয়েছেন, খাওয়ার হেরফের ঘটিয়ে মেদকোষের সংখ্যা কমানো যায় না। একজন নন, নানা বিজ্ঞানী নানা সময়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন ব্যাপারটা তাই বটে। জীবনের প্রথম বছরে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার ফল হিসেবে শতকরা অন্তত আশিটি ক্ষেত্রে মেদবহুলতায় ভুগতেই হয়।

ডঃ ব্রুক মনে করেন, ডাক্তাররাও অনেকখানি দোষী। শিশুকে প্রতিদিন কতখানি খাদ্য দিতে হবে সে-বিষয়ে তাঁরা কড়া নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাঁর মতে শিশুকে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য যে খেতেই হবে এ-ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি থাকা উচিত নয়। শিশুর ওজন একটানা বাড়ছে কিনা সেটাই আরো জরুরি বিষয়। শিশুকে বড়ো তাড়াতাড়ি দানা-শস্য ও কঠিন খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি বলছেন, দানাশস্য ও কঠিন খাদ্য দেওয়ার বয়স হচ্ছে তিন থেকে ছয় মাস, কদাচ তিন থেকে ছয় দিন নয়। ডঃ ব্রুক তাঁর গবেষণার এলাকায় লক্ষ্য করেছেন, অনেক মা-ই শিশুকে তিন থেকে ছয় দিন বয়সের মধ্যে দানাশস্য ও কঠিন খাদ্য দিতে শুরু করেন।

ডঃ ব্রুক মায়েদের পরামর্শ দিয়েছেন, বেবিফুড তাঁরা যেন বাড়িতেই তৈরি করেন, তৈরী বেবিফুড যেন না কেনেন। তৈরি বেবিফুডে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো অবশ্যই থাকে, উপরন্তু থাকে শিশুকে মোটা করার জন্য অনেকগুলো বাড়তি

উপাদান। বাড়িতে বেবিফুড তৈরি করলে সেসব উপাদানগুলো বাদ পড়ে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা থেকে আমাদের দেশের মায়েদেরও শিক্ষা নেবার আছে। সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা—শিশু কেঁদে উঠলেই শিশুর মুখে বোতল ধরিয়ে না দেওয়া। শিশুকে খাওয়াতে হবে নির্দিষ্ট সময়—সাধারণ তিন থেকে চার ঘণ্টা—পরে পরে। দ্বিতীয়ত, শিশুকে কোনো সময়েই জবরদস্তি না খাওয়ানো—চামচে বা ঝিনুকে জোর করে গেলানো তো কদাচ নয়। শিশু নিজের থেকে যতোটা খাবে ততোটুকুতেই তার খাওয়া শেষ করতে হবে। শিশুর পেট ফাঁপা, রাত্তিরে জেগে থাকা ইত্যাদি অনেক কিছুরই মূলে রয়েছে এই জবরদস্তি বা বেশিরকম খাওয়ানো। তৃতীয়ত, শিশুকে দুই খাওয়ার মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ে যতোটা পারা যায় জল খাওয়ানো।

প্রত্যেক মায়ের মনে রাখা উচিত, জন্মের পরে এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে তিনি কী ও কি-ভাবে খাওয়াচ্ছেন তারই ওপরে অনেকখানি নির্ভর করছে সেই শিশুর পরবর্তী কালের গোটা জীবন।

প্রত্যেক মায়ের মনে রাখা উচিত, এ ফ্যাট বেবি ইজ নট এ ফিট বেবি। কথাটি নেওয়া হয়েছে ইংলণ্ডের এক বেবিফুড-প্রস্তুতকারকের বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে। আমাদের দেশে অবশ্য বিজ্ঞাপনের ভাষা উল্টো। আর সে-কারণেই মায়েদের দায়িত্ব আরো বেশি।

দীর্ঘায়ু লাভে কোন চমক নেই

মানুষের গড় আয়ু কত বছর হওয়া উচিত—৭০? ১০০? ২০০? ৩০০? মানুষ কি অমরত্ব লাভ করতে পারে? মানুষের যৌবনকে কি চিরস্থায়ী করা যায়?

এসব প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। কোনোটা বিজ্ঞানসম্মত, কোনোটা উদ্ভট। তারপরেও প্রশ্নগুলো এখনো উঠছে। এখনো জবাব দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কিয়েভ-এ অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে বিশ্বের ৪৩টি দেশের ৩,০০০ বিজ্ঞানী মিলিত হয়ে দীর্ঘায়ু লাভের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছিলেন। এবং এই প্রশ্নগুলোর জবাব তাঁরা দিয়েছেন—উদ্ভট নয় — বিজ্ঞানসম্মত।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, যৌবনকে চিরস্থায়ী করার কোনো উপায়ের সন্ধান করতে যাওয়াটা আপাতত নিষ্ফল হতে বাধ্য। কিন্তু আধি-ব্যাধিতে না ভুগে দীর্ঘ জীবন লাভ করা কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, মানুষ অবশ্যই ৯০ বা ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত সুস্থ-সবল জীবন কাটাতে পারে। রুশ দেশের এক শারীর-বিজ্ঞানী একবার বলেছিলেন, 'আমাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের পক্ষে একশো বছর বয়স হবার আগে মারা যাওয়াটা হয়ে দাঁড়াবে লজ্জাকর ব্যাপার।' কিয়েভের সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের উক্তিতে এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

জীবনের পরমায়ু বাড়িয়ে তোলার বাস্তবসম্মত পথ আছে দুটি। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং আধিব্যাধি ও পরিবেশের প্রতিকূলতা দূরীকরণ। এই পথে ফল লাভের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে গড় পরমায়ু সোভিয়েত আমলের আগে ছিল ৩২ এখন ৭০।

দ্বিতীয় পথ—সুসংগঠিত সুসমন্বিত শ্রম। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো—যাঁরা একশো বছর বা তারও বেশি কাল বেঁচে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন কর্মঠ। অন্যদিকে যারা কোনো শারীরিক শ্রম করে না, কোনো রকম খেলাধুলা বা শরীর চর্চাও নয়—তারা তিরিশেই বুড়িয়ে যেতে শুরু করে। যাঁরা কর্ম-তৎপর জীবন যাপন করেন, কখনো কখনো তাঁরা এমন কি নব্বুই বছর বয়সেও তারুণ্য বজায় রাখতে পারেন।

মনকে সজীব রাখা দীর্ঘ জীবন লাভের আরেকটি উপায়। দেখা গিয়েছে দীর্ঘায়ুরা সাধারণত হয়ে থাকেন অক্লান্ত কর্মতৎপর, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর ও সদা উৎফুল্ল। কখনো তাঁরা বিমর্ষ হয়ে থাকেন না, বড়ো রকমের আঘাত পেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে উঠতে পারেন।

দীর্ঘ জীবন লাভের অপর একটি উপায়ের সন্ধানও এই সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তা হচ্ছে, যে সব জৈব প্রক্রিয়া ঘটার দরুন মানুষ বুড়ো হয় সেই প্রক্রিয়া-গুলোই প্রতিহত করা ও ঘুরিয়ে দেওয়া। এটি ঘটানো কোনো দূরের ব্যাপার নয়, এখনই হতে পারে ও কিছুটা হচ্ছেও।

মানুষ বুড়ো হয় কখন? জৈব শরীরের বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক সংযোগগুলোর মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তা ব্যাহত হলে। যদি বিশেষ ভেষজ বা বাস্তব প্রভাব প্রয়োগ করে এই ব্যাহত হওয়ার ব্যাপারটি ঠেকানো যায় তাহলে মানুষের পরমায়ুও অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা আরো একটি কথা বলেছেন। মানুষের বুড়ো হওয়া শুধু কতকগুলো জৈব প্রক্রিয়ার কমজোরী হওয়া নয়—মানিয়ে নেওয়ার নতুন প্রক্রিয়ার আবির্ভাবও। এ-ব্যাপারটি জীবনের সকল পর্যায়ে লক্ষ্য করা যেতে পারে। কাজেই, জৈব প্রক্রিয়া কম-জোরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করার নতুন প্রক্রিয়া কতখানি জোরদার হচ্ছে তার ওপরেও মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভ নির্ভর করছে। মানিয়ে চলার এই প্রক্রিয়াগুলো আয়ত্ত করতে পারলে অবশ্যই পরমায়ু দীর্ঘ হতে পারে।

—অরুণকান্ত

॥ ৫ ॥

দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল।

কাল হেমালগুের হাট ছিল। হাট থেকে মুরগী কিনে মুরগীর ঘরে রেখেছিলাম। আনাজও কিনেছিলাম। মিসেস কিংএর কাছে বলে পাঠিয়েছিলাম এক ডজন কেকের জন্যে। আগে অর্ডার না দিলে কেক পাওয়া যায় না।

কার্নি মেমসাহেব রুটি ত রোজ দিচ্ছেনই, কাল যাতে ছুটির জন্যে বাণ মেন্ সে কথা বলে পাঠালাম। ভোরবেলা হাকিম এসে মেটে দিয়ে যাবে যাতে ব্রেকফাস্টে ও খেতে পারে।

লালিকে বলে হাসানকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছি। হাসান বাবুর্চি। এ বাড়িতে সখের অতিথিরা কখনো কেউ এলেই হাসানের ডাক পড়ে।

ভাবতেই যে কি ভালো লাগছে। আজ ছুটি আসছে আমার কাছে। বিনা নিমন্ত্রণে, নিজে যেচে, নিজের সঙ্গত অধিকারে সে আসবে আজকে। অধিকার আমাদের অনেকেরই অনেক ব্যাপারে থাকে হয়ত অনেকের কাছে, কিন্তু সে অধিকারের তাৎপর্য ও তার সীমা আমরা অনেকেই সঠিক বুঝতে পারি না।

এতদিনে, এতদিনে যে ছুটি আমার এই ভাড়া-নেওয়া পর্ণকুটিরে, আমার এই শূন্য জীবনে তার নিজের ভূমিকা এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে এ কথা মনে করেই মন খুশীতে ভরে যাচ্ছে।

আমি বাইরের দিকের একটা ছোট ঘরে থাকি, সেখানেই আমার লেখার টেবল, টানা সব। তার পাশে একটা বড় ঘর—অন্য পাশেও বড় ঘর আছে। ছুটি কোন্ ঘর পছন্দ করবে, কোন্ ঘরে সে থাকবে জানি না। তাই দু' ঘরেই বিছানা পাতিয়ে রাখলাম বিকেলে। ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে রাখলাম।

ছুটি স্যুপ খেতে ভালবাসে। হাসানকে স্যুপ, চিকেন রোস্ট, পুডিং সব বানাতে বলে দিলাম।

পত্রাতু থেকে ম্যাকলাস্কির বিজলী আসে। মাঝে মাঝে হঠাৎ আলো নিভে যায়। নিভিয়ে দেওয়া হয় সেখান থেকে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে ছুটি ভয় পেতে পারে, তাই সব ঘরে ঘরে বড় মোমবাতি লাগিয়ে দিলাম, তার পাশে রাখলাম দেশলাই।

গঙ্গা বাস চামার রাস্তা দিয়ে যখন প্রতিদিন যায় তখন সন্ধ্যে হয়ে যায়। চারধারে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে।

সব বন্দোবস্ত শেষ করে, লণ্ঠন হাতে মালুকে নিয়ে, ভাল করে গরম জামা-কাপড় পরে আমি বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

এখানে এইই নিয়ম। যে যখন ফেরে, তার বাড়ির মালি (সাহেবরা বলে, কুলি) বাড়ির সামনে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গিরধারী ড্রাইভার বাস থামায়। যার যার বাড়ির পথের সামনে সে সে নেমে যায়, মালি মাল বয়ে নিয়ে বাড়ি যায়।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই দূর থেকে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় গোঙানি তুলে ফার্স্ট গীয়ার সেকেন্ড গীয়ারে আসতে শোনা গেল গিরধারী ড্রাইভারের গঙ্গা বাসকে।

দেখতে দেখতে হেড-লাইটের আলো দেখা যেতে লাগল। হেলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগল বাসটা।

আমি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মালু এগিয়ে গিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন উঁচু করে ধরলো। বাসটা থামলো। ভিতর থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন হিন্দীতে বলল, মুঝকো হিঁয়াই উতারনা?

গিরধারী বলল, জী, মাইজী।

বাসটা দাঁড়িয়ে একটা অতিকায় জানোয়ারের মত ঘড় ঘড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, এক্জস্ট পাইপের ধুঁয়োর গন্ধে পিটিস ফুলের গন্ধ মুছে গেল। পেছনের দরজা দিয়ে ছুটি নামল।

কতদিন পরে ছুটিকে দেখলাম। ক—ত—দি—ন পরে।

একটা হালকা সবুজে সিল্কের শাড়ি পরেছে, গায়ে সাদা বুটিতোলা শাল, পায়ে চটি।

কনডাক্টর একটা ছোট সুটকেস হাত বাড়িয়ে দিল—মালু সেটাকে নিয়ে নিতেই ছুটি বলল, তুমি কে?

বাংলায় বলাতে, মালু বুঝলো না, মালু আঙুল তুলে বলল, বাবু হুঁইয়েপর হ্যায়।

ছুটি অবাক গলায় ওকে বলল, বাবু হিঁয়া তক্ আয়া?

তারপর ওরা দুজন তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বাসটা চলে গেছিল।

লণ্ঠনের আলোয় চারিদিকের অন্ধকার আরো ভারী হয়ে ছিল। ছুটি আমার কাছে এসে, একেবারে আমার সামনে দাঁড়াল—অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে সেই লালচে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, প্রায় ফিস ফিস করে ওর বুকের মধ্যে থেকে বলল, কেমন আছেন? আপনি এখন কেমন আছেন?

কাউকে দেখলেই যে কারো এত ভাল লাগতে পারে, সমস্ত সত্তা হাওয়া লাগা সজনে ফুলের ডালের মত দুলে উঠতে পারে, তা ছুটিকে দেখতে পেয়েই নতুন করে মনে হল।

ছুটির গলা শুনলে, ওর চোখে তাকালে, ওর কাছে দাঁড়ালে কেন আমি এতখানি খুশী হই? কেন হই আমি কিছুতে বুঝতে পারিনি কোনোদিনও।

আজকে আমি কত যে খুশী কী যে সুখী, আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না। আমার স্বপ্নের, আমার দুঃখের, আমার আনন্দের আমার দুঃখজাগানীয়া, ঘুমভাঙানীয়া ছুটি আজ কতদিন পরে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মালুকে বললাম—লণ্ঠনটা আমার হাতে দিয়ে এগিয়ে যেতে, গিয়ে লালিকে কফির জল চড়াতে বলতে।

মালু এগিয়ে গেলে আমি বললাম, তুমি কেমন আছ? তুমি কেমন আছ বল?

ছুটি হঠাৎ আমার হাতথেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আমার মুখের কাছে তুলে ধরল, বলল, অনেকদিন আপনাকে ভাল করে দেখি নি, কই টুপীটা খুলুন একটু, খুলুন না।

টুপীটা খুলতে খুলতে আমি বললাম, তোমার স্বভাব একটুও বদলায়নি কলেজের লোকচারার হয়েও।

ছুটি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন।

টুপীটা পরতে পরতে আমি বললাম, তাত যাবই। তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়, বদলে যাওয়াই ত স্বাভাবিক। বয়সে এবং চেহারায়ও।

বয়সের জন্যে বদলাননি। নিজেকে বদলে ফেলতে চেয়েছিলেন তাই বদলে গেছেন। কিন্তু এভাবে নিজেকে...লাভ কি?

আমি বললাম, ছাত্রী পড়ানোর জন্যে তোমার বক্তৃতা দেওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন চলো। বাড়ি পৌঁছে—তারপর যা বলার আছে শোনা যাবে।

বাড়ি কি অনেকদূর? বলে সালটাকে ভাল করে টেনেটুনে নিল ছুটি।

বললাম, এই এক ফার্লং মত। তোমার খুব শীত করছে, না?

মুখ ফিরিয়ে ছুটি বলল, এখানে বেশ শীত বাবা, রাঁচীর চেয়ে বেশী শীত—হাত দুটো শীতে কুঁকড়ে গেছে।

চলতে চলতে আমি আমার ডান হাতটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার হাতে তোমার হাত রাখ, হাত গরম হয়ে যাবে।

ছুটি গ্রীবা ঘুরিয়ে এক চমক তাকাল। তারপর বলল, না।

একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, জানেন না, আমার সমস্ত শীতের দিনে আপনিই আমার দিকে আপনার উষ্ণতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, চিরদিন। আপনাকে নানাভাবে, নানা জনের মারফৎ দুঃখী করা ছাড়া আর কিছু আপনার জন্যে করতে পারিনি। এখন বোধহয় আপনার ঠাণ্ডা হাতের দিকে আমার হাত বাড়ানোর সময় এসেছে—আমার হাতে, আপনি হাত রাখুন, বলে ছুটি ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

বাঁ-হাতে লণ্ঠন নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছুটির বাঁ হাতে আমার ডান হাত রাখলাম। অনেক অনেকদিন পরে ছুটির হাতে হাত রাখলাম।

ভালোবাসা বলতে কি বোঝায় আমি জানি না, উষ্ণতা কথাটার মানে কি আমি জানতে চাইনি, কিন্তু বহুদিন পরে একজনের হাতে হাত রাখতেই আমার সমস্ত শরীর কেন যে এমন করে ভালো লাগায় শিউরে উঠল তাও কি আমি জানি? এই উষ্ণতা, এই আশ্লেষ, এই ভরন্ত ভালোলাগা, এর কি কোনো নাম নেই?

ছুটি আমার হাতখানি ওর সুন্দর নরম আঙুলে ও তালুতে দৃঢ় অথচ হালকা করে ধরে রইল। আমাদের দুজনের হাতের উষ্ণতা দুজনের হাতে ছড়িয়ে গেল। কারো হাতই আর ঠাণ্ডা রইল না। আমার হঠাৎ মনে হল, আমি কোনো বিরহী ঘুঘুর বুকে হাত রেখেছি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ছুটি বলল, আপনার বাড়ির চারপাশটা কেমন তা দেখা হল না। বিজুপাড়া পেরুতে না পেরুতেই ত অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। রাঁচীতে আমার এক বন্ধু বলছিল, জায়গাটা সুন্দর, সত্যিই সুন্দর না?

বললাম, সকলের সৌন্দর্যজ্ঞান ত সমান নয়, তবে তোমার চোখে হয়ত অসুন্দর লাগবে না। কাল তোমাকে সব দেখাব।

দূর থেকে বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছিল।

ছুটি বলল, ওমা, এই জঙ্গলে ইলেক-ট্রিসিটি আছে? ভাবা যায় না, এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ছবির মত ছোট ছোট টালির বাংলোয় ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে। তাই না?

জবাব দিলাম না কোনো। আমার সদ্য-রোগমুক্ত শরীরাশ্রিত ক্লান্ত মনটা এমন ভালোলাগার আমেজে বুঁদ হয়ে ছিল যে কোনো তুচ্ছ কথা বলেই সে আমেজ আমি নষ্ট করতে রাজী ছিলাম না।

বাড়িতে ঢুকে ছুটি সব ঘুরে ঘুরে দেখল—ওর চোখ বারবার দেওয়ালের বড় বড় ফাটল ও মেঝের লম্বা লম্বা ফাটার দাগ দেখতে লাগল। একটু পরে ও বলল, বাড়িটা এমন কেন? চতুর্দিক ফাটা, জরাজীর্ণ?

বললাম, বাড়িতে যে-থাকে তার মতই ও বাড়ি হবে? বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক যে-দামে এ বাড়ি কিনেছিলেন তাতে একটা মোটর সাইকেলও কেনা যায় না। সাহেব চলে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়া। সুবিধামত দাম পেয়ে কিনে নিয়েছিলেন। কাল সকালে তোমার এতটা খারাপ লাগবে না, দেখো। ও বাড়িটা বাড়ি হিসেবে ভাল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু বাড়ির পরিবেশটা ভাল। পরিবেশের জন্যেই শুধু ভাল লাগে।

ছুটি এসে ভিতরের বসবার ঘরের বেতের চেয়ারে বসল।

লালি এসে বলল, বাথরুমে গরম জল দেওয়া হয়েছে।

ছুটি উঠে হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গেল।

ও আমার পাশের ঘরেই থাকবে বলেছে—বলেছে ওর ভয় করবে ওপাশের দূরের ঘরে শুতে।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ছুটি কফি ঢালতে লাগল, বলল, আপনি ত এক চামচ চিনি খেতেন, এখন কি বেশী খান?

আমি হাসলাম, বললাম, আমি কফি খাবো না ছুটি, আমার খাওয়া দাওয়া এখনো নিয়মমত করতে হয়। বাড়তি কোনো কিছু খাওয়া বারণ।

ছুটি কফি ঢালা বন্ধ করে কফির ছোট পটটা শূন্যে ধরেই বলল, কে এসব বলেছে? কোন্ ডাক্তার?

মান্দারের সাহেব ডাক্তার। যিনি এখন আমাকে দেখছেন।

ছুটি চোখ নামিয়ে আমার জন্যে একটি কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল, তাঁকে বলবেন যে রাঁচীর লেডি ডাক্তার অন্যরকম প্রেসক্রিপশান করেছেন। কফি আপনার খেতেই হবে।

আমি যে দুদিন থাকব, আমি যা খাব, যা রাঁধব, সবই আপনার খেতে হবে। তারপর একটু থেমে বলল, আজকালকার ডাক্তাররা খালি শরীরের চিকিৎসা করেন, যেন শরীর একটা লোহার জিনিষ—তার সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই।

কফির কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে খুব অভিমানী গলায় বলল, সত্যি। আজ এতবড় একটা অসুখ হল, আমাকে একবার মনে পড়লো না আপনার. আমাকে একটা খবরও পাঠালেন না। আপনাকে কিছু বলার নেই আমার।

কফির কাপটা তুলতে তুলতে আমি বললাম, কেন খবর পাঠাব? তোমার মনে আছে? তুমি রাঁচী আসার আগে আমার একবার ভীষণ চোখের অসুখ হয়েছিল। আমি দিন-রাত চোখের কাজ করি, তাই যখন সাতদিন চোখ বুজে পড়ে থাকতে হয়েছিল তখন কি যে অবিশ্বাস্য অসহায়তা আর যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা-কি বলব। চোখ বুজলেই একজনের মুখ দেখতে পেতাম। সত্যিই বলছি, একজনের চোখ দেখতে পেতাম।

প্রায় পাঁচ দিনের দিনে তোমাকে নিজে ডায়াল হাতড়ে-হাতড়ে ফোন করেছিলাম, বলেছিলাম, একবার এসো, তুমি দেখতে এলে আমার ভাল লাগবে।

তুমি বিদ্রূপের গলায় বলেছিলে, আপনার কি দেখার লোকের অভাব। তারপর, মনে আছে কি-না জানি না, আরো, অনেক কথা বলেছিলে।

আমার মনে সেদিন সত্যিই সন্দেহ হয়েছিল, সে আমার প্রতি তোমার ভাল ব্যবহারটুকু কতখানি দেখানো এবং কতখানি সত্যি। তোমার উপর আমার জোর কিছু

আলো আছে কি নেই, সেদিন ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর অপমানিত মনে বসে বসে শুধু তাই ভেবেছিলাম।

আসলে আমার এ অসুখের কথা তাই জানাইনি।

ভালই করেছেন। আমি ভাবছি, কাল ভোরের বাসেই রাঁচী চলে যাব। যে ভদ্রলোকের নিজের অধিকার এবং নিজের সংগে অন্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তাঁর সংগে ফাকা বাড়িতে একজন অবিবাহিতা মেয়ের থাকাটাও ভাল দেখায় না। আমাদের দুজনের মধ্যের সম্পর্ক যদি এতই পলকা হয় যে অভিমানের বশে কেউ কাউকে কোনো কথা বললে তাতেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতে বসে, তাহলে জানতে হবে সম্পর্কটা এখনো যথেষ্ট পাকা হয়নি।

জবাব দিলাম না আমি; পেয়ালা-ধরা ওর হাতের উপর আমার হাত রাখলাম।

ও কোনো কথা বলল না, দুঃখিত মুখে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইল।

কফি খাওয়া শেষ করে ছুটি বলল, ওঃ ভুলেই গেছিলাম, আপনার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি বলে ওর ঘরে গেল।

ফিরে এল একটি পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে, ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলল, দেখুন ত, এই পুলোভারটা আপনার গায়ে হয় কিনা।

একটা সুন্দর ফুল-স্লিভস পুলোভার বুনেছে ছুটি। ছাই রঙা। বুকের ও হাতের কাছে সাদায় কাজ করা। আর দুটো ছাই-রঙা বড় মোজা।

ভাবলাম, এই ঠাণ্ডায় আপনার কাজে লাগবে। অনেক দিন আপনাকে কিছু দিই নি। পছন্দ হয়েছে আপনার?

আমি চুপ করে রইলাম। চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের চোখ এত কথা বলে, চুপ করে কারো দিকে চেয়ে থাকলে চোখ অনর্গল এত কথা বলে যে সে সময়ে মুখে কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের কলমের বা মুখের ভাষা কোনো দিনও বোধহয় চোখের ভাষার সমকক্ষ হতে পারবে না। আমার ছুটির চোখের দিকে চেয়ে আমি বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারি, হাজার বছর—।

চোখে কিছু বললে, বলার কিছু বাকি থাকে যা অন্য জনে কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নিতে পারে। মুখে যা নিখে বললে সব নিঃশেষে বলা হয়ে যায়, নিজের হৃদয়ে গোপন ও অব্যক্ত কথার আনন্দময় বেদনা তখন হারিয়ে যায়। সে এক দারুণ নিঃস্বতা।

আমার ফুসফুস হয়ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় এখনো তেমনি আছে, আমার হৃদয় যেমন যেমন ছিল। আমার ছুটি আমার চোখের সামনে থাকলে আমার হৃদয় এখনো তেমন ঝমঝমিয়ে বাজে। তখন আমার একটুও মরতে ইচ্ছে করে না।

যেদিন নিশ্চিন্তভাবে জানব যে ও আমার কাছে নেই, এমন কি আমার হৃদয়ের কাছেও নেই, এবং থাকবে না, জানব ও অন্য-কারো হয়ে গেছে অথবা অন্য কারোরই না হয়ে ও কেবল ওর নিজেরই হয়ে গেছে, সেদিন আমার বাঁচার আর কোনো তাগিদ থাকবে না।

হঠাৎ ছুটি বলল, এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না যে আপনি আমাকে একটা খবর দিলেন না কেন?

কি লাভ হত বল জানিয়ে? আমি বললাম, সকলের সব অশান্তি দূর করতে তুমি নিজেকে কোলকাতা থেকে দূরে নির্বাসিত করলে। তোমার কাছে আমি কত ছোট হয়ে আছি, ছোট হয়ে থাকি, তা তুমি জানো না। তাছাড়া এ এমন একটা অসুখ, যে অসুখে তোমার নিজের করার কিছিল? হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম, ডাক্তার ছিলেন, নার্সরা ছিলেন। রুগীকে ত এরকমভাবেই থাকতে হয়। তুমি এলে তোমারই কষ্ট হত শুধু।

চিকিৎসা নাই-ই বা করলাম, সেবা নাই-ই বা করলাম, আপনার কাছে ত থাকতে পারতাম।

—তোমার কি ধারণা তুমি কখনও আমার থেকে দূরে থাকো? আমার সংগে তুমি ত সব সময়েই থাকো। সমস্ত সময়। এতগুলো বছরে মনে পড়ে না কখনো যে তোমার কথা একবার না ভেবে একদিনও ঘুম এসেছে আমার অথবা তোমার মুখ মনে পড়ে ঘুম ভেঙেছে। তুমি কি কখনোও জানোনি যে, তুমি সব সময়ই আমার সংগেই থাক।

ছুটি ওর বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি তুলে আমার দিকে চাইল। কোনো জবাব দিল না কথার।

লালি খাবার লাগিয়ে দিয়েছিল।

খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে বললাম, তুমি কিন্তু খাওয়ার সময় দূরে বসে খাবে। আমার গ্লাস, আমার কাপ সব আলাদা করে রাখবে—আমার ঘরেও মোটে ঢুকবে না। তুমি ভাল করেই জান, এ রোগের বিশ্বাস নেই। যতখানি পারো আমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলবে।

ছুটি অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল বলল, বুঝেছি আপনি যেমন সব সময় আমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলছেন?

আমরা গিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসলাম।

সস্তা লোহার ফোল্ডিং টেবল, ফোল্ডিং চেয়ার, ফাটা দেওয়াল, ফাটা মেঝে।

এ ঘরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। খাওয়ার ঘরের পাশে রান্নাঘর—মধ্যে এক ফালি ঢাকা বারান্দা—কিন্তু দু পাশ খোলা। রান্নাঘরটা উত্তরে। এমন হাওয়া আসে যে বলার নয়। হাওয়া আসুক আর নাইই আসুক এ ঘরটা হাড়ই-ঠাণ্ডা হয়ে থাকে সব সময়। দিনের কোনো সময়েই এ ঘরে রোদ ঢোকে না।

শালটা ভাল করে মুড়ে বসল ছুটি—ঠাণ্ডায় ওর ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ছুটি আমার মুখোমুখি বসেছে তাই আমার মনে হচ্ছে এই ফাটা-ফুটো ঘর, এই সামান্য আসবাবের দৈন্য, সবকিছুই ছুটি এসেছে বলে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

হাসান এসে খুব গরম স্যুপ দিয়ে গেল।

আমি বললাম, শীগ্গীর খাও, নইলে দু মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ছুটি বলল, আমার ভীষণ শীত করছে, বলে টেবলের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাটুতে রাখল। আমার হাত ওর হাতে নিয়ে ওর হাত গরম করে দিলাম।

লালি ভাঁড়ার থেকে আচারের শিশিটা বের করে আনল।

ছুটি দেখে প্রায় চীৎকার করে উঠল, বলল, এ কি? এ আচার আপনি এখানে কোথায় পেলেন? আশ্চর্য। কবে কোলকাতার বলেছিলাম, ভালবাসি, আর আপনি সে কথা মনে করে রেখেছেন? বলুন না কোথায় পেলেন?

আমি হাসলাম, বললাম, খিদিরপুর থেকে আনিয়েছি।

—ছুটি অবাক গলায় বলল, আপনার মনেও থাকে আশ্চর্য। সব খুঁটিনাটি কথা।

—বললাম, থাকে, সবই মনে থাকে, সমস্ত খুঁটিনাটি কথা মনে থাকে। যা মনে রাখতে ইচ্ছা হয় সেগুলো সবই মনে থাকে।

—এ আচার তবে রাঁচীতেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আশ্চর্য। এত ভালোবাসি অথচ আমার নিজের একবারও মনে হয় নি যে রাঁচীতে খোঁজ করি।

—তাত হল। এখন আচার খাবে কি দিয়ে? আজ ত তোমার জন্যে একেবারে সাহেবী রান্না হয়েছে।

—কাল খাব। কাল আর কিছুই খাব না। শুধু আচার দিয়ে এক থালা ভাত খাব।

—বললাম, পাগলি।

খাওয়া দাওয়ার পর মধ্যের ছোট ড্রইং-রুমে চেয়ারের উপর পা তুলে, শাল মুড়ে শাড়ি টেনে বসল ছুটি। বলল, মশলা খাবেন? বলে ওর ব্যাগ থেকে একটি কৌটো বের করে একটু মশলা দিল। তারপর বলল, কটা বাজে?

—দশটা। আজ আর গল্প নয়। এতখানি বাসে এসেছ। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। আজকাল ভোরে কখন ওঠো তুমি? নটা না দশটা?

ও হাসল। বলল, আজ্ঞে না স্যার। নিজের অনেক কাজ করতে হয় ভোরে উঠে। আমি কি আর সেই আরামের আদুরে মেয়েটি আছি? এখন অনেক শক্ত হয়েছি আমি, অনেক কিছু করতে হয় আমাকে নিজের জন্যে। কাল দেখতেই পাবেন কখন উঠি।

—বললাম, কাল কোন সময় কি খাবে এখনি বলে রাখ। হাসানকে আমি সব বুঝিয়ে রাখছি।

—ছুটি চটে গেল। বলল, দেখুন, আপনার বাসাটি হয়ত ভাল হয়ত পারে কিন্তু আমার দরকার নেই কোনো। তাছাড়া আপনাকে পাহারার বাজে বাগি

কালকে আমিই সব রাঁধব—আমি আমার ম্য-খুন্দী আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

—তাতে আমি খুশী যে হব তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু চারদিকে এত সুন্দর জায়গা আছে তোমাকে দেখাবার, তোমাকে নিয়ে যাবার যে তুমি একদিনের জন্যে এসে হেঁসেলে ঢুকবে এটা মোটেই ভাল হবে না।

—আহা। যে রাঁধে সে যেন চুল বাঁধে না।

—তা হয়ত বাঁধে, কিন্তু তুমি এমনিতেই রোজ অনেক কষ্ট করো—আমার কাছে যখন আসবে যখনি থাকবে তখন অন্তত তোমাকে একটু আরামে রাখতে দিও। তুমি এখানে সকাল করে সাজবে, সকাল বিকেলে চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়াবে, খিদের সময় এসে খাবে—ব্যাস—এখানে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।

—না। তা বললে হবে না। জেদী মেয়েদের মত বলল ছুটি।

—তাহলে একটা রফা হোক। হাসানই রাঁধবে, কিন্তু তুমি শুধু একটি পদ রেঁধো। কেমন?

—কি ভাবল যেন ও। তারপর বলল, বেশ, তাই হবে।

একটু পরে ও বলল, চলুন শুয়ে পড়া যাক।

ওর সঙ্গে আমি ওর ঘরে গেলাম। বললাম রাতে ভয় পাবে না ত? ভয় পেলে আমাকে ডেকো। আমি পাশেই থাকব। তোমার বালিশের নীচে টর্চ রইল, যোজনে

থাবায়. জল রইল পাশে রইল। ... বাথরুমের আলোটা জ্বালিয়ে রাখতে পারো ... ভয় করলে।

ভোরে আমার জন্যে তোমার তাড়াতাড়ি ওঠার দরকার নেই। ওদিকের ঘরের বাথরুম ব্যবহার করব আমি। যতক্ষণ ভাল লাগে ঘুমিও। আমার ও তোমার ঘরের মধ্যের দরজাটা ভেজিয়ে রেখো। ভয় নেই কোনো।

ছুটি এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার বলল, বুঝলাম।

তারপর বলল, আপনার ঘরে চলুন দেখি।

—আমার ঘরে এসে ও বলল, শুয়ে পড়ুন, আপনার মশারী গুঁজে দিচ্ছি।

—বললাম, তুমি ... আমারে এখন অনেক কাজ বাকি ... ... শেষ করতে হবে, ... তুমি আগে শুয়ে পড়ো।

—ও বলল, তাহলে মশারীটা ... গুঁজে দিয়ে যাই অন্ততঃ—। বলেই মশারীটা ফেলে গুঁজতে লাগল।

টেবলের উপর লেখার কাগজগুলো ছিল, ও শুধোলে, এখন কি লিখছেন?

—বললাম, এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জের পটভূমিতে একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছি। কি লিখছি তা জেনে তোমার লাভ কি? তোমার কি আমার লেখা পড়ার অবকাশ হবে এখন?

—চোখে খুব ... ছুটি বলল ... তাত বলবেনই, আপনি ... ... কোথায় লিখছেন—কি ... যে এখানে আপনার সব লেখা খুঁজে বের করি ... আমিই জানি। ... বলেই, ওর চোখ দুটি বড় নরম হয়ে এল, ও স্বগতোক্তির মত বলল, খুব ভাল লাগে ... জানেন ...। বলেই থেমে গেল।

আমি বললাম, কি ভাল লাগে?

খুব ভাল লাগে, যখন কেউ আপনার লেখার প্রশংসা করে। বলেই আমার দিকে তাকাল।

আমি ওর চোখে চাইলাম।

ও কথা না বলে মশারী গুঁজতে লাগল।

মশারী গোঁজা শেষ হলে ও বলল, শুতে যাচ্ছি। পরক্ষণেই বলল, এই যা ... ভুলে গেছিলাম, বিজয়ার পরে দেখা, আপনাকে প্রণাম করতেই মনে ছিল না। বলেই নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল।

আমি ওকে দু'হাত ধরে তুলে ... তুলে ওর ... সাদা ... কপালে ... একটা চুমু খেলাম, ও ছটফট করে ...। তারপর ওর ... ... হয়ে ...।

আমি দুষ্টুমী ... তোমাকে ... আদর করতে খুব ইচ্ছা করছে, কিন্তু ... ঠোঁটে এখন রাজরোগের বীজাণু।

তোমার ... দুঃখের ... মুখ দেওয়াও ... নয়।

ও আদুরে গলায় বলল, থাক্ অত আদর করে কাজ নেই।

ছুটি গিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনলাম।

আমি একে একে খাওয়ার ঘর, বাইরের ঘর সব ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিবিয়ে ভিতরের বারান্দার ঘরে এলাম।

... ফায়ারপ্লেসের চুল্লী দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছে ভিতরে। দেওয়ালে তার দাগ হয়ে গেছে। কিছু ... এসে জমেছে ভিতরে জলের সঙ্গে। কাল এগুলো পরিষ্কার করে, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করতে হবে, ছুটিটার নইলে বড় কষ্ট হচ্ছে ঠাণ্ডায়।

ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে সরে এসে আলো নিভাতে যাব যখন, ঘরের, এমন সময় ছুটির ঘরের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। ... দেখি, ছুটি দাঁড়িয়ে আছে, একটা ... কটসউলের নাইটি পরে। মুখে ক্রীম লাগিয়েছে। দু' বিনুনী করে চুল বেঁধেছে। ওকে ভীষণ বাচ্চা বাচ্চা ... আলোতে ফর্সা রঙে ওকে ... ... রেড-ইন্ডিয়ান ...

—শুধোলাম, কি হল? ঘুমাওনি?

ও দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, না।

—ওর চোখ দেখে মনে হল, ও চাইছে, ভীষণ চাইছে, এই দারুণ শীতের কুকুরে বাওয়া রাতে আমি একটু ওর কাছে যাই।

—ওর সঙ্গে আমি ওর ঘরে গেলাম। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। নাইটিতে ঢাকা ওর বুকে আমার মুখ রাখলাম।

ও ভাল লাগার শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, আর মুখে বলতে লাগল অসভ্য; আপনি একটা অসভ্য।

আমি ওকে ডাকলাম, ছুটি, আমার সোনা ...

... যেন; কোন ... মধ্যে, কত দূরের জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে কত শিশির-ভেজা উপত্যকার ওপাশ থেকে আমার ডাকে সাড়া দিল, অস্ফুটে বলল, উঁ, আরামে বলল উঁ—উষ্ণতায় আবেশে বলল, উঁ......।

আর কোনো কথা হলো না। ও আমাকে আশ্রয় করে, আমাতে নির্ভর করে, আমার শক্ত বুকে ওর নরম, লাজুক, উষ্ণ বুকের ভার লাঘব করে আমার সারা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রইল।

আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, সোনা, আমার ছুটি, এবার ঘুমোতে যাও।

ছুটি অস্ফুটে বলল, না।

বললাম, ছুটি, তুমি এরকম করো আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। আমার খুব খারাপ অসুখ ছুটি, এমন করে না।

ছুটি তবুও বলল, না।

তারপর বলল, আপনাকে যদি আর কখনো এমন করে না পাই। এতবছর ত

সকলে মিথ্যামিথ্যি দোষী করল আমাকে; আপনাকে। অপবাদ যখন মাথা পেতে সহাই করব তবে নিজেদের ঠকাব কেন? কার জন্যে ঠকাব? আমাদের সকলে ঠকাবে আর আমরা কেন অন্যদের ঠকাবার আগে এতবার ভাবব?

আমি ওকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে তোমাকে ঠকায় এমন কোনো শক্তি ত নেই পৃথিবীতে। তোমার শরীরটাকে এই মুহূর্তে পেলেই কি ওদের উপর আমার জয় হবে ছুটি? এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, এই তোমার সমস্ত তুমি, তোমার মন, তোমার সুগন্ধি শরীরের তুমি, এই সমস্ত তুমিই ত আমার, আমার চিরদিনের। সে চিরদিনের, যা ... ভাবে অত তাড়াতাড়ি পেতে নেই। তোমার শরীর ত আমারই—যখনই আমি ... চাইব, তখনি পাব—এর জন্যে এত অধীরতা কেন তোমার? আমি ত এই ... তোমাকে বুকে জড়িয়েই খুশী—। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন আমার অসুখ এখনো সারেনি। আমি ত জেনেশুনে তোমার প্রতি অবিচার করতে পারি না।

ছুটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, কিন্তু, আমার মন হয়ত আপনার, কিন্তু শরীরটা সম্বন্ধে অত নিঃসন্দেহ হবেন না। আমার শরীর আমারই, আমার একার, এ শরীর অন্য কারো নয়। আমি জানি, আমার মন আপনার ডাকে চিরদিন সাড়া দেবে, ভয় হবে যদি শরীর না দেয়। আমার ভারী ভয় হয় যদি কখনো এমন হয় যে, আপনি কিছু চাইলেন আমার কাছে কিন্তু আমি দিতে পারলাম না।

তারপর একটু থেমে বলল, জানিনা, আবার কবে কতদিন পরে আপনাকে এমন ভাবে, এমন নির্জনতায় এরকম আপনার নিজের কাছে পাবে। পরে আমাকে কিন্তু দোষ দেবেন না। বলতে পারবেন না, আপনার ছুটির কিছুমাত্র অদেয় ছিল আপনাকে।

আমি ওর গালের সঙ্গে গাল ছুঁইয়ে বললাম, কখনো বলব না ছুটি, এ কথা কখনো বলবো না। তুমি দেখো, কোনোদিনও বলব না।

(ক্রমশঃ)

অভিনেত্রী জীবনের অভিশাপ

হিন্দী ছায়াছবির একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী ছিলেন মীনাকুমারী। অনেকগুলি সার্থকনামা ছায়াছবিতে তিনি যে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'বৈজু-বাওরা' নামক চিত্রে গৌরীর ভূমিকায় অভিনয় করে মীনাকুমারী খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর শেষ ছবি 'পাকীজা'। এই ছবিটি সম্পূর্ণ হতে লেগেছে প্রায় ষোলো বছর এবং এই ষোলো বছরই চিত্রাভিনেত্রীর জীবনের ঘটনাবহুল বিয়োগান্ত অধ্যায়।

বিদেশে অভিনেত্রীদের জীবন-কথা অনেক আছে। গ্রেটা গার্বো নিজেই লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী। গ্রেটা ছিলেন সেকালের রহস্যময়ী চিত্রাভি-নেত্রী। 'আই উইল ক্রাই টুমরো' অভি-নেত্রীর জীবনী হলেও তা সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলা ভাষায় একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'আই উইল ক্রাই টুমরো'র কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ উপন্যাসের চিত্ররূপও আদৃত হয়েছে। সুতরাং ছায়া-চিত্র অভিনেত্রীর জীবনেতিহাস পরম আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর কাহিনী। তার মধ্যে আছে বিরহ-মিলনের আনন্দ বেদনা এবং সাধারণ মানবিক সুখ-দুঃখের বাস্তব স্পর্শ।

বিনোদ মেহতা কর্তৃক লিখিত 'মীনা-কুমারী' নামক জীবনীগ্রন্থ সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় বোম্বাই শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং বলা বাহুল্য তা নিয়ে যথারীতি একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে এই জনপ্রিয় জীবন কথার আলোচনা পরিবেশিত হল।

মীনাকুমারীদের দেশ ভুট্টো সাহেবের দেশ, সেই গ্রামটির নাম ভেরা। মীনার পিতা আলি বকস্ ছিলেন একজন হারমোনিয়ম-বাদক, এবং জীবিকার সন্ধানে এসেছিলেন বোম্বাই শহরে। সেখানে দাদারে কৃষ্ণা কোম্পানীতে বাদকের কাজ পেলেন আলি বকস্, আর পেলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনী প্রভাবতীকে। প্রভাবতী নাকি জনৈকা বাঙালী খৃষ্টান নর্তকী এবং লেখকের মতে প্রভাবতীর জননী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা। বাল্যে বিধবা হয়ে-ছিলেন, তার পর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে মীরাটে যাত্রা করেন এবং সেইখানে জনৈক উর্দু কবি প্যায়রেলাল 'সাকীর' মীরাঠীকে বিবাহ করেন। এ'দের দুটি কন্যার অন্যতমা হলেন এই প্রভাবতী—তিনি পরে আলি বকস্‌কে বিবাহ করে ইকবাল বেগম হয়ে ছিলেন এবং মীনাকুমারীর মতে ছিলেন পরমাসুন্দরী। এইখানে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো পুত্রের কন্যা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। অতএব এই তথ্য ভুল। বাংলার বাইরে অনেক সময় যে কোনো বাঙালী রমণী ঠাকুর-বংশের রমণী এই পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রভাবতীর জননী হয়ত এই ধরনের কেউ হবেন কিংবা ঠাকুরবংশের দূর সম্পর্কের কেউ হবেন। রবীন্দ্রনাথের কেউ নয়। তবে আমরা যাঁরা বাঙালী তাঁরা সবাই ত' রবীন্দ্রনাথের স্বজন, সেই হিসাবে প্রভাবতীর জননীকেও আমাদের আপন জন এই স্বীকৃতি দিতে হবে।

আলি বক্‌সের তিন কন্যা, খুরসীদ, মাহজবীন (মীনাকুমারী) এবং মালিকা। আলি বক্‌স বেচারী পুত্র সন্তানের আশা করেছিলেন তাই মাহজবীনের জন্মের সময় তিনি ক্ষুণ্ণ হন। তবে শেষ পর্যন্ত খুশী হয়ে চাঁদের মত মুখ এই মেয়ের নামকরণ করেন মাহজবীন। চন্দ্রমুখী হওয়ার চাঁদের নামে এই মেয়েটির নামকরণ করা হয়।

অতি অল্পবয়সে মীনাকুমারীকে তাঁর পিতা আলি বক্‌স একদিন প্রকাশ স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়ে শিশুর ভূমিকায় অভিনয়ের কাজে লাগিয়ে দেন। স্টুডিয়োর কর্তা বিজয় ভাট এই শিশুঅভিনেত্রীকে নগদ পঁচিশ টাকা দেন। সেদিন থেকেই সুরু হল মীনাকুমারীর অভিনেত্রীজীবন।

মীনাকুমারী নিজেই বলেছেন—

"আমি প্রথম যেদিন কাজে গিয়েছিলাম আমি ভাবিনি যে, বাল্যজীবনের মধুরতার অবসান ঘটল। ভেবেছিলাম দুপুরবেলা স্টুডিয়ো যাব তার পর আবার সেই স্কুলে ফিরে যাব। অন্য সবার মত কিছু শিখব কিছু খেলাধুলা করব। কিন্তু তা আর হোল না।"

একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন মীনা কুমারী, কিন্তু কিছুই হল না। সিনেমার কাজে পড়াশোনা হল না। যেটুকু শিখে ছিলেন তা 'প্রাইভেট' পড়াশোনার ফল

মীনা উর্দু ভালো জানতেন, এ ছাড়া ইংরাজী ও হিন্দিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। উর্দু ভাষায় লেখা মীনাকুমারীর অনেকগুলি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে।

যা কিছু বন্ধুবান্ধব (শৈশব দিনের) তাঁরা স্কুলের সহপাঠী নন, এ'রা সবাই স্টুডিয়োর-চত্বরে একসূত্রে মিলিত হয়েছেন। বিখ্যাত নর্তক সুরেশ এবং বেবী মুমতাজ (পরে মধুবালা) এই দুজন মীনাকুমারীর বাল্যজীবনের সাথী।

তাঁর জীবনে যে মানুষটির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কামাল আমরোহীর সংগে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৩৮-এ। তখন বয়স তাঁর ছিল ছ'বছর। কামাল এসেছিলেন সোরাব মোদীর 'জেলার' ছবির জন্য একটা ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য আলি বক্সের কাছে। পিতার আহ্বানে সেদিন কলা খেতে খেতে মীনাকুমারী দৌড়ে এসেছিলেন আগন্তুকের সামনে। মাহজবীন (মীনা) কিন্তু সেই যাত্রা নির্বাচিত হলেন না। তিনি বিজয় ভাটের 'এক হি দিল' ছবিতে ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন আর এই বিজয় ভাটই মাহজবীন নামটির বদলে 'বেবী মীনা' নামকরণ করেন।

যখন আঠারো বছর বয়স তখন কামাল আমরোহীর একটি ছবি এক ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন বাজারে গুজব 'মহাল' ছায়াছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে কামাল এক লাখ টাকা পেয়েছেন। অভিনেতা, যা চিত্র-পরিচালক কামাল মীনার চিত্ত জয় করেন নি। মীনা আকৃষ্ট হল কামাল আমরোহীর লেখক সত্তার প্রতি। যে মানুষটি তাঁর হৃদয় হরণ করবেন তার একটা সুস্পষ্ট ছবি ছিল মীনার মনে। তিনি চতুর হবেন বুদ্ধিমান হবেন। তিনি হবেন কবি, লেখক। মানুষের বাহ্যিক আকৃতিটা কিছু নয়—তার সচেতন সংবেদনশীল মনটাই সব কিছু। মীনার চেয়ে কামাল ছিলেন পনের বছর বেশী বয়সের, তিনি তখনই বিবাহিত। তথাপি মীনা গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন এই কামাল আমরোহীর প্রতি।

কামাল আমরোহীর ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে মীনাকুমারীর চিত্তে বিদ্যুৎচমক খেলে গেল, তিনি বলেছেন ঃ

> I had a lighning flash before my eyes, bringing realisation with stunning shock which left me trembling sick with a strange apprehension. This was the man of my dreams, the ideal enshrined in my heart, I did not want to believe it. I tried to deceive myself—"

রোমান্টিক মন মীনাকুমারীর। সে কেবল চিন্তা করে, এ কি স্বপ্ন! না মায়া! না মতিভ্রম! অন্তর থেকে কে গেয়ে ওঠে—সেই আমি এই আমি। তুমি যাকে খুঁজে বেড়াও আমি সেই জন।

এই কালে কামাল আমরোহী 'আনার কলি' ছবির কাজে ব্যস্ত। মধুবালা নামভূমিকায় অভিনয় করবেন সব ঠিকঠাক, এমন সময় খবর এল মধুবালা শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি রাজী নন।

কামাল সেই সময় মনে মনে ভাবছেন কাকে নায়িকার ভূমিকায় নেবেন। সেই রাতেই বান্দ্রায় লোক পাঠালেন আলি বখসের বাড়ি। যদি মেজ মেয়েকে কোনো মতে এই ভূমিকা গ্রহণে রাজী করানো যায়।

আলি বক্সের কাছে প্রস্তাব পৌঁছাতে তিনি সহজেই রাজী হলেন। কামাল তখনই একজন প্রসিদ্ধ পরিচালকের খ্যাতি অর্জন করেছেন। মীনাকুমারীও খুশী।

'আনার কলি'র কাজে যখন কামাল ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন আগরা-দিল্লী তখন সংবাদ পাওয়া গেল মোটর দুর্ঘটনায় মীনাকুমারী আহত হয়েছেন। মীনাকুমারী হাসপাতালে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন। সিনেমা অভিনেত্রীর স্বপ্ন বুঝি সফল হল না। কি জানি কি আছে কপালে?

তারপর একদিন চোখ খুলেই মীনাকুমারী দেখলেন হাসপাতালের বিছানার পাশে কামাল আমরোহী দাঁড়িয়ে। মধুর কণ্ঠে কামাল জানতে চাইলেন—কেমন আছো এখন?

মীনাকুমারী বলছেন—আমি তখন আমার নিজের গড়া স্বর্গে। কে কি বলছে জানার প্রয়োজন নেই—কামাল আমরোহী দাঁড়িয়ে আছেন সামনে আমি তাতেই খুশী। যার জন্য আমি আকুল হয়ে আছি, তিনি স্বয়ং এসেছেন আমাকে দেখতে।

এর পরই সুরু হল প্রেমলীলা। বাজারে কানাকানি ছড়ালো। কামাল আমরোহীর বয়স বেশী এবং বিবাহিত। মীনা কি 'দুসরি বিবি' হবেন? এদিকে কামাল এবং মীনার দুজনের মধ্যে নিজেদের বিবাহের প্রসংগে কোনো আলোচনা নেই। সবাই বলছে বিয়ে হোক। তারপর একদিন বন্ধুজনদের চেষ্টায় ও আগ্রহে স্থির হল বিয়ে হবে দুজনের।

১৯৫২-র ১৪ই ফেব্রুয়ারী আলি বক্স মেয়েদের নিয়ে ডাঃ জুসুসাওলার ক্লিনিকে গেছেন। তিনি এ্যাক্সিডেন্টের পর মীনাকে তার আহত হাতটির চিকিৎসার জন্য প্রতিদিনই এমন নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে। সেদিন মেয়েদের রেখে আলি বক্স তাঁর মোটর ঘোরাতেই মেয়েরা আর ক্লিনিকে গেল না। কাছাকাছি ছিলেন কামাল আমরোহী আর তাঁর সেক্রেটারি। চারজনে মিলিত হয়ে একটি প্রকান্ড বুইকে উঠলেন, তারপর মাহজবীন ও সৈয়দ আমীর হায়দার (কামাল আমরোহীর আসল নাম) দুজনের সিয়া এবং সুন্নী উভয় মতেই সাদি হয়ে গেল।

দুই বোন আবার ক্লিনিকে ফিরে এলেন। একটু পরেই আলি বক্স গাড়ি নিয়ে ফিরলেন, মেয়েদের তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চললেন,—তখন কিন্তু তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তার একটি কন্যার বিয়ে হয়ে গেল এই মাত্র। সদ্য বিবাহিতাকে নিয়ে তিনি ঘরে ফিরছেন। এই জীবন নাটকের বাকী অংশ আগামী সপ্তাহে পরিবেশিত হবে।

—অনুবাদক

MEENA KUMARI — (BIOGRAPHY): By VINOD MEHTA. Published by JAICO PUBLISHING HOUSE :: BOMBAY PRICE Rs. 5 only.

উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

ডক্টর শিশির চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান হিসেবেই নয়, বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে চিনেছিল, কবিতার অনুবাদক ও সমালোচক হিসেবে। তাঁর শ্যামলা রঙ, দীর্ঘ শরীর এবং উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এককালে রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' কাব্যের কবিতাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে, তিনি অনেকের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। তরুণ কবিদের কবিতাও পড়তেন মনোযোগ দিয়ে। এবং যখনই যার কবিতা ভালো লাগত, তখনই অনুবাদ করে অন্যভাষীদের কাছে, তাঁর কবিতা পৌঁছে দিতেন। এই সেদিনও, সুকান্তর কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তিনি, মূলের ধ্বনি ও অর্থগৌরবকে অব্যাহত রেখে।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের কাছেও ছিলেন জনপ্রিয় অধ্যাপক। পড়াশোনা করেছেন মিত্র ইনস্টিটিউশান, সেন্ট পলস কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৫ সালে লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে যোগ দেন, আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের টেকনিক নিয়ে গবেষণার জন্য। দু বছর পরে পি-এইচ-ডি হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

তাঁর সাহিত্যকৃতির পরিচয় এত অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল, যে-বইগুলি ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, সে-বইগুলির নামই উল্লেখ করছি ঃ (১) অলডাস হাক্সলি—এ স্টাডি; (২) দি নভেল অ্যান্ড দি মডার্ন এপিক; (৩) জেমস জয়েস—এ স্টাডি ইন টেকনিক; (৪) দি টেকনিক অব দি মডার্ন ইংলিশ নভেল; (৫) প্রোবলেমস ইন মডার্ন ইংলিশ ফিকশান, এবং (৬) ভার্জিনিয়া উলফ। বাংলাদেশ সম্পর্কে, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ

'অ্যাজামেন্ট ঃ দি বার্থ অব এ নেশন'-এর নামও স্মরণীয়। 'কোরাম' 'বিহার হেরাল্ড' 'ওয়াটারস্তে রিভিউ'র পাতায় তাঁর বহু প্রবন্ধ এখন ছড়িয়ে আছে।

কলকাতায় শ্রীমতী রুথ ক্রাফট

আমন্ত্রণ জানান তাঁকে ভারত সরকার। এলেন তিনি দুই রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কর্মসূচী অনুসারে। প্রথমেই উঠলেন দিল্লি। তারপর ঘুরলেন জয়পুর, আগ্রা, বারাণসী, বোম্বে, ভুবনেশ্বর। কলকাতারও এসেছিলেন তিনি। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্যতম জনপ্রিয় লেখিকা ফ্রাউ রুথ ক্রাফট।

১৯২০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি জন্মেছিলেন তিনি। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে তার দু বছর আগেই। অর্থনৈতিক মন্দা আর মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছিল তখন জার্মানি। সেই সময়েই রুথের বাবা কেনেন একটি ছোট্ট দোকান। যা লাভ হত তাতে কোন রকমে চালানো সম্ভব হয়েছিল রুথ আর তাঁর বোনের মাধ্যমিক শিক্ষা। স্কুলের গণ্ডি শেষ হবার পর রুথের বাবা যখন মেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত সে সময়েই রুথ নিলেন এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত।

এক বছর প্রাইভেট হ্যাটসহোল্ডে কাটিয়ে ম্যাথমেটিক্যাল ও ফিজিক্যাল কাজ নিলেন সেনাবাহিনীর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক স্টেশন পীনেমিউন্ডে-তে। তখন থেকেই জাগে লেখার ইচ্ছে, লিখেও ফেলেন কিছু কিছু, কিন্তু ছাপান নি।

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েও পড়াশোনা করেন একদা জার্মান-জাপানীজ ইউনিভার্সিটি টিচার্স হোমে। সে সময়েই জাপানী পদার্থবিদ সিন-ইটচিরো টোমোঙ্গার সংস্পর্শে আসেন। কয়েক বছর বাদে ইনি পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। নোবেল পুরস্কৃত এই বিজ্ঞানীর প্রভাব পড়েছিল রুথ ক্রাফটের উপর। তারই স্বীকৃতি হল ১৯৬৫তে প্রকাশিত লেখিকার 'মেনশেন ইম গেগেনভিন্ড' উপন্যাসটি।

রুথ ক্রাফট পীনে মিউন্ডেতে বেশ কঠিন গাণিতিক হিসেব-নিকেশের কাজে ছিলেন মগ্ন। নাৎসী বাহিনীর সেই ভয়ংকর অস্ত্র 'এ-৪' প্রোজেক্টের জন্য এরারোডায়নামিক হিসেব-নিকেশ করতেন তিনি। এই সময়কার অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখেন 'ইনজেল ওনে লয়েস্টফয়ার'। বেরোয় ১৯৫৯-এ। 'আমি ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধের কোনো মানে আর লক্ষ্য বুঝতে পারিনি আগে।' জানান মিসেস ক্রাফট। পরে অবশ্য বুঝেছিলেন তিনি। তবু ব্যক্তিজীবনে সবসময়েই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ছিলেন দোদুল্যমান। মানসিকতায় দিক থেকে একসময় ছিলেন নাৎসীদের একান্ত কাছের। সময়ের পট-পরিবর্তনে ক্ষত-বিক্ষতও কম হননি। স্বপ্নভঙ্গের ছিল বেদনাও। এক সময় রেড আর্মি'রও মুখোমুখি পড়েছিলেন রুথ। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও নিতান্তই ব্যক্তিগত অপরাধবোধ তাঁর কোন কোন গল্পের ছিল বিষয়বস্তু। আত্মার স্বাধীনতার কথাও বেরোচ্ছে [illegible] । একই বিষয় নিয়ে ১৯৭০-এ লেখেন 'গেস্টদুরস্তেটে লিবে' উপন্যাস।

১৯৪৫-এ ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে। পরে পার হলেন সীমানা। এলেন সোভিয়েত অঞ্চলে। ১৯৪৬ সাল থেকেই ফ্রীল্যান্স লেখিকা। লিখতে শুরু করেন বিশেষভাবে বেতার নাটিকা। মানবতাবাদী দৃষ্টিই ছিল এসব রচনার মূলে। শুধু উপন্যাস নয়, গল্প, কবিতা, শিশুসাহিত্য সবদিকেই রয়েছে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর।

এই জনপ্রিয় জার্মান লেখিকাকে গত ২০শে জানুয়ারি সম্বর্ধনা জানালেন ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মান সাহিত্য সমিতি। 'পরিচয়' পত্রিকার দপ্তরে সেদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তরুণ ও অনতি-তরুণ কবি-ঔপন্যাসিক বুদ্ধিজীবীরা। রুথ ক্রাফটের প্রাথমিক পরিচয় তুলে ধরেন কলকাতাস্থ জি ডি আর দূতাবাসের ভাইস-কন্সাল মিঃ এইচ ডি ৎসিমার। লেখিকাও বললেন তাঁর নিজের কথা। মেলে ধরলেন সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা। জানালেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধার কাহিনী। একে একে উত্তর দিলেন উপস্থিত সাহিত্যিকদের প্রশ্নগুলি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি তরুণ সান্যাল।

গণতান্ত্রিক জার্মানির এই লেখিকাকে আরেকটি অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানান সর্ব ভারতীয় কবি-সম্মেলন। ১০ হিন্দুস্থান রোডে আয়োজিত ২৪ জানুয়ারির এই সভায় পৌরোহিত্য করেন সতীকান্ত গুহ।

দুদিনের এই ভিন্ন ভিন্ন আলোচনায় যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন অন্নদাশংকর রায়, মণীন্দ্র রায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, আশিস সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, লীলা রায়, হরেন চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে

কয়েকদিন আগে ভারত ঘুরে গেলেন কবি উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড। এসেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের দেশ দেখতে, ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকদের সাম্প্রতিক ভাবনা-চিন্তার পরিচয় নিতে। উইলিয়ম স্ট্যাফোর্ড ভ্রমণ করলেন দিল্লি, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত সম্মানিত লেখক স্ট্যাফোর্ড এ পর্যন্ত পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। ১৯৬২-তেই পান তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ট্রাভেলিং থ্রু দ্য ডার্ক'-এর জন্য ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড। অন্যান্য কয়েকজন আমেরিকান কবির সঙ্গে মিলে একসময় অনুবাদ করেন গালিবের গজল, উর্দু থেকে। মিঃ স্ট্যাফোর্ড জন্মেছিলেন ১৯১৪ সালে কানসাসে। বর্তমানে তিনি পোর্টল্যান্ডের লুই অ্যান্ড ক্লার্ক কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের আবাসিক অধ্যাপক।

স্লোভাকের খবর

বয়সের তুলনায় নিঃসন্দেহেই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত, একজন তরুণ লেখকের পক্ষে এমনতরো দায়িত্ব পালন হেলাফেলার নয়। কেননা, এই জানুয়ারির ২২ তারিখেই পা দিলেন তিনি সবে ত্রিশে। অথচ এরই মধ্যে এক ডাকে তাঁর নাম আজ পরিচিত চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষজনের কাছে।

লেখকের নাম পিটার জারোস। মাত্র কিছুকাল আগেই ব্রাতিস্লাভায় শেষ হয়েছে তাঁর ফিলজফিক্যাল ফ্যাকাল্টির পড়াশোনা। এখন কাজ করছেন সম্পাদক হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়ার বেতারে।

পিটার জারোস হলেন স্লোভাকের তরুণ গল্প-লেখকদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়। বয়স যখন তাঁর মাত্র তেইশ তখনই বেরোয় তাঁর আলোড়নকারী ছোট গল্প 'সড়কে বিকেল'। গল্পটিতে তরুণ মানসিকতার এক সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন লেখক। যুব-মনের নানামুখী ভাবনা-চিন্তার জাল বিস্তার করেছেন অপরূপ গীতিল গদ্যে। ভয়ংকর টেনসনে ভরা মননশীল এই গল্প প্রকাশের পরই সাড়া পড়ে যায় পিটার জারোসকে নিয়ে। সেই থেকে প্রায় প্রতি বছরই বেরুচ্ছে একটি করে তাঁর গল্প-সংকলন কিংবা উপন্যাস। ১৯৬৪-তে বেরুলো 'নিজেকে বানাও মহাসাগর'। পরের বছরই প্রকাশিত হল 'হর্‌র্যার'। এই উপন্যাসটি শুধু পাঠকদেরই নয় সমালোচকদেরও চমকে দেয়। ১৯৬৬-৬৭তে বেরোয় যথাক্রমে 'স্কেলস' এবং 'জার্নিং টু ইমমোভাবিলিটি'। পরের বছর বেরুলো 'মিনিউট'। এই গ্রন্থে উন্মোচিত হল লেখকের প্রতিভার নতুন দিগন্ত। জন্মভূমির কথা, সেখানকার মানুষের ছেলেবেলার দিনগুলি রাতগুলি, আর কিংবদন্তীর কাহিনী—সব কিছু মিশেল দিয়ে গল্পে আনলেন নতুন স্বাদ। একই বছরে প্রকাশিত হয় 'মূর্তি নিয়ে ফিরে আসা'। ১৯৭০-এ বেরুলো 'রক্তের দাগ'। এই গল্প-সংকলন লেখককে এনে দিল নতুন সম্মান। পেলেন পুরস্কার। দিলেন স্লোভাক রাইটার্স পাবলিশিং হাউস।

নতুন বই

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী (প্রথম খণ্ড : উপন্যাস) ঃ গোপীমোহন সিংহরায় ভারবি : ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আঠারো টাকা।

পাঁচ খণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরিত্রাভিধান ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রকাশের সংকল্প নিয়ে শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় এই প্রথম খণ্ডে 'গ্রন্থানুক্রমিক সূচি'-সমেত মোট ৩৪৪ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির চরিত্র-পরিচিতি দিয়েছেন বিশদ-[illegible] [illegible] অংশ পঞ্চম

খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে, বইখানির পূর্বা-ভাষ-অংশে একথা জানানো হয়েছে। লেখকের নিজের কথা—'আমার গ্রন্থ আভিধানিক হলেও যেন তারা (চরিত্রগুলি) একেবারে জীবনরসরিক্ত না হয়ে পড়ে—সেদিকে তিনি নজর রেখেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন—প্রায় দু হাজারের মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ. তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও রূপবৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করলে তাঁকে মনুষ্যচরিত্রের মহাকবি বলাই সমীচীন হয়।'

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই পরিচ্ছন্ন—বিশেষভাবে এই ধরনের বইয়ের (যা বহুদিন বহু পাঠক-লেখক-গবেষকের নিত্য-ব্যবহারের সামগ্রী হয়ে থাকবে—) পক্ষে যে আদর্শ রক্ষা করা উচিত, এতে তা আছে। তবে চরিতাভিধানে চরিত্রগুলির পরিচিতি অনেক ক্ষেত্রেই একটু বেশি বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। মূল বইয়ে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ চরিত্রের অবস্থানসূত্রটুকু ধরিয়ে দেবার চেষ্টাটুকুই যথেষ্ট. শ্রীযুক্ত সিংহরায় কিন্তু সেই সীমারেখাতে নিজের 'প্রযত্ন' আবদ্ধ রাখেননি। নৌকাডুবির 'অক্ষয়; প্রজাপতির নির্বন্ধের অক্ষয় মুখুজ্যে', চার অধ্যায়ের 'অতীন্দ্র', চতুরঙ্গের 'দামিনী', যোগাযোগ-এর 'বিপ্রদাস চাটুজ্যে', চোখের বালির 'বিনোদিনী', 'মহেন্দ্র' এবং এইরকম বিভিন্ন চরিত্রের প্রসঙ্গে প্রায় পুরো কাহিনীই তাঁকে সংক্ষেপিত করতে হয়েছে। এরকম ঘটা অস্বাভাবিক নয়,—'গোরা'র 'মনোরঞ্জন' একটি নাম মাত্র,—এক ছত্রেই তার পরিচিতি পরিবেশনযোগ্য, কিন্তু নায়ক স্বয়ং 'গোরা' তো স্বভাবতই বেশি জায়গা দাবি করবে। তবে, সেজন্য আট-নয় পৃষ্ঠার ব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি বই কি।

লেখকের অধ্যবসায় অপরিসীম। রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর এই কাজটি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই।

হরপ্রসাদ মিত্র

স্বামিজীর পদপ্রান্তে (জীবনী) : স্বামী অব্জজানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। দশ টাকা।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাঁর অনুসারী প্রধান ভক্তদেরও জীবনী রচিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেই জীবনী-সাহিত্যধারার অনুসরণ দেখা যায়, উনিশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত লিখিত হওয়ার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শিষ্যের জীবন ও বিরাট সত্তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে বর্তমান সংকলনটি বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রায় বছর তিনেক আগে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হল—এই সংকলনের প্রতিটি জীবনী লেখক কর্তৃক পুনঃসম্পাদিত ও অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। মোট তেরোজন শিষ্যের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ, শুদ্ধা-নন্দ, পরমানন্দ প্রভৃতির জীবনভাবনাগুলি লেখক সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে রচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী লিখিত ভূমিকা অংশটি অত্যন্ত মূল্যবান। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ফটো এ গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। স্বামিজীর বহু শিষ্য এবং সকলেই প্রণম্য। প্রকাশের তারতম্য থাকলেও তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্রেই স্বামিজীর দিব্যস্পর্শ আছে। বর্তমান সংকলনে যাঁদের নির্বাচন করেছেন আলোচ্য হিসেবে—তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবা-ন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই উনিশ শতকের বলিষ্ঠ ভূমিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দকে নিয়ে যে বিরাট ধর্মান্দোলন দেখা দেয়, তার গবেষকরা বর্তমান গ্রন্থে অনেক নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ পাবেন। এ গ্রন্থ শুধুমাত্র বিশেষ ভক্তদের কাছেই প্রিয় নয়, সাধারণ ধর্মজিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছেও এ গ্রন্থের সমান আকর্ষণ আছে। সর্বোপরি, লেখক স্বামী অব্জজা-নন্দের ভাষা, গদ্য ও আলোচনাভঙ্গি অত্যন্ত সরস ও সাবলীল হওয়ায় পাঠকদের পাঠ সহজসাধ্য হবে।

জলের আলপনা (কাব্য সংকলন)—বিজয়কুমার দত্ত। কবিতা পরিষদ, ৬০।২।৮, কেক রোড, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

বিজয়কুমার দত্ত 'জলের আলপনা'র কবিতাগুলিতে প্রেমের কথায় অকপট, স্মৃতির সূক্ষ্ম চেতনায় অন্তর্শায়ী। ভাল-বাসার অনুভবে কবি বলেন—'চিরন্তনী প্রেমিকার পায়ে মাথা রেখে / সকাল সন্ধ্যায়, শান্ত দুপুরের মগ্ন অবসরে / আমি একা চিহ্নহীন স্টেশন মাস্টার।' (বয়স)। আবার স্মৃতি-অনুষঙ্গে সূক্ষ্মতায় বলে উঠছেন—'কি যেন কখনো ছিল / আজ নেই, এমন ভাবনায় / পায়ে পায়ে ধ্বনিত নূপুর (শেষ সম্বল) / স্মৃতির সঙ্গে স্বগতভাষণে কবির হৃদয়-অনুভব পবিত্র, আলোয়-ধোয়া পরিচ্ছন্ন—'মনে পড়ে, কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংলাপে / সমস্ত পৃথিবীময়, হাজার সূর্যের আলো / জ্বলেছিল চোখের শিরায়।' (মনে পড়ে) আলোচ্য কবির কবিতা রোমান্টিক অনুভাবনায় মৃদুস্বাদী, চিত্রকল্পগুলি চার-পাঁচ-এর দশকের বহু কবির শব্দ অভিজ্ঞতা স্মরণ করায়। তবু কবির প্রেম-অনুভবে স্বাতন্ত্র্য আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই গদ্যাত্মক, তাই কোন কোন কবিতায় অন্তর্মিল শ্রুতিসুখকর হয়নি। কবি ছন্দের কানে সতর্ক। কবি-ভাবনা, যেহেতু সবসময়ই আত্মমুখীন, তাই শব্দ, ছন্দ, চিত্রকল্প-ব্যবহার ব্যঞ্জনাত্মক।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত [পূর্বার্ধ]—সুরেন্দ্র-মোহন শাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম : আট টাকা।

নৈতিক শক্তির উদ্বোধনে, মধ্যযুগের বাংলাদেশ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে পেয়েছিল, বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে। তিনি ছিলেন মানবতাবোধ ও আধ্যাত্মি-কতারও একমাত্র প্রেরণাস্থল।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর, তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে, অনেকে অনেক কাব্য রচনা করেছেন এবং ভক্তের আকুলতা নিয়ে বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ ও অধ্যাত্মদর্শনের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও, সেইসব আশ্চর্য গ্রন্থের এতটুকু অবমূল্যায়ণ ঘটেনি।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, মহাসাগরের মতো বিশাল ও গম্ভীর, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার লীলারাশি বর্ণনা করেছেন, মিত্র ও অমিত্র পয়ারে! প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সরল। আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি প্রত্যেক ভক্ত ও রসপিপাসু পাঠকের কাছে, সংগ্রহযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণ্ঠস্বর। বিশেষ শারদ সংখ্যা। ৫ম বর্ষ। সম্পাদক—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ১১।২, টেমার লেন, কলিকাতা—৯। দাম—১ টাকা।

আধুনিক কবিতা নিয়ে যেসব পত্র-পত্রিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে কণ্ঠস্বর তাদের মধ্যে একটি। এ পত্রিকাটি শুধু তরুণ কবিদের মুখপত্রই নয়, আধুনিক কবিতা আন্দোলনেরও একটি বিশেষ দলিল। এ সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন তরুণ কবি কবিতা লিখেছেন এবং এসব কবিতার স্বাদও নতুন। এছাড়া, আছে কয়েকটি প্রবন্ধ।

কবিতায় নতুন ছন্দ, আঙ্গিক, বিষয়-বস্তু নিয়েও কয়েকটি কবিতা কিছুটা রীতি ভাঙার রীতিতে লেখা হয়েছে। বিশেষ করে ইন্দ্রনীল, ভট্টাচার্য চন্দন, স্বাতী লাহিড়ী, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও গণেশ সেনের কবিতা উল্লেখযোগ্য।

চাষবাস। প্রথম সংখ্যা। প্রথম বর্ষ। সম্পাদক—সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ১১।২ টেমার লেন, কলিকাতা—৯। দাম—৫০ পয়সা।

চাষবাসের ভাল পত্রিকার খুবই অভাব। অধিক ফসল পাওয়ার জন্য চাষীরা আগ্রহী। কিন্তু মাটি, সার প্রয়োগ, বীজের ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে চাষী-দের নানা প্রশ্ন। এ পত্রিকাটি চাষীদের সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে অতি সহজ বাংলায় সহজ ভাবে। চাষীরা কীভাবে ঋণ পাবেন, কোথায় দরখাস্ত করতে হবে, কীটনাশক, সার প্রয়োগের উপর কয়েকটি ভাল লেখা ছাড়াও আছে এ মাসের কৃষি পঞ্জী, অধিক ফলনশীল গম চাষ, বোরো ধান চাষ, আলু ও শাকসব্জি চাষের উপর ভাল প্রবন্ধ। উৎসাহী চাষীদের এ পত্রিকাটি খুবই কাজে আসবে। পত্রিকাটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুপরিকল্পিত। মলাটে প্রধানমন্ত্রীর চাষ করার ছবিটি চমৎকার।

বনমালিপুরের মাঠ

হেমচন্দ্র ঘোষ

দা'ঠাকুর মোরা আর নীল বোনবো না!

নীলকুঠির দেওয়ান বনমালির মুখের উপর দৃষ্টি রেখে করিম কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে ফেললো। তার চোখের দৃষ্টি কঠোর অথচ ভয়বিহ্বল।

বনমালি খেঁকিয়ে উঠলো।

– অযথা গোলমাল কোরো না—করিম। সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করবে তোমরা! হুঁ[illegible]কে তো খোঁড়া, গোলমাল বাধলে যেটা ভাল সেটাও যাবে।

—মুই কি করবো। পাড়ার সব্বাই মোল্লে মোড়ল বানিয়েছে তাদের কথাটা তো মানতে হবে।

বনমালির স্ত্রী হৈমী পাশে দাঁড়িয়ে—করিমের দিকে ফিরে বললেন—এখানে আসার পর থেকেই তোমার সঙ্গে চেনা-জানা, অনেক উপকার করেছো—আমরাও কিছু কম করিনি। বলি তোমার ছিলোটা কি! ওইতো শুধু ভিটেটুকু—আর এখন তুমি একজন বড় জোতদার। কার দয়ায়?

স্বামীর দিকে আঙুল দেখিয়ে হৈমী বললেন—উনিই তো তোমায় বড় করেছেন—মানতে চাও, না, চাও না?

করিম মাথা হেঁট করে রইল—একটু থেমে ধীর কণ্ঠে বলল—মানবো না! সব মানছি মাঠান। একটা কথা—দেশের সব্বনাশ ডেকে এনেছে এই নীল চাষ! জান দিয়ে সেটা রুখতে হবে।

বনমালি বিরক্ত হয়ে বলল—তবে দাদন নেও কেন?

একটা শক্ত উত্তর করিমের ঠোঁটের আগায় এলো কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—দা-ঠাকুর! দাদনের কথাটা কি তোমার অজানা আছে! কারকুণ মশাই দশটা টাকা দেবে লিখবে বিশ! যে ক্ষেতে দশমণ হয় না সেখানে দিতে হবে পাঁচ মণ—না দেও সে জমি কোম্পানীর খাতায় খাস হয়ে গেল।

বনমালি রেগে উঠল—চিৎকার করে বলল—কে বলে—কোন শয়তান। নামটা একবার শুনি, দেখিয়ে দি তাকে।

এবার করিমের স্বর দৃঢ়—তুমি জান না। কোনটা তোমার অজানা দা'-ঠাকুর। দেশের মোরা চাষী, মোদের কত আশা—তুমি দেশের লোক মোদের বাঁচাবে!

—আমি কিছু করিনি। বেইমানের দল। আমি না থাকলে, গাঁটা তো এতদিনে উজোড় হয়ে যেতো। ভাটরা-ইছেপুর আর আছে নাকি! সেখানে শকুন চরছে!

—মোদেরও না-হয় তাই হতো—মোরা না হয় সব কবরে যেতুম। সাহেবরা কবর খুঁড়ে হাড় তুলে কাজে লাগায়—মোদের হাড়ও না-হয় তাদের কাজে লাগতো!

বনমালি মুখটা [illegible] করে বলল—[illegible],

দেখছি সাহেবদের সঙ্গে লড়ার মতলব! এখনও চিন্তা করার সময় আছে।

করিম এবার হেসে ফেলল।

মোরা কি আর মানুষ দা-ঠাকুর!

দুহাত চিৎ করে বলল—দ্যাখো না—দাঠাকুর! আঙুলগুলোর গেঁটে গেঁটে কড়া পড়েছে—শক্ত জামড়ো—টিপলে ব্যথা বিষ। লড়ার কথা বলছ—লড়ার লোক আছে!

—এই জেলায়—এই বারাসতে।

—না গো-না!

করিমের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—লড়বে যশোরের শিশির ঘোষ। সাহেবদের সাত ঘাটের জল খাইয়ে দেবে!

বনমালির মুখে একটু হাসি ফুটলো—তাচ্ছিল্যভরে বলল—ওঃ, শিশির ঘোষ! এক ফুঁ—ঠোঁটদুটো উঁচু করে বনমালি একটা ফুঁ দিল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল—ওসব মতলব টতলব ছাড়ো—যেমন চলছে সেই ভাবে চলো—নইলে বিপদ, মহা বিপদ।

—ঝিকরগাছার কোন খবর রাখো দা-ঠাকুর!

ভেংচি কেটে বনমালি বলল—রাখি-রাখি—সব রাখি! বশটা ছোঁড়া নিয়ে শিশির ঘোষ মিটিং করল—মেকেঞ্জি সাহেবের লেঠেলরা যেমনি এলো অমনি দৌড়।

—দা'ঠাকুর! তুমি তা'লে জানো না—ভুল শুনেছো! মুই সেখানে ছিলুম আরে লোক—খালি মাথার সমুদ্দুর—হাজারে হাজারে লাখে-লাখে! সাহেবের লোকেরা তির সীমানায় এলো না—সাহসই করল না! শিশিবাবু বলল—ভাইসব! নীল তো তোমরা বুনবেই না—দাদনও নেবে না। মোরা হৈ হৈ করে উঠলুম—নীল মোরা বোনবো না—দাদন! নেবোই না—জান থাকতে না। দা'ঠাকুর! তুমি ঐ সাহেবটার কথা বললে—ও বেটা এক মহা শয়তান। চাষীর ভাল ভাল অল্পবয়সের মেয়েগুলোরে কুঠিতে এনে বাঁদী করে রেখেছে! কেউ বলে পঁচিশটা—কেউ বলে পাঁচশো! কথাটা উঠতিই সব লাঠি নিয়ে ছুটল। কুঠির সামনে ঠকাঠক্ লাঠি! একটা পেয়াদা এল—বলল সাহেব্ তো নেই!

করিম হেসে উঠল।

—দা'ঠকুর! সাহেব তখন যশোরে—পলাতক!

বনমালি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—তারপর কোঁচকানো মুখখানার কালো কালো শিরগুলো মোটা মোটা হয়ে উঠেছে—করিমের দিক থেকে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে গাম্ভীর্যের ভাব দেখিয়ে চুপ করে রইল—তার লম্বা লম্বা হাটুদুটো নাচাতে সুরু করে দিল।

চাটুজ্যে-গিন্নীর সুর নরম, বললেন—বাপু, আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর কেন? হাঙ্গামা-হুজ্জুতের দিকে যেও না, করিম—ওসব কাজে মাথা না দেওয়াই ভাল! তোমাকে ছেলের মতো দেখি! দাঠাকুর তো তোমার কোন অভাব রাখেননি!

—ঠিক, খুব ঠিক মাঠান! কিন্তু ফেরার তো আর পথ নেই! সেদিন শুক্কুরবার—জুম্মার নামাজ হলো—কসম নিলুম, নীল আর বোনবো না—জান গেলেও না!

বেঙ্গল ইণ্ডিগো কনসার্ণ! সারা বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। চব্বিশ পরগণার উত্তরে একটা নাতি-বৃহৎ জেলা—বারাসত। কলকাতার কাছে। বিলেতের দুষ্টু ছেলেদের ধরে এনে এখানে মিলিটারী ট্রেণিং দেওয়ার জন্যে ইংরেজরা ক্যাডেট্ কোর কলেজ করল—স্যাণ্ড হার্স্ট অফ্ বেঙ্গল পাল্কীতে বা নৌকোপথে কলকাতা ছিল সহজগম্য, যোগা-যোগের সুযোগ ছিল প্রচুর। স্যার এব্রাহাম রবার্টস্ লর্ড রবার্টসের বাবা। তিনি ক্যাডেট্ কলেজের প্রিন্সিপাল, কিন্তু ছেলে-গুলো ছিল আয়ত্তের বাহিরে। ভারত সরকার উঠিয়ে দিলেন কলেজ। সারা ইউরোপে তখন নীল চাষের সাড়া পড়ে গেছে। বাংলা হচ্ছে উপযুক্ত ক্ষেত্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে নীল কুঠি উঠলো। সাহেবরা নবাবী কেতায় বাস করার সুযোগ করে নিল। বারাসত জেলার গুরুত্ব তখন বেড়ে গেছে। সাহেব সিভিলিয়ান জেলার কর্তা—ভাগলপুর আর বরিশালের মতো বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের বাৎসরিক বারো হাজার টাকার বদলে আঠার হাজার টাকার মাইনে ঠিক করা হল। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট হবার জন্যে বড়লাটের দরবারেও তদ্বির চলল। বারাসত ছিল 'প্লাম্প স্টেশন'। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটরা নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হৃদ্যতা রেখেই চলতেন। চলত খানাপিনা, চলত অনেক রাত পর্যন্ত বাঈজীর নাচ আর বিলিতি সরাব। অল্পবয়সী অবিবাহিত ম্যাজিস্ট্রেটরা নীল-কুঠিতে সুখেই রাত কাটাতো! এর দক্ষিণা? কনসার্ণের দুষ্টু লোকদের অপরাধ মাপ করা! বেঙ্গল ইণ্ডিগো কনসার্ণের প্রধান আফিস নদীয়ায় মুলনাথে। দ্বিতীয় আপিস বারাসতে। জেনারেল ম্যানেজার লারমুর বারাসতটাকে বেশী পছন্দ করত। মুলনাথের চাষীগুলো আদব-কায়দা জানতো না—যেন খাজা-খাজা! কলকাতার কাছেই বারাসতে লোকগুলোও ভাল। নিতান্ত কাজের গতিক ছাড়া লারমুর বারাসত ছেড়ে থাকতো না। নীলকর সাহেবদের বারাসতের বাড়ী প্রকাণ্ড—গথিক স্টাইলের। চারপাশে প্রচুর জমি, ফুলের বাগান, দিশি বিলিতী ফুলের মেলা। ডলির কথায় সাহেব গোটা-কতক জবা গাছ বসিয়েছে। রোজ সকালে বেয়ারা ডলির মার জন্যে ফুলগুলো পৌঁছে দেয়। তিতুমীরের উপদ্রব একসময়ে খুব ছিল। কুঠির পিছনটা সুরক্ষিত করার জন্যে লম্বা বেড়বাঁশের সারি বসানো। নারকেল-বেড়ের বাঁশের কেল্লা লর্ড বেণ্টিঙ্ক ধ্বংস করে দেন। নিষ্ঠুর ওয়াহাবিরা ছত্রভঙ্গ তবুও তাদের মধ্যে দু-চারজন লুকিয়ে লুকিয়ে দল পাকায়—সুবিধামত নীলকুঠি লুঠ করে—অসহায় পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। যমুনা নদীর ওপর তাদের উপদ্রবটা ছিল বেশি রকমের। নতুন রোগ ম্যালেরিয়ায় বাংলার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে—সম্পদ অলক্ষ্যে উঠে যাচ্ছে তবু বাঙালী-বাঙালী—সে তার মর্যাদা হারায়নি। বোশেখে মনজনে। চাষের সুযোগ এসে গেল। চাষীরা জোড়-জোড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে বছর বোশেখের গোড়াতেই বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। কালো জমাট মেঘের সংঘর্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল। প্রচণ্ড ঝড় সঙ্গে প্রবল বর্ষণ একযোগে ধরার বক্ষটাকে যেন ভেঙে চুরমার করে দিল। লোকজন বার হচ্ছে না—মেটে রাস্তায় হাটুভর কাদায় শুধু প্রয়োজনের তাগিদে দু'একজনকে বেরুতে হয়েছে। লারমুর দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় এলো। একটা ইজিচেয়ারে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল চঞ্চল মেঘের দিকে—ধুসর বরণ মেঘগুলো কেমন একের পর এক ছুটে চলেছে দৃষ্টির বাহিরে—আবার ক্ষণেকের সংঘর্ষে দামিনীর হুঙ্কারে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ধরিত্রীর বুকখানা। লারমুরের বেশ ভাল লাগছিল। সামনের ঝাউগাছ-গুলোর মাথা ঝড়ো হাওয়ায় নুইয়ে পড়ছে—বাবুই পাখীর বাসাগুলো দুলছে, দোলনার মতো। প্রাকৃতিক মাধুর্যে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

—ডলি!

ডলি লারমুরের খুব প্রিয়। বাঙালী হলেও তাকে সে একেবারে আপনজন করে নিয়েছিল। ডলি এসে দাঁড়ালো সাহেবের পিছনে—সাহেবের কাঁধটা ছুঁয়ে। হুঁকো-বরদার গড়গড়া রেখে গেছে—অম্বুরী তামাকের গন্ধে জায়গাটা ভরপুর হয়ে উঠেছে। আমেজে বিভোর সাহেবের উৎফুল্ল নয়নদুটো ভরিয়ে তুলল স্বদেশের ছবিগুলো।

ডলি! ইউ সি! এটা ঠিক যেন হোম ওয়েদার! স্কটল্যাণ্ডের কোলে টিলার পর টিলা ধোঁয়াটে মেঘের আবরণ নিয়ে মিশে গেছে দৃষ্টির অন্তরালে। কি সুন্দর! লারমুর চোখের পাতাদুটো বন্ধ করলো।

—ডলি! মাই ডারলিং!

ডলি সামনে এসে মেঝেতে বসে পড়ল—তার মাথাটা সাহেবের কোলে ডুবিয়ে দিয়ে সে নিশ্চুপ—আবেশে তার দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

—ডলি! যাবে আমার সঙ্গে বিলেতে?

ডলি উঠে বসল। লারমুরের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল—মা কি আর যেতে দেবে!

—তোমার মাকে বুঝিয়ে বলব—তিন-চার মাসের ভেতরই তো আবার ফিরছি।

—মা কিছুতেই ছাড়বে না! ওখানে গেলে নাকি অখাদ্য খেতে হয়।

লারমুর জোরে হেসে উঠলো।

—হুজুর!

লারমুর তাকালে বিরক্তিতে, তার মুখ-খানা কঠোর হয়ে উঠেছে—শক্ত গলায় বলল, কি! এখন এখানে! ইডিয়ট!

নবীন লারমুরের খাস আর্দালী। সাহেবের মেজাজ—তার গতিক, নবীন ভাল রকমেই জানতো। বিশ্রামের সময় এত্তালা দিতে সে প্রথমে মোটেই রাজী হয়নি। ওয়ারনারের শুকনো মুখ, তার ভ

জোয়ানটো দেখে অনুকম্পায় ভরে উঠলো নবীনের মনটা। সে রাজী হল।

—হুজুর! হাবড়ায় ওয়ারনার সাহেব! বড্ড বিপদ!

লারমুরের ইঙ্গিতে ভীল চলে গেল।

—গুড ইভনিং মিঃ লারমুর!

—গুড ইভনিং!

—ভিতুমীরের লোকেরা সরকার পাড়ার কুঠি লুঠ করেছে।

লারমুর খেঁকিয়ে উঠলো—সোজা হয়ে উঠে বসে চীৎকার করে বল—কেন? বরকন্দাজ—লাঠি বন্দুক কুঠিতে ছিল না! ফুল!

ওয়ারনার চুপ করে রইল।

—ওয়ার্থলেশ! প্রেসট উইচ তোমার চেয়ে ঢের বেশী কমপিটেন্ট! তাকে দেবো হাবড়ায় —তোমায় যেতে হবে মুলনাথে।

—স্যার!

—কোন কথা শুনতে চাই না—যাও!

নীচে ছিল বনমালি। এই দুর্যোগ ঘাড়ে নিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। ঠাকুর-দেবতাদের পুজো দিয়ে বশ করা যায়, কিন্তু এই সাহেবরা? তাদের চেনা বড় শক্ত। কি জানি ওয়ারনার হয়তো একদিন জেনারেল ম্যানেজার হবে—এখন থেকেই তাকে একটু একটু তোয়াজে রাখা ভাল। ওয়ারনার নীচে নামতেই বনমালী এগিয়ে এল।

—কি হল! বড় সাহেবের সঙ্গে কথা হলো?

—হুঁ—আমাকে মুলনাথে যেতে হবে!

ওয়ারনারের গলার স্বর ভার—অতি গম্ভীর।

—ভীষণ দুর্যোগ—এ অবস্থায় তো হাবড়ায় যাওয়া যাবে না!

বনমালির মুখের দিকে ওয়ারনার তাকালো—তার দৃষ্টি অপমানের ব্যথায় ভরে উঠেছে।

—মিঃ লারমুর তো থাকার কথা বললেন না।

বনমালি অতি আপ্যায়নে বললো—

—না-না! এই দুর্যোগে তোমায় ছাড়তে পারি না—কিছুতেই না। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছো—এই বিপদে ফেলতে পারবো না। আমার বাড়ী চলো।

রাতে দুর্যোগের মাত্রা খুব বেড়ে গেল।

—ভীল! তুমি আর এ-রাতে বাড়ী যেও না!

—কিন্তু মাকে তো একটা খবর দিতে হয়!

—হাঁ-হাঁ হবে—বেয়ারা!

সকালে বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা পাতার ফাঁক দিয়ে রুগ্ন সূর্য ধরার বুকে তার ক্ষীণ আলোর রেখা ছিটিয়ে দিচ্ছে। বনমালি ওয়ারনারকে ডেকে তুললো।

—সাহেব! এখনও আবছা আছে। ঘোড়াটা এনে রেখেছি—রওনা হও! বড় সাহেব জেনে ফেলো আমাদের দুজনের কাউকে আর আস্ত রাখবে না। শিগগীর—শিগগীর—আর দেরী নয়!

সময় ধরা। বনমালি এলো কুঠিতে এত্তালা দিতে।

লারমুর নীচের একটা ছোট ঘরে কোম্পানীর মাসের হিসেব দেখছে। নীলগঞ্জ থেকে এবারের রপ্তানি খুব কম—অর্ধেকও না! অফিসারগুলো অকেজো—সব দিকে নজর রাখা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মনটা বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলো!

—হুজুর! সেলাম!

সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বনমালি।

এক চোখে বনমালিকে দেখে লারমুর যেন ক্ষেপে উঠলো।

—ওয়ার্থলেস! ফুল! নীলগঞ্জে রপ্তানি কত—জান?

—হুজুর!

—আজ থেকে তোমার দেওয়ানী ঘুচে গেল। যাও—

বনমালি জানতো লারমুর তাকে ছাড়তে পারবে না। এমন ফলাও কারবার আর কেউ করতে পারবে না—দাদনের অর্ধেক টাকাটা বনমালির কারচুপিতে লারমুরের পাকেটে যেতো।

বনমালি লারমুরের দিকে তাকিয়ে বলল, রপ্তানীটা কম হয়েছে ঠিকই তার একটা কারণও আছে। চারিদিকে আগুন—আগুন বলে আগুন! চাষীরা ক্ষেপে গেছে—নীল তারা বুনবে না—শিশির ঘোষ ইন্ধন যোগাচ্ছে। লোকটি বোধহয় যাদুটোনা কিছু জানে নইলে চাষাগুলো জানে তারা ধ্বংস হবে তবু তোমা তার পিছন পিছন ঘুরছে—তার হুকুম মেনে চলছে! চেষ্টা তো করছি হুজুর। কিন্তু সফল হচ্ছে না।

লারমুরের মনটা নরম হয়ে গেল।

—শুনেছি ঝড়ে চাষীদের ঘরগুলো অনেক পড়ে গেছে—কিছু দাদন দিলে তো পার!

—হুজুর! তারা সব পাগল! বলে কি —ভাঙা ঘরে থাকবো—বউঝি নিয়ে গাছ-তলায় বাস করবো তবুও দাদনের খাতায় টিপ দেবো না। লারমুরের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো।

—কে? কে এখানে জোট পাকাচ্ছে।

—সে আর বলার কথা না হুজুর। ভিক্ষের ঝুলি ছাড়িয়ে যাকে মানুষ করলাম —সেই এখন ছুরি মারছে! নেমকহারাম করমে খোড়াটাই এই হুজুগের মূল।

—করিম! সে তো আমাদেরই লোক।

—এখন বিগড়ে গেছে! ঝিকরগাছার শিশির ঘোষের মিটিং থেকে ঘুরে এসে তার মাথাটা যেন কেমন-কেমন হয়ে গেছে। কি যে বলে তার ঠিক ঠিকানা নেই!

লারমুর গম্ভীর হয়ে বললো—

—বুঝিয়ে দেও, সাহেবরা দুর্বল নয়। কথা না শোনে শেষ পর্যন্ত শেষ ব্যবস্থা করা হবে!

সাহেবের হুকুম—বনমালি চলে গেল করিমের বাড়ী। সদর রাস্তার ধারে করিমের বাড়ী। সামনে এক লম্বা আটচালা —সেটা সদর। বাইরের লোকজন বসে— সময় সময় গাঁয়ের মজলিস হয়।

বনমালি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলো আট-চালায় লোক গিজগিজ করছে।

—করিম! করিম মিঞা!

সাড়া পেয়ে করিম ছুটে এলো।

দাঠাকুর! এ আবার কি ডাক? মুই তোমার কাছে আবার মিঞা হলুম কবে? তোমার কোলে মানুষ—তোমার জন্য জানটা দিতি পারি!

—হুঃ! আটচালায় কারা?

—সব গাঁয়ের মানুষ!

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি!

—ভিন্ গাঁয়ের দুচারজন মোড়লরাও এয়েছে। মোদের কথা হচ্ছে নীল বোনা হবে কিনা!

বনমালি মুখখানা গম্ভীর করে বলল— করিম! এসব কুমন্ত্রণা কে দিয়েছে? ওপথ ছাড়ো—যেমন চলছিল—চলো! সাহেবদের সঙ্গে লড়াই অত সোজা নয়! শুধু শুধু জানটা কেন খোয়াবে!

—সাহেবদের সঙ্গে পারবো না—জানি! কিন্তু জানটাতো দিতে পারবো! মাটি ধরে উঠিছি আবার মাটির নিচেই না হয় চলে যাবো।

—এ কথা তোমার কাছে শুনতে আসিনি করিম! এখনও বলছি—ও পথ ছাড়ো!

—দাঠাকুর! তোমার ঋণ কি শোধবার মতো? কিন্তু কে বড়—মুই না মোর দেশ! চাষীরা—তারা তো তাদের খুনে দিয়ে নীলের সার জোগায়! বল! দাঠাকুর! এটা ঠিক কি না?

—করিম! কেন অযথা একটা অমঙ্গল ডেকে আনছো! এখনও বলি—সাবধান!

বনমালি চলে গেল।

হৈ-চৈ চীৎকারের মধ্যে মজলিস তখনও চলছে।

হাতের গুলো ফুলিয়ে রহিম এগিয়ে এল—মোরা জান দেবো তবু নীল বোনবো না! গুলি কোরবে—করুক! তবুও না।

রহিম বড়ার মুরুব্বী ইমানের ছেলে।

ইমান ধমক দিল. বলল—থাম—থাম, আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না!

ইমান করিমের দিকে ফিরে বলল— দাঠাকুরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে দাদনটা একটু হাল্কা করলে হতো না?

—না, না! ওকথা বোলো না—মোড়ল। মোরা নীল বোনবো না—মোরা একজোট!

জোট ভাঙলে সাহেবরা পেরে বলবে? ঝিকরগাছায় মোরা হলপ নিছি—মোরা জোট ভাঙবো না—কিছুতেই না!

মাতব্বররা সাহেবদের সঙ্গে গোলমাল করতে নারাজ। সাহেবরা তো আর অমনি ছাড়বে না—হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেবে—শুধু শুধু কতকগুলো জান যাবে।

ছোঁড়ার দল বলল—ইস! মোরা পাঁচুর সাকরেদ—মোরা লাঠি ধরতি জানি!

বুড়ো ইমান লম্বা দাড়িটা চুমরে নিয়ে বলল, লাঠি! লাঠিতে কি গুলি আটকায়?

—না পারি জান দেবো!

ইমান ছেলের হাত ধরে টান দিল—চ—আর বাহাদুরীতে কাজ নেই! এক লহমা আঁধার হল—বৌটা একা। চ—চ বাড়ী চ!

তখনও খুব হৈচৈ। করিম চেঁচিয়ে বলল, মোর জবান এক। মুই বলিছি বোনবো না তো বোনবো না—জান থাক আর যাক! কাজীপাড়ায় গেলুম। মাথা নেড়ে নেড়ে কাজীসাহেবরা বললো—ঘাড়ে দেখছি জিন চেপেছে—এ পাগলামি কেন? সাহেবরা কি মানুষ রে—ওরা হচ্ছে হুরীর পোলা। এক লহমে উড়িয়ে দেবে!

বনমালি আবার এলো!

—করিম! তোমায় ভালই বলছি গোলযোগ করো না—ভাল হবে না!

করিম একটু হাসলো—ভাল হবে না জানি। দাঠাকুর! মুই তার তোয়াক্কাও রাখি নে! মরণ তো আছে। জ্যান্তে মরার চেয়ে একেবারে মরাই ভাল! সাহেবরা ইচ্ছে মত গরু বাছুর ধরে নিয়ে যাবে—সোমথ সোমথ মেয়েদের ঘরে রাখা যাবে না! এ অবস্থায় আর বেঁচে থেকে লাভ কি দাঠাকুর? তুমিই বলো না!

—তুমি তো সাহেবদের পেয়ারের লোক! তারা তোমার সব কিছুই তো ভাল করেছে!

গম্ভীর হয়ে করিম বলল, এ দুনিয়ায় মুই একা নই দাঠাকুর! আজ এবাড়ী কাল ওবাড়ী শেষে মোর বাড়ী! সাহেবদের আর চিন্তে বাকি নেই দাঠাকুর! ঝিকরগাছায় হলপ নিচ্ছি, নীল মোরা বোনবো না! এ কথার আর নড়চড় নেই!

বনমালি মুখ ফিরিয়ে নিল।

—মরার জন্যে পিঁপড়ের পাখা ওঠে। দেখছি—তোমারও পাখা উঠেছে! করিম একটু হাসলো।

—দাঠাকুর! ভয় দেখিও না মোরে—মুই ভয় পাবার মানুষ না!

বনমালি ফিরলো সোজা কুঠিতে।

—বন্!

—হুজুর!

—কি হলো! কি করলে?

—হুজুর। করমেটা বড্ড নিমকহারাম! কত বললাম, কত বোঝালাম সেই এক গোঁ—নীল বুনবো না! শুধু তাই না—আশপাশের গাঁ থেকে লোক জড় করে জোর জোট বেঁধেছে, বলে শিশির ঘোষ নাকি বলে দিয়েছে!

—ওকে দাদন দিয়েছো?

—দাদন! বোধহয় না—ওর জমিগুলো তো কোম্পানীর খাস। টাকাটা হুজুরের তাঁবলে জমা হয়। বলে কি—কালই মাঠে লাঙ্গল দেবো।

—লোকজন সব ঠিক আছে? বিশেনরু! দরকার বুঝলে চক্করঘাটার পাইকদের খবর দিও!

—হুজুর!

পরদিন সকালে আকাশে মেঘের ভাঁজ নেই। সূর্যের নিস্তেজ আলো বাঁশ বনের ফাঁকে ফাঁকে মাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। উলুখড়ের মাথাগুলো তখনও ভিজে। রাস্তার খানাখন্দের অল্প জলে ছোট ছোট মাছের ঝাঁকগুলো ঘুরেফিরে খেলা করছে।

করিম লাঙ্গলটা কাঁধে নিল।

করিমের স্ত্রী বাইরের উঠোনে গোবরের ছড়া দিচ্ছিল—স্বামীর কাছে এগিয়ে এলো।

—বনমালিপুরের মাঠে চাষটা দিয়ে আসি?

—আজ না হয় থাক না! মোর দিনটায় ভাল ঠেকছে না!

—ধ্যাৎ! যেমন কথা? মেয়ে লোকের আঁচল ধরে বসে থাকবো—লোকে কি বলবে!

—আজ বিষ্যুদ বার—আজ না হয় থাক না!

করিম একটু হাসল!

—চাষ দেবো এতে আবার বিষ্যুদ—শুক্কুর কি!

—কি জানি! মোর দিলটা যেন কেমনতর ধক ধক করছে।

দৃঢ়কণ্ঠে করিম বলল,—

—কথা দিচ্ছি—লাঙ্গল দেবো। তা দেবোই—নইলে মোরে মানবে কেন?

ভবিষ্যতের এক অমঙ্গল আশঙ্কা করিমের স্ত্রীর মনটাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুলল।

—তা হলে মুইও যাবো।

—ধ্যাৎ! মেয়ে লোকে কি মাঠে যায়! সাহেবরা জানলে মসকরা করবে—হাসাহাসি করবে!

—করুক গে—মুই যাবই!

মুখটা কাঁচুমাচু করে করিমের স্ত্রী বলল—

—মোর দিলটা যেন কেমন কেমন কোরছে!

করিমের স্ত্রীও পাছু পাছু চলল।

বনমালিপুরের মাঠ যেন দিগন্তে মিশে গেছে। পূবদিকের তিন বিঘের বন্দ—সার মাটি লাগে না—চাষের ভাল জমি। লাবণ্যকে বলে বনমালি করিমকে জোগাড় করে দিয়েছে। করিমের দখল পাঁচ বছর। এবারে আর এ জমিতে সে নীল বুনবে না—হলপ নিয়েছে। কয়েকদিন আগে বৃষ্টিটা হলো বটে কিন্তু জলটা টেনে গেছে মাটিটা খটখটে। চাষের জো হয়নি তবু করিমকে লাঙ্গল দিতে হবে—সবার সামনে যে সে কথা দিয়েছে—এখন আর ফেরার উপায় নেই! আলের পাশে শুকনো একটা খেজুরে গাছ—তার তলায় গরু দুটো ছেড়ে দিল। লাঙ্গলটাও রাখলো।

করিমের স্ত্রী ভয়ে ভয়ে স্বামীর আরও নিকটে এল।

—দেখছো না—ঐ তো ঐ তো সাহেবের লোক দল বেঁধে আসছে!

করিম তাকালো।

—মোর জমিতে মুই চাষ দেবো তাতে কার কি!

ভয়ে করিমের স্ত্রীর গলাটা যেন শুকিয়ে আসছে।

—ওরে বাবা! কত লোক—সবার হাতে লাঠি-সড়কি।

করিমের স্ত্রী একটু এগিয়ে এলো।

—দাঠাকুর! এত লোক কেন?

—কেন? ন্যাকা! কার জমিতে। করমে জানে না—এটা কোম্পানীর খাস জমি!

—মোরা এক্ষণি যাচ্ছি!

করিমের কাছে এলো।

—লাঙ্গল দিতে হবে না—বাড়ী যাই চলো!

গলার স্বর চড়িয়ে করিম বলল—মোর ভুঁই—মুই চোষবো—বারণ করার কে?

বনমালি এগিয়ে এলো।

—কার ভুঁই—কার ভুঁইরে?

দৃঢ়স্বরে করিম বলল—

—মোর!

বনমালি আঙুল নেড়ে বলল—এখনও বলছি বেরিয়ে যা!

স্বর তার কঠোর।

—নইলে—

—নইলে? কি হবে দাঠাকুর!

বনমালির ইঙ্গিতে করিমের ওপর লাঠি পড়ল।

করিমের স্ত্রী দৌড়ে বনমালির দুটো পা জড়িয়ে ধরলো—

—দাঠাকুর! আর মেরো না—কাল রাতে এতটুকু ঘুমুই নি—মেরো না—দাঠাকুর!

করিমের স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

করিম তখন মাটিতে—তার ক্ষতবিক্ষত দেহের আঘাত থেকে রক্ত ঝরছে।

বনমালি বলল—দেখতো রে এখনও নিঃশেস পড়ছে নাকি!

রাম পাইক নাকের কাছে হাত দিয়ে বনমালির দিকে তাকালো—।

—নাঃ।

দিনকাল কেমন চলছে,
তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি।
কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব
আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আঁতের
খবর মেলে ধরা হবে এই
বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু
সচেতন হতে পারি।

শর্করা-সংকট

যত গুড় (বা চিনি) ঢালা যাবে নিশ্চয় তত মিষ্টি হবে, কিন্তু গুড় চিনি স্যাকারিন বা অন্য কোন সুইটেনিং সাবস-ট্যান্স না দিয়ে অন্তত চা-এ কি প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিষ্টি স্বাদ আনা যায় না? এক কাপ চা চেয়ে গৃহকর্ত্রীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ফেরি-ওয়ালার কাছ থেকে জিনজার-গ্রুপের এক ভাঁড় চা পান করতে করতে এই কথাই বারবার ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত সেই অনবদ্য পরিহাসের কথা : "...সেদিন ল্যান্ডলেডীর (মুদ্রণের সুবিধের জন্যে বাংলা অক্ষর ব্যবহার করলাম) মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, 'না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখছিনে।'' (য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র)

তখন ভাবলাম, 'ঠাট্টা যদি সত্যি হত আহা!' —যদি আমাদের প্রত্যেকের নেলির করস্পর্শে চিনিবিহীন চা মিষ্টতায় ভরে উঠেছে বলে মনে করতে পারতাম তবে আজকের এই শর্করা-সংকটে আমাদের আর ভুগতে হত না—আমি অন্তত প্রত্যাখ্যানের জ্বালা আর মৃৎপাত্রে জিনজার গ্রুপের আস্বাদন এড়াতে পারতাম।

অর্থনীতিবিদ স্টিগলারের আক্ষেপও মনে পড়ে গেল : যদি আমাদের প্রত্যেকের একটা করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থাকত...।

স্টিগলারের আক্ষেপ কিন্তু এক দিক দিয়ে ভুল। আমাদের প্রত্যেকের একটা করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ থাকলে অর্থনীতি বলে কোন শাস্ত্রের চর্চা কখনই হত না, আর ফলে স্টিগলারের নামও কেউ জানত না।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

কোন কিছু লিখতে বসে এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার করা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা লিখতে বসে সেদিন তাই করেছিলাম, কিন্তু অন্দরমহল থেকে সংক্ষিপ্ত জবাব পেলাম : চিনি নেই। লেখা মাথায় উঠল। কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। মোড়ের মাথায় একজন ফেরিওয়ালা অনির্বাণ চুল্লীতে পেতলের কলসী বসিয়ে সর্বদা গরম চা বেচে জানি। সেই দিকেই অগ্রসর হলাম। দেখলাম ফেরিওয়ালা ঠিকই তার জায়গায় বসে। এক ভাঁড় চা নিয়ে আস্বাদন শুরু করতেই জাতবিদের দেরী হল না—জিনজার-গ্রুপের চা।

'জিনজার-গ্রুপ' নামটা দেওয়া এক সরকারী কলেজের অধ্যাপকের। সেদিন ঐ কলেজে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কলেজের ক্যানটিন থেকেই চা এল। এক চুমুক দিয়েই বন্ধুর পাশে বসা তাঁর এক সহকর্মী মন্তব্য করলেন : জিনজার-গ্রুপের বলে মনে হচ্ছে।—তারপর একটু থেমে আবার, অন্য লোকে ডুবা দেয় ভাগ্যে আমি তারে চিনি।

প্রথম চুমুক নয়, দ্বিতীয় চুমুকে আমিও বুঝলাম যে চাটা অফিসিয়াল গ্রুপ বা চিনির চা নয়—চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে ইক্ষুগুড়, আর গন্ধনাশের প্রচেষ্টা করা হয়েছে জিনজার বা আর্দ্রক দিয়ে। জিনজার-গ্রুপের এই চা বহু পুরোন হলেও সম্প্রতি এর প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে শর্করা-সংকটের দরুন।

প্রথমে সমীক্ষাটির নাম দেব ঠিক করেছিলাম 'চিনি-সংকট', কিন্তু এক বন্ধু (বাংলা ব্যাকরণবিৎ) বললেন : ঠিক হবে না, অনেকে গুরুচণ্ডালী দোষ ধরবে। তারপর তিনিই নির্দেশ দিলেন : নাম দাও শর্করা-সংকট। এতে গুরুচণ্ডালী দোষ কাটবে, আর অনুপ্রাসের দরুন শোনাবেও ভাল।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুর পরামর্শই গ্রহণ করলাম, যদিও বা ইংরেজ মহাকবির সেই প্রশ্নটি বারবার খোঁচা দিয়েছিল : হোয়াটস ইন এ নেম?

সংকটের প্রকৃতি-পরিচয় :

শুধু গৃহকর্ত্রী বা আমার মত চা-খোরেরা না, শর্করা-সংকটের কবলে আজ কে-না পতিত? সাধারণ রেস্তোরাঁ, চায়ের স্টল, মিষ্টির দোকান, বেকারী, লজেন্সের কারখানা, আইসক্রীম বা সফট্ ড্রিংকের ব্যবসা, এমনকি ওষুধের ল্যাবোরেটরীও শর্করা-সংকটের দরুন আয় অল্পবিস্তর সংকুচিত।

রেস্তোরাঁ ও চায়ের দোকানের মালিকের অভিযোগ, চিনির আগুন দামের জন্যে চায়ের দাম বাড়াতে হয়েছে, আর তার দরুন চায়ের বিক্রি কমে গেছে। অনুরূপ-ভাবে মিষ্টির দোকানের মালিকও বলে থাকেন, তিনি সাইজ ছোট করতে এবং ওজনের হিসেবে দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সাইজ ছোট বলে খদ্দেরের মনে ধরে না, আর ওজনের হিসেবে দাম বেশী বলে কিনলেও কম কেনে।

কারও যুক্তিতে ভুল নেই। উপকরণ বা ইনপুটের দাম বাড়লেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ কমে যায়—অর্থনীতির এ অতি সাধারণ তত্ত্ব। কিন্তু এই অবস্থার ফল যে তৃতীয় পর্যায়ী, চতুর্থ পর্যায়ী অর্থাৎ সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিন্তা করা হয় না।

ধরুন, চিনির দাম বৃদ্ধির ফলে রেস্তোরাঁ, চা-এর স্টল, মিষ্টির দোকান ইত্যাদিতে বিক্রি কমে গেল। পরবর্তী পর্যায়ী ফল—উৎপাদন হ্রাস এবং তার দরুন নিয়োগ হ্রাস—হয়ত রেস্তোরাঁ বা চায়ের দোকানে দু'একজন শিশু-পরিবেশক বা কারিগর ছাঁটাই হল। এই ত' সেদিন এক ছোট বেকারীর মালিক বললেন : কি করব মশাই, পেস্ট্রী তৈরী বন্ধ করে দিয়েছি। দুজন কারিগরকেও জবাব দিলাম।

দুজন কারিগরকে জবাব দেওয়ার অর্থ হয়ত এই নিয়োগহীনতার দিনে দুটি পরিবারকে অনশনের মুখে ঠেলে দেওয়া।

এইভাবে চিনি যেখানে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ সেখানেই ঘটছে অল্পবিস্তর উৎপাদন হ্রাস। উৎপাদন হ্রাসের ফলে নিয়োগ-হ্রাস, নিয়োগহ্রাসের দরুন আয় হ্রাস এবং তার ফল বেকারত্ব ও ধনবৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। এ ছাড়া কনজামসান বা ভোগ হ্রাস ত' আছেই—বাড়ীতে বরাদ্দের বাইরে এক পেয়ালা চা চেয়ে পাওয়া যায় না, পৌষপার্বণের দিনে গৃহকর্ত্রী পুলিপিঠের প্রকারভেদ ও পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হন, জল-খাবারের ক্ষেত্রে চিনি ছাড়াই কাজ চালাবার চেষ্টা করা হয়, শর্করাপ্রিয় বাচ্চাদের সতর্ক

করে দেওয়া হয় যে দ্বিতীয় দফা চিনি চাইলে পাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। কারণ হিসেবে বলা হয়, বাজারে চিনি নেই।

বাজারে কিন্তু চিনি আছে—খোলা বাজারেই আছে, তবে তার যা দাম তাতে প্রয়োজনমত কেনা অধিকাংশ কনজিউমার বা ভোক্তার সামর্থ্যের বাইরে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে ঐ দামে প্রয়োজনমত চিনি কেনা পরিবারের পারচেজ-প্ল্যান বা ব্যয়বণ্টন-নীতি দ্বারা কোনমতেই সমর্থিত হতে পারে না। অর্থাৎ, চিনির জন্যে ঐ পরিমাণ ব্যয় করলে অন্যান্য দ্রব্যাদির ভোগ এত কমে যাবে যে পরিবার কিছুতেই সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না। যেমন, ঐ বেশী দামে চিনি কেনার জন্যে পরিবারকে যদি দুধ বা মাছ বা ঐ রকম কিছুর ওপর খরচ কমাতে হয় তবে পরিবারের ব্যয়বণ্টনের লক্ষ্য—সর্বাধিক পরিতৃপ্তিলাভ করা—ব্যাহত হতে পারে। তাই র‍্যাশানিং বা বরাদ্দ ব্যবস্থায় যে, ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে যেটুকু চিনি পাওয়া যায় তা দিয়েই, বা অপরিহার্য ক্ষেত্রে খোলা বাজারে কেনা কিছুটা যোগ করে কাজ চালাতে হয়। অথচ এই র‍্যাশানিং ব্যবস্থার বাইরেই হল দেশের অধিকাংশ অঞ্চল, আর ন্যায্যমূল্যের দোকানও সংখ্যায় পর্যাপ্ত নয়। উপরন্তু, চিনির দোকান প্রভৃতি যেসব ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের কাছে চিনি উৎপাদনের অন্যতম ইনপুট তাদের খোলা বাজার থেকেই দ্বিগুণ মূল্যে এই উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। ফলে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্তরবৃদ্ধিতেই সহায়তা করে।

অতএব, শর্করা-সংকট ভোগ উৎপাদন আয় নিয়োগ বণ্টন মূল্যস্তর—অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত। এবং এই সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। অনেকেরই আশংকা যে আগামী আর্থিক বছরে (১৯৭৩-৭৪) শর্করা-সংকট জনসাধারণের পক্ষে আরও ত্যাগ ও বেদনার এবং সরকারের পক্ষে আরও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠবে।

এখন দেখা যাক, কেন এমন হল—এই শর্করা-সংকটের উৎস কোথায়।

সংকটের কারণ :

প্রাথমিক পর্যালোচনায় ভারতের ন্যায় দেশে আজকের শর্করা-সংকট অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কারণ, বিগত তৃতীয় দশকের সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারত অন্যতম প্রধান চিনি উৎপাদনকারী দেশ (এই দিক দিয়ে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে সপ্তম স্থানাধিকারী, যদিও বা কয়েক বছর আগে স্থান ছিল চতুর্থ) এবং গত দশ বছরে ৫০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে (১৯৬১-৬২ সালে ২৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ৪২·৫ লক্ষ মেট্রিক টন) সমর্থ হয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিকল্পনাও করেছে।

একটু তলিয়ে দেখলে কিন্তু সংকটের কারণগুলো সহজেই ধরা পড়ে। মোটামুটিভাবে দেখলে সংকটের কারণ দ্বিবিধ বা দ্বিমুখী : উৎপাদন হ্রাস ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি (অর্থনীতির ভাষায় ঠিক চাহিদা বৃদ্ধি হয়ত বলা যায় না)। উৎপাদন হ্রাসের মৌল কারণ প্রতিকূল আবহাওয়া বা কোন স্থানে অতিবৃষ্টি এবং কোন স্থানে অনাবৃষ্টির দরুন ১৯৭১-৭২ সালে আখ যোগানে ঘাটতি। কৃষিজাত দ্রব্য যে শিল্পের প্রধান ইনপুট, বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল কৃষিপ্রধান দেশে তার উৎপাদন হ্রাস যে কোন বছর ঘটতে পারে। এ ছাড়া অবশ্য তলে তলে অন্য কারণও দানা বাঁধছিল।

দেখা যায়, অনেক ফ্যাকটরী জোনে আখ চাষের জমি অন্য চাষে স্থানান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আগের চেয়ে বেশী পরিমাণে আখ চিনির কলে না গিয়ে বিভিন্ন প্রকার গুড় ও দিশি চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তৃতীয়ত, চিনি শিল্পের—বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের চিনি শিল্পের ওপর জাতীয়করণের খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

এইসব মুখ্য ও গৌণ কারণের জন্যে ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের ৪২·৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনে।

অপরদিকে বা প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির মূলে আছে জনবিস্ফোরণ ও জনগণের ভোগ-পদ্ধতির পরিবর্তন। বিগত দশ বছরে (১৯৬১-৭১) জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে—২৪·৬ শতাংশ বা মোট ১০·৭৮ কোটি। শিশুর খাদ্যে বেশ চিনি লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশীই লাগে, তা ভুললে চলবে না। আর ভোগ-পদ্ধতির দিক দিয়ে সমস্যাটির বিচার করলে দেখা যায় যে, আগে যারা গুড় ইত্যাদি ব্যবহার করত তাদের অনেকেই চিনির দিকে ঝুঁকেছে।

এর ওপর কিছুটা রপ্তানির আবশ্যকতাও আছে। মোট কথা, দশ বছরে চিনির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ লক্ষ মেট্রিক টনের মত—৩২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। অথচ ১৯৭১-৭২ সালে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৩১ লক্ষ মেট্রিক টন। এই অবস্থায় বর্তমান বছরে (১৯৭২-৭৩) যে শর্করা-সংকট দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

আগামী বছরে প্রত্যাশা কি রকম?

আগামী বছরে (১৯৭৩-৭৪) সংকট আরও ঘনীভূত হবে বলে যে আশংকা করা হচ্ছে তার মূলে আছে বর্তমান বছরে নিদারুণ খরা বা অনাবৃষ্টি।

ভারতে ২২০টির মত চিনির কল আছে। এর মধ্যে ৯৮টি বিহার ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত এবং এই দুইটি রাজ্যেই মোট এক-তৃতীয়াংশের ওপর চিনি উৎপন্ন হয়। চিনি উৎপাদনে অপর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মহারাষ্ট্রও খরায় সমান প্রপীড়িত। এই খরার দরুন অনুমান করা হচ্ছে যে বর্তমান বছরে উৎপাদন গত বছরের অংক ৩১ লক্ষ মেট্রিক টনেও পৌঁছবে না। তার ওপর আবার বছরের শেষে মজুতও কিছু থাকছে না (যা প্রতি বছরই থাকে)।

অপরদিকে ১৯৭০-৭১ সালের ভিত্তিতেই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ অন্তত ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে ধরে নিলে এবং এর সঙ্গে পঞ্চপাঞ্চমূলক কোটার ভিত্তিতে ১ লক্ষ মেট্রিক টন রপ্তানির ব্যবস্থা করতে হলে মোট ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াবে ৪১ লক্ষ মেট্রিক টনে।

অতএব, আগামী বছরে মোট ১০-১১ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি-ঘাটতির আশংকা রয়েছে। এর ফলে চিনির বরাদ্দ ব্যবস্থা আর দাম যে কোথায় দাঁড়াবে বলা কঠিন।

অথচ আগামী বছরই চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছর, যে বছরে চিনির উৎপাদন ৫০ লক্ষ মেট্রিক টনও ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছিল।

প্রতিবিধানে সরকারী প্রচেষ্টা :

চিনি একাধারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদনের উপকরণ বলে শর্করা-সমস্যা বা সংকটে সরকারের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা কল্পনাও করা যায় না। এবারও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। খোলা বাজারে দাম চড়তে শুরু করা মাত্রই সরকার বিক্রি ও বিলিবণ্টন ব্যবস্থার ওপর নানারকম নতুন বাধানিষেধ আরোপ করে। লেভি চিনির অনুপাত (যে চিনি র‍্যাশানিং ও ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয়) ৬০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ শতাংশে নিয়ে যায়; ফলে খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে থাকে ৩০ শতাংশ। একসাইজ ডিউটি বা অন্তঃশুল্ক বাদ দিয়ে লেভি চিনির দাম ধার্য করা হয় কুইণ্টাল প্রতি ১৪৭·১৯ টাকায়, এবং এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয় ১৯৭২ সালের জুলাই মাস থেকে।

শর্করা-শিল্পের অভিযোগ হল, এই দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন বলে অবাস্তব, এবং এর অর্থ শিল্পকে বাকী ৩০ শতাংশ চিনি খোলা বাজারে বেশী দামে বেচে লেভি চিনির বিক্রির দরুন ক্ষতিপূরণ করতে অনুমতি দেওয়া। ১৯৭১ সালের মে মাসে যখন চিনির বিনিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন উদ্দেশ্য ছিল ঐ একই। এবার লেভির শতাংশ বৃদ্ধির (৬০ থেকে ৭০) দরুন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? অর্থাৎ খোলা বাজারের চিনির দাম ত বাড়বে—এতে অবাক হচ্ছেন কেন?

জাতীয়করণের দাবি :

এই সোজা যুক্তি সত্ত্বেও শিল্প কিন্তু অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পায়নি। খোলা বাজারে চিনির দাম বৃদ্ধির দায়িত্ব অনেকাংশেই চাপানো হয়েছে শিল্পের ওপর এবং চিনির কলের মালিকরা 'শর্করা-শ্রেষ্ঠী' (সুগার ব্যারন) আখ্যা পেয়েছেন যাঁরা আখচাষী ও জনসাধারণ উভয়কেই শোষণ করে নিজেদের উদর স্ফীত করছেন।

সমবায়িক চিনির কলগুলোর মালিকদেরও নতুন শোষক গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এই অবস্থায় শর্করা-শিল্পের জাতীয়করণের দাবি জোরালো হওয়াই স্বাভাবিক, এবং তাই হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ত' এই দাবি নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে সোরগোল।

জাতীয়করণ [illegible]:

জাতীয়করণের ফলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? এই সোজা প্রশ্নের উত্তরে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে দেখা যায়। সরকারও এ ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। না হলে এতদিন জাতীয়করণের পথই বেছে নেওয়া হত। তার পরিবর্তে সরকার এক অনুসন্ধান কমিটি (শর্করা-শিল্প অনুসন্ধান কমিটি) নিয়োগ করেই বসে আছে এবং উত্তরপ্রদেশে এই নিয়ে রাজনীতির খেলা চলছে।

আমাদের দেশের মত অর্থ-ব্যবস্থায় কোন বিশেষ শিল্পের সমস্যার সমাধান হিসেবে জাতীয়করণের পথ মরিয়া হয়েই গ্রহণ করতে হয় এবং বেশ কয়েক ক্ষেত্রে তা করা হয়েছে। কিন্তু শর্করা শিল্পে তা এখনই করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? এর ফলে শিল্পটির খোলা থেকে সোজা আগুনে গিয়ে পড়বার আশংকা থাকবে না?

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর কার্যসম্পাদন থেকে দেখা যায় যে, অবস্থা কোন ক্ষেত্রেই অনুকূলের দিকে আসে নি, বরং বেশীর ভাগ কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো চূড়ান্ত অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছে। চালু করার প্রথম প্রথম এই রকম অসুবিধাই হয়, কিন্তু শর্করা শিল্পের বেলায় এই প্রাথমিক অসুবিধার ফল হবে ভয়াবহ। উৎপাদন যদি [illegible] হ্রাস পায় তবে অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা কল্পনাও করা যায় না। মোট-কথা, এই গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য এবং [illegible] সরবরাহকারী শিল্পকে নিয়ে হঠাৎ কিছু করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

সমবায়ই কি পথ?

ভারতের মোট ২২০টি চিনির কলের মধ্যে ৭৪টি সমবায়িক ভিত্তিতে গঠিত। অনেকে বলেন, বাকিগুলোকে সমবায়ের আওতায় নিয়ে আসলেই সব সমস্যার সমাধান হবে—সংকট দূরীভূত হবে। কিন্তু দেখা যায়, একমাত্র মহারাষ্ট্র ছাড়া কোন রাজ্যেই সমবায়িক চিনির কলের কার্য-সম্পাদন আশাপ্রদ নয়। উপরন্তু, সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতিকে সকল সময়ই বহন করে লক্ষ্যের সংঘর্ষ: অর্থনৈতিক না সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন? অর্থনৈতিক লক্ষ্য হল যথাসম্ভব অধিক মুনাফা লাভ করা। এর জন্য উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম যা হয় হোক। এ-লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে সামাজিক লক্ষ্যের দিকে চোখ বুজে থাকতে হয়। অপরদিকে বেশী উৎপাদন আর কম দামের দিকে দৃষ্টি দিলে অর্থ-নৈতিক লক্ষ্য ব্যাহত হয়।

অতএব, সমবায় শর্করা শিল্পের সংকট মোচনের পথ বলে মনে হয় না।

প্রকৃত প্রতিবিধান কি?

মনে হয় বর্তমানের 'আংশিক বিনিয়ন্ত্রণ' নীতিই প্রকৃত পন্থা, তবে এই নীতির বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।

শর্করা-সংকটের মৌল কারণ হল পরিমাণে আখের যোগানের অপ্রতুলতা—অর্থাৎ এই শিল্প পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা-মাল পাচ্ছে না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় আখের যোগান কমে গেলে তার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করবার নেই, কারণ তা হল বৃহত্তর কৃষি-সংগঠনের প্রশ্ন। কিন্তু আখ চাষের জমি যাতে অন্য চাষে স্থানান্তরিত না হয় এবং যে পরিমাণ ফসল জন্মায়, তা যাতে ঐ জোনের কলগুলোতে গিয়ে পৌঁছোয় তার জন্যে ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে করণীয় হল আখের দাম বৃদ্ধি করা। প্রতি-বিধানটি নিয়ে সরকারও ভাবছে এবং শোনা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে উত্তর ভারতে আখের দাম কুইন্টাল-প্রতি ১২ থেকে ১৩ টাকায় ধার্য করা হবে। (বর্তমানে ন্যূনতম দাম ৭-৩৭ টাকা।) দাম এতটা বাড়ালে বরাদ্দ চিনি কিলোগ্রাম-প্রতি বর্তমান ২ টাকার পরিবর্তে অন্তত ২-৫০ টাকা হতে বাধ্য এবং খোলা-বাজারেও দাম ৫ টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে ভারতীয় চিনিকল সংঘের ধারণা। অপর-দিকে যদি আবার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় ফিরে গিয়ে লেভি-চিনির দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়, তবে অনেক মিলই দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হবে।

তাহলে যা করতে হবে তা হল: আখের দাম বাড়ানো কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জন্য আলাদা আলাদা দাম ধার্য করা। অবশ্য ন্যূনতম দাম ৯/১০ টাকা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের সময়-কাল (সময়-কাল বা ক্রাসিং-সীজন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম—৩ থেকে ৫ মাস), উৎপাদনের ক্ষমতা, নিষ্কাশন-ক্ষমতা (রিকভারী) ইত্যাদি বিচার করে জোন-গুলোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তৃতীয়ত বিভিন্ন প্রকার গুড় ইত্যাদির উৎপাদন এবং চিনি উৎপাদনের মধ্যে সংহতিসাধন করতে হবে। চতুর্থত, উৎপাদনের পরিমাণ যতদিন প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম থাকবে, ততদিন বর্তমান বছরের মত অন্ততঃ শুল্ক থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখতে হবে। পঞ্চমত, দুঃস্থ কলগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই অব-লম্বন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পারিশ্চা কমিটির সুপারিশগুলো বিশেষভাবে অনু-ধাবন করা যেতে পারে। ষষ্ঠত, ভারতে চিনির কল মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই কেন্দ্রী-ভূত, আখের চাষ কিন্তু বিস্তৃতি লাভ করছে। সুতরাং প্রয়োজন হল আরও চিনির কল স্থাপন করা। এ-ব্যাপারেও মনে হয়, অন্ততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায়িকতার পথে না গিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপরই নির্ভর করা উচিত। তবে কৃষকের স্বার্থরক্ষায় আখের দাম বেঁধে দিতে হবে। সপ্তমত, নিষ্কাশন বা রিকভারী বৃদ্ধির জন্যে উত্তর ভারতের কলগুলোর আধুনিকী-করণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কলগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত) আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই [illegible] উৎপাদনে উৎসাহিত করবার জন্যে [illegible] উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের [illegible] ব্যবস্থার। চিনি ও আখ থেকে উপজাত দ্রব্য হিসেবে যে শক্তি-সুরাসার, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি তৈরী করা যে সহজেই সম্ভব তা সকলেই জানেন। পরিশেষে, শর্করা-নীতি সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতেই গৃহীত ও কার্যকর হওয়া উচিত। এ-ব্যাপারে প্রাদেশিকতাকে—আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দিলে ভুল হবে।

উপসংহার:

নির্দেশিত প্রতিবিধানগুলো নতুন কিছু নয়, তবে এপর্যন্ত কোনও বাস্তবের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাঙ্গীণ দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্যকর করবার প্রচেষ্টা করা হয়নি। দেখা যায়, সকল সময়ই অবস্থা বুঝে আশু উপশমের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে শর্করা-শিল্প সকল সময়েই নির্ভর করেছে দেবের ওপর। যে-বছর বরুণ দেবতার কৃপায় প্রয়োজনমত বা প্রয়োজনাতিরিক্ত আখ উৎপন্ন হয়েছে, সে-বছর চিনির অপ্রতুলতা-জনিত কোন সমস্যাই দেখা দেয়নি। কিন্তু যে-বছর ফসল একটু বা কিছুটা কম হয়েছে সেই বছরই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সমস্যা, যা বর্তমান বছরের মত কখনও কখনও সংকটেও রূপান্তরিত হয়েছে। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে দৈব নির্ভরশীল করে রাখা উচিত নয়। সুতরাং আখের যোগান বাড়াতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে ঐ যোগানের যাতে চাহিদাও হয়। এই জন্যেই প্রয়োজন সুচিন্তিত শর্করা-নীতির, যে-নীতি অবশ্যই দীর্ঘকালীন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রচিত হবে।

আশা করা যায়, উপরি-বর্ণিত প্রতি-বিধানগুলো সংগঠিত করে এই দীর্ঘ-কালীন শর্করা-নীতি পঞ্চম পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার আগেই ঘোষিত হবে। এই রকম আশার কারণ, নির্দেশিত প্রতি-বিধানগুলো মোটেই নতুন নয় (অন্তত আমার মাথা থেকে বেরোয়নি)—মোটামুটি সরকারী সূত্র থেকেই বিভিন্ন সময়ে এগুলো ঘোষিত হয়েছে। তবে এদের মধ্যে সংগতি-সাধন করে পূর্ণাঙ্গ দীর্ঘকালীন নীতি কখনও বোধহয় ঘোষিত হয়নি। এই প্রয়োজনই আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায়, এটা জনসাধারণের (সংসদীয় বা সংসদের বাইরে) দাবি।

—[illegible]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকক্ষণ ধরে হাত পা মুখ ধুলাম। হাতে জল নিয়ে ঘাড় ভেজালাম। হঠাৎ চোখ কান গলা যে কেন এত গরম হয়ে উঠলো! এক এক সময় নিজের শরীরের মধ্যে কী যে হয় মানুষ নিজেই বোঝে না। সব মানুষই বোঝে না—না আমিই বুঝি না। বা এমনও হতে পারে, সব মানুষের শরীরের মধ্যে সেরকম কোন অস্থিরতা জাগে না। সব অবস্থাতেই তারা শান্ত থাকে, আর এই শান্ত থাকাটা নির্ভর করে তাদের মানসিক সুস্থতার ওপর।

ইচ্ছে করে অনেকটা সময় নষ্ট করে বাইরে এলাম। আমি মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণ ধরে। শুধু যে মানসিক সুস্থতা তা না। আমার শরীরকেও নিজের বশে আনতে সচেষ্ট ছিলাম। বাইরে এসে দেখলাম, ঘোতন আর লীলাবতী গল্প করছে। মা, সুপ্রিয়া আর বড়মামা আলাদা ভাবে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বড়মামা বললেন, 'শুনলাম তুই নাকি বেরোবি?'

বললাম, 'ঘোতনের সংগে একটু বেরোবো। জরুরী কাজ আছে।'

বড়মামা সাবধান করে দিলেন। 'তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস। দিনকাল ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। চতুর্দিকে বোমা, গোলাগুলি। কলেজ স্ট্রীটের দিকে আজও গুলি চলেছে।'

বললাম, 'আমি কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাব না।'

বড়মামা যেন নাছোড়বান্দা। বললেন, 'কোনদিকে যাবি?'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কলুটোলার দিকে।'

বড়মামা আঁৎকে উঠলেন, 'এই সন্ধ্যার সময় কলুটোলায় যাবি?'

উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'ও ঠিক জানে না বড়মামা। আমাকে একবার কসবায় যেতে হবে। একা একা ঐ পথে যাওয়া ঠিক হবে না বলে ওকে সংগে নিয়ে যাব ভেবেছি।'

বড়মামা খুব খুশী হলেন না। বললেন, 'কসবাও ভাল জায়গা না। ওদিকে গোলমাল তো লেগেই আছে, সাবধানে যেও।'

সুপ্রিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। 'সাতটা বেজে গেল, ওঠা যাক।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘোতনও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমিও যাব এখন।'

লীলাবতী ঘোতনকে বলল, 'আমাকে ক্যামাক স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে যাবেন?'

আমার মনে হচ্ছিল লীলাবতীকে লিফট দেবার কথা বলি। সুপ্রিয়ার সংগে নিশ্চয়ই গাড়ি রয়েছে। সুপ্রিয়া একটা কথাও বলল না। লীলাবতীর ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেই সুপ্রিয়ার সংগে চোখাচোখি হয়ে গেল। সুপ্রিয়া আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

ঘোতন আর লীলাবতী বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ লীলাবতী পিছন ফিরে আমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'কাল সকালে আসবো।' বলে মা আর বড়মামাকে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘোতন একটা কথাও বলল না। কিন্তু ওর চোখ দেখে বুঝলাম, ঘোতন দারুন জোরে নিজের মনে মনে হাসছে।

ওরা বেরিয়ে যেতে ঘরে রইলাম আমরা চারজন। বড়মামা একটা চেয়ারে বসে আছেন। বড়মামার মুখোমুখি তক্তপোষে বসে রয়েছে মা। আমি আর সুপ্রিয়া দাঁড়ানো। বড়মামা বললেন, 'কাল সকালে কি তোর কাজ আছে?'

বললাম, 'কেন?'

'একবার দমদমে যাস। তোদের বাড়িটা দেখে আসিস। আর পেয়ারা যদি থাকে, নিয়ে আসিস গোটা কতক। কতদিন পেয়ারা খাই না।'

'আপনি অনেকদিন পেয়ারা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, দাঁত তোলার পর থেকে শক্ত জিনিষ চিবোতে পারেন না বলে।' কথাগুলো নিজের কানেই কর্কশ শোনাল।

বড়মামা একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং খুব মজার কথা শুনলেন যেন। সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'ছেলেবয়সে খুব পেয়ারা খেতে ভালবাসতাম। বুড়োবয়সে ছেলেবয়সের ভাল লাগাটা আবার ফিরে আসে। লক্ষ্য করে দেখো, যারা ছেলেবেলায় মিষ্টি ভালবাসে, তারা বৃদ্ধবয়সে আবার মিষ্টির দিকে আকৃষ্ট হয়।'

বড়মামা এমনভাবে বললেন, যেন দীর্ঘ গবেষণার পর এই মুহূর্তে চরম তথ্যটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

সুপ্রিয়া অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিল। ও যেন কথা বলতেও ভুলে গেল। বড়মামা আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'আর দেরী করিস না। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস। তুই না ফেরা পর্যন্ত চিন্তায় থাকবো।' এর পরে আর থাকা যায় না। বাধ্য হয়েই সুপ্রিয়ার পিছন পিছন বাইরে বেরিয়ে আসতে হল। বাইরে একটা নতুন ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা গাড়ির সামনে যেতেই উর্দিপরা ড্রাইভার তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ধরে পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি আর সুপ্রিয়া পিছনে বসলাম। দুইজন দুই কোনায়। মাঝে একজন মানুষের সমান ব্যবধান। আমি এদিক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। সুপ্রিয়া ওদিকের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছিল। বড় রাস্তায় পড়ে ড্রাইভার গন্তব্যস্থান জানতে চাইল। সুপ্রিয়া বলল, 'লেক।' অথচ কিছুক্ষণ আগে ও বলেছিল, কসবা। ক্রমশই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম। সুপ্রিয়া যে মনে মনে একটা ষড়যন্ত্র করছে, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। অথচ কী সেই ষড়যন্ত্র, এবং তার প্রকাশ কোন পথ ধরে হবে, তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একবার মনে হল দরজা খুলে নেমে পড়ি। কিন্তু গাড়ি তখন দ্রুতগতিতে লেকের দিকে ছুটে চলেছে।

জলের দিকে মুখ করে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। নামতে যাচ্ছিলাম, সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বলল, 'একটু বসবো, পরে হাঁটবো।' তারপর ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'ইচ্ছে করলে তুমি একটু বেড়িয়ে আসতে পার।' লোকটা নেমে গেল।

সুপ্রিয়া আমার দিকে কাত হয়ে বসল। এদিকে আলো বিশেষ নেই। সুপ্রিয়া নিশ্চয়ই আমার মুখ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে স্বাভাবিক গলায় সুপ্রিয়া বলল, 'হঠাৎ চলে এলে যে?'

আমিও যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম, 'পুজোয় কোলকাতার বাইরে থাকতে ভাল লাগে না।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারতো।'

হেসে বললাম, 'মাসীর যদি গোঁফ হতো, মাসী তা হলে মামা হতো।'

'অবাক লাগে তখনই যখন মানুষ আবোল তাবোল কথা দিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চায়।'

খুব হাল্কাভাবে বললাম, 'কিন্তু যে দোষ করে নি, দোষ ঢাকার প্রশ্ন তার ওঠে না।'

সুপ্রিয়া হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তীব্র অথচ চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল, 'একশোবার দোষ করেছো। লীলাবতী ভাল মেয়ে না।'

'ও অসম্ভব ড্রিংক করে। সে কথা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে।'

'শুধু যে ড্রিংক করে তা না, মিস্টার কাপুরের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্কও রয়েছে।' সুপ্রিয়া ক্রমশই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল।

শান্তভাবে উত্তর দিলাম, 'একদা এক মিস্টার কাপুরে এক মিস দেশপাণ্ডেব কণ্ঠলগ্ন হয়ে মত্ত অবস্থায় গাড়িতে এসে বসেছিল। বসেছিল ঠিক না, তাকে এনে বসানো হয়েছিল।'

'এত কথা তুমি জানলে কি করে?'

'সেই প্রশ্নটা আমারও।'

'আমি শুনেছি।'

'কার মুখে?' হঠাৎ আমি যেন সুপ্রিয়ার চেয়ে সবল একজন মানুষ হয়ে গেলাম।

সুপ্রিয়া জেদী মেয়ের মত বলল, 'যার মুখেই শুনি না কেন, কথাগুলো সত্যি।'

'আরও গোটা কয়েক সত্যি কথা তোমার জানা উচিত।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। আবছা আলোয় দেখলাম ও আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বললাম, 'লীলাবতী সরল, নিশ্চুক। ওর দম্ভ নেই। ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে। আর নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে ঠেলে দেয় না।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার গলার দুরন্ত কাপুনী থেমে গেল।

সুপ্রিয়া বলল, 'আমি তোমাকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে ঠেলে দিয়েছি?'

হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে কান্নার মত শব্দ বার হল, 'সব চেয়ে বিস্ময়কর কি জানো। মানুষ যখন নিজের চরম দুরভিসন্ধি সরলতা দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে।'

সুপ্রিয়া কঠিনভাবে বলল, 'কী বলতে চাও?'

'বক্তব্য খুব সহজ, এত সহজ যে বলাটা খুব কঠিন হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রথম প্রশ্ন, আমাকে পাটনায় পাঠিয়েছিলে কেন?'

'প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য না। অফিসের কাজেই তুমি পাটনায় গেছ। কোন ব্যক্তির প্রশ্ন এখানে ওঠে না।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদিও প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি বাধ্য না, কিন্তু প্রশ্নগুলো তোমার শোনা দরকার। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে জামসেদপুরে পাঠানো হয়েছিল কেন, আগে থেকেই ডিলার অ্যাপয়েন্ট করা হয়ে গিয়ে থাকলে, এই তামাশার কী দরকার ছিল? তৃতীয় প্রশ্ন—'

হঠাৎ সুপ্রিয়া অসাতঙ্কু ভাবে বলে উঠলো, অন্য কথা বলো।'

'কী কথা বলবো। কী কথা বলা যায় তোমার সঙ্গে?'

সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল। ও আর আমার দিকে তাকিয়ে নেই এখন। এতক্ষণ ও আমার দিকে ঝুঁকে বসেছিল। ধীরে ধীরে ওপাশে সরে বসল। ওদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ করে বসল। লেকের এদিকটা অন্ধকার। কিন্তু আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। সেই আলোতে লেকের জলের কিছুটা অংশ চিক-চিক করছে। ওপারের গাছগুলো এক একটা জমাটবাঁধা অন্ধকার। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হতে লাগল, সুপ্রিয়া যে শুধুমাত্র আমার ওপর অবিচার করেছে তা না, ও আমাকে ভয়ানক দূরের মানুষ বলে ভেবেছে। দূরের মানুষ বলে না ভাবলে মানুষ মানুষকে এত অপমান করতে পারে না। একটা চিঠি লিখেছিলাম পাটনায় পৌঁছে, সে চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলল, 'ফেরা যাক।'

ড্রাইভারকে কাছে পিঠে দেখা গেল না। দরজা খুলে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলাম, সুপ্রিয়া আবার বলল, 'আমার ওপর রাগই করো বা আমার সঙ্গে বলার মত কথা খুঁজে না-ই পাও, ক্ষতি নেই। নিজেকে সামলে চলো। দেশপাণ্ডে ভাল লোক না। আজ সকালেই মিস্টার কাপুরকে ফোন করে জানিয়েছে, তুমি তার মেয়েকে পৌঁছে দিতে কোলকাতায় এসেছো। চাকরি করতে গেলে সুনাম নিয়ে চাকরি করা দরকার।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলাম, 'সুনাম দুর্নামে মানুষের কিছু এসে যায় না। মিথ্যে কথা যার যা ইচ্ছা রটাতে পারে।'

'এত লোক থাকতে সবাই তোমার নামেই বা এত মিথ্যা কথা রটায় কেন?'

'আর কি কথা?'

'তুমি ঘন ঘন দেশপাণ্ডের বাড়ি যাও। লীলাবতীর সঙ্গে পেছনের বাগানে বেড়াও। পাটনায় অনেক বেড়াবার জায়গা আছে।'

কর্কশ গলায় বলে উঠলাম, 'তোমার যতীনবাবু দেখছি সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে।'

আর এক মুহূর্তও বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। দরজা খুলে বাইরে এসে গলা ছেড়ে ড্রাইভারকে ডাকতে লাগলাম।

গাড়ি সাদার্ণ অ্যাভিনু দিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে চলেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। যদিও চুপ করে ছিলাম, মন শান্ত ছিল না। বারবার মনে হতে লাগল ঘোতনদের সঙ্গে আমারও বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমি জানতাম সুপ্রিয়া আজ কসবা যাবে না। জেনেশুনেও ওর ফাঁদে পা দিলাম। শুধু আজ না, বরাবরই দিয়ে আসছি। একটা পাপের বোঝা যেন আমার মাথায় চাপানো আছে। একটা অভিশপ্ত মানুষের মত সেই বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে আমাকে। এই গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে আমি কি কোন দিনই মুক্তি পাব না? শুধুই কি অন্ধের মত অন্য একটা ইচ্ছার তাড়নায় ছুটে চলবো, যে ইচ্ছা কোন দিনই আমার নিজের ইচ্ছা হতে পারবে না।

হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা কানে এলো, 'সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য।'

একটা চাবুক যেন এসে পিঠে পড়ল। ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'যা অপ্রিয়, তাই সত্য না।'

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে আবার বলল, 'রাগারাগির কথা না। কথা হচ্ছে নিজের ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষেরই থাকা উচিত।'

'সে উচিত বোধ যদি থাকতো, তাহলে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হতে তুমি।' বলে সুপ্রিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

সুপ্রিয়া বিস্মিত হল। 'আমার বিপদ হতো?'

'হ্যাঁ তোমার।' একটা ক্ষুব্ধ মানুষ যেন আমার ভেতর থেকে চেঁচাতে লাগল, 'কারণ নিজের স্বার্থ অপরের বিনিময়ে চরিতার্থ করতে ব্যাঘাত হতো তোমার।'

সুপ্রিয়া ছোট্ট ধমক দিয়ে বলল, 'লীলাবতীকে দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অথচ অনিমেষ ওকে দস্তুর মত অবহেলা করে।'

'না, অনিমেষ তা করে না, উপায় নেই বলেই অনিমেষকে দূরে দূরে থাকতে হয়।'

'কেন? উপায় নেই কেন?' সুপ্রিয়া একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ও আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

'উপায় নেই কারণ বিভা আর কোন স্ত্রীলোককে সহ্য করতে পারে না। আর কেউ যে অনিমেষকে ভালবাসবে, তার কাছে

কাছে থাকবে বিত্তা তা চায় না। চায় না বলেই পাটনায় গিয়ে তোমাকে হোটেলে থাকতে হয়।'

মনে হল সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে রইল। ও যেন কথা হারিয়ে ফেলল। ওর এই বিকল্প অবস্থা দেখে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ওকে ক্ষত-বিক্ষত করার নেশা আমাকে পেয়ে বসল। 'লীলাবতীকে তুমি হিংসে করো।'

'লীলাবতীকে আমি হিংসে করতে যাব কেন? ও তো চাকরির ক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী না।'

'চাকরি ছাড়াও মানুষের অন্য ক্ষেত্র থাকে।' ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা আমাকে ক্রমশই আচ্ছন্ন করতে শুরু করে-ছিল।

'এই ক' দিনের মধ্যেই অনেক জ্ঞান বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

সুপ্রিয়ার বিদ্রূপ গায়ে না মেখে উত্তর দিলাম, 'স্বাভাবিক মানুষ আ-জীবন অন্ধ সেজে থাকতে পারে না।'

সুপ্রিয়া যেন চাপা স্বরে গর্জে উঠল, 'তুমি স্বাভাবিক না। একটা বিশ্রী কমপ্লেকসে ভুগছো তুমি।'

'সে জন্যে যদি কেউ দায়ী হয়, সে তুমি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। একশোবার তুমি। তুমি আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছো। আমাকে লোভী করেছো, মানুষের চরম অধঃপতন—বিশ্বাসঘাতকতা, তুমি আমাকে দিয়ে তাই করিয়েছো। এক-এক ধাপ করে আজ কত নীচে নেমে গেছি আমি।' অন্ধকারের মধ্যে যেন আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

ভেবেছিলাম, আমার এই অসহায় অবস্থায় সুপ্রিয়া দুঃখিত হবে। ও আরও রেগে গেল। বিরক্তভাবে বলল, 'যা বলতে চাও সোজা ভাষায় বলো। কী বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছো তুমি? কার সঙ্গে করেছো?'

সুপ্রিয়ার নিষ্ঠুরতায় আমার অন্ত-রাত্মা হাহাকার করে উঠল, 'তুমি জানো না, কী করেছি আমি! অফিস ইউনিয়নের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি? ওরা যখন সংগ্রাম করার জন্যে জীবন-মরণ পণ করে ছিলো, তখন আমি চোরের মত পালিয়ে গিয়ে বড় পোস্টে জয়েন করিনি? আমার কলিগদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয় এটা?'

সুপ্রিয়া যেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, 'তুমি থাকলে ওদের এর চেয়ে বেশী কিছুই ভাল হতো না, বরং তোমার ক্ষতি হয়ে যেত। ওদের দাবী পুরোপুরিভাবে মিটেছে।'

'না, মেটে নি। ওদের আসল দাবী ছিল কোম্পানীতে ওদের একটা পাকাপোক্ত স্থান দিতে হবে। ম্যানেজমেন্টে ওদের কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই।'

সুপ্রিয়া ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, 'অবান্তর কথা তুলে সবাইকে বিব্রত করো না। তাতে কারও শান্তি হয় না।'

'যে প্রশ্ন তোমাদের বিব্রত করে, তাকেই তোমরা অবান্তর প্রশ্ন বলো। আমার প্রশ্ন ছিল, আমরা কারা। তোমার কাপুর সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয় নি।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুপ্রিয়া বলল, 'যেহেতু সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। অফিস আর যাই হোক, নাটকের আসর না। তোমরা কারা, এ প্রশ্নের জবাব তোমা-দেরই দিতে হবে। বাইরের কেউ সে উত্তর দিতে পারে না, দিলেও সেটা তোমাদের মনের মত হবে না। আমি যদি বলি, তোমরা একদল মেরুদণ্ডহীন মানুষ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে না পেরে অকারণে শুধুই চেঁচাও।'

'তা হলে বলবো, যাদের কাছে এই প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা একদল হৃদয়হীন যন্ত্র। মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। কিন্তু এক-দিন আমার এবং আমি বিশ্বাস করি, সেদিন খুব দূরে না, যেদিন এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতেই হবে।'

সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত ঝলকিয়ে উঠল: 'সেদিন যদি আসেই, আমিও বলে রাখছি, আমি তোমাদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে একই কথা বারবার বলে যাব, শুধু চীৎকার চেঁচামেচি করে মানুষ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না, মানুষ ক্ষমতা পায় নিজের কাজ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, ঐকান্তিক চেষ্টা দিয়ে।'

হাসির মধ্য দিয়ে বিষ ছড়াতে ছড়াতে বললাম, 'কিছুক্ষণ আগে বলেছিলে, এটা নাটকের আসর না। তোমার কথা দিয়ে তোমাকেই সাবধান করে দিচ্ছি।

সুপ্রিয়া যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। জেদী মানুষের মত বলেই চলল, 'আমি একদিন খুব সামান্য চাকরি নিয়ে এই কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলাম। আজ আমি যে উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়-য়েছি, তার জন্যে বাইরের থেকে কোন সাহায্য আসে নি। আমাকেই নিজের চেষ্টায় উঠতে হয়েছে।'

'নিজের চেষ্টায় বলো না। তোমার রূপ আছে, বয়স আছে, আর কাপুরের মত পুরুষ মানুষ আছে, তোমাকে কে বাধা দেয়।'

সুপ্রিয়া হঠাৎ চুপ করে গেল। কী বলতে গিয়েও বলল না। গাড়ি তখন গড়িয়াহাটার রেডলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকটায় বেশ আলো, সেই আলোয় সুপ্রিয়াকে দেখতে চাইলাম। সুপ্রিয়া মুখ ঘুরিয়ে বসেছে। ওর মুখের একটা অংশ আর ঘাড় দেখা যাচ্ছে শুধু। সুপ্রিয়ার এই অংশ দেখে ওকে সুপ্রিয়া বলে মনে হচ্ছিল না। সুপ্রিয়া গলায় একটা হার পরেছে। আলো পড়ে সেই হার চিকচিক করছে।

হঠাৎ মনে হল, আমার এখানে নেমে পড়া দরকার। ঘোতনের সঙ্গে আজ রাতেই আমাকে দেখা করতে হবে। দরজা খুলে নেমে পড়লাম। ভেবেছিলাম, সুপ্রিয়া বাধা দেবে। কিন্তু সুপ্রিয়া একটা কথাও বলল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না পর্যন্ত। যে-রকম বসেছিল সে রকমই বসে রইল। গাড়ি ছেড়ে দিল। মনে হল, সুপ্রিয়া ঠিক সেই-ভাবেই বসে আছে। মুখ ফিরিয়ে রাস্তাই দেখছে।

ঘোতন বাড়িতেই ছিল। বলল, 'কি ব্যাপার। মান অভিমান পর্ব শেষ হল।'

'মান-অভিমান আবার কি। অফিসের উঁচু পদে রয়েছে, একটু খাতির টাতির করতে হয়।'

ঘোতন হেসে ফেলল, 'ভেরী ভেরী গুড। তোমার বাস্তব বুদ্ধি সত্যি সত্যি প্রশংসনীয়।'

অন্যপথ ধরলাম, 'তারপর তোর খবর কি। আমাকে অন্তত একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।'

ঘোতন বিস্মিত হল, 'কেন?'

'একজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ পাওয়া যে-কোন পুরুষের পক্ষে লোভনীয়।'

ঘোতন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। বিশেষ করে যে মেয়ে রঙীন পানীয়ের সঙ্গিনী হতে পারে।'

'তুই লীলাবতীকে মদ খাইয়েছিস ঘোতন?'

ঘোতন নিজের মুখের সামনে হাত নাড়িয়ে বলল, 'মদ মদ বলিস না, ছোটলোকের মত শোনায়। ড্রিঙ্কস বল্, বেশ বুর্জোয়া গন্ধ। বেশ টানতে পারে রে মেয়েটি।'

'ভাল করিস নি ঘোতন।'

ঘোতনের চোখ বেশ লাল দেখাচ্ছিল। সেই লাল চোখ ছোট করে ও বলল, 'আর যাই করিস, উপদেশ দিতে আসিস না। ইচ্ছে করলে এই ধরনের বস্তা-পচা বাণী আমিও বহুৎ বহুৎ ছাড়তে পারি। সন্ন্যেসী থাকার সময় এসব খুব কপচাতাম। তার-পর, এত রাত্রে এলি কেন, তাই বল?'

'আমাকে আমেরিকায় নিয়ে চল ঘোতন।' বলতে বলতে ঘোতনের একটা হাত চেপে ধরলাম।

'এই কথা। দেখিস শেষ পর্যন্ত বাছুরে প্রেমের ঠেলায় আমার জীবন ওষ্ঠাগত করে তুলিস না যেন।' বলে ঘোতন পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

ফিক করে হেসে ফেললাম, 'তোকে একটা জলদস্যুর মত দেখাচ্ছে।'

ঘোতন বিরক্ত হয়ে বলল, মদ না খেয়ে তোরা—বাঙালীরা যা নেশা করতে পারিস, দেখার মত। আর বক-বক করতে হবে না, বাড়ি যা। আমি এখন ঘুমবো। কাল সকালে দেখা হবে। একসঙ্গে বেরোবো তখন। তোর ভিসা, পাসপোর্ট আরও যা-যা লাগে সব ব্যবস্থা করতে হবে। তার আগে ওখানে তোর একটা চাকরির জোগাড় করা দরকার। গুডনাইট।'

ঘোতন একরকম আমাকে তাড়িয়েই দিল।

—এগারো—

সকাল নটার সময় লীলাবতী এল। সঙ্গে এল ঘোতন। ঘোতন আসায় মুখ রক্ষা হল। প্রথম দিনেই বুঝতে পেরে-ছিলাম, এ বাড়িতে সুপ্রিয়াকে যে নজরে

দেখেছে সবাই, লীলাবতী সে দৃষ্টি-দাক্ষিণ্য পায় নি। লীলাবতীর চেহারা যে সে জন্যে কিছুটা দায়ী, আমার তা মনে হয়েছিল। এক একটা রূপ নিজের প্রখরতায় অপরকে পীড়া দেয়। লীলাবতীর রূপ সে-রকম। আগুনের শিখায় যেমন দাহন থাকে, ওর সমস্ত শরীর ঘিরে রয়েছে সেই দাহিকাশক্তি। পতঙ্গ নিজেকে পুড়িয়ে মারতে সেই শিখার দিকে ধেয়ে চলে। বড়মামা, মামীমা, মা সবার চোখে আমি একটা ঘনিয়ে-আসা আতঙ্ক দেখতে পেয়েছিলাম। আমি যাতে আগুনের শিখায় না পুড়ে মরি, তাই নিয়ে ও'দের উদ্বেগ।

বড়মামা তখনও অফিসে বেরোন নি। বাইরের ঘরে এসে প্রথমেই উনি লীলাবতীকে দেখলেন। দেখার সংগে সংগে আমার দিকে তাকালেন। বড়মামার চোখে যেন ভর্ৎসনার দৃষ্টি। ঘোতনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোরা এলি ভালই হল; বাড়িতে একা-একা ভাল লাগছিল না।' কথাটা বলার হয়তো দরকার ছিল না। বলতে হল বড় মামাকে শুনিয়ে। মামা যাতে বুঝতে পারেন ঘোতন আর লীলাবতী এক সংগেই এসেছে। লীলাবতীর সংগে সৌহার্দ্য যদি কারও গড়ে উঠে থাকে, সে ঘোতনের সংগেই, আমার সংগে না। বড়মামা সবাইকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কোন কথা বললেন না।

ঘোতন হঠাৎ বলে উঠল, 'এক-একজন মানুষ নিজেকে নিয়ে ভীষণ ভাবে। তোর মামাটি সেই ধাতের মানুষ।'

ঘোতনের কথায় অবাক হলাম, 'কি করে বুঝলি?'

সরাসরি কথার উত্তর না দিয়ে ঘোতন ঘুরিয়ে বলল, 'এইসব মানুষেরা শুধু যে নিজে কষ্ট পায় তা না, অকারণে অনেককেই দুঃখ দেয়। বাড়িতে বসতে ভাল লাগছে না। চল, বাইরে যাই কোথাও।'

'কোথায় যাবি?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঘোতন বলল, 'যাবার জায়গার অভাব। নে, ওঠ।'

যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, 'তোরা দুজনে একসংগে এলি কি করে রে!'

ঘোতন উত্তর দেবার আগেই লীলাবতী হেসে উঠে বলল, 'টেলিপ্যাথি মারফৎ যোগাযোগ করে।'

পার্ক স্ট্রীটের একটা 'বার'-এ এসে ঢুকল ঘোতন। আমি আপত্তি তুলেছিলাম, 'এই সাত সকালে মদ খাবি ঘোতন?'

ঘোতন উত্তর দিল না। শুধু ঠোঁটের একটা পাশ একটু বেঁকাল, যার মানে হল, মদ খাওয়ার আবার সময় অ-সময়!

ঘোতন খুব রসিয়ে রসিয়ে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে লীলাবতীকে দেখছিল। লীলাবতী একটা আগুন রংয়ের শাড়ি পড়েছে। ও যেন জ্বলছে। ওর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে চোখ খরখর করছিল। মদের একটা গ্লাস আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ঘোতন বলল, 'মনে হচ্ছে জীবনে মদ ছুঁস নি। খেয়ে দ্যাখ, নে।' হাত গুটোতে যাচ্ছিলাম, ও আবার বলল, 'ভয় পেয়ে কী হবে? ভয় পেতে পেতে দেখবি, ভয়টাই এক সময় তোকে নিয়ে পিংপং খেলছে। পড়িস নি সেই কবিতাটা, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর ডেথ। বেশী লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু যে-টুকু শিখেছি, একেবারে সাচ্চা। খিলু ফাটিয়ে ফেললেও ভুলবো না।' বলে ঘোতন হঠাৎ দমকা হাসিতে ফেটে পড়ল।

তখনও ইতস্তত করছিলাম, খাব কি খাব না। আমার অবস্থা বুঝে নিয়েই যেন ঘোতন বলে উঠল, 'তোর দুটো সাথি তোকে নিয়ে খেলা করছে। একটা চাইছে তোকে পেছনে টানতে, আর একটা চাইছে পেছন থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিতে।'

কাতর কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'আমি কী করবো ঘোতন?'

ঘোতন সংগে সংগে বলে উঠল, 'পিছনে হটার চেয়ে সামনে এগোনোর মধ্যে অনেক বেশী থ্রিল রয়েছে। আর চিন্তা না করে দুর্গা বলে দে গলায় ঢেলে।'

ঘোতনের কথা মত সবটাই এক সংগে গিলে ফেললাম। সংগে সংগে গলাটা জ্বলে উঠল। একটা বিকৃত স্বাদ জিভটাকে আড়ষ্ট করে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে ঘোতন আর লীলাবতী এক সংগে হেসে উঠল। লীলাবতী ঘোতনের সংগে পাল্লা দিয়ে মদ খাচ্ছিল। ওর সমস্ত মুখ টুস-টুসে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জোনাকীর মত জ্বলছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর ঘোতন প্রশ্ন করল, 'কিরে, কেমন লাগছে?'

ফিক করে হেসে ফেললাম, 'মন্দ না, কানদুটো বেজায় গরম হয়ে উঠেছে। মাথাটা খুব হাল্কা লাগছে।'

ঘোতন মুখ সরু করে বলল, 'আরও কত কি লাগবে। তখন রোজ খেতে চাইবি।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কিন্তু সবাই যে বলে মদ খাওয়া খুব খারাপ।'

ঘোতন বলে উঠল, 'বোকারা বলে, আর যাদের পয়সা নেই তারা বলে। আর কারা বলে জানিস, সেই সব লোকেরা যারা মরবার আগে বহুবার মরছে, তারা। আমি যেদিন আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছলাম, পকেটে কি ছিল জানিস? একটা ডলারের নোট, গোটা কয়েক সেন্ট, আর ছোট্ট একটা কাগজে ছোট্ট একটা কবিতা।' ঘোতন সুর করে বলতে লাগল, 'অদৃষ্টেরে শুধালেম, চির দিন পিছে/অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?/সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম আমি/সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি। সেই আমিটাকে তোর চিনে বার করে আনতে হবে যে কিনা তোকে সামনের দিকে ঠেলবে।'

বিভ্রান্তভাবে বললাম, 'কিন্তু সেই আমিটা যদি ঠেলতে ঠেলতে আমাকে পাতালের অন্ধকারে নিয়ে যায়।'

ঘোতন দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে বলল, 'আর যদি যাক। সেই অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে তুই বলবি, হে ঈশ্বর আমাকে আলো দাও। জগৎ আলোময় করে তোলো। দেখবি সত্যি সত্যি আলোর সন্ধান পাবি।'

হেসে ফেললাম, যাঃ, এ যেন বাইবেলের গল্প।'

ঘোতন প্রতিবাদ করল না। চেয়ারের পিঠে হেলান দিতে দিতে শুধু বলল, 'যা বললাম, বয়স হলে বুঝবি।'

'তুই যেন বয়সে আমার চেয়ে কত বড়!'

'বয়সে না হোক, জ্ঞানে তোর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা।'

ঘোতনের কথা বলার ধরণে লীলাবতী খিল খিল করে হেসে উঠল। লীলাবতীর হাসিটা খুব মিষ্টি। শুধু যে মিষ্টি তা না, প্রাণবন্তও। হাসি থামিয়ে লীলাবতী আমাকে বলল, 'আপনার বন্ধুটি রিয়াল জেম।'

বুঝতে না পেরে ঘোতন বলল, 'কার কথা বলছেন মিস দেশপান্ডে?'

'আপনার'। বলে লীলাবতী মিটমিট করে হাসতে লাগল।

ঘোতন কায়দা করে মাথা নুইয়ে বলল, থ্যাংকস য়্যু।' তারপর গলা ছেড়ে ঘোতন ডাকল, 'বেয়ারা।' ও কাছে আসতেই হুকুম করল, 'আউর দো পেগ।'

লীলাবতী বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আমি বলে উঠলাম, 'আর খাস নে ঘোতন। তোর নেশা হবে। আপনিও আর খাবেন না মিস দেশপান্ডে। অপরের বাড়ীতে থাকতে হয় আপনাকে। ও'রা কী না কী ভাববেন।'

লীলাবতী কথা বলল না। ঘোতন বলল, 'নেশা করার জন্যেই তো খাই। নেশা হলে খুব মজা লাগে না?' ঘোতন যে আমাকে প্রশ্ন করেছে বুঝতে পারি নি। চুপ করে আছি দেখে ও আবার ধমকের সুরে বলল, 'এমন কিছু শক্ত প্রশ্ন না যে এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে। ইয়েস, অথবা নো, যা হয় বলে দে একটা।'

'তা তো বটেই। নেশা না হলে মানুষ শুধু শুধু পয়সা খরচা করবে কেন?'

আমার কথা শুনে ঘোতন বলল, 'দ্যাটস রাইট, তোর হবে। চল তোর পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দি-ই।'

'আজ থাক ঘোতন।'

ঘোতন স্নেহের হাসি হেসে বলল, 'নট টুমরো। কাল কাল করে যে কাল বয়ে যায় বন্ধু। যা করবে আজ। শুধু আজ, শুধু আজ। নট টুমরো।' বলতে বলতে ঘোতন উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। টাল খেয়ে বসে পড়ল।

হেসে বললাম, 'কী হল?'

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এবং শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদকের সঙ্গে

অমৃতের লেখক ও পাঠকেরা

স্বদেশে বাঙালী, এবং বিদেশে ফরাসী-দের, সম্পর্কে নানারকম গল্পগুজব ছড়িয়ে আছে, আড্ডাবাজ বলে। হেমিংওয়ে আড্ডার অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন 'মুভেবল ফিস্ট"-এর টুকরো টুকরো লেখাগুলি। অনুরূপ আড্ডার গল্প বাংলা সাহিত্যেও বিরল নয়। যেমন ছিল ঠাকুর বাড়ীর আড্ডা, পরিচয়ের আড্ডা, শনিবারের চিঠির আড্ডা, কল্লোলীর আড্ডা—এমনি আরো বহু আড্ডার আসর।

সেদিন বাইশে জানুয়ারী। আড্ডা দিতে নয়, অমৃতের লেখক ও পাঠকেরা সম্পাদকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, ৭২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে। উপলক্ষ যেটা ছিল তার কথা পরে বলছি। ছাতের ওপরে প্যাণ্ডেল বাঁধা থেকে শুরু করে মাইকের গমগমে শব্দ—সবই ছিল। সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায়। মঞ্চের মাঝখানে বসেছিলেন, কিংবদন্তীর নায়কের মতো অমৃত-সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, বৈঠকী মেজাজে।

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবার নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সেজন্যেই, এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন। চুয়াত্তর বছরের প্রবীণ সাহিত্যিক বনফুল, আগের মতো, ছোটাছুটি করতে পারেন না। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। তিনিও এসেছিলেন, অমৃতের লেখক-হিসেবে, সম্পাদককে অভিনন্দন জানাতে।

বললেন, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একটা গৌরবময় অতীত ছিল, যখন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেনের মতো মানুষেরা এই সম্মেলনের সভাপতি হতেন। কিন্তু অনেকদিনের অবহেলায়, এই সম্মেলন গুরুত্ব হারাতে বসেছিল। আমি আশা করব, তুষারবাবু সেই গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কেননা, তিনি যোগ্য ব্যক্তি।

খুবই সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ধ্বনিঝঙ্কারে আশ্চর্য আবহ তৈরী করতে পারেন। শব্দ নির্বাচনেও তাঁর জুড়ি নেই। কিছুকাল আগেও, তিনি স্মরণ করতেন যে, নোয়াখালির বাঙাল শিশুকে সাউথ সুবারবান স্কুলের ছেলেরা ক্ষেপিয়ে মারত, পূর্ব-বঙ্গীয় উচ্চারণের জন্য। এইবার পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হয়েছে। যেন বলতে চান, দ্যাখো, বাঙাল ভাষার কী তেজ! কী মহিমা!

কিন্তু এমন একটা তৃপ্ত-পরিবেশে বুঝি কেউ আক্ষেপের ভাষা খুঁজে পান না?

অচিন্ত্যবাবু বললেন, তুষারবাবু এমন মানুষ, আসন যাঁর অলঙ্কার নয়। আসনেরই তিনি অলঙ্কার। সাহিত্যকেই তিনি ভালবাসেন না, সাহিত্যিকদেরও ভালোবাসেন। তাঁর সংস্পর্শে এলে, নির্মল সরোবরে স্নান করার পুণ্য অর্জিত হয়। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হয়ে, তিনি আসরকে সম্মানিত করেছেন।

তখন শীত ও শীতের কুয়াশা নেমেছে ঘন হয়ে। মাথার ওপরে খোলা আকাশ। মঞ্চের সামনে হলুদ রঙের প্লাইউডের চেয়ারগুলিতে বসে ছিলেন নানাবয়সী কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর গরিষ্ঠ অংশ। প্রমথনাথ বিশী গল্প করছিলেন শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কৃষ্ণ ধরের মুখে প্রসন্নতার আমেজ। রাম বসু একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। এবং তরুণ সান্যালকে দেখে মনে হচ্ছিল, ছোটোখাটো একটা ভাষণ দিতে তিনি অনিচ্ছুক নন।

খুব লাজুক চেহারার কবিসাহিত্যিকরাও সেই মুহূর্তে সঙ্কোচমুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ, উপলক্ষের সীমা ছাড়িয়ে, সকলেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন দ্রুত। লক্ষ্যটা কি? সম্পাদকের সঙ্গে পুনর্মিলনের সুযোগে সেতু নির্মাণের চেষ্টা? তাই হবে হয়তো। আড্ডা ও আনুষ্ঠানিক ভাষণের যুগ্মস্রোত বইছিল তখন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন : নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগে ছিল, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল পুরুষেরাই তার সভাপতি হতেন। সম্মেলনের দিনগুলি ছিল, আমাদের কাছে, দুর্নিবার, কিংবদন্তীর গল্পের মতো, আকর্ষণীয়।

কিন্তু ক্রমে ঐ সম্মেলন, তার গুরুত্ব হারায়। প্রকৃত সাহিত্য-সাধকের পরিবর্তে, জনপ্রিয় লিখিয়েরা, সভাপতির আসনে বসতে থাকেন। তরুণেরাও বর্জিত। এই পরিস্থিতিতে, তুষারবাবু, একটি আশ্চর্য

কাজ করেছেন, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শরীরে নতুন রক্ত সঞ্চালনের মতো। সেটি হলো, যখন যে-রাজ্যে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হবে, সেই রাজ্যের ও আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা, তিনি করেছেন। এর ফলে, ভাষার পরিধি বাড়বে। চিন্তার মুক্তি ঘটবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই ভেবে আশান্বিত যে, তুষারবাবু যোগ্য লোক। তাঁর মতো মানুষ যদি তরুণদের উৎসাহিত করেন, এবং প্রবীণদের জন্য দরজা বন্ধ না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের লুপ্ত গৌরব ফিরে আসবে।

মনোজ বসু, তুষারবাবুকে বলেন 'তুষারদা।' তাঁর কণ্ঠস্বরে আনুষ্ঠানিকতার লেশমাত্র ছিল না। যেন ঘরোয়া আসরে বসে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত।

বললেন, তুষারদা, এবার যে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। তিনি দেশে এবং বিদেশে খ্যাতিমান পুরুষ। আমি বাংলাদেশে গিয়েছি। সেখানকার মানুষ তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। ভারতবর্ষেও তিনি পরিচিত। সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁকে জানে।

বললেন, বাংলা অন্যান্য রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের মতো নয়। হিন্দীর চেয়েও বড়ো। একথা যেন কখনো ভুলে না যাই। তুষারদার কাছে আবেদন, ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতে হবে।

মনোজ বসু আরো বললেন, আমরা ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশানের কথা বলে চেঁচিয়ে মরছি। কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ দিচ্ছি না। তুষারদা সেই প্রমাণ দিয়েছেন। হিন্দীকে, দক্ষিণীভাষাকে, তিনি মর্যাদা দিয়েছেন, পুরস্কার দিয়ে। আমার বিশ্বাস, তাঁর নেতৃত্বে আমরা আবার মালিন্যমুক্ত হতে পারব।

এরপর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনি স্মৃতিচারণার আবেগ নিয়ে কথা বলছিলেন। মাইকে তাঁর কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট আন্তরিকতায় ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বললেন, কিংবদন্তী-শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা আমার সামনে, চারদিকে, বসে আছেন। এই পরিবেশে, আমি কিংবদন্তী-শ্রেষ্ঠ মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের নায়ক বললেও তাঁকে, অত্যুক্তি হয় না। তাঁর পরিবারের সাহিত্যপ্রীতিও আজ জনশ্রুতির বিষয়। আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মানেই একটা বিরাট ইনস্টিটিউশান। তাঁর কাছে আমাদের দাবীও অনেক। তরুণ কবিসাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে আমি দাবী করছি, তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে, যাঁদের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সাহিত্য জড়িয়ে আছে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে, তাঁদের যেন স্থান হয়।

কথা বলতে বলতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যেন, দশ বছর আগেকার দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন। নাকি গত-প্রাত্যহিকের সমকালে দাঁড়িয়ে শোনাচ্ছিলেন, অতীতের কথা?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বললেন,, আমি তখনো লেখক হইনি। সবে লেখা শুরু করেছি। প্রথমে একটি গল্প পাঠিয়েছিলুম অমৃত পত্রিকায়। ছাপা হয়নি। আবার পাঠালুম। ছাপা হল। তারপর থেকে যত লেখা পাঠিয়েছি, কোনোটাই ফেরত যায়নি। আজ অসঙ্কোচে স্বীকার করছি, অমৃতের মধ্য দিয়েই আমি প্রথম জনস্বীকৃতি পাই। এবং সেই কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ। আমার উপন্যাসও প্রথম ধারাবাহিকভাবে বেরোয়, তাঁরই সম্পাদিত অমৃতে।

মাইকের সামনে দাঁড়ালে অজীন বন্দ্যোপাধ্যায় কি রকম যেন অগোছালো হয়ে যান! ভালো কথাগুলিও গুছিয়ে বলতে পারেন না।

বললেন, বাগবাজারের ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘোষ-পরিবারের কথা সুবিদিত। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে দেখলে আমার সেকথা বারবার মনে হয়। আমি কথায়, আচার-আচরণে বাঙালী। কিন্তু তুষারবাবু বাঙালী কালচারের সার্থক প্রতিভূ হিসেবে, আমাদের মধ্যে যে-রকম পরিচ্ছন্নতায় উপস্থিত, সেইভাবেই নিজেকে আমি বিশুদ্ধ রাখতে পারিনি। তাঁরই সম্পাদিত অমৃতে আমি একটা সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখেছি, প্রায় এক বছর ধরে। এজন্যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এরপর এলেন প্রমথনাথ বিশী। তিনি বললেন, তুষারবাবু, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। জাতীয় কর্মকাণ্ডের দক্ষ ও কৃতি ব্যক্তি। বহু আগেই, তাঁর এই পদে নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতে পরিহাসের সুরটি প্রচ্ছন্ন ছিল না। বললেন, তুষারবাবু, আপনাকে মানচিত্র নিয়ে বসতে হবে। ভবিষ্যতে যখন সম্মেলন করবেন, তখন এমন জায়গাই নির্বাচন করতে হবে, যেখানে দর্শনীয় কোনো কিছুই থাকবে না। কেননা, এই উপলক্ষে কেউ সাহিত্য করতে যান না, এলিফ্যান্টা গুহা, কি অন্য কিছু দেখতে যান।

আরেকটি কথা। কোনো প্রকাশককে যেন ভবিষ্যতে এই সম্মেলনের, সভাপতির আসনে বসানো না হয়। কেননা, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ট্যুরিস্ট আর ব্যবসায়ীদের জন্য নয়।

কথাটা খাঁটি। এবং আরো খাঁটি কথা বলেছেন বিমল মিত্র। তাঁর ভাষায়: 'আমি লেখার কাজে রিহার্সাল দিয়েছি। বলার কাজে দিইনি। কাজেই...'

সম্বর্ধনা সভায় বনফুল, মনোজ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, তুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র

বেশ অমার্জিত। তিনি বললেন, তুষারবাবু সভাপতি হয়েছেন এজন্যে আমি আনন্দিত। তবে, সম্মেলন করে যে সাহিত্য হয়, একথা আমার মনে হয় না। এবার বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের খবর কেবল যুগান্তরে বেরিয়েছে, অন্য কাগজে বেরোয়নি। কেন? সাহিত্য যদি বড় লক্ষ্য হয়, তাহলে কি এটা ঘটত, না, ঘটতে পারত? আশা করি, তুষারবাবু, এই অনাচার রোধ করতে পারবেন।

মন্মথনাথ ঘোষ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি গদ্যে কিছু বলব না। কবিতা লিখে এনেছি। তাই পড়ে শোনাব। কবিতাটির নাম 'তুষারভারতী'।

বঙ্গ সাহিত্যের চূড়া
সাহিত্য সাধক
ভারতীর একনিষ্ঠ
নিত্য আরাধক,
হে তুষার, তব কান্তি
নিষ্কলঙ্ক দ্যুতি
গড়ে পাঠকের চিত্তে
নবীন প্রস্তুতি
প্রভাতের; মর্ত্যে তুমি
আনিলে অমৃত,
সগরের সন্তানেরা
হল সঞ্জীবিত
নতুন জীবনে; তব
প্রতিভা স্বাক্ষর
ঘটাইল বঙ্গদেশে
নব যুগান্তর।
মহাত্মা পিতার রচা
অমৃতবাজার
ষড়ৈশ্বর্যে করে পূর্ণ
সাধনা তোমার।
স্বয়ং ভারতী তার
বীণাখানি তুলে
সমর্পিল তব হস্তে
সর্ব দুঃখ ভুলে।
জানি তুমি সুরক্ষিতে
মর্যাদা তাহার।
ভাগ্যের প্রতিমূর্তি,
লহ নমস্কার।
কর্মকাণ্ড ত্যাগী তুমি
পরম বৈষ্ণব
সাফল্যে মণ্ডিত হোক
আজি মহোৎসব।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তুষারবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু লিখে পাঠিয়েছেন, 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হওয়ায়, অমৃতবাজার ও অমৃত পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে, আজ যে আয়োজন হয়েছে, শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারলাম না। আমার এ অক্ষমতা, আশা করি, আপনারা মার্জনা করবেন। এ অক্ষমতা যে কতখানি মর্মান্তিক, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় না। কারণ, শ্রীমান তুষারকান্তি আমার আত্মার আত্মীয়, আমার একান্ত আপনার জন।'

দক্ষিণারঞ্জন বসু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে যেন পূর্ববর্তী বক্তাদের প্রসঙ্গ টেনে কথা বলছিলেন। সবাই সতর্ক। মনোযোগী।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তুষারবাবু কেবল বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবেননি, ভারত-ভাবনায় প্রাণিত হয়ে দুটি পুরস্কার দিয়ে আসছেন ১৯৬৬ সাল থেকে। আজ যদি আসামে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হত এবং কোনো অসমীয়া সাহিত্যিক পুরস্কৃত হতেন, তাহলে হয়তো তার ফলাফল ভালোই হত।

এরপর ভাষণ দিলেন বুদ্ধদেব গুহ। তিনি বললেন আগে তিনি শিকার কাহিনী লিখতেন, কিন্তু তাতে তেমন সাড়া পাননি। এলেন উপন্যাস ও গল্প রচনার ক্ষেত্রে। অমৃতে আমি উপন্যাস লিখেছি, এবার শুরু করছি নতুন উপন্যাস। তুষারবাবুর কাগজে এ সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

সম্বর্ধনার উত্তরে তুষারবাবু, অন্নদাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, বক্তৃতা বড় ক্লান্তিকর। যাঁরা শোনেন, তাঁদেরও পরিশ্রম কম হয় না।

ঠিক সেই আড্ডার মেজাজে ধীরে ধীরে কথা বলছিলেন তিনি। খুব আস্তে আস্তে বললেন, সুধীর সরকারের দোকানে ভারি আড্ডা জমত।

হ্যাঁ। কি বলছিলেন যেন? ঢাকায় সম্মেলন করলে কি হয়? হোক না।

অন্নদাশঙ্কর আপত্তি জানিয়ে বললেন, তা কি করে হবে? বাংলাদেশ এখন আলাদা রাষ্ট্র। ভিন্নদেশ। ওখানে সম্মেলন করতে হলে আলাদা নাম নিতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ সাহিত্য সম্মেলন বা ঐ রকম অন্য কিছু। না হলে আপত্তি উঠবে, ভেবে দেখেছেন?

শ্রোতাদের কাছে বেশ উপভোগ্য মনে হচ্ছিল। আড্ডা? হ্যাঁ, আড্ডাই বটে। তাঁরা অমৃত-সম্পাদকের সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। লেখক ও পাঠকের সঙ্গে যিনি যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, নেপথ্যে থেকে, তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এই-ই তো উপায়। সম্বর্ধনা যেন তারই উপলক্ষ।

তুষারবাবু বললেন, আপনারা আমাকে সম্মান দিয়েছেন, সেজন্যে আনন্দিত। এই যে আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা করছি— তার মূল্য কি কম? আপনাদের আমি আত্মীয় বলে ভাবি। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে। এবং নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মারফতেই হবে।

কে যেন বললেন, যৌবনে তুষারবাবুকে মনে হত রাজার কুমার। আজ মনে হচ্ছে, তিনি রাজা। সম্রাট। এই সম্রাটই এখন নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

এরপর সভাপতি অন্নদাশঙ্কর বললেন, আমার পরম হিতৈষী ও বন্ধু তুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

—শুভঙ্কর পাঠক

সুস্বাগতম—মহাকাশচারিণী

বিশ্বের প্রথম এবং অদ্বিতীয়া মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা আবার এসেছিলেন কলকাতায়। এসেছিলেন ২৮ জানুয়ারী। দীর্ঘ ১০ বছর আগে ঠিক মহাকাশ জয়ের পরই ভারতবর্ষ তথা কলকাতায় ভ্যালেন্টিনা এসেছিলেন। সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক সফর। এবার তিনি এক মহিলা প্রতিনিধিদল নিয়ে ভারত সরকারের অতিথি হিসাবেই এসেছেন ভারতের প্রজাতন্ত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সঙ্গের সাথীরা হলেন—সোভিয়েত মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী জেনিয়া পুসকুরনিকোভা (একদা বলশোই ব্যালে প্রথম শিল্পী ছিলেন) এবং সদস্যা গ্যালিনা কোলাডা। শ্রীমতী তেরেসকোভা নিজেও ঐ মহিলা সমিতির সভানেত্রী।

বিমানঘাঁটিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, ভারতের মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি, প্রদেশ কংগ্রেস মহিলা শাখা এবং কয়েকটি মহিলা সংস্থা। ভি আই পি লাউঞ্জ থেকে শুরু করে রানওয়ের সর্বত্রই ছিল আবালবৃদ্ধবণিতায় ভর্তি। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির তরুণ সদস্যারা তাঁকে 'গার্ড অফ অনার'-এ সম্মানিত করেন। তারপর চন্দনের টিপ, মালা এবং ফুলের তোড়ায় সম্মানিত করা হয় অতিথিদেরকে। 'ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী জিন্দাবাদ' 'ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা যুগ যুগ জিও' ধ্বনিতে বিমানঘাঁটি মুখরিত হয়ে ওঠে। এরপর অতিথিদের আনা হয় ভি আই পি রুমে। সাংবাদিকদের প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে ওঠেন শ্রীমতী তেরেসকোভা। প্রাথমিক পরিচয়াদির পর শুরু হয় কলকাতা পরিক্রমা। গত '৬৩-র কলকাতা তাঁকে বড়ই আকৃষ্ট করেছিল। তাই দুর্বার গতিতে ছুটে এসেছেন রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতায়। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে সোজা হোটেলে জিনিসপত্র রেখেই কলকাতা দেখতে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীমতী তেরেসকোভা ও তাঁর সঙ্গীরা। সঙ্গ দিয়েছিলেন কলকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ। মহাত্মা লেনিনের স্ট্যাচুতে

দমদম বিমানঘাঁটিতে সোভিয়েট মহাকাশচারিণী ভ্যালেণ্টিনা তেরেসকোভা। পশ্চিমবাংলার শিল্প বাণিজ্য ও পর্যটনমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (সর্ব বামে) মাদাম তেরেসকোভাকে স্বাগত জানান। ছবিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনূরুল ইসলামকে দেখা যাচ্ছে।

শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হোল কলকাতা ভ্রমণ! ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হয়ে গ্রেড ইউ-নিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলনের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন। সময় খুবই কম। এরই মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললেন দুপুরের খাওয়া। যোগ দিলেন পর পর দু-দুটো সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। মাত্র একদিনের ছোট্ট সফর এবারের এই কলকাতা পরিক্রমা। আরো আশা ছিল তাঁর মনে কিন্তু তা আর ফলবতী হলো না। হ্যাঁ, ১০ বছর আগের কলকাতা আর আজকের কলকাতায় অনেক গরমিলই খুঁজে পাচ্ছিলেন শ্রীমতী তেরেসকোভা পর্যটকের দৃষ্টিতে তবু বারবারই কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন কলকাতার জনগণের কাছে। সোভিয়েত মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে তাই তিনিও সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আরো জানান যে, ভারতের যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব তিনি লক্ষ্য করেছেন। সে-বন্ধুত্ব শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, শিল্প-বিজ্ঞান-কারিগরী, এমনকি সামাজিক স্তরেও প্রসারিত হয়েছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্বের বন্ধন আরো মজবুত হবে।

শ্রীমতী তেরেসকোভার চাঁদে যাওয়া পৃথিবীর কাছে বিস্ময়কর হলেও সমগ্র নারীসমাজের কাছে এ এক গর্বের বস্তু। ভারতীয় মহিলারা কোনদিন চাঁদে যেতে পারবে কি? এমন প্রশ্ন অনেকেই শ্রীমতী তেরেসকোভাকে করছিলেন। তিনি হেসে একটাই জবাব দিচ্ছিলেন, শুধু ভারত কেন যে-কোন দেশের মেয়েরাই যেতে পারে। তবে তাকে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে হবে। খুব কঠিন অধ্যবসায় ছাড়া কি আর এসব সম্ভব হয়? তার আগে সে-দেশকে 'বিজ্ঞান ও কারিগরী' ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নত হতে হবে।

তেরেসকোভার বাবা ছিলেন ট্রাকটর-ড্রাইভার, আর মা সুতোকলের শ্রমিক। এই পরিবারের কেউ কি, সেদিন ভাবতে পেরেছিল যে, এই মেয়েই এমন এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে যার ফলে ইতিহাসে তার নাম চিরদিন জ্বলজ্বল করবে? একাগ্রতা আর অধ্যবসায়ের ফলেই তো সেই রবার ফ্যাকটরির আলাদা কর্মীটি ভ্যালেন্টিনা ক্রমে ক্রমে সুতোকলের কর্মী থেকে সুতো প্রযুক্তিবিদ্যা আরম্ভ করেন। দিনে করতেন কারখানায় কাজ, আর রাতে পড়াশুনা। এয়ার ফোর্স ইঞ্জিনীয়ারিং আকাদেমীর স্নাতক হয়ে একেবারে মহাকাশযাত্রী। এসবই সামান্য কটা বছরের কথা। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায় না থাকলে আজকের সফলতা সম্ভব হত কি?

আর পাঁচজন মেয়ের মতই পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখী মহিলা। স্বামী আর কন্যা নিয়ে সুখের সংসার। চাঁদে যাওয়া এবং ঘরকন্নার কাজ করা দুটোই তাঁর কাছে সমান সম্মানজনক। তিনি আবার মহাকাশে যেতে চান এবং যথাযথ তোড়-জোর চলছে। কবে যাচ্ছেন—এমন প্রশ্ন করায় তিনি সহাস্যে বললেন, দিনটা এখনও ঠিক হয়নি, সেটা আমার দেশ ঠিক করবে। আচ্ছা আপনি তো মেয়ে, একজন মেয়ের চোখ দিয়ে আপনার কাছে মহাকাশ কেমন লেগেছিল, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, এসব ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের কোন প্রভেদ নেই। আমি একজন বৈজ্ঞানিক। আমি বৈজ্ঞানিকের চোখেই সেদিন মহাকাশ দেখেছিলাম। হ্যাঁ, মহাকাশে গেছি। আবার যাবো। এবং সেটাই আমার কাজ।

—সিপ্রা আদিত্য

সাহিত্য ও সঙ্গীতে তুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা.

গত ২২শে জানুয়ারী যুগান্তর অফিসের ঘরোয়া উৎসব-সন্ধ্যা আড়ম্বরহীন. বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু বিদগ্ধ রসিকের শ্রদ্ধায় স্নেহে আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। টলটলে পূর্ণতায় চিত্তহারী। উপলক্ষ—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এ বছর সভাপতি রূপে নির্বাচিত শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের প্রতি তাঁর অনুরাগী অমৃতের লেখক. পাঠক ও কর্মীদের উদ্যোগে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় ২২ জানুয়ারী দৈনিক যুগান্তর অফিসে।

সাহিত্যিকদের রঙিন মনের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমান্তরাল ছন্দে চলেছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের সুরের দীপারতি।

অনুষ্ঠান সুরু হয় শ্রীমতী মায়া সেনের নিষ্ঠাগভীর কন্ঠের 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা' দিয়ে। ধ্রুপদাঙ্গের উদাত্ত সুরে রচিত হয় এক শুচিসুন্দর পরিবেশ। তারপরই 'আনন্দ সন্ধ্যা'র এক নির্মল আনন্দকে শিল্পী অলংকৃত করেন টপ্পার মীড় ও জমজমার অপূর্ব কারুকৃতিতে 'হৃদয়বাসনা আজ' দিয়ে। সংস্কৃতিমান তুষারবাবুর রুচিকে এই সাবেকী ঢংয়ের গান দিয়ে যেন শিল্পী অভিনন্দিত করেন।

বাণী ঠাকুর পরিবেশন করেন 'দুঃখ রাতে হে নাথ'— সুন্দর সুমার্জিত কন্ঠের শিষ্টাচারী পরিবেশনা শ্রোতাদের মন অনাবিল খুশীতে ভরিয়ে তোলে।

সুমিত্রা সেন তাঁর আপন পরিবেশন-শৈলীর আধারেই সুরু করেন 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা'-দিয়ে। তারপর 'ফুল বলে ধন্য আমি'-র পথ বেয়ে এসে থামল 'মোর সন্ধ্যায়'-এর সাধ্য ছাযায়। গানের নির্বাচন. সুরের আবেদন এবং শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গীর উজ্জ্বল ছাপ ছিল প্রতিটি গানে।

বাদুকর মদন কুণ্ডু

তুষারকান্তি ঘোষ সম্বর্ধনা সভায় অপূর্ব ভোজবাজি বিস্তার করে দর্শকমন্ডলীকে অভিভূত করেন।

মায়া সেন — সুমিত্রা সেন — বাণী ঠাকুর — সাগর সেন

সর্বশেষ শিল্পী সাগর সেনের সুগম্ভীর ভরাট কন্ঠে সূচিত হোলো মর্যাদাদীপ্ত উপসংহার 'আজি শুভদিনে পিতার ভবনে', 'একি সত্য' এবং বিশেষ অনুরোধে পরিবেশন করেন আরো তিনটি গান। বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী শিল্পী তার স্ব-মানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই তাঁর ভক্ত-শ্রোতারা শেষ অবধি তাঁদের আসনে অবিচলিত ছিলেন।

শিল্পীদের মেজাজকে সুসঙ্গতে উদ্দীপ্ত করেছেন সর্বশ্রী গোবিন্দ বসু. স্বপন অধিকারী. চঞ্চল খান ও ননী উপাধ্যায়।

সেদিনের উত্তাল সঙ্গীত-সন্ধ্যা যেন সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রবীণ সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষকের প্রতি নবীন যুগের একটি মধুর প্রণাম।

বন্ধুদলে কানন দেবী সম্বর্ধিতা

সূর্যনগরে তরুণ প্রাণের সবুজ স্বপ্ন দিয়ে গড়ে ওঠা এক অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 'বন্ধুদল' তাদের বাৎসরিক উৎসব উদ্বোধন করেন শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষকে সম্বর্ধনা জানিয়ে।

সম্বর্ধনার উত্তরে বিনম্র ভাষণে কানন দেবী বলেন, 'সম্বর্ধিত হবার মত এতটুকুও কিছু যদি আমার মধ্যে থেকে থাকে সে আমার প্রতি সহৃদয় স্নেহশীল দেশবাসীর সৃষ্টি। এই সুযোগে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্বর্ধনা আজকাল বহু জায়গায় পাবার সুযোগ ঘটছে—তবু আজকের এই সম্বর্ধনা আমার কাছে বড় মধুর। কারণ আমার সন্তানতুল্য প্রতিবেশী তরুণ দল এই সম্বর্ধনা সভার উদ্যোক্তা। সংস্থা প্রসঙ্গে বলেন. 'বন্ধুদল' সংস্থা নূতন। কিন্তু নূতন নয় এর অন্তরের সৌন্দর্য-পিপাসা. দুঃখ, অভাব. সমস্যা-জর্জরিত জীবনের তিক্ততাকে উপেক্ষা করে আকাশের দিকে মনকে মেলে ধরার স্বপ্ন। সকল বাধাকে জয় করে এই আনন্দবরণের প্রতি যেন এরা অবিচলিত থাকে।'

কানন দেবীর হাতে মানপত্র ও অর্ঘ্যদান করেন অমিতাভ গুপ্ত ও পলি গুপ্ত।

দু-দিনের উৎসব সভার এক একটি দীপ জ্বালিয়ে দিলেন যে সব শিল্পীবৃন্দ, তাঁরা

ছলেন সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা বসু, শক্তিপদ বসুরায়, বটুক নন্দী, গৌরাঙ্গ দেব। সংগীতের মাঝে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন পদ্মশ্রী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ললিত কণ্ঠের আবৃত্তি দিয়ে। যোগেশ দত্তর মূকাভিনয়ও খুব উপভোগ্য হয়।

সংগীতে সবাই লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। এঁদের সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। তরুণ শিল্পী গৌরাঙ্গ দেব উদীয়মান। কিন্তু পরিণতির সুস্পষ্ট আভাস তাঁর সুরেলা হাত ও ছন্দ প্রকরণে। স্থানীয় শিল্পী শক্তিপদ বসুরায়ের কণ্ঠও মধুর।

অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার কৃতিত্ব প্রাপ্য স্বপন ভট্টাচার্য ও তপন ভট্টাচার্যের।

তানসেন সংগীত সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী উৎসব : এ বছর মহাজাতি সদনে তানসেন সংগীত সম্মেলন রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন করেন। সংগীত সম্মেলনের রজতজয়ন্তী উৎসব ভারতে এই প্রথম। এই সঙ্গে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আর দুটি প্রতিষ্ঠান অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন এবং তানসেন মিউজিক কলেজেরও রজতজয়ন্তী পালিত হয়েছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও শিষ্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠানত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি বিশেষ সম্বর্ধনা সভা আহ্বান করে সম্মান জ্ঞাপন করেন। এ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন তানসেন সংগীত সম্মেলনের প্রথম সভাপতি কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শ্রীরায়চৌধুরী সেনী ঘরাণার সংগীতধারার একনিষ্ঠ প্রচারক বলে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

এবারের দীর্ঘ দশদিনব্যাপী অধিবেশনে যন্ত্রসংগীতের তুলনায় কণ্ঠসংগীত নিষ্প্রভ।

কণ্ঠসংগীতে মনে রাখবার মত অনুষ্ঠান করেছেন ওস্তাদ আমীর খাঁ ও জিতেন্দ্র অভিষেকী।

আমীর খাঁর সাত্ত্বিকভাবের সংযত গাম্ভীর্য অন্য সব ত্রুটিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। সুর লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর শুদ্ধ কল্যাণ, চন্দ্রকেদার ও চন্দ্রমধু। এ-শক্তি দুর্লভ বলেই আজও আমীর খাঁ অজেয়।

জিতেন্দ্র অভিষেকী তাঁর দু' দিনের অনুষ্ঠানে গাইলেন ভূপালী, সোহিনী, রামকেলী। কণ্ঠের পরিসর, মাধুর্য ও আবেগ মিলে অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হয় শ্রীঅভিষেকীর অনুষ্ঠান।

বহুদিন বাদে শোনা গেল শ্রীমতী পদ্মাবতী শালিগ্রামের গান।

মুণাম্বর খাঁর গানে অনুভবের চেয়ে আঙ্গিকশৈলীর কৌশল প্রদর্শনের অধীরতাই বেশী।

ভাল লাগলো শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাগেশ্রী পঞ্চম'। আগেকার চাঞ্চল্য—আঙ্গিক প্রদর্শনের ব্যগ্রতা—সুরের মোহানায় সংহত।

ধ্রুপদানুষ্ঠানে শ্রীশিশির গুহ তাঁর পাণ্ডিত্য ও শান্তভাবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

বাদিদ দেব বর্মণের আলাপ উচ্চ মানের—সেই তুলনায় ধামার কিছু ম্লান।

যন্ত্রসংগীতে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাগেশ্রী'র আলাপে গুরু আলাউদ্দিনের সরলতা ও শুচিতা—আবার গতের অংগে আলি আকবর খাঁর কল্পনার রং লেগে এক আশ্চর্য শ্রী ফুটে ওঠে। এর ওপর শিল্পীর অম্লিষ্ণু চিত্তের অনুধাবন ত আছেই।

প্রবীণ শিল্পীদ্বয় শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের সরোদ ও বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতার—শোনবার মত।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের 'কৌশিকী কানাড়া' ও মণিলাল নাগের 'মারু বেহাগে' দুটি যৌবনদৃপ্ত মনের গতিবৈচিত্র্যের দুটি পথ-রেখা মেলে ধরেছে।

যতীন ভট্টাচার্যের ব্যঞ্জনায় সুরের চেয়ে লয়কারীর প্রাধান্যই বেশী।

আমজেদ আলি খাঁর সরোদ শিল্পীর সকল আকর্ষণই ছিল। কুমার রাজেন্দ্র সিং-এর বেহালায় 'গুর্জরী টোড়ি' আর হিমনে ছড়ের শক্তিশালী স্বর ছাড়াও যে বস্তুটি মন আকর্ষণ করে সে হোলো তাঁর উত্তর ভারতীয় বাদনশৈলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্বরকম্পনের সুসঙ্গতি।

গৌর গোস্বামীর বাঁশের বাঁশীতে বাজানো 'চাঁদনীকেদারা' আসরে যেন একরাশ চাঁদের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইমরাৎ খাঁর 'দেশ' তানে লয়ে আঙ্গিক দক্ষতায় অনবদ্য।

ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর সানাই-এ 'বৈরাগী ভৈরব' রাত্রিশেষের যবনিকায় ফুটিয়ে তুলল প্রভাতী আলোর শুদ্ধ, শান্ত পূজারত-আত্মমগ্নতা।

কানাই দত্তর তবলা লহরায়, বোলের ঠেকা ও কায়দা তার আনন্দ ও দক্ষতার স্বাক্ষরবাহী।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হোলো কৌশিক বসাকের সেতার, শচীন দাসুর কণ্ঠসংগীত এবং সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের তবলা লহরায় প্রচুর প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

—চিত্রাঙ্গদা

বসন্ত বিলাপ/ অপর্ণা সেন

চিত্র-সমালোচনা

৫ দুশমন

জানা গেল যে, একই ধরনের (বোর-এর) গুলি দিয়ে কয়েকটি হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং অনুসন্ধান করতে করতে আরও জানা গেল যে, বিরজু নামে কোনও এক দুর্বৃত্ত এই হত্যালীলার জন্যে দায়ী। প্রথম নিহত ব্যক্তি রাজুর দাদা সুনীল এই দুর্বৃত্তকে ধরতে বদ্ধপরিকর। এবং তার প্রণয়িনীর সহায়তায় ও বন্ধুরূপী মেহমুদের পরামর্শে সে একসঙ্গে পাঁচজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করল একটি এস্টেটের রাণীরূপিণী প্রণয়িনীর জন্মোৎসবে। পাঁচ দুশমন একসঙ্গে মন্ত্রণা করল কি উপায়ে রাণীর পনেরো লক্ষ টাকা দামের হীরের গহনা হস্তগত করা যায়। বহু বুদ্ধির লড়াইয়ের পরে পাঁচ দুশমনের একজন 'মনোমোহন' সুনীলকে এবং অপর দুশমন 'শত্রুঘ্ন সিংহ' তার রাণীরূপিনী প্রণয়িনীকে নিয়ে পৃথক পৃথক মোটরে রওনা হল। বাকী তিন দুশমন বিনোদ খান্না, প্রেম চোপড়া ও প্রাণ—অপর তিনখানি গাড়ী চেপে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। পথে বহু ধস্তাধস্তি ও 'জুডো'-যুদ্ধের পরে সুনীল মনোমোহনের মৃত্যু ঘটাতে সমর্থ হল। পরে তারই মোটরে চেপে সে শত্রুঘ্ন সিংহের সম্মুখীন হল। দুই মোটরের সংঘর্ষ যখন চরমে উঠল, তখন জ্ঞানহারা রাণীকে মোটর থেকে ফেলে দিয়ে শত্রুঘ্ন সুনীলবেশী মন্ নারাংয়ের সম্মুখীন হল। প্রচন্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে যখন প্রমাণিত হল দুজনেই সমান সমান, অন্য অনুরূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপর তিন দুশমনও হাজির এবং বিনোদ খান্না ও প্রেম চোপড়া খতম হবার পরে যখন রণক্ষেত্রে রইল দুই দুশমন, তখন হঠাৎ দেখা গেল মা 'দুর্গা খোটে'র সামনে উপস্থিত হয়েছে দুই সুনীল। কে নকল, কে আসল, তা আবিষ্কার করল এক দুশমন 'প্রাণ'। এবং এও আবিষ্কৃত হল যে, শত্রুঘ্ন সিংহ—যে নকল সুনীল সেজেছিল, সেই হচ্ছে ঘাতক 'বিরজু'। এর পরে শেষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে যখন শত্রুঘ্ন সিংহ হত, তখন সাঙ্গোপাঙ্গসহ পুলিশ অফিসার গোপাল আবির্ভূত হয়ে সুনীলের অসমসাহসিকতার তারিফ করলেন। অবশ্য প্রাণ সত্যিই দুশমন কিনা, তার উত্তর পাওয়া যাবে ছবি দেখবার পরে।

মন্ নারাং প্রযোজিত '৫ দুশমন' ছবির এই হচ্ছে কাহিনীসারাংশ। ছবির নাম যদিও '৫ দুশমন' আসলে তা হওয়া উচিত ছিল 'পাঁচ দুশমন বনাম সুনীল' বা আরও ভালো, শুধু 'সুনীল'। কারণ ছবির নায়ক সুনীল-এর বলবীর্য ও প্রেম ভালোবাসা দেখাবার জন্যেই এই ছবি এবং প্রোডিউসার মন্ নারাং নিজেই এর কাহিনীকার ও নায়ক সুনীলের ভূমিকায় অভিনয়কারী শিল্পী। তা ছাড়া পাঁচ দুশমনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ছবির প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছুবার পরে; তার আগে পর্যন্ত তার ছোট ভাই, বিপথগামী রাজুর প্রায় তার চোখের সামনেই নিহত হওয়া ওদের মা ও পুলিস-কর্তা গোপালের সুনীলকেই রাজুর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করা এবং নিজের দোষস্খালনের চেষ্টায় সুনীলের প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ 'পাঁচ দুশমন'-এর সম্মুখীন হওয়ার ঘটনাগুলিকেই দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করেন। ছবির দ্বিতীয় অংশে যখন দর্শক মনোমোহন, বিনোদ খান্না, প্রেম চোপড়া, শত্রুঘ্ন সিংহ ও প্রাণ—এই পাঁচ দুশমনের কার্যকলাপ দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, তখন এঁদের মধ্যে কাউকে না ক্লোরোফর্মের শিশি নিয়ে, কাউকে বা ছ' চেম্বার রিভলভার নিয়ে নিজ নিজ অভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দর্শক কি দেখেন? দেখেন যে, প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে সুনীল লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত এবং ছবির কাহিনী অনুযায়ী প্রতি লড়াইয়ে সেই জয়লাভ করবে এও জানা কথা। সাসপেন্স থেকে সেটি হচ্ছে, ঐ পাঁচ দুশমনের মধ্যে কে সেই হত্যাকারী 'বিরজু'! শত্রুঘ্ন সিংহ-ই যে বিরজু, এটা জানবার পরেও দর্শকদের একটি উপরি লাভ হয়, যখন তাঁরা জানতে পারেন যে, প্রাণ আসলে দুশমন নয়, সে হচ্ছে একজন গোয়েন্দা।

'৫ দুশমন' এমন একটি ছবি, যা সর্বাংশে [illegible]প্রধান এবং সেইজন্যেই এ ছবিতে কোনো শিল্পীরই নাট্যনৈপুণ্য [illegible] সুযোগ থাকতে

পারে না। কাজেই প্রাণ, শত্রুঘ্ন সিংহ, নাজির হোসেন, অরুণা ইরাণী, মনোমোহন, বিনোদ খান্না, প্রেম চোপড়া, হেলেন প্রভৃতি সকলেই প্রাপ্ত সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেও দর্শকমনে তেমন কোনো দাগ কাটতে পারেন না।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। রাহুল দেববর্মণের সুরযোজনাতেও তেমন কোনও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল না।

মনু নায়াং প্রযোজিত এবং অভিনীত '৫ দুশমন' একটি সাধারণ সাসপেন্সধর্মী ছবি।

—নান্দীকর

স্টুডিও সংবাদ

সোনালী প্রোডাকসন্স-এর 'বসন্ত বিলাপ'

আজ শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারী উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে সোনালী প্রোডাকসন্স নিবেদিত মজার ছবি 'বসন্ত বিলাপ'। বিমল কর রচিত কাহিনী অবলম্বনে শেখর চট্টোপাধ্যায় লিখিত চিত্রনাট্যটিকে পর্দায় রূপায়িত করেছেন দীনেন গুপ্ত। এই হাস্য, কৌতুক ও রোমান্সে ভরা ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, কাজল গুপ্ত, শিবানী বসু, কণিকা মজুমদার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও চিন্ময় রায়। ছবির সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে রমেশ যোশী ও সুর্য চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পী সংসদ-এর 'বনপলাশীর পদাবলী'

রমাপদ চৌধুরী রচিত 'বনপলাশীর পদাবলী' একটি বহুপ্রশংসিত উপন্যাস। বিরাট এর পটভূমিকা, অগণন চরিত্রের ভীড়। এর থেকে একটি ঋজু চলচ্চিত্র গড়ে তোলা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। বাঙলা চলচ্চিত্র জগতের অবিসংবাদী নায়করূপে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে উত্তমকুমার নিজে এই কাহিনী অবলম্বনে একটি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ও পরিচালনার গুরুদায়িত্বও পালন করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। শিল্পী সংসদের হয়ে তিনি এই বিরাট চিত্রটি নির্মাণ করেছেন এই আশায় যে, এই কীর্তির আয় দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য ব্যয় করা হবে। এই হিতকার্যে সাহায্য হস্ত প্রসারিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ছবিটিকে প্রমোদকর মুক্ত করে। সকলেরই জানা আছে যে, এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণকারী অভিনেতা অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা কোনোরকম পারিশ্রমিক নেননি এবং উত্তমকুমার নিজেই এর উদ্যোক্তা।

রাজগীরে—অচেনা অতিথি

সারা প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'অচেনা অতিথি'র এক সপ্তাহব্যাপী বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য শিল্পীসহ চল্লিশজন বয়েজ স্কাউট-এর ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রযোজক রাজগীর যাত্রা করেছেন। অচেনা অতিথির কাহিনী রচনা করেছেন সুখেন দাস। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন দাস ছবিখানির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। সুর দিচ্ছেন অজয় দাস। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন—মান্না দে ও মৃণাল চক্রবর্তী। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে এখন পর্যন্ত যাঁদের দেখা গেছে তাঁরা হলেন—স্বরূপ দত্ত, সুখেন দাস, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেন সাধু, অজয় ভট্টাচার্য, জয়শ্রী রায়, মেনকা দেবী, রত্না ঘোষাল, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি। ছবিখানির চিত্রগ্রহণ কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিবিধ সংবাদ

সি এল টি-তে তুষারকান্তি ঘোষ : কোলকাতা শহরের অজস্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শহরের প্রান্তে, যেন একান্তে দাঁড়িয়ে আছে সি এল টি'র ভবনমহল আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে। ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'—জাতির ভাবী জনক সেই শিশুদের শরীরের সঙ্গে- সঙ্গে মানসিক সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও গঠনমূলক কর্মক্ষমতা গড়ে তোলবার এমন অভিনব প্রয়াস ও আয়োজনে সি এল টি অনন্য, অপরাজেয়। নানান বাধা-বিপত্তি, অর্থাভাবের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করেও সি এল টি এবার ভবনমহলে তাঁদের পক্ষকালব্যাপী উৎসব সমাধা করলেন শিশু শিল্পীদের দিয়ে।

১৪ জানুয়ারীর সন্ধ্যা স্মরণীয় হয়ে উঠেছিলো সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পরসিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের আনন্দময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে। সেদিনের পুরস্কার বিতরণীসভায় প্রতিভাচিহ্নিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা ও পুরস্কার বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং তুষারবাবু। চার কিংবা পাঁচ বছরের শিশুকাল থেকে সুরু করে পনের বছরের কিশোর কিশোরীদের নিষ্ঠা ও শ্রমভরে শিক্ষাগ্রহণ ও যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিবরণ শুনলেন এই প্রবীণ শিশু বিস্ময়ে, কৌতূহলে, আনন্দে, আগ্রহে। তারপর তাঁর সরল, সুন্দর স্নেহঝরা ভাষণে অভিনন্দন জানালেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়কে।

তিনি বলেন, শিশুদের এই বিচিত্র মেলায় আমি সমরবাবুর কল্পনার আকাশকে যেন দেখতে পেলাম। সব দুর্যোগের অবসানে এই প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যে যেন পৌঁছয় ঈশ্বরের কাছে আজ এই আমার প্রার্থনা।

দীর্ঘ আঠারো দিনের অনুষ্ঠানের সবগুলিতে উপস্থিত থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি কিন্তু মিঠুয়ার বিনিদ্র-রজনীতে প্রকৃতির সঙ্গে খেলা, মায়া চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত কথক নৃত্যের আঙ্গিকে 'রূপলেখা' নৃত্যাভিনয়ের আসরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি।

সংস্থার অন্যতম কর্মী শ্রীঅসিত মৈত্রের কাছে জানা গেল এবারের উৎসবে বাইরের শিল্পীর অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের অনুষ্ঠানের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে বেশী।

এবারের জোরালো অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল 'সং অফ ইণ্ডিয়া', 'ছড়া গান' 'হ-য-ব-র-ল' 'ড্যান্সিং চেলো', ছড়ায় শ্রীঅরবিন্দ, চণ্ডালিকা, মীরাবাঈ, রামায়ণ, ডিপ্লোমা গ্রুপের 'মধুর অপাঙ্গ'। এছাড়া নৃত্যমের 'রূপকথা' নৃত্যনাট্যে লোকরঞ্জনের 'স্বর্ণকাঞ্চন' ও 'মৌমাছিরা এল বনে'ও দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

অনামিকা কলাসঙ্গম-এর 'লোকমঞ্চ'-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গেল রবিবার, ২৮ জানুয়ারী, সকাল ১০টায় রবীন্দ্রসদন-এ অনামিকা কলাসংগম-এর 'লোকমঞ্চ'-এর শুভ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়েছে। সংস্থা সভাপতি শ্যামসুন্দর কানোরিয়ার স্বাগত ভাষণের পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ উদ্বোধনী ভাষণে বলেন : 'অনামিকা কলাসঙ্গম সংস্থা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মীদের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলবার উপায়স্বরূপ এই যে নৃত্য, নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে মালিকের অর্থে কর্মীদের প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করেছেন, এই অভিনব প্রচেষ্টাকে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাচ্ছি।' উন্নত-ধরনের নাটকাভিনয়, নৃত্যনাট্য, ব্যালে প্রভৃতি প্রচুর ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান। অনামিকা সংস্থা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়তায় একদিকে যেমন তাদের কর্মীদের এইগুলি দেখবার সুযোগ করে দিচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনই এই সকল দৃশ্যশিল্পের (পারফর্মিং আর্ট-এর) অনুষ্ঠাতাদেরও যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করতে সক্ষম হবেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরে বোম্বাই-এর শচীনশঙ্কর সম্প্রদায়ের 'দি ট্রেন' এবং অপরাপর ব্যালে প্রদর্শিত হয়। ('লোকমঞ্চ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য)

আমরা শুনে সুখী হলুম, 'অনামিকা' গোষ্ঠীর সুযোগ্য নাট্যপরিচালক শ্যামানন্দ জালান এ-বছরে ভারতীয় সঙ্গীত-নাটক, আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছেন। অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিকেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

ঢাকুরিয়া সান্ধ্য মজলিসের বার্ষিক অনুষ্ঠান : ঢাকুরিয়া সান্ধ্য মজলিসের সভাবৃন্দ গত ১৪ জানুয়ারী রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম রঙ্গমঞ্চে দ্বাদশ বার্ষিক প্রীতি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন, এই উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও তাঁরা যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তা ছিল স্বর্গত রমেশ গোস্বামীর বহুল অভিনীত নাটক, 'কেদার রায়'। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মজলিস সভাপতি শ্রীসুশীল নাথ উপস্থিত দর্শকদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান ও তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতীয় নাট্যশিল্পের অগ্রগতিতে পূর্বতন ও বর্তমান শিল্পীদের অবদান গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করেন।

তারপর সভ্যরা অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ "কেদার রায়" নাটকটি অভিনয় করেন। অতীতের বিশিষ্ট শিল্পীসমন্বয়ে বহুবার অভিনীত এই প্রখ্যাত নাটকটি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে মজলিস সভ্যরা এবারও প্রমাণ করেন যে তাঁরা নাট্য পরিবেশনায় সত্যই দক্ষতার দাবী করতে পারেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এই নাটকের সামাজিক চিত্রটিকেই বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় ও এই ব্যাপারে যথাযথ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাটকটির সুগম নির্দেশক—দক্ষিণা ঘোষাল ও প্রসা[দ] বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট চরিত্র রূপায়[ণে] অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন—প্রস[াদ] বন্দ্যোপাধ্যায় (কেদার রায়), হরিগোপা[ল] মুখোপাধ্যায় (চাঁদ রায়), দক্ষিণা ঘোষা[ল] (কাভালো), নন্দ মুখোপাধ্যায় (শ্রীমন্ত), সুশীল দত্ত (ঈশা খাঁ), মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যা[য়] (মানসিংহ), সুশীল নাগ (কালু), অনি[ল] চট্টোপাধ্যায় (মুকুট), শ্রীমতী পাই[ন] (সোনা) ও কুমারী মঞ্জু ভৌমিক (রাণী)। অন্যান্য ভূমিকায় প্রশংসাযোগ্য অভিন[য়] করেন সর্বশ্রী জীবন ঘটক (রত্নগর্ভ), শম্ভু প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বিশ্বনাথ), ভাস্কর মিত্র (মারান রায়), বরুণ বসু ও অমিত ঘোষ। এঁদের সকলের দলগত অভিনয় ও

নান্দীকার

জানুয়ারী মাসের অভিনয়

১লা রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ৪র্থ
১লা রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ৫ম
২রা মুক্ত অঙ্গন নাট্যকারের সন্ধানে ২২৮তম
৪ঠা রঞ্জনা শের আফগান ২২৫তম
৬ই রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩১৪তম
৭ই রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩১৫তম
৭ই রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩১৬তম
৮ই যাদবপুর তিন পয়সার পালা ৩১৭তম
১০ই রবীন্দ্র সদন শের আফগান ২২৬তম
১১ই রঞ্জনা নাট্যকারের সন্ধানে ২২৯তম
১৩ই রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩১৮তম
১৪ই রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩১৯তম
১৪ই রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩২০তম
১৬ই রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ৬ষ্ঠ
১৬ই রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ৭ম
১৭ই ধানবাদ শের আফগান ২২৭তম
১৭ই ধানবাদ নটী বিনোদিনী ৮ম
১৮ই রঞ্জনা শের আফগান ২২৮তম
১৯শে কল্যাণেশ্বরী নানা রঙের দিন ১২৬তম
২০শে রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩২১তম
২১শে রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩২২তম
২১শে রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩২৩তম
২২শে দেওঘর:জি শের আফগান ২২৯তম
২৩শে রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ৯ম
২৩শে রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ১০ম
২৫শে রঞ্জনা নাট্যকারের সন্ধানে ২৩০তম
২৬শে রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ১১তম
২৬শে রঞ্জনা নটী বিনোদিনী ১২তম
২৭শে রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩২৪তম
২৮শে রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩২৫তম
২৮শে রঞ্জনা তিন পয়সার পালা ৩২৬তম
২৯শে চুঁচুড়া শের আফগান ২৩০তম
৩০শে কোন্নগর শের আফগান ২৩১তম

মোট ৩৩বার অভিনয়

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুষ্ঠানটির সুবৃহৎসংখ্যক উপস্থিত দর্শক-বৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনামিকা কলাসংগমের নতুন পরিকল্পনা

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাঁচ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'অনামিকা কলাসংগম'-এর কর্মধারার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত, তাঁরা এঁদের প্রশংসা না করে পারবেন না। নৌটংকী, রামলীলা, কাওয়ালী এবং সস্তা নাচগানের আসরের ভক্তদের চোখের সামনে এঁরা পরপর তুলে ধরেছেন প্রকৃত শিল্প-পদবাচ্য অভিনয় কলা, লোকসংগীত ও নৃত্য, নৃত্যনাট্য এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁদের ঘটেছে, রুচিপরিবর্তন। শুধুই তাই নয়, 'অনামিকা' শিল্পীগোষ্ঠী শ্যামানন্দ জালানের দক্ষ নির্দেশনায় হিন্দী নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে উন্নত মানের এমন একটি আদর্শ কলকাতার হিন্দী ভাষাভাষীদের সামনে উপস্থাপিত করছেন, যাকে অনুসরণ করে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নাট্যসংস্থা এই নগরীতে গড়ে উঠেছে। মঞ্চাভিনয় এবং অপরাপর ক্রিয়াশীল শিল্পের (পারফর্মিং আর্ট-এর) ক্ষেত্রে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিরাট রুচির বিবর্তন ঘটানো অল্প কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

সম্প্রতি শ্যামসুন্দর কানোরিয়ার নেতৃত্বে অনামিকা কলাসংগম দেশ-বিদেশের উচ্চ-শ্রেণীর অভিনয়, নৃত্য, সংগীতাদি পরিবেশনের জন্যে আর একটি নতুন পরি-কল্পনা গ্রহণ করেছেন। বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক ও শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত কর্মী ও নির্বাহিকদের (এক্সিকিউটিভদের) যাতে এইসব অভিনয়াদি দেখতে মালিক-গোষ্ঠী সাহায্য করেন এবং ফলে মালিক-কর্মী সম্পর্ক উন্নত হয়, তার জন্য এঁরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এঁদের পরিকল্পিত 'লোকমঞ্চ' বিভাগের সদস্যপদ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। এঁদের আয়োজিত প্রতিটি প্রদর্শনীর বারোখানি আমন্ত্রণ-পত্র—দুখানি নির্বাহিতদের জন্যে ও দশখানি অপর শিক্ষিত কর্মীদের জন্যে—এঁরা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দেবেন বার্ষিক এক হাজার টাকা চাঁদার পরিবর্তে। ন্যূনকল্পে বছরে বারোটি কিংবা তারও বেশী উচ্চাঙ্গের প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন বলে এঁরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা শুনলুম, এরই মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান 'লোকমঞ্চ'-এর সভ্যপদ গ্রহণ করেছেন। কাজেই আমরা স্থিরনিশ্চয়, অনামিকা কলা-সঙ্গম-এর এই অভিনব প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত হবেই হবে।

রঙমহলে—নতুন নাটক 'তথাস্তু' :

অনর্থ-খ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের আর একখানি আলোড়ন-সৃষ্টিকারী নাটক 'তথাস্তু' গেল প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে রঙমহলে শুরু হয়েছে। পরি-চালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল সেন। নাটকের প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ, মিন্টু চক্রবর্তী, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, দিলীপ মৌলিক, ছন্দা দেবী, গীতা মিত্র, মন্দিরা রায়, মমতা বন্দ্যো-পাধ্যায়, সীমা, ছন্দা চট্টোপাধ্যায় এবং সরযূ দেবী। এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন 'তথাস্তু' রঙমহলের দর্শকদের তৃপ্তিদানে পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। নাটকের গানগুলি লিখেছেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরযোজনা করেছেন শৈলেশ রায়।

সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয় বর্ষ :

গরিফা সেণ্ট্রাল ক্লাবের পরিচালনায় সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৭ মার্চ, ১৯৭৩ থেকে। সামগ্রিক প্রযোজনায় থাকবে তিনটি আকর্ষণীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১০১ টাকা, ৭৫ টাকা ও ৫১ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা : গরিফা সেণ্ট্রাল ক্লাব (তালতলা), পোঃ গরিফা, ২৪ পরগণা।

নিহত সূর্যের ও-পিঠ : গত ১৯ জানুয়ারী 'আয়না' নাট্যসংস্থা অলোক সেনগুপ্তের 'নিহত সূর্যের ও-পিঠ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে কলেজ ওয়ু হলে মঞ্চস্থ করেন।

এই রূপকধর্মী নাটকটির সুন্দর সংলাপ এবং কাহিনীর বিস্তার খুবই চমকপ্রদ। আজ দৈনন্দিন মনুষ্যজীবনের উপর কটাক্ষপাত করেই এই নাটকটির মূল বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। নাট্যকার অতি সুন্দরভাবেই মহামানব, যুবক, মাতাল, কবি ও ডাক্তারকে বেছে নিয়েছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজের বাস্তব রূপকে দেখাবার। আবার এর মাঝে স্তাবক ও প্রতীক এই দুটি চরিত্রের উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। পরিচালনার গুণে (অলোক সেনগুপ্ত) নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়। কিন্তু প্রথম সূত্রপাতটি বড় একঘেয়ে

লাগলো। কিছু অদলবদল করে নিলে প্রথম দিকটা আরও আকর্ষণীয় করা যায় বলে মনে হয়। আলোকসম্পাতের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষভাবে আলোর বৃত্তটা যেখানে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি চরিত্রের ওপর পড়ছে, সেখানে আলোর কাজ খুবই উচ্চমানের হয়। সাদাবুড়ো যেখানে আগুন নিয়ে প্রতিটি চরিত্রের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন, সেখানকার ক্রিজটি খুবই ভালো এবং অর্থপূর্ণ হয়।

সকলের অভিনয়ের মধ্যে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। অবশ্য আরও কয়েকবার অভিনয় করলে এ-ত্রুটিগুলো সংশোধনীয়। তবুও এর মধ্যে মহামানব চরিত্রাভিনেতা সোমনাথ ভট্টাচার্যের অতি অভিনয়ের ঝোঁক অবশ্যই সংশোধন করা প্রয়োজন। শ্রীভট্টাচার্যের চলা-বলার মধ্যেও কৃত্রিম ভাব লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন : সঞ্জয় চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, পীযূষ সরকার, প্রশান্ত কাঞ্জিলাল, প্রবীর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণমোহন চ্যাটার্জি ও অলোক সেনগুপ্ত।

মঞ্চসফল নাটকের চিত্ররূপ : স্টারে অভিনীত মঞ্চসফল নাটক 'শর্মিলার' চিত্ররূপের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। প্রধান সহযোগী জয়ন্ত চ্যাটার্জি এক সাক্ষাৎকারে জানান : গত ২২ জানুয়ারী পার্ক হোটেলে কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলের নিয়মিত ক্যাবারে নর্তকী মিস্‌ ... নৃত্যে অংশগ্রহণ করার পর ছবির শেষ পর্যায়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী মার্চেই ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

তিনি আরও জানান, এ-ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করছেন : হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখার্জি, অসিতবরণ, বাসন্তী চ্যাটার্জি, দীপ্তি রায়, কণিকা মজুমদার, সুলতা চৌধুরী, চিন্ময় রায়, রাজশ্রী বসু ও শুভেন্দু চ্যাটার্জি।

সুধীন দাশগুপ্তের সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন মান্না দে ও আরতি মুখার্জি। অন্যান্য বিভাগীয় দায়িত্বে আছেন সুনীল ঘোষ (পরিচালক), সুনীল চক্রবর্তী (ক্যামেরায়), অনিল সরকার (সম্পাদনা)। চিত্রটি সিনে কোয়ালিটির পতাকাতলে নির্মিত হচ্ছে।

জব্বলপুরে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা : স্থানীয় দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাবে সভাপতি সুবোধ রায় ও সম্পাদক মোহিত কুমারের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা গত ১৩ জানুয়ারী থেকে ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীকিরণ মৈত্র বিশিষ্ট অতিথি ও বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপঃ—

শ্রেষ্ঠ নাটক—"আসামী হাজির", প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ প্রযোজিত। ২য় শ্রেষ্ঠ নাটক—"এক যে ছিল রাজা"—অশনি প্রযোজিত। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—তুষাররঞ্জন বসু (আসামী হাজির), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—রঞ্জিত ঘোষ (আসামী হাজির), ২য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—তপন ব্যানার্জি (এক যে ছিল রাজা) শ্রেষ্ঠ পার্শ্বাভিনেতা—গোবিন্দ দে (এক যে ছিল রাজা), ২য় শ্রেষ্ঠ পার্শ্বাভিনেতা—তারাপ্রসাদ বসু (বিষবৃক্ষ রেখা), বিশেষ পুরস্কার—মাঃ দেবাশীষ শ্যামরায় (কোথায় আলো)।

'কবি চন্দ্রাবতী' যাত্রাভিনয় : কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ গত ২৫ জানুয়ারী মহাজাতি সদন নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির আমন্ত্রণে মহাজাতি সদনে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'কবি চন্দ্রাবতী নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। যাত্রাভিনয়ে সৌখীন শিল্পীসংস্থাগুলির মধ্যে এই সংসদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, তাই এদের পরিবেশিত নাটকের মধ্যে যে দলগত সংহতি ও অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই বিরলদৃষ্ট। জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতীর মধুর কাহিনী এ নাটকের বিষয়বস্তু। দ্বন্দ্ব সংঘাত, প্রেম ও বিরহের সমন্বয়ে এ নাটকটির আবেদন সকল জনকেই আনন্দদানে সক্ষম। শিল্পীরা তার সঙ্গে অভিনয়ে চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। কাহিনীর রসঘনতা ও শিল্পীদের প্রাণময়তা যেন এক হয়ে গেছে। বংশীদাস, জয়চন্দ্র, ছাসেম আলি, কাসেম আলি, সিপার, শিবচন্দ্র, হলায়ুধ, পুষ্পায়ুধ, কেনারাম, রহিম, কাঙালী, চন্দ্রাবতী নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় প্রভৃতি চরিত্রে রূপদান করেছেন, ধীরেন চক্রবর্তী, নিখিল দাস, প্রদীপ ব্যানার্জি, সুরেশ ঘোষ, ইতু মুখার্জি গৌরচন্দ্র পাল, অসিত ঘোষ, দিলীপকুমার, কার্তিক বাগচি, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ঝর্ণা বসু, সুলেখা ব্যানার্জি, বুলবুল দে, রীতা মুখার্জি, গৌর অধিকারী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীঅজিত সাহা। সমগ্র নাটকের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি।

'কবি' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু

সমগ্র সাহিত্য জীবনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ক'খানি উপন্যাস লিখেছেন, 'কবি' তার মধ্যে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। কাহিনীর বলিষ্ঠ বক্তব্য তার প্রকাশকালে সমসাময়িক সমাজ জীবনকেই নাড়া দেয়নি, আজও তার আবেদন অক্ষুণ্ণ আছে। এই সঙ্গীতপ্রধান ট্রাজিক প্রেমের কাহিনীটি যখন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে তখন তার জনপ্রিয়তার কথা আমরা ভুলিনি। আমাদের চোখের সামনে সেইসব চরিত্র যেন আজও জীবন্ত—সেই কবিয়াল, ঠাকুরঝি, বসন, রাজন, মাসি ইত্যাদি।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মাতালিয়া প্রোডাকসন্স কবির নতুন চিত্ররূপ আবার আমাদের উপহার দিতে চলেছেন। বসন আর কবিয়ালের প্রেম আবার নতুন করে আমাদের মনের মর্মস্থানটিকে নাড়া দিয়ে যাবে।

কলকাতায় মিঃ টমাস জে বাটা

মিঃ টমাস জে বাটা ২৪ জানুয়ারী দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। ১৯৭৩ সালে দূরপ্রাচ্য সফর কর্মসূচীতে ভারতে অবস্থানকালে মিঃ বাটা ভারতে পাদুকাশিল্পের কারিগরী উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করেন এবং ভারতীয় কোম্পানির কার্যাবলী, কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে সর্বাধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি বাণিজ্যিক কর্মকৌশল, ফ্যাসানের প্রবণতা বিষয়ে পরামর্শ দেন।

মিঃ বাটা ২৮ জানুয়ারী কলকাতা ত্যাগ করেন।

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

চতুর্থ টেস্ট খেলা

কানপুরে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ৪র্থ টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ভারত ২—১ খেলায় ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে এগিয়ে আছে। সুতরাং ভারত বোম্বাইয়ের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলাটি ড্র রাখতে পারলেই 'রাবার' জয়ী হবে। এখানে উল্লেখ্য, কানপুরে এই নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যে ৪টে টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৩। ইংল্যান্ড এখানে ১৯৫১-৫২ সালের টেস্টে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল।

ভারতবর্ষ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়ে মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। প্রথম দিনের ৩৫০ মিনিটের খেলায় তারা দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৬৮ রান তুলেছিল। গদাই লস্করি চালে ভারতীয় খেলোয়াড়দের রান তোলার বহর দেখে ক্রিকেটপ্রিয় লোকের বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। স্কোর বোর্ডে লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না-পড়ে ৫১ রান এবং চা-পানের সময় দুটো উইকেট পড়ে ১১৩ রান দাঁড়িয়েছিল। সুনীল গাভাস্কার ২৩১ মিনিটে ৬৯ রান করে আউট হন। আবার তাকে স্বমহিমায় ফিরে আসতে দেখে

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

অজিত ওয়াদেকার

সকলেই খুশী। বিগত তিনটি টেস্টে তাঁর খেলা খুবই খারাপ হয়েছিল— ৬ ইনিংসে মোট রান ৬০ এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর কানপুর টেস্টে এই ৬৯ রানই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় তাঁর দিক থেকে সর্বোচ্চ রান। আরও উল্লেখ্য, কানপুরের এই চতুর্থ টেস্টে তিনি তাঁর ৬৯ রানের মধ্যে ২২ রান সংগ্রহ করলে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০০ রান পূর্ণ হয়। ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে গাভাস্কারই তুলনায় কম টেস্ট ম্যাচ খেলে ১০০০ রান

জি আর বিশ্বনাথ

টনি লুইস

পূর্ণ করেছেন। তাঁর হাজার রান পূর্ণ হয়েছে ১১তম টেস্টের ২১তম ইনিংসে।

প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন ওয়াদেকার (৪১ রান) এবং বিশ্বনাথ (২৪ রান)।

দ্বিতীয় দিনে ভারতের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৩২ (৭ উইকেটে)। এইদিন তারা আরও ৫ উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৬৮ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১৬৪ রান যোগ করেছিল। ভারতের রান ছিল লাঞ্চের সময় ২৫২ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ২৯১ (৪ উইকেটে)। অধিনায়ক ওয়াদেকারের দুর্ভাগ্য তিনি মাত্র ১০ রানের জন্যে স্বদেশের মাটিতে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ওয়াদেকার ৩২২ মিনিট খেলে তাঁর ৯০ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউন্ডারী করেন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং মনসুর আলী
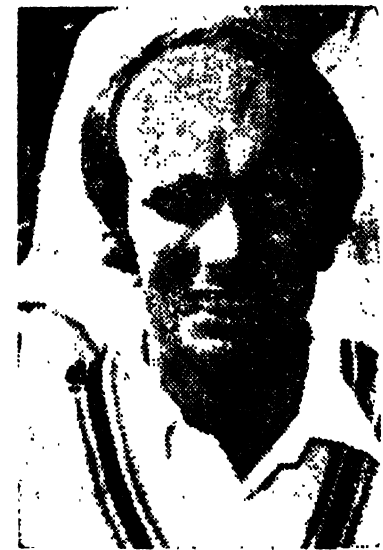
জ্যাক বার্কেনস

[illegible] রান সংগ্রহ করেছিলেন। মনসুর আলী আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ২৩০ মিনিট খেলে তাঁর ৫৪ রানে ৭টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। কি [illegible] না ভারতবর্ষ রান করেছিল—১০ ঘণ্টায় তাদের ৩০০ রান পূর্ণ হয়।

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার তাঁর ১ম ইনিংসের ১৫ রানের মধ্যে ১১ রান তুলে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেন। ফারুকের এই ২০০০ রান পূর্ণ হয়েছে তাঁর ৩৭তম টেস্ট খেলার ৬৯তম ইনিংসে। তাঁকে নিয়ে ১০জন ভারতীয় খেলোয়াড় সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৩৫৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তাঁরা মাত্র ৪০ মিনিট খেলে শেষ ৩টে উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ২৫ রান যোগ করেছিল। ক্রিস ওল্ড মারাত্মক বোলিংয়ে মাত্র ১৭ রানের বিনিময়ে ভারতের শেষ তিনটে উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন। আবিদ আলির ৪১ রান উল্লেখযোগ্য। তিনি আক্রমণাত্মক খেলায় ইংল্যাণ্ডের বোলিংয়ের ধার ভোঁতা করে ধরেছিলেন।

তৃতীয় দিনের বাকি ২৭৯ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক লুইস (৮৬ রান) এবং ফ্লেচার (২৮ রান)। লুইস এবং ফ্লেচারের অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে এইদিন ৮০ রান উঠেছিল। আবিদ আলি এবং লুইসের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দর্শকদের এইদিন যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৯০ (৭ উইকেটে)। এইদিন তারা আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে পূর্ব-দিনের ১৯৮ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে ১৯২ রান যোগ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টনি লুইস ১২৫ রান করে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড-ভারতের ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজেও এটা প্রথম সেঞ্চুরী। এখানে উল্লেখ্য, কানপুরে ইংল্যাণ্ড-ভারতের টেস্ট খেলায় এই নিয়ে ৮টা সেঞ্চুরী হল—ইংল্যাণ্ডের ৬টা এবং ভারতের দুটো। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন ব্যারিংটন (১৭২ রান), ডেক্সটার (নটআউট ১২৬ রান), পুলার (১১৯ রান), বেরী নাইট (১২৭ রান) এবং পিটার পারফিট (১২১ রান)। অপরদিকে ভারতের পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন পলি উমরীগড় (নটআউট ১৪৭ রান) এবং বাপু নাদকার্ণী (নটআউট ১২২ রান)।

লুইস তাঁর ১২৫ রানে ১৬টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর ৪র্থ উইকেটের জুটি কিথ ফ্লেচার তাঁর ৫৮ রানে করেছিলেন ৮টা বাউণ্ডারী। টনি লুইস এবং কিথ ফ্লেচার তাঁদের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে যেভাবে দলের অতি মূল্যবান ১৪৪ রান তুলেছিলেন তেমনি দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দও দিয়েছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ৩৩৬ (৭ উইকেটে)। ভারতের ১ম ইনিংসের ৩৫৭ রানের থেকে ২১ রান কম।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ৩৯০ (৭ উইকেটে)—ভারতের ১ম ইনিংসের থেকে ৩৩ রান বেশী। খেলায় অপরাজিত থাকেন বার্কেনশ (৫৯ রান) এবং আরনল্ড (৪৫ রান)। বার্কেনশ এবং আরনল্ডের অসমাপ্ত ৮ম উইকেটের জুটিতে এইদিন ৮৯ রান উঠেছিল। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা মনের সুখে ভারতীয় বোলারদের নির্মমভাবে পিটিয়ে খেলেছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৯৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের ৩৫৭ রানের থেকে ৪০ রানে এগিয়ে যায়। এই দিন ইংল্যাণ্ড আরও দুটো উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ৩৯০ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে ৭ রান যোগ করে। আঙ্গুলে আঘাত থাকায় গিফোর্ড ব্যাট করতে নামেননি।

ভারতের ২য় ইনিংসের ৩৯ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে গেলে ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে যায়। কিন্তু সোলকার (২৬ রান), আবিদ আলি (৩৬ রান) এবং বিশ্বনাথ (নট আউট ৭৫ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ভারতকে বিপদমুক্ত করেন। সোলকার ও বিশ্বনাথ ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ৬৪ রান এবং আবিদ আলি ও বিশ্বনাথ ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৮ রান তুলেছিলেন। বিশ্বনাথ ৭৫ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। তিনি ২৪২ মিনিট খেলে তাঁর ৭৫ রানে ১০টা বাউণ্ডারী করেন।

ভারতের ২য় ইনিংসের ১৮৬ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় ৪র্থ টেস্ট খেলা শেষ হয়। দুটি বিরতির সময় ভারতের রান এই রকম ছিল : লাঞ্চের সময় ৩৬ রান (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১২৬ রান (৫ উইকেটে)

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ৩৫৭ রান (গাভাসকার ৬৯, ওয়াদেকার ৯০, মনসুর আলি ৫৪ এবং আবিদ আলি ৪১ রান। ওল্ড ৬৯ রানে ৪ এবং আণ্ডারউড ৯০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮৬ রান (৬ উইকেটে। বিশ্বনাথ নট-আউট ৭৫, আবিদ আলি ৩৬ এবং সোলকার ২৬ রান। আণ্ডারউড ৪৩ রানে ২ এবং বার্কেনশ ৬৬ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ৩৯৭ রান (লুইস ১২৫, ফ্লেচার ৫৮ বার্কেনশ ৬৪ এবং আরনল্ড ৪৫ রান। চন্দ্রশেখর ৮৬ রানে ৪, বেদী ১৩৪ রানে ৩ উইকেট)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।